উপন্যাস সমগ্র

উপন্যাস সমগ্র

রমাপদ চৌধুরী

৩

সপ্তর্ষি প্রকাশন

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৬

স্বাতী রায়চৌধুরী কর্তৃক সপ্তর্ষি প্রকাশন , ৪৪এ চক্রবর্তী লেন , শ্রীরামপুর হুগলী থেকে
প্রকাশিত এবং কালি প্রেস, ৬৭ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ।

সূচী

এখনই

আজকের জীবনে ছোট ছোট সুখ আছে, আনন্দ নেই। দুঃখ আছে, গভীর বিষাদ নেই। আজকের জীবন ট্র্যাজেডিও না, কমেডিও না। মিলন এবং বিচ্ছেদের এই সম্মিলিত সুর আসলে এক ধরনের অ্যাডজাস্টমেন্ট। সুখের লোভে হারানোর ভয়ে শুধুই মানিয়ে চলা, মেনে নেওয়া। সেটাই বোধহয় এ-যুগের আসল ট্র্যাজেডি।

'আরে দুর্-দুর্,কেউ কারও সঙ্গে কথা বলতে পারে না। প্রাণিজগতে সবাই কথা বলতে পারে, যে যেটুকু বোঝে, যেটুকু বোঝাতে চায়। একটা কাক ডাকলে সব ক'টা কাক জলের মত বুঝতে পারে কি বলছে। মাঠের মধ্যে একবার মাইরি একটা গরুকে দেখেছিলাম, গলা উঁচিয়ে হাম্বা করল, দূর থেকে বাছুরটা সাড়া দিল, দুটো ডাকই, বিশ্বাস কর, ভালবাসার মত মিষ্টি। আর মা যখন আমাকে 'অরুণ' বলে ডাকে, স্নেহ না ঘৃণা বুঝতেই পারি না।'

টিকলু হেসে উঠল। বললে, মারা পড়বি তুই। দিনরাত সারা গায়ে শুধু কাঁটাতারের বেড়া জড়াচ্ছিস। কি দরকার বাবা, ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকিস কেন, আমার মত পাঁকাল মাছটি হয়ে সুড়ুত করে সরে পড়লেই পারিস।

অরুণ গুম্ হয়ে রইল, জবাব দিল না। সারা পৃথিবীর ওপরই ঘেন্না হয়ে গেছে ওর। সক্কলের ওপর, নিজের ওপরও।

মনের দুঃখ টিকলুকে বলতে গেল, সেও বুঝল না। নাঃ, জন্তু-জানোয়ার সবাই কথা বলতে পারে, একা মানুষই শুধু কথা বলতে পারে না।

সুজিত নিজের হাত নিজেই দেখছিল। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, জীবজন্তুদের অনুভূতি কম, চাহিদা শুধু দুটি, সে আর অন্যকে বোঝাতে পারবে না কেন!

অরুণ বিরক্তির সঙ্গে বললে, সে-কথাই তো বলছি। মানুষের হাজারো ফ্যাঁকড়া, সেসব অন্যকে বলতেও চায়, অথচ বলতে পারে না। মানুষ শুধু নিজের সঙ্গেই কথা বলতে পারে, নিজের সঙ্গেই শুধু কথা বলা যায়।

তা নয় তো কি। দিনরাত সবাই কথা বলছে। আমি নিজেও তো বলছি, অরুণ ভাবল। কিন্তু যা বলতে চাই তা তো বলি না, বলতে পারি না। যখন বলি, কেউ বুঝতে পারে না। তাহলে? কথা তো তাহলে কতকগুলো অর্থহীন শব্দ, কতকগুলো আওয়াজ শুধু, আর কিচ্ছু নয়, কিচ্ছু না। কেউ কোনও কথা বলতে পারে না, কেউ কোনও কথা বুঝতে পারে না।

—আমার কি মনে হয় জানিস? আমরা বনের গাছপালার মত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে

আছি। চুপচাপ। গাছ ভিড় করে থাকলে বন, মানুষ ভিড় করে থাকলে সমাজ।

—কিন্তু মেয়েরা ভিড় করে থাকলে বিউটি প্যারেড। নিজের কথায় নিজেই হাসল টিকলু।

অরুণ তিক্ত অধৈর্যে বললে, একটা সিরিয়াস কথা বলছি…

টিকলু বললে, তবে ? তবে যে বলছিস মানুষ কথা বলতে পারে না ? পারে না যদি তো দিব্যি ভ্যাজভ্যাজ করছিস কি করে !

অরুণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, ঠিকই বলেছিস। প্রত্যেকটি লোক শুধু ভ্যাজভ্যাজ করে।

সুজিত এবার ওর হাতের ফেট-লাইন থেকে চোখ তুলল। বললে, অরুণ, তুই ফিলজফি নিলে পারতিস। মনে হচ্ছে দার্শোনিক হয়ে যাবি।

—হাসিস না সুজিত। তিক্তবিরক্ত অরুণ বলে উঠল, আমার কি মনে হচ্ছে জানিস ? মনে হচ্ছে সারা গায়ে যেন ড্যাবা ড্যাবা আমবাত বেরিয়েছে, সারা গা চুলকোচ্ছে, কুটকুট করছে। ইচ্ছে হয় কষে এক লাথি বসিয়ে দিই পৃথিবীটাকে।

টিকলু গা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হাসল। অরুণকে যখন ও চিড়বিড় করে উঠতে দেখে তখনই এমনি ভাবে হাসে। হাসতে হাসতেই বললে, ও তুই যত কষেই পেনালটি কিক্ দে, গোলকি শালা একজন কেউ আছেই, ঠিক লুফে নেবে। তারচে তুই বরং এক মুঠো নিমপাতা ঘিয়ে ভেজে গপ্ করে খেয়ে নে, আমবাত ভাল হয়ে যাবে।

অরুণ চটল না। ঘাসের ওপর পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে হাত দু'খানা পিছনে রেখে আয়েশে ডেকচেয়ার হয়ে গেল। খালি হয়ে যাওয়া দেশলাইয়ের বাক্সটা পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে টেনে টেনে কাছে আনল, তারপর বাক্সর লেবেলটা তুলে ফেলার চেষ্টা করতে করতে বললে, সারা পৃথিবীর লিভার খারাপ, আমি একা নিমপাতা চিবিয়ে কি করব !

টিকলু একটা নকল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বললে, রুণু সত্যিই তোকে একেবারে…

—ধুত্তোর রুণু। বাড়ি। বাড়ি। আমার মাইরি…(অরুণের গলার স্বর কেমন কান্নার মত ভেঙে পড়ল)… সত্যি বলছি টিকলু, বাড়ি থেকে আমার পালাতে ইচ্ছে করে।

টিকলু হেসে উঠল। —আমার ট্রাব্‌ল্ অন্য, বাড়িতে ঢুকতেই দিতে চায় না।

সুজিত হাসল না, অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, সন্ন্যাসী হবি নাকি ? তোর তো বাবা শনি চন্দ্র এক ঘরে নেই, উঁহু ওসব সুবিধে হবে না।

অরুণ ফেটে পড়ল। —তুই জানিস না সুজিত, আমি সত্যিই এক এক সময়…মা আর বাবা…একজন শনি, আরেকজন রাহু…আর দিদিটা ? জলহস্তী, রিয়েল জলহস্তী।

বলে দু'চোখ বুজে বুকের ভিতরকার অসহ্য যন্ত্রণাটা চেপে রাখার চেষ্টা করল। পারল না। সমস্ত ঘটনা, আনুপূর্বিক সমস্ত দৃশ্য আবার ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল নিজেকে নিজে কষে কয়েক ঘা বেত মারে। সপাং সপাং সপাং। উফ্, তাহলে বোধহয় একটু শান্তি পেত।

অরুণের মনের মধ্যে একটা চাপা অভিমান, ওকে বাড়ির কেউ বুঝতে চায় না, বুঝতে পারে না। ও যেন কেউ নয়, ওর যেন মন বলে কিছু থাকতে নেই। মাঝে মাঝে অভিমানটা তাই রাগ হয়ে যায়।

সুখ বল বিলাস বল, একটাই আছে—ঘুম, তাও মৌজসে ভোগ করতে দেবে না। রোজ সকালে একটা না একটা ফিরিস্তি।

—ভোরসকালে হাওয়াঘুমটা দিলে মাইরি মাটি করে ! কি, না হৃষিকেশবাবু চলে যাচ্ছেন, পেন্নাম করে আয়। এই রকম পেন্নামটেন্নামের ভণ্ডামি কবে যাবে বল তো দেশ থেকে !

ভিতরের ক্ষোভ কার কাছে আর প্রকাশ করবে, টিকলু আর সুজিত ছাড়া ? তাই সেদিন এসে বলেছিল ওদের।

হৃষিকেশবাবু চলে যাচ্ছেন। কৃতার্থ করেছেন। তোমাদের গুরুদেব টাইপের লোক, তোমরা যত্নআত্তি করো, লুচি ভেজে খাওয়াও,আমাকে ঘুম থেকে তুলে পেন্নাম না ঠোকালে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত।

টিকলুর কাছে সবই ঠাট্টা। হেসে বলেছিল, সে তো বাওয়া চুকে গেছে সকালেই। বলেছিল, আঁচ তো নিভে গেছে, তবু এখনও উথলোচ্ছিস কেন।

কাকে বোঝাবে অরুণ। কেউ বোঝে ? এই আজকের ব্যাপারটা···

খামচে মাটি থেকে পড় পড় করে একমুঠো দুব্বোঘাস ছিঁড়ল অরুণ, মুঠোর মধ্যে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল। আর মনে মনে ভাবলে, কত লোক তো দিব্যি মনের মত মা পায়, আমার বেলাই···

—মনের মত কিছুই পেলাম না মাইরি।

সুজিত হেসে বললে, ওসব অন্যদের জন্যে। চতুর্থে ভাল গ্রহট্রহ থাকে তাদের, চতুর্থপতি স্ট্রং হয়···

টিকলু হাসল না। বললে, তোর মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে। আসল কথাটা কি তাই বল না।

অরুণ বিরক্তিতে ঘেন্নায় মুখখানা বিতিকিচ্ছিরি করলে। —কোনটা বলব ?

—কেন, হৃষিকেশটা তো সেদিন বললি, বিদেয় হয়েছে। টিকলু হাসল।

অরুণ নিজেই এবার বলতে গিয়ে হেসে ফেলল—আজ আবার দরজায় ধাক্কা, ঘুম ভাঙিয়ে বাজারের থলিটা হাতে ধরিয়ে দিলে : সোনার মা কাজ করতে আসেনি, বাজারে যা। ···দ্যাখ টিকলু, সমস্ত পৃথিবী আমার কাছে তেতো হয়ে গেছে। আর নয়তো আমি নিজেই তেতো হয়ে গেছি। স্পষ্ট বাংলায় কথা বলছি, তুইও বুঝতে পারছিস না।

—কেন বাবা, তুই তো বলিস, প্রত্যেকটা মানুষ নাকি এক এক ভাষায় কথা বলে, কেউ কারও ভাষা বোঝে না।

—উঁহুঁ, তাও মনে হচ্ছে ঠিক নয়। আমরা আদপে কথা বলতেই পারি না। অরুণ ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবার চেষ্টা করে বললে।

—মানে আমরা সব গাছ হয়ে গেছি ? টিকলু রসিকতা করল।

অরুণ চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর দুম্ করে বলে ফেলল, তাতেও কি শান্তি আছে ? 'আমি সরে থাকব, আমি আলাদা থাকব, আমাকে বিরক্ত করো না'—এসব ভাবলেই হল নাকি। সেখানেও দেখবি আশপাশের গাছগুলো তলায় তলায় শিকড় চালিয়ে দেবে, শিকড়ে শিকড়ে ঠোকাঠুকি, জড়াজড়ি, এ ওরটা ছিনিয়ে নিতে চাইবে···

নাঃ, পালানো যায় না। পালাবার জায়গা নেই। প্রত্যেকটা মানুষ এক-একটা অদ্ভুত ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে, হ্যাঁ তাই, কেউ কারও ভাষা বোঝে না, তবু কথা বলতে হবে, কথা বলে যাও। দিনরাত শুধু জিভের এক্সারসাইজ করো। ধুত্তোর।

□

আসুন, এইবার আমরা ঐ বাড়িটার কাছে যাই।

বাড়িটার সামনাসামনি রাস্তার এপারে একটা মহানিমের গাছ। দু'দিন আগেও পাতা ছিল না গাছটায়, গুঁড়িটা হাত পা ছড়িয়ে ঠায় দাঁড়িয়েছিল। গাছ, কিন্তু ওটা যে নিমগাছ বোঝার

উপায় ছিল না। এখন অনেক পাতা। ডগায় কচি কচি তামাটে শিখা হয়ে দুলছে। একটা ডাল ইলেকট্রিকের তার অবধি গিয়ে পড়েছিল বলে কেটে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম দিকের ঘরখানা ছোট, তক্তপোশটা আরও ছোট। তক্তপোশটার ধারে একটা জানালা আছে, ঘুম-ভাঙা ভোরের দিকে অরুণ চোখ বুজেও জানালার ওপাশে নিমগাছটার পাতা নড়া টের পায়। ঝিরঝির ঠাণ্ডা হাওয়া আসে।

কিন্তু নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকতে পায় না। গত বছর বাড়িওয়ালা অরুণদের কিছু না জানিয়ে নীচের তলায় একখানা ঘর ভাড়া দিয়ে দিল। তার পর থেকে ঘরখানা চুনের আড়ত। বাড়ির সদর দরজার পাশটুকু নোংরা হয়ে থাকে। চুন ছড়িয়ে থাকে শালার রাস্তা অবধি। সভ্য-ভব্য একটা লোককে বাড়ি আনা যায় না। তার চেয়ে বড় কথা, ব্যাটা সকাল থেকে মাল খালাস করে, টিন পেটানোর, লরি দাঁড়ানোর আওয়াজ আসে। ভোরবেলার আমেজে বেশ বালিশ আঁকড়ে মজাসে আরেকটু ঘুমোবে তার উপায় নেই।

ফুরফুরে চমৎকার হাওয়া আসছিল। এই ভোরের হাওয়াটা দিব্যি সাবানের ফেনার মত গায়ে মুখে মেখে নিতে ইচ্ছে হচ্ছিল অরুণের। কিন্তু তা হ'লে তো হাত বাড়িয়ে টেব্‌ল ফ্যানটা বন্ধ করে দিতে হয়। 'এর মধ্যে তোর যে কেন পাখা লাগে বুঝি না।' ধেৎ। লাগে তো লাগে, তোদের কি। ইলেকট্রিক বিলের টাকা তো আর তুই দিস্ না।

ওদের তো সব কিছুতেই অভিযোগ, অরুণ যা কিছু করে। শুনে শুনে ও নিজেও ভোঁতা মেরে গেছে, চামড়ার ভিতর অবধি আর পৌঁছয় না। তবে ঘুম ভেঙে গেলেই মান্ধাতা আমলের জং-ধরা টেব্‌ল ফ্যানটার ঘচাং ঘচাং আওয়াজটা বড় কানে লাগে।

পাখাটা বন্ধ করার জন্যে শুয়ে শুয়েই হাত বাড়াবে কিনা ভাবছিল অরুণ, সাহস হল না। বিশ্বাস নেই, হঠাৎ এক একদিন এমন শক্ মারে।

ইস্, মা এমন এক-একটা কথা বলে। টিকলুর সামনেই একদিন বলে বসল, দেখিস শট্ মারবে!

শট্ মারবে। ভেংচে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল অরুণের।

বালিশটা আরেকটু ভাল করে আঁকড়ে ধরে আরেকটু আরাম করে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু উপায় আছে নাকি।

দড়াম্ দড়াম্ করে ধাক্কা পড়ল দরজায়। —অরুণ, অরুণ!

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে দিল অরুণ।

—সোনার মা আসেনি, ওঠ্, বাজারে যেতে হবে। পাছে আপত্তি শুনতে হয়, কথাটা বলেই মা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

আজকের দিনটা খারাপ যাবে। চেঁচিয়ে উঠে 'পারব না' বলতে গিয়েও অরুণ থেমে গেল। আজ মা'র কাছ থেকে গোটাকয়েক টাকা চাইতে হবে।

শুয়ে শুয়ে একটু রুণুর কথা ভাবতে চেয়েছিল। রুণুটা একটা ইডিয়েট। অরুণ কি দারুণ ভালবাসে ওকে, অথচ মেয়েটা কেন যে বোঝে না, ভুল বোঝে! 'তোমার তো স্মার্ট মেয়েদেরই পছন্দ।' স্মার্ট কথাটার মধ্যে উর্মির নামটা লুকিয়ে আছে, অরুণ জানে। মেয়েরা এক একটা ক্যালকুলাসের অঙ্ক, বোঝাই যায় না। আরে, প্রথম প্রথম একটা দিনও তো ভালবাসার কথা বলতে হয়নি, তখন তো ঠিক বিশ্বাস করতে। এখন নিত্যদিন কি ভালবাসি ভালবাসি বলা যায় নাকি। বলতে গেলে অরুণ নিজেই হেসে ফেলবে।

আচ্ছা, উর্মির ওপর ওর এত জেলাসি কেন?

চোখেমুখে জল দেবার জন্যে কলের দিকে গেল অরুণ। কলটা খুলে দেখলে জল নেই। ধুৎ। কোনও সময়ে যদি পাম্পের জল থাকে। কলটা ফিরে বন্ধ করতে ইচ্ছেও হল না। যখন পাম্প চলবে জল বেরিয়ে যাক্ না, আমি তো কখনও…আমার শালা সেই

চৌবাচ্চা। এই তো একটু আগে কে মুখ ধুচ্ছিল, আমার বেলাই শেষ। তেলের শিশি নিয়ে স্নান করতে যাও, দেখবে দু'ফোঁটা শুধু তলানি পড়ে আছে। যে যার নিজেরটি পেলেই খুশী, কেন, শেষ হয়েছে দেখে আবার ঢেলে রাখতে পার না!

চৌবাচ্চার জল নিয়ে চোখেমুখে দিয়ে দড়িটার দিকে তাকাতেই মা তোয়ালেটা এগিয়ে দিল। ফ্ল্যাটারি আর কাকে বলে।

দিদি হাসি হাসি মুখে চায়ের কাপ নিয়ে হাজির হল।

তার হাত থেকে কাপটা নিয়ে অরুণ বললে, ঘুস দিচ্ছিস? বলে হাসল।

দিদির মুখেও হাসি এসেছিল, কথাটা শুনেই ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেল। মুখের হাসিটা ঝট্ করে মুখ-ঝামটা হয়ে ফিরল। —না, অন্যদিন কেউ চা দেয় না তোকে!

অরুণ চুরুপ্ করে একটা চুমুক দিল কাপে, তারপর বললে, দেয়, আধঘণ্টা চেঁচামেচির পর।

—সক্কালে উঠলেই পারিস, প্রথমবার যখন হয়।

অরুণ কথা বাড়ালে না, মুখ তেতো করে কি হবে সকাল থেকে। রুণুর সঙ্গে দেখা হওয়ার দিন আজ, অথচ মন খিচড়ে রইল।

পাজামা বদলে প্যাণ্ট পরবে কিনা ভাবল একবার। উফ্, এই প্যাণ্ট করানোর জন্যে কি রাগ বাবার।

—ছেলেকে দিয়ে বাজার করালে পচা মাছই খেতে হবে। যতটা সম্ভব বাবার সঙ্গে মুখোমুখি হতে চায় না অরুণ, তবু সেদিন পাকেচক্রে একসঙ্গে খেতে বসতে হয়েছিল। বাবা তো চিরকাল টাটকা খেয়ে এসেছে, দিনকাল যে বদলে গেছে সে খবর তো রাখে না, মাছ একটু মুখে দিয়েই বললে, খারাপ হয়ে গেছে। ব্যস্, মা অমনি ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, ছেলেকে দিয়ে বাজার করালে পচা মাছই খেতে হবে, কেনার সময় মাছে হাত ঠেকান নাকি বাবুরা, হাতে যে আঁশটে গন্ধ হবে।

সময় নষ্ট করে বাজার করে আনল অরুণ, থলি হাতে করে বয়ে আনল, তবু যদি সন্তুষ্ট হত এরা। এইজন্যেই তো কিছু করতে ইচ্ছে হয় না।

মাছে হাত ঠেকান নাকি বাবুরা!

কথা হচ্ছে মাছের, বাবার রাগ নিয়ে পড়ল প্যাণ্টের ওপর। তাচ্ছিল্যের স্বরে, অরুণকে শোনাবার জন্যেই বললেন, মাছ দেখতে হলে নিচু হতে হবে না? চোঙা প্যাণ্ট পরে নিচু হবে কি করে!

দেশসুদ্ধ সবাই পরছে, আমার বেলাই যত রাগ। হৃষিকেশবাবুকে পেন্নাম করাতে তো ছাড় না। কি, না ঠাকুর্দার গুরুদেব বংশের লোক।

বাজারে যেতে অবশ্য আপত্তি নয় তার, কিন্তু একটা দিন বললে না, ঝিঙেগুলো বেশ কচি রে। আপত্তি আছে আরেকটা—ঐ নোংরা থলেটা। হাতে নিলেই কেমন কেরানি কেরানি লাগে। বুড়োদের মত। চেনাজানা কেউ দেখলে বুঝতে পারবে বাড়িতে চাকর নেই। বিশেষ করে মেয়েদের সামনে···হোক্ না অচেনা, থলে হাতে নিয়ে তার মুখের দিকে তাকাতেও অস্বস্তি লাগে। ঊর্মি কোনও দিন যদি দেখে ফেলে, এমন হাসবে।

ফিরে এসেই হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাল অরুণ, বাজারের থলেটা নামিয়ে দিয়েই 'চললাম আমি'। খুচরো পয়সাগুলো আর ফেরত দিল না।

পানের দোকান থেকে এক প্যাকেট চারমিনার কিনে একটা দড়িতে ধরাল। ক'টা মাত্র কাঠি আছে দেশলাইয়ের বাক্সে, খরচ করে দরকার নেই।

সিগারেটে গোটা কয়েক টান দিয়ে কোজি নুকে এসে উঁকি দিল।

টিকলু আর সুজিত এসে গেছে অনেক আগেই।

—বাজার যেতে হয়েছিল মাইরি।

—তাহলে তো আর্নিং হয়েছে, চা খাওয়া। সুজিত বললে। টিকলু হাসল। —আহা ও বেচারিকে কেন, সাঁটুলির জন্যে ওর তো এমনিতেই খরচ বেড়ে গেছে।

খরচ, খরচ, খরচ। ঐ এক কথা এদের মুখে। জেলাসি ছাড়া আর কি। যেন মেয়েরা মেয়ে নয়, প্রেম বলে কিছু নেই। ক'টা মেয়ে দেখেছিস তোরা? খরচ করলেই যদি ভালবাসা পাওয়া যেত, জোটা না একটা। কাউকে ভালবাসা যে কি কষ্ট তোরা কি বুঝবি? ভাবিস ও শুধু পাঁচ আঙুলের মামলা।

মেয়েদের ওপর শ্রদ্ধা না থাক, রুণুকে তো শ্রদ্ধা করতে পারিস। তা না, এমন ঠেস দিয়ে কথা বলবে যেন রুণু ভাল মেয়ে নয়, যেন রুণু ওকে সত্যি ভালবাসে না। রুণু কোথায় দু'টাকা চল্লিশে ছবি দেখতে চায় না, এক একদিন জোর করে চায়ের পয়সা দেয়, অথচ এদের মুখে শুধু খরচ আর খরচ। 'সাঁটুলি'! শুনলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়।

—কি রে, সত্যি খুব কস্ট্‌লি নাকি মেয়েটা? সুজিত বিশ্রী হাসল।

নাঃ, রুণুর কথা কিচ্ছু বলবে না এদের।

অভিমানের জ্বালাটা লুকিয়ে তবু হাসতে হল অরুণকে। —কখনও কখনও আমি না দিলে প্রেসটিজ থাকে? বল্ না।

—শালা বেকার থাকতে আর ভাল লাগছে না। টিকলু দুম্ করে বললে।

অরুণ হেসে বললে, একটু খোঁচা দিয়ে, তোদের তো খরচ করানোর মত কেউ নেই, তোদের আর ভাবনা কি।

সুজিতের মুখ দেখে বুঝল খোঁচাটা ঠিক জায়গায় লেগেছে। আর অমনি অরুণের মনে হল, দেখেছো, ওকে তো আমি থাপ্পড় মারতে চাইনি, শুধু নিজের জ্বালাটা ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিলাম। কি যে আমরা বলতে চাই, আর কি বলে ফেলি।

এবার তাই ঘায়ের ওপর মলম লাগানোর মত করে হেসে উঠল অরুণ। বললে, সত্যি, মা'কে তেল দিয়ে দিয়ে আর টাকা চাওয়া যায় না মাইরি। যদ্দিন না রেজাল্ট বেরোচ্ছে কি করা যায় বল্ তো? টুইশনি?

টিকলু হাসল। —সে তো বাবা রুণুকেই লেস্‌ন দিচ্ছ।

সুজিত দিন কয়েক টুইশনি করেছিল। বললে, ও রাস্তায় বাবা আমি নেই আর, সারা সন্ধেটাই মাটি। ছাত্র নিয়ে ও সময় ঘ্যানর ঘ্যানর ভাল লাগে?

—কেন ছাত্রী?

সুজিত হেসে বললে, ছাত্রীর সঙ্গে বাপটাও যে ফ্রিতে পড়া শুনবে।

তিনজনই এবার শব্দ করে হেসে উঠল।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। অরুণ হঠাৎ বললে, টয়েনবির বইটা পড়ালি না?

টয়েনবির বইটা কিনব কিনব করেও কিনতে পারেনি ও। বাবার কাছে চাইবে কি, বাবার কাছে যেতেই ইচ্ছে হয় না। আগে তবু রাত্রে একসঙ্গে খেতে বসতে হত, এখন তো আড্ডা দিয়ে দেরি করে ফেরে। ঘরে ভাত ঢাকা দিয়ে মা শুয়ে পড়ে। বাড়ি নয়, যেন হোটেলখানা। শুকনো কড়কড়ে রুটিগুলো গিলতে হয় একা একা। পর পর ক'দিন রাত করে বাড়ি ফিরেছে বলে কি চেঁচামেচি। 'তোর জন্যে সবাই রাত জেগে বসে থাকবে নাকি?' রেগে গিয়ে অরুণ বলেছিল, খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দিলেই পার, সোনার মা দরজা খুলে দেবে। ব্যস, মা সেই যে গুম্ হয়ে গেল, সত্যি সত্যি তারপর থেকে খাবার ঢাকা দিয়ে রাখে। খেল কি খেল না, সকালে সে-খবরও নেয় কিনা সন্দেহ।

এক এক সময় অরুণের ভীষণ অভিমান হয়। আরে বাবা, ও যে মাকে এত ভালবাসে,

সেবার মা'র হঠাৎ অসুখটা বাড়াবাড়ি হল, ও যে ছুটতে ছুটতে ডাক্তারের বাড়ি গেল, মা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল দেখে ওর যে বুকের মধ্যে কেমন করছিল, লজ্জায় কাউকে বলতে পারেনি, কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে যে কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে এল, এ-সবের কি কোন দাম নেই ? মা কি কিছু বুঝতে পারে না ! তবে আর মা কিসের ।

আর বাবাও তেমনি । একটা ভাল কথা বলবে না । কাছে গেলেই পড়াশোনা, চাকরি, কমপিটিটিভ পরীক্ষা, আর নয়তো, 'জানিস অরুণ, সে-সব দিনই ছিল অন্য, গান্ধীর ডাকে দলে দলে সব জেলে যাচ্ছে, ফ্যাশান-ট্যাশান সব বিসর্জন দিয়েছে দেশের লোক'...

ওসব অনেক শুনেছি, মাল তো ক্যাচ হয়ে গেল কুড়ি বছরেই । ইতিহাসের সব বড় বড় লোকগুলোও ফিকশন কিনা কে জানে । দলে দলে সব জেলে যাচ্ছে ! কই, তুমি তো জেল খাটোনি । তুমি কি করেছিলে । মা যা ভীতু. ফিরতে দেরি হলে আগে যা কাণ্ড করত, মা বোধ হয় বাবাকে ও লাইনে যেতেই দেয়নি ।

টয়েনবির বইটা পড়া থাকলে এ-সময় একটু ইম্পর্টান্স পাওয়া যেত । বইটা কিনবে বলে দু একবার ভেবেছে বাবার কাছে টাকা চাইবে অরুণ । কিন্তু কি করে চাইবে । সংসার খরচের হিসেব নিয়ে তো দিনরাতই মা আর বাবার খিচখিচ লেগেই আছে । ওর নিজেরই এক এক সময় মনে হয়, এমন অশান্তির সংসার আর নেই ।

তবু মিলুর বেলায় বাবা একবারও না বলে না । যখন যা চাইছে দিব্যি পেয়ে যাচ্ছে । মাঝে মাঝে তাই মিলুর কাছেই তো ওকে ধার নিতে হয় । যা কিপটে মিলুটা ! ভাগ্যিস কিপটে, তা না হলে হয়তো ধার পেতই না ।

—একটা বই কেনার এত ইচ্ছে, জানিস মিলু । অথচ বাবার সব সময় অভাব, অভাব ।

মিলু একটা বাচ্চা মেয়ে, সবে কলেজে ঢুকেছে, সেও বিজ্ঞের মত বলেছে, অভাবই তো । দু-পাঁচ টাকা জমিয়ে কিনলেই পারিস ।

—জমিয়ে ! মিলুকে আর কিছু বলতে ইচ্ছেই হয়নি অরুণের ।

তারপর ধীরে ধীরে বলেছে, জানিস মিলু, তোদের মত জমিয়ে জমিয়ে কিছু করতে আমার ভালই লাগে না । আমার অনেক কিছু পেতে ইচ্ছে করে, বই, গাড়ি, ভাল বাড়ি, রেফ্রিজারেটার...আরও কি সব যেন, কিন্তু আমার মনে হয় সব এখনই চাই, এখনই ।

মিলু হেসে বলেছে, দাদা, তুই বড্ড অধৈর্য রে । সব কখনও এখনই পাওয়া যায় ?

তারপর একটু চুপ করে থেকে মিলু খুব খুশি খুশি হাসিতে চোখ বুজে ফেলার মত করে বলেছে, হ্যাঁ রে দাদা, আমারও । আমারও ইচ্ছে করে সব কিছু—সব এখনই পেয়ে যাই ।

□

প্রকাশবাবু জানেন, মূল্য না দিয়ে কিছুই পাওয়া যায় না । জানেন, কোন কিছু পেতে হলেই আটঘাট বেঁধে এগোতে হয় । নিজেকে তৈরি করতে হয় ।

চেষ্টা করেও অরুণকে কিছুতেই যেন বুঝতে পারেন না । তাই অরুণকে নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার শেষ নেই । এতটুকু দায়িত্বজ্ঞান নেই ছেলেটার । এতটুকু মায়া-মমতা নেই বাবা-মার ওপর, সংসারের ওপর । তুমি রোজগার করে টাকা এনে দাও, আমি আড্ডা দিয়ে বেড়াই । দুদিন পরে যে উনি রিটায়ার করবেন, সে খবর শুনে মুখে কোন ভাবনার ছাপ পড়ল না ।

ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়ামটা দিয়ে আসতে বলেছিলেন, লিফটম্যানের সঙ্গে ঝগড়া করে ফিরে এল । কি. না কিউ দিয়ে পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম. লিফটম্যান সবাইকে নিয়ে

আমার বেলাই বললে, হবে না। কেন, আমি কি ফালতু নাকি ?

—তোর বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না। সে তো নিয়ম মেনে লোক নেবে। ঝগড়া করে লাভ কি হল, সেই মনিঅর্ডার করে পাঠাতে হবে, রসিদ কবে পাব তার ঠিক নেই। প্রকাশবাবু বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন।

আর অরুণ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিল, ওঃ। নিয়ম মেনে লোক নেবে। কত নিয়ম মানছে সব জায়গায় !

এদের ধারণাটা কি, প্রকাশবাবু ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। নিয়ম মানছে না কেউ, সেটাই আপত্তি ? না, নিয়ম জিনিসটাই খারাপ ?

কিন্তু ছেলের ওপর অভিমান করেই বা লাভ কি। বেড়া দিলেই কি চারাগাছ বড় হয় ? সারা সংসারটাকে তো ইচ্ছার গণ্ডিতে বেঁধে মনের মত করে সাজাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন কি ! তাঁর চোখের সামনেই তো সকলে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

চুলোয় যাক সব, তিনি নিজের কর্তব্যটুকু করে যাবেন। ওরা তো বুঝবে না। ছোট মেয়ে মিলু তবু কাছে আসে, হেসে কথা বলে ; সেও একদিন বলেছিল, বুড়ো বয়সে সিচুয়েশন ভ্যাকান্ট দেখছ, তোমার বাবা অদ্ভুত সব বাতিক।

বাতিক ! তাই হবে হয়তো। এখন অবশ্য পরীক্ষা হয়ে গেছে, আর কিছুদিন পরেই তো ফল বের হবে। অরুণ পাশ করবে সে বিশ্বাসও আছে। ছেলে তো খারাপ নয়।

একালের ছেলেমেয়েদের এই একটা দিক বুঝতে অসুবিধে হয় প্রকাশবাবুর। তখন ভাল ছেলেরা ভাল-ছেলে ছিল, খারাপ ছেলেরা খারাপ-ছেলে।

আর এরা ভাল খারাপ সব যেন এক ছাঁচে ঢালা। সার্টিফিকেট না দেখলে চেনা যাবে না কে ভাল, কে খারাপ।

অরুণের ছোটমাসী এসেছিল বেড়াতে। সে-কথা শুনে হেসে উঠেছিল সেদিন।—জামাইবাবু, আপনার বড্ড সেকেলে ধারণা কিন্তু। ভাল ছেলে হলেই থুতনিতে ছাগলদাড়ি থাকবে, দাড়ি কামাবে না, জামায় ইস্ত্রি থাকবে না, কথা বলতে গেলে তোতলামি করবে, আর শুধু বেশি বেশি নম্বর পাবে পরীক্ষায় —এই তো আপনাদের ভাল ছেলে ! মাগো, আমার ভাবতেও বিশ্রী লাগে।

শুনে হেসে উঠেছিলেন প্রকাশবাবু নিজেও। তবু মনের মধ্যে একটা গোপন ইচ্ছে বোধহয় ছিল অরুণকে ঠিক সেইভাবে মানুষ করে তোলার। এখন ভাবেন, ভাগিস অরুণ সে-রকম হয়নি। তাহলে এই বাজারে একটা চাকরি জোটানো যে কি মুশকিল হত।

অরুণের চাকরিটাই অবশ্য এখন একমাত্র দুশ্চিন্তা। পড়া তো শেষ হয়ে গেল, এখন থেকেই চেষ্টা করতে দোষ কি। অরুণকেও বলেছেন সে-কথা।

আর সেজন্যেই সকালের খবরের কাগজটা নিয়ে বসেছিলেন। প্রতিদিনই এ সময়টা বসে বসে চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, কোন কোনটার চারপাশে কালির দাগ টেনে রাখেন।

বিজ্ঞাপনগুলো দেখতে দেখতেই তাই ডাক দিলেন, অরুণ, অরুণ !

কনকলতা ভাঁড়ার থেকে একমুঠো তেজপাতা আর তেলের বাটিটা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, কাকে ডাকছ ? সে-বাবু বাড়িতে আছেন নাকি, বাজার নামিয়ে দিয়েই আড্ডা দিতে চলে গেছে।

বড় মেয়ে বুলু পাশের ঘরে ঝুল ঝাড়ছিল। লম্বা ঝুলঝাড়াটা নিয়ে এমনিতেই ব্যতিব্যস্ত, তার ওপর ঘাড়ে পিঠে ঘাম জ্যাবজ্যাব করছে। মা'র কথা শুনে নিজের মনে মনে বললে, আড্ডায় না কোথায়, সব জানো কিনা।

স্ত্রী টিপ্পনী কেটেই রান্নাঘরের দিকে চলে গেছে দেখে বুলুকেই ডাকলেন এবার।

—একটা বিজ্ঞাপন টিক দিয়ে রেখেছি, অরুণকে বলিস তো বুলু দরখাস্ত করতে।

বুলু এতক্ষণ গাছকোমর বেঁধে কাজ করছিল, কোমর থেকে আঁচলটা খুলে গলার ঘাম কাঁধ মুখ মুছতে মুছতে বললে, তোমার কেন যে এই বাজে খাটুনি, ও দরখাস্ত করে নাকি। বলে, রেজাল্ট না বেরোলে ওসব করে কি লাভ।

প্রকাশবাবু হাসলেন। —করে করে, ও তোদের রাগাবার জন্যে বলে।

চাকরির চিন্তা নেই, চাকরির চেষ্টা করবে না, তা কখনও হয় নাকি।

আসলে মুখে যাই বলুন, অরুণের পোশাক-আশাক, হাঁটাচলা তাঁর চোখে খাপছাড়া লাগে বটে। কিন্তু ছেলের ওপর অগাধ বিশ্বাস। ছেলে খারাপ নয় অরুণ। কই, কোন অন্যায় তো করেনি কখনও।

ঝগড়া, মারামারি, পুলিস কেস—আজকালকার ছেলেদের নিয়ে বাপ-মাকে কম ঝামেলা পোয়াতে হয়? আপিসে নিত্যদিনই তো শুনছেন। অথচ অরুণ সম্পর্কে কেউ কোনও দিন কোনও অভিযোগ করেনি তাঁর কাছে। কনকলতারও তো ঐ একটা অভিযোগ শুধু। দিনরাত আড্ডা দেয়, বাড়ির কাজে লাগে না।

চাকরি হোক, নিজে মেয়ে দেখে একটা ভাল বিয়ে দিয়ে দেবেন, তারপর দেখব···কনকলতাকে হেসে বলেছেন, আড্ডা এক-আধটু আমরাও দিতাম, বুঝলে। তারপর সংসার-চিন্তায়··

ছেলের বিয়ের কথায় কনকলতার মুখেও হাসি ফুটেছে। —দাদা বলছিল, গগনবাবুর মেজ-শালীর মেয়ে বি. এ. পরীক্ষা দেবে, দেখে রাখলে দোষ কি।

—পাগল হয়েছ, এখন ওসব মাথায় ঢুকিও না। বলেছেন বটে, কিন্তু নিজেরও একটু ভাবতে ভাল লেগেছে। বেশ শিক্ষিত আর সুন্দরী মেয়ে দেখে ঘরে আনবেন, শুধু একটা ভাল চাকরি হয়ে যাক না।

খবরের কাগজটা ভাঁজ করে অরুণের ছোট্ট টেবিলটার ওপর রেখে উঠে পড়লেন।

ক্ষুরটা খাপ থেকে বের করলেন, ভাঁজ খুললেন, লম্বা স্ট্র্যাপটা বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে ক্ষুরটা তার ওপর টেনে টেনে শান দিলেন। শান দিতে গিয়ে ক্ষুরের 'শেফিল্ড' লেখাটা যেখানে প্রায় মুছে গেছে সেটার ওপর একবার চোখ ফেললেন।

—ভেবেচিন্তে লাভ নেই প্রকাশ, ওরা সব বদলে গেছে। বড় শালা অনন্ত রসিক মানুষ, একদিন হেসে হেসে বলেছিল, তোমরা ছিলে শেফিল্ডের ক্ষুর, বাইশ বছর ধরে শান দিয়ে দিয়ে রেখেছ। ওদের শেফটি রেজার, দিন কামাও আর ব্লেডটা ছুঁড়ে ফেলে দাও।

সত্যি তাই। কোন জিনিসের ওপর এদের যত্ন নেই, মায়া নেই। এইটুকু থাকলেই আর কোন ক্ষোভ থাকত না তাঁর। বাপ মা সম্পর্কে একটু দরদ, একটু মায়া।

কিন্তু এত বড় একটা ক্ষোভের কারণ হয়ে উঠবে অরুণ, কনকলতাও ভাবতে পারেননি। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বিশ্বাস করতে ইচ্ছেই হল না। কিন্তু না বিশ্বাস করেই বা উপায় কি।

গলির মোড়ে ওর সমবয়সী একটি মেয়ের সঙ্গে মিলু প্রতিদিন এ সময়টা গল্প করে। মাঝে মাঝে একটু চোখ রাখেন কনকলতা। একটু আগেও বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে দেখে গেছেন, মিলু ওদের দরজায় দাঁড়িয়ে হেসে গল্প করছে।

তাই মিলু হঠাৎ দুদ্দাড় করে ছুটে আসতে আসতে 'মা, মা' বলে ডাকছে শুনেই ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। —কি হল?

মিলুর মুখে হাসি আর ধরে না। —ছোটমাসী আসছে। এই মাত্তর দেখলাম।

—ছোটমাসী? আজ, হঠাৎ?

ছুটিছাটার দিনে কখনও কখনও কানন আসে বেড়াতে। কিন্তু এই তো সেদিন ঘুরে

গেছে সে, এর মধ্যে আবার এল যে।

কনকলতা নিজেও খুশী হয়েছিলেন ছোট বোন আসছে শুনে, তবু মিলুকে ধমক দিলেন কাননকে শুনিয়ে শুনিয়ে।

ছোটমাসীর হাত ধরে মিলু ততক্ষণে নাচানাচি শুরু করেছে, ছোটমাসী, আজ তুমি এখানে থাকবে, যেতে পাবে না।

কনকলতা হেসে ফেললেন। ধমক দিয়ে বললেন, ছোটমাসীকে দেখলে সব দেখি আহ্লাদে আটখানা।

মিলু কলেজে ঢুকেছে, রাস্তায় বের হলে শাড়ি আর শরীর নিয়ে সবসময় ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু বাড়িতে কেমন একটা বালক বালক ভাব। ঠোঁট উল্টে অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গি করে বললে, ছোটমাসী তো তোমার মত মুখ গোমড়া করে থাকে না।

কনকলতা বড় একটা হাসেন না সত্যি। হাসবার মত সময় পান কখন ?

তবু আদরের গলায় জবাব দিলেন, ছোটমাসীই তোমাদের মাথাগুলি চিবিয়ে খাচ্ছে। বলে হেসে ফেললেন।

কানন ঠোঁট টিপে চোখে একটু রহস্য আঁকল। —মাথা আর কারও চিবোতে হবে না মেজদি, আজকাল ওরা নিজেরাই নিজেদের মাথা চিবোচ্ছে।

কথাটা বলার মধ্যে কি যেন ছিল, হাসিটা কেমন যেন। কনকলতার কপাল কুঁচকে গেল, কিন্তু মিলুর সামনে জিজ্ঞেস করতেও পারলেন না। বুলু মিলু সম্পর্কে কিছু ? কোথাও কিছু শুনেছে কানন ? কিন্তু মিলুকে তো যতখানি সম্ভব চোখেচোখেই রাখেন। ছেলেমেয়েদের ভয় পান না, ভয় পাছে কেউ ওদের সম্পর্কে কিছু বলে বসে।

মিলু রেকর্ড-প্লেয়ারটা বাজাতে যেতেই কনকলতা ঈষৎ চাপা গলায় বললেন, মাথা চিবোনোর কথা কি বলছিলি তখন ?

—বলব, বলব। বলে হেসে ফেলল কানন।

তারপর ছোট্ট বারান্দাটা, যেখানে প্রকাশবাবু ক্যাম্বিসের ডেকচেয়ার পেতে চা খাচ্ছিলেন সেখানে গিয়ে হাজির হল। বেতের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে হঠাৎ আরেক দমকা হেসে উঠে বললেন, অরুণের কিন্তু পছন্দ আছে জামাইবাবু।

প্রকাশবাবু চোখ তুলে তাকালেন।

আর কনকলতা অধৈর্য হয়ে বললেন, অরুণ ?

—আবার কে। কানন যেন হাসি চাপতে পারছে না। —তাকিয়ে থাকার মত চেহারা মেজদি, লম্বা, স্লিম, জোড়া ভুরু। জোড়া ভুরু আমার ভীষণ ভাল লাগে।

কনকলতা রেগে গেলেন এবার। —ওসব ছাড় তো, আসল কথাটা বল।

কানন আবার হাসল। —রেগে যাচ্ছিস কেন, আমি হলে তো নিজে গিয়ে ছেলের বউ করে নিয়ে আসতাম। ফোয়ারার মত, সত্যি বলছি, যেমন ফর্সা সুন্দর, তেমনি হাসিখুশি, হাঁটাচলাও বেশ।

প্রকাশবাবুর কপালে এতক্ষণে দাগ ফুটল। —তুমিই তো দেখছি ফোয়ারা হয়ে গেছ। কথাটা শুনে তো মনে হচ্ছে হাসির তেমন কিছু নেই। খুব শান্ত গলায় থেমে থেমে বললেন।

কানন ঠোঁট চেপে বললে, আহা, আমাকে আপনি তো ফোয়ারাই দেখে আসছেন। আপনার চোখের বিচারে নয়। সত্যি ভাল মেয়ে, আর এতটুকু জড়তা নেই, হাত পা নেড়ে এমন···

কনকলতা দুশ্চিন্তায় রাগে গুম হয়ে গিয়েছিলেন।

বললেন, দ্যাখ কানন, সব সময় হাসি ভাল লাগে না।

শেষ অবধি সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলল কানন। বললে, অরুণ যে যাবে তা কি জানতাম আমরা। সেই দু'দিন আগে থেকে টিকিট কেটে রেখেছি···তা সিনেমার পর বেরিয়ে আসছি, ও হঠাৎ বললে, দ্যাখো দ্যাখো, অরুণ না? একবার ওর সঙ্গে নাকি চোখোচোখিও হয়েছিল···কানন আবার হেসে উঠল, বললে, ওরা তখন পালাতে পারলে বাঁচে।

—মেয়ে? কত বয়েস? চিনিস তাকে? কনকলতা এক সঙ্গে এক ঝাঁক প্রশ্ন ছুঁড়লেন। বেশ বোঝা গেল একটা প্রশ্নেরও উত্তর জানতে চান না। বেশ বোঝা গেল সমস্ত ঘটনাটিকে সহজভাবে নিতে পারছেন না।

কানন নিজেও যেন বুঝতে পারল এতক্ষণে, খবরটা এদের না জানালেই ভাল ছিল। সামান্য একটা রসিকতার ব্যাপার ভেবেই না বলেছে।

তাই শুধু বললে, এত উতলা হচ্ছিস কেন? আজকাল এটা কি কোন খবর নাকি!

এত বড় একটা খবরকে বলে কিনা খবর নয়? কাননের নিজের ছেলে হলে এভাবে হাসতে পারত ও!

ছোট বোনকে বিদায় দিয়েই স্বামীর কাছে ফিরে আসছিলেন কনকলতা। কিছু একটা ঘটেছে, দাদাকে নিয়ে, তা বুঝতে পেরেছিল বলেই কাছে আসেনি মিলু। মাঝপথে মাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে মা?

—তুই যা তো এখন। একটা দুঃখের শ্বাসকে বুকে চেপে রাখাব চেষ্টা করলেন কনকলতা।

তারপর বারান্দায় এসেই বললেন, দাদাকে বলি, গগনবাবুব সেই মেজশালীর মেয়েকে এই সপ্তাহেই দেখতে যাব আমি।

প্রকাশবাবু কানেই তুললেন না কথাটা। শুধু বললেন, আস্কারা দিয়ে দিয়ে তোমরাই ওর মাথাটা খেয়েছ। আসুক ফিরে হারামজাদা—

□

এতক্ষণ কাঁধটা গরম কোট ঝোলানোব হ্যাঙার ছিল, টানটান, চোখোচোখি হতেই কাঁধটা ঝুলে পড়ল। বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল অরুণের।

মেজাজ সকাল থেকেই তো বিগড়ে আছে। তার ওপর দুপুবে খেয়েদেয়ে বের হবে, মা বলে বসল, র‍্যাশনের দোকানে এখনও কার্ড ফেরত দেয়নি সোনাব মাকে, কি সব দরকার, গিয়ে আনতে বলেছে।

—তোমাদের কি রোজ একটা না একটা কাজ থাকবেই। পারব না আমি।

মা গম্ভীর গলায় বললে, না আনতে পারিস উপোস করবি সব, এ হপ্তার র‍্যাশন তোলা হবে না।

উপোস করবি। যেন উপোস করাকে ভয় পায় ও। আর কাজেরও শেষ নেই, আজ প্রিমিয়ামটা দিয়ে আয়, আজ র‍্যাশন কার্ড, স্টোভ সারিয়ে আন্, মিস্ত্রিকে খবর দে···বেকার হয়ে বসে আছে বলে ওই যেন একমাত্র কাজের লোক। কোন রকমে একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারলে শান্তি। তখন বাবার মত ন'টার মধ্যে বেরিয়ে যেতে পারবে।

র‍্যাশন কার্ডগুলো ফেরত পেয়ে হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল অরুণ। চচ্, সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। অথচ একটার মধ্যে পৌঁছতে হবে।

ওগুলো নিয়ে তখন তখনই বাসে উঠলে দেরি হত না। কিন্তু ছ'খানা র‍্যাশন কার্ড হাতে নিয়ে তো রুণুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া যায় না।

বাড়িতে সেগুলো রেখে দিয়ে ছুটতে ছুটতে বাসে উঠে আবার ঘড়ি দেখল অরুণ। আর দেরি হয়ে গেছে দেখে সমস্ত শরীর চিড়বিড় করে উঠল।

—আমার মাইরি কি মনে হয় জানিস টিকলু ? মনে হয় শরীরে রক্ত নেই, শুধু নিমপাতার রস। শালা তেতো হয়ে গেছি।

টিকলু অসীম বিরক্তিতে মুখখানা দুমড়ে কুঁচকে বলেছিল, বিছুটি, টেরিলিন ফেরিলিন, এই প্যাণ্ট শার্ট সব মনে হয় বিছুটি দিয়ে বোনা।

টিকলু ঠিকই বলেছিল।

বাস থেকে যখন নামল তখন একটা বেজে পনেরো। অথচ রুণুর সঙ্গে কথা ছিল একটা অবধি থাকবে। বাস-স্টপে। এসে ফিরে গেল ? না, আসেইনি এখনও ?

রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। বাস-স্টপে এক চামচ ছায়া আছে বটে, কিন্তু লোক লোক। রোদ্দুরে দাঁড়াতে পারেনি বলে কাছে কোথাও ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ায়নি তো!

রোদ্দুরের মধ্যেই বেশ খানিকটা এদিক ওদিক করে রুণুকে খুঁজল ও। দু'চারটে দোকানে উঁকি দিয়ে দেখল কোথাও টফি কিংবা চুলের কাঁটা কেনার নাম করে ছায়া পোয়াচ্ছে কিনা।

নাঃ। হয়তো অপেক্ষা করে করে চলে গেছে। সময়ের দাম যেন শুধু রুণুরই আছে, অরুণ যে এক এক দিন আধঘণ্টা বাড়তি সময় দাঁড়িয়ে থাকে! থাকে বটে, কিন্তু রুণু এসেই এমন ভাবে বলে, ইস্, তোমাকে খুব কষ্ট দিই আমি, না ? কি করব বলো···ব্যস্, সব রাগ জল হয়ে যায়। তখন রুণুকে এত ভাল লাগে।

অরুণ ভাবল, রুণু এসে ফিরে গেল, অথচ আর পনেরো মিনিট অপেক্ষা করল না! করবে কি করে, মেয়েদের কোথাও পাচ মিনিট দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কবাব উপায় আছে নাকি। মাছির মত ভন্ ভন্ করবে সব। গা ঘেঁসে দাঁড়াবে, আড়ে আডে তাকাবে। ন্যুইসেন্স। দেশটা অধঃপাতে যেতে বাকি নেই আর। একটা লোকও সুস্থ নেই আর, একটা লোকও না।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা কবেও যখন রুণু এল না—ধুত্তোর, কফি হাউসেই যাই, যদি কেউ থাকে···

কেউ না থাক্, ঊর্মি আছে। ফিলামেণ্ট যায়-যায় হলদে হওয়া বাল্‌ব্‌টা দপ্ করে আলোয় সাদা হয়ে গেল। এতক্ষণের জমা হওয়া বিবক্তি এক নিমেষে সরে গেল মন থেকে।

ঊর্মির টেবিলে সেই গোঁফওলা ছেলেটা। হাতে সব সময় মোটা মোটা বই নিয়ে যে ঘোরে। শালা ইনটেলেকচুয়াল। ওকে দেখলেই হাসি পায অরুণের।

ঊর্মিও বোধ হয় বাঁচল। অরুণকে দেখতে পেয়েই ঝট্ করে স্প্রিঙের মত উঠে দাঁড়াল সটান, টান টান হয়ে, ঢাউস সাদা ব্যাগটা তুলে নিয়ে কি যেন বলল ছেলেটাকে, তাবপর হাসতে হাসতে অরুণের দিকে এগিয়ে এসে আরেকটা টেবিলে বসতে বসতে বললে, বাঁচালি।

—দিব্যি তো ওর সঙ্গে মজে গিয়েছিলি। অরুণ হাসল। —বাংলা পড়াচ্ছিল নাকি!

ঊর্মি হেসে উঠল। —বাপ্‌স্, কি জেলাসি। বলেই হাত নেড়ে নির্ভয় করলে, ভয় নেই। একা একা বসে থাকলেই প্রেম-ট্রেম দুঃখটুঃখ মনে পড়ে যায় কিনা, তাই ভাবলাম যতক্ষণ তোরা কেউ না আসছিস···

—তোর আবার দুঃখ আছে নাকি।

—বানাই। বলেই হেসে উঠল ঊর্মি।

অরুণ হেসে ফেলল ওর কথায়। ওরা ঠিকই বলে, ঊর্মির মধ্যে সত্যি কি একটা জাদু আছে। সাদা ব্যাগটার সোনালি মোনোগ্রামটার ওপর দুটো আঙুলে খেলা করছিল ঊর্মি। সেদিকে তাকাল অরুণ। বাঃ, বেশ সুন্দর তো আঙুলগুলো, এতদিন লক্ষ্যই করেনি। এক

একজন আছে না, ঝট্ করে এত কাছে এসে যায়, তাকে আর ভাল করে লক্ষ করা হয় না। ঊর্মি ঠিক তেমনি।

গোঁফওলা ছেলেটা আরেক কাপ কফি নিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে সিলিঙ দেখছে। ঊর্মির সঙ্গে আলাপ করার জন্য বহুদিন থেকে ছুঁকছুঁক করছিল। অরুণ কিংবা টিকলুর কাছে মাঝে মাঝে দেশলাই চাইতে এসেছে, সে কি সিগারেট ধরাবে বলে! ওকে দোষ দিয়ে কি হবে, কলেজে ঢুকেই তো দেখেছে সব ছেলেগুলোরই চোখ পড়েছে ঊর্মির ওপর। আলাপ করতে পেলে বর্তে যায়। অরুণরা লাকি, সিঁড়ি দিয়ে ভিড় করে নামছিল সব, পাশ কাটিয়ে যেতে চাইল অরুণ, আর ঊর্মি নিজে থেকেই হেসে কি যেন বলেছিল। কি বলেছিল এখন আর মনে নেই।

—কি এত বোঝাচ্ছিল ছেলেটা? অরুণ জিজ্ঞেস করল।

—বোদেলেয়ার, মালার্মে, কামু, কাফকা। বলেই হেসে উঠল ঊর্মি।

ঊর্মির লম্বা সুন্দর শরীর, হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলা, হাসি— সব মিলিয়ে একটা নিটোল অশোক গাছ, ডালগুলো ঝড়ে দুলছে। দুর্, অশোক গাছ তো আমি দেখিইনি।

—গাঁদা ফুলের মত এমন সুন্দর চেহারা তোর, ছেলেগুলোর আব দোষ কি। ঠাট্টা করে একদিন বলেছিল অরুণ।

—যা যা, আমার মত একটা ফিগার দেখা তো তুই। থার্টিফোর, টুয়েন্টিটু, থার্টিফোব। বলেই নিজেকে নিজে ঠাট্টা করার ভঙ্গিতে হেসে উঠেছিল ঊর্মি।

টিকলু গম্ভীর মুখে বলেছিল, দর্জির ফিতেটা নির্ঘাত ইলাস্টিক ছিল।

শুনে দমকে দমকে হেসে উঠেছিল ঊর্মি।

সত্যি, ঊর্মি যতক্ষণ থাকে, অরুণের আর কিচ্ছু মনে পড়ে না। বিরক্তি, দুঃখ, অভাব, কিচ্ছু না।

এ-যুগটা সেই কাপালিকের মত দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধছে তাকে, দিনরাত বাঁধছে, আর ঊর্মি যেন ছুরি দিয়ে বার বার দড়িটা কেটে দিতে চাইছে।

প্রথম দিন, কিংবা প্রথম আলাপের পর একদিন, এখন আর ঠিক মনে নেই, ঊর্মির কাছে নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হয়েছিল, কিংবা ঊর্মিকে অহঙ্কারী।

—না না, ওসব আপনিটাপনি চলবে না, স্রেফ 'তুই'। তুই-তুই। বলে অরুণের অপ্রতিভ মুখটার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠেছিল ঊর্মি।

তুই! হাঁ হয়ে গিয়েছিল অরুণ। ঊর্মি সম্পর্কে তখন বুকের মধ্যে একটু একটু গুনগুনুনি শুরু হয়েছে, ঊর্মির শরীরের দিকে তাকানো চোখটা তখনও পাজি।

টিকলুকে বলেছিল, ঊর্মিলা···ঊর্মি মাইরি আজ শেক্ দি বট্‌ল্ করে দিয়েছে।

ঊর্মির যুক্তিটা শুনে আরও খাবাপ লেগেছিল। হাসতে হাসতে ঊর্মি বলেছিল, আপনি থাকলেই কবে তুমি করতে চাইবি। না বাবা, ওসবের মধ্যে আমি নেই। হেসে উঠে বলেছিল, 'তুমি' একজন আছে, আছে। মাইনিং এঞ্জিনিয়ার।

তারপর থেকে সম্পর্কটা সত্যিই কত সহজ হয়ে গেছে। কত্ত সহজ।

দুটো কফির অর্ডার দিয়ে ঢাউস সাদা ব্যাগটা খুলল ঊর্মি। চুরুর্‌র্ চুরুর্‌র্···জিপ ফাসনার খুলল, বন্ধ করল। বোধহয় টাকা পয়সা ঠিক ঠিক আছে কিনা দেখে নিল।

অরুণ বললে, আছে, আমার কাছেও আছে। একটু থেমে বলল, তোর প্রেমিকের খবর-টবর বল্।

ঊর্মি হাসল। —এলে কি আর এখানে আসতাম। মাইনিং এঞ্জিনিয়ার তো, বোধহয় গভীরের সন্ধানে আছে, আমার মত হাল্কা মেয়ের কথা মনে পড়ছে না।

অকপটে নিজের প্রেমের গল্প বলতে বলতে, খুঁটিনাটি বর্ণনা দিতে দিতে ঊর্মির মুখখানা

যখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তখন এক একদিন অরুণের মনে হয়, ও নিজে যেন বড়ো বেশি তুচ্ছ হয়ে গেছে। তবু শুনতে ভালও লাগে। সে কোলকাতায় এসেছে কিনা, চিঠিতে কি লিখেছে।

ঊর্মি ওর কাছে একটা রহস্য, একটা আতঙ্ক। —চিঠি লিখিস। পরীক্ষার পর ঊর্মি একদিন বলেছিল।

ভয় পেয়েছিল অরুণ। চিঠি লিখলেই তো উত্তর আসবে। কোন মেয়ের লেখা চিঠি বাড়িতে এলে রক্ষে আছে নাকি। এমনিই তো ভয়, ঊর্মি হঠাৎ না কোনও দিন বাড়িতে এসে হাজির হয়।

বাইরের পৃথিবীটা ঊর্মির মত সহজ হয়ে গেছে, অথচ··· । নাঃ, শুধু চিঠি কিংবা ঊর্মির উপস্থিতিকেই ভয় নয়। ঊর্মির মত সুন্দর একটা ফুলের তোড়াকে···ঐ বিশ্রী নোংরা জঞ্জালের মত বাড়িটায়··· বেমানান, বেমানান।

—কি ভাবছিস্ এত ? রুণুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই তো ?

বলে হাসল ঊর্মি।

অন্য দিন হলে অরুণও হাসত। কিন্তু রুণুর কথা মনে পড়িয়ে দিতেই বুকের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকল। আচ্ছা, রুণু এল না কেন ? ঊর্মির সঙ্গে সেদিন দেখেনি তো রাস্তায় ? কিন্তু সেদিন তো টিকলু আর সুজিতও ছিল। স্টুপিড ! ঊর্মির ওপর জেলাসি। এরা কেউ যদি জানতে পারে ঊর্মির ওপর জেলাসি আছে রুণুর, এমন ঠাট্টা শুরু কববে সব। আর ঊর্মি তো হেসে উঠে হাত-পা নেড়ে নির্ঘাত চেয়ার ভাঙবে।

—বললি না, তোদেব কোন প্রোগ্রাম আছে কিনা আজ ? ঊর্মি ঠোঁট চেপে হাসল।

—আরে দুর্, প্রেমট্রেম তুই সত্যি বিশ্বাস করিস্ ? ওসব কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই। ও শুধু বিশ্রী গরমে এয়ারকণ্ডিশান্ড্ ঘরে বসে থাকা।

ঊর্মি হেসে উঠল। —দারুণ ! ব্যাগ থেকে একটা পাঁচ পয়সা বের কবে দিল অরুণকে, তারপর বললে, 'অন রেকর্ডে' পাঠিয়ে দে।

লুকোনো রাগ আর চাপা জ্বালা ভেতর থেকে বের করে দিয়ে বেশ ভাল লাগল অরুণের। আরও খুশী হল চটকদার একটা কথা বলতে পেরেছে বলে। মিথ্যে কথাগুলোর বেশ চটক আছে তো। সত্যি কথাগুলো খুব সহজ, খু-ব সহজ, অথচ বলা যায় না। রুণুর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় ও যে কষ্ট পাচ্ছে, সে-কথা বললে ঊর্মি হেসে উঠে এমন সিন ক্রিয়েট করত—

আজ দুপুরের এই রোদ্দুরে ও পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে আশায় আশায় অপেক্ষা করেছে এ-কথা কাউকে বলা যায় নাকি। তার জন্যে নিজের কাছেই তো নিজের লজ্জা কবছে।

—তা হ'লে চল্, একটা ছবি দেখে আসি। ঊর্মি বললে।

—এয়ারকণ্ডিশান্ড্ ঘরে ? বলে হেসে উঠল অরুণ। —কিন্তু টাকা নেই।

—কবে থাকে ? কথাটা মিথ্যে বলেই ঊর্মি ঠাট্টা করতে পারল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কলার ধবে টানল। —ওঠ, ওঠ, সুজিত আসবে না।

কি করবে অরুণ ? বলবে, না না, যাব না তোর সঙ্গে !

—আমাদের আসল ট্রাব্‌ল্ কি জানিস সুজিত ? বাইরের সঙ্গে ভেতরটা মিলছে না। সুজিতকে একদিন বলেছিল অরুণ। কিন্তু কি ভেবে বলেছিল ও নিজেও জানে না। হঠাৎ দুম করে বলে ফেলেছিল, তারপর মনে হয়েছিল নিশ্চয় কথাটাব কোনও মানে আছে।

ঠাণ্ডা ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঊর্মির পাশে পাশে হেঁটে কাউন্টাবেব দিকে যাবার সময়

অরুণের গর্ব হচ্ছিল। ওর মত মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটার একটা অন্য গর্ব। রুণু যদি এ সময় দেখত, খুব ভাল হত। রুণু আসেনি বা এসেও বেশিক্ষণ অপেক্ষা করেনি, তার জন্যে ভিতরে ভিতরে এক একবার রেগে উঠেছিল ও। এমনি তো চোখে দেখেনি, নামই শুনেছে, দু-একটা হাল্কা গল্প, তাতেই হিংসেয় জ্বলে। হঠাৎ চুপ করে যাওয়া, গম্ভীর হওয়া, হিংসে নয়তো কি।

উর্মি কত সহজ, স্বাভাবিক। আর সিনেমা দেখতে গিয়ে রুণুর কেবল ভয়, কেবল ভয়। সব কিছুর পরও কেমন একটা অতৃপ্তি থেকে যায়।

অথচ উর্মি সারাক্ষণ ছবি দেখতে দেখতে সশব্দে হেসেছে, কানে কানে টিপ্পনী কেটেছে, আবাব স্পষ্ট করে দু-একটা কথাও বলেছে। অথচ এইটুকু রুণুর কাছ থেকে পেলে, ও কত বেশি খুশী হতে পারত।

যেখান থেকে যা পাচ্ছি, টুকরো টুকরো ভাবে পেলেই বা দোষ কি।

সিনেমা হল থেকে তখন ভিড় উপচে বের হচ্ছে। এবাব তো উর্মি চলে যাবে। অরুণ আবার একা। রুণুর কথা আবার নতুন করে মনে পড়ল। যাক গে, 'কোজি নুক' আছে, চায়ের কাপ সামনে নিয়ে সুজিত টিকলুর মুখোমুখি বসে থাকা আছে।

অন্যমনস্ক ভাবে সিনেমা হল থেকে বের হতে গিয়ে ছোটমেসোর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। ছোটমেসো? বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল অরুণেব। কাঁধটা গরম কোট ঝোলানো হ্যাঙারের মত টানটান ছিল, ঝুলে পড়ল।

এতক্ষণ উর্মির ওপর খুশি ছিল, ঈষৎ বিরক্তি ফুটে উঠল এবার। উর্মির সঙ্গে দূরত্ব বাড়াবাব জন্যে যত সরে আসে, উর্মি ততই কাছ ঘেঁসে আসে। হাসতে হাসতে অরুণেব মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে গেল ও, আর অরুণ অন্য দিকে তাকিয়ে এমন ভান করল মুখের, যেন উর্মি ওর চেনা কেউ নয়।

তাড়াতাড়ি ভিড় ছাড়িয়ে ছোটমেসোর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল অরুণ। সঙ্গে কে ছিল, আব কেউ ছিল কিনা দেখার সাহসই হয়নি। উর্মিকে কি উনি দেখেছেন? দেখে বুঝতে পেবেছেন ওরা একসঙ্গে এসেছিল?

দুশ্চিন্তায় তখন মনের এমন অবস্থা, উর্মি কলকল কবে কি বলছে, কুলকুল করে কেন হাসছে, কিছুই বুঝতে পারল না। শুধু তার কথার পিঠে শুকনো হুঁ আর হাঁ দিয়ে গেল!

ও শুনছে কি শুনছে না, সেদিকে দৃষ্টি নেই উর্মির। ও শুধু হাত নেড়ে নেড়ে অনর্গল কথা বলছে, ট্যাঙ্কে জল ফুরিয়ে যাওয়া কলের মত হঠাৎ হঠাৎ হাসছে। এমন মুশকিল, উর্মিকে যে বলবে ছোটমেসোব কথা, সাবধান করে দিয়ে দূরে দূরে হাঁটবে তাবও উপায় নেই। শুনে এমন হেসে উঠবে। —সে কি রে! বলে এমন অবাক হয়ে তাকাবে মুখের দিকে!

একসঙ্গে অনেকের ওপর রাগ হল অরুণেব। উর্মির ওপর, ছোটমেসোর ওপর, বাবা-মা-দিদি সক্কলের ওপর। সমস্ত বাড়িটার ওপর। আজ আবার মনে হল ঐ বাড়িটাব সঙ্গে ও যেন খাপ খায় না। বাইরেব সঙ্গে ভেতরটা খাপ খায় না, কোন কিছুর সঙ্গে কোন কিছু খাপ খায় না।

বাস-স্টপে এসে দাঁড়াল দু'জনে। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

ফোলিওব্যাগ হাতে মধ্যবয়স্ক একটি লোক ফুটপাত ধরে আসছিল। এমন উদাসীন অন্যমনস্ক ভাব করল যেন উর্মি তার চোখেও পড়েনি। তাই উর্মির কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে চোখ দুটোকে সে র‍্যাডার বানিয়ে দু মাইল দূরে কোথাও বাস আছে কিনা খুঁজল।

—মাইনিং এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ করবি? উর্মি হেসে উঠল। —শিগগির আসছে।

—ধুস্‌। তোর মেয়েবন্ধু হলে করতাম।

উর্মি হেসে উঠে বললে, আহা রে! বলেই চারপাশের লোকগুলোকে দেখিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল।

অরুণও হেসে ফেললে। সুজিত বেশ উপমাটা দিয়েছিল কিন্তু 'গরমের দিনে ঘাম হতে দেখেছিস? ফুট্‌ করে এক জায়গায় এক ফোঁটা ঘাম বের হল, একটু পরে তার পাশে তিন চার ফোঁটা, তার পাশে আবার, আবার...পুনপুন পুনপুন করে চাক হয়ে যাবে একটা। তেমনি কোথাও একটা মেয়ে এসে দাঁড়াক, দু-মিনিটে দেখবি ভীমরুলের চাক গড়ে উঠবে।'

উর্মি হেসে উঠে বললে, ঘাম।

অরুণও হেসে ফেলে এপাশ-ওপাশ দেখল। সত্যি, ভিড় জমে গেছে। বাঃ, তা বলে লোকে বাসে উঠবে না।

□

না, আজ আর এখন বাড়ি ফেরা চলবে না। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে, যেদিন আড্ডায় ইন্টারভ্যাল হয়, সেদিন এ সময় বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়ে একেবারে 'কোজি নুকে' গিয়ে হাজির হয়। আজ তার উপায় নেই, দুর্ঘটনাকে চোখের সামনে ঘটতে দেবে না। ছোটমেসো যদি সোজা গিয়ে হাজির হয়ে থাকে।

—শালা যত সব গাঁইয়া। নিজের মনে মনেই অস্ফুটে বলে ফেলল অরুণ।

আচ্ছা, উর্মি তো স্রেফ বন্ধু। যা সত্যি তাই বলবে। হ্যাঁ, গিয়েছিলাম সিনেমা দেখতে। হ্যাঁ, একজনের সঙ্গে, একটি মেয়ে।

অসম্ভব। বললেই হল নাকি, ঝড় বয়ে যাবে। মা দেয়ালে মাথা খুঁড়বে, বাবা চিৎকার করবে, দিদি বলবে, অরুণ তুই শেষে...

আশ্চর্য, সব কথা কেবল চেপে রাখ, লুকিয়ে রাখ।

উর্মিকে বাসে তুলে দিয়ে উল্টো দিকের বাসে উঠে একেবারে 'কোজি নুকে'র সামনে এসে নামল। ছোট চায়ের দোকানটার নাম 'কোজি নুক'। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। খান বারো-চোদ্দ কমদামী কাঠের চেয়ার টেবিল, যেমন নোংরা টেবিল, তেমনি নোংরা ইজের-পরা বাচ্চা বয়। কিন্তু বিকেল হতে না হতে সব ক'টা চেয়ার দখল হয়ে যায়। আর কি চিৎকার, কি চিৎকার।

অরুণকে দেখতে পেয়েই তর্ক থামিয়ে টিকলু বললে, কি বস্‌, অ্যাটাচির সঙ্গে দেখা হল? জাহাজ দেখালে?

—ধুত্তোর অ্যাটাচি। অরুণ বিরক্ত হল। —দেখবি যা, সে অন্য কার সঙ্গে...

বলেই থেমে গেল ও। এক একদিন কি যে হয়, রুণু সম্পর্কে ওরা একটু খোঁচা দিলেই রাগ গিয়ে পড়ে রুণুর ওপরই। তখন ও রুণুকেই খুব সস্তা করে দেয়।

কিংবা কথা চাপা দেয়ার জন্যেই হয়তো বললে। একটু চুপ করে থেকে মেজাজ ঠাণ্ডা করে আবার বললে, একটা নতুন ঝামেলা হল। উর্মির সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়ে...

সুজিত মুখ বাঁকিয়ে বললে, ফালতু সময় নষ্ট করতে তোর ভাল লাগে?

অরুণ এবার কথাটা চেপে গেল। ভাগ্যিস বলে ফেলেনি। শুনে হয়তো বলত, ছোটমেসো দেখছে তো কি হয়েছে, তার সঙ্গেও ভ্যাকুয়াম ছিল কিনা দেখেছিস? কারও সম্পর্কে এদের এতটুকু ভালবাসা নেই, শ্রদ্ধা নেই। ছোটমেসো, রুণু, উর্মি, সকলকে সমান চোখে দেখে। বাবা মা তো এদের আসল চেহারা দেখেনি, দেখলে বুঝত। চোদ্দ ইঞ্চিকেই

চোঙা ভাবে। টিকলু একটা নতুন প্যান্ট করিয়েছে, তার গর্বেই···শালা আবার প্লেট দেয়নি।
—উর্মির সঙ্গে আমিও একদিন গিয়েছিলাম। টিকলু হাসল। —মাইরি হলে ঢুকছি, বললে, 'অসভ্যতা করবি না কিন্তু'···মেয়েলি টান দিয়ে উর্মির মত করেই বললে।
সুজিত হেসে ফেললে। —একেবারে ঠাণ্ডা পানি ?
অরুণ হাসল না। —টিকলুকে যে বিশ্বাস নেই।
টিকলু হ্যা হ্যা করে হেসে উঠে বললে, যা যা, তোর মত তো হার ম্যাজেস্টির সার্ভেন্ট নই। শালা পুঁটলি বইব চিঁড়ে খাব না, ও বাবা ভাল লাগে না।
অরুণ ভিতরে ভিতরে গুমরে উঠছিল, এবার ও আরও রেগে গেল। বললে, আফটার অল ও আমাদের বন্ধু, এতদিনের বন্ধু।
—ফ্রেণ্ড ? টিকলু হেসে উঠল। —ফ্রেণ্ড তো কি হয়েছে, মাইনিং এঞ্জিনিয়ার ওকে জাহাজ দেখায় না ? তোকেই বিশ্বাস কি, তলায় তলায়, মানে··· ।
এবার সুজিতও বিরক্ত হল। খুব কড়া করে কিছু বলবে ভাবল। বলল না। হঠাৎ অন্যমনস্কের মত হয়ে গিয়ে হাতের রেখা দেখতে দেখতে বললে, ইণ্টারভিউ তো দিয়ে এলাম···
অরুণ বেঁচে গেল। রাগটা তরতর করে নেমে গেল। —বাবা তো রোজ বিজ্ঞাপন দাগিয়ে রাখছে।
টিকলু ফস্ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে, ঠোঁটে-ধরা সিগারেটটা ধরিয়ে বললে, ইণ্টারভিউ দিয়ে চাকরি ? ওসব ছেড়ে বাবা কপিকল ধর, তা না হলে কিস্যু হবে না।
সুজিত হাসল। —যা বলেছিস। কিচ্ছু জিজ্ঞেস করল না মাইরি। তারপর টিকলুর দিকে ফিরে বললে, তোর কি, বাপের চেয়ারে বসবি।
—নেভার। টিকলু প্রতিবাদ করল, মা'র সঙ্গে কবে থেকে ঝগড়া চলছে। দুটো ট্রেড্‌ল মেশিন নিয়ে ঠুকুস ঠুকুস, ধুর্, সারাদিন শুধু 'শুভবিবাহ' আর হ্যাণ্ডবিল ছাপা। লাখখানেক টাকা জোগাড় করে দাও, প্রেস কাকে বলে দেখিয়ে দিচ্ছি।
অরুণের ঐ সব লাখ টাকার গল্প ভাল লাগে না। তাছাড়া নিজেদের অবস্থাটার কথা যখন ভাবে, তার সঙ্গে টিকলুর মত বড় বড় স্বপ্নকে ও কিছুতেই মেলাতে পারে না। তাই খানিক চুপ করে থেকে বললে, মাস্টারি একটা ইস্কুলে পাওয়া যায়, কিন্তু ইচ্ছে হয় না।
সুজিত চুপ করে থেকে বললে, জানিস অরুণ, আমাদের মধ্যে কোন রঙ নেই। সত্যি, আমাদের মাইরি কিচ্ছু হতে ইচ্ছে হয় না।
কেন হবে না। সুজিতটাও বাবার মত কথা বলছে। কিংবা ও ব্যাটাও হয়তো বাপের কাছে শুনে শুনে নিজেও তাই বিশ্বাস করছে। কিচ্ছু হতে ইচ্ছে হয় না। যেন ইচ্ছে হলেই কিছু হতে পারত ও। বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করলে একটা ইণ্টারভিউ মেলে না, ইণ্টারভিউ দিয়ে নাকি চাকরি হবে! কারও কাছে চিঠি লিখে দাও না বাবা, যদি মুরোদ থাকে। দ্যাখো, চাকরি করি কিনা। তা না, শুধু বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত কর।
দরখাস্ত করার ঝামেলা কম নাকি।
পকেটে হাত দিয়ে চায়ের পয়সা দিতে গিয়ে খসখস করে কি একটা কাগজের টুকরো হাতে ঠেকল। অমনি মনে পড়ে গেল, দুপুরে বেরোবার সময় দিদি দিয়েছিল। নখ দিয়ে দিয়ে ছেঁড়া বিজ্ঞাপনের টুকরোটা। ওটা পেয়েছিল বলেই আর টাকা চাইতে হয়নি মা'র কাছ থেকে। খুব বিরক্ত মুখে বলেছিল, দাও দুটো টাকা, আবার এক দরখাস্তের ঝামেলা দিয়ে গেছে বাবা।
মা প্রথমে একটা টাকা দিয়েছিল, তারপর অরুণ এমন অসহায় কাচুমাচু মুখ করে

তাকিয়েছিল যে, আরেকটা না দিয়ে পারেনি।

প্রথম প্রথম অবশ্য বাবার এই বিজ্ঞাপন দাগ দিয়ে রাখা মোটেই পছন্দ হত না অরুণের। কম হাঙ্গামা নাকি। মোড়ের মাথায় একটা দিশি ব্যাঙ্ক আছে, তার সিড়ির পাশে দুটো টাইপরাইটার নিয়ে সারাদিন খটাখট খটাখট চালাচ্ছে দুটো লোক। এক একটা দরখাস্ত চার আনা, সার্টিফিকেটের ট্রু কপি—সেও দু আনা। ঝামেলা না ঝামেলা। দুটো গেজেটেড ধরে সার্টিফিকেট নিয়ে রেখেছে, তার ওপর ডিগ্রিফিগ্রির নকল আছে। তারপর লম্বা খাম কেন, ঠিকানা টাইপ করাও, স্ট্যাম্প লাগাও পোস্ট আপিসে কিউ মেরে দাঁড়িয়ে। একটা দরখাস্ত মানে দুটো দিনের আড্ডা বন্ধ। প্রথম প্রথম তাই বিরক্ত হত ও। এখন তাই স্রেফ মার কাছ থেকে একটা কি দুটো টাকা নিয়ে বলে, করেছি। শালা করলেও যা, না করলেও তাই, ইন্টারভিউ তো আসবে না। তার চেয়ে বাপের টাকা ছেলেরই ভোগে লাগছে।

কিন্তু আজ অন্য ব্যাপার। বিজ্ঞাপনের টুকরোটা হাতে ঠেকতেই বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল অরুণের।

—একটা দরখাস্ত টাইপ করাতে হবে, যাবি টিকলু? হঠাৎ উঠে পড়ে অরুণ বললে।

টিকলু অবাক হয়ে তাকাল। —যাব্বাবা, ও রোগ তো ছেড়ে গিয়েছিল, দিব্যি টু-পাইস হচ্ছিল বিজনেসে।

—যাবি কিনা বল্।

দরখাস্তটা টাইপ করাতেই হবে। ছোটমেসো এর মধ্যে কি কাণ্ড করেছে কে জানে। যদি রিপোর্ট পৌঁছে গিয়ে থাকে তা হলে তো ফায়ার হয়ে আছে সব। দরখাস্তটা হাতে নিয়ে ঢুকলে, বাবাকে দেখালে তবু যদি একটু ঠাণ্ডা হয়।

টিকলু কালমেঘ-খাওয়া মুখ করে বললে, মেয়ে-টাইপিস্ট হলে একশো বার যেতাম, এক দরখাস্ত আমি সতেরো বার টাইপ করাতাম। কিন্তু দুটো বোকা বোকা টাইপের লোক বসে বসে খুটুস খুটুস করে টাইপ করবে, আমার মাইরি কোমর কন কন করে।

—সে কি রে টিকলু। সুজিত হেসে ফেললে, তোর মুখে তো জানতাম ন্যাকা-বোকা একা আসে না।

টিকলু হেসে বললে, অরুণের মত একটু পালিশ মারছি, ও নির্ঘাত পালিশ দেখিয়ে রুণুটাকে কব্জা করেছে।

অরুণ পা বাড়াল। —আমাকে যেতেই হবে। দরখাস্তটা না করালে···

—অ্যাটাচি বিয়ে করতে বলছে বুঝি? চাকরি জোগাড় করতে হবে? টিকলু হাসল।

সুজিত সিগারেটের তলানিটা দু আঙুলের ফাঁক দিয়ে ছটাক করে দূরের ফুটপাতের দিকে টিপ্ করে ছুঁড়ে দিল। দিয়ে বললে, ইন্টাবভিউ দিয়ে এলাম, কিচ্ছু জিজ্ঞেস করল না রে।

অরুণ বিরক্তির সঙ্গে বললে, আরে ধেস্, চাকরির কথা কে ভাবছে। বাড়ি এতক্ষণ ফুজিয়ামা হয়ে গেছে হয়তো, ধোঁয়া উগরোচ্ছে।

দরখাস্ত টাইপ করিয়ে একটু তাড়াতাড়ি ফিরল অরুণ। বুকে তখন বেশ খানিকটা বেপরোয়া ভাব এসেছে, যা হবে হয়ে যাক্। না হয় রেগে গিয়ে বাপকে সেলাম করে দেবে, 'গুডবাই'য়ের মত মোক্ষম অস্ত্র থাকতে ভয় কিসের।

যেন কিছুই হয়নি, ছোটমেসো ওকে দেখেনি, এমন ভাব করে বাড়ি ঢুকল। পড়ার ঘরটায় একবার উঁকি মেরে দেখল মিলু আছে কিনা। থাকলে টেম্পারেচারটা আগে জেনে নিত। কিন্তু না, মিলু নেই।

নিজের ঘরে যাবার আগেই বারান্দার এক কোণে রান্নাঘর। দুর্, ভয় ভয় ভাল্ লাগে না, যা হবার এস্পার-ওস্পার একটা হয়ে যাক্।

অরুণ রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে চেঁচাল। —মা, টেরিফিক খিদে পেয়েছে, শিগগির খেতে দাও।

মা ফিরে না তাকিয়েই বললে, ঘোড়ায় জিন্ দিয়ে এলেন, মুলুকে বলগে যা জায়গা করতে। বলে এবার ফিরে তাকাল। —তোর হাতমুখ ধোয়া হতে হতে হয়ে যাবে।

আর দাঁড়ায় ? চটপট নিজের ঘরটাতে এসে ঢুকল। ঢুকেই দেখলে, দিদি ওরই টেবিলের সামনে বসে খুব এক মনে চিঠি লিখছে ওর কলম দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বিরক্ত হয়ে উঠল অরুণ। এতবার বারণ করেছি। কেন বাবা, কর্তাকে চিঠি লিখছ, একটা কলম সে কিনে দিতে পারেনি ! দেবে নিবটার বারোটা বাজিয়ে।

জামা ছাড়তে ছাড়তে একটু শব্দ করল অরুণ, ইচ্ছে করেই। তারপর আড়চোখে একবার দিদির দিকে তাকাল। নাঃ, মনে হচ্ছে পাস করে গেছে ও। মা কিছু বলল না, দিদি ঝাঁঝিয়ে উঠল না এখনও...

তবু সাবধানের মার নেই। টাইপ করা দরখাস্তটা নিয়ে বাবার কাছে দাঁড়াল। —দ্যাখো তো, অ্যাপ্লিকেশনটা ঠিক আছে কিনা। এক বন্ধু বলছিল, কোন্ অফিসার ওখানে ওর চেনা আছে...

বাবা কোন কথা বলল না। দরখাস্তটা হাত থেকে নিয়ে আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে বললে, কালকেই তা হলে পোস্ট করে দিস, ঠিক আছে।

অরুণ সরে এল। বাবার সামনে নেহাত বাধ্য না হলে ও যায় না, থাকতে ইচ্ছে হয় না দু মিনিট।

নিজের ঘরে এসে দরখাস্তটা টেবিলের ওপর রেখে সবে খেতে বসতে যাবে, দিদি মার ডাক শুনে এতক্ষণে হয়তো খাবার জায়গা করতে গেছে, হঠাৎ পা টিপে টিপে মিলু ঘরে ঢুকল ; এদিক-ওদিক দেখল, তারপর অরুণের কাছে সরে এসে বললে, কি হয়েছে রে দাদা, ছোটমাসী ওদের বলছিল ?

□

দেখতে দেখতে মহানিমের গাছটা পাতায় ভরে উঠেছে। তামাটে রঙের কচি কচি পাতাগুলো এখন ফিকে সবুজ। হাল্কা হাওয়ায় নিমের ঝালরগুলো যখন আরতির চামরের মত আস্তে আস্তে নড়ে, তখন সেদিকে ঠায় তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

পাড়াটা নোংরা, গলির শেষে একটা ডাস্টবিনের উপচে-পড়া আবর্জনায় গলিটা দুর্গন্ধে ভরে থাকে মাঝে মাঝে। জানালা থেকে বাইরে তাকালে কয়েকটা মরচে-পড়া টিনের শেড দেখা যায়, একটা ফ্ল্যাটের বারান্দায় ছেঁড়া নোংরা কাঁথা শুকোয়, দূরে একটা ছোট্ট মুদিখানা। চারপাশের বাড়িগুলোর গায়ে রঙ নেই, রোদে-জলে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

কোথাও কোন রঙ নেই। রুণু ছাড়া কোথাও কোন রঙ নেই।

অথচ প্রেমট্রেম অরুণ আগে বিশ্বাসই করত না। কেউ না, সুজিত টিকলু অরুণ—কেউ না।

সুজিত আজকাল বড়ো বেশি কুষ্ঠিতে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ইন্টারভিউ দিচ্ছে আর দিনরাত শুধু ছক কাটছে। কোন্ ঘরে কোন্ গ্রহ মুখস্থ করে ফেলেছে। আবার মাঝে মাঝে নিজের হাত নিজেই দেখছে। শালা বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতটা চেপে চেপে দিব্যি একটা ফেট লাইন বানিয়ে ফেলেছে এর মধ্যে। লাইনটা এমন স্পষ্ট যেন কেষ্টপুর ক্যানাল, একখানা গাধাবোট নামিয়ে ঠেলে দিলে স্যাটার্নে গিয়ে

পৌঁছবে।
অরুণ শুনে হাসে। —আমাদের আবার ফেট।
—তুই সে-কথা বলিস না অরুণ, ফিউচার তো তোরই। সুজিত বলেছিল।
টিকলু হেসে বলেছিল, প্রেজেন্টও তোর, ফিউচারও তোর।
সব ঐ রুণুকে উদ্দেশ করে। অর্থাৎ যা পাওয়ার তা তো পেয়ে গেছিস।
সত্যি তো, এ বয়সে আর কি আকর্ষণ আছে, আর কি পেতে চায় অরুণ! সেদিক থেকে ও ভাগ্যবান। রুণুর কথা ভাবলে গর্বে ভরে ওঠে।
—তোর আবার ক্রেডিট কি রে, ক্রেডিট তোর কুষ্ঠির। ও শালা যার ভাগ্যে যা আছে। একদিন ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল সুজিত।
অরুণের এখন মাঝে মাঝে হাসি পায়। এদের বোঝাতে পারে না, বোঝাতে চায়ও না যে প্রেম মানে একটা মেয়ে নয়। শরীর-টরির তার মধ্যে আছে, নানারকম ইচ্ছে-টিচ্ছেও হয়, তবু অন্যরকম। ওরা এখনও সেই ষোল-সতেরো বছরের মন নিয়ে পড়ে আছে। তখন মেয়েদের দেখলেই কেমন একটু রঙিন রঙিন লাগত। দু একটার দিকে হাত বাড়াতেই উচ্চিংড়ের মত ছিটকে বেরিয়ে গেছে। একটা বোকা বোকা দাঁড়িয়ে থাকত, কথা বলত না। কিন্তু অরুণের নিজের মন ভরত না।
—টিকলু একটা হারামি। সুজিত একবার টিকলুর ওপর রেগে গিয়ে অরুণকে বলেছিল। —ব্যাটা পিসতুতো…মাইরি সন্দেহ হয়।
অরুণ বিশ্বাস করেনি, তবু মজা পেয়েছিল।
সে-সব দিনের কথা ভেবে অরুণের নিজেরই এখন গা ঘিনঘিন করে।
সতেরো-আঠারোর জীবনটাকে এখন চ্যাংড়ামি মনে হয়। এখন ওরা একুশ। একুশ-বাইশ। এই কবছরে, আর কেউ না হোক, অরুণ অনেক বড় হয়ে গেছে। বদলে গেছে।
কিংবা রুণুই ওকে এখন একটু একটু করে বদলে দিচ্ছে।
—এইবার তোরটা বল্ শুনি। ঊর্মির তো সবই অদ্ভুত, একদিন নির্ঝঞ্ঝাট নিরিবিলি দুপুরে ফেরাজিনির এক কোণে গা এলিয়ে ওর নিজের প্রেমের গল্প বলেছিল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক উদাস উদাস দেখাচ্ছিল ওকে। হঠাৎ উড়ন্ত ঘুড়িটাকে ঝপাঝপ্ লাটাইয়ের কাছে গুটিয়ে এনেছিল, ভিজে ভিজে চোখের পাতাকে হাসিয়ে দিয়ে বলেছিল, ব্যস্, এই। এবার তোরটা বল্।
বাঃ রে বাঃ। এ যেন চাকরি পাওয়া। ইণ্টারভিউ হল, কি নাম, কোন্ সালে পাস করেছ, কাল থেকে আসবেন। প্রেম কি কাউকে বলার মত কাহিনী? কাউকে বোঝানোর মত?
অরুণ জানতই না ও প্রেমে পড়ে যাবে। মনে মনে ওদের সকলেরই এটা ঘুমন্ত বাসনা ছিল একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবে, একটু ঘোরাঘুরি করবে, রেস্টুরেণ্টে বসবে। একটু ফাঁকা পেলে আদর-টাদর করবে। এই অবধি।
কলেজের বিরাম ইচ্ছের সলতেটা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। মেয়েলি মেয়েলি চেহারা ছিল তার, কলেজের সোশ্যালে একবার অভিনয় করে খুব হাততালি পেয়েছিল। স্যান্সক্রিট কলেজের সামনে গিয়ে বিরাম পায়চারি করত, কোন কোন দিন সেই মেয়েটা। তখন নাম জানত না।
ওরা ঐখানে দেখা করে এক একদিন কোথায় হারিয়ে যেত।
বিরাম লাস্ট বেঞ্চে বসে রসিয়ে রসিয়ে যা বলত, ওরা গোগ্রাসে তাই গিলত। আবার বিরামকে ক্ষ্যাপাতেও ছাড়ত না।
একদিন টিকলু খুব মজা করেছিল। বিরাম তখনও আসেনি, ও দেখল মেয়েটি ফুটপাতে

সাজানো পুরনো বই দেখার ভান করে অপেক্ষা করছে।

টিকলু বললে, দাঁড়া, বিরামটাকে আজ একটা কাঁচি মারব।

বলে সটান মেয়েটির কাছে গিয়ে বললে, বিরাম আপনাকে আজ চলে যেতে বললে, টি কে'র ক্লাশে প্রক্সি দিতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

তারপর বিরামকে আধ ঘন্টা ধরে পায়চারি করতে দেখে অরুণ, সুজিত, টিকলু দূরে দাঁড়িয়ে খুব হাসাহাসি করেছিল।

পরের দিন জানতে পেরে বিরাম ভীষণ রেগে গিয়েছিল।

টিকলু বলেছিল, একটা জুটিয়ে দাও না গুরু, তাহলে আর ডিস্টার্ব করব না।

সে-সব ভাবলে নিজেকে বড়োছোট মনে হয় অরুণের। তখন প্রেম জিনিসটা কি তা সে বুঝতেই পারত না। যে-কোন একটা ছেলের সঙ্গে কোন মেয়েকে দেখলেই হিংসে হত। মনে হত ছেলেবেলার মত পকেটে একটা গুলতি থাকলে দূর থেকে ধাঁই করে একটা বসিয়ে দিতাম।

সুজিত বলেছিল, বিরামটা রোজ ভিক্টোরিয়ায় যায়।

টিকলু বললে, চল্ ওটাকে আজ পাংচার করে দিয়ে আসি।

ওরা তিনজনে হাসতে হাসতে মজা দেখার জন্যে বাসে লাফিয়ে উঠল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এসে জলের ধারে একজোড়াকে দেখে টিকলু বললে, মেয়েগুলো মাইরি ভারী বোকা। দ্যাখ্ দ্যাখ্ ছেলেটা হুইল গোটাচ্ছে, মেয়েটা বুঝতেই পারছে না।

অরুণ তাকিয়ে দেখে হেসে ফেলল। মেয়েটার জন্যে ওর মায়া হল। মনে হল ছেলেটা ঐ মেয়েটার একটুও যোগ্য নয়। ওর মনে হল ছেলেটা গদগদ হয়ে অভিনয় করছে। তুলনায় ওর নিজেকে খুব সৎ আর ভাল মনে হল। ভাবল, আমি কোন মেয়েকে পেলে মিথ্যে কথার প্যাঁচ কষব না। আমি সত্যি সত্যি ভালবাসব।

টিকলু ওদের সকলকে বিরক্ত করতে করতে টিপ্পনী কাটতে কাটতে, কখনও অশ্লীল অট্টহাসের আওয়াজ তুলে ভিতরের জ্বালাটা জুড়োবার চেষ্টা করছিল।

হঠাৎ 'ইয়াল্লালা' বলে চিৎকার করে উঠে থেমে পড়ল। —শালা এক সঙ্গে দুটো ? কি লাক্ মাইরি।

সেই প্রথম। বিরাম আর নন্দিনীর সামনে হাঁটু গুটিয়ে বসে রুণু হাসছিল আর কি বলছিল।

টিকলু চিরকেলে চ্যাংড়া, ঝট্ করে বিরামদের সামনে এগিয়ে গিয়ে নন্দিনীকে বললে, ম্যাডাম, ক্ষমা চাইতে এলাম।

বলে বসে পড়ল ঘাসের ওপর।

অরুণের তখন ভীষণ লজ্জা করছিল। নিজেকে একটা রক্‌বাজ ছোকরা মনে হচ্ছিল। তাদের সঙ্গে তফাত কোথায় ? সত্যি তো, কারও সঙ্গে কারও তফাত নেই। সার্টিফিকেট দেখিয়ে কিংবা স্যালারি বিল দেখিয়ে সবাই ভদ্রলোক হতে চায়। ব্যবহার দিয়ে নয়।

বিরাম খুব রেগে গিয়েছিল, তবু আলাপ করিয়ে দিল।

আর অরুণ, একা অরুণ দু'হাত এক করে বললে, নমস্কার।

সুজিত বললে, চল্, গিয়ে একটু চা খাই।

ওরা সবাই এসে রেস্টুরেন্টের একটা টেবিল ঘিরে বসল।

সুজিত যে এত স্মার্ট কথাবার্তা বলতে পারে মেয়েদের সঙ্গে, অরুণ জানত না। সুজিত মজার মজার কথা বলছিল, আর নন্দিনী খুব হাসছিল। রুণু টিকলুর মুখোমুখি বসেছিল, আর অরুণের ভয় হচ্ছিল টিকলু না টেবিলের তলায় পা দিয়ে রুণুর পায়ে চাপ দেয়। ওকে কোন বিশ্বাস নেই।

অরুণ চোখ ফিরিয়ে এক একবার রুণুকে দেখছিল।

এতকাল ঊর্মিকে ওর খুব সুন্দর মনে হত। কিন্তু রুণুকে ওর কেমন যেন স্বপ্নের মত মিষ্টি লাগছিল। কেমন অস্পষ্ট মৃদু কুয়াশা, গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ, শরৎকালের রোদ্দুরের মত দূরের স্বপ্ন যেন।

রুণু কোন কথা বলছিল না, অরুণ কোন কথা বলছিল না।

কিন্তু এলোমেলো কথা বলতে বলতে সুজিত কখন গণৎকার হয়ে উঠল। ও বিরামের হাত দেখল, নন্দিনীর হাত দেখল, আর ও যখন হাত দেখার নাম করে ফ্ল্যাটারি করছিল, তখন রুণু ইলেকট্রিক স্পার্কের মত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটু একটু মুচকি হাসছিল।

—আমার হাতটা দেখবেন না ? একটু হেসে রুণুও তার হাত বাড়িয়ে দিল।

সুজিত রুণুর হাতটা ছুঁল, আর অমনি অরুণের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল।

তারপর সারাক্ষণ বেহালার ছড় টানার মত একটা ব্যথা ওর পাঁজরে পাঁজরে ঘুরল।

বিরাম বললে, এবার ওঠা যাক্।

রুণু এতক্ষণ ওর মেলে ধরা হাতের দুর্বোধ্য রেখাগুলোর দিকে তাকিয়েছিল। এবার ওর নামানো চোখ ঈষৎ তুলে এক পলকের জন্যে অরুণের মুখের দিকে তাকাল।

নন্দিনী বললে, আহা, বসো না আর একটু।

রুণু বললে, না রে। দেরি হয়ে যাবে।

অরুণের কেবল মনে হতে লাগল, দেরি হয়ে যাবে, দেরি হয়ে যাবে। ওর তক্ষুনি তক্ষুনি কিছু একটা বলতে ইচ্ছে করছিল। ওর ভয় হচ্ছিল, সুজিত কিংবা টিকলু আগেই রুণুকে কিছু একটা বলে ফেলবে। ওরা কেউ যদি বলে ফেলে তা হলে অরুণের তারা-ঝরা আকাশটা চৌকো জানালার মত ছোট্ট হয়ে যাবে।

ওরা খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিল। সুজিত খুব চটকদার কথা বলছিল। নন্দিনী হাসছিল। রুণু বোধ হয় কিছু ভাবছিল। টিকলুকে চোঙা প্যান্টে বড়ো কুৎসিত দেখাচ্ছিল।

অরুণ হাঁটতে হাঁটতে ঘাসের ওপর হালকা নীল আর গাঢ় নীলে মেশামেশি একটা সুন্দর পালক দেখতে পেল। খুব সুন্দর কোন পাখির খুব সুন্দর একটা পালক।

অরুণ এতক্ষণ শুধু রুণুর মুখের দিকে তাকিয়েছে। শিশির ধোয়া সেই মুখটার দিকে। ও এতক্ষণে লক্ষ করল, রুণু একটা নীল শাড়ি পরে আছে।

অরুণ ঘাসের ওপর থেকে পালকটা তুলে নিল, তারপর একটাও কথা না বলে পালকটা রুণুর দিকে এগিয়ে দিল।

রুণুর হাতে পালকটাকে আরও সুন্দর মনে হল। রুণু পালকটা নিয়ে অরুণের মুখের দিকে আরেকবার তাকাল।

□

এসপ্লানেডের একটা নিওন-আলোর বিজ্ঞাপন জ্বলছে আর নিবছে, জ্বলছে আর নিবছে। অরুণ শুনতে পেল ওর হৃৎপিণ্ডও কথা বলছে। ওর মুখ আশায় নিরাশায় জ্বলছে আর নিবছে, জ্বলছে আর নিবছে।

সমস্ত ঘটনাটা কেমন যেন আকস্মিক মনে হয়। সেদিন যখন কুড়িয়ে পাওয়া একটা রঙিন পাখির সুন্দর নীল পালক রুণুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন অন্য কোন অসম্ভব কল্পনায় খুশি হয়ে উঠতে সাহস পায়নি।

এখন সব কথা বললে টিকলুরা হয়তো বিশ্বাসই করবে না। কিংবা টিকলু হয়তো রেগে

গিয়ে বলবে, শালা বেইমান !

সুজিত বলবে না কিছু, কিন্তু মনে মনে ভাববে, ওর হাতের মোয়া অরুণ ছোঁ মেরে নিয়ে নিয়েছে।

টিকলুকে সুজিতকে সব কথা বলবে কিনা ভাবল অরুণ। টিকলুকেই ভয়। ও তো একটা রিয়েল ছোটলোক। যাচ্ছেতাই চেঁচামেচি করবে, কলেজসুদ্ধ সকলকে বলে বেড়াবে। ওকে কোন বিশ্বাস নেই। ইউনিয়নের ইলেকশনের সময় পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা নিয়ে রীতিমত মারপিট শুরু করে দিয়েছিল। অথচ পলিটিক্সের তুই কি বুঝিস ? দলের পাণ্ডারা কেউ একটু ওর কাঁধে হাত দিয়ে তোয়াজ করলেই হল, অমনি পার্টি পাল্টে ফেলবে।

এমন একটা আনন্দের খবর না বলেও তো শান্তি নেই। অরুণের ইচ্ছে হল লাফাতে লাফাতে গিয়ে বলে, সুজিত কংগ্রাচুলেট কর, মেরে দিয়েছি।

কিন্তু সুজিতের সঙ্গে দেখা হতেই ওসব কিছুই বলল না, শুধু সুখ-সুখ একটা হাসি ওর মুখে ছড়িয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে বললে, রুণুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলে হাসল অরুণ।

কোথায়, কখন, কিভাবে—অনেকগুলো প্রশ্ন দেখা দিল সুজিতের চোখে।

—চল, চল, ঊর্মিকে বলতে হবে। সুজিত টেনে নিয়ে গেল।

—অনেকক্ষণ আমরা একা একা গল্প করলাম। অরুণ খুশিটা যেন চাপতে পারছে না এমন গলায় বললে।

সুজিত সশব্দে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিল অরুণের পিঠে। —সাবাস। ঊর্মির কাছে এবার আমাদের প্রেস্টিজ বেড়ে গেল। ও তো ভাবে আমরা জোটাতে পারি না।

কফি হাউসে এসে দেখলে ঊর্মির সঙ্গে সেই শুকনো কালো মেয়েটা—সোমা চ্যাটার্জি, হিস্ট্রির। আর টিকলু। সোমাকে ডেকে আনলেই সুজিতের সমস্ত মন বিস্বাদ হয়ে যায়। এক টেবিলে বসতে ইচ্ছে হয় না। 'নিজে প্রমিনেন্ট হওয়ার জন্যে একটা দিন মাইরি ঊর্মি একটা সুন্দর চেহারার কাউকে আনল না।'

সুজিত চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। বসেই বললে, টিকলু, তুই ফর নাথিং স্বপ্ন দেখছিস, এদিকে অরুণ লটকে নিয়েছে, রুণুকে।

অরুণ কোন কথা বলল না, ওর মুখের হাসিটাও মিলিয়ে গেল। দু'চোখ বন্ধ করতে ইচ্ছে হল অস্বস্তিতে। 'লটকে নিয়েছে।' যেন এর চেয়ে ভাল কোন কথা নেই।

অরুণের হঠাৎ মনে হল, রুণুকে এরা অপবিত্র করে দিল। অথচ মনে মনে ও রুণুকে একটা বিশুদ্ধতা দিতে চাইছিল।

ঊর্মি বাঁ হাতে ধরা স্যাণ্ডুইচে সবে একটা কামড় বসিয়েছিল, না চিবিয়েই ঢক করে খানিকটা জলের সঙ্গে সেটা গিলে ফেলে বলল, রুণু কে ?

—আউটসাইডার।

—দেখতে কেমন ?

সুজিত পাখির ডানার মত করে বাঁ চোখের ভুরু কাঁপাল। বললে, টপ।

ঊর্মি মুখ কাচুমাচু করে বললে, ঈস্ অরুণ, আমার চেয়েও ?

সুজিত বললে, তোর আজ ডিভ্যালুয়েশন হয়ে গেছে।

অরুণ একটু মুচকি হাসল। —কি যে করিস না তোরা। আলাপ হয়েছে, ব্যস। সে তো সুজিত টিকলুর সঙ্গেও হয়েছে।

আসলে অরুণের একটু ভয় ভয় করছিল। এই হইচই, এই আলোচনা যদি বিরামের কানে যায়, যদি রুণুকে বিরাম ক্ষ্যাপাতে শুরু করে, কিংবা বলে, অরুণ তোমাকে নিয়ে সকলের সামনে চ্যাংড়ামি করেছে, তাহলে হয়তো···

টিকলু এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি, অন্য দিকে তাকিয়েছিল।

উর্মি হঠাৎ হেসে উঠে হাত বাড়িয়ে টিকলুর চিবুক ছুঁল। —আহা, দ্যাখ দ্যাখ জিৎ, বেচারি একেবারে মনমরা হয়ে গেছে।

টিকলু হেসে ফেলল। —ও ব্যাটা রুণুকে জাহাজ দেখাবে, আর আমি বুঝি ফুর্তিতে টুইস্ট নাচব ?

—এই অসভ্য ! উর্মি চোখের ইশারায় সোমার দিকে দেখাল। অর্থাৎ ওর সামনে এসব কথায় ওর আপত্তি।

টিকলু হেসে উঠল। —তোরা মেয়েরা সব জিনিসে এত অসভ্যতা খুঁজে পাস। জাহাজ দেখানো খারাপ কিছু ?

—নয় ? উর্মি হেসে উঠল। —কি, মানে কি ?

সুজিত হেসে বললে, তোর ঐ কলেজ পালিয়ে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পড়তে যাওয়া।

উর্মি এমনভাবে হেসে উঠল যেন কেউ ওকে কাতুকুতু দিয়েছে। হাসতে হাসতে বললে, বাপ্‌স্‌, ও বেচারার ওপরও জেলাসি ? হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললে, আমি যেখানেই যাই আমি পবিত্র, আমি বিশুদ্ধ।

সোমা কালো আর শুকনো মুখ নিয়ে ফিকফিক করে হাসছিল চোখ নামিয়ে। ওর আঙুলের প্রবালের আংটিটাই যেন বলে দিচ্ছিল ও প্রাণ খুলে হাসতে পারে না।

আমি পবিত্র, আমি বিশুদ্ধ।

সোমা উর্মির কথা শুনে এতক্ষণে আস্তে আস্তে বললে, ভেজাল প্রমাণে এক হাজার এক টাকা পুরস্কার, তাই না ?

টিকলু সুযোগ খুঁজছিল। বললে, সে তো এস কে এম ছাড়া আর কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না।

উর্মি হো হো করে সশব্দে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলেই।

উর্মি হাসতে হাসতে বললে, আফটার অল একজন প্রফেসর। তার যদি একটু স্নেহটেহ, একটু বাৎসল্য···

সুজিত বললে, ঠিকই তো, একজিবিশনে যদি ঘাড়ে হাত রেখে একটু ছবি বোঝায়···

চাপা স্বভাব সরিয়ে সোমাও হেসে উঠল। —বাৎসল্যই তো। ঝুপুরঝুপ বৃষ্টি, ছুটি চাইলাম সকলে, 'কি উর্মিলা, ক্লাস করবে, না ছুটি দিয়ে দেব ?' যেন উর্মিই ক্লাস।

উর্মি হেসে ফেলেই অসহায়ের মত ভান করল। —অরুণ, তুই একটু ডিফেণ্ড কর আমাকে।

—অ্যাঁ ? অরুণ একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। চমকে উঠল। —কি বলছিলি ? শুনিনি আমি।

সকলে একসঙ্গে হেসে উঠল ওকে অপ্রতিভ হতে দেখে।

সুজিত শুধু বললে, তোর বারোটা বেজে গেছে।

টিকলু বললে, অরুণটা লাকি। ওর এখন আর সময় কাটানোর প্রবলেম নেই।

অরুণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বলে ভীষণ লজ্জা পেল। লজ্জা কাটানোর জন্যে বললে, যাঃ, অন্য কথা ভাবছিলাম।

—উড়ছিলি বল্, ফুরুর ফুরুর করে উড়ছিলি। সুজিত আবার ঠাট্টা করলে।

কুড়িয়ে পাওয়া সেই নীল পালকের মত, সেই নীল পালকের পাখির মত অরুণ এতক্ষণ সত্যিই মেঘে বাতাসে অল্প রোদ্দুরের আকাশে ফুরুর ফুরুর করে উড়ে বেড়াচ্ছিল।

সবুজ ঘাস, গাছগাছালি, পুকুর, ঘুঘুর ডাক ইত্যাদি অনেক কিছু মেখে মোলায়েম হওয়া

এক ধরনের শান্ত শ্রী আছে রুণুর মুখেচোখে, শরীরে। কিংবা অরুণই তা আবিষ্কার করেছে।

রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। রুণু মৃদু হেসে থেমে পড়ল, বললে, কলেজ থেকে। লাইব্রেরিয়ানশিপ পড়ছি।

—চলুন চলুন, কোথাও একটু বসা যাক। যেন একটা সুযোগ এক্ষুনি হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে এমনি তটস্থভাবে ও বললে।

আজকেই ধোপদুরস্ত শার্ট প্যান্ট ভাঙবে ভেবেছিল।বড়োবোকামি হয়ে গেছে। নিজের ক্রিজ নষ্ট হওয়া পোশাকের দিকে তাকিয়ে অরুণ ভাবল।

রুণু হাতের ঘড়ি দেখল। —পনেরো মিনিট, কেমন ? হাসল ও ; বললে, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

অরুণ একটু আহত বোধ করল। মনে হল, রুণু যেন ওকে উপেক্ষা করতে গিয়ে নেহাত নির্দয় হতে পারছে না।

একবার ইচ্ছে হল বলে ওঠে, তাহলে থাক।

পারল না। সেই প্রথম দেখা হওয়ার পর মাঝে মাঝেই ওর রুণুর কথা মনে পড়েছে। এক একবার বিরামের ওপর রাগ হয়েছে। কে জানে, ও-ই আড়াল করে রাখছে কিনা।

এমনকি বিরামকে সন্দেহও হয়েছে ওর। কে জানে বিরাম তলায় তলায় রুণুর সঙ্গেও খেলছে কিনা।

—বাইরেই বসি। রেস্টুরেন্টের খোলামেলা জায়গাটায় খানকয়েক চেয়ার-টেবিল। সেখানেই বসল রুণু। কেবিন দেখিয়ে বললে, ওখানে দম বন্ধ হয়ে যায়।

অরুণের মনে হল রুণু যেন ওকে বার বার অপমান করতে চাইছে। ওকে বিশ্বাস করছে না। রুণুর চোখে অরুণও যেন আরেকজন টিকলু।

কিন্তু তারপর গল্প করতে করতে, গল্প করতে করতে, গল্প করতে করতে ওরা দুজনেই—দুজনের মন—কখন কাছে এসে গেল। অরুণ বুঝতে পারছিল পনেরো মিনিটের মেয়াদ অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। তবু পাছে সে-কথা রুণুর মনে পড়ে যায় সে-জন্যে ওর ভয় হচ্ছিল।

রুণু শুধু নিজের কথাই বলছিল।...বাঃ, ইচ্ছে তো আমারও হয়। কি করে আসব বলুন, একটু দেরি হলে মামীমা এত ভাবেন, মামাতো বোনটা পড়তে বসে না...

নিজের সংসারের সমস্ত কথা রুণু অনর্গল বলে যাচ্ছিল। বাবা কি-ভাবে মফস্বলে থেকে সংসার চালায়। কাকারা আমার কলেজে পড়াই পছন্দ করে না, মামাবাবু ডাক্তারি করেন, নিয়ে এসে রেখেছেন। আমি একটা চাকরি পেলে সংসারের তবু কিছুটা...

রুণুকে খুব সহজ আর সরল মনে হচ্ছিল।

—আমি খুব হাসছিলাম বলে সেদিন আমাকে খুব খারাপ ভেবেছেন, তাই না ?

রুণু হঠাৎ লাজুক হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল।

অরুণ বললে, রাগ হয়েছিল, সুজিত আপনার হাত ছুঁয়েছিল বলে।

—হিংসুটে !

অরুণ হেসে উঠল। —আপনি অন্যের কথায় হাসলে আমার হিংসে হয়, সে কি আমার দোষ !

রুণু এবার আর হাসল না। —আপনার দেয়া পালকটা আমি সকলকে দেখিয়েছি। খুব সুন্দর।

সকলকে দেখিয়েছি, সকলকে দেখিয়েছি। সকলকে দেখানোর জন্যে তো অরুণ কিছু দিতে যায়নি, কিছু বলতে যায়নি। ও অনেক খুশি হত যদি রুণু বলত, ওটা আমি কাউকে দেখাইনি।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে পাশাপাশি ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে কয়েকবার অরুণের সঙ্গে রুপুর শরীরের ঈষৎ ছোঁয়া লাগল। অরুণের ভাবতে ভাল লাগল, প্রতিবারই ছোঁয়াটুকু অনিচ্ছাকৃত বা আকস্মিক নয়। ভাবতে ভাল লাগল, রুপুর একটুখানি প্রশ্রয় আছে।

অরুণের আবার মনে হল, আমি এখনই কিছু বলে ফেলি, এখনই কিছু বলে ফেলি। আমাদের সামনে কোন ভবিষ্যৎ নেই, কোন পারম্পর্য নেই। চোখের সামনে কিছু পড়ে থাকলে তখনই তখনই কুড়িয়ে নিতে হবে। তা না হলে এই তাড়াহুড়োর মধ্যে এই ভিড়ের মধ্যে সব হারিয়ে যাবে।

ছাড়াছাড়ির আগে অরুণ বললে, কেন জানি না, আপনার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে বেশ ভাল লাগে। এতক্ষণ বসেছিলাম একসঙ্গে, ভীষণ ভাল লাগল।

রুপু একটু লাজুক হয়ে চোখ নামাল।

অরুণ বুঝতে পারল না ওর এই পাগলের উচ্ছ্বাস শুনে রুপু ভিতরে ভিতরে রেগে গেছে কিনা। নাকি মুখ নিচু করে হাসি চাপছে।

ও তাই তাড়াতাড়ি বললে, ওর গলাটা হয়তো অভিমানে ভারী হয়ে গিয়েছিল, বললে, আপত্তি থাকলে অবশ্য...

রুপু কোন কথা বললে না, রুপু অরুণের মুখের দিকে ফিরে তাকাল না, শুধু অস্ফুটে বললে, কাল। এ সময়েই।

বলে বাসের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

ব্যস আর কিছু না। 'কাল। এ সময়েই।'

গলি থেকে দেখা আকাশী রঙের ফিতেটা বিরাট একটা আকাশ হয়ে গেল। সুজিত বলেছিল, আমাদের কোথাও কোন রঙ নেই। সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। অরুণ রঙের মধ্যে ডুবে গেল। মহানিমের গাছটা সুন্দর হয়ে উঠল, চোখ ঠাণ্ডা করার মত আরও সবুজ, আরও সবুজ। ট্রামের আওয়াজটা বেশ মিষ্টি লাগল। দূরে কোথায় দু' দুটো দমকল ছুটে গেল ঘণ্টি বাজিয়ে। শব্দটা যেন ওর শরীরের মধ্যের উত্তেজনার প্রতিধ্বনি হয়ে উঠল। ও নিজেও যেন একটা দমকল হয়ে গেছে, ছুটছে ছুটছে।

অথচ সুজিত আর টিকলু কিছু বুঝতে পারছে না। ওরা ভাবছে, প্রেম একটা ঠাট্টার জিনিস।

আশ্চর্য, অরুণ নিজেও কিছু বোঝাতে পারছে না। বলতে ইচ্ছেও হচ্ছে না। সহজ আর সুন্দর কথাগুলো বলতে ইচ্ছে হয় না। গোপন করতে ইচ্ছে করে। কিংবা সব কথা হয়তো বলা যায় না।

□

সেই সময়ে রুপুর সঙ্গে যদি ওকে দেখতে পেত ছোটমেসো! অরুণ কেয়ারই করত না। ও তখন একদম বেপরোয়া। বাড়ির লোক দেখে দেখবে, কি আছে তাতে।

আসলে রুপুর ভয় ভাঙাতে গিয়েই ও নিজে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল।

—আরে পাগল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বললাম, কি বড়ো জোর চায়ের দোকানে বসলাম, কেউ দেখলে তবু অজুহাত দেয়া যায়। রুপু ওর পাগলামি দেখে হেসেছিল। —পার্কেটার্কে ওসব দিকে দেখলে কি বলব শুনি?

ভয় না দুষ্টুমি, অরুণ বুঝতে পারত না।

অথচ মজা দ্যাখো, রুপুর সঙ্গে তো সিনেমা দেখেছে, কিন্তু কারও চোখে পড়েনি। চোখ

পড়ল কিনা উর্মির সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়ে।

—বেঁচে আছি না বেঁচে আছি, জুতোর মধ্যে বালি ঢুকলে মাইরি হাঁটতে ভাল লাগে? টিকলু একদিন বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে এসে মুখ তেতো করে বলেছিল।

মিথ্যে বলেনি। কিচকিচ কিচকিচ করে লাগছে চামড়ায়, পা ফেলতে গেলেই। সমস্ত বাড়িটার চোখে ও যেন এখন অপরাধী হয়ে গেছে। একটা ক্রিমিন্যাল। বাবা যদি ধমক দিত, মা চেঁচামেচি করত, তাহলে বরং শান্তি ছিল। দুটো কথা বলতে পারত। তা নয়, সব চুপচাপ। যেন কিছুই হয়নি, ছোটমাসী এসে কিছুই শুনিয়ে যায়নি।

আর ঐ দিদিটা। চার বছরের বড়, অথচ ভাব দেখায় ও যেন মা'র সমবয়সী। সব সময় লম্বা লম্বা উপদেশ।

—মা কত দুঃখ করছিল। জ্বর হচ্ছে আবার, মাথায় যন্ত্রণাটা বাড়ছে, তুই একটু খোঁজখবর নিতে তো পারিস।

অরুণেরও ইচ্ছে হয়েছিল জিজ্ঞেস করে মাকে। পাছে মা ভাবে ছোটমেসোর কাছে ধরা পড়েছে বলে ও ফ্ল্যাটারি করতে এসেছে, তাই জিজ্ঞেস করতে পারেনি। কিন্তু দিদির কাছে কথাটা শুনে ক্ষেপে গেল। —যা যা, তোকে আর অ্যাডভাইস দিতে হবে না।

ওর যে জলহস্তী নাম দিয়েছে, একেবারে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। দিনরাত শুধু ঘোঁত ঘোঁত করছে। দিব্যি খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে আর ফুলছে। ঘুমোনোর সময় আবার ঘঙর ঘং করে নাক ডাকায়। চেহারায় কথাবার্তায় কোথাও একটু শ্রীছাঁদ নেই। গেঁয়ো বউ যেন রথের মেলায় চাকি বেলুনি কিনতে এসেছে। রাবিশ। অক্ষয়দা আবার ওকে নাকি দেখতে এসে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল। ভাবলে হাসি পায় অরুণের, অক্ষয়দা ওর মধ্যে কি যে দেখেছিল ঈশ্বর জানেন। কিংবা টাকাটাই দেখেছিল হয়তো, নেহাত কম খসায়নি তো বিয়েতে। কন্যাদায় কিন্তু রয়েই গেছে। অক্ষয়দার বদলির চাকরি, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে বাসাটাসা ঠিক করার আগে দুচার মাস ঠেলে দেবে এখানে। বসার ঘরখানা তখন দিদির এক্তিয়ারে, একটা বন্ধুবান্ধব এলে বসতে বলার উপায় নেই এমন নোংরা করে রাখবে। অবশ্য তার জন্যে বাবাও দায়ী। নিজে তখন মফস্বলে থাকে, কম মাইনে, কলেজ ছিল না, মেয়েকে দূরে পাঠানোয় আপত্তি ছিল। ছোটবেলাতেই ওর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে বাবা।

আর ঐ এক চিজ তৈরি হচ্ছে—মিলু। আদরে আদরে মাথাটি খেয়ে বসে আছে সব। আরে উর্মিকে যা মানায় তোকেও তাই মানাবে নাকি। তুই একটা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। আঠারো বছর বয়েস, স্লিভলেস ব্লাউজ পরছে, পেটের কাছে এক বিঘত বে-আব্রু। সুজিত কিংবা টিকলু এলে ওর নিজেরই লজ্জা করে। ওরা কি বলাবলি করে কে জানে। তবে মিলু দিদির মত যে হয়নি সেও ভাল।

মিলু অবশ্য বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে শিখেছে। মনটাও বেশ খোলামেলা। সব কথা অরুণকে বলে। ফাজিল তো কম নয়।

একদিন ওর কলেজের বন্ধু কটা মেয়ে এসেছিল। টানতে টানতে অরুণকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিল। —আমার দাদা। দাদা কিন্তু, জানিস টুলু, আমার বন্ধু। ওকে আমি স—ব বলি। বলেই মিলু হেসে উঠল।

—সেই কথা বলেছিস? চোখের ঈশারায় টুলু মেয়েটা কি যেন বলল।

আর মিলু হেসে গড়িয়ে পড়ল। —এই দাদা, বলা হয়নি তোকে। আমরা না খুব একটা মজা করেছি সেদিন।

ওদের কাণ্ড দেখে অরুণও হেসে ফেলেছিল। —কি করেছিস?

—দুপুরবেলায় ওদের বাড়ি গিয়ে, কি করি কি করি, টেলিফোন ডিরেক্টরি দেখে না···হেসে গড়িয়ে পড়ল মিলু।

—হেসেই অস্থির। টুলুও হেসে ফেলল, তারপর। —আমি বলছি, আমি বলছি। এক একটা নাম দেখে না আমরা ফোন করি, নাম নম্বর তো সত্যি সত্যি জানাই না, গল্প করি তাদের সঙ্গে। আর নাম ঠিকানা জানার জন্যে, দেখা করার জন্যে সে যে কি আকুল হয়ে পড়ে বুড়ো বুড়ো লোকগুলো···

বোঝো ব্যাপার। তখন ওর বন্ধুদের সামনে না হেসেও পারেনি ও। কিন্তু মিলুর ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে ভিতরে ভিতরে। ওর এসবের মধ্যে থাকার কি দরকার। যত সব নোংরা কাণ্ডকারখানা, যদি কেউ কোনও দিন জানতে পারে।

তবু কড়া করে কিছু বলতেও পারেনি। বাড়িসুদ্ধ সবাই তো অরুণের বিরুদ্ধে। ওকে কেউ বুঝতে চায় না, বুঝতে চেষ্টা করে না। শুধু অভিযোগ আর অভিযোগ। মিলুটাই ওকে একটু একটু বোঝে, ওর জন্যে একটু মায়ামমতা একমাত্র মিলুরই তো আছে। ওকে চটিয়ে রাখলে তো জানতেই পারত না ছোটমাসী এসেছিল, কি সব বলে গেছে ওর সম্পর্কে।

কি বলে গেছে তা বুঝতেই পারছে, কিন্তু তারপর মা-বাবা কিছু আর এ কদিন বলাবলি করেছে কিনা কে জানে।

মিলুকে জিজ্ঞেস করার জন্যেই ওর পড়ার ঘরে ঢুকেছিল অরুণ। কিন্তু ওর পায়ের শব্দ পেয়েই মিলু ঝট্ করে কি লুকিয়ে ফেলল। কিছু লিখছিল বোধ হয়। প্রেমপত্র-টত্র নয় তো?

কাগজটা লুকিয়ে ফেলে মিলু উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে মুখ ঘোরাল। —এই দাদা। একটু চাপা গলায় বললে, তোর গিলোটিন হয়ে গেছে।

—মানে? ভয়ে আঁতকে উঠল অরুণ।

—হেভি দায়িত্ব পড়েছে তোর কাঁধে।

এ বাড়িতে দায়িত্ব ঘাড়ে নেবার জন্যেই অরুণ জন্মেছে। অধিকার নেই এতটুকু, শুধু দায়িত্ব। বাবা মা'র মন জুগিয়ে চল, তাদের হুকুম মেনে চল। নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছে স্পষ্ট করে বলতে পাবে না। আমরা কি বড় হইনি নাকি। যেন কিছুই বুঝি না, সব সময় ওদের ভয়, একটা ফল্‌স্ মেয়ের প্রেমে পড়ে যাব। রুণুর মত একটা মেয়ে এ বাড়িতে এলে বর্তে যাবে। ধোঁয়ায় আর ঝুলে কালো হওয়া দেওয়ালগুলো তখন দেখবে হোয়াইটওয়াস মনে হবে। আরে দূর, হোয়াইটওয়াস আর হবে নাকি। ইলেকট্রিক ওয়্যারিং সব মান্ধাতা আমলের, অনেককাল বদলানো হয়নি, একটু কিছু হলেই ফিউজ হয়ে যায়। কোথায় শর্ট আছে, ফিউজের তার বদলেও লাভ হয় না। ছোটো, শালা ইকেলট্রিকের মিস্ত্রি জোগাড় করতে।

—মিস্ত্রিটিস্ত্রি হলেও কাজ হত রে। সুজিতকে বলেছিল একদিন। —পাঁচবার ডাকলে তবে আসবে, একটা স্ক্রু-ড্রাইভার ঘুরিয়ে দিয়েই ঝটাং করে দুটো টাকা দাও।

—আর কি রোয়াব। টিকলুর রাগ তো আরও বেশি। —তুই রুণুকে নিয়ে এক টাকা পঞ্চাশেই ফ্ল্যাট, ওরা তিন টাকার টিকিট ঝপ্ করে কেটে নেবে।

সুজিত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল, যা বলেছিস। আমরা হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজে মরছি।

চাকরির কথা ছাড়া সুজিতটা আর কিছু যেন বলতে জানে না। শুনলেই অরুণের নিজেকে কেমন অসহায় অসহায় লাগে। মা একদিন বলেছিল, নবীনবাবুর ছেলেটা রত্ন। যেমন ভদ্র, তেমনি ভাল, চাকরিও করছে, সাড়ে পাঁচশো টাকা মাইনে। মা হয়তো এমনিই বলেছিল, কিন্তু শুনে অরুণের ইচ্ছে হয়েছিল হামানদিস্তে দিয়ে নিজেকে থেঁতলে দেয়। সব ব্যাটাই রত্ন, মা যাকে যেখানে দেখে, সবাই ভাল, শুধু অরুণ একাই যেন খারাপ। ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে নিজের ওপর ঘেন্না হয়ে গেছে। হয়তো মার ওপরও।

সুজিতের কথা শুনে সেই রাগটা উপছে পড়ল। কেন, বিনা মাইনের চাকরি তো লেগেই

আছে, বাড়ির ওয়্যারিং বদলাব না—মিস্ত্রি তোয়াজ কর, প্রিমিয়াম দেব দেরিতে, লিফটম্যান থেকে কাউন্টার অবধি স্মাইল দাও।

ইলেকট্রিক ওয়্যারিং-এর জন্যে যত না রাগ, মিস্ত্রিদের তোয়াজ করতে হয় বলে অরুণের রাগ আরও বেশি। পার্টিগুলো আবার ওদেরই মাথায় তুলে নাচে। নাচুক, ন মাসেই তো তোমাদের মেগার টেস্ট হয়ে গেল বাওয়া।

—ঠিক বলেছিস। টিকলু হেসেছিল। —মেগার টেস্টে সব ধরা পড়ে গেছে, লাইন বিলকুল শর্টসার্কিট।

সুজিত আপত্তি করল। —শূলে চড়িয়ে শাস্তি দেবার জন্যে ডেকেছিলাম, তার আবার জাত জেনে কি হবে।

চুলোয় যাক্ পলিটিক্স, ওসব নিয়ে অরুণের মাথাব্যথা নেই। আসলে ঝুটঝামেলা ওর ভাল লাগে না। বাবাকে কতবার বলেছে, ওয়্যারিং বদলে নিতে। তা নয়, বাবার সেই এক কথা। —ভাড়াটে বাড়ি, আজ আছি কাল নেই, কি হবে ওসব করে।

বাড়ি—বাড়ি, তার আবার ভাড়াটে না পৈতৃক। দেখতাম যদি জমিটমি কিনে একটা কিছু ব্যবস্থা করছ, বুঝতাম। থাকব তো আমরাই, একটু নিশ্চিন্তে ভালভাবে থাকলে দোষ কি। মাও তেমনি। ক'টা পর্দা কেনার কথা বলেছিল অরুণ, বললে কিনা, এ বাড়িতে এত সাহেবিয়ানা করে কি হবে। বাল্বগুলো কেমন ন্যাংটো ন্যাংটো লাগত, ক'টা শেড্ কেনার কথা হল, 'পরের বাড়িতে ওসব করে কি লাভ।'

সমস্ত গা রি রি করে ওঠে রাগে।

অসহায় ক্রোধে কান্না পেয়েছিল অরুণের। —জানিস মিলু, ওরা বাঁচতে জানে না। আরে এখনই যদি ভালভাবে না বাঁচলাম, বুড়ো হয়ে একটা বাড়ি সাজিয়ে জানালা দরজার ধুলো ঝেড়ে কি লাভ বল।

মিলু ওর কথায় সায় দিয়েছিল। —রিয়েলি। ওরা তো শুধু প্যাণ্ডোরাজ বক্স খুলছে। কি পাবে শেষ অবধি ? হোপ। তার চেয়ে এখনই যদি একটু একটু কিছু পাই, মন্দ কি।

অরুণের তাই মনে হয়। একটু একটু যদি পাই। টুকরো টুকরো করে যদি পাই। যেটুকু পেলাম সেটুকুই তো তৃপ্তি। রুণুকে তো ও একটু একটু পাচ্ছে, এখনই পাচ্ছে।

কিন্তু তবু কোথায় যেন একটু অতৃপ্তি থেকে যায়।

রুণুর কথাগুলো মনে পড়ে গেল মিলুর কাছ থেকে দায়িত্বের আভাস পেয়েই।

রুণুর ঐ এক অদ্ভুত স্বভাব। দেখা করতে আসবে, কিন্তু এসে দুদণ্ড কোথায় নিরিবিলিতে বসে গল্প করবে, তা না, কেবলই হাতের ঘড়িতে সময় দেখবে। ও যেন অরুণের কাছে আসে, চলে যাবার জন্যেই।

—ঘড়িটাই দেখছি আমার রাইভ্যাল। অরুণ হেসে বলেছিল, আমার দিকে একবারও তাকাও না, ওর মুখের দিকে মিনিটে মিনিটে।

রুণু হেসে ফেলেছিল। —ঈস্, কি রাগ রে। আমার বুঝি বাড়িঘর নেই, ফিরতে হবে না ?

অরুণ কি আর করবে, একটু অভিমান দেখিয়েছিল। আর রুণু চোখের পাতায় কি এক সহানুভূতির স্নিগ্ধ ছায়া ছড়িয়ে বলেছিল, এই শোনো। পরশুদিন আমি অনেকক্ষণ থাকব, দেখো, অনেকক্ষণ থাকব।

সেই পরশুদিনের উজ্জ্বল সন্ধ্যাটাকে মা এভাবে পুরোন ছেঁড়া পর্দাকে বিদেয় করার মত এক টানে ছিঁড়ে ফেলে দেবে, অরুণ ভাবতেও পারেনি।

মিলুর কাছে সব খবর শুনে ভিতরে ভিতরে ও রাগে গরগর করছিল। ঠিক যে মুহূর্তে ওর জীবনের একটা দিন স্মরণীয় হয়ে উঠতে চাইছিল, সেই সময়েই কি বাধা না পড়লে

চলত না। দিদিটা একটা ন্যুইসেন্স। একটা ন্যুইসেন্স। যেন পাঁচ দিন পরে গেলে চলবে না।

'হেভি দায়িত্ব' কথাটায় রাগের মধ্যেও হেসে ফেললে অরুণ। জলহস্তীকে কাঁধে নিয়ে যেতে হবে, হেভিই তো।

নিজের ঘরে ঢুকে ও সবে প্যান্ট ছেড়ে পাজামায় পা গলিয়েছে, মা এসে হাসি হাসি মুখে দাঁড়াল। মার হাসি দেখে কিন্তু সারা শরীর জ্বলে উঠল অরুণের।

সেদিকে না তাকিয়েও অরুণ লক্ষ করল মা কপাল টিপছে বাঁ-হাত দিয়ে। অন্য সময় ও হয়তো বলত, তোমার মাথার যন্ত্রণাটা আবার বেড়েছে নাকি ? চলো তা হলে একদিন পি জি-তে—

কিন্তু না, সেরকম কিছু বলতে ইচ্ছে হল না।

মা একটু অপেক্ষা করেই বললে, তোকে তো পরশু পাটনা যেতে হচ্ছে।

—কেন ? সব জেনেও অরুণ প্রায় ক্ষ্যাপা কুকুরের মত খেঁকিয়ে উঠল।

মা বললে, অক্ষয় ছুটি পায়নি, লিখেছে তোর সঙ্গে বুলুকে পাঠিয়ে দিতে। ও না গেলে···

—আমি পারব না।

—সে কি রে ! তুই ওকে না নিয়ে গেলে ও যাবে কার সঙ্গে ? মার গলার স্বরে যেন অনুনয় ঢলে পড়ল।

অরুণ বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, আমি পারব না, পারব না, পারব না। আমার কোথাও যাওয়া চলবে না।

মা থমকে চুপ করে রইল বেশ কিছুক্ষণ। অবাক হয়ে তাকাল অরুণের মুখের দিকে। তারপর একটু একটু করে তিক্ত-বিরক্ত একটা ভাব ফুটে উঠল মুখে।

অরুণ যতখানি চেঁচিয়ে বলেছিল কথাগুলো, তার চেয়েও জোরে চিৎকার করে উঠল মা। —আমি জানতাম, তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না। তুই একেবারে গোল্লায় গেছিস, একেবারে গোল্লায় গেছিস।

অরুণের কান্না পেল। উর্মির সঙ্গে একদিন সিনেমা দেখতে গিয়েছে বলে ও একেবারে গোল্লায় গেছে ! স্পষ্ট করে তা বললেও তো পারত মা, ও তা হলে জবাব দিতে পারত একটা।

□

অক্ষয়কে নিয়ে এই এক ফ্যাসাদ। বদলির চাকরি তার, আজ এখানে কাল সেখানে। হুটপাট করে চলে যেতে হয় নতুন জায়গায়. যদ্দিন না বাসা জোগাড় হচ্ছে বুলুকে এখানেই পাঠিয়ে দেয়। কিংবা বুলু নিজেই হয়তো শ্বশুরবাড়িতে থাকতে চায় না।

কনকলতা অবশ্য খুশী হন। তবু তো বড় মেয়ে মাঝে মাঝে এসে থাকতে পায় তাঁর কাছে। শুধু পরের ঘরে চলে গেছে বলেই এই অতিরিক্ত আদর নয়। কনকলতা দেখেছেন, তেমন ভাল বিয়ে দিতে না পারা সত্ত্বেও বুলুর কোন অভিযোগ নেই। বরং বাবা-মার ওপর একা বুলুরই খুব মায়া।

দিনকে দিন কনকলতার শরীর আরও খারাপ হচ্ছে। মাথায় একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা হয়, সন্ধের দিকে একটু জ্বর-জ্বর। কাজকর্ম করেন বটে, রান্নাও নিজেই সামলান, কিন্তু বড়ো ক্লান্ত লাগে। ছেলেকে দোষ দিয়ে কি হবে, স্বামীও অর্ধেক সময় খবর নেয় না।

—রোগ চেপে রাখা তোমার স্বভাব। প্রকাশবাবু একদিন বলেছিলেন .

কনকলতা কোন উত্তর দেননি। অভিমানে চোখে জল এসে গিয়েছিল। রোগ চেপে রাখা তোমার স্বভাব। চেপে না রেখে কি করবেন, পাঁচ বছরের পোষা রোগ। প্রথম প্রথম তো ভেবেছিলেন চোখ খারাপ হয়েছে। চোখের ডাক্তারকে দেখানোও হয়েছিল। ওষুধপত্তরও খেয়ে দেখেছেন। কিছুতেই কিছু হয়নি। এর পর আর কি করবেন, প্রতিদিন শুধু নিজের রোগের কথা. বলবেন ? মানুষটা খেটেখুটে আসে, পাঁচরকম ঝঞ্ঝাট রয়েছে, তাকে দু বেলা নিজের শরীরের কথা শোনাতে ভাল লাগে ! না, তারই শুনতে ভাল লাগবে। ইচ্ছে থাকলে নিজেই তো বড় ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করত। বলতে হবে কেন।

বরং বুলুই মাঝে মাঝে বলেছে অরুণকে। —হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে একবার দেখিয়ে আন না মাকে।

বুলু যে-কদিন থাকে, কনকলতার কাজকর্ম আদ্দেক কেড়ে নেয়। অনেক রাত্তির অবধি বসে বসে মাথা টিপে দেয়। দুপুরে মাদুর বিছিয়ে পাশে শুয়ে গল্প করে। বুলু না থাকলে তো কনকলতার নিজেকে মনে হয় সংসারের বাইরের লোক।

ঝামেলা শুধু বুলুকে পাঠানো নিয়ে। কখনও কখনও অক্ষয় নিজেই এসে নিয়ে যায়, বাসা ঠিক হলেই। পুরোন বাসা থেকে মালপত্র নিয়ে নতুন জায়গায় নতুন বাসায় আবার সাজিয়ে-গুছিয়ে বসতে হয়। তখন বুলুর না গেলেও চলে না।

চিঠি পড়ে প্রকাশবাবু বলেছিলেন, তাহলে অরুণই ওকে নিয়ে যাক্। পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখন তবু কাজ নেই। এরপর ইন্টারভিউ-টিন্টারভিউ যদি এসে পড়ে···

কনকলতা সেজন্যেই বলতে গিয়েছিলেন অরুণকে। দু-পাঁচদিন পরে পাঠানোর ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অক্ষয় একেবারে দিনক্ষণ লিখে দিয়েছে, স্টেশনে থাকবে জানিয়েছে। তাছাড়া জামাইকে একটু ভয়ও পান কনকলতা, যা রগচটা মানুষ !

রাগে গরগর করতে করতে ফিরে এলেন কনকলতা। —ছেলে তোমার জবাব দিয়ে দিয়েছে, যেতে পারবে না।

বুলু প্রকাশবাবুর কাছে বসেছিল। বললে, আমি জানতাম। আমাকে নিয়ে যেতে ওর যে লজ্জা করে, আমি তো আজকালকার মত ফ্যাশনদার নই।

প্রকাশবাবু কথাটায় একটু খোঁচা খেলেন। ভাবলেন, বড় মেয়েকে মফস্বলে মানুষ করেছেন, লেখাপড়া বেশি দূর করাতে পারেননি, তাই বোধ হয় বুলুর একটু বাপের বিরুদ্ধে অনুযোগ আছে। তাই তার কথাটা কানে না তুলেই বললেন, কেন, যেতে পারবে না কেন ?

—তুমিই জিজ্ঞেস করে দ্যাখো। বলে মাথার অসহ্য যন্ত্রণায় তক্তপোশের এক ধারে গিয়ে শুয়ে পড়লেন কনকলতা।

প্রকাশবাবু ডাকলেন, অরুণ !

অরুণ আসতেই বললেন, পরশুদিন বুলুকে পাটনায় পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। অক্ষয় ছুটি পাবে না এখন।

অরুণ মাথা নিচু করে বললে, দেখি।

বলেই সরে এল তাঁর সামনে থেকে।

মুখে যদিও বলল 'দেখি', তবু মনে মনে বুঝতে পারল এখন আর বাবার কথার নড়চড় করার উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে যদি একটা অজুহাত দিতে পারত তাহলেও কথা ছিল।

অরুণের নিজেকে বড়ো অসহায় লাগল। অক্ষম রাগে নিজের দাঁত দিয়ে নিজেকে কামড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে ইচ্ছে হল।

'অনেকক্ষণ থাকব, অনেকক্ষণ থাকব'। সেই মুহূর্তে অরুণ অহঙ্কারে টালার ট্যাঙ্কের মত

উঁচু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরের দিন সকাল থেকেই একটা দুশ্চিন্তা ওর ঘাড়ে চেপে রইল। রুণুকে খবর দেওয়ারও উপায় নেই। ও আসবে, অপেক্ষা করবে, তারপর ফিরে যাবে। হয়তো ভুল বুঝবে, আর কোনদিনই দেখা করবে না অরুণের সঙ্গে। হয়তো ভাববে, অরুণ ঐ সুজিত আর টিকলুর মতই হাল্কা ধরনের ছেলে।

রুণুর ঠিকানা একবারই শুনেছিল ও, মনেও আছে। কিন্তু রুণুদের বাড়িটা কেমন? উর্মিদের মত কি? তাও জানে না অরুণ। জানলে একটা চিঠি অন্তত দিতে পারত।

অরুণের একবার মনে হল, টিকলুকে বলবে। ও তো সেই সময়ে দেখা করে বলতে পারে অরুণ কেন যেতে পারেনি। কিন্তু না, মন চাইল না।

টিকলু একদিন ইয়ার্কি করে বলেছিল, দু' একদিন প্রক্সি দিতে দে না মাইরি।

সুজিত হেসে বলেছিল, তা না দিস্, সঙ্গে নিয়ে যেতে তো পারিস।

অরুণ তবু এড়িয়ে গেছে।

ওদের ঐ ধরনের সস্তা ইয়ার্কি ওর ভাল লাগে না। ও চায় না রুণুকে নিয়ে কেউ কোন আলোচনা করে। রুণুকে ও ভালবেসে ফেলেছে, দারুণ ভালবেসে ফেলেছে। অরুণ তাই ওদের ইতর ঠাট্টাগুলো এখন সহ্য করতে পারে না।

—বিরামের ট্রেনিং পাওয়া মেয়ে, ঘাবড়াস না অরুণ, তুই এগিয়ে যা। টিকলু একদিন বলেছিল।

শুনে ঠাস করে একটা চড় মারতে ইচ্ছে হয়েছিল ওর। খারাপ খারাপ, সব মেয়ে খারাপ তোদের কাছে। কোন ছেলের সঙ্গে আলাপ থাকলেই, কিংবা কারও সঙ্গে দেখা গেলেই সে মেয়ে খারাপ।·· বিয়ের সময় তো সব মডার্ন মেয়ে চাইবি, তখন আর খারাপ নয়।

কে জানে, হয়তো ভিতরে ভিতরে রুণুর সম্পর্কে একটু অবিশ্বাসও আছে। মেয়েদের মন পাখির মত, এক ডাল থেকে আরেক ডালে যেতে কতক্ষণ। বিরাম না হোক, অন্য কেউ। অরুণেব সব সময় ভয় হয়, রুণুকে না অন্য কাবও সঙ্গে দেখে ফেলে টিকলু আর সুজিত। না, ও হিংসেয় জ্বলবে না। রুণুকে ও জেনেছে। কিন্তু ওদের কাছে ছোট হয়ে যাবে যে।

—দাদাবাবু, কে এক ভদ্দরনোক এয়েছে, সঙ্গে মেয়েছেলে। সোনার মা হাজা-ধরা ভিজে হাত তার নোংরা শাড়িতে মুছতে মুছতে এসে বললে।

কে আবার এল। ইস্কুলের বন্ধু সেই রণ্টু নাকি। হয়তো বউ নিয়ে এসেছে। এর আগেও একদিন এসেছিল। শালা গোঁফ ওঠার আগে বিয়ে করে মোটা টাকা পেয়েছিল, দিব্যি ব্যবসা করছে পণের টাকায়। টাকা পিটছে তো, কথায় কথায় ব্যাটা অ্যাডভাইস দেয়।

হাওয়াই চটিটা খুঁজল অরুণ, ঘরমোছার সময় কোথায় যে সরিয়ে রাখে সোনার মা! খুঁজে না পেলে এক একদিন ও চিৎকার করে ওঠে রাগে।

পায়ে চটি গলিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। তারই মধ্যে ভেবে নিল কোথায় বসতে দেবে ওদের। জলহস্তী তো বাড়তি ঘরখানা বাজেযাপ্ত করে বসে আছে। ও গেলেই বাঁচি। কিন্তু সুখে-স্বচ্ছন্দে যাবে নাকি, যাবার আগে একটু ট্রাব্‌ল্ না দিয়ে যাবে না।

—ঐ যে ভূত ছাড়ার আগে বলে না? গাছের ডাল ভেঙে দিয়ে যাবে। অরুণ একবার হাসতে হাসতে মিলুকে বলেছিল।

—যাঃ, দাদা, তুই কি রে। মিলুও হেসে ফেলেছিল। —আফটার অল দিদি তো।

তা ঠিক। ওরও তো বাপ-মা। তবু, বিয়ে হয়েছে বলেই কেন যে ওকে বাইরের লোক মনে হয়। বাঃ রে, তা কেন। দিদির খটখটে কথাবার্তা, গেঁয়ো গেঁয়ো স্বভাবের জন্যেই অসহ্য লাগে। ও যদি মিলুর মত হত, ভীষণ ভালবাসত ও দিদিকে। কিংবা দিদি যদি ওকে ভালবাসত। বোগাস্। বাবা মা'ই ভালবাসে না তো দিদি।

মিলুর পড়ার ঘরে একবার উঁকি দিল। যাচ্চলে, বুড়ো মাস্টারটা পড়াচ্ছে মিলুকে। বি-এ

পড়ছিস, এখনও মাস্টার।

বাইরের দরজার কাছে এসেই কিন্তু চমকে উঠল অরুণ।

—একি, তোরা ? ভাবতেই পারিনি।

বিরাম আর নন্দিনীকে দেখে তাই চমকে উঠল। বোঝো এখন, মা তো জিজ্ঞেস করবে, কারা এসেছিল রে! কি বলবে ? বিরামের লাভার ? ওর একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে।

—কি খবর ? চল্ চল্। বলে বেরিয়ে পড়ল অরুণ। কয়েক পা এগিয়ে গেল, ওরা পিছনে পিছনে আসছে কি না-আসছে না দেখেই। বাড়ির কাছ থেকে সরে পড়তে পারলে বাঁচে।

বিরাম আর নন্দিনী ভেবেছিল, ঘরে বসতে বলবে অরুণ। বাইরে এত মডার্ন, ঊর্মির সঙ্গে হইহুল্লোড় করে, তার বাড়িতে আসা যে বোকামি তা জানবে কি করে।

নন্দিনী বিশেষ করে প্রথম একটু অপ্রতিভ হয়েছিল।

গলির মোড় পার হয়ে এসে তবে মুখ খুলল অরুণ। —হঠাৎ এলি যে! চল একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসি।

আর কোথায় যাবে, চায়ের দোকানই তো এখন ড্রইং-রুম। বারান্দায় যদি বা বসার জায়গা থাকে তো প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না। টিকলু ঠিকই বলে, পালিশ দিয়ে দিয়ে কথা সত্যি পোশায় না।

চায়ের দোকানে ঢুকতে ঢুকতে বিরাম বললে, চল্ কথা আছে।

গলার স্বর বা বলার ধরনটা এমনই যে অরুণ ঘাবড়ে গেল। রুণুর ব্যাপার নিয়ে নয় তো। চার্জ করতে আসেনি তো। হয়তো বলবে, তুই এত ছোটলোক অরুণ। হয়তো বলবে, রুণু আমার নিজের বোনের মত।

অরুণের বুক দুরুদুরু করছিল।

একটা কেবিনে ঢুকে পর্দা টেনে দিয়ে বসল অরুণ। —বল্।

বলে নন্দিনীর মুখের দিকে এতক্ষণে তাকাল। নন্দিনীর মুখেচোখে এমন একটা থমথমে ভাব ছিল যে, দেখেই অরুণের মনে হল সাংঘাতিক কিছু!

বিরাম অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, নন্দিনী বাড়ি থেকে চলে এসেছে।

—সে কি!

একটা আতঙ্ক সরে গিয়ে আরেকটা আতঙ্ক ওর বুকে চেপে বসল।

বিরাম আবার বললে, ফিরবে না বলছে। দুচারদিন ওর থাকার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

অরুণ যাকে বলে স্তম্ভিত। বিরামটা ভেবেছে কি ? ওর বাড়িতে এসে রাখবে নন্দিনীকে এই তালে ছিল! পাগল নাকি! কিন্তু ওকে সাফ সাফ তো বলাও যাবে না। চটে গেলে, রুণু কি আর কিছু না বলেছে নন্দিনীকে, বাড়িতে বাবা-মাকে জানিয়ে দিতে পারে। তা অবশ্য করবে না, কিন্তু রেগে গিয়ে রুণুর কাছে ভাংচি দিতে কতক্ষণ। অরুণ একটা যাচ্ছেতাই, মদ খায়, ওসব জায়গায় যায়-টায়, কিংবা আরও অনেক মেয়ের সঙ্গে—। ঊর্মিকেই হয়তো ওর সঙ্গে লেপটে দিল।

সমস্ত দায়িত্ব ওর ঘাড়ে এসে পড়তে পারে যেন। নন্দিনীকে হেসে মিষ্টি করে ও বললে, কেন পাগলামি করছেন, বাড়ি ফিরে যান।

নন্দিনী এতক্ষণ হয়তো ভেবেছিল অরুণের কাছে কোন ভরসা পাবে।

—আপনাদের কাছে আমি উপদেশ চাই না। ও বাড়িতে আমি আর ফিরব না।

বিরাম চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ বললে, তুই জানিস না অরুণ, ওর দাদা ওকে—

কথা শেষ না করে নন্দিনীর মুখের দিকে তাকাল বিরাম। বোধ হয় বলবে কিনা জানতে চাইল।

নন্দিনীর চোখের তারায় একটা ফণা তোলা সাপের ছায়া দেখল অরুণ। সঙ্গে সঙ্গে নন্দিনীর দু'চোখ জলে ভরে গেল। —দেখবেন ? এই দেখুন। এক ঝটকায় শাড়ির প্রান্তটুকু কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল॥ স্লিভলেস ব্লাউজের নীচে ফর্সা ধবধবে হাতে কয়েকটা ছড়ে যাওয়া কালসিটে পড়া দাগ দেখতে পেল অরুণ, দেখতে পেয়ে শিউরে উঠল।

—আমাকে জুতোয় করে মেরেছে দাদা। তবু আমাকে ফিরে যেতে বলেন ?

এতক্ষণ অরুণ ভাবছিল, যত বাজে ফ্যাসাদ, কাটাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু হঠাৎ ওর মনের মধ্যে, শরীরের মধ্যে কি এক ধরনের উত্তেজনা এল। মনে হল কিছু একটা করতেই হবে।

বিরাম দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেকেই যেন বললে, প্রবলেম ! কি করি বল তো।

—আমি তো কারও সমস্যা হতে চাই না। নন্দিনীব গলায় ঝাঁঝ দেখা দিল। অরুণের মনে হল ঝাঁঝটার মধ্যে প্রচণ্ড অভিমান বযেছে।

বিরাম দমে গেল। অপ্রতিভভাবে বললে, না না, সে-কথা বলছি না।

ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনার কথা বলল বিরাম। —আমাদের মেলামেশার কথা ওর দাদা বোধ হয় টের পেয়েছিল, কথায় কথায় শাসন করত নন্দিনীকে, তাড়াতাড়ি ফিরতে বলত। কাল রাত্রে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল···সকালে উঠেই ওদের কথা কাটাকাটি হতে হতে···

—আমিও ছাড়িনি, যা মুখে এসেছে বলেছি। নন্দিনী বেপরোয়াভাবে বললে।

অরুণ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। কোন একটা উপায় ভেবে বের করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, আমি বলি কি, ফিরেই যান। ধরুন পুলিস কেসটেস যদি করে···

—আমি নাবালিকা নই। নন্দিনী ব্যাগ খুলে দেখাল। —সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছি।

তারপর হঠাৎ চুপ করে গিয়ে বললে, কিছু না পারি মরতে তো পারব।

অরুণ এবার আরও ভয় পেল। সেটাকে লুকোবার জন্যে সশব্দে হেসে উঠে বললে, কি আজেবাজে ভাবছেন।

বিরামকে দেখে মনে হল ও ভাবনায় ভেঙে পড়েছে। —সক্কালবেলাতেই জানিস অরুণ, হেঁটে হেঁটে আমার বাড়ি চলে এসেছে। কতখানি অপমানিত হলে···

—বাড়িতে ? কথার পিঠে কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ল। 'মেয়েটা কে রে ! ছেলেটা তোর সেই কলেজের বন্ধু না ? কেন এসেছিল ?' শালার ঝঞ্ঝাট কি একটা। রুণু আবার কোনদিন এমনি একটা কাণ্ড করে বসবে না তো। ধুত্তোর, ওসব প্রেমট্রেম করে কাজ নেই। বেফিকির ঝামেলা বাড়ানো।

—একটা হোটেল-টোটেলে বরং···অরুণ কিছু একটা বলার জন্যেই যেন বললে।

—না না, ওসব জায়গায় আমার ভয় করে। নন্দিনী বলে উঠল।

আর বিরাম উপুড় করা হাত উল্টে দিয়ে বললে, টাকা কোথায় ?

অরুণ হাতের ঘড়িটা দেখল। সিটি অফিস থেকে ট্রেনের টিকিট কেটে রাখতে হবে কালকের। দিদিকে পাটনা নিয়ে যেতে হবে। অথচ এদিকে সমস্যার কোন সুরাহা হচ্ছে না।

অরুণ চায়ের কাপটা সরিয়ে দিয়ে হিসেব করে পয়সা নামিয়ে রেখে উঠে পড়ল। —চল্ টিকলুকে ডাকি। ওর এসব ব্যাপারে মাথা খুব সাফ।

টিকলু দাঁতে টুথব্রাশ ঘসতে ঘসতে বেরিয়ে এল। খালি গা, পায়জামার দড়িটা হাঁটু অবধি দুলছে।

অরুণ চুম্বকে কাহিনীটুকু শুনিয়ে বললে, মোড়ের মাথায় ওরা দাঁড়িয়ে আছে, চট্ করে

জামাটা গায়ে দিয়ে আয়।

এতক্ষণ তিন মাথা এক হয়েছিল, এবার চার মাথা এক হল।

সব শুনে টিকলু হেসে উঠল। যেন ইয়ার্কি-ঠাট্টার ব্যাপার। হাসতে হাসতে বললে, এই কথা। দারোগাবাবু ডিম খাবে, আমাকে সেজন্যে মুরগী পুষতে হবে!

স্টুপিড। অরুণের সারা শরীর জ্বলে উঠল। একটু আগে নন্দিনীর দু'চোখ জলে ভেসে উঠেছিল, মনে পড়ল। 'কিছু না পারি মরতে তো পারব', কথাটা কানে বাজল।

—টিকলু, এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার। অরুণ বললে।

আর টিকলু হেসে উঠে বললে, আরে দুর,এ তো সোডার মত সিম্পল। সই মেরে বিয়ে কর, সিঁদুর কিনে আন দু আনার, সিঁথিতে দিয়ে বাড়ি চলে যা। গিয়ে বল্, মা তোমার জন্যে দাসী আনলাম।

ঊর্মির কাছে কথাগুলো রিপিট করল টিকলু, আর ঊর্মি হাসিতে ফেটে পড়ল। তারপর ব্যাগ খুলল চুরুর্র্ চুরুর্র্। জিপ-ফাসনার খুলে একটা পাঁচ পয়সা বের করে টিকলুকে দিল। কেউ একটা চটকদার মজার কথা বললেই পাঁচ পয়সা প্রাইজ দেওয়ার রীতি ওদের।

টিকলু বললে, পাঁচ পয়সায় হবে না জি-এফ, বেশি ছাড়তে হবে।

জি-এফ, অর্থাৎ গার্ল ফ্রেন্ড।

শেষ অবধি টিকলু সুধাদের বাড়িতে নন্দিনীর দিনকয়েক থাকার ব্যবস্থা করল। কিন্তু।

—বিয়ে না করলে মাইরি ওসব হুজ্জোত পোয়াতে রাজি হচ্ছে না।

বিরাম বললে, বাঃ বিয়ে তো আমরা করবই। কিন্তু দুচারদিন…মানে রেজেস্ট্রি করতে হলে নোটিশ লাগবে, টাকা লাগবে।

টিকলু হেসে বললে, নোটিশ? ও-ও শালা টাকা।

বলে পকেট থেকে প্রেসের একটা বিল্ বের করলে। তাগাদায় যাবার জন্যে বাবার কাছ থেকে নিয়েছিল। আদায় করতে পারলে দু-পাঁচ টাকা মেরে দেবে ভেবে রেখেছিল।

পারল না আদায় করতে।

শেষে ঊর্মিকে ফোন করল পোস্ট-আপিস থেকে। —জরুরী দরকার, চলে আয় কফি হাউসে।

সুজিত বললে, ঊর্মি নিশ্চয় টাকা জোগাড় করতে পারবে।

টিকলু বললে, কাল বিল্-এর টাকা শালা কিছু না দিলে, ওরই একদিন কি আমারই একদিন। কাল পরশুর মধ্যে বিয়েটা দিয়ে দিতে হবে।

সারাদিন ওদের ছোটাছুটি আর আতঙ্কের মধ্যে কাটল। এদিকে পুলিসের ভয়, কে জানে থানায় নন্দিনীর দাদা ডায়েরি করেছে কিনা।

অরুণ আর টিকলু যখন নন্দিনীকে রেখে এল সুধাদের বাড়িতে, তখন অরুণের মনে হল সারাদিনের অনিশ্চিত ছোটাছুটি আর সারাজীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভেবে নন্দিনী কেমন যেন হয়ে গেছে। ওর চোখ যেন কিছু দেখছে না, ওর মন কিচ্ছু ভাবছে না। বোকা বোকা দেখাচ্ছিল নন্দিনীকে, চিন্তাভাবনাহীন জড়পদার্থের মত।

দেখে অরুণের ভীষণ কষ্ট হল, মায়া হল। আহা বেচারী।

অরুণের মনে হল, একটা দিনের ঝড়ে তেজী মেয়েটা নিস্তেজ হয়ে গেছে একেবারে। অরুণের মনে হল যে-জন্যে এত কাণ্ড, মেয়েটার মধ্যে সেই প্রেম মরে গেছে, একেবারে মরে গেছে।

ফিরে আসার পথে টিকলু বলল, বিরামটা মাইরি লাকি, দিব্যি সাপটেছে। আমার, সত্যি বলছি, তাকিয়ে লোভ হচ্ছিল।

—তুই কি বল তো? বিরক্তি আর ঘৃণায় অরুণ বললে।

কিন্তু একা বাড়ি ফিরতে ফিরতে হঠাৎ ওর চোখের সামনে সকালে দেখা নন্দিনীর শরীরটা ঈষৎ লোভ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। সেই শাড়ি সরিয়ে নন্দিনী যখন বাহুর কালসিটের দাগ দেখিয়েছিল, স্লিভলেস ব্লাউজের আঁটসাঁট শরীর, উন্মুক্ত ফর্সা মসৃণ হাত, গলার নীচের অনেকখানি মুক্তাঙ্গন, সমস্ত জুড়ে একটা অদ্ভুত ভাল লাগা লোভ অরুণের মনেও উঁকি দিল। এতক্ষণে।

কারণ এখন আর সেই সমস্যাটা সিন্দবাদের বুড়োটার মত ঘাড়ের ওপর চেপে বসে নেই।

□

গলির মুখেই একটা ছেলেদের ইস্কুল। দাদের মত গোল দঙ্গল পাকিয়ে বখাটে ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে থাকে পকেটে হাত গুঁজে। রাস্তা দিয়ে মেয়েদের যাওয়ার উপায় নেই। রুণুর ছোটভাইটা বেঁচে থাকলে ওদেরই মত বয়েস হত। দোষ করলে রুণু নিশ্চয় তাকে শাসন করত। কিন্তু এদের কি শাসন করার মত কেউ নেই?

বছর বছর ফেল মেরে দু-চারটে ছেলের বেশ বয়েস হয়ে গেছে। কামানো গালে শিরীষ কাগজের মত কড়া দাড়ি। ছোটগুলোকে ওরাই নষ্ট করছে। মেয়েদের দেখে শিস্ দেয়, টিপ্পনী কাটে, অভব্য অঙ্গভঙ্গি করে। পাড়ার লোক হেডমাস্টারের কাছে অভিযোগ করেছে, ফল হয়নি। হবে কি করে, মাস্টারদের আবার নিজেদের মধ্যে দলাদলি, ক্লিক বজায় রাখতে গিয়ে ছেলেগুলোকে কাজে লাগায়। যেতে আসতে কখনও মুখোমুখি পড়লে, রুণু দেখেছে, দু-চারজন মাস্টারের তাকানোটা বেশ খারাপ।

ছেলেগুলো পাজির পা-ঝাড়া।

একবার একটা কালোকুলো ভিখিরির বাচ্চাকে লেলিয়ে দিয়েছিল। যা না, মা যাচ্ছে, জড়িয়ে ধর গিয়ে।

বাচ্চাটা সত্যি এসে হাঁটু জড়িয়ে ধরেছিল নোংরা হাতে, 'মা' 'মা' বলে ভিক্ষে চেয়েছিল। কি অস্বস্তি, কি অস্বস্তি।

ইস্কুলের ওই বখাটে ছেলেগুলোকে ধরে চাবকাতে ইচ্ছে হয়।

দ্রুতপায়ে ঐটুকু পার হয়ে এসে রুণু একবার ভাবলে, নন্দিনীর কোন খবর পাওয়া গেছে কিনা খোঁজ নিয়ে যাবে। না, থাক্। খবর পেলে পরমদা নিজেই বলে যাবে নিশ্চয়।

আশ্চর্য ব্যাপার। নন্দিনী ওর এত বন্ধু, রুণুর কাছে খুব কম কথাই চেপে রাখত, অথচ ও হঠাৎ এভাবে যে চলে গেল, একটা খবর পর্যন্ত দিল না রুণুকে?

মামীমার কাছে মুখ দেখাতেও লজ্জা করছে কাল থেকে। জলজ্যান্ত একটা মেয়ে বাড়ি থেকে চলে গেলি? মামীমা কি ভাবছেন কে জানে। নিশ্চয় রুণুকেও খারাপ ভাবছেন। 'তোমারই তো বন্ধু।' সত্যি, নন্দিনীর জন্য লজ্জাও হচ্ছে, নন্দিনীর ওপর রাগও হচ্ছে। আচ্ছা, নন্দিনী রাগের মাথায় কিছু একটা করে বসবে না তো? আত্মহত্যা-টত্যা?

পরমদা মামাবাবুর সঙ্গে কাল অনেকক্ষণ আলোচনা করেছিলেন নন্দিনী সম্পর্কে।

হতাশায় দুঃখে বলেছিলেন, তোমাকেও একটা কিছু জানিয়ে গেল না রুণু? নাকি জান, বলতে বারণ করে গেছে।

দুঃখের মধ্যেও এ এক জ্বালা। সবাই হয়তো ভাবছে রুণু সব জানে। এত বন্ধু যখন, কিছু কি আর না বলে গেছে। আর নন্দিনীই বা কেমন মেয়ে। মা বাপ মারা যাওয়ার পর থেকে মানুষ করেছেন, নিজের দাদা, তুই দোষ করেছিস বকুনি দিয়েছেন। তার জন্যে সব ছেড়ে চলে যাবি!

—দোষ আমারই। পরমদা মামাবাবুকে বলেছিলেন, রুণু শুনেছে। বলছিলেন, বড় হয়েছে, কখন কি হয়, কখন কি করে বসে, ভয় হয় না ? বলুন ? তারপর মেয়েদের মত চোখ মুছতে মুছতে বললেন, প্রায়ই দেরি করে ফিরছিল, বকাঝকা করতাম। পাঁচ ঝঞ্ঝাট লেগেই আছে, সকালে উঠেই ওর বউদি বললে, কাল রাত নটায় ফিরেছে। মেজাজ ঠিক রইল না, গালাগালি দিয়ে ফেললাম।

রুণুর একবার মনে হল পরমদা কিছু অন্যায় করেননি। আবার ভাবলে, শুধু বকুনি দিলেন আর নন্দিনী রেগে চলে গেল ! তাও কি হয়। পরমদা ঠিক কি বলেছেন, কি করেছেন তা হয়তো এখন আর বলতে পারছেন না। গালাগালি দিয়েছেন মানে ? নোংরা কিছু ? ছি ছি।

কিন্তু বিরামের কথাটা বলবে কিনা রুণু ভেবে ঠিক করতে পারল না। এখন যদি ও বলে বিরামের সঙ্গে নন্দিনীর সম্পর্কটা ও জানত, তা হলে মামাবাবু মামীমাও ছি ছি করবে। ভাববে রুণুও ওর মতই।

তাছাড়া···

অরুণের সঙ্গে দেখা হলেও হয়তো নন্দিনীর খোঁজ পেত।

কিন্তু অরুণ কেন যে এল না রুণু কিছুতেই বুঝতে পারছে না। সব খবর জানে বলেই কি ? হয়তো নন্দিনী দেখা করতে নিষেধ করেছে, কিংবা অরুণ নিজেই ভেবেছে দেখা হলে যদি জিজ্ঞেস করে নন্দিনীর কথা ! বাঃ রে, ওকে বিশ্বাস করে বলতে পারবে না ? ও কি পরমদাকে বলে দেবে নাকি ?

বাড়ির নীচের তলায় মামাবাবুর ডাক্তারি চেম্বার। সকালের দিকে রুগী আসে দু-চারজন, এখন কয়েকটা কল্ থাকে, সেরে আসেন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রুণু মামাবাবুর গলা শুনতে পেল। তা হলে আজ আর কল্ ছিল না বিশেষ, আরও দুজন ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছেন বারান্দায় বসে।

—মামীমা, পাঁউরুটি আছে ? ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। দোতলায় উঠেই রুণু জিজ্ঞেস করলে।

বিকেলে এ-সময় ও দু পিস পাঁউরুটি আর চা খায়। আজ ফিরে আসার কথা ছিল না বলেই ভাবলে হয়তো রুটি আনানো হয়নি।

—এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে ? ফাংশন এর মধ্যে শেষ হয়ে গেল ? মামীমা জিজ্ঞেস করলেন।

রুণু হেসে বললে, না। ভাল লাগল না, একদম বাজে। বলে নিজের ঘরটিতে চলে গেল। ভাবলে, চোখের দিকে তাকিয়ে মামীমা হয়তো মিথ্যে কথাটা ধরে ফেলবেন।

রুণুর অবশ্য পৃথক কোন ঘর নেই। মামাতো বোন দুটো ছোট, তারাও ওর ঘরে পড়ে। ওর সঙ্গেই শোয়। তবে রুণুর একটা ছোট্ট টেবিল আছে, পড়ার। আর টেবিলে চাবি দিয়ে রাখার মত একটা দেরাজ আছে।

কাপড় ছেড়ে একটা আটপৌরে চেক শাড়ি পরে মুখ হাত ধুয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলটার সামনে বসল রুণু।

না, দেরাজটা এখন খুলবে না। মামীমা হয়তো নিজেই পাঁউরুটি চা দিয়ে যাবেন। এক একদিন তো বলেন, তোমাকে চা করতে হবে না, কলেজ থেকে ক্লান্ত হয়ে এলে, আমি করে দিচ্ছি।

মামীমাকে ভীষণ ভাল লাগে ওর। সত্যি, এত ভালমানুষ।

নিজের সংসার চলে টানাটানির মধ্যে, তবু তো রুণুকে নিয়ে এসে রেখেছেন, পড়ার খরচ জুগিয়ে চলেছেন।

বিছানায় একটু গড়িয়ে নিল রুণু চায়ের কাপটা সরিয়ে রেখে। আজ ওর মন একটুও ভাল নেই। বার বার কেবল অরুণের কথা মনে পড়ছে।

মাঝে মাঝে অরুণের সঙ্গে দেখা করার তীব্র ইচ্ছা কেন যে হয়। প্রেম ? আহা রে ! প্রেম এত সস্তা নয়। অরুণের সঙ্গে কথা বলতে ওর অবশ্য বেশ লাগে, মনে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলি। ব্যস্‌, প্রেম-ট্রেম ওসব শৌখিন জিনিস ওর জন্যে নয়। কিন্তু বেচারি অরুণ, হ্যাঁ অরুণ বোধ হয়···বাঃ, তা না হলে দেখা করার জন্যে, বেশিক্ষণ থাকার জন্যে এত ছটফট করে কেন ? কই, প্রথম প্রথম তো সাদামাটা পোশাক ছিল, এখন শার্টের ইস্ত্রি, প্যাণ্টের ক্রিজে এতটুকু খুঁত থাকে না। রুণুর জন্যে আর তো কেউ কখনও এমন করেনি।

কিন্তু অরুণ এল না কেন, কিছুতেই বুঝতে পারছে না ও। রুণু যেচে বলেছিল, আসব, অনেকক্ষণ থাকব, অনেকক্ষণ, সেই জন্যে কি ওর দাম কমে গেল অরুণের চোখে ? নাকি ওকে খারাপ ভাবল ? অরুণ ওকে খারাপ ভাবতে পারে ভেবে বুকের মধ্যে কেমন একটা ব্যথা-ব্যথা লাগল। তারপরই ভাবলে, দুর্‌, ওসব কিছু না। নিশ্চয় কোন কাজে আটকে পড়েছে।

আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, অরুণ অন্য কাউকে ভালবাসে। ওর সঙ্গে শুধু খেলা করছে। হয়তো যাকে ভালবাসে তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে, কিংবা অন্য কিছু। সেইজন্যে রুণুর কথা ভুলে গেছে।

বেশিক্ষণ থাকার জন্যে, অরুণকে আরও একটু খুশি করার জন্যে কত আগে থেকে মিথ্যে কথাটা বলে রাখল। —কলেজে ফাংশন আছে, ফিরতে একটু দেরি হবে মামীমা।

মিথ্যে কথাটা কোন কাজেই লাগল না। এত পরিপাটি করে সাজল রুণু। অরুণ এলই না।

ফিরে আসার সময় এত বিচ্ছিরি লাগছিল। রুণু মনে মনে ভাবল, পরে যদি হ্যাংলামি করে, এমন জব্দ করব ! নেহাত অরুণ কষ্ট পায় বলেই না অনেকক্ষণ থাকার কথা দিয়েছিল।

ঝট করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল রুণু।

কি করি কি করি, উঠে ব্যাগ থেকে দেরাজের চাবিটা বের করল।

এই একটাই লুকানো স্বর্গ আছে ওর। এই একটাই নেশা। চাবি লাগিয়ে দেরাজটা খুলল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর মন খুশিতে ভরে উঠল।

অরুণ আসেনি তো কি হয়েছে। এই দেরাজটার মধ্যে ওর টুকরো টুকরো আনন্দ জড়ো হয়ে আছে। একটু একটু করে পাওয়া জীবনের অসংখ্য আনন্দের মুহূর্ত।

দেরাজটা টেনে খুলল রুণু।

অসংখ্য টুকরো টুকরো কাগজ, কত কি তুচ্ছ জিনিস। অথচ তার কোনটাই রুণুর কাছে তুচ্ছ নয়।

আঃ, রুণুর মন ফুর্তিতে ভরে উঠল। রুণুর মন ছোট্ট এতটুকু সাত-আট-ন বছর হয়ে গেল। চাবির রিং একটা। তুলে নিয়ে সেটা আংটির মত করে আঙুলে পরল। কুড়িয়ে পেয়েছিল। বোনার কাঁটা এক জোড়া, হাতির দাঁতের মত সাদা—ইস্কুলের নিভাদিদিমণি দিয়েছিলেন। খুব ভালবাসতেন ওকে। একটা তারের ম্যাজিক, নিজেই কিনেছিল রথের মেলায়। সব, সব জমিয়ে রেখেছে রুণু এই দেরাজের মধ্যে।

কাগজগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে পরীক্ষা পাশ করার সার্টিফিকেট পেল ! সেই প্রথম দুরন্ত আনন্দের দিন ওটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

একটা একটা করে সব কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল রুণু।

অনুরাধার দাদার সেই চিঠিটা কই ? খুঁজে খুঁজে বের করল, পড়ল, সারা মুখে একটা

খুশির হাসি ছড়িয়ে পড়ল। অনুরাধার হাত দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়েছিল। পড়ে খুব রেগে গিয়েছিল ও, উত্তর দেয়নি। কিন্তু চিঠিটা ফেলে দিতেও পারেনি। রেখে দিয়েছিল। ভাল লেগেছিল। আবার পড়ল সেই লাইনটা—বিশ্রী হাতের লেখায়—তোমার চেয়ে সুন্দরী আমি দেখি নাই। ফিক্ করে হেসে ফেলল রুণু নিজের মনেই।

রুণুর যখনই মন খারাপ হয়, ফাঁকা ফাঁকা লাগে তখনই ও এই দেরাজটা খুলে বসে একটা একটা করে সুখের স্মৃতিকে স্পর্শ করে।

হঠাৎ অরুণকে ছুঁতে ইচ্ছে হল ওর। তন্ন তন্ন করে খুঁজল ; কোথায় গেল সেই খামটা!

একটা ভীষণ জরুরী কিছু যেন হারিয়ে গেছে এমন অধৈর্য ভাবে ও খুঁজতে শুরু করল।

পেয়ে গেল। নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে একটা সাদা খামের মধ্যে নীল পালকটা রেখে দিয়েছিল ও। পালকটা বের করল, মুগ্ধভাবে সেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। মুখের ওপর পালকটা খুব হাল্কা ভাবে বুলিয়ে আবার খামের মধ্যে যত্ন করে রেখে দিল।

তারপর দেরাজটা বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে দিল।

এসে গড়িয়ে পড়ল আবার বিছানার ওপর।

অরুণের কথা ভাবতে ভাল লাগল।

—ও সব নোবল প্রফেশন-ফ্রফেশন শুনতেই ভাল লাগে বোস। তোমার কথা কেউ ভাবে না, না রুগী না গাভমেণ্ট, তুমি শুধু সার্ভ কর। ওসব চলে না এখন আর।

—রুদ্র, তুমিই বুদ্ধিমান। পয়সা এখন গাইনোকলোজিতে। তাই না মহীতোষ ?

—সৎপথের চেয়ে অসৎপথে। ডাক্তার সেনের গলা।

মামাবাবুদের কথা শুনতে পেল রুণু ভাসা-ভাসা কথা। ওরা হো হো করে হেসে উঠল।

কি আলোচনা! চাপা গলায় বললেও এক একদিন কানে আসে অস্পষ্ট ভাবে। বয়েস হয়েছে, কিন্তু বকবাজদের সঙ্গে তফাত কোথায়! মামাবাবুই যা ভদ্র।

অরুণ কিন্তু চমৎকার মানুষ। ভদ্র, আর কি ভাল।

চারটের সময় একদিন দেখা করার কথা ছিল, রুণুর খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল আসতে। ও তাই জিজ্ঞেস করেছিল, কতক্ষণ এসেছেন ?

রাস্তা পার হওয়ার আগে দূর থেকে ও অরুণকে দেখতে পেয়েছিল। কি হতাশ বিষণ্ণ, দুশ্চিন্তার ছায়া মেখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল অরুণ।

দেখে হেসে ফেলেছিল ও, আবার ভিতরে ভিতরে ভালও লেগেছিল। নিজেকে সেদিন খুব দামী মনে হয়েছিল।

রুণুকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক খুশি ছড়িয়ে পড়ছিল অরুণের মুখ-চোখে, কিন্তু সেটা চট্ করে লুকিয়ে ফেলে, রাগ-রাগ ভাব করল অরুণ।

—বড্ড দেরি হয়ে গেল। কতক্ষণ এসেছেন ? ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে রুণু বললে। অরুণ রাগ রাগ ভঙ্গিতে বললে, সাড়ে তিনটে।

—বাঃ রে, অত আগে আসার কি দরকার ছিল।

অরুণ হেসে ফেলল। —তুমি দশ পনেরো মিনিট আগেই যদি এসে পড়তে ? একা-একা দাঁড়িয়ে থাকতে খারাপ লাগত না তোমার!

শুনে বেশ ভাল লেগেছিল। দ্যাখো, অরুণ তাহলে শুধু নিজের কথাই ভাবে না, আমার দিকটাও বোঝে।

বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে চুপটি করে সেই সব কথা ভাবতে ভাল লাগছিল রুণুর।

—এই। 'তুমি' বলব ? হঠাৎ একদিন দুম্ করে বলে ফেলল অরুণ।

চমকে উঠেছিল ও।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সেই ঘাসের চত্বরে ওরা মুখোমুখি বসেছিল। জলের ধারে ঠিক যে জায়গাটিতে বিরাম আর নন্দিনীর সঙ্গে প্রথম দিন বসেছিল, যেদিন টিকলুর অভদ্রতায় ওর মাথা ঝিমঝিম করে উঠেছিল। অরুণকে সেদিনই বেশ ভদ্র মনে হয়েছিল, টিকলুর পাশে আরও।

—এই। 'তুমি' বলব ?

চমকে উঠেছিল রুণু, পরমুহূর্তেই ভীষণ লজ্জা পেয়েছিল। ও হাঁটু মুড়ে বসেছিল, হাঁটুর ফাঁকে চিবুক রেখে। তক্ষুনি চোখ নামাল ঘাসের দিকে, একটা হাতে ঘাসের শিস ছিঁড়ল, আর মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। রুণুর মনে আছে লজ্জায় ও মুখ তুলতে পারেনি।

তারপর ওরা অনেকক্ষণ গল্প করেছিল, কিন্তু বুঝতে পারছিল 'আপনি' বলে বলে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, 'তুমি' বলতে অরুণের খুব অস্বস্তি হচ্ছে।

ফেরার সময় অরুণ হঠাৎ বললে, দুর্, আপনিই ভাল ছিল। এক পক্ষ আপনি বলবে, আর আমি শুধু···

রুণু হেসে ফেলেছিল। তারপর হাল্কা ভাবে বলেছিল, অন্যপক্ষের ইচ্ছে না থাকলে সে বলবে কেন!

—কি হল ? রুণু অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যথার গলায় বলে উঠেছিল। কারণ ওর কথায় অরুণের মুখ নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছিল অরুণ, কিংবা প্রচণ্ড অপমান বোধ করেছিল।

অরুণ কোন কথা বলল না, গুম হয়ে রইল। রাগ জ্বালা লজ্জা অনুশোচনা। রুণুর ইচ্ছে হল ও বলে, মুখের কথাটা কিছু নয়, কিছু নয়। ওর ইচ্ছে হল ওর হৃৎপিণ্ডটা তক্ষুনি ছিঁড়ে বের করে এনে অরুণকে দেখিয়ে দেয়।

আর মনে মনে বলেছিল, প্রজাপতিকে কখনও দু আঙুলে টিপে ধরতে নেই। পাখা খসে গিয়ে সেটা আবার শুঁয়োপোকা হয়ে যায়।

□

তিনদিক থেকে তিনটে রাস্তা। পরস্পরকে ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়ে মাঝখানে ছোট্ট একটা ট্র্যাংগল বানিয়ে দিয়েছে। রেলিং-ঘেরা জায়গাটুকুতে মরা-মরা ঘাস ছিল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল সেখানে কারা একটা সুন্দর ফোয়ারা বসিয়েছে। তিনপাশে রঙবেরঙের ফুলের গাছ, লাল নীল আলো ঝরছে ফোয়ারার জলে।

ঠিক তেমনি একটা হঠাৎ-সুখে হাউই হয়ে গেছে ওরা সবাই।

টিকলু, সুজিত আর ঊর্মি। বিরামও খুশি খুশি। প্রথম প্রথম ও প্রাণ খুলে হাসতে পারছিল না। ঊর্মি সান্ত্বনা দিয়েছে, ভাবছিস কেন, চাকরি একটা জুটে যাবেই। প্রফেসর সেনকে ধরলে···

তারপর থেকে বিরামও হাসতে পেরেছে! পারেনি শুধু নন্দিনী।

নন্দিনীর চোখ দুটো সেই যে কেমন বোকা বোকা দেখাচ্ছিল, ঠিক তেমনি আছে। কোন আনন্দ নেই, আশা নেই। মনে হচ্ছে, ওর চোখের দৃষ্টি থেকে সব প্রেম মুছে গেছে, মরে গেছে। বিয়ে তো হয়ে গেছে, সিঁথিতে ডগডগে করে সিঁদুর টানা, কপালে বড় একটা সিঁদুরের ফোঁটা। তবু নন্দিনী যেন একটা জড়পদার্থ।

ঊর্মি হঠাৎ বললে, জিৎ, অরুণটা থাকলে বেশ জমত।

সুজিত হেসে বললে, বল না মাইনিং এঞ্জিনিয়ারের জন্যে মন কেমন করছে। মেয়েদের তো বিয়ের চিঠি দেখলে হার্ট পালপিটেশন ডবল হয়ে যায়।

ঊর্মি হাসল। —নিশ্চয়ই। ...কিন্তু অরুণ থাকলে—

টিকলু বললে, ও এখন হয়তো পাটনাই মোরব্বা খাচ্ছে।

নন্দিনীর কানে যাচ্ছে না কোন কথা। ও স্থির বিষণ্ণ পুতুলের মত বসে আছে। চোখজোড়া যেন কাচের।

তারই ফাঁকে একবার ও বিরামের দিকে তাকাল। এমন একটা দৃষ্টিতে যা অপরের সঙ্গে যোগ সৃষ্টি করে না। জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকানোব মত।

টিকলুর কিন্তু চোখে পড়ল। —কি মশাই, আড়ে আড়ে খুব যে শুভদৃষ্টি সেরে নিচ্ছেন। বলে নন্দিনীকে হাসাবার চেষ্টা করল।

কান্নার মত হাসি নিয়ে নন্দিনীর ঠোঁট কাঁপল একটু।

আসলে নন্দিনীর এই থমকে যাওয়া চেহারাটা টিকলু সহ্য করতে পারছিল না। যে কোন উপায়ে ও নন্দিনীকে হাসাতে চাইছিল।

টিকলু বললে, এই চল্, সবাই মিলে দক্ষিণেশ্বর যাই। সুধার অর্ডার, ওখানে গিয়ে নন্দিনীদের নামে পুজো দিতে হবে।

সকলেই হই হই করে উঠে পড়ল—সেই ভাল, হুল্লোড় করা যাবে।

শুধু নন্দিনী বিরামের গা ঘেঁসে যেতে যেতে ধীরে ধীরে বললে, রুণুকে একটা ফোন করলে হত।

নন্দিনীব দাদার ওপর বিরাম তখনও প্রচণ্ড রেগে আছে। যেন এই ফ্যাসাদের জন্যে ওর দাদাই দায়ী। তাই নন্দিনীর তরফের সকলকেই ও অগ্রাহ্য করতে চায়। রুণুকেও।

নন্দিনী আবার মুখ তুলে বিরামের দিকে তাকাল। —ফোন করলে হত।

ভিখিরি তাড়ানোর মত করে হাত নেড়ে বিরাম বলে উঠল, নান্‌না।

নন্দিনীর চোখে একটুখানি আলো এসেছিল, সেটা নিবে গেল।

মন্দিরের দরজা খুলতে তখনও অনেক দেরি দেখে ওরা নিস্তব্ধ নির্জন গঙ্গার পাড় ধরে ধরে কিছু দূর অবধি হেঁটে গেল। তারপর একটা বাঁধানো ঘাটের ওপর এসে বসল।

কাছেই দুটো নৌকো বাঁধা ছিল, কিন্তু কোথাও কোন লোক নেই।

ঊর্মি সুজিতের গা ঘেঁসে বসল।

সুজিত ঊর্মিকে কনুইয়ের ঘা দিয়ে ইয়ার্কি করে বলল, চল্, চল্, নৌকোয় ঘুরে আসি তোর সঙ্গে। বহুদিনের ইচ্ছে, চল্ না, এই।

ঊর্মি হেসে বললে, কতদিন বেড়িয়েছি, মিষ্টি মিষ্টি কথা তো সব নৌকোতে বসেই শুনিয়েছিল। কি যে হয়ে গেল জিৎ, তোদের আর মানুষ বলেই মনে হয় না।

টিকলুটা চ্যাংড়ার একশেষ। ও বললে, আমিও শোনাব মাইরি। স্যাকারিন মিশিয়ে দেব।

সব্বাই হো হো করে হেসে উঠল।

হাসল না শুধু নন্দিনী। ও তেমনি উদাস চোখে গঙ্গার ওপারের দিকে তাকিয়ে রইল।

দূরে কোথায় একটা ঘণ্টা বাজার শব্দ হল। বিরাম বললে, বোধ হয় দরজা খুলেছে।

সুজিত বললে, না না।

বিরাম তবু উঠে পড়ল। বললে, বোস তোরা, দেখে আসি।

কেউ কোন কথা বললে না। নন্দিনী তেমনি চুপ, গম্ভীর, পাথর।

হঠাৎ জিপ-ফাসনার খোলার চুরুক করে একটা শব্দ হল এক সময়। আর সঙ্গে সঙ্গে

টিকলু ফিরে তাকিয়ে দেখলে উর্মির ব্যাগ থেকে একখানা খাম নিয়ে সুজিত ছুটে পালাচ্ছে।

উর্মি সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনে পিছনে ছুটল। —জিৎ, ভাল হচ্ছে না, চিঠি ফেরত দে বলছি। জিৎ, শোন···

কোথায় সুজিত। তখন চিঠিটা নিয়ে সুজিত ছুটেছে, পিছনে পিছনে উর্মি।

টিকলু ভেবেছিল ওরা এখনই ফিরে আসবে। কিন্তু এল না। ও হঠাৎ আবিষ্কার করল ও আর নন্দিনী একা। আর কেউ কোথাও নেই। চারিদিক নির্জন নিঃশব্দ।

—চলুন, আমরাও উঠি। টিকলু বললে। কিন্তু ওর সত্যি উঠে পড়ার ইচ্ছে ছিল না। নন্দিনীর কাছে নির্জনে বসে থাকতে থাকতে টিকলুর মনের মধ্যে সেই পুরোন লোভটা জেগে উঠতে চাইছিল। লোভে আর ভয়ে ওর শরীরটা ভিতরে ভিতরে থরথর করে কাঁপছিল।

—চলুন। নিজেকে নিজেই ভয় পাচ্ছিল টিকলু, তাই আবার বলে উঠল।

নন্দিনী তেমনই ভাবলেশহীন মুখে উঠে দাঁড়াল।

ওরা পাশাপাশি হেঁটে চলল। একটা বিরাট শিরীষগাছের গুঁড়ি ওদের দু জনকে যেন আড়াল করে রেখেছে।

হঠাৎ টিকলুর কি হল কে জানে, ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নন্দিনীর মুখোমুখি। বললে, আপনাকে আজ দারুণ দেখাচ্ছে।

অর্থহীন চোখ তুলে তাকাল নন্দিনী। আর সেই মুহূর্তে, টিকলুর কি হল কে জানে, ও নন্দিনীর হাতটা ধরতে গেল।

—এই, এই। চমকে উঠে টিকলুর হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সশব্দে হেসে উঠল নন্দিনী। খিলখিল করে হাসতে হাসতে, আঁচলে হাসি চাপতে চাপতে ও মন্দিরের দিকে ছুটে যাওয়ার মত করে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।

টিকলু হাসতে পারল না, লজ্জা করছে, ভীষণ লজ্জা করছে।

শেষ অবধি নন্দিনীর মুখেও হাসি ফুটলু, অথচ অরুণের যে এ ক'টা দিন কিভাবে কেটেছে!

অরুণ ফিরে এল অনেক রাত্রে। সমস্ত শরীর ট্রেন-জার্নিতে ক্লান্ত, ক্লান্ত।

স্নান করে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে হল, কিন্তু মন ছুটে যেতে চাইল 'কোজি নুকে'। নন্দিনীদের খবর জানতে হবে। ওরা হয়তো ভেবেছে কাঁধ থেকে দায়িত্ব নামিয়ে দেবার জন্যেই অরুণ পালিয়েছে। অথচ ক্ষমতা থাকলে অরুণ ওদের এই বিপদের সময়ে এমন কোন উপকার করত যা দিয়ে কৃতজ্ঞতার ঋণ কিছুটা শোধ করা যায়। হ্যাঁ, বিরাম আর নন্দিনীর কাছে ও কৃতজ্ঞ। ওরা না থাকলে রুণুর সঙ্গে ওর আলাপ হত কি করে।

কিন্তু রুণুর সঙ্গে ও আবার যোগাযোগ করার কোন রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটা বিরাম আর নন্দিনীর কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেই হয়েছে মুশকিল। তা না হলে নন্দিনীকে ও জিজ্ঞেস করতে পারত। কিন্তু রুণু লুকিয়ে রেখেছেই বা কেন? অরুণের তো ইচ্ছে হয় পৃথিবীসুদ্ধ সমস্ত লোককে বলে বেড়ায়। মাঝে মাঝে তাই সন্দেহ হয়, রুণুর কাছে এটা শুধু একটা খেলা।

—দুপুরে বাবা যখন খেতে যায় বাড়িতে, তখন তো লাইন ক্লিয়ার দিলেই পারিস। টিকলু বলেছিল।

সুজিত হেসে বলেছিল, খবর্দার। সুযোগ পেলে কোনদিন ও ব্যাটাই টেলিফোনে ফস্টিনস্টি শুরু করবে।

টিকলুদের প্রেসে একটা টেলিফোন আছে। টিকলুর বাবা দুপুরে যখন খেতে যায় সে

সময় সুযোগ বুঝে রুণু তো ফোন করতে পারে। অরুণ তাহলে ঘড়ি ধরে ওদের প্রেসে অপেক্ষা করত। কিংবা সে সময় রুণু তো টিকলুকেও বলে দিতে পারে, কোথায় কখন অপেক্ষা করবে!

অরুণকে ও-কথা না বললেও চলত। টিকলুকে ও একটুও বিশ্বাস করে না।

কিন্তু সে সব পরের কথা। সকালে উঠেই 'কোজি নুকে' যেতে ইচ্ছে হল। কলকাতা শহরটা এই কদিন যেন অরুণকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে।

মিলুকে চা করতে দেখে অরুণ বললে, কি ব্যাপাব রে মিলু, তুই?

—কেন, আমি কি পারি না। মিলু হাসল।

—চার চামচ চিনি দিস্, তোর হাতের চা তো এমনিতেই তেতো হবে।

মিলু কপট রাগ দেখাল। —চিনির যা দুর্ভিক্ষ, একটা মিষ্টি হাত জোগাড় করে আন না। তারপর গম্ভীর হয়ে বললে, এবার তো আনতেই হবে। জানিস্, মার কি হয়েছে?

—কি হয়েছে?

মিলু বললে, টেরিফিক জ্বর, তার ওপর মাথার যন্ত্রণা।

এবার রহস্যটা পরিষ্কার হল। কাল রাতে ফিরে আসার পর মা দুচারটে প্রশ্ন করেই চুপচাপ শুয়ে রইল। অন্যদিন হলে এত অল্পে রেহাই পেত নাকি। উকিলের জেরা শুরু হত। ট্রেনে জায়গা পেয়েছিলি? স্টেশনের খাবার খেয়ে বুলুর শরীর খারাপ হয়নি তো? বাসা পেয়েছে কেমন, কখানা ঘর? অক্ষয় ভাল আছে তো? পাড়ার লোক কেমন? সদর দরজায় খিল দিলেই নিশ্চিন্ত, নাকি মই বেয়ে ঘরে ঢোকা যায়? যা চোর ছ্যাঁচোড়ের উপদ্রব আজকাল। ইত্যাদি।

উত্তর দিতে দিতে বিরক্ত হতে হয়।

অরুণ ভাবলে একবার মার কাছে গিয়ে কেমন আছে জিজ্ঞেস করবে কিনা। একটু পাশে গিয়ে বসতে, কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখতে ইচ্ছে হল। কিন্তু কোনদিন তো ওসব করেনি, তাই কেমন লজ্জা লজ্জা করল। কে জানে, মা হয়তো বলে বসবে, যা যা, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।

'তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না, তুই গোল্লায় গেছিস, তুই গোল্লায় গেছিস।' কথাটা মনে পড়তেই মাথায় রক্ত উঠে গেল। গোল্লায় যখন গিয়েছি তখন আর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কি হবে। মা তো ভাববে, কিছু বাগাবার তালেই ও তোয়াজ করছে।

নটার সময় কোজি নুকে যাবে বলে তৈরি হচ্ছে, বাবার ডাক। —অরুণ!

ও গিয়ে দাঁড়াতেই বললে, তোর ছোটমেসো একবার দেখা কবতে বলেছে। আজকেই যাস।

ছোটমেসো! কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। ছোটমেসোর নাম শুনেই ও কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। আবার সেই উর্মির সঙ্গে সিনেমা অ্যাফেয়ারটাই এতদিনে অ্যাজেণ্ডায় উঠল নাকি?

—আচ্ছা। বলে চলে আসছিল ও।

—আচ্ছা নয়, আজকেই যাবি।

নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখল, ওর বিছানায় শুয়ে পায়ের আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে গল্পের বই পড়ছে মিলু।

মেয়েটার যখন তখন বিছানায় পড়ে পড়ে গল্পের বই পড়া দু চোখের বিষ অরুণের কাছে। চিচিঙ্গের মত চেহারা, এদিকে শাড়ি ঠিক রাখতে পারে না। নিমগাছটার ওদিকের ফ্ল্যাটের ছেলেটা প্রায়ই কবি-কবি চোখে শালা কিছুই দেখছি-না দেখছি-না করে তাকায়।

মিলু তাকায় কিনা কে জানে। নাঃ, ওর টেস্ট এত বাজে নয়।

অরুণ এসে মিলুকে কাতুকুতু দিল।
—এই দাদা! রেগে গিয়ে উঠে বসল মিলু।
অরুণ চাপা গলায় বললে, ছোটমেসো দেখা করতে বলেছে কেন রে?
মিলু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, কি একটা চাকরি আছে, টেম্পোরারি।
—ও।
মিলু বললে, যাবি?
—যেতে একবার হবেই।
—তা হলে আমিও যাব তোব সঙ্গে। ছোটমাসী সেদিন কত করে বলে গেছে। মিলু বললে।
অরুণ বেঁচে গেল। একা গেলে সেদিনের ঘটনা নিয়ে ছোটমেসো কি বলবে কে জানে। মিলু সঙ্গে থাকলে তবু কিছুটা রেহাই পাবে।
বললে, বেশ, যাবি। সন্ধেবেলায়।
তার আগে তো দুপুর। তার আগে তো কফি হাউস। কোজি নুকে অপেক্ষা করে করে কাউকে না পেয়ে মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। তার ওপর রুণুর জন্যে দুর্ভাবনা। খুব সহজে কাছে এসেছে বলেই হয়তো তাকে হারানোর এত ভয়। অরুণের মাঝে মাঝে মনে হয় রুণু ওকে ভুল করে ভালবেসে ফেলেছে। যে-কোনদিন তার ভুল ভেঙে যেতে পারে। যে-কোনদিন অরুণ রুণুর কাছে টিকলু হযে যেতে পারে।
কফি হাউসের চৌকাঠ ডিঙিযেই সকলকে দেখতে পেল অরুণ। হলভর্তি সিগারেটের ধোঁয়া, বাতাসে কফির ঝাঁঝ, আর এই কথার হট্টগোল—কথাগুলোকে যেন কফির দানার মত পার্কোলেটারে ফেলা হচ্ছে।
তা হোক, এতক্ষণে অরুণের মনে হচ্ছে কলকাতা ওকে ফিবিয়ে নিল।
দূর থেকেই ওদেব দিকে তাকাল ও।
উফ্, কি দারুণ সেজেছে ঊর্মি!
অরুণকে দেখেই চাব জোড়া হাত ঝড়ের মুখে গাছেব ডাল হয়ে হাতছানি দিল।
শুধু নন্দিনী একটু ফিকে হাসি হাসল, হাতছানি দিল না।
চেয়ার টেনে নিয়ে বসতেই সুজিত বললে, আমাদের আজ নন্দিনীবিদায়। বিয়েটিয়ে হয়ে গেছে, আজ বিরামের দিদির বাড়িতে চলে যাবে নন্দিনী। দিদি অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে। শুধু দাদাটা—
বিরাম বিরক্ত মুখে বললে, দাদাটা একটা ছোটলোক।
নন্দিনী ভুরু কুঁচকে আপত্তির চোখ তুলে একবার বিরামেব দিকে তাকাল, কোন কথা বলল না।
অরুণ ওসব কিছু লক্ষ করল না, ও তখন ঊর্মিকে দেখছে।
অরুণ হেসে বললে, ঊর্মি, আজ দারুণ সেজেছিস। তারপর দূরের টেবিলে গোঁফওলা ছেলেটার দিকে ইশারা করে বললে, তোকে দেখে ইনটেলেকচুয়ালটার বুকে এতক্ষণ ক্যান্সার হয়ে গেছে।
ঊর্মি হেসে বললে, তোদেরও হচ্ছে নাকি?
টিকলু হাসল। —আলবাত হচ্ছে, বুকের মধ্যে একটা তক্ষক কুরুর কুরুর করে লাংস চিবোচ্ছে যেন।
সুজিত বললে, সত্যি। আজ সোফিয়া লোরেনকে মনে হচ্ছে তোর দিদিশাশুড়ি।
হো হো করে হেসে উঠল সবাই। বিরাম কিছু বলতে পারল না। বলবে কি করে, আড়ালে পেলেই তো তা হলে নন্দিনী ধাতানি দেবে।

উর্মি সত্যিই খুব সেজেছে। চুড়ো করে পার্ক স্ট্রিট ধরনের চুল বেঁধেছে, ভুরু টেনেছে। ফর্সা ঘাড়, গাল-গলার নীচের ঢালু পুরীর সি-বিচ্। কাঁধ অবধি দুটো হাত বাকল ছাড়ানো গাছের মত মসৃণ। কিংবা নাইলনের প্যাঁচানো শাড়ির দীর্ঘ শরীরটাই যেন একটা ঋজু গাছের এখানে-ওখানে বাকল খসে পড়া কাণ্ড। দূরে বসে দেখা যায় না, ছুঁতে ইচ্ছে করে।

উর্মি হঠাৎ বললে, অরুণ, তুই কখনও ড্রিঙ্ক করেছিস ?

অরুণ কিছু বলার আগেই টিকলু বললে, কতবার।

—জিৎ তুই ?

সুজিত হেসে বললে, বিয়ার খেয়েছি।

টিকলু নাক সিঁটকে বললে, সোডা কিংবা বিয়ার মাইরি আমি 'র' খেতে পারি না।

ওরা কেউ কিছু বুঝতে পারল না দেখে বললে, মানে সঙ্গে একটু হুইস্কি না হলে।

উর্মিও এবার হেসে উঠল। তারপর বললে, আমি একদিন একটু খাব। নিয়ে যাবি ?

—আজই চল্ না। টিকলুর উৎসাহ সবচেয়ে বেশি।

উর্মির চোখ দুটো ঝকঝক্ করল।

আজই বরং সেলিব্রেট করা যাক্ নন্দিনীবিদায় উপলক্ষে : বলে হেসে উঠল।

নন্দিনীর মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। —আমি না, আমি না।

বিরাম বললে, আমাদের বাবা দিদির বাড়ি যেতে হবে।

অরুণ বললে, আজ থাক্ না।

টিকলু রেগে গিয়ে বললে, ট্রামের দড়ি কাটার অভ্যেস তোর গেল না।

ওরা সকলেই গুম্ হয়ে বসে রইল। উর্মিও সেই যে 'ড্রপ ইট' বলে চুপ করে গেছে, আর কোন কথা বলছে না। একটা নতুন ফুর্তির আশায় সকলেই উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, অথচ সে মুহূর্তে কেউ না কেউ বাগড়া দেবেই।

টিকলু ক্ষোভের সঙ্গে বললে, কপালটাই খারাপ আমাদের। শুয়ে ঘুমোব কি, শালা তোশকে তুলোর চেয়ে তুলোর বীজ বেশি।

বিরাম ওর বিরক্তি দেখে হেসে ফেললে। বললে, আমরা এবার উঠব।

ওরা সকলেই ওদের বাসে তুলে দিতে নেমে এল।

অরুণ শুধু সুযোগ খুঁজল নন্দিনীকে কি করে আড়ালে পাওয়া যায়, বিরামকেও এড়িয়ে কি করে রুণুকে টেলিফোন করার ব্যবস্থা করা যায়।

ওর কেমন ধারণা হল নন্দিনী একটু-আধটু নিশ্চয় জানে। ওর আর রুণুর সম্পর্কের কথা। বিরামকে নন্দিনী কিছু বলেছে কি না ওর সন্দেহ ছিল।

বিরামের কানে গেল বোধ হয় কথাটা। বললে, নন্দিনীর খবর কিন্তু তুই কিচ্ছু জানিস না।

অরুণ হেসে ফেলে বললে, না না, সে ভয় নেই। বলব, দেখাই হয়নি।

কোন্ সময়ে কিভাবে ফোন করা যাবে জেনে নিয়ে ও খুব খুশি হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রাগ হল রুণুর ওপর। দেখেছ কাণ্ড, কেমন পিউরিটি বার্লির মত মুখ করে রুণু সেদিন বলেছিল, বিরাম নন্দিনী কেউ কিছু জানে না। অরুণও ওদের কিছু জানাতে বারণ করেছিল। আশ্চর্য, মেয়েদের কোন বিশ্বাস নেই, ওদের একটুও বিশ্বাস করতে নেই।

□

টিকলু যতই ভাবছিল ততই ওর মজা লাগছিল।

—খুব তো পাম্প দিচ্ছিলি, যেন নাম্বার ওয়ান বোতল ভাদুড়ি। পকেট তো এদিকে গড়ের মাঠ। সুজিত ফেরার পথে ঠাট্টা করেছিল।

আর অরুণ বলেছিল, নন্দিনীর সামনে তোর ওসব বলা উচিত হয়নি।

টিকলু রেগে গিয়ে বললে, যা যা, উর্মি মাংসের সিঙাড়া হয়ে চোখের সামনে বসে থাকবে, আর আমি মদের কথা বললেই দোষ। একটু খাওয়াতে পারলে দেখতিস 'আমি পবিত্র আমি বিশুদ্ধ' কোথায় সব চড়ুই পাখি হয়ে ফুরুক করে উড়ে যেত।

অরুণ কোন কথা বললে না। নিমপাতা খাওয়া মুখ করে রইল।

এই জন্যেই তো টিকলুর আজকাল সুজিত আর অরুণকে অসহ্য লাগে। ওরা সবাই একসঙ্গে আড্ডা দেয়, ফুর্তি করে, স্বপ্ন দেখে, কিন্তু তারই ফাঁকে সুজিত আর অরুণ এমন ভাব করে যেন টিকলু অনেক নিচু স্তরের মানুষ। ও যেন সত্যিই একটা রকবাজ ছেলে।

কার কত কালচার জানা আছে, থাকিস তো ভাড়াটে বাড়িতে।

পার্কের পিছনে তিরিশ ফুট রাস্তাটার ওপর সব বাড়িগুলোই একে একে নতুন হয়ে গেছে। কেউ পুরনো বাড়িটাই ভেঙেচুরে নতুন গ্রিল বসিয়ে নিয়েছে, কেউ বারান্দা বাড়িয়ে জানালা ফুটিয়ে নতুন চেহারা এনেছে। কোন কোনটা সত্যিই নতুন। শুধু তার ফাঁকে টিকলুদের বাড়িটাই ধসে পড়ার মত অবস্থায়। লোহার থামগুলোতে জং ধরেছে। এক এক সময় বাড়িটার জন্যে টিকলুর গর্ব, এক এক সময় লজ্জা। বাবার বিরুদ্ধে টিকলুর অবশ্য একটা ক্ষোভ ছেলেবয়েস থেকে জমা হয়ে আছে। সারা জীবন ধরে বাবা তা হলে কি করল ? পৈতৃক একখানা বাড়ি পেয়েও মেজেঘসে সেটাকে একটু ভদ্রস্থ করতে পারল না ? আবার ছেলেকে উপদেশ দেয়, শাসন করতে চায়।

বাবার ওপর টিকলুর একটুও শ্রদ্ধা নেই। মা সমীহ করে না তো টিকলুই বা করবে কেন। বাবা পড়াশুনো কদ্দূর করেছিল, করেছিল কিনা, টিকলু তাও স্পষ্ট জানে না। ওর বদ্ধ ধারণা বাবা ওর কথা শুনে চললে অ্যাদ্দিন ব্যবসায় লাল হয়ে যেত। প্রেস প্রেস বলে, মাল তো বাজারের কাছে নীচের তলার দুখানা অন্ধকার ঘরে দুটো ট্রেডল মেশিন। ঘটাং ঘটাং শব্দ করে হ্যাণ্ডবিল্ কিংবা রসিদবই ছাপে। কখনও শ্রাদ্ধের চিঠি। প্রেসে একটা খদ্দের ঢুকলে বাবা এমন তোয়াজ করে যেন বাড়িতে বেয়াই এসেছে। সাদা টুইলের নোংরা শার্ট পরে যখন বসে থাকে, পরিচয় দিতেও লজ্জা।

মা একবার বলেছিল, বাউণ্ডুলের মত ঘুরে না বেড়িয়ে ছাপাখানার কাজটাজ একটু দেখলে তো পারিস।

টিকলু নাক সিঁটকে বলেছিল, ওটাকে আর ছাপাখানা বলে না।

মা রেগে গিয়ে বলেছিল, ঐ থেকে দু-বেলা জুটছে। পারিস তো করে দেখা না কাকে ছাপাখানা বলে।

টিকলুর সত্যিই এক এক সময় ইচ্ছে হয়, ও বিরাট একটা কিছু করে ফেলবে।

—প্ল্যানও আসে, বড়লোকের ছেলেও পাকড়াই, কিন্তু মাইরি কেন যে পাকা শোল মাছের মত সুড়ুত করে সরে পড়ে···

সুজিত হেসেছিল। —তোর তো তাল শুধু পরের টাকায় ম্যানেজারি··

—ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে বসবে, স্টেনো থাকবে পাশে···অরুণও ঠাট্টা করেছিল।

এ জন্যেই সুজিত আর অরুণকেও আজকাল অসহ্য লাগে। বড় কিছু একটা ওরা ভাবতেই পারে না। শুধু দেড়শো দুশো টাকার চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে। চাকরি একটা পেলেই বা কি হবে, ডালহৌসিতে দুপুরে বেরিয়ে তো চানাচুর চিবোবি।

মাও বোঝে না। —আড্ডা দিয়ে না বেড়িয়ে, কিছু একটা করলেও তো পারিস।

আড্ডার ওপর সবাই দেখি জলবিছুটি হয়ে আছে। অথচ আড্ডা না থাকলে সময় কাটাত

কি করে। একটা দিন আড্ডা না দিলে মনে হয় কি যেন হল না, কি যেন হল না।

—বল্ সুজিত, তাই কিনা ? বুড়োরা মাইরি বোঝে না। আরে আড্ডা না থাকলে অ্যাদ্দিন তো বখে যেতাম।

সুজিত হেসে বললে, অরুণটা লাকি। সময় কাটানোর প্রবলেম ওর আর নেই।

অরুণ কোন উত্তর দিল না। লাকি। প্রেম করেছিস কখনও, প্রেম কি তা জানিস ? যন্ত্রণা রে, স্রেফ যন্তরনা। 'সময় কাটানোর প্রবলেম নেই !' রুণুর সঙ্গে একটু মন খুলে কথা বলার পর থেকে মনে হয় চব্বিশ ঘণ্টা ও কাছে কাছে থাকুক। দু তিনদিন অন্তর দেখা হয়, অথচ সময় কাটাবে কি, মনে হয় ঘড়ির কাঁটা যেন পোলিওতে ভুগছে।

—কদ্দূর এগিয়েছিস্ বল। টিকলু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে।

—প্রেম কি এগোবার বা পিছোবার জিনিস ! অরুণের পিঠে কেউ যেন আল্‌পিন বিঁধিয়েছে এমনভাবে বিরক্ত হয়ে ও বললে, তুই বুঝিস না টিকলু, তুই বুঝিস না।

সুজিত হাসল। —এগোয়নি পিছোয়নি ? তাহলে কি স্ট্যাটিক নাকি ! মেয়েটাকে দেখে তো মনে হয়েছিল দিব্যি চালু।

অরুণ অসহ্য যন্ত্রণায় চোখ বন্ধ করল। কিন্তু টিকলু হ্যা হ্যা করে হেসে শোধ তুলতে চাইল।

মেয়েটা চালু, মেয়েটা খারাপ, মেয়েটা তোকে স্রেফ নাচাচ্ছে। শুনতে শুনতে কান গরম হয়ে ওঠে অরুণের। অথচ কিছু প্রকাশ করে বলতেও পারে না। ওদের মধ্যে যা গোপন তা হাটের মধ্যে প্রকাশ করবে কেন। গোপন বলেই তো এত সুন্দর।

টিকলুব মনের মধ্যে তখনও বাজছে 'তুই বুঝিস না টিকলু, তুই বুঝিস না।' টিকলু বোঝে না, শালা যত বোঝে অরুণ। কি, না রুণুর সঙ্গে একা একা দেখা করে একটু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে, রেস্টুরেণ্টে বসে পকেট সাফ করেছে, মাঠে বসে গরুর মত ঘাস চিবিয়েছে। দুটো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছে, ব্যস্। টিকলু যে তোর চেয়ে অনেক বেশি জানে, বোঝে, তার তো খবর রাখিস না। নেহাত বলার উপায় নেই, শুনলে হয়তো ছি ছি করবে।

কে জানে, পাপটাপ হচ্ছে কিনা টিকলু নিজেও জানে না। কিন্তু মা বাবাকে ভ.. শুধু ঐ একটা কারণে। কখন সন্দেহ করে বসে, কখন বুঝতে পারে। ভয় না লজ্জা কে জানে। শুনলে সুজিত আর অরুণ হাসবে, না ছি ছি করবে, তাও জানে না।

কিন্তু ভালবাসা কি, প্রেম কি, তা ও জানে। আলবত জানে। বিরাম কিংবা অরুণের সঙ্গে টিকলুর তফাত কোথায় ? ও কি কম ছটফট করে ? কম যন্ত্রণা ওর ? শরীরের জন্যে শরীর কি কম কষ্ট পায় ? শরীর দিয়ে শরীরকে আদর করা যায় না ? তা হলে এত জ্বালা কিসের।

নানারকম রঙিন রঙিন ইচ্ছে টিকলুরও হয়। টিকলুরও ইচ্ছে—ও ঘুরবে, বেড়াবে, ঘাসের ওপর বসবে, সন্ধেবেলার জল দেখবে, জলের মধ্যে তারা কিংবা হাওড়া ব্রিজের আলোয় গাঁথা মালা। ঘন হয়ে বসবে, মুগ্ধ হয়ে মুখের দিকে তাকাবে—সত্যি, ওর হাসিটা ফাইন—পাঁচজনের সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে যেতে ইচ্ছে করে টিকলুর।

অরুণ ঠিকই বলে। আমরা কথা বলতে জানি না, কথা বলতে পারি না। রিয়েলি, দিনরাত বুকের মধ্যে খই ফুটছে, সরা চাপা দিয়ে রাখো। কি, না, সমাজ, 'ছি ছি'।

কতবার ওর ইচ্ছে হয়েছে, একটু একটু আভাস দেবে অরুণ আর সুজিতকে। পারেনি। অথচ সব ব্যাটাই হয়তো…

—তোমার কি একটু গল্প করতেও ভাল লাগে না ?

বাব্বাবা, টিকলু যে ওর জন্যে ছটফট করে, সেটা কিছু না। বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে জ্বালা জুড়োতে চায়, সেটাই অন্যায় ? কে জানে, প্রেম অন্য কিছু হতেও পারে। টিকলু ঠিক

বুঝতে পারে না। কিংবা ওর প্রেম চার দেয়ালের মধ্যে দমবন্ধ হয়ে আছে বলেই হয়তো অন্য রকম মনে হয়।

প্রেমট্রেম বোঝে না টিকলু। যেখান থেকে যেটুকু পাওয়া যায়। এর বেশি আর কিছু পাবে না বলে। আরেকটা রঙিন ইচ্ছেও জাগে। রুণুকে দেখে জেগেছিল। এমনকি নন্দিনীকে দেখেও। ওর তো কোথাও কিছু প্রাপ্য নেই। বাইশ বছর বয়স অবধি কেউ তো কিছু হাত বাড়িয়ে দিলে না ওকে। শুধু যেটুকু যেখান থেকে পারো ছিনিয়ে নাও। ভাবতে গিয়ে নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে গেল। ভাবলে, আমি, আমি বোধহয় একটা স্কাউড্রেল।

সত্যি, ও কিছুতেই বুঝতে পারছে না, কেন ও হঠাৎ এমন বিশ্রী কাণ্ডটা করল। অথচ ও সত্যি এসব কছু ভাবেনি আগে থেকে। মুখে যা আসে তাই বলে, কিন্তু ওসব কি মনের কথা নাকি। বরং বিরাম আর নন্দিনীকে দেখে ওর খুব ভাল লেগেছিল। ফুল দিয়ে সাজানো ফুলদানির মত সুন্দর। আমি তো শালা সুখের মুখ দেখব না, ওরা অন্তত সুখী হোক, মনে মনে ভেবেছিল। অথচ হঠাৎ—

মদটদ খাওয়া বাজে কথা। দু-চার দিন টেস্ট নিয়েছে এই পর্যন্ত। কিন্তু হঠাৎ ওর ইচ্ছে হয়েছিল নিজের চেহারাটা কালো করে দিই। নন্দিনী তো আমাকে খারাপ ভেবেছে, আরও খারাপ ভাবুক। সকলেই তো ওকে খারাপ ভাবে, দ্যাখ তোরা, আমি আরও কত খারাপ।

কে জানে, নন্দিনী বিরামের কাছে কি রিপোর্ট দিয়েছে। বিরামকে ও সারাক্ষণ স্টাডি করেছে। কিন্তু বুঝতে পারেনি। যদি জেনে থাকে, এই ভয়ে, ভেবেছিল বেহেড হয়ে নিজেকে আরও কালি মাখাবে।

কিংবা ভেতরের অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই হয়তো ও মাতাল হতে চেয়েছিল। মদটদ খেয়ে...নন্দিনীর কাছে ক্ষমা তো চাওয়া যায় না...নিজেকে বেধড়ক চাবকানো যেত...আমি মাইরি একটা শুয়োরের বাচ্চা, শালা কখন যে কি করে ফেলি...

কিন্তু টিকলুর হঠাৎ মনে হল, আমি তো ভাল, আমি সৎ...তবু বাইরের পোশাক দেখেই লোকে কেন যে খারাপ ভাবে। হঠাৎ ওর একটু নন্দিনীর ওপর লোভ হয়েছিল বলেই কি ও খারাপ নাকি ? এখন সব শুনলে বিরাম ভাববে সেজন্যেই ও নন্দিনীকে সুধাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। কে জানে, হয়তো নন্দিনীকেও সন্দেহ করবে। ভাববে...টিকলু ভাবল। অভিমানে দুঃখে একটু যে কাঁদব, তাও জল আসবে না চোখে। শুকিয়ে সুপুরি হয়ে গেছি রে, আমি শালা একটু কাঁদতেও পারি না।

ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে অরুণ বললে, একটু আস্তে চালান, একটু আস্তে।

ওর চোখ দুটো বাস-স্টপের ভিড়ের মধ্যে রুণুকে খুঁজছিল। ভিড় ছাড়া রুণু কোথাও অপেক্ষা করতে চায় না, পাছে চেনাজানা কেউ দেখলে কিছু সন্দেহ করে। রুণু তো ভিড়ে হারিয়ে থেকেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালাদের যা মেজাজ, ভিখিরি তাড়ানোর ভঙ্গিতে প্যাসেঞ্জার হটায়। রুণুকে তাড়াতাড়ি খুঁজে না পেলে ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে হবে। তারপর ও যখন আসবে তখন আবার ট্যাক্সি পেলে হয়। কোথাও যদি নির্ভেজাল শান্তি থাকত ! রুণুটা এমন দেরি করে আসে, তখন বাসে-ট্রামেও জায়গা মেলে না।

ঝট করে ভিড়ের মধ্যে চোখোচোখি হল। অরুণ জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ডাকতে যাচ্ছিল, তার আগেই রুণু এগিয়ে এল।

অরুণ বললে, উঠে পড়, উঠে পড়।

রুণু ট্যাক্সিতে বেশ অস্বস্তির সঙ্গে উঠল। অস্বস্তি তো হবেই, কেউ যদি দেখে, তখন আর কোন ওজর-অজুহাত চলবে না। মামাবাবু বকুনি-টকুনি নাও দিতে পারেন, কিন্তু

নিজের তো লজ্জা। আর ট্যাক্সি জিনিসটাই তো এখন ঘেন্নার, দিনরাত চোখের সামনে যা দেখছে!

নন্দিনী চলে যাওয়ার পর থেকে রুণু নিজেও একটু ভয়ে ভয়ে আছে। নন্দিনীর দাদা লোক সত্যি ভাল, ঐ ঘটনার পর কেমন ভেঙে পড়েছেন। বিরামের ঠিকানা যদি ওর জানা থাকত, রুণু একাই গিয়ে খবর নিয়ে আসত। এমনই মুশকিল, নন্দিনীর দাদাকে বিরামের নামটাও বলতে পারছে না। বললে, কলেজে খোঁজ করেও তার ঠিকানা জোগাড় করতে পারতেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মামীমা ভাববেন, দেখছো কাণ্ড, রুণু সব জানত। ও আবার ভিতরে ভিতরে কি করছে কে জানে!

অরুণ ঘন ঘন মিটারের দিকে তাকাচ্ছিল।

রুণু বললে, কি সাহস তোমার!

অরুণ হাসল। —কি করব, খবরটা তো দিতে হবে।

—সেদিন কি হয়েছিল? রুণু জিজ্ঞেস করেই অরুণেব মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অর্থাৎ মিথ্যে কথা বললেই যাতে ধরতে পারে।

অরুণ বললে, সে অনেক কাণ্ড। পাটনা যেতে হল হঠাৎ।

রুণুর ভুরু কাঁপল, বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, পাটনা কেন, আরও দূরেও তো যেতে পারতে, পেশোয়ার?

রুণুর মুখের দিকে তাকিয়ে, তার গলার স্বর শুনে অরুণের ভীষণ রাগ হল। কি আশ্চর্য, ওকে বিশ্বাস করছে না রুণু!

অরুণ জোর দিয়ে বললে, সত্যি পাটনা গিয়েছিলাম।

—কফি হাউসে যাওনি? মক্ষিরানীর আড্ডায়?

কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। ছি ছি, এ কি সন্দেহ পুষে রেখেছে রুণু!

অরুণ কোন কথা বলল না। গভীর একটা অভিমানে ওর বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। পরক্ষণেই একটু সন্দেহ হল, সেদিন টিকলুরা যে বিরাম আব নন্দিনীকে নিয়ে কফি হাউসে গিয়েছিল, সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বর—জানে নাকি রুণু? হয়তো ভেবেছে অরুণও ছিল।

রুণু ফিরে তাকাল আবার, তারপর কৌতুকে হাসল।

ওর হাসি দেখে অরুণও হেসে ফেলল। যাক্ বাবা, মুখে হাসি ফুটেছে এতক্ষণে। কিন্তু বিরাম আর নন্দিনীর কথা কি বলবে এখন? তারপব যদি ওর কাছ থেকে শুনে নন্দিনীর দাদা ঝামেলা পাকায়। তখন কারও কাছে মুখ দেখাতে পাববে না। সুজিত আর টিকলু ধিক্কার দেবে, বিরাম বলবে, তুই এত ছোটলোক?

না, কিছু বলবে না ও রুণুকে। অথচ, ধুত্তোব, হুজ্জোত না হুজ্জোত, নন্দিনী যদি ইতিমধ্যে রুণুকে ফোন করে সব বলে দিয়ে থাকে। রুণু ভাববে, দেখেছ, এই লোকটাকে আমি ভাল ভেবেছিলাম, ভেবেছিলাম আমাকে ভালবাসে, আমার কাছে কি আর কিছু লুকিয়ে রাখবে?

অরুণ প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যেই বললে, মামীমা কিছু বুঝতে পারেননি তো?

রুণু হেসে ঘাড় নাড়ল। তারপর আবার বললে, কি সাহস বাবা!

অরুণও হাসল। রুণুর হাসিটা ওর বুক ভরিয়ে দিয়েছে। ও খুশি।

বললে, তোমার মামাবাবুর নাম খুঁজে ফোন নম্বর তো বের করলাম।

—নাম বলেছিলাম আমি? রুণু অস্পষ্ট স্মৃতি হাতড়াবার চেষ্টা করল।

অরুণ একটু অপ্রতিভ হয়েছিল, জেনেছে তো নন্দিনীর কাছে, সেটা চট করে ঢাকা দিল। —হ্যাঁ বলেছিলে।

একটু থেমে হাসল। —সকালে করেছিলাম, বোধ হয় মামাবাবু ধরেছিলেন, টক্‌ করে কেটে দিলাম সাড়া না দিয়ে।

রুণু চোখ কপালে তুলল। —ও মা, ও রকম করলে তো ভাববেন···

অরুণ হেসে বললে, একবার তো সকালে, তারপরই ঘণ্টাখানেক পরে আবার, তোমার গলা শুনলাম। কেউ ছিল না তো কাছে ?

—না। কিন্তু কোথায় চলেছি শুনি ? রুণু তাকাল অরুণের মুখের দিকে।

অরুণ ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে বললে, লাইটহাউস।

সিনেমার অন্ধকার ছাড়া আর কোথায় স্বস্তিতে পাশাপাশি বসে থাকা যায় নির্বিঘ্নে, চাপা গলায় কথা বলা যায়।

টিকিট কেটে ওরা ঢুকল। আঃ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, অরুণের বুকের মধ্যে এতক্ষণ অনেক সংশয় অনেক অভিমান জমা হয়েছিল। সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল।

ঢোকবার সময় তো টিকিটের আধখানা ছিঁড়ে নেয়। বাকি অর্ধেক ফিরিয়ে দিতেই অরুণ পকেটে রেখে দিল। দেখি আজকেও চায় কিনা।

—এই, টিকিট দুটো কই ? দাও ? সিটে বসেই রুণু বললে।

আধখানা-ছেঁড়া টিকিট দুখানা অন্ধকারে এগিয়ে দিল অরুণ। রুণুর হাত ছুঁল। টিকিট দুখানা রুণুর হাতে দিয়ে তার হাতটা মুঠো করে দিল। এই সামান্য একটু স্পর্শের মধ্যে অফুরন্ত একটা আনন্দ।

রুণু ছেঁড়া টিকিট দুটো নিয়ে ব্যাগের মধ্যে যত্ন করে রেখে দিল। এখন ব্যাগের মধ্যে, এর পর বাড়ি ফিরে দেরাজ খুলবে ও, দেরাজের মধ্যে যত্ন করে রেখে দেবে। কিছুই হারিয়ে যেতে দেবে না। ছোট ছোট প্রত্যেকটি আনন্দের স্মৃতিকে বুকের মধ্যে সবচেয়ে বড় দেরাজটায় ঠিক যেভাবে লুকিয়ে রেখেছে, ঠিক সেইভাবে লুকিয়ে রাখবে ওর পড়ার টেবিলের দেরাজে।

অরুণ ভাবল, আচ্ছা, চাকরির কথাটা বলব এখন ? না থাক্‌, হোক্‌ তো আগে। বলবার মত চাকরি কিনা তাই বা কে জানে।

রুণু ভাবল নন্দিনীর চলে যাওয়ার খবরটা বলবে কিনা। —এই, জানো, নন্দিনী তার দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেছে।

—সে কি ? কোথায় ? অরুণ যেন কিছুই জানে না।

রুণু সংক্ষেপে বললে।

তারপর চুপচাপ।

অন্ধকারে রুণুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল অরুণ। ফিসফিস করে বললে, সেদিন খুব রাগ হয়েছিল, না ?

ঠেলে সরিয়ে দিল রুণু। হাসি-হাসি গলায় বললে, আরে পাগল, পিছনের লোকরা দেখছে।

দেখছে, দেখছে, দেখছে। যেখানেই যাও কোথাও কোন শান্তি নেই। পৃথিবীসুদ্ধ লোক শুধু দেখছে। বুভুক্ষুর মাঠ হয়ে আছে সব, আসলে তো দেখছে না, জ্বলছে। হিংসেয় জ্বলছে। অরুণ নিজেও তো এক সময় জ্বলত। বিরাম আর নন্দিনীকে দেখে। না, একদিন কিন্তু খুব ভাল লেগেছিল। কত আর বয়স হবে, দুজনেরই আঠারো উনিশ। ফুটপাত ধরে হাঁটছিল তারা কথা বলতে বলতে। দুজনেরই মুখের উপর এমন একটা মুগ্ধ ভাব ছিল, চারপাশে কোথায় কি ঘটছে, ভ্রূক্ষেপ নেই। হাসছিল তারা। অরুণের খুব ভাল লেগেছিল তাদের দিকে তাকিয়ে।

ওদের দেখেও, ওকে আর রুণুকে দেখে তেমনি ভাল লাগে না কেন সকলের ?

রুণুর কথা শুনে একটু রাগ হল অরুণের। ও সরে এল। বয়ে গেছে রুণুর সঙ্গে কথা বলতে, কাছ ঘেঁসে বসতে।

কিন্তু হাতটা চেয়ারের হাতলেই ছিল।

অন্ধকারের মধ্যে রুণুকে সিল্যুট ছবির মত লাগছে। পর্দার দিকে তাকিয়ে ছবি দেখছে।

হঠাৎ অরুণের হাতের ওপর ঠাণ্ডা মত কি লাগল। বাঃ, মন ভরে গেল। রুণুর আঙুলটা অরুণের হাতের পিঠে ছোঁয়া দিয়ে দিয়ে ঘুরছে, রাগ ভাঙাতে চাইছে আর কি।

ফিরে তাকাল অরুণ। কাছ ঘেঁসে গেল আবার।

রুণু বোধ হয় হাসছে। পর্দার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইশারায় বললে, ছবি দ্যাখো। কিন্তু হাতের ওপর হাতখানা আবার রাখল।

অথচ প্রথম যেদিন রুণুর হাতটা ছুঁয়েছিল, উঃ, লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল সেদিন।

তখন রুণুর এত মান-অভিমান ছিল না, এত সন্দেহ ছিল না। অরুণই বরং অভিমানে অপমানে বুকের মধ্যে কাঁদত।

কোথায় যাবে, দুদণ্ড মুখোমুখি বসবে? কলকাতা একটা উৎকট অভিশাপ, এখানে ভালবাসা আছে নাকি! প্রেমফ্রেম তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে শরীরের সিঁথিতে সিঁদুর লেপতে চাও তো কলকাতা তোমার দোস্ত্। স্রেফ দশ টাকার নোট একখানা এগিয়ে দিলেই নোংরা হোটেলের দরজা খুলে যাবে, ভিতর থেকে বেপরোয়া খিল্ দাও। বেরিয়ে এসে ফটক পার হও, সিপাইজী স্যালুট মারবে। কিন্তু বাইরে কোথাও একটু নিরিবিলিতে বসতে গেলে ফেউ লাগবে পিছনে।

ফাল্গুন মাস সেটা। রেডিওতে ফাগুন এসেছে-টেসেছে গান চলছে, কিন্তু আসলে তো পাঁজিতে বসন্ত। বেশ গরম। ভিক্টোরিয়ায় লোক গিজগিজ, অরুণ ভাবলে এর চেয়ে গঙ্গার ধারে...

—হ্যাঁ, সেই ভাল। ফুলের গাছটাছ নাকি লাগিয়েছে, আলো দিয়েছে। রুণু বললে।

প্রিন্সেপ ঘাটের দিকে চলে গিয়েছিল। ঈস্, সেখানেও ভিড়।

জেটির দিকে যাচ্ছিল ওরা, ওদের সামনে সামনে তিন চারটে সাজগোজ করা ফর্সা চামড়ার পাঞ্জাবী মেয়ে।

—গঙ্গায় আজকাল বেড়ে ইলিশ উঠছে রে। সাত আটটা ছেলে এর-ওর কাঁধে হাত দিয়ে বনমহোৎসবে পোঁতা চারা গাছের গোল বেড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের একজন কে বললে, মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে, রুণুর দিকে তাকিয়ে।

—ইলিশ? এ সময়? বুঝতে না পেরে চাপা গলায় রুণু এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রশ্ন করলে।

রুণুর সঙ্গে তখনও মনের দূরত্ব অনেক। স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারল না অরুণ, শুধু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। তখন ওরা বিশুদ্ধ স্বপ্ন, রঙিন ছবি। কুৎসিত কৌতূহল কিংবা ময়লা কথা ওদের গায়ে নোংরা ছিটিয়ে দিত। বৃষ্টির দিনে গাড়ি দেখে যেমন পালাতে হয়, তেমনি ওসব থেকে পালাতে চাইত।

কিছুটা নির্জন দেখে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসল দুজনে। অরুণের মনে হল রুণু যেন ইচ্ছে করে এক বিঘত জায়গা ফাঁক রাখল। এক বিঘত ঐ ফাঁকা জায়গাটা যেন অরুণের গালে একটা থাপ্পড় মেরে বলতে চাইল, তুমি তো পুরুষ, ঐ ইলিশ-দেখা ছোকরাগুলোর মত, তোমাকেই বা বিশ্বাস কি। অথচ অরুণ তখন কিছুই চায় না, কিছুই চায় না, শুধু রুণু বলুক ও যেমন দেখা করার জন্যে, কথা বলার জন্যে, কাছে বসার জন্যে ছটফটিয়ে মরছে, রুণুর মনেও তেমনি কোন অসহ্য যন্ত্রণা। —না রে সুজিত, মেয়েরা ভালবাসে না। ওরা শুধু

ভালবাসা পেতে চায়।

টিকলু হেসেছিল অরুণের কথা শুনে। —বুঝেছিস তা হলে ? ও আমার জানা আছে। তুই শালা সল্‌তে হয়ে জ্বলছিস, রুণুর মুখ আলো হবে, দেখে বলবি, রুণুর হাসিটা মাইরি ফাইন। ব্যস, ওরা খুশি।

টিকলু ঠিকই বলে। বোকামি ছাড়া আর কি।

বোকা বোকা চোখ মেলে অরুণ অন্ধকার জলের ওপর কুচি কুচি পোখরাজ দেখল, দূরে চলন্ত মোটর-লঞ্চ দেখল, জাহাজ দেখে মনে হল, ওর কোথাও যেন কেউ আছে, কে আছে, সেখানেই ও চলে যেতে চায়। এখানে, এখন, ওর কেউ নেই। একটু আগে দুজনে ফুল হয়ে গিয়েছিল, ইলিশ-খোঁজা ছেলেগুলো নোংরা ছিটিয়ে সব মাটি করে দিয়েছে।

রুণু চুপ করে বসেছিল। অন্ধকারেই ও একবার হাতের ঘড়িটা দেখল।

অরুণ ঠাট্টা করে চাপা ক্ষোভে বললে, আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

রুণু হেসে ফেলল। তারপর বললে, শুনুন, সত্যি তাড়াতাড়ি যেতে হবে। রোজ রোজ কত নতুন অজুহাত দেওয়া যায় বলুন।

অরুণের সেদিনও ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল রুণুকে ও ছোঁবে। ওকে একটুখানি ছুঁতে পারলেই যেন বুকের জ্বালাটা জুড়িয়ে যাবে। এই অসহ্য অতৃপ্তি থেকে পরিত্রাণ পাবে। এ এক অসহ্য যন্ত্রণা। দিনের পর দিন প্রতিটি মুহূর্ত যে ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, এক পলকের জন্যেও যাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারছে না, সে সত্যি সত্যি যখন কাছে আসে, মনে হয় চলে যাবার জন্যেই যেন এসেছে। রক্তের মধ্যে যাকে অনুভব করছে, হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁতে পারছে না। রুণু যেন ওর হৃৎপিণ্ডের মতই। সবচেয়ে আপন, অনুভব করা যায়, হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না।

অরুণ বললে, আরেকটু। আব একটু বসি।

—না না, এবার উঠি। রুণু বললে। কিন্তু উঠল না।

অরুণেব মন সাহস পেল। ও হাত বাড়িয়ে রুণুব হাত ছুঁল।

সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিল রুণু।

সমস্ত পথ অরুণ একটাও কথা বলল না। অপমানে, নাকি হতাশায়, ওর সমস্ত মুখ কেমন যেন হয়ে গেছে। রুণুর দিকে তাকাতেও লজ্জা। ধরা পড়ে যাবাব ভয়।

বাসে তুলে দিতে গিয়ে আর চুপ করে থাকতে পাবল না অরুণ। ও ছুঁতে চায় না রুণুকে, কিছুই চায় না, ভালবাসা চায় না। ও শুধু ভালবাসতে চায়।

ভালবাসাই তো ওর জীবনে এখন একটামাত্র নোঙর।

বাসের পাদানিতে পা দিয়েছে রুণু, অরুণ বলে উঠল, শুক্কুরবার আসবে ? শুক্কুরবার তো তোমার তাড়াতাড়ি ছুটি হয়।

রুণু ফিরে তাকাল, হাসল। —অসম্ভব, শুক্কুরবারে তো দোল।

দোল। দোল। শেষ মুহূর্তের একটা ক্ষীণ আশায় পাম্প কবা হ্যাজাক বাতির মত ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। রুণু তার চাবিটা নির্দয়ভাবে ঘুরিয়ে দিল।

অরুণ একটা ক্লান্ত অবসন্ন গোল খাওয়া খেলোয়াড়ের মত টলতে টলতে ফিরে এল। —আমি ভীষণ লাকি রে টিকলু। ভীষণ লাকি।

অসম্ভব। শুক্কুরবার তো দোল।

কোন্‌টা অসম্ভব ? আর কোনও দিন দেখা কবা ? না শুক্কুরবার দোল, তাই দেখা করতে পারবে না রুণু। এ কদিন বুকের মধ্যে শুধু খাঁ খাঁ।

দূরে কোথায় কে ঢোলক বাজাচ্ছে। 'হোলি হায় হোলি হায়' চিৎকার করে উঠল এক

দঙ্গল ছেলে। সামনের রাস্তায় হাসি চিৎকার, পিচকিরি, রঙ, আনন্দ। টিকলুরা এলেও অরুণ এবার আর দোল খেলতে বেরোবে না। অসম্ভব, অসম্ভব, দোলের মধ্যে এবার আর কোন রঙ নেই!

—হ্যাঁ রে, তোর চোখ লাল হয়েছে কেন? জ্বরটর হয়নি তো।

কনকলতা বাঁ হাতে কপাল টিপে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে এলেন। অরুণের কপালে হাত দিয়ে আঁতকে উঠলেন। —এ কি রে, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে যে! শুয়ে থাক্‌, শুয়ে থাক্‌।

কনকলতা মাথার যন্ত্রণায় ভাল করে হাঁটতে পারছিলেন না। দেয়ালে হাত দিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন।—শুনছ, অরুণের ভীষণ জ্বর। ডাক্তার ডাকার কেউ তো নেই, তুমিই যাও।

গা পুড়ে যাচ্ছে? কই, অরুণের তো কোন কষ্ট নেই। ও তো বুঝতেও পারেনি। ওর শুধু একটাই কষ্ট।

রুণু ওকে একটুও ভালবাসে না, একটুও না। কিন্তু ভালবাসা যে ওর চাই-ই চাই। যে কেউ, যার হোক্‌। মনে মনে বললে, ঊর্মি, তুই আমাকে একটু ভালবাসলেও তো পারিস। কিছু না, তুই তো স্মার্ট মেয়ে, তুই শুধু একটু অভিনয় করবি। মার মত কপালে হাত দিয়ে রুণু তো জ্বর দেখবে না, ও আমাকে ছোঁবে না, ছোঁবে না। ঊর্মি, তুই পারিস না একটু কপালে হাত দিতে? আমি কথা দিচ্ছি, তোর ওপব আমার আর কোন লোভ হবে না। আমি টিকলু নই। তুই শুধু আমার কপাল ছুঁবি। তোর হাতখানা একবার মুঠো করে ধরব। দুশ্‌শালা! চোখে জল এসে গেল যে। বালিশটা ভিজে ভিজে লাগছে। অরুণ হেসে ফেলল। আর মিলুর গলা শুনে তাড়াতাড়ি বালিশটা উল্টে দিল।

—দাদা, তোর একটা চিঠি ছিল রে লেটাব বক্সে। মিলু ছুটতে ছুটতে এল।

হাত বাড়িয়ে ভারী খামটা নিল অরুণ। ছিঁড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঝুরঝুর করে খানিকটা আবির ঝরে পড়ল। গোলাপী কাগজে মোড়া এক মুঠো সুগন্ধি আবির।

নাকের কাছে নিয়ে অগুরুব গন্ধ শুঁকল অরুণ।

—কে পাঠিয়েছে রে? মিলু জিজ্ঞেস করল।

খামের ওপরে হাতের লেখাটা দেখল অরুণ। কিন্তু দেখার দরকাব ছিল নাকি। আবিরের গন্ধেই ও টের পেয়েছে। সমস্ত মন, সমস্ত শবীর মাউথ অর্গ্যান হয়ে গেছে।

আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল অরুণ, আবিরসুদ্ধ খামটা মাথায় উপুড় করে দিল। চুলের ভিতরে ভিতরে আঙুলকে কাঁকুই কবে ছড়িয়ে দিল। আবির মাখা হাতটা বুকের ওপর রাখল।

দুর্‌, কে বলে প্রেমের মধ্যে যন্ত্রণা আছে। প্রেম চন্দনের মত ঠাণ্ডা, চন্দনেব মত।

□

সোনার মা চেঁচাচ্ছে। দিনরাত চেঁচাচ্ছে। এত চেষ্টা করে, এত ধমকধামক দিয়েও ওর অভ্যাস বদলানো গেল না। কান ঝালাপালা হয়ে যায়। কে বলবে ভদ্দরলোকের বাড়ি। একবার রেগে গিয়ে অরুণ বলেছিল, এত চিৎকার চেঁচামেচির কি দরকার, কাজ পছন্দ না হয় ছেড়ে দিলেই পার। আরে ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব হয়! ব্যস, তারপর দু দিন কামাই। কনকলতাও রেগে গিয়েছিলেন অরুণের ওপর। যা, এবার লোক জোগাড় করে আন। আনলেও থাকত নাকি, সোনার মা তাকে দুধের দোকানে দেখতে পেলে শাসাবে।

—আমরা সব, বুঝলি সুজিত, ঝি-চাকরদের চাকর হয়ে গেছি। একটা কড়া করে কিছু বলার উপায় নেই রে!

উপায় থাকবে না কেন, ঘুম থেকে উঠে ছোট্ তুই বোতল হাতে, দুধের ডিপোয়। বাজার কর, কলাপাতা আনতে ভুলে গেলে মার কাছ থেকে মুখ-ঝামটা খাও। সোনার মাকে তো তাড়ালি, বাসন মাজবে কে!

সব সুখ কোথাও পাবে না। তাই সোনার মার চিৎকার শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে অরুণ। আজও সেই এক অভিযোগ, এত বাসন বের করে দিলে পারে কেউ। রোজ রোজ পোড়া কড়াই, এত বাড়িতে কাজ করলুম, এমন নেদ্দয় বাড়ি দেখিনি। আমার শরীলটা শরীল নয়?

আসলে ওসব কিছু না। অরুণ বুঝে গেছে সোনার মা চেঁচাবেই। পোড়া কড়াই কিংবা ঘর মোছার ন্যাতা কিংবা রান্নাঘর ধোয়ার ঝাঁটা নিয়ে। কিচ্ছু খুঁজে না পেলে অন্য বাড়ির বিরুদ্ধে গজগজ করবে।

মরুকগে, আমার সঙ্গে আর বাড়ির কি সম্পর্ক, যার যা খুশি করুক না। অরুণ ভাবলে।

মা জ্বর হয়ে মাথার যন্ত্রণা নিয়ে পড়ে আছে। একজন ভাল ডাক্তার দেখানোর দরকার। দু-একবার পি. জি-তে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেও হয়েছে অরুণের। কিন্তু বাবা না বললে, তারই বা কি করার আছে। কে বড় আর কে ছোট ডাক্তার সেই মীমাংসায় আসতেই তো আধ ঘণ্টা ভ্যাজ-ভ্যাজ শুনতে হবে।

--অরুণ! প্রকাশবাবু হঠাৎ ডাক দিলেন।

সোনার মার চিৎকার তখনও চলছে, কিন্তু কেউ কানে নেয় না। এ বাড়ির ব্যাক-গ্রাউণ্ড মিউজিক ওটা। মিলু রেডিওটা জোরে চালিয়ে দিলে তো পারে। লোকে জোরে রেডিও চালালে দু-একজন আবার কালচার ঝাড়ে। আরে বাবা, এই সব চিৎকার চেঁচামেচি ঘরোয়া ঝগড়া চাপা দেবার জন্যেই তো রেডিও। গভর্নমেন্ট ভাবছে রেডিও খুব পপুলার।

—কিছু বলছেন? অরুণ গিয়ে দাঁড়াল প্রকাশবাবুর সামনে।

—তোর ছোটমেসোর কাছে গিয়েছিলি? কি বললে?

আজকের সারাটা দিন তো এখন সেই ঝামেলাতেই কাটবে। লম্বা-চওড়া কথা তো বলে, কত ধানে কত চাল দেখাই যাক না।

ছোটমাসীরা থাকে গড়িয়াহাটের কাছে, একটা দোতলার ফ্ল্যাটে। মিলুকে নিয়ে গিয়েছিল।

নীচের তলায় বেতের চেয়ারে বসা খাকি হাফপ্যাণ্ট পরা বুড়োটার চেহারা মনে পড়তেই হেসে ফেললে। —কিচ্ছু করবে না, কিচ্ছু করবে না, চলে যাও গটগট করে।

বলেই বাঘের মত কুকুরটার নাম ধরে ডাকল, জিমি! জিমি!

অচেনা লোক দেখে কিচ্ছু করবে না যদি, তো কুকুর পুষেছ কেন হে?

ছোটমেসোও তেমনি। —ভয় পেও না, ভয় পেলেই কামড়ায়।

যাব্বাবা, ভয় কি সিনেমা হলের পর্দা, সুইচ টিপে সরানো যায়? মেয়েদের কাছে প্রেমটাও তাই কিনা কে জানে। দিব্যি অন্যদের সঙ্গে হেসে খেলে আড্ডা দিয়ে কাটাবে, হিসেব করে একটা দিন দেখা করবে, তখন চোখ ছলছল, গাঢ় গলার কথা। অরুণ এদিকে চব্বিশ ঘণ্টা জ্বলে মরে। রুণু ভালোটালো বাসে না, বাসে না, নেহাত দেখছে একজন কাবু হয়ে পড়েছে!

সেদিন সিনেমা দেখতে গেল, অরুণ ভাবলে সিনেমার পর কোথাও ফাঁকায় গিয়ে বসবে, যদি পাটনা যাওয়ার কথাটায় কোনও ভুল বোঝাবুঝি থাকে, প্রমাণ দাখিল করবে। কোথায় কি, ছবি শেষ হয়নি, অরুণ হঠাৎ লক্ষ করলে অন্ধকারেই রুণু মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছে। সরবতের গ্লাসের স্ট্রতে বাচ্চাদের দুবার মুখ দিতে দিয়ে 'আর খেও না' বললে যেমন লাগে, রুণু তেমনি একটা অতৃপ্তি। এসেই চলে যেতে চাইবে।

তবু অরুণ একটু আশায় আশায় ছিল। ভেবেছিল, ছবি শেষ হওয়ার আগে অন্ধকার থাকতে থাকতে তো বেরিয়ে পড়ে রুণু, পাছে আলো জ্বললে কেউ দেখে ফেলে, চিনে ফেলে, সেজন্যেই হয়তো ঘড়ি দেখছে। তা না, রুণু হঠাৎ বললে, এই, তুমি দ্যাখো। আমি চলি, দেরি হয়ে যাবে।

কি খারাপ লেগেছিল। তুমি দ্যাখো! আমি যেন সিনেমা দেখতেই এসেছি, টিকিটের পয়সা উসুল না করে উঠব না।

সে দিনটাই বরবাদ। ভেবেছিল, আর কোনওদিন রুণুর সঙ্গে দেখা করতে চাইবে না। রুণুর কথা ভাববে না। অথচ ঘুরে ঘুরে পুরনো দৃশ্যগুলোই চোখের সামনে ভাসে। দোলের দিনে যখন আবির পাঠিয়েছিল, তখন নিশ্চয়ই ভালবাসত রুণু। —এখন—অয়ন হয়তো আবার ওর মন জুড়ে বসেছে। কি নাম রে বাবা—অয়ন!

তবু যা হোক, এরই ফাঁকে টিকলুদের প্রেসের ফোন নম্বরটা বলে দিয়েছে এক সময়। লিখে নিতে বলেছিল, রুণু এমনভাবে 'মনে থাকবে রে বাবা, মনে থাকবে' বলে উঠল যে, আর জোর করতে সাহস হয়নি। টিকলুর বাবা দুপুরে যখন খেতে যায় তখন ফোন করতে বলেছে অরুণ। করবে কিনা কে জানে।

ছোটমাসীর বাড়িতে গিয়ে টেলিফোনটা দেখে অরুণের খুব লোভ হয়েছিল। ঈস্, অরুণদের বাড়িতে যদি একটা ফোন থাকত, কি মজাই না হত। কথা বলতে অবশ্য পেত না, মা ঠিক জিজ্ঞেস করত, কে কথা বলছিল রে! কথা না-ই বা বললাম, বিরাম আর ওর আগের লাভার কেয়া যা করত, ক্রিং ক্রিং দুবার বাজল, অন্য কেউ রিসিভার তুললেই কাট। মানে নির্দিষ্ট জায়গায় যাচ্ছি, তুমি চলে এস।

প্রকাশবাবু বললেন, তা অ্যাপ্লাই করে দে, দেরি করছিস কেন। বলেছে যখন···

অরুণ বললে, হ্যাঁ, আজকেই করে দেব।

আসলে যেখানে ওর নিজের মনেও খিঁচ লেগে গেছে সে ব্যাপারটা আর বলল না। বাবা তো সেই আদ্যিকালের লোক, বলে বসবে, না না, চুরি জোচ্চুরি করে ও চাকরির দরকার নেই। অরুণের নিজেরও অবশ্য ভাল লাগছে না, কিন্তু না করেই বা উপায় কি। ছোটমেসোও তো একজন গাভমেণ্ট অফিসার, গেজেটেড অফিসারের সার্টিফিকেট দিতে পারে। সে যখন বলছে—

রেফ্রিজারেটার কিনেছে।

চাকর গোপেনকে ছোটমাসী বলেছিলেন, ফ্রিজ থেকে জল দিও গোপেন।

মিলু দেখে তো আহ্লাদে আটখানা—লাভলি! কি সুন্দর দেখতে রে দাদা।

অরুণ ঘাড় নেড়ে বলেছিল, হ্যাঁ! কত দাম ছোটমাসী?

ছোটমাসী এড়িয়ে গিয়ে বলল, কত যেন, হায়ার পারচেজে কেনা তো। অনেক বেশি লাগে।

ভাঙা টেবল ফ্যানটায় ঘটাং ঘটাং আওয়াজ হয়, মিলুর পড়ার ঘরের পাখা তো প্রায়ই খারাপ, কিন্তু বাবাকে বলে বোঝাতে পারল না অরুণ, যে একসঙ্গে যখন অত টাকা দেয়া যাবে না, তখন হায়ার পারচেজে পাখা কিনলে দোষ কি।

—তুই পাগল হলি নাকি? ও তো কাবলের সুদকেও হার মানায়। ওসব ফোতো লোকদের জন্যে। বাবা একদিন বলেছিল। —ধারদেনা করে জিনিস কেনা আমি বেঁচে থাকতে হবে না।

হায়ার-পারচেজ নাকি ধারদেনা। বাবা সেই সেকেলেই রয়ে গেল। কিছুতেই বোঝানো গেল না ভবিষ্যৎ ভেবে ভেবে বুড়িয়ে গিয়ে লাভ হয় না।

সুজিতও একদিন বলেছিল, এখনই যদি সব না পেলাম, বুড়ো বয়সে পেয়েই বা কি

লাভ।

টিকলু সায় দিয়েছিল। —বেড়ে বলেছিস সুজিত। আরে বাবা, লাইফটাকে একটা হায়ার-পারচেজ করে নে। এখন ভোগ কর, পরে দাম দিবি। তা না, এখন চিনেবাদাম খেয়ে পেট ভরাও, শালা ফল্‌স্ টিথ দিয়ে মাংস চিবোনোর আশায়।

অরুণের নিজেরও সে কথা মনে হয়। এক এক সময় ছোটমেসোকে মনে হয় চৌকোশ লোক, এ যুগের মানুষ। বাবার মত পাপপুণ্য, পাঁজি-পুজো, হৃষিকেশবাবুকে নিয়ে বসে নেই।

অরুণ যেতেই সাফ-সাফ কথা ছোটমেসোর। —দেখো বাপু, তেল সবাই দেয়। তবু কাজ হয় না কেন জান ? তেল দিতে জানা চাই। পেট্রোলের জায়গায় পেট্রোল, মোবিলের জায়গায় মোবিল দিতে হয়। উল্টোপাল্টা হলেই ইউ নো হোয়াট উড হ্যাপ্‌ন।

তারপর বলেছিলেন, তোমার বাবা তো চাকরি চাকরি করে খেয়ে ফেললে।

অরুণের তখন অবশ্য খারাপ লেগেছিল। ডাঁট ! 'তোমাব বাবা কি রে, বড় ভায়রাভাই, 'দাদা' বলতে পার না ?'

তবু মোবিলের জায়গায় মোবিল দিয়েছে অরুণ, হেসে বলেছে, বাবা আপনাকে ছাড়া আর কাকে বলবেন। কে আছে আর ?

ছোটমেসো খুশি হয়েছেন। তোষামোদ এমনি জিনিস বাবা, ধরতে পারলেও ভাল লাগে। কি করে দরখাস্ত-টবখাস্ত কবতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে বলেছেন, শুধু গ্র্যাজুয়েট লিখবে, এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছি লিখবে না, আর এক্‌স্‌পিরিয়েন্স আছে বলে এমপ্লয়ার্স সার্টিফিকেট দেবে সঙ্গে।

অরুণ অবাক হয়ে চোখ কপালে তুলেছে। —আমি তো চাকরিই করিনি। চাকরি পেলে আর চাকরি খুঁজব কেন ?

ছোটমেসো হা হা করে হেসে একটা নাম ঠিকানা লিখে দিয়ে বলেছেন, অবিনাশবাবুর কাছে গিয়ে দেখা কর, আমি ফোনে বলে রাখব। ওঁর একটা ফ্যাক্টরি আছে।

এ ধরনেব একটা জাল সার্টিফিকেট দিয়ে চাকবি ! তা চাকরি হওয়া নিয়ে কথা, সুতরাং অরুণ ঘাড় নেড়ে বলেছে, তা নিয়ে আসতে পাবব।

কিন্তু ওখান থেকে চলে এসে ওব খুব খাবাপ লেগেছে। এ যেন টিকলুর মত টুকে পাস কবা, যোগ্যতার জন্যে চাকরি পেলাম ভাবতেও পাবব না। মরুক গে। যোগ্যতা দেখিয়ে কতই যেন চাকরি হচ্ছে।

বাবার কাছে ব্যাপারটা স্রেফ চেপে গেল অরুণ।

তারপর দুপুরে অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল। ছোটমেসোর নাম করতেই অবিনাশবাবু বললেন, হ্যাঁ, ফোন তো আমাকেও করেছেন। কিন্তু তা কি সম্ভব নাকি ?

—তা হলে ? অরুণ আশা করে এসেছিল, কথা শুনেই বসে পড়ল। বসে পড়ল মানে উঠে দাঁড়াতে গেল। অফিস টাইমে ঠেলেঠুলে বাসে উঠলাম, মাঝপথে ব্রেকডাউন—যাবে না, যাবে না, নেমে পড়ুন।

অবিনাশবাবু বললেন, তবে একটা কিছু তো করতেই হবে।

তাব মানে অবিনাশবাবু একটা ক্ষুদে ফ্যাক্টরির মালিক। ছোটমেসোর চেয়ে সেই বা কম কি। অতএব একটু উপেক্ষা করে, একটু সম্ভ্রম দেখিযে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করলেন।

বললেন, আরে ভাই, অডিট আছে, ইনকাম-ট্যাক্স আছে, স্যালারি বিল আছে, অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার আছে। লিখে দিলেই হল নাকি।

অরুণ সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়াল। —উনি বললেন বলেই এলাম।

—দাঁড়াও হে, দাঁড়াও। অবিনাশবাবু হাসলেন। —তোমাদের একালের ছেলেদের

দেখছি মাথা গরম হয়েই আছে। শোনো—

বলে কোম্পানির লেটার হেডের প্যাড থেকে একখানা নাম ছাপা কাগজ নিয়ে এগিয়ে দিলেন। —এই নাও, যা খুশি লিখে নীচে আমার হয়ে সই করে দিও। ওসব কেউ এনকোয়ারি করে না, গাভমেণ্ট সার্ভিস তো নয়।

বাঃ, তা হলেই তো হয়। অবিনাশবাবুর সই তো আর কেউ চেনে না। একটা সার্টিফিকেট নিয়ে কথা।

ছোটমেসোর কথামত দরখাস্ত সার্টিফিকেট সব পাঠিয়ে দেওয়ার পর কিন্তু কেমন খারাপ লাগল অরুণের। বুকের মধ্যে খিচখিচ। চাকরি পেলেও শান্তি থাকবে না, স্বস্তি থাকবে না। 'কেউ এনকোয়ারি তো করে না'। করে না ঠিকই, কিন্তু তা হলে তুমি বা লিখে সই করে দিলে না কেন ? মানে, যদি কখনও কেউ পিছনে লেগে ধরিয়ে দেয় তখন উনি স্রেফ গা বাঁচাবেন—সে কি, আমার সই তো নয়, নিশ্চয় কেউ লেটার হেড চুরি করে···

অরুণ দরখাস্ত পাঠানোর আগে অবধি খুশিতে ডগমগ করছিল, এমন কি সুজিত আর টিকলুর ওপর যে একহাত নেওয়া যাবে তাও ভেবেছিল। জলজ্যান্ত একটা চাকরি, খুশি হবে না ?

কে জানে, ছোটমেসোর সাজানো ফ্ল্যাট, রেফ্রিজারেটার, হামবড়াই ভাব—এসবের মধ্যেও হয়তো এমনি সব খিচখিচ আছে, কাঁটা বিঁধছে।

ছোটমেসোর বাড়ি থেকে সেদিন ফেরার সময় মিলু বলেছিল, বেশ মজাসে আছে ওরা, না রে দাদা ?

অরুণ তিক্তভাবে বলেছিল, ফুটানি শুধু।

পরে মনে মনে বলেছিল, আমরা সবাই বোধ হয় ছোটমেসো হতে চাই। পারব না তো, তাই টেনে লাথি মারতে ইচ্ছে করে।

নিশ্চয়ই তাই। তা না হলে গাড়ি চালাচ্ছিল যে লোকটা, বাচ্চাটাকে দেখে জোরে ব্রেক কষা সত্ত্বেও টিকলু তাকে ধাঁই করে একটা বদ্দা মেরেছিল কেন ? মেরেটেরে পরে বলেছিল, ও ব্যাটার কিন্তু দোষ ছিল না মাইরি !

□

আহা, রুণুর যেন ইচ্ছে করে না। অরুণের কথা শুনলে এমন হাসি পায় এক এক সময়। যেন অরুণেরই শুধু দেখা করতে ইচ্ছে করে, অনেকক্ষণ কাছাকাছি থাকতে ইচ্ছে করে, গল্প করতে ইচ্ছে করে। আর রুণুর বুঝি কিছু ইচ্ছে করে না ?

শেষ অবধি সিনেমা দেখার কি উপায় ছিল নাকি ? অরুণ হয়তো ভেবেছিল ওখান থেকে বেরিয়ে কোথাও গিয়ে একটু বসবে, গল্প করবে। রুণু তাড়াতাড়ি হল থেকে বেরিয়ে পড়াতে, অরুণ···নিজের মনেই হেসে ফেলল রুণু···নন্দিনী থাকলে গাল ফুলিয়ে দেখাত অরুণ কি রকম রাগ করেছে। তারপর দু জনে মিলে খুব হাসত। আর হাসতে হাসতে রুণুর একটু কষ্টও হত। এখনও তো সত্যি কষ্ট হচ্ছে। শুধু তো একটু সময় চেয়েছিল বেচারা।

নন্দিনীর জন্যেও একটু কষ্ট হয়। যা বোকাসোকা মেয়ে। গিয়ে নিশ্চয় বিরামের সঙ্গে দেখা করেছে, কিন্তু তারপর ? ছেলেদের কি কোন বিশ্বাস আছে নাকি ? সবাই তো আর অরুণের মত ভাল নয়। নন্দিনী ওকে প্রচণ্ড একটা অভাব দিয়ে গেছে। নন্দিনীর অভাব। দিব্যি দু জনে মিলে মন খুলে কথা বলতে পারত, সুখ-দুঃখের কথা, প্রচণ্ড অভিমান কিংবা প্রকাণ্ড আনন্দের কথা। বাড়ির অবস্থা তো ভাল নয়. পড়াশুনো শেষ করে হয়তো চাকরি

করতেও হতে পারে রুণুকে। মামার কাছে আছে তো সেইজন্যেই। বাবা মাঝে মাঝে দেখা করতে আসে বহরমপুর থেকে। একদিন হঠাৎ এসে হাজির, এদিকে বাস-স্টপে গিয়ে দেখা করার কথা অরুণের সঙ্গে। যেতে পারেনি, অরুণ নিশ্চয় অপেক্ষা করে করে ফিরে গেছে। পরে যখন জিজ্ঞেস করলে, 'সেদিন রাগ করেছিলেন ?' অরুণ হেসে উঠে বললে, 'না না, দিব্যি কফি হাউসে গিয়ে ঊর্মির সঙ্গে আড্ডা দিলাম।' মানে, বোঝাতে চাইলে, কেউ না থাক, ঊর্মি তো আছে। অরুণের সব ভাল, রেগে গেলে এত আঘাত দিয়ে কথা বলে। রাগটা কিজন্যে, না, রুণু নাকি ওকে ভালবাসে না। ওর একটু একটু সন্দেহ হচ্ছিল, পাটনা যাওয়ার কথা একেবারে বানানো। স্রেফ সেদিনের ব্যাপারটার শোধ নেবার জন্যে ইচ্ছে করে আসেনি। আসেনি অথচ কষ্ট পেয়েছে। অবশ্য বলা যায় না, ওসব কিছু নাও হতে পারে, ঊর্মির সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে ভুলেই গিয়েছিল হয়তো। সেই সব কথা, কিংবা আজকের সিনেমা হল থেকে হঠাৎ চলে আসার কথা নন্দিনীর কাছেই বলতে পারত। মন হাল্কা হত। অথচ এখন সব নিজের মনের মধ্যেই চেপে রাখতে হচ্ছে। আরে দুর্, নন্দিনী থাকলে নিজের কষ্টের কথা বলত নাকি। শুধু অরুণ ওকে কি ভীষণ ভালবাসে সে কথাই বলত। দিব্যর কথা কিংবা অয়নের কথাই বা কতটুকু বলেছে। রুণুর হঠাৎ দিব্যর কথা এক ঝলক মনে পড়ল। কি ঝকঝকে চেহারা, প্রথম প্রথম খুব ভাল লেগেছিল, একটু একটু আদর পেয়েছিল। তবু, এখন আর স্পষ্ট কিছুই মনে পড়ে না। আচ্ছা, দিব্য এসেছিল, তারপর অয়ন--হ্যাঁ, অয়নকে সত্যি ভালবেসেছিল। এখন মনে পড়লেও রাগে মাথার শিরা দপ্‌দপ্ করে। অরুণকে একদিন একটু বলেছিল অয়নের কথা, তারপর হাসি হাসি চোখে অরুণের মুখখানা দেখে আরও হাসি পেয়েছিল।

রুণু ভাবলে, আচ্ছা, তাহলে আমি কি খারাপ ? কেউ শুনলে তাই ভাববে হয়তো। বাঃ রে, ও খারাপ হবে কেন, ও তো বার বার ভুল করছে। বুঝি না বাবা, ভুল হয়েছে জেনেও তাকেই ভালবাস, বিয়ে কর, সবাই ভাল বলবে। ভুল শুধরে নিতে গেলেই—খারাপ, খারাপ। এ-সব কথা নন্দিনীও বোঝে না।

ডাক্তার রুদ্রর কথাও এখন আর কাউকে বলার উপায় নেই। মামার কাছে আসে, গল্প করে, বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ। দারুণ স্মার্ট। কিন্তু লোকটাকে একটুও ভাল লাগে না। বিরামকেও বিশেষ ভাল লাগত না।

ডাক্তার রুদ্রর চোখ দুটো ঝকঝক করছে, ছটফটে স্বভাব, দিব্যি রোজগার করছে নাকি এই বয়সে। গাইনোকোলজিস্ট তো, ওদের আজকাল খুব পসার। মামাবাবু অবশ্য মামীমাকে একদিন বলছিলেন, টাকাই কামাচ্ছে, কি করে কামাচ্ছে আমার জানতে বাকি নেই। মামাবাবু ঠিকই বলেন, লোকটার চাউনি ভাল লাগে না রুণুর। ভাব দেখায় যেন সরল পুঁটি, হাঁকডাক করে রুণুর সঙ্গে কথা বলে, একদিন সিঁড়িতে মুখোমুখি পড়ে গিয়ে ভীষণ ভয় পেয়েছিল রুণু।

বাড়ি ফিরে দরজার আশেপাশে ডাক্তার রুদ্রর গাড়িটা না দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হল। তরতর করে ওপরে উঠে এল। টেলিফোন বাজছে শুনে বুকটা ধড়াস করে উঠল। সকালে অরুণ ফোন করেছিল, তারপর থেকে টেলিফোন একটা আতঙ্ক হয়ে গেছে। অরুণ নয় তো ?

এসে দেখলে মামীমা রিসিভার তুলেছেন।

--রুণু, দ্যাখো তো কে, তোমাকে চাইছে।

মামীমার হাত থেকে রিসিভার নিতে গিয়ে হাতটা কেঁপে গেল। আরে দুর্, বলে দেব কলেজের ছেলে, একসঙ্গে পড়ি।

—অ্যাঁ ? নন্দিনী তুই ?

মামীমা চলে যাচ্ছিলেন, নন্দিনীর নাম শুনে, রুণুকে চোখ বড় বড় করে কথা বলতে দেখে থেমে গেলেন।

অনেকক্ষণ ধরে টেলিফোনে কথা বলল রুণু। কথা বলতে বলতে ওর ভুরু কুঁচকে গেল। দেখেছ কাণ্ড, অরুণকে ও এত বিশ্বাস করে, মনে করে ওর কাছে কিছু গোপন রাখতে পারে না অরুণ, অথচ আজ এমন ভান করলে যেন নন্দিনীর সম্পর্কে কোনও খবরই রাখে না। বিরাম বলতে বারণ করেছিল বলে রুণুকেও বিশ্বাস করে বলতে পাববে না ? তাহলে আর তার মুখের কথাকেই বা কি বিশ্বাস। হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে বলেছিল, 'ঊর্মি ? তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ? ফ্রেণ্ড, আবার কি !' তাবপর গাঢ় গলায় কৌতুক মিশিয়ে বলেছিল, বোকা মেয়ে, তার সঙ্গে প্রেমফ্রেম থাকলে তোমার জন্যে ছটফট করব কেন ?

রুণু কত সহজে বিশ্বাস কবেছিল।

—কি বললে ? কোথায় আছে ? মামীমা জিজ্ঞেস করলেন।

সব বললে রুণু। বললে, ওর দাদাকে চিঠি দিয়েছে।

নন্দিনীর জন্যে দুশ্চিন্তায় বুকের ভেতরটা কেমন ভারী ভাবী ছিল, এতদিন বুঝতেই পারেনি। এখন একেবাবে হাল্কা লাগছে নিজেকে।

নানা কথা, আলোচনা, তার পর এক সময় নিজের টেবিলেব সামনে এসে বসল রুণু। চাবি বেব করে দেবাজ খুলল। ওর সেই টুকরো টুকরো করে জোগাড় করা সুখেব দেরাজ। একটা বড় খামের মধ্যে সিনেমাব ছেঁড়া টিকিট দুটো বাখল। অরুণের সঙ্গে যতবার সিনেমা দেখেছে টিকিটের টুকরো দুটো চেয়ে নিয়েছে, সাজিয়ে রেখে দিয়েছে এই খামের মধ্যে। টিকিটগুলো বের করে একবার গুনল, গুন গুন কবল মনের মধ্যে, আবাব রেখে দিল।

প্রথম যেদিন টিকিট দুটো চেয়েছিল, অরুণ অবাক হয়ে গিয়েছিল। —কি হবে ?

রুণু হেসে বলেছিল, আমাব জানেন একটা দেরাজ আছে, তাতে সব জমিয়ে রাখি, মাঝেমাঝে বের কবে দেখতে এত ভাল লাগে…

অরুণ হেসে বলেছিল, আমার বুকের মধ্যে একটা দেবাজ আছে। সেখানে আমি সব জমিয়ে রাখি, সব।

সক্কলের আছে, সক্কলের। টুকরো টুকরো সাধ, টুকরো টুকরো আনন্দ সেখানে জমা হয়ে থাকে।

নন্দিনীর সঙ্গে একবার খুব ঝগড়া হয়েছিল রুণুব। প্রায়ই হত, তারপর আবার মিটমাট। সেবার নন্দিনী খুব বড় একটা চিঠি লিখেছিল, নন্দিনী ওকে কত ভালবাসে সে কথা জানিয়ে। সেই চিঠিটা দেরাজ থেকে বেব করে রুণু একবার পড়ল।

নন্দিনীর ওপর যত রাগ সব জল হয়ে গেল। মনে হল নন্দিনীর চেয়ে আপন আর কেউ নেই।

প্রেম কি রুণু তা আগে জানতই না। এখন তো মনে হয় এটাই প্রেম, আসল প্রেম। এর আগের দুটো—ছোট্ট, একেবারে ছোট্ট। নন্দিনীকে সে গল্প সাত কাহন করে বলেও ছিল। তখন অরুণের সঙ্গে আলাপও হয়নি। এখন ভাবলে কখনও মুখে ক্যাডবেরি রাখার মত মিষ্টি মিষ্টি লাগে, কখনও আবার অনুরাধার দাদাব সেই 'তোমার মত সুন্দর দেখি নাই' চিঠির মত হাসি পায়।

—অয়ন ? খুব সুন্দব নাম তো ? অরুণ বলেছিল।

রুণুর নিজের কেমন অপরাধী অপরাধী লাগত, অয়নের কথা তাই একদিন আভাসে বলেছিল অরুণকে। যখন বলেছিল, তখন অয়ন শুধুই একটা নাম, মুছে যাওয়া সুন্দর একটি নাম।

—আমার কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল—অরুণ হেসে উঠেছিল কথা বলতে বলতে

বলেছিল, আমি ভেবেছিলাম অয়নের কথা বলে তুমি আসলে বলতে চাইছিলে, বড্ড ভুল রাস্তায় এগোচ্ছেন স্যার, আর এগোবেন না।

কি কথা! রুণু কোথায় আরও আপন হতে চাইছিল! তা না…

—জান, আমি না…একটা কাজ ভুলে গেলে আমার রাত্রে একদম ঘুম হয় না।

অরুণ হেসেছিল। —কি কাজ? নিলডাউন হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা?

—প্রায়। রুণু হেসে বলেছিল, শোবার আগে আমি রোজ বালিশের ওপর তোমার নাম লিখি আঙুল বুলিয়ে। না লিখে আমার ঘুমোতে ইচ্ছে করে না। তারপর হেসে ফেলে বলেছিল, ঘুম আসেই না।

রুণুর আজ হঠাৎ মনে পড়ল, ও অনেক দিন আর বালিশে নাম লেখেনি অরুণের। মনে মনে ভাবলে, আজ রাত্রে নিশ্চয় নিশ্চয় বালিশের ওপর আঙুল বুলিয়ে অরুণের নাম লিখবে, তারপর সেই নামের ওপর মাথা রেখে ঘুমোবে।

এই সময়ে ওর এক একদিন অরুণকে ভীষণ ছুঁতে ইচ্ছে করে। অরুণটা স্রেফ পাগল, তা না হলে কেউ এমন পাগলের মত ভালবাসে? রুণুর এত হাসি পায় সেসব দিনের কথা মনে পড়লে। আরে, ছুঁতে ইচ্ছে তো ওরও হয়েছিল, প্রতিদিন হত প্রথম প্রথম।

—বা রে, হাত সরিয়ে না নিলে তুমি আমাকে খারাপ ভাবতে না? তা না হলে, আমার নিজেরই তো ইচ্ছে হয়েছিল তোমার হাতের ওপর হাত রাখি।

—সত্যি? অরুণ খুশি হয়েছিল শুনে। অরুণের খুশি-খুশি মুখের দিকে তাকিয়ে রুণু বলেছিল, খুব হয়েছে, আর গর্বে নাক ফোলাতে হবে না।

অরুণ হেসে ফেলেছিল। —তুমি তো আমার গর্বই। কিন্তু সেদিন সত্যি বড় কষ্ট হয়েছিল। বিরাম জ্বর জ্বর লাগছে বললে প্রথম দিন, আর তুমি তার কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখলে, অথচ আমি হাত ছুঁতে গেলাম যেদিন…

রুণু ভাবলে, আচ্ছা, অরুণ যে বলে ওর সঙ্গে দেখা না হলে বুকের মধ্যে কি রকম সব হয়-টয়, যন্ত্রণা, কষ্ট, জ্বালা সব সত্যি? না ওকে সন্তুষ্ট করার জন্যে বলে! আহা রে, রুণুর যেন সব ভাল। দেখতে সুন্দর, গলার স্বর ভরাট ভরাট, কথার মধ্যে জাদু আছে, আরও কত কি। উফ্, এত মন জুগিয়ে কথা বলে!

—সুন্দর তো সুন্দর, কিসের মত সুন্দর? একটু কৌতুক করে রুণু প্রশ্ন করেছিল।

অরুণ বলেছিল, স্তবের মত।

আনন্দে চোখ বুজে ফেলেছিল রুণু। তারপর হেসে উঠে বলেছিল, এর নাম কি জান? স্তাবকতা।

অরুণকে চেনা সত্যি মুশকিল। এক এক সময় এক এক রকম। এত খেয়ালী, হঠাৎ হঠাৎ অন্যমনস্ক, তখনই উচ্ছ্বাস, তখনই নির্বিকার। ওর নিশ্চয়ই ভিতরে কোথাও একটা গভীর দুঃখ আছে।

একদিন হঠাৎ বললে, তোমার চেয়ে সুন্দর মেয়ে তো অনেক আছে, কিন্তু তুমি সুন্দরী হয়েও অন্য রকম।

তখন তো ওরা অনেকখানি অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে, রুণু বললে, এর নাম কি জান? স্তুতি।

অরুণ হেসে উঠে বললে, কিংবা প্রস্তুতি।

ওর ওই এক দোষ। এক একটা কথা অরুণের বুকের ভিতর থেকে, অনেক গভীর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে, মনে হয় অন্য রকম। অন্য ছেলেদের থেকে একেবারে পৃথক। আবার এক এক সময় ও এত হাল্কা, এত চটুল, যে মনে হয় রুণুর সঙ্গে খেলা করছে।

কিন্তু একদিন এমনি হাল্কা কথাকে খুব হাল্কা ভাবে যেই নিয়েছে রুণু, অমনি অরুণের মুখ থমথম করে উঠল। ধীরে ধীরে বলল, হাসতে হাসতে বলা সব কথাই হাসির নয়। বললে,

সবচেয়ে দুঃখের কথাগুলোই আমরা হাসতে হাসতে বলি।

রুণুর ইচ্ছে করে অরুণকে বলে, তুমি আমাকে একটা চিঠি লেখ। সত্যি, সামনা-সামনি অরুণ কিই বা বলবে। যা কিছু বলতে ইচ্ছে হয়, রুণুই কি বলতে পারে? অরুণ যদি অনেক দূরে কোথাও চলে যায় তা হলে খুব ভাল হয়। তখন রোজ কলেজ থেকে ফিরে ও চিঠির বাক্স দেখবে। বাক্সে কোন চিঠি থাকবে না, থাকবে না, মনে হবে অরুণ ওকে ভুলে গেছে, তারপর ঝট করে একদিন একটা নীল রঙের খাম, নীল বা গোলাপী, কিংবা কমলা রঙ। কমলা রঙ অরুণ পছন্দ করে। রুণু একদিন কমলা রঙের শাড়ি পরে গিয়েছিল।

—না বাবা, তোমার চিঠি খুলে আমার কাজ নেই। কলেজে পড়ছ, কি চিঠি কে জানে। বলে রসিকতা করেছিলেন মামীমা অয়নের চিঠিটা রুণুর হাতে দিয়ে।

চিঠিটা যে সরল রেখার মত, তখন অয়নের চিঠি সরল রেখা, রুণু জানত। তাই বলেছিল, মামীমা, খুলে দেখলেই তো পারতেন।

জবাবে এই কথাই বলেছিলেন মামীমা। বলেছিলেন, আমি বাপু অত খুঁতখুঁতে নই, শুধু তোমার বাবা যেন দোষ না দেন আমাদেব।

বাবার কথা, মার কথা, ছোট ছোট ভাই-বোনদেব কথা ভাবতে গেলেই রুণুর সব ওলোটপালোট হয়ে যায়। ওর ওপর অগাধ বিশ্বাস বাবাব, রুণু কোন অন্যায় করতে পারে না, রুণু বাপ-মার অবাধ্য হতে পারে না। রুণু চাকরি করবে, করে সংসারের দুঃখ ঘোচাবে।

চাকরি করতে ওর কিন্তু একটুও ইচ্ছে করে না। যখনই বাবা কোথাও কোন বিয়ের চেষ্টা করেন, ওকে দেখতে এসে একজনের তো খুব পছন্দ হযেছিল···তখন রুণুর ভীষণ ভাল লেগেছিল। নন্দিনীর সঙ্গে অনেক গল্প করেছিল। নাঃ, নিজের বিয়ের জন্যে বাবাকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই, ও নিজেই কাউকে পছন্দ করে বিয়ে করবে—হয়তো অরুণকেই, কিংবা···। কে জানে, ভাল লাগে না, তবু হয়তো চাকরি করতেই হবে।

মামাবাবু একদিন বলেছিলেন, একজনের রোজগারে সংসার চলবে, রুণু, সে দিনকাল আর নেই। হেসে বলেছিলেন, চাকরি ছেলেদের কয়েদখানা, কিন্তু মেয়েদের তো ফ্রিডাম।

রুণু ফ্রিডাম চায় না।

□

চুনের আড়তদারটা বড়বাজারের গলি বানিয়ে দিয়েছে রাস্তাটাকে। দু-তিনখানা ঠ্যালাগাড়ি পড়ে থাকে সব সময়। কখনও কখনও ঝরঝরে লরি।

বাড়ি ঢুকতে যাবে, দরজার সামনে একটা পেল্লায় গাড়ি একেবারে হাল মডেলের, এস টি সি থেকে কেনা। ভোজপুরী দরোয়ানের মত দরজা আগলে বসে আছে গাড়িখানা। চুনওয়ালার কাছে কোন ব্ল্যাকের নবাব এল নাকি! চম্পক বাজোরিয়া এমনি একটা গাড়ি করে কলেজে আসত। ইউনিয়ন করতো সঞ্জয়, ব্যাটা বিলেত চলে গেল, নির্ঘাত সি আই এ-র টাকায়। টিকলু তো তাই বলে। 'পরের জন্মে মাইরি মনের মত বাবা বেছে নিতে হবে', টিকলু বলেছিল। সুজিত হেসে বলেছিল, 'নিদেনপক্ষে একটা আইটি-ও।' গাড়ির ওপর টিকলুর বেদম রাগ। ওদের পাড়ার লাল বাড়িটায় তিন তিনটে বোন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফ্যাশান প্যারেড দেয়। একটা ছোকরা গাড়ি করে আসে, আঙুলে চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে উপরে উঠে যায়। টিকলু-অরুণ ওদের দিকে তাকালে মেয়েগুলো পানের পিক ফেলার মত করে হাসে। গা জ্বলে যায়। টিকলুর তো জ্বালিয়ে দিতে ইচ্ছে করে গাড়িটাকে। একদিন চাকার হাওয়া খুলে দেবে ভেবেছিল। সাইকেলের মত নয়। কি করে

হাওয়া খোলে কে জানে।

পেল্লায় বিলিতি গাড়িখানাকে দরজার সামনে দেখে সারা গা চিড়বিড় করল। কাছে এসে দেখল লাল ক্রশ মারা। ডাক্তার ?

দুদ্দাড় করে ভেতরে ঢুকল। দ্যাখো কাণ্ড। জুতো টিপে টিপে, আওয়াজ না হয়, অরুণ বাবার ঘরের দরজায় দাঁড়াল। যা ভয় পেয়েছিল তাই। ও কি করবে, ও কি হাত গুনতে জানে, মার অসুখ কখন বাড়াবাড়ি হবে!

সব্বাই চুপচাপ, হাসপাতালের মত। ডাক্তার মাকে পরীক্ষা করছে, বাবা তাকিয়ে আছে ডাক্তারের মুখের দিকে। বাবার মুখ ফ্যাকাশে। মিলুর মুখ ছমছম, এক্ষুনি বুঝি কেঁদে ফেলে। ছোটমাসীর চোখের পাতা ভিজে ভিজে।

অরুণকে দেখে ছোটমাসী তাকাল, মিলু তাকাল, বাবা তাকাল না।

ডাক্তারের মাথা ঝুঁকে পড়েছে, ভাবছে কিছু। বাবা দশ টাকার নোটগুলো আরেকবার গুনল, বেশি না চলে যায়। কিংবা কম দিয়ে লজ্জায় না পড়ে।

টাকাগুলো না দেখেই যন্ত্রের মত হাতে নিল ডাক্তার, পকেটে রেখে দিল। বাবা পিছনে পিছনে গাড়ি অবধি এগিয়ে দিতে গেল।

অরুণ মার মুখের দিকে তাকাল। মুখ টকটকে লাল, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

মিলু ফিসফিস করে বললে, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। ...কোথায় ছিলি এতক্ষণ, বাবা তোর ওপর ফায়ার।

তুমি গাফিলতি করে ফেলে রাখলে এতদিন, আমি ছিলাম না সেটাই দোষ। অরুণের কিন্তু নিজেকে একটু কালপ্রিট-কালপ্রিট লাগল। ছোটমাসী আর মিলুও হয়তো তাই ভাবছে।

—মার বোধ হয় খুব কষ্ট হচ্ছে! নিজের মনেই মিলুকে যেন বললে অরুণ।

কিন্তু অরুণের কষ্ট হচ্ছে না কেন ? বুকের মধ্যে কোন কষ্ট নেই কেন। একটু আগে মুখের ওপর উৎকণ্ঠার ছাপ পড়েছিল, কিন্তু সে তো বানানো। মাকে ও কি একটুও ভালবাসে না ? কে জানে বইয়ে লেখেটেখে, লোকে মুখে বলে, কেউই হয়তো তেমন ভালবাসে না। নাকি অরুণই একটা অপদার্থ। মা প্রায়ই তাকে অপদার্থ বলত। কিন্তু মার জন্যে অরুণের কিছু একটা করতে ইচ্ছে হল। খুব শক্ত কাজ, কঠিন-কিছু। গন্ধমাদন বয়ে আনার মত। দু বছর আগেও তো মা বলত, বাঁদর ছেলে।

কণুর জন্যে তো কষ্ট হয় বুকের মধ্যে।

—মা কি জিনিস আরেকটু বড় হলে বুঝবি। দিদি একদিন বলেছিল। ও তো অ্যাডভাইসারি বোর্ডের চেয়্যারম্যান। এখন তো মার এই অসুখ, আয় না তুই, সেবা করবি।

ঊর্মির ওপর থেকে থেকে রাগ হচ্ছে। টিকলুর ওপরও রাগ হচ্ছে।

অরুণ আর সুজিত কোজি নুকে বসে ছিল। কফি হাউসে গেলেই খরচ। পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর থেকে ফাণ্ড শর্ট। ইনকাম নেই এক পয়সা, কেবল মার কাছে হাত পাতো। এখন তো তাও বন্ধ। বইগুলো তো সব বিক্রমপুর করে দিয়েছে পুরনো বইয়ের দোকানে, ভেবেছিল টয়েনবির বইটা কিনবে। পারেনি। বাবার কাছে চাইবে কি, বাবা হয়তো টয়েনবির নামই শোনেনি। সে আমলে গিবন ছাড়া কাকেই বা চিনত। লাইব্রেরি ডিপোজিট তুলে নিল, তাও হাওয়া।

টিকলু লাফাতে লাফাতে এল, যেন ক্যান্সারের ওষুধ আবিষ্কার করেছে। ছাড়ানো মুরগীর ঠ্যাঙের মত কাঁধ দুটো উঁচু করে নাটক-নাটক গলায় বললে, 'আমি বিশুদ্ধ, আমি পবিত্র।'

তারপর চেয়ার টেনে নিয়ে ধপ করে বসল। চেয়ারটা মচমচ করল। বললে, ঊর্মি আমাদের গঙ্গাজলে ভাজা খুর্জার ঘি মাইরি।

অরুণের বিরক্তি মুখেও ফুটল। —ও কি তোর বাবার দেখা পাত্রী, এত খুঁত খুঁজে বেড়াস কেন।

টিকলু বাধা পেয়ে চটে গেল। —তুই আর সতী ফলাস না, তুইও ঊর্মির সঙ্গে পিংপং খেলছিস কিনা কে জানে।

সুজিত বললে, রুণু আর ঊর্মি ছাড়া সবাই ডালডা।

টিকলু হেসে উঠল। —হাতে হাতে প্রমাণ। ঊর্মিকে আজ দেখলাম নিউ মার্কেটে, এস কে এম-এর সঙ্গে। ট্যাক্সিতে উঠল, ট্যাক্সিতে।

সুজিত আব অরুণ দুজনেই চুপ করে গেল। দুজনেবই ভীষণ খাবাপ লাগল।

মার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজেব ঘরে চেয়াবে বসে আবার কথাটা মনে পড়ে গেল। ধুত্তোর, একটা সিগারেট ধরাবে তাব উপায় নেই। বাবা, ছোটমাসী···ঘবে বসে সিগারেট খেতে না পেলে···

কিন্তু ঊর্মি শেষে এস কে এম-এর সঙ্গে ঘোবাঘুরি শুরু কবেছে? ছি ছি। বাঃ রে, তাতে কি, অরুণও দিদি কিংবা মা হয়ে গেল নাকি? ছোটমেসোর ওপর, মা বাবার ওপব, দিদিব ওপর চটে গিয়েছিল ও। যত সব গাঁইয়া, একটা মেয়ের সঙ্গে একটু গল্প কবল, কিংবা সিনেমায় গেল, অমনি ভেবে নিল সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে। সাংঘাতিক কিছু ঘটে যাওয়া যেন এতই সহজ।

অরুণ একদিন বলেছিল, বাবা মা মাইবি আমাদের একটুও বোঝে না। ওরা ভাবে আমবা খুব ফুর্তি করে নিচ্ছি।

টিকলু হেসেছিল। —বুড়োগুলোকে নিয়ে ঐ তো এক ঝঞ্ঝাট। ঊর্মির সঙ্গে আমরা যে সেদিন বসেছিলাম প্রিন্সেপে, দেখলি তো। বকবাজগুলোকে তবু বুঝি, পকেটে পয়সা না থাক্ শেয়ারে ট্যাক্সি করার সাধ। কিন্তু বুড়োগুলো? হিংসেয় সব পুলিশ-কুকুব।

সুজিত হতাশ গলায় বলেছিল, আমবা এদিকে দুধেব স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছি, ঊর্মি একটু আড্ডাফাড্ডা দেয়, লোকে হিংসেয জ্বলে, ঐ আমাদের সুখ।

টিকলু হেসেছিল।—তেলাপিয়া ভেজে মাছেব গন্ধ ছড়ানো।

অরু. হঠাৎ ভাবলে, তা হলে? ঊর্মিকে ওরা সকলেই খারাপ ভাবছে কেন? এস কে এম-এর সঙ্গে একদিন দেখা গেছে বলেই সে খাবাপ হয়ে গেল! তা হলে আব বাবা-মার দোষ কি? আমরাও ভিতরে ভিতরে খুঁতখুঁতে বুড়ো। একটুও বদলাইনি।

কফি হাউসের গোঁফওলা ছেলেটা আবার কালচাব দেয। ঊর্মির মগজে ফাইল ঘসতে এসেছিল. ভ্যালুজ বদলে গেছে। মূল্যবোধটোধ কি সব বলছিল। আগে এক সময় অরুণও ওসব কথা বিশ্বাস করত। এখন তো বেশ বুঝতে পারছে গোঁফওলা ছেলেটার তাল ঐসব বুঝিয়ে ঊর্মিকে হাত করা। ভ্যালুজ বদলেছে তো নিজেব বাড়ি থেকে বদলা না বাবা, বাইরে কেন! ঊর্মি এস কে এম-এর সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠেছে শুনে মাথার মধ্যে চিড়িক দিচ্ছে। পিন ফোটার মত। রুণু হলে কি হত কে জানে। এই এক ভয় সদাসর্বদা। রুণু অন্য কারও সঙ্গে ঘোরাঘুরি করলে বুকে লাগবে ঠিকই। কিন্তু তার চেয়ে ভয়, টিকলু কোনদিন না এসে বলে, 'আরি বাপ্, রুণুকে কার সঙ্গে দেখলাম রে, ব্যাটা দাগী মিথুনলগ্ন, কুয়োয় বসা চোখ', অথচ রুণু নিজে যদি বলে, এর আগে অযন···মানে ওসব কিছু না, স্রেফ প্রেস্টিজ। ঊর্মির কাছে, টিকলুর কাছে, সুজিতের কাছে নিজের সম্মান বাঁচাতে পারলেই হল। বলতে পারলেই হল, ও আর নতুন খবর কি, রুণু তো বলেছে আমাকে। আমার কাছে না লুকোলেই শান্তি। বাঃ, তা হলে ভ্যালুজ বদলে যাচ্ছে তো। আগেকার দিনে এটুকুই কি সহ্য করতে পারত?

সত্যি, ওদের কাছে শরীর ছিল ঠাকুরঘর, দিনরাত শান্তিজল ছিটিয়ে রাখ। মন কিছুই না, কিছু না। কিন্তু অরুণ জানে, শরীর-টরির আছে, শরীরে রক্ত। কখনও হাই, কখনও লো।

তবে মন না পেলে কিছুই পাওয়া নয়।

ওরা আমাদের কি বুঝবে? কুড়ি বছরে বিয়ে করে ছেলেব বাপ হত, চাকরি পেত, সেক্সটেক্স ওদের কাছে তো নোংরা ব্যাপাব হবেই।

আরে দুর্, ঊর্মি খারাপ হতেই পারে না। তাহলে সেদিন অত ভেঙে পড়ত না।

কি হয়েছিল কে জানে, থেকে থেকেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। ঊর্মিব শরীরটা বেশ ছিপছিপে। ডম্বরুর মত কোমব, মনে হয এক হাতে তুলে ধরে বাজানো যায়। শরীবকে সাজিয়ে গুছিয়ে আলোর মত করে জ্বালতে জানে। তাকিয়ে দেখতে ভালই লাগে। কিন্তু ঊর্মি হাসতে পারছিল না।

—কি হয়েছে তোর বল্ তো, একেবারে জিরো পাওয়াব হয়ে গেছিস।

তখনওরোদ্দুর সম্পূর্ণ পড়ে যায়নি। ইয়া মোটা মোটা কমলারঙের থামওয়ালা প্রিন্সেপ গ্যেটের ভিতরটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল। খালি গায়ে মুটেমজুব ভিখিরি ঘুমোচ্ছিল। একটা পাগল ওদের দেখে, ভয় পেয়ে কিনা কে জানে, উঠে গেল।

বেঞ্চটা রুমাল দিযে ঝেড়ে বসল। রুণু ওসময দেখলে ডাইবিব পাতা চড-চড় করে ছিঁড়ে ফেলে দিত। আগে একবাব তো ছিঁডে ফেলেছিল। না ফেললে অরুণ আসত কি করে। ছেড়ে দাও সেসব কথা। ভালবাসে বলে কি অরুণ বিকিযে দিয়েছে নাকি নিজেকে। ধুত্তোর, অত সন্দেহ সন্দেহ ভাল লাগে না। অরুণ ভাবলে, আমি তো খাঁটি, আমি জ্বলছি। সায়েন্স পড়লে এক্সরে টাইপের কিছু বের করতাম। বুকেব ভেতরটা ফটো তুলে নাও, দ্যাখো, ব্যস্। আর ঘ্যান ঘ্যান কোর না।

ভাবতে গিযে নিজের মনেই হেসে ফেললে অরুণ। পাগল, তাহলে তো আরও বেশি ধরা পড়তাম। টুকরো টুকরো ভাল লাগাগুলো তো রুণু জানে না। ওর ভয শুধু ঊর্মিকে। টানটান শালোয়ার পরা পাঞ্জাবি মেয়েটা একবার ঝিলিক দিয়েছিল। স্লিভলেস ব্লাউজেব নন্দিনীকে দেখে একটু কেমন কেমন কবেছিল! আরও কত কত ছোট্ট ছোট্ট গুনগুনুনি। সব বুকের ফটোতে বেরিয়ে আসত। তখন—ঈস্, তুমি এত নোংরা! রুণুব জন্যে এই যন্ত্রণা যেন কিচ্ছু না।

পাশাপাশি বেঞ্চে বসে আছে, অরুণের মনে হল ঊর্মি অনেক দূবে চলে গেছে। বোধ হয় ধানবাদে।

ওকি, ঊর্মির চোখেব পাতা ভিজে ভিজে লাগছে কেন।

—কি হয়েছে তোর, বল্ না। অরুণ বললে।

—কিচ্ছু না। হেসে উঠল ঊর্মি, আব সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল টপ্ করে পড়ল; কোলের ওপর বাখা সাদা ঢাউস ব্যাগটায।

অরুণের সমস্ত মন ব্যথায় বিস্বাদ লাগল। আচ্ছা, ঊর্মি মাইনিং ইঞ্জিনিয়রকে যেমন ভালবাসে রুণু সে-রকম ভালবাসতে পারে? অরুণকে?

অরুণের ইচ্ছে হয় পাখির মত উড়ে গিয়ে রুণুদের জানলায় উঁকি দিয়ে দেখে। রুণুর চোখ অরুণের জন্যে এমনি একটা পোখরাজ ঝরিয়ে দেয় কিনা।

—আচ্ছা অরুণ, ছেলেরা কি চায বল্ তো? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঊর্মি।

—কি আবার চায়। ঊর্মির প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে অরুণ বললে।

ঊর্মি হঠাৎ যেন খুব সিরিয়াস হয়ে গেল। —না না, ভালবাসলে ওরা এত বদলে যায় কেন।

অরুণ হাসবার চেষ্টা করল। —বদলে যায়?

—কি জানি। ঊর্মির মুখ সদ্য বিধবার মত বিষণ্ণ দেখাল।

অরুণ বললে, জানি না। ভালবাসা···অরুণের গলা কেঁপে গেল···আমাদের কাছে একটা

প্রচণ্ড অহঙ্কার !

ঊর্মির সমস্ত মুখ রাগে ঝলসে উঠল। —দম্ভ।

—না না ঊর্মি, গর্ব। প্রচণ্ড অহংকার। পৃথিবী আমাদেব কি দিতে পারে ? যশ, অর্থ, সম্মান। দ্যাখ, ওসব পেয়েও বলা যায় না পেয়েছি, বিনয় দিয়ে লজ্জা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। ভালবাসা ? রুণু আমাকে ভালবাসে, প্রাণ খুলে সবাইকে বলতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে হয় সমস্ত পৃথিবী জানুক।

—যে জানাতে চায় না, জানাতে ভয় পায় ? ঊর্মির কথাব মধ্যে কি একটা জ্বালা।

অরুণ চোখ বুজল এক পলকের জন্যে। তারপর বললে, তার কষ্ট আরও বেশি। অরুণের গলাব স্বর গাঢ় হল। বললে, আমিও পাবি না ঊর্মি, আমারও ভয় হয। কি জানি, সকলকে বলে ফেললাম, তারপব হঠাৎ জানলাম, সব মিথ্যে, রুণু হয়তো অন্য কাউকে···আমার সঙ্গে শুধু খেলা-খেলা··

অরুণ চুপ করে গেল, কথা শেষ কবতে পাবল না।

ঊর্মি হঠাৎ অরুণের মুখেব দিকে তাকাল। কি যেন খুঁজল। —অরুণ, তুই বোধ হয় আমাব চেয়েও দুঃখী।

—কি জানি, আমি বুঝতে পাবি না, বলতে পারি না। আমার কি মনে হয জানিস ঊর্মি, আমরা যা বলতে চাই তা বলতে পাবি না। কেমন মনে হয ছোট হয়ে যাচ্ছি। লজ্জা কবে, হাসি পায়। আঘাত পাব এই ভয়ে আগে থেকেই আঘাত দিই।

—ঠিক বলেছিস অরুণ, তুই ঠিক বলেছিস ! ধীবে ধীরে ঊর্মি তার ডান হাতখানা অরুণের বাঁ কাঁধে রাখল। ঊর্মি কোনদিন এভাবে অরুণের কাঁধের ওপর হাত রাখেনি।

অরুণ কোনদিন বুঝি এমন সহানুভূতির স্পর্শ পায়নি। ওব বুকেব মধ্যে থেকে কান্না ঠেলে উঠতে চাইল।

ঊর্মি ধীবে ধীরে বললে, অরুণ, তুই রুণুর কাছ থেকে কিছু পাসনি ? কিচ্ছু পাসনি ?

অরুণ কোন উত্তর দিল না। ওর শুধু কল্পনা করতে ইচ্ছে হল ওর কাঁধের ওপর রুণু ঠিক এমনিভাবে হাত রাখবে, ওর কখনও কঠিন অসুখ হলে রুণু ওর কপাল ছুঁযে দেখবে, কিংবা ওব যদি মৃত্যু হয়—মৃত্যুর মত ঠাণ্ডা কপালে রুণু কোনদিন তার গাল ছোঁয়াবে।

ঊর্মি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তাবপর অস্পষ্ট সুরের মত গলায় বললে, আমার মাঝে মাঝে কি ইচ্ছে হয় জানিস অরুণ। ইচ্ছে হয় যারা ভালবাসা দিযেও কিচ্ছু পায না, কিচ্ছু পাযনি, নিজেকে নিঃশেষ করে তাদের জ্বালা জুড়িয়ে দিই।

□

টিকলু খবরেব কাগজটাগজ অত পড়েও না, কখনও খেলার পাতাটা দেখে নিল, কখনও সিনেমার বিজ্ঞাপন। কোজি নুকে একখানা কাগজ আড়াই ভাগ হয়ে টেবিল থেকে টেবিলে উড়ে বসে। বাড়িতে কাগজ আসে না, দবকারও হয় না। চায়েব দোকানেই কৌতূহল মিটিয়ে নেয়।

টিকলু জানত না। অরুণ সক্কাল বেলাতেই এসে খবব দিল। —চল্ চল্, রেজাল্ট বেরিয়েছে, দেখে আসি।

—ও আর কি দেখব, ফেল তো করেছি জানি। টিকলু হেসে বললে।

ফেল কথাটা শুনতেও ভয় হল অরুণের। বুকের মধ্যেটা ধক করে উঠল। ফেল ! তা হলে আর বাড়ি ফিরবে না অরুণ। বাবার কাছে মুখ দেখাবে কি করে।

টিকলুদের ঘরখানাব একপাশে দেয়াল ঘেঁসে একটা তক্তপোশ, তাব ওপর মাদুর বিছোনো।

টিকলু সেখানে বসে চা খাচ্ছিল একটা ময়লা কাপে। টিকলুর মা অরুণের জন্যেও এক কাপ নিয়ে এলেন।

টিকলুর কথাটা কানে যেতেই। —তোব কি লজ্জা নেই, ফেল কবব বলছিস কি করে? তোর বাবা না খেয়ে তোকে পড়িয়েছে।·

টিকলু হেসে উঠল। —আমাব আবাব লজ্জা!

লজ্জা তো ওর এতদূব অবধি ঝুলে ঝুলে এসেছে সেটাই। কি দবকার ছিল বাবা, তুমি নোংরা টুইলের শার্ট পবে প্রেস চালাচ্ছ, আলতুফালতু কথা বল খদ্দেরদেব সঙ্গে, বাবো বছর বয়েস থেকে কম্পোজিটাব বানিযে দিলেই পাবতে। এখন তো টিকলু দু-কান কাটা, কোন কিছুতেই লজ্জা নেই। বাড়িটা লজ্জা নয়? চাবপাশে ঝকঝকে নতুন বাড়ি, ওদেবটা পলেস্তারা খসা, ইটেব বঙ কালো। বাবাকে দেখলে তো লোকে মেশিনম্যান বলে ভুল করে। ক ভাই ক বোন জিজ্ঞেস কবলে আঙুল গুনতে হয়, একটা না বাদ পড়ে যায়। মা একটা কালো সজারু, চব্বিশ ঘণ্টা কাঁটা ফুলিয়ে আছে। টিকলু নিজেও ওদেব লজ্জা। মা তো কথায় কথায় বলত, পাড়ায় তোব জন্যে লজ্জাব শেষ নেই। কি না ঝগড়া করে একদিন বাঁই বাঁই দুটো ঢিল ছুঁড়ে মজুমদাবদেব জানলাব কাচ ভেঙে দিয়েছিল। কি না ইস্কুলেব বাস্তায় টিটকিবি দিয়েছিল লাল বাড়িব মেয়েটাকে। ও শালা মেয়ে দেখলে আওযাজ যেন আর কেউ দেয় না। দেবে না কেন। রুণুব মত নৈবিদ্যি হয়ে টিকলুব কাছে কেউ আসবে নাকি। মেয়ে বল, চাকবি বল, পবীক্ষায পাশ বল, সব ছিনতাই করে নিতে হবে। বাপ একটা ইংবিজি কথাব মানে বলে দিতে পাবে না, পড়তে বসে এ টি দেব ঘাঁট, তাব আবাব ফেল কবলে লজ্জা।

লজ্জা তো ওব সুধাও। অরুণ বুক ফুলিয়ে রুণুব কথা বলে, আব ওকে ভাব দেখাতে হয ওসব কিচ্ছু জানে না। বেস্টুবেণ্টে বসে গল্প করছিল, 'জানিস টিকলু, আমি গ্লাসে জল খেয়েছি, সেই জল নিজেব গ্লাসে ঢেলে নিয়ে খেল রুণু।' ফুর্তিতে ব্যাটাব গায়ে পালক গজিয়েছিল বলতে বলতে। 'বললাম, আবে আমি খেয়েছি, আমি খেয়েছি ওটা।' উত্তব দিলে, 'বাঃ, তুমিই তো খেয়েছ।' যাব্বাবা, এক জলে দুজনে ঠোঁট ঠেকিয়েই এই, ছোঁয়াছুঁযি হলে না জানি কি করত। অরুণেব পাঁজবে পা বেখে দিব্যি ভবতনাট্যম নাচছে মেয়েটা।

—আহা, দ্যাখ দ্যাখ, লাভলি! গলি থেকে ট্রাম-বাস্তায এসেই অরুণ বলে উঠল।

স্কুটারটা ফটফটিয়ে এদিক ওদিক ঢলে ঢলে ছুটে পালাল। সরু কোমবেব নাঙ্গা পিঠ, ফর্সা ফুটফুটে, শাড়িব আঁচল টেনে এনে কোমবে গোঁজা। ছিপছিপে সুন্দব মেয়েটা স্কুটাবেব পিছনে বসে আছে এমন ভাবে, মনে হল ছেলেটাব পিঠ ছুঁয়ে আছে।

বুকের ভিতরটা শিবশির কবে উঠল। অরুণ বুঝতে পাবল না বুকেব মধ্যে থেকে এক খামচা স্বস্তি কে কেড়ে নিয়ে গেল, চটকদাব মেয়ে-শবীবটা, না স্কুটাবটা?

—একটা স্কুটারে এত লোভ হয়! অরুণ ক্ষোভেব সঙ্গে বললে। একটু থেমে বললে, ও মাইরি আমাদের ভাগ্যে নেই, আমাদেব বেলায় বাসেট্রামে বার্বেল কব।

টিকলু হেসে বললে, ইস্কুটার? ওসব ছেড়ে দিয়ে একটা রিকশা কেন ববং, রুণুকে বসিয়ে ঠুন ঠুন করে নিজেই টানবি।

বলে হেসে উঠল টিকলু, কিন্তু রুণুব কথা বলতে গিয়ে সুধাব কথা মনে পড়ে গেল।

টিকলু ভেবেছিল, সুধাদের বাড়ি যাবে একবার, দুপুবেব দিকে। বেজাল্ট দেখে এসে ফেল করেছে জানলে আর যেতে ইচ্ছেই হবে না।

ভেবেছিল, কিন্তু একদম উল্টো। ওবা সব কটা পাশ করেছে। ঊর্মি ওপরেব দিকে।

টিকলু বললে, যাক্ বাবা, ট্যাক্সির অঙ্কটা মিলে গেল।

অরুণ রেগে গেল। বললে, ঊর্মি আগেও ভাল রেজাল্ট করেছে, ও খুব শার্প।

—শার্প তো নিশ্চয়, জিলেটের ব্লেড, দুধারে কাটে।

সুজিত বললে, একজামিনাবরা খাতা দেখে ভাবিস?

ঊর্মির জন্যে ওদের কোন ক্ষোভ নয়। বাগ আসলে টিকলুর ওপর। কারণ অরুণ সুজিত আব টিকলু এক হয়ে গেছে। কে জানে, টিকলু হয়তো ওদের চেয়ে নম্বর বেশি পেয়েছে। পড়েই পাশ কর আর টুকেই পাশ কর—এক। টিকলু ফেল কবলে ওদেব খাবাপ লাগত। টিকলু পাশ করেছে, তাও খারাপ লাগছে।

অরুণ আর সুজিত ঊর্মিকে ফোন করতে গেল। টিকলু বললে, আমি চলি, কাজ আছে। কাজ আর কি, সুধা।

সুধার ব্যবহার ইদানীং ও বুঝতে পাবছে না।

—তোমাব কি একবাবও একটু গল্প করতে ইচ্ছে হয না। সুধা সেদিন বলেছিল।

যেন সেই অফুরন্ত সময়, সেই অফুবন্ত সুযোগ আছে। ওদেব ভালবাসা, সে তো একটা অন্ধকাব গোলকধাঁধার ঘব। এক ফালি আলো বিদ্যুৎ হয়ে চমকায় চাব দেওয়ালেব ঘবে, অন্ধকার বাবান্দায়, অন্ধকার ছাদে। অন্ধকাব ওদের প্রেম, টিকলুব রক্তই তো ভাষা। ওর বক্ত কথা বলে অরুণ যত কথা জানে, যত কথা বলে রুণুকে।

কাজ থাক্ না থাক্ ঝি রতনমণি ফুকফুক কবে এসে এটা ওটা বলে। ইলেকট্রিকেব মিটাব দেখতে এল লোকটা, যেন আর সময় নেই আসাব। সুধাব মা, ইয়া সাদা হাতিব মত চেহারা, খাটে বসে গল্প শুরু করলে আব উঠতে চায় না। সুধাব ছোট ভাইটাকে একটু আদব কবতে গিয়ে এখন 'টিকলুদা টিকলুদা', সরতে চায় না। টিকলুব মন একজনেব কাছে সাবাক্ষণ বাঁধা পড়ে আছে, সুধার কাছে। শিরাব মধ্যে রক্ত—টগবগানো ঘোড়া। কিন্তু ছুটে গিয়েও লাভ কি! ধৈর্য থাকে না, সাবা শবীব রাগেব কাঁটায বাবলা গাছ হয়ে যায়।

—তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না। সুধা একদিন বলেছিল।

—ভালবাসা নয়? অবাক হযে গিয়েছিল টিকলু।

ওর সারা শরীর ঝনঝন করে, বাচ্চা হোক্ বুড়ো হোক, সামনে বসে ট্যাঁক ট্যাঁক করলে টিকলুর গা ফুঁড়ে বেরোনো বিরক্তির বাবলাকাঁটাগুলো ধারালো কুকরি হয়ে যায়। সে বুঝি এমনি? ভালবাসা নয়?

ইদানীং সুধা যেন কেমন বদলে যাচ্ছে। কেমন এড়িয়ে চলতে চায়। সেদিন ওব নন্দাই ছোকরা উঠতে চাইল, সুধা খপ কবে হাতটা ধরে বললে, বসো বসো। টিকলু তখন ভাবছে, ওঠে না কেন। মাঝে মাঝেই আসে কিনা কে জানে।

সুধাব ওপর যত রাগ হয়, ততই নন্দিনীর কাছে যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয় বুকের মধ্যের এই ফাঁকা ফাঁকা ভাবটা নন্দিনী যদি ভরিয়ে দিত।

—বিরাম নাকতলায় বাসা নিয়েছে, যাবি? অরুণকে বলেছিল টিকলু।

অরুণ যাবে না ও জানত।

সুধার সেদিনের ব্যবহারের কথা মনে পডতেই মাথায় রক্ত উঠে গেল। ভাবলে, না, যাব না সুধাদের বাড়ি। রাগ, অভিমান, লজ্জা? হ্যাঁ লজ্জাও। আমি যেন শালা ভিখিরি! সুধার ভাল না লাগে, যাব না। অন্য কাউকে ভালবাসতে পেলে টিকলু আব কোনদিন যাবে না। সুধা আজকাল টিকলুকে বড়ো তাচ্ছিল্য কবে। করুক।

ববং নন্দিনী ওকে—না, ওসব ভালবাসাটাসা নয়—কিন্তু বেশ পছন্দ করে। করবে না কেন, যখন রাগ করে বাড়ি থেকে চলে এসেছিল, টিকলু না থাকলে যেত কোথায়। নাকতলাব ঘরখানা টিকলুই খুঁজে দিয়েছে। টুকটাক সাহায্য করেছে। ধার চেয়েছিল কিছু

টাকা, প্রেসের বিল আদায়ের প্রায় সবটাই দিয়ে দিয়েছে।

পাশ করেছে সে খবর বাবা-মাকে জানাবে রাত্রে ফিবে। 'ফেল করবি, ফেল করবি।' ভাবুক সারাদিন বসে বসে। হোটেল-ফোটেলে খেয়ে নেব ববং। তার আগে প্রেস থেকে সরানো শর্ট টাইপের দামটা আদায় করতে হবে।

গ্যারাজের ওপরে একখানা ঘর, নীচে কলঘর আব একটুখানি রান্নার বারান্দা। একটা এলেবেলে চাকরিতে এব চেয়ে বেশি আর কি হবে বিবামের।

কড়া নাড়তেই গ্যারেজের ওপবের জানলার পর্দা সবে গেল।

এসে দরজা খুলে দিল নন্দিনী, কিন্তু হাসল না।

—বিরাম পাশ করেছে? টিকলু জিজ্ঞেস করল।

নন্দিনী মাথা নেড়ে জানাল, না।

টিকলু পাশ করেছে কিনা নন্দিনী জিজ্ঞেস করল না। টিকলু নিজেব থেকেই বললে, আমরা সবাই পাশ কবলাম, ও বেচাবা···

নন্দিনী টিকলুর মুখের দিকে তাকাল. হাসবাব চেষ্টা কবল।— আমার কপালই খারাপ।

বিরাম কোথায়?

নন্দিনী বললে, কাজে বেবিয়ে গেল। একটু থেমে বললে, আপনি তো খেয়ে আসেননি। আজ কিন্তু এখানে খেয়ে যাবেন!

টিকলু বললে, আরে না না, স্নানই কবিনি। আসলে নন্দিনীব তো কষ্টের সংসার, তার ওপর আর একজনের খাওয়া!

নন্দিনী হাসল। —জলের অভাব নেই। নাকি স্নান কবিয়ে দেয় কেউ? নন্দিনী ঠাট্টা করল, তারপর বললে, আমিও পারব।

টিকলু কিছু বললে না, কিন্তু কথাটা খুব ভাল লাগল। সত্যি যদি তাই হত, সত্যি যদি নন্দিনী ওব বুকে পিঠে সাবান মাখিয়ে দিত, মগে করে জল ঢেলে দিত, তা হলে ইযার্কি করে এক মগ জল ও নন্দিনীব গায়ে ছুঁড়ে দিত। সেবার দিঘায় গিযেছিল, সবুজ শাড়িব মেয়েটা ভিজে কাপড়ে উঠে আসছিল. ও তাকাতেই, ওর তাকানো তো. ফিক করে হেসে গম্ভীব হয়ে গিয়েছিল।

টিকলু বললে, আপনার হাতের রান্না, লোভ হচ্ছে সত্যি।

নন্দিনী ট্রাঙ্ক থেকে একটা তোযালে বেব করে কলঘরে রেখে দিল। সাবান ছিলই। ছোট্ট কলঘর, তোয়ালেটা বেখে আসাব সময় টিকলুব গা ঘেঁসে বেবিয়ে আসতে হল। ছোঁয়াটা টিকলুর কাছে ফুলেব গন্ধের মত মিষ্টি লাগল। একবার ভাবতে চেষ্টা করল, ইচ্ছাকৃত কিনা। আবে দুর্, মেয়েদের বোঝা দায়।

টিকলুর মনে পড়ল দক্ষিণেশ্বরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়েছিল নন্দিনী। তখন টিকলু ভয় পেয়েছিল। কিন্তু বিরামকে তো বলেনি। বলেনি. ব্যাপারটাকে তুচ্ছ ভেবেছে বলে, রসিকতা ভেবেছে বলে। আবার কি।

খাওয়াদাওযাব পব বিছানায় এসে বসল। উঠে গিয়ে জানলাব পর্দাটা টেনে দিল ভাল করে, নন্দিনী 'আসছি' বলে কাচের প্লেট গ্লাস নিয়ে চলে যেতেই।

বিরাম হঠাৎ এ-সময় ফিরে এলে কিছু ভাববে না তো। কি জানি বাবা।

চটপট নিজের খাওয়া সেবে নন্দিনী চলে এল। খাটের পায়ে বসে বললে, নিন। বালিশটা এগিয়ে দিল ও।

এতক্ষণে নন্দিনীর দিকে ভাল করে তাকাল টিকলু। বিরামের হাতে পড়ে নন্দিনীর অবস্থা কাহিল, টিকলু এর আগেও ভেবেছে। চেহারায় সেই চেকনাই নেই. চোখ বসে গেছে, হাসিটা গেছে হারিয়ে। সেই ভিক্টোবিয়া মেমোরিয়ালেব দিন নন্দিনীকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল,

হাসিটা আরও সুন্দর। অমন প্রাণখোলা হাসি টিকলু দেখেইনি। আর এখন নন্দিনীর হাসিকে ঠিক হাসি বলে চেনা যায় না। বরবাদ করা টিউবওয়েল, তিনবার হটর হটর করলে চুরচুর করে জল বেরোনোর মত।

টিকলু ভাবলে, প্রেমফ্রেম সব বাজে, টাকাই সব। নাকি বাড়ি থেকে চলে এসে যখন দেখলে পায়ের তলায় মাটি নেই, বিবাম বিরক্ত, ওর ভয় দাদা না থানা-পুলিশ করে, তখনই ওর প্রেম মবে গেছে। রূপসী মেয়ে রোগে ভুগে ভুগে যেমন হয় তেমনি ম্লান বিষণ্ণ।

নন্দিনী বললে, বরুণদা সকালে আসবে বলেছিল।

ধুত্তোর বরুণদা। পাড়ার দু-তিনটি ছেলে আসে, চা খায়। কেন আসে তা বোঝে না বোকা মেয়েটা। মেয়েবা এত বোকা! তাদের সঙ্গে এত মেশামেশির কি দরকার।

প্রেমে পড়লে ছেলেরাও অন্ধ হয়ে যায়। অরুণেরও কাণ্ড দ্যাখ না। চব্বিশ ঘণ্টা রুণুর নাম জপ করছে। ওর ধাবণা রুণু ওকে দারুণ ভালবাসে। অথচ টিকলু এক নজরেই বুঝে নিয়েছে, রুণু দিব্যি ডুবসাঁতার জানে। ঊর্মিও যা, রুণুও তাই।

—আরে ওরাও বুঝে গেছে এখনই এখনই চাই। মার্বেলের অহল্যা হয়ে থাকবে, কবে কে পায়ের ছোঁয়া দিয়ে জাগাবে, ওসব কেউ বিশ্বাসই করে না। টিকলু একদিন বলেছিল।

সুজিত বলেছিল, দোষ কি ওদেব, বাপ বিয়ে দিতে পারবে কিনা তাই জানে না। নন্দিনীর কথাই ভাব না। দাদার সংসার চলে না, বিয়ে দেবে! ও তাই বিবামকে আঁকড়ে ধরেছিল।

টিকলু হেসে বলেছিল, সে-সব বাদ দে, আসল কথা 'বয়স কেটে যায় সখী'। ওদের যা আমাদেরও তা। এ বয়সে একটু ফুর্তি-ফার্তা না করলে কখন করবে।

এ ছাড়া আর কিই বা আছে, আব কিছু কববার আছে নাকি? ·সব শুধু জোড়াতালি, জোড়াতালি···যা বলেছিস, শালাব সোস্যাল সিসটেমেব ঘাড় মটকে দিয়ে·· কিস্যু হবে না, এ দেশে কিস্যু হবে না উচ্ছন্নে গেল সব···আরে দুব্‌, চাকবি, চাকরি পেলেই দেখবি সব···প্রেমটেম হলেও··গোলি মাবো প্রেমকে, প্রেম তো শালা রুপুলি তবকে মোড়া সেক্স···মালা সিন্‌হাকে দেখেছিস··বাখ তোর মালা সিন্‌হা, এলিটে একটা অ্যাডাল্টস্‌ ওনলি এসেছে·· আমার মাইরি এক এক সময় ইচ্ছে হয় দেশটাকে বদলে দিই···আমেরিকাব তাঁবেদারদের দিয়ে···সব ক্যাপিটেলিস্টেব দালাল··যা যা, ওসব অনেক শুনেছি, যত রাগ দালালেব ওপর, কেন বাওয়া খোদ ক্যাপিটেলিস্টকে ধরলেই তো পার, দালালকে কেন··ন্যাশনালাইজ না কবলে···লে লে, সে তো ইনএফিসিয়েন্সি···প্রাইভেট সেক্টবের এফিসিয়েন্সি তো ঘুসে·· কমিউনিজম ছাড়া সলিউশন নেই গুরু, আর সব রাবার সলিউশন, শুধু পাংচার সারানো যায়· তাই বলুক না কমিউনিস্টরা দেডশো টাকা মান্থলি ইনকাম না হওয়া অবধি কাবও মাইনে বাড়বে না··দেডশো কেন বস্‌ যাট বলো না, মিড্‌ল্‌ ক্লাশ একেই বলে, নিজের কথাই ভাবছ···বাঃ, মিনিমাম লেভেল একটা··মিনিমাম লেভেল কে ঠিক করবে, কোটি কোটি লোক যাট পেলেই খুশি···তা হলেই হয়েছে, ভোট পাবে না কেরানিদের মাইনে না বাড়ালে···আমি যদি পাওয়ার পেতাম সব ব্যাটাকে বছরে তিন মাস লাঙল ঠেলতে দিতাম···সে যাই বলিস চাষীরা সুখে আছে···যা না গ্রামে, লেকচাব দিচ্ছিস কেন··কি যে বলিস, খেলা দেখব না?···ফুটবলেব স্ট্যাণ্ডার্ড কিন্তু··চুনীকে ইলেকশনে দাঁড করিয়ে দিলে···ও সব বাদ দে তো, ভাল লাগে না···স্রেফ ফুর্তি কব বাবা, ফুর্তি কব।

—অরুণ তো দিব্যি ফুর্তি করে নিচ্ছে। টিকলু হেসে উঠে বলেছিল।

অরুণ রেগে গিয়ে বলেছিল, প্রেম কি তোবা বুঝিস না, বুঝিস না।

ওই এক কথা ওব মুখে। প্রেম যেন চাঁদ ফুল বন্‌লতা স্যেন্‌।

প্রেম এখন স্যুটকেসে ভরা থাক, দু পয়সা রোজগারের ফিকিবে বেরোতে হবে। মা বাবা তো ভেবে রেখেছে পাশ কবলে দুটো ডানা গজাবে। টিকলু ভাবলে, বেশ ছিলাম, এখন

আবার বেকার বলে খোঁটা খেতে হবে। পাড়ার জয়ন্তদা সেদিন জিজ্ঞেস করল, কি টিকলু, কি করছ--টবছ! এখন কলার উল্টে বলবে, বিজনেস। সব্বাই তো তাই বলে, যদ্দিন না চাকরি জুটছে। চাকরি করতে একটু ইচ্ছেও হয় না। ঝট করে বড় হতে চায় টিকলু। এন্তার টাকা, নয়তো নাম। পলিটিক্স করতে গিয়েছিল সেজন্যেই, এখন বুঝেছে বড়ো নোংরা ব্যাপার। সব দাদারাই চায় ও শুধু রোদে বসে হাততালি দেবে, নয়তো ফাইফরমাস খাটবে।

আসলে টিকলু কি হতে চায় ও নিজেও জানে না। ও শুধু অবাক করে দিতে চায়। লোক ঘেন্না করে এসেছে ওকে, ও চায় তারা যেন ঘাড় উঁচিয়ে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়।

রাত্রে খুব খুশি খুশি মুখে সুধাদের বাড়ি থেকে ফিরল। শেষ অবধি সুধাদের বাড়িতে না গিয়ে পারেনি। পাস করেছে, এত বড় সুখবরটা না দিলে চলে?

সুধাদের বাড়ির সব্বাই খুব অবাক হয়ে গেছে।

টিকলুর রীতিমত গর্ব হচ্ছিল। বুক ফুলিয়ে বাড়ি ঢুকল। ধরে নিয়েছিল মা বাবা সমস্ত দিন অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করেছে। মনে মনে সে-কথা ভেবে হেসেছে। ভাবুক না, মা ভাববে হয়তো, ফেল করে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না।

কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না দেখে নিজেই বললে, পাস করেছি।

মা গম্ভীর ছিল, ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, পাস করলেই মানুষ হয় না।

বাবা ভাঙা চেয়ারটায় বসেছিল, উঠে দাঁড়াল। --শুয়োর, বিল-এর টাকা আদায় হয়নি বললি, গত হপ্তাতেই তো নিয়ে এসেছিস। কি করেছিস টাকা?

□

কয়েক দিন থেকেই বিকেলের দিকে মেঘ জমছিল, মেঘ উড়ে যাচ্ছিল। বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই। আগুনের হল্কার মত রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে পিচ গলে যায়, পিচের রাস্তায় পায়ের স্লিপার আটকে যায়। বাসে উঠে ওঠা যায় না, বসা যায় না, বাসের রডে হাত দিলে ছ্যাঁকা লাগে হাতে, ঘরে থেকেও স্বস্তি নেই, পাখার হাওয়া তো নয়, যেন কামারের হাপর। কোন কোন দিন বিকেলের দিকে মেঘ জমে, শাড়ির আঁচলের মত মৃদু আমেজটুকু দিয়েই মেঘ উড়ে যায়। বৃষ্টি নামে না, বৃষ্টি নামে না।

--তুই রিয়েল প্রেমিক রে অরুণ, এক্কেবারে বাইশ ক্যারেট। টিকলু ঠাট্টা করে বলেছিল।

সুজিত হেসেছিল। --আমরা মাইরি মোবারজীর চোদ্দ হবারও চান্স পেলাম না।

টিকলু প্রতিবাদের ঢঙে বললে, চান্স পেলেও পারতিস তুই অরুণের মত এই টেরিফিক গরমে টঙাস টঙাস করে ঘুরতে?

যেন অরুণ একাই ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর সহ্য করছে। যেন অরুণ একাই পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে। ওরা যা খুশি ভাবুক। রুণু সেই কত দূর থেকে আসছে, কলেজ ফেরার ক্লান্তি স্পষ্ট দেখা যায় তার মুখেচোখে, কেন আসছে? সুজিত বা টিকলু যখনই ওর মনের মধ্যে রুণুর সম্পর্কে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়, কিংবা রুণুর কোন ব্যবহার যখনই ওকে অপমান করে, তখনই অরুণ ভাবতে চেষ্টা করে ওর ভয়টয় সব মিথ্যে। রুণু ওকে ভালবাসে না? শুধুই এটা তার একটা খেয়ালের খেলা? বাঃ তা হলে বাসের ভিড় ঠেলে এই প্রচণ্ড গরমে রুণু আসবে কেন! রুণু অন্য কাউকে ভালবাসে? বাঃ, দেখা করতে আসার জন্যে তা হলে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সে নিজেকে বাঁধবে কেন? অগুরু মেশানো সেই আবিরের মধ্যে অরুণ

প্রথম, হ্যাঁ সেই প্রথম ভালবাসার ঘ্রাণ নিয়েছিল। তবু একটু একটু ভয় ভয় করত ওর। রুণু এত সরল, এত খোলা মন নিয়ে কথা বলে, ওর ভয় হত কখন হয়তো রুণু বলে বসবে, দোলের দিনে তো কারও সঙ্গে দেখা কবার উপায় নেই, তাই চেনাজানা সক্কলকে আমি আবির পাঠিয়ে দিই এমনি খামে ভবে। ব্যস, তা হলেই ওর সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমাব হয়ে যাবে। সুজিত তো বলেওছিল। 'তুই কি রে, কিচ্ছু না, স্রেফ আবিব মেখেই তোব চোখে বঙ লেগে গেল!' টিকলু বলেছিল, 'ক ডজন খাম কিনেছিল কে জানে।'

কিন্তু রুণুর মুখ তো মিথ্যে বলতে পাবে না। দুপুব দুটো, প্রচণ্ড রোদ্দুর, একদিন নির্দিষ্ট জায়গায কণু এল। আব কণুর মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণের ভীষণ মায়া হল। রোদে ঝলসে রুণুর মুখ লাল, রুমাল দিয়ে পবিপাটি কবে ও মুখ মুছল তবু কপালেব ঘাম মুছে গেল না। তাব জন্যে মায়া হল অরুণেব, আহা বেচাবীকে বড্ড কষ্ট দিচ্ছি আমি, আবাব সঙ্গে সঙ্গে অরুণেব নিজেব সব ক্লান্তি দূব হযে গেল। মেয়েটা নিশ্চয আমাকে দারুণ ভালবাসে। আমাব মতই।

—তুমি কেন বিশ্বাস কবো না বল তো? তা হলে আমি আসব কেন, দেখা কবব কেন। রুণু বিষণ্ণ মুখে বলেছে, যেদিন তুচ্ছ কাবণে অরুণ আহত হয়েছে, অনুযোগ করেছে রুণুব কাছে।

—তুমি কেন এত ভাল বল তো, তুমি ভীষণ ভাল রুণু একদিন বলেছিল। আব সে-কথা শুনে অরুণেব আবও ভয় হযেছিল রুণুকে হারানোব ভয। আসলে অরুণ তো একটুও ভাল নয়, ও শুধু রুণুব কাছে এলেই ভাল হয়ে যায। টিকলু ঠিকই বলে, ও নাকি পালিশ দিযে দিযে কথা বলে। বলেই তো। আসলে প্রত্যেকটা মানুষই তো তাই, দোষ কি শুধু অরুণের! টিকলুব বাবা একদিন ওদেব প্রেসে বসে দুটো বুড়োব সঙ্গে কি বিচ্ছিবি বিচ্ছিবি কথা বলছিল, অরুণকে দেখতে পাযনি। বিটাযাব কবা চাবটে লাঠি হাতে বুড়ো একদিন লেকে বসে নোংবা সব আলোচনা করছিল। কলেজে দুজন প্রফেসব একদিন চেঁচামিচি করে উঠেছিল, মুখে কাবও লাগাম ছিল না।

আমবা কেউই বোধ হয 'একজন' মানুষ নই। অনেক ছোট ছোট পৃথক মানুষ মিলে 'একজন'। অরুণ, সুজিত, টিকলুর মধ্যে 'একজন' অরুণ, অরুণ আব উর্মিব মধ্যে 'আরেকজন'। আব অরুণ আব রুণু—সেখানে অন্য অরুণ। বাবা-মাব কাছে এক অরুণ, ছোটমেসোব বাড়িতে অন্য অরুণ।

দিদিব বিযেব দিনটা মনে পড়ল। আদ্দিব পাঞ্জাবি আব কোঁচানো ধুতি পরে সকলকে নমস্কাব করে অভ্যর্থনা কবছিল ও, ববযাত্রীদেব সিগাবেট বিলি করেছিল।

পবেব দিন মা হাসি হাসি মুখে বলেছিল, তোর যে সবাই খুব গুণ গাইছে রে বলে হীবেব টুকবো ছেলে।

ছেলেব প্রশংসায মা খুব খুশি হয়েছিল। হবাবই কথা। কিন্তু অরুণ মনে মনে হেসেছিল। ন্যাকামি কবে একটা নমস্কাব কব, একটু বিনয দেখাও, ব্যস, হীরেব টুকবো হয়ে যাবে। অথচ, ওবা তিনজন একবাব কি মজাটাই না করেছিল। বিয়েব দিন ছিল, একটা পেল্লায বাড়িতে প্রকাণ্ড সামিযানা টাঙিয়েছে, বোশনচৌকি, সানাই, চোঙা প্যান্ট পরেই তিনজনে গটগট করে ঢুকে গেল একজন চেনা বন্ধুকে ঢুকতে দেখে। তাবপব দিব্যি গলদা চিংড়ির মালাইকাবি সাঁটিয়ে চলে এল।

অথচ রুণু ভাবছে, অরুণ খুব ভাল। এদিকে রুণু নিজে কত ভাল, কত সবল, এত মন খুলে কথা বলে, অন্য মেয়েদেব মত কাযদা করে কথা বলে না, উৎকট সাজসজ্জা নেই, এত সিম্পল, রুণু নিজেই তা জানে না। এমনকি রুণুব মধ্যে এমন একটা সহজ সৌন্দর্য আছে, যে-কেউ দেখবে সেই ভালবেসে ফেলবে, রুণু তাও জানে না। বিশ্বাসই করে না। 'তুমি

তো আমার সবই ভাল দ্যাখো', রুণু হেসে উঠে বলেছিল। যেন কথাটা হাসির।

কিন্তু রুণুর মধ্যে নিশ্চয় কিছু একটা আছে, তা না হলে অরুণের নিজেকে আজকাল আর তেতো লাগে না কেন। নিজেকে আর বিরক্তিতে তিক্ততায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে ইচ্ছে হয় না। বাঁচতে ইচ্ছে হয়।

—তুই না তেতো নিমগাছ হয়ে গিয়েছিলি ? সুজিত বলেছিল। —এখন তুই কদম।

অরুণ হেসেছিল। —নিমগাছেও ফুল হয় রে সুজিত, নিমফুলেও মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ আছে।

টিকলু তালুতে জিভ ঠেকিয়ে একটা টক্ করে আওয়াজ করেছিল। —প্রেম এমনি জিনিস, কপালে তিল দেখলে তিলক মনে হয়। এখন নিমগাছও তোকে সেণ্ট মাখাচ্ছে।

চোখোচোখি হতেই একমুখ হাসি হয়ে গেল রুণু।

তখন বিকেল। রোদ্দুর পড়ে আসছে, কিন্তু ঝকঝকে রুপোর মত আলো।

—এই, চা খাওয়াবে কিন্তু। সারা দিন ক্লাস করেছি, একটাও অফ ছিল না। একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, মা কেমন আছেন ?

টিকলু সুজিত কি বুঝবে। ওরা তো শুধু জানতে চায় চুমু খেয়েছি কিনা, কদ্দূর এগোল। এত নোংরা লাগে ওদের। মন বলে ওদের কিছু নেই বোধ হয়। এই যে এখন ও নিজেই বললে চা খাওয়ার কথা, এ যে কি আনন্দ। অরুণের হঠাৎ মনে হল রুণু অনেক অনেক কাছে এসে গেছে। তা না হলে এমন ভাবে বলতে পারে। আঃ, রুণু যদি সবসময় এমনি অধিকার দেখায়, ভাব দেখায় ওর ওপর জোর আছে··'মা কেমন আছেন' একটা ছোট্ট প্রশ্ন, অথচ কত আপন।

রুণু হঠাৎ হাসল। —এই দাঁড়াও। বলেই ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট শিশি বের করল, সেণ্টের শিশি। সেটা খুলে ওর শার্টের কলারে, ভাঁজ করা রুমালে, বুকে লাগিয়ে দিল। আনন্দে মন ভরে গেল অরুণের।

রোদ পড়ে গিয়েছিল, অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছিল।

ওরা চা খেয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে হাঁটতে শুরু করল। কি করবে, এ-সময় না পাবে ট্যাক্সি, না বাসে ট্রামে উঠতে পারবে।

—সেদিন তুমি এই নীল শাড়িটা পরে এসেছিলে, এত অদ্ভুত সুন্দর মানায় তোমাকে··

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ঘূর্ণি গেট ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে অরুণ বললে।

—নীল রঙ তোমার খুব পছন্দ, তাই না ?

অরুণ মুগ্ধভাবে তাকাল রুণুর দিকে। বললে, নীল আর কমলা রঙ। তুমি একদিন কমলা রঙের শাড়ি পরেছিলে।

—সেদিন নন্দিনীকে কমলারঙেও খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

—আজ তোমাকে। অরুণ বললে, সেদিনও তোমাকে এত অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল, আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখতে পারিনি।

অরুণ ফিরে তাকাল রুণুর দিকে। দেখলে, তার ঠোঁটে চাপা হাসিটা দুলছে।

ওরা তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ পাশাপাশি হেঁটে এসে একটা গাছের গুঁড়ির কাছে ঘাসের ওপর বসল। একটা কাঠ-বেড়ালী তরতর করে নেমে আসছিল, ওদের দেখে গাছে উঠে গেল তরতরিয়ে। সেণ্টের আমেজ নাকে এসে লাগল। মিলুটা যা ফাজিল, বলবে, সে কি রে দাদা ! সেণ্ট মাখছিস ?

গাছটার দিকে পিঠ ফিরিয়ে রুণু বসল, মুখোমুখি অরুণ।

সত্যি রুণুকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল নীল শাড়িতে। নীলের ওপর ছোট ছোট সাদা জুঁইফুল, তারার মত ফুটে আছে। মনে হল রুণুর মুখে দিঘির জল, সবুজ পাতা, কাশফুল, পায়রার পালক, ঘুঘুর ডাক, ঝরনা, ঘাস, পদ্মের পাপড়ি মিশে গেছে। রুপোলি রোদ মেখে

কাছে কাছে একটা ফড়িং উড়ছিল। রুণুর মুখেব দিকে তাকিয়ে অরুণের মন তখন হরিণ-হরিণ।

রুণু হাঁটু মুড়ে বসেছিল, হাঁটুর ওপব ওর দুহাত আঙুলে আঙুলে জড়ানো।

রুণু এত কাছে, এত অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে, অথচ এখনও যেন অনেক দূরের মানুষ। অরুণের বুকের ভিতর একটা শূন্যতার যন্ত্রণা করুণ হয়ে কাঁদছিল।

রুণুর আঙুলে একটা আংটি দেখতে পেল অরুণ। ও হাত বাড়িয়ে আংটিটা দেখার ছল করে রুণুর হাত স্পর্শ করল। আংটিটা দেখা যেন শেষ হয়নি এমন ভাব করে ও রুণুর আঙুল ছুঁয়ে রইল।

আর, অরুণ ভাবছিল এবার হয়তো রুণু হাতটা সবিয়ে দেবে, কি ভাগ্য, রুণুর চোখে মুগ্ধ হাসি ; অরুণ বললে, আংটিটা খুব সুন্দব, রুণু কোন কথা বলল না, ধীরে ধীরে ওর মুখ নামিয়ে এনে তাব হাতের ওপর যেখানে অরুণ আংটিটা ছুঁযে হাত রেখেছিল, সেখানে অরুণের হাতের ওপর চিবুক রাখল। চিবুক, তারপর গাল ছোঁয়াল।

অরুণ, তোর চেয়ে সুখী আজ আর কেউ নেই। অরুণ নিজেকে বললে। অরুণের সমস্ত শরীব আনন্দে থরথব করে কেঁপে উঠল। ওব হাত কাঁপছিল, ওর বুকের মধ্যে সব সংশয় অবিশ্বাস সরে গেল, ও স্বপ্ন দেখল।

আব কিছু চায় না অরুণ, আব কিছু চায় না।

অরুণ আবেশে শিথিল তার শরীরটাকে ঘাসের ওপর এলিয়ে দিল, কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া ভঙ্গিতে।

রুণুর পিছনে একটা মরা গাছ, অসংখ্য ডালপালা, একটাও পাতা নেই সে-গাছে। একটু আগে সেদিকে তাকিয়ে, গাছটাব পিছনে পবিচ্ছন্ন আকাশ, অরুণেব মনে হয়েছিল—আমি ঐ গাছটাব মতই। রুণু আমার কাছে শুধু একটা স্তোকেব মত, এক টুকরো সান্ত্বনা—দূরের পবিচ্ছন্ন আকাশটার মত। আর আমি, অরুণ, ঐ গাছটাব মত মৃত, হাহাকারে ভরা, নিষ্পত্র, পাতা ঝরা অজস্র শাখা অসংখ্য প্রার্থনাব হাত বাডিয়ে আছে, আছি, আমিও, আকাশটাব দিকে।

অরুণ খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল, রুণু খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল।

হঠাৎ পশ্চিমেব আকাশে ধোঁযাটে কালো কালো বৃষ্টির মেঘ এসে জমতে শুরু করল। প্রতিদিন বিকেলেই মেঘ জমছে, মেঘ উডে যাচ্ছে। এক ঝাঁক পাযবা অনেক উঁচু দিয়ে ডানায় রুপো ঝরিয়ে উড়ে গেল। রুণুকে খুব সুন্দর দেখাল। নীল শাড়িতে সাদা সাদা জুঁই। রুণু জুঁই ফুলের মত ফুটফুট করছে। ওব চোখে, হাসিতে, কথায় জুঁই ফুলের স্নিগ্ধ সুগন্ধ।

'মালা, নেবেন বাবু, মালা', লোকটা হাতে একরাশ বেল আর জুঁই, জুঁই ফুলেব মালা নিয়ে একদিন ওকে বলেছিল। রুণু আডচোখে অরুণেব দিকে তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছিল। ফুল-বেচা লোকটা বলেছিল, 'মালা নেবেন দিদি, মালা।' অরুণ সাহস পায়নি। ভেবেছিল, দিলেও ওর চোখেব আড়ালে গিযেই হযতো মালাটা ছুঁড়ে ফেলে দেবে। বাঃ রে, ফেলে তো দেবেই, তা না হলে মামীমার কাছে জবাব দেবে কি। লোকটা চলে যাওয়ার পরও জুঁইফুলের গন্ধ ছিল।

—তুমি আমাকে একটা নতুন নাম দাও। রুণু বললে। —শুধু তোমাব দেওয়া নাম, যা আর কেউ জানবে না। তুমি আর আমি।

অরুণ ভাবল। কি নাম দেবে ও, যা মন্ত্রের মত অরুণেব মনেও রোমাঞ্চ জাগাবে। পাখি, নদী, ঝরনা, ফুল, ময়ূরের রঙ, দোয়েলেব ডাক, সোনামোড়া ধানের শিস, সমুদ্র, পাহাড়, পাহাড়ের চূড়ায় বরফের চাদবে সূর্যোদয়।

অরুণ নিজের মনেই বললে, বৃষ্টি আসছে।

রুণু বললে, কোথাও এসেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া।

ঠাণ্ডা ভিজে ভিজে হাওয়া। সমস্ত শরীর জুড়িয়ে গেল। মেঘ জমেছে, কালো কালো, জলের ভারে টইটুম্বুর।

আর পরক্ষণেই ঝড় উঠল। কালবৈশাখীর ঝড। অরুণের মনে, রুণুর মনে।

টিপ টিপ দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পডছে। পড়ুক।

বৃষ্টি, বৃষ্টি। নিষ্পত্র গাছটা অজস্র বাহু বাড়িয়ে মৃতেব মত দাঁড়িয়ে আছে। অরুণের হৃদয়।

আরও একটু ঘন হয়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে!

অরুণ আর রুণু উঠে দাঁড়াল।

অরুণ বললে, যাব না, যাব না।

রুণু বিদ্যুতের মত হাসল। —আঃ, কতদিন বৃষ্টিতে ভিজিনি।

ওবা হঠাৎ দেখলে চারপাশে যাবা বসেছিল, যাদেব কথা ওবা ভুলে গিযেছিল, তাবা সব ছুটে পালাচ্ছে। ছুটে পালাচ্ছে।

ওরা খুব আস্তে আস্তে হেঁটে চলল, ঝবঝব বৃষ্টি পডছে, পড়ুক, স্বচ্ছজল পুকুরটাব পাড়ে সব বেঞ্চগুলো খালি হয়ে গেছে, ঝুপুব ঝুপ বৃষ্টি।

অরুণ আর রুণু এক মন হযে গেছে, বোমাঞ্চে, একটা অন্যবকম বিশুদ্ধভাব, আনন্দ ওদের চোখেমুখে।

বেঞ্চে এসে ওরা বসল। লোকগুলো সব জোডায় জোডায় এতক্ষণ বসেছিল, কেউ উদাস নিঃসঙ্গ, সবাই ছুটে পালিযেছে, গাছেব নীচে নীচে ভিড হযে দাঁডিযেছে।

—আমাদের নিশ্চয় পাগল ভাবছে ওবা। রুণু বললে।

অরুণ বললে, এই আনন্দ ওবা জানল না!

দুজনেরই সমস্ত শবীব ভিজে গেছে, চুল, পোশাক, মন থেকে জল ঝবে পডছে, ঝবে পড়ছে। দুটি স্রোত যেন এক হয়ে যেতে চাইছে।

তুমুল বেগে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি নয়, মেঘ-ভাঙা জলপ্রপাত যেন। চাবপাশে কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু ওবা দুজনকে দুজনে দেখতে পাচ্ছে।

সেই অঝোব বৃষ্টির আডাল দেওয়া ঘবে পাগলেব মত অরুণ রুণুর মুখেব কাছে মুখ এগিযে নিয়ে গেল। রুণুর মুখেব ওপর বৃষ্টিব ঝড।

—আরে পাগল ওরা দেখছে, দেখছে। রুণু বাধা দিল না, শুধু হাসল।

আর দুজনেই কাছাকাছি গাছের নীচেব ভিডেব দিকে তাকাল। ভিড়েব লোক বৃষ্টিব পর্দা ঢাকা পডে অস্পষ্ট।

অরুণের মনে হল আকাশেব দিকে তুলে ধরা অসংখ্য প্রার্থনাব হাত কৃতজ্ঞতায় আনত। অরুণের সমস্ত শরীর আজ সবুজ পাতায় ভবে গেছে।

প্রচণ্ড ঝড়ের মত মেঘভাঙা বৃষ্টি ওদেব চারপাশে যেন একটা ঘসা কাচের পর্দা টাঙিয়ে দিযেছে। কিচ্ছু দেখা যায় না, কিচ্ছু দেখা যায না। ফ্রস্টেড বাল্‌বেব আলোর মত, ঘসা কাচের জানলা দিয়ে আসা বিকেলের আলোব মত।

ওরা কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, কেউ ওদের দেখতে পাচ্ছে না।

অরুণ দুহাত বাড়িয়ে উত্তেজনায় রুণুকে জড়িয়ে ধরল সেই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে, ভিজে পিঠে রুণুর দুটি হাতের স্পর্শ অনুভব করল অরুণ।

মুখের ওপর মুখ নামিয়ে এনে সৃষ্টির প্রথম দিনের অজ্ঞাত রোমাঞ্চের স্বাদ নেবার মত অস্থিরতায় অরুণের ঠোঁট রুণুর ঠোঁট স্পর্শ করল। অরুণের বুক রুণুর বুকেব শব্দ শুনল,

অরুণের হৃৎপিণ্ড রুণুর হৃৎপিণ্ডে কান পাতল।

হঠাৎ বৃষ্টি একটু কমে এসেছিল, ঘসা কাচের জানলা সরে গিয়েছিল, আর কেউ একজন অট্টহাসে হেসে উঠতেই ওরা দুজনেই সচকিত হয়ে উঠল।

তারপর বৃষ্টির মধ্যেই ছুটে পালাল, ঘূর্ণি গ্যেটের দিকে, ঘাস-জল-স্বপ্ন-আনন্দ পিছনে ফেলে ছুটে পালাল।

নির্জনতা নেই, কোথাও নির্জনতা নেই। প্রেমকে স্নেহ দেখানোর মত মানুষ নেই, মানুষের সুন্দর মন নেই।

□

বেমানান, বেমানান। ভিতরটা বাইরেব সঙ্গে মিলছে না, বুকের ভাষা মুখের কথাব সঙ্গে মিলছে না। অরুণ তখন রক্তবঙের ফুলে ফুলে কৃষ্ণচূড়ার গাছ। অরুণেব মন মিহি সুরেব গান। ভিক্টোরিয়ার চত্বরে রুণুর পিছনে সেই যে মরা গাছটা ছিল, একটাও পাতা নেই, শুধু আকাশের দিকে অসংখ্য প্রার্থনাব হাতের মত ডালপালা, সেই গাছটা এখন পাতায় পাতায় কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়েছে। অরুণেব সমস্ত শরীর এখন সবুজ সবুজ পাতায় ভরে গেছে।

ছবিটা বার বার ওব মনে সুন্দর কোন ল্যান্ডস্কেপেব মত ভেসে উঠছিল। সবুজ ঘাস, সবুজ সবুজ গাছের পাতা, কেয়ারি করা ফুলের বেড, ফুলেব রঙ, রুণু দু-হাঁটু মুড়ে দু-হাতের ঢালুতে মুখ রেখেছে। পিছনে একটা মবা গাছ, তাবও পিছনে ফর্সা আকাশ, পশ্চিমেব আকাশে মেঘ, জলে-ভরা কালো কালো মেঘ জমছে।

রুণুর সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়ে শবীবেব সঙ্গে লেপটে আছে। অথচ বৃষ্টি গেছে থেমে, আকাশ পরিষ্কার হয়-হয। রাস্তায় ঘাটে বাসে শুকনো পোশাকেব ভিড।

রুণুর খুব অস্বস্তি লাগছিল। বললে, কি ভাববে বল তো সকলে?

অরুণ হেসে বললে, হেমেন মজুমদারেব ছবি। কোন একটা ম্যাগাজিনেব পুবনো সংখ্যায় দেখেছিল।

রুণু নামই শুনেছে, ছবি দেখেনি, তবু অর্থ বুঝল। বললে, বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি।

অরুণের নিজেবও এখন বিচ্ছিরি লাগছে, বেমানান লাগছে। সবাই ফিটফাট, ওব মত কেউ ভেজেনি, বৃষ্টি বন্ধ হযে গেছে অনেকক্ষণ, অথচ ওর সর্বাঙ্গ জলে চোবানো কাঁথা। লোকগুলো অবাক হয়ে দেখবে, যেন ওরা দুজন একেবারে পাগল। কাবও জামা ভিজবে এই ভয়, কেউ ভাববে এমন করে ভিজল কখন। বৃষ্টি তো নেই। একজনেব বুকেব মধ্যে যখন ভালবাসার বৃষ্টি নামে, আব সবাই তখন ঠিক এমনি অবাক হযে তাকায। বলে, পাগল, পাগল।

আনন্দে কৃতজ্ঞতায রুণুকে ও কত কি বলতে চেয়েছিল। বলতে চেয়েছিল, তোমার নতুন নাম বৃষ্টি। অথচ বলে বসল, তুমি হেমেন মজুমদারেব ছবি।

মুখের ভাষায় কি যায় আসে, কলকাতা এখন কবিতা। ট্রামেব ঘণ্টিটাও এখন ভাল লাগছে, ট্রাফিক সিগন্যালের আলোয় এখন রঙ।

অরুণের সমস্ত মন এখন ভরে আছে। 'কিচ্ছু পাবি না, কিচ্ছু পাবি না, ও তোর বুকেব ওপর পা রেখে ভরতনাট্যম নাচছে', টিকলু বলেছিল। অরুণের ইচ্ছে হল, সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে বলে, টিকলুকে, সুজিতকে, ঊর্মিকে—এই মাত্র আমরা শরীরেব দলিলে সই দিয়ে এলাম। ঠোঁট ঠোঁট ছুঁয়েছে, বুক বুক, এখন আর কোন অবিশ্বাস নেই, কোন ভয় নেই। এখন একটাই ভয়, হারিয়ে না যায়।

টিকলু কিচ্ছু বোঝে না, ও শরীরকেও সুন্দর করে দেখতে জানে না। কেউ জানে না। আরে শরীর মানে যে-কোন একটা শরীর নয়। যন্ত্রণার, স্বপ্নের, ইচ্ছার মোলায়েম ওড়নায় মোড়া একটা বিশেষ শরীর। রুণুর মত।

কিন্তু রুণু হঠাৎ 'বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি' বলল কেন। অরুণকে টিকলু ভাবল না তো ? ওর মন বদলে যাবে না তো ! বাঃ রে, চুমুটুমু খাওয়ার পরেও কি বদলে যেতে পারে নাকি। যাবে না কেন, অয়ন কি আর ওকে···যাঃ, শরীর তো স্নান করলেই শুচি, রুণু আমাকে মন দিয়েছে। কেউ কিচ্ছু বোঝে না। গোঁফওলা ছেলেটার মত সবাই কেবল চেঁচায়—ভ্যালুজ বদলে গেছে, বদলে যাচ্ছে। তাহলে পাঁচটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করলে সে মেয়েকে যাচ্ছেতাই বলিস কেন ? তুই জেনেশুনে তেমন মেয়েকে বিয়ে করতে চাস না কেন ?

আসলে ফিকির-ফন্দি সব। আসলে বোকা বুঝিয়ে মেয়েগুলোকে হাত করতে চায়। হাতের কাছে এলেই যেন বুক ভরবে। স্টুপিড, স্টুপিড সব। প্রেম কি জানেই না।

কোজি নুকে এসে বসল।পাখার হাওয়ায় জামাকাপড় একটু শুকিয়ে নিতে হবে। মা তো কদিন একটু ভাল আছে, ভিজে কাপড় দেখলেই চেঁচাবে। অবশ্য চেঁচানোর শক্তি এখন আর নেই, শুয়ে শুয়েই বলবে। মা কিন্তু খুব ভাল রান্না করত। একটা রান্নার লোক রাখা হয়েছে। লোকটা বাঁধতেই জানে না।

—প্রিন্সের কি খবর ? টিকলু হেসে উঠল। —চোখের জলে জামাকাপড় ভেজালি নাকি ?

অরুণের মুখে হাসি রয়েই গেল। —বল্, তোরা যা-খুশি বলে যা। আমি এখন আকাশে হাউই হয়ে ফাটছি, লাল নীল রুপোলি তারা হয়ে ফুটছি।

গরম চায়ে শব্দ করে চুমুক দিল অরুণ। আঃ।

সুজিত বললে, আর সাতাশ দিন পরেই বৃহস্পতি আমার একাদশে আসছে। তখন দেখাব।

আসলে ও একটু আশা পেয়েছে। জব-ভাউচার একখানা পেয়ে যেতে পারে। তাহলেই 'ফরেন'। কিন্তু সেটা চেপে গিয়ে বললে, তখন কত রুণু জুটে যাবে, দেখাব, দেখাব।

অরুণ হাসল, যেন প্রেম জিনিসটা 'পদ্মশ্রী' পাওয়া। আরে, প্ল্যান করে পবিত্র হওয়া যায় না, প্ল্যান করে ডাকাতি করা যায়।

—আমি দেখাতেও চাই না। টিকলু বললে, বিরামের হাল তো দেখছি।

—কেন ? কেন ? অরুণ জিজ্ঞেস করল।

সব শুনে অরুণের খুব খারাপ লাগল। আহা বেচারি। তাহলে টাকাই সব নাকি ? নন্দিনী তো ভীষণ ভাল মেয়ে। কম মাইনেতেও ওর তো সংসার গুছিয়ে নেয়ার কথা। অভাব কি কখনও প্রেমকে গলা টিপে মারতে পারে !

—শালা পাড়ার কটা ছোকরা ওদের বাড়িতে দিনরাত আড্ডা দেয়। টিকলু ক্ষোভের সঙ্গে বললে।

সুজিত হাসল। —তারাও তো ভাবে তুই কেন টহল মারছিস।

অরুণ নিজের মনেই হাসল, মূল্যবোধ না কি যেন বলে ওরা, সব বদলে-টদলে গেছে। বদলে যদি গেছে, তবে চাকরিটার জন্যে এত খুঁতখুঁতনি কেন অরুণের। ছোটমেসো তো বলেছে, এ মাসেই হয়ে যাবে। হয়ে তো যাবে, তারপর মিথ্যে সার্টিফিকেটটা ঘাড়ের ফিক ব্যথা হয়ে লেগে থাকবে। অথচ জানি সব ব্যাটারই কোথাও না কোথাও ফল্স্ কিছু আছে। তবু মন এমনি জিনিস, সব সময় খাঁটি থাকতে চায়। আরে দুর্, পার্টটাইম ফিলজফার হয়ে লাভ নেই, কত লোক তো জাল ডিগ্রি দেখিয়ে চাকরি জুটিয়ে নিচ্ছে। আর আসল ডিগ্রিতেই বা কি কম ভেজাল। ওর এখন চাকরি নিয়ে কথা, যাক্, তবু তো চাকরি।

অরুণ উঠে পড়ল, ভিজে কাপড়ে বড়ো শীত-শীত করছে।

বাড়ির সামনে এসেই—সর্বনাশ। সেই বড় গাড়িটা। ডাক্তাব।

আচ্ছা, অরুণ কি করবে, ও কি চব্বিশ ঘন্টা বাড়িতে বসে থাকবে নাকি। তখন তো দেখে গেল, মা দিব্যি কথা বলছে ধীরে ধীরে। তাছাড়া, বাবা তো ছুটি নিয়ে বাড়িতেই আছে। দুদিন হাসপাতালে কি সব পরীক্ষাটরিক্ষা করিয়েও এনেছিল বাবা।

ডাক্তার বলেছে, হসপিটালে রিমুভ কবতে হবে। বাবাব একটুও ইচ্ছে নেই।

ডাক্তার চলে যাওয়াব পর অরুণ মাব কাছে এগিয়ে এল।

মা কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন, চোখেব দৃষ্টি ভাসাভাসা। মিলু মাথাব কাছে বসে পাখার বাতাস করছিল। মার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে, দাদা এসেছে। মা, দাদা এসেছে।

মা বোধ হয় চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। তবু তাকিয়ে দেখবাব চেষ্টা কবল।

বিছানাব ওপব পড়ে থাকা ডান হাতটা তুলতে পাবল না মা, শুধু আঙুলগুলো হাতছানি দিল।

অরুণ গিয়ে মাব কাছে বসল, মাব হাতটা হাতেব মধ্যে নিল—মা, কষ্ট হচ্ছে তোমার?

মা মাথা নাড়ল না, কথা বলতে পাবল না। শুধু মাব দুচোখ বেয়ে দবদর করে জল পড়ল।

অরুণের বুকেব ভেতব কেমন কবে উঠল। অনুশোচনায় দুঃখে ওব নিজেবও কাঁদতে ইচ্ছে হল। কাঁদতে পারল না। মিলু ভাববে, দাদাটা কি, ছেলে হয়েও কাঁদছে।

অনেকক্ষণ মার কাছে বসে বইল অরুণ। মাব কপালে হাত বুলিয়ে দিল। মিলু যা ভাবে ভাবুক। মা ভাল হয়ে উঠলে তখন ও হয়তো শুনিয়ে শুনিয়ে হাসবে।

কিন্তু এ-ভাবে কতক্ষণ বসে থাকা যায়। মিলু কিন্তু ঠায় বসে বসে পাখাব বাতাস কবছে, কোন ক্লান্তি নেই। মেয়েবা এসব কিন্তু বেশ পারে।

—অরুণ।

বাঁচা গেল। বাবার ডাক শুনে উঠে গেল অরুণ।

বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

—নাঃ, কিছু না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা বলল।

অরুণ নিজের ঘরে চলে এল। ক্ষিদে পেয়েছে খুব। কিন্তু এখন খাওয়াব কথা বলা যায় না। বাবা কি ভাববে, মিলু কি ভাববে। মা এত কষ্ট পাচ্ছে, ও না হয় একটু পেল। দিদি তো বড় বড় লেকচাব মাবে, উপদেশ দেয়। কেন, এ-সময় আসতে পারে না? এসে একটু সেবা তো কবতে পারে। মিলু একটা বাচ্চা মেয়ে। 'তোমাবও তো মা অরুণ, তুমি একটু জোব করতে পার না? ডাক্তার যখন বলছে, অপারেশন কবতে··', ছোটমাসী একদিন এসে বলে গিয়েছিল, যেদিন পি. জি-তে নিয়ে গিয়ে বাবা দেখিয়ে এনেছিল। কিন্তু তাবপর থেকে চুপচাপ। 'জামাইবাবু, বোগটা কি, কিছু বলল?' ছোটমাসী জিজ্ঞেস করেছিল। বাবা মাথা নেড়ে জানাল—না! তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—বাবা কেন যে কিছু কবছে না। বাত্রে মিলুকে বললে অরুণ।

মিলুব মুখ থমথম কবছিল। ধীরে ধীরে বললে, বাবা কেমন যেন হয়ে গেছে। এ-সময় দিদি থাকলে তবু বোঝাতে পারত।

এ-সময় দিদি থাকলে! সে তো শুধু অ্যাডভাইস দিতে জানে। নিজেব সংসার নিয়েই ব্যস্ত। চিঠি দিল মিলু, আসার তো নাম নেই। উল্টে কাজ বেড়েছে ওব, হপ্তায় হপ্তায় বিপোর্ট পাঠাও মা কেমন আছে।

চাকরিটা হয়ে গেলে টাকাপয়সার দিকটা অনেকখানি সুরাহা হত। আজকাল খেতে বসে খেতে ইচ্ছেই হয় না, মাছের টুকরোটা অনেক ছোট হয়ে গেছে। সোনার মা পয়সা মারছে,

না বাবা বাজার-খরচ কমিযে দিয়েছে তাও জানে না অরুণ। মার অসুখে খরচ তো কম হচ্ছে না। বাবা বোধ হয় আর সমালাতেও পারছে না। এ-সময় অরুণের তো উচিত কিছু রোজগার করা। সংসারে কিছু সাহায্য করা। তা হলে ছোটমাসীও ওকে একটু সমীহ করত। বড়মামা তো ওকে দেখে হাসে, যেন ও একটা গুড ফর নাথিং।

অরুণের নিজেরও এক এক সময় তাই মনে হয়।

পরীক্ষা দিতে যাওয়ার দিনটা অবধি কোন দুর্ভাবনা ছিল না। ভিড় ঠেলে খেলা দেখতে গেছে, কিউ দিয়ে সিনেমাব টিকিট কেটেছে, পলিটিক্স নিয়ে তর্ক করেছে। তখন সমস্ত পৃথিবীকে বুড়ো আঙুল দেখানোর সাহস ছিল।

এখন রাতাবাতি ওরা সবাই অসহায় হয়ে গেছে, ও টিকলু সুজিত। আমরা যেন কিচ্ছু নই, কিছুই করতে পারি না, কোন পাওয়ার নেই আমাদের। একটা ভাল চাকরির বিজ্ঞাপন দেখলে অন্যকে জানাতে ইচ্ছে করে না। সুজিত একদিন ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে বেবিয়ে আসছে, অরুণেব সঙ্গে দেখা হযে গেল; বললে, একটা বই ফেবত দিতে গিয়েছিলাম। অরুণ জানে শ্রেফ মিথ্যে কথা, সুজিত নির্ঘাত জব-ভাউচাবের চেষ্টা করছে, ফর্ম আনতে গিয়েছিল। একটা চাকরি পেলে বিলেত যাবে না কেন? কিন্তু ওব ভয, অরুণও না চেষ্টা করে। অথচ এই সেদিন অবধি সুজিত ব্রেন-ড্রেন নিয়ে তর্ক কবেছে। যাক, ওব যা ব্রেন, বিলেতে পার্শেল কবে পাঠিয়ে দিযে বিলেত দেশটাকে যদি ডোবানো যায়।

—দ্যাখ টিকলু, এতকাল স্টুডেন্ট ছিলাম, মনে হত পৃথিবীটাকে কমলালেবুর মত হাতে নিযে লোফালুফি কবতে পাবি। টিকলুকে বলেছিল অরুণ।

এখন হাসি পায। ওরা কলেজেব সব ছেলেরা যখনই একজোট হয়েছে···ওবা একজোট হলে গরমেন্ট কাঁপে, আগুন জ্বলে, পুলিশ ভয় পায় এইটুকু জানত। এখন ওদেব আব কেউ কেয়ারই করে না। দু পয়সা বোজগার করতে না পাবলে এখন আর ওদেব কোন পরিচযই নেই। বাড়িতে প্রেস্টিজ নেই তো বাইবে। কলেজে যাবাব সময অ্যাদ্দিন তবু একটা দুটো টাকা নিত মাব কাছ থেকে, টিফিনের নাম কবে সিগারেট খেত, এখন মিলুর হাত দিয়ে বাবার কাছ থেকেই টাকা চাইতে হয।

—বিশ্বাস কর সুজিত, আমার এক একদিন বিবাট কিছু একটা করে ফেলতে ইচ্ছে করে। মনে হয় যেখানে যত গরমিল আছে, সব মিলিয়ে দিই অঙ্কের মত। মনে হয যেখানে যত অবিচার আছে সব ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিই।

সুজিত হেসেছিল ওর কথা শুনে। —তোর গা থেকে কলেজেব গন্ধ আর যাচ্ছে না। ও সব ছেড়ে নিজের ফিউচার বানা। সক্কলে ভাল ভাল চাকরি করবে, আর আমি দেশসেবা করব, ও মাইরি আমার কুষ্ঠিতে নেই।

—যা বলেছিস। টিকলু টিপ্পনী কেটেছিল। —অরুণ প্রেমে পড়েছে, ও তো গ্রেট হবার স্বপ্ন দেখবেই। আমি বাবা লিডারদের চিনে গেছি।

অরুণ কোন কথা বলেনি আর। টিকলু তো ঠিকই বলেছিল। প্রেম ছাড়া আর কি জন্যেই বা ও সব গরমিল মিলিযে দিযে পৃথিবীটাকে বদলে দিতে চাইছে! নাঃ, বাজে কথা। এতদিন ভাবত পৃথিবীটাকে বদলে দেবে, এখন জেনে গেছে তা সম্ভব নয, তাই নিজেকেই বদলে নিতে চাইছে। রুণু, ছোট ছোট সুখ—এসব চাওয়ার মানেই তো নিজেকে বদলে নিয়ে বেমানান পৃথিবীটার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া।

রুণুকে বিয়ে করার কথা এখনও ভেবে দেখেনি। ভালবাসে, ভালবাসে। ইচ্ছে হলে তখন আর কোন বাধানিষেধ মানবে না। বাবা, মা, দিদিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে।

সঙ্গে সঙ্গে মার কথা মনে পড়ে গেছে। ছি, ছি। সব দায়দায়িত্ব ও ভুলে গিয়েছিল।

দুব, কাল থেকে আর রুণুর সঙ্গে দেখা করবে না, রুণুর কথা আর ভাববে না। রুণুকে

দেখলেই ও সব দায়দায়িত্ব ভুলে যায়। কি আশ্চর্য, আজ যতক্ষণ রুণু ছিল, যতক্ষণ রুণুর কথা ভেবেছে, একবারও মার কথা মনে পড়েনি। রুণু ওর কষ্ট বোঝে না বলে ওর অভিমান হত, কই, মার কষ্ট ও যে বুঝছে না, তার বেলা?

অরুণের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এই যাঃ, সুজিত যে বললে ঊর্মি ওকে আজ ফোন করতে বলেছিল! বিশেষ কি দবকার। সুজিতের সঙ্গে গল্প করতে করতে ও একদম ভুলে গেছে।

এস কে এম-এর সঙ্গে ঘোরাঘুরির কথাটা টিকলু বলার পব থেকে ঊর্মির বিরুদ্ধে ওর একটা দারুণ অভিমান। অরুণ চায় ঊর্মি বিদ্যুতেব মত পবিত্র আব বিশুদ্ধ থাকবে। ঊর্মি শুধু মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারকে ভালবাসবে, একদিন বিয়ে কববে, সুখী হবে। ঊর্মি খারাপ হলে, কিংবা ঊর্মিকে কেউ খারাপ বললে যেন ওরই প্রেস্টিজে ঘা লাগবে।

—অরুণ! বাবা বারান্দায় ডেকচেয়ারে বসে বসে বিলেত থেকে আনানো কয়েকটা মেডিকেল জার্নালের পাতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিল, হঠাৎ ডাক দিল।

এই এক রোগ হয়েছে বাবার এখন। মার বোগটা কি তাই ধবা গেল না এখনও, ডাক্তার তো বলছে ব্রেনে কিছু, অপারেশন করাতে হবে, এদিকে বাবা যত রাজ্যেব প্যাম্পলেট জার্নাল আনিয়ে ঘর বোঝাই করছে।

বাবাব ডাক শুনে নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল অরুণ।

বাবা চোখ তুলে তাকাল, চোখ নামাল। তারপর বললে, না থাক। শুয়ে পড়গে যা। অনেক বাত হয়েছে।

□

টিকলু অন্যায় করেছে, একশোবার স্বীকার করবে ও অন্যায় কবেছে। না করে উপায় ছিল না তাই! কিন্তু ওব কি কোন মান-ইজ্জত নেই নাকি। বাবা তো ঠাণ্ডা মাথায় বলতে পাবত, ওর পাস করার খবরটা শুনে মা একটু খুশি হতে পাবত। তা না, বাড়ি ফেবার সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই এমন চেঁচামেচি চিৎকার কবল, ভাই-বোনদেব সামনে এমন গালিগালাজ করল বাবা, ওরা তো টিকলুর চেয়েও খাবাপ হবে, দাদাই এই, তবে আর আমরা ভাল হব কেন।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল টিকলুর। বাবাকে কেউ সমীহ কবে না, পাড়ায় বাবার কোন ভয়েস নেই, সবাই কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলে, এই সব দেখেই না পড়াশুনোর দিকে মন গিয়েছিল। তখন অরুণ আর সুজিত ওকে এত হেয় চোখে দেখত না। দেখলে বন্ধুত্বই হত না। কিন্তু ওর বাবাকে নিয়ে সুজিত আর ক্লাসের আবেকটা ছেলে একদিন ঠাট্টা করছিল, ও হঠাৎ এসে পড়ে শুনতে পেয়েছিল। তার পর থেকে অনেকদিন পর্যন্ত সুজিতের ওপর ওর রাগ ছিল।

সবাই, সব ছেলেই সুযোগ পেলে একবার করে বাবা দেখাত। কে কত বিদ্বান, কে কত বড় চাকরি করে। কিছু না থাকলে অমুক মন্ত্রী আমার মামার মেসোর মেজশালীর দেওর। টিকলুর যে বলার মত কিচ্ছু নেই। ও তাই চুপ করে থাকত, আর ভিতরে ভিতরে রেগে উঠত। যারা ঐ সব বলাবলি করত তাদের ওপর রাগ গিয়ে পড়ত শেষে বাবার ওপর। এক-এক সময় তাই মনে হত, পড়াশোনা করে পাস কবেই বা কি লাভ। ডিগ্রি তো বড়ো জোর পেন্সিলের দাগ তোলার ইরেজার, উল্কির দাগ তুলবে কি দিয়ে!

ও রকবাজদের মত কথা বলে, চোঙাদের সঙ্গে মিশে যায়, কিন্তু অরুণ বোঝে না, ওটাও

এক ধরনের স্নবাবি। তোদের পালিশ দেওয়া ভদ্রতাকে ভেংচি কাটার জন্যে। আসলে চোঙা প্যান্টদের ও ঘেন্নাই করে, কারণ ও নিজেকে ঘৃণা করে। যাদের পরিচয় দেবার মত পরিচয় আছে, ডিগ্রি না থাকলে তাদেব ভেংচি কাটা যায না, বড়ো জোর তাদের ওপর রেগে যাওয়া যায়!

সেল্‌স্ রিপ্রেজেণ্টেটিভেব চাকবিটা যদি পেয়ে যায নিযে নেবে, ভাবল টিকলু। ভেতরে ভেতরে ধরাধরি করছে, চেষ্টাও কবছে, অরুণ সুজিতদেব বলেনি। কলকাতায় আমার কি আছে? না হয় হোটেলে হোটেলেই ঘুরব, বাড়িটাও তো হোটেল।

বিলের টাকাটা আদায় কবে সবটা মেবে দেবাব ইচ্ছে ওব ছিল না। কি করবে, নন্দিনী হঠাৎ ধার চেয়ে বসল। পকেটে টাকা, বলা যায় কি যে দিতে পাবব না। তাছাড়া নন্দিনীকে ওব ভাল লাগছে, সুধা যতই তাচ্ছিল্য কবছে ততই ওব ইচ্ছে হয নন্দিনীর কাছে ছুটে যেতে।

আসলে টিকলু এই বাড়ি থেকে, পুরনো জীবন থেকে পরিত্রাণ পেতে চায। কিন্তু এখান থেকে ও কোথায় যেতে চায় তা নিজেই জানে না।

উপস্থিত নন্দিনীব কাছে।

প্যান্ট শার্ট পবে তৈবি হচ্ছে, মা বললে, আপিসাব ছেলে, ফিটফাট হযে বেরুচ্ছে। ঠাট্টাটা হঠাৎ ধমক হয়ে গেল। —বেরুচ্ছিস যে, টাকাটা দিযে যা।

টিকলু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, দেব তো বলেছি, তোমাদেব ধার আমি এক পযসাও বাখব না। একটু থেমে বললে, এখন নেই।

—নেই? মার গলাব স্বর হতাশ শোনালে। —নেই মানে? সংসার চলবে কি কবে? ঐ টাকার ওপর ভবসা করে ছিল তোব বাবা।

—নেই মানে নেই। জোব দিযে বললে টিকলু। মোজা খুঁজতে গিযে এক পাটি পেল, আরেক পাটি কোথায কে জানে। বোজ এই এক ঝামেলা। বাড়ি ভর্তি ভাইবোন, এ ওটা টানছে ও এটা ফেলছে। বিরক্তির একশেষ। কখনও মোজা পাবে না, কখনও গেঞ্জি কিংবা গামছা। গামছায় করে বাবা আবার একদিন মাছ নিয়ে এসেছিল। আঁশটে গন্ধ সাবান দিয়েও যায়নি!

মোজা খুঁজতে গিযেও বিবক্তি। নিজেব মনেই বললে, শালা বাড়ি, না ধোপাব ভাটি।

সত্যিই তাই। সব কটা ঘর আব বাবান্দায় ভিজে কাপড শুকোচ্ছে—শাড়ি, ধুতি, বাচ্চাদের ইজের, কামিজ এটা-ওটা। লম্বালম্বি টাঙানো শাড়ি, নডাচডা কবতে গেলেই মাথায ভিজে কাপড ঠেকে।

শেষ পর্যন্ত পেল মোজাটা। জুতোটা পালিশ কবাতে হবে। ঐ একটা সময় টিকলুর নিজেকে বেশ রাজা-রাজা লাগে। সিগাবেট ধবিযে জুতো-পালিশ বাচ্চাটাব পা-দানিতে পা তুলে দিয়ে যখন দাঁডিযে থাকে, আব বাচ্চা ছেলেটা ফটাফট ফটাফট পালিশ করে, তখন টিকলুর খুব ভাল লাগে।

বাইরে বেবিয়ে এসে টিকলু পকেটে হাত দিযে দেখল। তিনটে নোট এখনও আছে। মাকে দিব্যি বলে দিল, নেই।

একবার ভাবলে সুধাদেব বাড়ি যাবে কিনা! রোজ বোজ গেলে অন্য সবাই কি ভাববে। আর গিয়েও হয়তো তাকে একা পাবে না। পেলেও সুধা কাউকে না কাউকে ডেকে গল্প করতে বসবে। যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। এক একদিন এমন রাগ হয়। একদিন তো রেগে গিয়ে বলেও ছিল, তোমাকে জব্দ করাব অস্ত্র আমার হাতে আছে, দেখাব যেদিন···

সুধা ভয পেয়েছিল। তারপর ন্যাকামি করে করে ওকে শান্ত কবেছিল। একটুখানি

সুযোগ দিয়েছিল।

তারপর থেকে টিকলুব নিজেরই খারাপ লেগেছে। এ তো স্রেফ ব্ল্যাকমেল। ভয় দেখিয়ে কি ভালবাসা পাওয়া যায় নাকি। 'তুই কিচ্ছু বুঝিস না টিকলু, কিচ্ছু বুঝিস না।' যত বোঝে অরুণ। ভালবাসা কি তা যদি নাই বুঝত, তা হলে সুধার ব্যবহার দেখে মনে হয কেন, রক্তে কেউ শুকনো লঙ্কা বেটে দিয়েছে। আরে যাঃ, সুধার ওপর ও কখনও রিভেঞ্জ নিতে পারে নাকি। নেবে সুধা কখনও বিপদে পড়লে তাব দারুণ কোন উপকার কবে দিয়ে। তখন বুঝবে, বক্তমাংসের শরীরটাও ভালবাসতে জানে। বছব তিনেক আগে একদিন বাস্তা থেকে একটা মেয়েকে দশ টাকা দিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়েছিল ওরা ক বন্ধু। হুল্লোড় আর ফাজলামি করেছিল, কিন্তু মেয়েটাকে ছুঁযে দেখতে ইচ্ছে হযনি। সেক্স, সেক্স! এক গালাগাল। জানে না তাব মধ্যেও ভালবাসা আছে। শবীরকে ভালবাসা। অদ্ভুত সব ধারণা লোকের, ভেনাসের মূর্তিটা বেঁচে উঠলেই লোকে বলবে অশ্লীল, অশ্লীল। তা হলে প্রাণটুকুই অশ্লীল নাকি? অশ্লীল এই হৃৎপিণ্ডেব ধুকধুকুনি?

ঊর্মি তো ওকে কথায় কথায় বলে, অসভ্য। ওটা অবশ্য মেয়েদেব কথার মাত্রা। 'মেয়েটা হয়তো নির্ভেজাল, বোকা বোকা, জাহাজ দেখেনি কখনও, ছেলেটা তাকে ভুলিয়েভালিয়ে গঙ্গার দিকে নিয়ে যায়, বলে, চল চল জাহাজ দেখাব।' ব্যস্ 'জাহাজ দেখানো' কথাটায় আপত্তি। ভেতবে অন্য কোন মানে যদি দেখে থাকিস, সে তো তোরও দোষ। সাদা কথার সাদা মানে বুঝলেই আর ঝঞ্ঝাট থাকে না। ঊর্মি তো হাসতে হাসতে বললে, 'তুই ছিলি টিকলু? ডাকলি না কেন? হ্যাঁ, নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম, এস কে এম-এর সঙ্গে দেখা। বললেন, চল নামিযে দিয়ে যাব।' ব্যস, অরুণ তো বিশ্বাস করল। আমি অবিশ্বাস করছি তেমন ভাবও দেখাইনি।

মেয়েদের টিকলু একটুও বিশ্বাস করতে পারে না।

টিকলু ভাবলে, বিরাম বোধ হয় নন্দিনীকে খুব বিশ্বাস করে। নন্দিনী? না, নন্দিনী নিশ্চয় বুঝতে পারে ও কেন ওদের ওখানে প্রায়ই যায়। ববং টিকলু তো সুযোগ পেলেই বুঝিযে দেবার চেষ্টা কবে।

কোমব-ভাঙা একটা ট্রাম বিচ্ছিরি আওয়াজ কবে দুলতে দুলতে আসছিল; টিকলু লাফিযে উঠে পড়ল।

কড়া নাডতেই গ্যারেজেব ওপরের জানলা থেকে পর্দা সরে গেল।

বিরাম বললে, দাঁড়া, যাচ্ছে।

ইচ্ছে করেই তো সকালে এসেছে টিকলু। নন্দিনীব কাছে ওব আসতে ইচ্ছে হয়, গল্প কবতে ভাল লাগে। এ ছাড়া আর কি। ভিতরের লোভটাকে চাপা দিয়েই বেখেছে। জানে, ওর শরীরে পৌঁছনো যায় না।

নন্দিনী গিয়ে দরজা খুলে দিল। মুখ থমথমে। টিকলুকে দেখেও একটু হাসতে পারল না নন্দিনী। টিকলু বেশ বুঝতে পাবল, এইমাত্র বিবামের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেছে নন্দিনীর। আজকাল তো প্রায়ই হয। আসলে নন্দিনী হযতো বুঝতে পাবছে ও ভুল করেছে, ভীষণ ভুল করেছে। কিংবা বিরাম নিজেই হয়তো বিরক্ত হচ্ছে নন্দিনীব ওপর। ভাবছে সব দোষ নন্দিনীর। আরে বাবা, প্রেমটাই সব নয়। এত সব দায়দাযিত্ব, অভাব-অনটন, ঝুটঝামেলাব কথা তখন হয়তো ভাবেইনি বিরাম। নিজেকে তৈরি করার সময পায়নি। কিংবা দাদা-বৌদি, বাবা-মা সকলকে ছেড়ে এসে ভিতবে ভিতরে দগ্ধে মরছে। নন্দিনীকে বলতেও পারছে না।

নন্দিনী একদিন বলেছিল, ও তো বাড়ির কোন খবরই রাখে না, রাত করে বাড়ি ফেবে। আমাকে যে কিভাবে চালাতে হয় সে আমিই জানি।

বিরামের ওপর রেগে গিয়েছিল টিকলু।

ঘরে ঢুকে দেখলে বিরাম আপিস যাওয়ার জন্যে তৈরি। এক থালা ভাত ছিটকে পড়ে রয়েছে। নির্ঘাত ঝগড়া করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে থালাটা।

টিকলু ঢুকতেই বিরাম উঠে দাঁড়াল। —আমি চললাম, দেবি হয়ে যাবে। বলে ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে গম্ভীর মুখ নিয়ে এল নন্দিনী, ছড়িয়ে থাকা ভাতগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে থালায় রাখল, তারপর সেটা বাঁ হাতে ধবে জায়গাটায় ন্যাতা বুলিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ঘড়ি দেখল টিকলু। বিছানায় বসে বসে ঘড়ি দেখল। প্রায় আধঘণ্টা পর এক কাপ চা নিয়ে ঢুকল নন্দিনী।

মুখ তখন নির্বিকাব।

চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা প্রাণহীন গলায বললে, না খেযে বেরিয়ে গেল! গলাব স্বরে কান্না এসে গেল ওব। —দেখলেন, না খেয়ে বেরিয়ে গেল।

টিকলু কোন কথা বলল না। কাপেব চাযে দুবাব চুমুক দিযে চোখ তুলে তাকাল। দেখলে দেযালে পিঠ দিযে স্থিব দাঁডিয়ে আছে নন্দিনী, মুখ নামিয়ে। জল-টলটল চোখের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করল টিকলু! ওর বুকেব মধ্যে কেমন একটা নিষ্পাপ কষ্ট আর লুকানো লোভ ডুব-সাঁতার দিতে দিতে ভেসে উঠছিল।

—দাদা এসেছিল, তাও যেতে দিল না। গলাব স্ববটা কান্নাব মত শোনাল।

টিকলু চুপ কবে বইল। তারপর মুখ তুলে হাসবাব চেষ্টা কবল ও, নন্দিনীকে বললে, বসুন আপনি। দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ।

নন্দিনী ধীরে ধীরে এসে বসল টিকলুব কাছে। এত কাছে আব কোনদিন বসেনি। শুধু সেদিন কলঘর থেকে বেবিযে আসতে গিয়ে ওব গা ঘেঁসে গিয়েছিল। টিকলুর সমস্ত শরীব কেমন কেমন করে উঠেছিল।

আজ আবার তেমনি লাগছে। নন্দিনীকে সুধা বানিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

নন্দিনীর হাতটা মুঠো করে ধরল টিকলু! বোধহয অস্ফুটে কি একটা সান্ত্বনা দিতে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে নন্দিনী ডুকবে কেঁদে উঠে টিকলুব কোলেব ওপর মুখ ডোবাল।

নন্দিনীর পিঠের ওপর হাত রাখল টিকলু। —আপনি ফিবেই যান, দাদার কাছেই ফিরে যান।

নন্দিনীর শরীরের ওপর লোভ, নন্দিনীর অসহ্য কষ্ট, আবাব হয়তো টাকাপয়সা দিতে হবে সেই ভয়—পলকের মধ্যে অনেক কিছু খেলা করে গেল টিকলুব মনের মধ্যে।

অনেকক্ষণ পরে নন্দিনী মুখ তুলল, জলে মাখামাখি চোখমুখ ওর হেসে উঠল। বললে, হাতে কিচ্ছু নেই, কি করে কি করি বলুন তো? ও বোঝে না।

নন্দিনীকে এক মুহূর্তে সুধা বানিয়ে দিতে ইচ্ছে হল টিকলুর।

নন্দিনী মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে বললে, আপনার কাছে আর কত চাইব। আমাদের জন্যে আপনি অনেক করেছেন। চোখ নামিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, কুড়িটা টাকা অন্তত না হলে…

টিকলু বললে, টাকা নেই নন্দিনী, টাকা নেই আমার কাছে।

সমস্ত শরীর মন তেতো হয়ে গেল। বাবার গালাগাল, মার কথাগুলো মনে পড়তেই টাকার কথাটা অসহ্য বিরক্তি হয়ে গেল। বললে, টাকা নেই, সত্যি টাকা নেই।

পকেটে তখনও তিনখানা দশ টাকার নোট!

নন্দিনী মুখ তুলে তাকাল টিকলুর মুখের দিকে।

কিন্তু টিকলু চোখ তুলে তাকাতে পারল না।

নন্দিনী কি টিকলুকে বোকা ভেবেছে নাকি ? দিনের পর দিন টাকা চাইবে, সেই বিয়ের সময় থেকে শুরু হয়েছে, আর টিকলু শুধু দিয়েই যাবে ? নন্দিনীর জন্যে কি করেনি ও ? অথচ নন্দিনী ভাবছে, মুখের হাসি দিয়েই ওকে সন্তুষ্ট করবে।

নন্দিনী মুখ তুলল না। ধীরে ধীরে অস্ফুটে বললে, আমি এমনি চাইছি না।

হঠাৎ ও কেঁদে উঠে বললে, আমি বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই টিকলুদা।

একটু থেমে চাপা গলায় বললে, এমনি চাই না, আপনি বরং দুপুরে আসবেন।

বলেই হয়তো ভীষণ লজ্জা পেয়ে ছুটে পালাল নন্দিনী।

—নন্দিনী, নন্দিনী ! টিকলু ডাকল।

কিন্তু নন্দিনী এল না। বোধহয় চূড়ান্ত লজ্জায় ও আর সামনে আসতে পারল না।

টিকলু নিজেই নেমে এসে নন্দিনীকে খুঁজে বের করল। নন্দিনী তখনও দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ফর্সা ধপধপে কান আর কানেব চারপাশ রক্ত জমে লাল হয়ে আছে। যাব্বাবা, লজ্জায় কান লাল হওয়া পড়েই এসেছে, সত্যি এমনি হয় নাকি !

টিকলু পকেট থেকে দুখানা দশ টাকার নোট বেব কবে বললে, এই নিন।

নন্দিনী তখনও ফিরে তাকাল না।

টিকলু নন্দিনীর হাত ছুঁল না। দেয়ালের তাকে নোট দুটো রেখে বললে, এইখানে রইল।

বলে বারান্দা পেরিয়ে দরজা খুলে রাস্তায় নামল। সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে। মাথার মধ্যে যেন কিচ্ছু নেই। কেমন একটা ঘোরেব মত।

হাঁটতে হাঁটতে, ট্রাম লাইনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে টিকলুর ইচ্ছে হল ও চিৎকার করে বলে ওঠে, শালা টিকলু, তুই মহৎ, তুই শালা বেজায় মহৎ।

টিকলু নিজের মনকে বললে, আমাকে কেউ বুঝল না বে, কেউ বুঝল না। আমার নাকি নন্দিনীকে দেখে লোভ হয়, অরুণ আমাকে ঘেন্না করে, কিন্তু আমি ওদেব চেয়ে অনেক বেশি মহৎ। আমি তো সৎ, আমি তো ভাল।

নিজেকে শালা বিশ্বাস নেই। আমি আর কোনদিন নন্দিনীর কাছে আসব না, কোনদিন না। টিকলুকে কি কোন বিশ্বাস আছে নাকি।

'ভালবাসার তুই কিচ্ছু বুঝিস না টিকলু, কিচ্ছু বুঝিস না।' অরুণ বলেছিল। আসলে অরুণ, তুই বুঝিস না। আমি শরীরের ভালবাসা চেয়োছিলাম বে, শবীর চাইনি।

কেউ কোথাও ছিল না, চারদিক নির্জন। হাঁটতে হাঁটতে টিকলু হঠাৎ জোরে জোরে উচ্চাবণ করলে, আমার মধ্যেও মানুষ আছে রে, অরুণ, আমি সৎ, তোদেব চেয়ে অনেক বেশি সৎ।

কলেজে যেবার খুব হইচই হল, ট্রাম-বাস পুড়ল, সেদিন উর্মিকে টিকলু বলেছিল, আড্ডা দিই আব যাই করি, আমাদের ভিতবেও বারুদ আছে, কেউ শালা জ্বালিয়ে দিল না।

আজ হঠাৎ আবার সেই কথাটা টিকলুর মনে পড়ল।

□

অরুণের এখন অন্য এক ভাবনা।

প্রথম কয়েকটা দিন ও পালকের বিছানায় গোলাপের পাপড়িব চাদর গায়ে দিয়ে স্বপ্নের ঘোরে ঘুমিয়েছে। ওর মনে হয়েছে ওর চেযে সুখী আর কেউ নেই।

ওর যখন সতেরো বছর বয়স, ফ্যাকাশে রোগা চেহারার একটা মেয়েকে ভালবাসতে চেয়েছিল। নীপা। ওর দুর্বলতা নিয়ে মেয়েটা তার বন্ধুদের সঙ্গে হাসাহাসি করত। অরুণের

এখন ইচ্ছে হয়, ও রুণুকে নিয়ে বেড়াবে, হাসবে ; মুগ্ধচোখে মুখের দিকে তাকাবে, আর নীপা আরও রুগ্‌ণ আরও কালো চেহারা নিয়ে তাকিয়ে দেখবে। অদ্ভুত। নীপাকে ওর তো মনেই নেই, হঠাৎ দেখা হলে চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ। মেয়েরা এত চটপট বদলে যায় যে চেনাই যায় না। কিংবা মেয়েদের বোধ হয় কখনওই চেনা যায় না।

অরুণের এখন আর তেমন ভয় হয় না, রুণুর ওপব কেমন একটা বিশ্বাস এসে গেছে। বাঃ, রুণু তো আমাকে ভালবাসে, তাহলে আর হারাবাব ভয় কিসের। এতদিন ভয ছিল বলেই সুজিত আর টিকলুকে আড়ালে আড়ালে রেখেছে। কিংবা টিকলুদের প্রেসের টেলিফোনটা ব্যবহার করতে হয় বলেই আব ওকে আডালে রাখা যায় না। একদিন তাই সুজিত আর টিকলুকে সঙ্গে নিয়ে রুণুর সঙ্গে দেখা করেছিল।

ভেবেছিল রুণুর ভুরু কুঁচকে যাবে। ভেবেছিল এক সুযোগে রুণু ওকে বলবে, আজকের দিনটাই মাটি করলে।

কোথায় কি, সুজিত আর টিকলুকে পেয়ে রুণুর হাসি এক মুহূর্তে একেবারে ফোটা তুবড়ি। সারাক্ষণ জমিয়ে গল্প কবেছে ওদের সঙ্গে, অকণ আছে সে কথাই যেন ভুলে গেছে।

সুজিতকে রুণুর একটু বেশি বেশি ভাল লেগেছে, অরুণের বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু রুণুর ঐ গায়ে-পড়া ভাব অরুণেব একটুও ভাল লাগেনি। অরুণেব ইচ্ছে, সুজিত আর টিকলুর সঙ্গে রুণু একটু দূরত্ব বেখে কথা বলবে, আর অরুণেব সঙ্গে এমন ব্যবহাব করবে যে, ওরা দেখেই ভাববে মেয়েটা অরুণকে ভীষণ ভালবাসে।

তাই রুণু যখন সুজিতকে বলল, আবাব কবে আসবেন বলুন, তখন অরুণের খুব বাগ হয়েছিল।

সুজিত অবশ্য বললে, আমি ? আমি তো বোধ হয চলে যাচ্ছি। ইউ কে নয়তো ক্যানাডা। জব-ভাউচার নিয়ে চলে যাব, গিয়ে চাকরি কবব সেখানে।

সুজিত রুণুকে এড়িয়ে গেল দেখেও অরুণ খুশি হতে পারল না। শালা বিলেত দেখাচ্ছে রুণুকে। জব-ভাউচার দেখাচ্ছে। আর রুণুটা তো একদম বোকা, ও হয়তো ওসব বিশ্বাস করবে। কিংবা ভাববে বিলেতে চাকরি করা যেন খুব গর্বের। হয়তো সুজিতের সঙ্গে তুলনা করে অরুণকে মনে হবে—কিছু না, কিছু না।

অরুণ যে ভিতরে ভিতরে জ্বলছে, রুণু তা বুঝতেই পারেনি। ও হঠাৎ হাতটা বাড়িয়ে দিল সুজিতের দিকে, দেখুন না, আমার ‘ফরেন’ যাওয়া হবে কিনা।

ফেরার সময় তাই অরুণ হঠাৎ বললে, সেই হলুদ শাড়ির মেয়েটাকে মনে আছে রে টিকলু ? বেশ আলাপ হয়ে গেছে।

অর্থাৎ রুণুকে যদি তোরা সস্তা ভেবে থাকিস, কিংবা যদি ঠাট্টা করে বলিস, ও সুজিতের প্রেমে পড়ে গেছে, তা হলে···হ্যাঁ, অরুণও কম যায় না ! ও শুধু রুণুকে নিয়ে মজে যায়নি। অথচ, কোথায় কি, হলুদ শাড়িব সঙ্গে ওসব কোন সম্ভাবনাই নেই।

কিন্তু টিকলু বিশ্বাস করল। চোখ বড় বড় কবে বললে, সত্যি তোর কপাল মাইরি, এগিয়ে যা, এগিয়ে যা, না হয় ওটাকে স্টেপনি বানিয়ে নিবি।

অরুণ বুঝতে পারল না দেখে টিকলু হেসে উঠে বললে, গাড়ির একটা ফালতু চাকা থাকে দেখিস না ? সেটাই স্টেপনি।

অরুণ কোন কথা বলল না। রুণুর কাছে ও নিজেই ফালতু কিনা তাই বা কে জানে ?

আগে রুণুব সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ ছিল না, এখন হয়েছে নতুন জ্বালা।

এখন এক কাজ হয়েছে অরুণের, দুপুরে এসে টিকলুদের প্রেসে বসে থাকা। টিকলুর বাবা এ সময় থাকে না, রুণু জানে। ‘মনে থাকবে রে বাবা, মনে থাকবে’, রুণু ফোন নম্বরটা

শুনে বলেছিল ; কখন ফোন করতে হবে তাও বলে দিয়েছিল অরুণ। কিন্তু বিশ্বাস করেনি, ভেবেছিল, রুণু নিজের থেকে নিশ্চয় ফোন করবে না।

কিন্তু অরুণের এখন ওই এক কাজ হয়েছে। দুপুরে একটা ঘণ্টা টেলিফোনের সামনে বসে থাকা। কখনও টিকলু থাকে, কখনো থাকে না। ও থাকলেই হাসাহাসি করে এমন সব আজেবাজে কথা বলে, একটাও যদি কানে যায়, রুণু আর অরুণের সঙ্গে দেখাই করবে না। যেদিন ও একা একা আসে, সেদিন মন খুলে কথা বলতে পারে। টিকলু থাকলে, নিজেকে রুণুর পায়ে লুটিয়ে দেয়ার মত করে কথা বলতে পারে না। কিন্তু সেভাবে কথা বলেও তে' লাভ নেই। ও যা বলতে চায় তার কোন ভাষা নেই। ওর ইচ্ছে হয় প্রত্যেকটি শব্দের গায়ে একটু করে চোখের জল মিশিয়ে দিতে।

অরুণের এখন অন্য এক কষ্ট। দিনের পর দিন সব কাজ ফেলে ও ছুটে আসে টিকলুদের প্রেসে, আর সে কি অসহ্য যন্ত্রণা! প্রতিটি সেকেণ্ড যেন এক একটা পক্ষকাল। সকাল থেকে উৎকণ্ঠ হয়ে থাকে এই সময়টার জন্যে, আশায় আশায় স্বপ্ন দেখে, রুণু নিশ্চয় টেলিফোন করবে। হয়তো বলবে, 'যাব ? আজ দেখা করার মত সময় আছে হাতে।' যতক্ষণ থাকে টেলিফোনের দিকে চোখ। রাস্তা দিয়ে একটা সুন্দর মেয়ে চলে গেল একদিন, টিকলু বললে, 'দ্যাখ, দ্যাখ', অরুণ দেখল না, কিংবা দেখেও দেখল না। ওর কান বিবিবিং রিরিরিং শোনার জন্যে উৎকর্ণ। এক একবার হাতের ঘড়িটা দেখে, আশার লগ্ন পার হতে আর কতক্ষণ, এক একবার হতাশ হয়ে ভাবে, আজ আর বোধ হয় ডাক এল না, আবার পরক্ষণেই মনে হয় আসবে আসবে।

একবার টেলিফোনটা সত্যি সত্যি বেজে উঠল।

একটিবার বাজতেই ঝট করে রিসিভার তুলল ও।

—আজ্ঞে না, হরিদাসবাবু নেই, এক ঘণ্টা পরে করবেন।

বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

টিকলু হেসে উঠে বললে, একটা মুভি ক্যামেরা থাকলে ছবি তুলে রাখতাম তোর। মুখটা তখনই দপ করে জ্বলে উঠল, তখনই নেবানো কুপি।

টিকলুকে নিয়ে এই এক মুশকিল। ও না থাকলে অরুণ নিশ্চিন্ত। শেষ অবধি টেলিফোন না এলে বুকের জ্বালা বুকেই গোপন করা যায়। টিকলু থাকলে ঊর্মি আর সুজিতকে গিয়ে বলবে, হাসাহাসি করবে।

আচ্ছা, শুধু তো একটা ফোন, কয়েকটা কথা। তা হলেই সেদিনটা আনন্দে কেটে যায়, বুকের জ্বালা জুড়িয়ে যায়। তাও পারে না কেন রুণু ?

যেদিন ফোন আসে না, পর পর কয়েক দিন হয়তো আসে না, অরুণের সব কিছু বিস্বাদ লাগে, ইচ্ছে হয় হকি স্টিক দিয়ে পৃথিবীটাকে নাগালের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। এক এক সময় মনে হয় বুকের মধ্যে এত যে যন্ত্রণা, বোধ হয় একমুঠো মাংস কিংবা ফুসফুস কিংবা কি যেন পচা ঘা হয়ে গেছে, খামচে বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলে স্বস্তি।

ফোন আসে না, ফোন আসে না, তারপর হঠাৎ একদিন। —বৃষ্টি, আমি বৃষ্টি। যেন রুণুর গলা চেনে না অরুণ, যেন পরিচয় দেয়া দরকার। একটা ছিপিখোলা উল্লাস অরুণের মুখেচোখে ছড়িয়ে পড়ে।

—উঁহুঁ, আজ কি করে যাব, আজ তো

ব্যস, উড়ন্ত ফানুসটা, আকাশ-ছুঁই-ছুঁই ফানুসটা হঠাৎ গ্যাস বেরিয়ে যাওয়া বেলুন হয়ে যায়।

—শোন, কাল যাব। কাল কি বল তো ? রুণু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে।

অরুণ যেন জানে না। রুণু ফোন নম্বরটা মনে রাখতে পারে, আর অরুণ এই দিনটা মনে

রাখতে পাবে না ?

—তোমার জন্মদিন।

জন্মদিন। রুণু এসেই বললে, আমি ভাবতেই পাবিনি। সেই কবে তোমাকে বলেছিলাম, তারিখটা তুমি ঠিক মনে রেখেছ ?

বাঃ, মনে থাকবে না ? এ তো সামান্য ব্যাপাব। অরুণ তো ভাবে ওদেব দুজনের মনের মধ্যেও কথা চলে। পর পর কয়েক দিন ফোন না পেয়ে অরুণ নিজেই ফোন করল একদিন, আর রুণু বললে, ও মা, আমি তো এইমাত্তব তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। রুণুর জন্মদিন ওর নাকি মনে থাকবে না। এই একটা মাস ও খরচ কমিয়ে কমিয়ে শুধু টাকা জমিয়েছে। ওব যদি টাকা থাকত খুব দামী একটা কিছু দিত অরুণ।

তিনটে দিন শুধু দোকানে দোকানে ঘুরেছে। নিউ মার্কেটে।

মাত্র সাতটা টাকা। কিই বা কিনবে। কিচ্ছু পাওযা যায় না, কিচ্ছু পাওয়া যায না। যা কিছু পছন্দ হয়েছে, দাম শুনে পিছিয়ে এসেছে।

ঘুরতে ঘুরতে, ঘুরতে ঘুরতে, হঠাৎ একটা শো-কেসে সুন্দব একটা কাশ্মিবী সিল্কেব স্কার্ফ দেখতে পেল। এক কোণে সূক্ষ্ম সুতোব ছোট্ট একটি নকশা। একটা দীর্ঘ চেনার গাছ বাজার মত দাঁড়িয়ে আছে, তাব গুঁড়িতে দড়ি দিযে বাঁধা ছোট্ট একটি শিকারা। দড়িটা জরি দিয়ে বোনা, দড়ির মতই।

অরুণ জিজ্ঞেস করলে, কত দাম ?

রুণুর কাছে অরুণ ভিখিবি, ভিখিবি। তা বলে ওর চেহাবাও কি ভিখিরিব মত ?

লোকটা হেসে উঠল। —বহুৎ দাম, বহুৎ দাম। যেন দামটা বলতেও তার কষ্ট।

প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে সাতটা এক টাকাব নোট ছুঁল অরুণ, অপমানে বাগে সেগুলো মুঠো করে ধরল, মুঠোব মধ্যে পিষে ফেলল। তাবপব উদভ্রান্তেব মত বাইরে বেবিয়ে এসে দুমড়ে যাওয়া কুঁকড়ে যাওয়া নোটগুলো আবাব হাতের ওপর বেখে সমান করল।

বহুৎ দাম, বহুৎ দাম। একবার ইচ্ছে হল উর্মির কাছ থেকে ধার নিয়ে এসে দামটা ছুঁড়ে মারবে দোকানদারের মুখে। স্কার্ফটা কিনে নেবে। পবক্ষণেই ভাবলে, উর্মিব কাছে ধাব নিয়ে রুণুকে জন্মদিনেব উপহাব দেবে ? সে তো রুণুব অপমান।

ভাবতে ভাবতে শেষ অবধি কিছুই কেনা হল না।

জন্মদিন, জন্মদিন।

রুণুর সঙ্গে প্রিন্সেপ ঘাটের দিকে চলে গেল অরুণ, সামনে একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে।

তারপব নির্জন ঘাসের দিকে, কেল্লার পিছনে ডিচ্‌ ঘেঁসে এক জায়গায় বসল অরুণ।

—বোসো। রুণুকে বললে।

রুণু হেসে বললে, উঁহু, উঠে দাঁড়াও।

অরুণ কিছু না বুঝে উঠে দাঁড়াল, আব রুণু ওকে পা ছুঁয়ে প্রণাম কবল। —আমাব জন্মদিন।

একুশ বছবের যুবক অরুণ হঠাৎ অনেক বড় হয়ে গেল। অনেক বড়।

ওদেব দূর থেকে দেখে একটা ফুলওযালা কাছে এগিয়ে আসছিল, অরুণ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

ঠিক সেদিনের মতই মিষ্টি গন্ধ জুঁই ফুলের মালায। রুণুর চুলের মতই মিষ্টি গন্ধ, রুণুর চোখের তারার পাশের সাদা অংশটার মত সাদা।

একটা মালা কিনল অরুণ, রুণুর খোঁপায় জড়িয়ে দিল।

রুণু ভীষণ খুশি হল, ওর মুখ জুঁই ফুলের মত ফুটে উঠল। তাবপর মালাটার একটা প্রান্ত তুলে নাকের সামনে এনে ঘ্রাণ নিল রুণু। ধীরে ধীরে বললে, অয়ন আমাকে এমনি একটা

মালা দিয়েছিল।

ব্যস্, অরুণের মনেব সমস্ত আনন্দ এক নিমেষে মুছে গেল।

অয়ন, অয়ন, অয়ন।

অরুণের মনে হল, আমি কেন অয়ন হতে পারলাম না। 'অযন এমনি একটা মালা দিয়েছিল আমাকে।' তা হলে অনুক্ষণ রুণুর মনেব মধ্যে অযন বেঁচে আছে? শুধু তুচ্ছ কোন ভুল বোঝাবুঝির ফলে দুজনে দূরে সবে গেছে বলেই রুণুর বুকের মধ্যে কোন ব্যথা গুমরে মরে? তাহলে তো ও অয়নকেই খুঁজছে, অরুণের মধ্যেও অযনকে।

পাড়ার আনন্দদার পাঁচ বছবের ছেলেটা গ্রামে গিযে জলে ডুবে মারা গিয়েছিল। ওই একটাই ছেলে, আনন্দদার বউ কেঁদে কেঁদে কেমন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। খেত না, ঘুমোত না, কেঁদে কেঁদে চোখে ভাল দেখতেও পেত না। কেমন অন্যমনস্ক হযে থাকত, তিনটে প্রশ্নের একটা কানে যেত। শেষে আনন্দদার বউ, সকলে বলত, একটা এত্ত বড ডল পুতুলকে শার্ট প্যান্ট পরিযে বুকেব কাছে নিয়ে ঘুমোত।

তাহলে রুণু কি আমাকে ভালবাসে না? আমি শুধু একটা ডল পুতুল? হাবিযে গেলে বা নষ্ট হযে গেলে, কিংবা রুণুব যেদিন মনে হবে আমি ঠিক অযনেব মত নই, সেদিন আবাব ও অন্য একটা ডল পুতুলকে বুকেব কাছে আসতে দেবে?

—এই! মামীমাকে তোমাব কথা বলেছি। রুণু হঠাৎ বললে।

অরুণ আঁতকে উঠল—সে কি! যেন ভয়টা অরুণেব। তারপব জিজ্ঞেস কবল, কি বলেছ?

রুণু হাসল। —তুমি কি পাগল নাকি, আমার কি বুদ্ধিসুদ্ধি কিচ্ছু নেই? বলেছি, আলাপ হয়েছে, বন্ধু।

তারপর একটু থেমে বললে, মামীমা খুব হাসছিলেন। আমি বেগে গিযে মামীমাব সঙ্গে কথাই বলিনি।

আবেকটু থেমে অরুণেব মুখের দিকে কৌতুকেব চোখে তাকিয়ে রুণু বললে, মামীমা বলেছিলেন, একদিন বন্ধুটিকে নিয়ে এস।

বলে ঝবনা হয়ে হেসে উঠল রুণু। শেষ বিকেলেব আলোয রুণুকে বড়ো সুন্দব দেখাল। ও হাসলে ওকে রুপোলি ঝবনাব মত মনে হয়।

রোদ পড়ে আসছে তখন। আর একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। রুণু ঘড়ি দেখল।

—সময ফুরিয়ে গেছে? অরুণ অতৃপ্তিতে বিষণ্ণ হয়ে গেল।

রুণু হেসে উঠল। —সব কি ফুরিয়ে যাচ্ছে? আবার তো আসব।

অরুণ বললে, আজ লক্ষ্মীটি, আজ অন্তত আরেকটু বসো। আজ তোমাব জন্মদিন।

রুণু দূরে কোথাও চোখ ফেলে উঠে দাঁড়াল। —না না, আমার ভয করছে।

—ভয়? হেসে উঠল অরুণ। কিসের ভয়?

রুণু লাজুক চোখ নামিয়ে বললে, কাগজে দ্যাখোনি?

কি আশ্চর্য, অরুণ ভুলেই গিয়েছিল। ঝপ্ কবে ততক্ষণে হঠাৎ আবছা অন্ধকার নেমেছে। ওর নিজেরও ভয়-ভয় কবল। দূবে একটা পুলিশ কনেস্টবল নির্জনে বসা মধ্যবয়স্ক লোকটিকে কি বলছে, একটু দূরেই স্থূলাঙ্গী এক ভদ্রমহিলা।

মধ্যবয়স্ক লোকটি পকেটে হাত দিল।

আজ রুণুর জন্মদিন। আজ ওরা স্নিগ্ধ সন্ধ্যার বাতাসে কবিতা হয়ে যেতে চাইছিল। নির্জন হতে চাইছিল। কিন্তু নির্জনতা নেই, কোথাও নেই!

একটু দূরে জন পাঁচেক ইতর প্রাণী মদেব বোতল নিয়ে বসেছে। তারা বোধ হয় রুণুকে শুনিয়ে শুনিয়েই কিছু কুৎসিত আবর্জনা ছুঁড়ল। পুলিশ কনেস্টবলটা তাদের পাশ দিয়ে

হেঁটে আসছে, তাদের কথা বোধ হয় তাব কানেও গেল না। কিংবা আগেই বোধ হয় তার মুখবন্ধ করে রেখেছে ওবা।

আজ অনেক কথা ভেবে রেখেছিল অরুণ। অনেক কথা গুছিয়ে বলবে ভেবেছিল। কিছুই বলা হল না।

পাশাপাশি হাঁটিতে হাঁটিতে অরুণেব হাতটা ধরল রুণু, আঙুলেব সঙ্গে আঙুল জড়িয়ে ও একবাব অরুণের অতৃপ্ত বেদনাব মুখখানা দেখল। মৃদু ম্লান হাসি ছড়িযে পড়ল রুণুর চোখেমুখে। গাঢ গলায় বললে, তুমি অনেক কিছু চেযো না, আমাদেব এইটুকুই ভাল, এইটুকুই।

অরুণেব দিকে আবেক বাব তাকিয়ে খোঁপা থেকে জুঁই ফুলের মালাটা খুলে আবেক বার ঘ্রাণ নিল রুণু।

□

আমি কি একটা মানুষ? টুকরো টুকবো যত সুখ খুজে বেডাচ্ছি, একটু একটু দুঃখ নিতে চাইছি না। আমি কি একটা মানুষ? অরুণ ভাবল।

—ওদেব দোষ দিয়ে লাভ নেই প্রকাশ, ওবা অন্য জাত। বডমামা একদিন অরুণকে শুনিয়ে শুনিয়ে বাবাকে বলেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি শরীব খাবাপ হলেও একদিন ট্যাক্সিতে আপিস যাও না। বল, যখন পারব তখন বোজ ট্যাক্সি কবে যাব। আর এরা? পকেটে টাকা থাকলেই ঝট্ কবে উঠে পডে, পবেব দিন বাসেব ভাডাটাও থাকবে না জেনেও।

সত্যি তাই। সেবার পুবী গিযেছিল সকলে, বাবা কিছুতেই হোটেলে উঠল না। অরুণ আর মিলু বলেছিল, কটা তো দিন, কোথায় ফুর্তিতে থাকব, তা না, বেডাতে এসেও মা রান্নাঘরে, বাবা বাজাব কবছে।

বাবাকে অরুণ কিছুতেই বুঝতে পাবে না। ভবিষ্যৎ ভেবে ভেবে বাবা কোনদিন বর্তমানকে উপভোগ করতে পাবল না। বাডমামাও তো বাবাব মতই, বলেছিলেন, প্রকাশ, তোমবা চাও উপভোগ কবতে। দোতলায ওঠবার মত অবস্থা না হলে দোতলায উঠতে চাও না। ওবা চায ভোগ কবতে। পুজোব বোনাস পেলে একালেব ছোকবাবা কি ভাবে জান? দুদিন অশোকা হোটেলে থাকব।

যেন সেটা খুব দোষেব। অরুণ কাকে আব বলবে? টিকলুকে বলেছিল, আমাদের কি ভবিষ্যৎ আছে নাকি? শান্তিতে কেউ কিছু উপভোগ কবতে দেবে নাকি? কিছুই যখন পাব না, একটু একটু করে ভোগ করে নিই। তবু জানব কিছু পেযেছি।

আরে, বাচ্চা তো আঁতুড ঘবেও হয়। আমরা হযেছি, অরুণ ভাবল। কিন্তু দিদির ননদ তাব ফুটফুটে ছেলেটাকে দেখাতে এনে বার বার বললে প্রেসিডেন্সি নার্সিং হোমে হয়েছে। যেন ব্যথা ওঠে না ওখানে গেলে! নিজের মনেই হেসে ফেলল অরুণ। আচ্ছা, সত্যি খুব কষ্ট হয় ওদের? কি রকম? ইংবিজিতে কথায় কথায তো বার্থপ্যাংস্ ব্যবহার করে, অথচ কেউ জানেই না জিনিসটা কি।

মা যে কষ্ট পাচ্ছে, এই অসহ্য যন্ত্রণা, এও তো অরুণ বুঝতে পারছে না। শুধু মুখ দেখে বুঝতে পারে কষ্ট হচ্ছে। এক এক সময ওর নিজেবও অসহ্য লাগে। আসলে ও মাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে, না মার কষ্টটাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে? ও জানে না।

চিঠি পেয়ে দিদি এসে গেছে, খুব সেবা কবছে। সত্যি, দিদি না থাকলে বাবাও অসুখে

পড়ত। অবশ্য বাবা অসুখে পড়বেই। রাতে ঘুমোতে পারে না। অরুণ যখনই উঠেছে, দেখেছে বাবা চুপচাপ মার মাথার কাছে বসে পাখার হাওয়া করছে। সব ঝক্কি তো বাবাই পোয়াচ্ছে।

এদিকে, অসুখ মানেই তো একটা মচ্ছব। আত্মীয়স্বজনে ঘর ভর্তি, এ আসছে ও যাচ্ছে—চা খাওয়াও, রিক্‌শা ডেকে দাও, বাঙাপিসীর ছেলেমেয়েরা এসেছে লিলুয়া থেকে, জলখাবারের ব্যবস্থা কর।

আর সকলের কাছে অরুণের লজ্জা, হাসপাতালে দিচ্ছিস না কেন, অপারেশন করাচ্ছিস না কেন ? যেন ওর কথাতেই সব হবে।

বাবা কিন্তু গোঁ ধরে বসে আছে, অপারেশন করিয়ে আমাদের কি লাভ, ডাক্তাররা হাত পাকাবে।

বাবাকে এক এক সময় খুব নৃশংস মনে হয়। কিংবা কৃপণ। এক একবার সন্দেহ হয় মাকে বাবা হয়তো একটুও ভালবাসত না।

ওর ইচ্ছে হয়, খুব বড় বড় ডাক্তার দেখানো হোক, অপারেশন করানো হোক হাসপাতালে রেখে। বাঁচানো বা কষ্ট কমানোর চেয়ে বড় কথা, কেউ যেন না বলতে পারে, ওরা কিচ্ছু করেনি।

সুজিত তো সেদিন চমকে উঠে বলেছিল, সে কি রে, অপারেশন করাসনি ?

যেন মাকে ও খুন করছে। তাই যত রাগ ওর বাবার ওপর।

—অরুণ।

রাগারাগি করে অরুণ বেরিয়ে এসেছিল, সকাল থেকে মার ঘরে যায়নি। বাবার ডাক শুনে প্রথমটা সাড়া দিল না। তারপর কি মনে হল নিজেই গিয়ে বাবার কাছে দাঁড়াল।

বাবা চোখ তুলে তাকাল। বললে, শোন্।

বাবার চোখের দৃষ্টি পাথর।

বাবা কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ধীরে ধীরে বললে, ক্যান্সার। ব্রেনে।

অরুণের মাথা ঝিমঝিম করে উঠল, সমস্ত শরীর শক্তিহীন অবশ মনে হল। সুজিতের ওপর ওর মাঝে মাঝে রাগ হয়, দিনরাত কেবল হাতের রেখা দেখছে, কিংবা কুষ্ঠির ছক কাটছে। অরুণের মনে হল ও সুজিত হয়ে গেছে, অদৃষ্টের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে।

বাবা আবার ফিসফিস করে বললে, কষ্ট বাড়িয়ে কি লাভ বল্ ! ওকে শান্তিতে মরতে দে।

বাবা তাই বার বার সেদিন ডাক্তারকে বলেছিল, আর কিছু না, ওর কষ্ট কমিয়ে দিন।

শান্তিতে মরতে দে মানে শান্তিতে তাড়াতাড়ি মরতে দে।

অরুণ মার বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল। ওষুধ খেয়ে আচ্ছন্ন মার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল মৃত্যুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। অবধারিত মৃত্যুর দিকে।

বাবা আবার বিলিতি মেডিকেল জার্নালগুলোর পাতা ওল্টাচ্ছে।

নিজের ঘরে এসে বসতেই দিদি এসে দাঁড়াল। —মাকে তোরা মেরে ফেলছিস।

অসহ্য একটা কষ্ট হল, কথা বলতে না পাওয়ার কষ্ট। অরুণ এই প্রথম বুঝতে পারল, বাবা কি যন্ত্রণার মধ্যে দিনগুলো কাটিয়েছে। ওর আবার মনে পড়ল, মানুষ কথা বলতে পারে না।

সকলে ভুল বুঝছে বাবাকে ; অথচ বাবা দিনের পর দিন কেবল মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে। কিংবা প্রার্থনা করছে, অরুণের মতই যাতে মার তাড়াতাড়ি মৃত্যু হয়। বাবা দিদিকে বলতে পারছে না, মিলুকে বলতে পারছে না। আমাকে বলতে পারেনি, পাছে কষ্ট হয়।

বাবা কাউকে কষ্ট দিতে চায় না, সব কষ্ট নিজের বুকের মধ্যে পুষে রাখতে চায়। অরুণ

মাকে কষ্ট দিতে চায় না, তাই মার দ্রুত মৃত্যু চায়।

পাড়ার ননীবাবুর বাবার হয়েছিল। অপারেশন করে, 'রে' দিয়ে শুধু লোকটাকে ছমাস ধরে যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিল। তার পর সেই মৃত্যু।

বাঁচবে না, বাঁচবে না। যে কদিন বাঁচবে কষ্ট পাবে, হয়তো বা জড়পদার্থের মত পড়ে থাকবে।

অরুণের একবার মনে হল মার মৃত্যু, মার কষ্ট—এসব কিছুই নয়। বড়মামা বলবে, চিকিৎসা না করে তোরা মেরে ফেললি। ছোটমাসী বলবে, অপারেশন করিয়ে দেখলে তো পারতিস! টিকলু বলবে, বাঁচতেও তো পারত। ঊর্মি আর সুজিত বলাবলি করবে, খরচের ভয়ে কিচ্ছু করায়নি।

দিদির ননদ কেন নার্সিং হোমে গিয়েছিল এখন যেন বুঝতে পারছে অরুণ। মারা গেলে কেউ কাউকে দোষ দিত না। বলত, নার্সিং হোমে তো গিয়েছিল।

এতকাল ও ভাবত নার্সিং হোম আসলে স্নবারি। সাধারণের মত আঁতুড়ে কিংবা হাসপাতালে যায়নি, তারই বিজ্ঞাপন। এখন মনে হচ্ছে দায়িত্বস্খালন। বড় ডাক্তার দেখানোও বোধ হয় সেজন্যেই। কেউ কোন অপবাদ দেবে না, বাঃ, বড় ডাক্তার তো দেখিয়েছিলাম।

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে অরুণের মনে হল, মা তুচ্ছ হয়ে গেছে, মার অসুখ তুচ্ছ। আসলে বাড়িটা এখন রথের মেলা। লোক আসছে যাচ্ছে, গল্প করছে হাসছে। সময় মত চা না পেলে চটে যাচ্ছে।

লোকে কি বলবে সেটাই বড়। অরুণের মনে হল ও বিরাট একটা কিছু করে ফেলুক। খুব বড় বড় ডাক্তার আসুক। হাসপাতালে গিয়ে অপারেশন হোক। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস টাকা খরচ করে ওরা নিঃস্ব হয়ে যাক। ছোটছুটি করে ওরা সকলে অসুখে পড়ুক। মার কষ্টটা কিছু নয়। মার মৃত্যু কিছু নয়। সকলে বলবে, বেচারী ভীষণ কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু ওদের যত্নে ত্রুটি ছিল না।

দিদির ননদের মত গর্ব করে বলতে পারবে, ডাক্তার স্বোয়ামী অপারেশন করেছিলেন, ডাক্তার স্বোয়ামী!

—দাদা! কে একটা ছেলে তোকে ডাকছে রে, বেশ দেখতে ছেলেটা!

মিলু এসে বললে।

দরজার কাছে যেতেই বছর পনেরোর একটা সুদৃশ্য ছেলে দু-হাত জোড় করে নমস্কার করলে। তারপর একটা চিরকুট বের করে দিল।

চিরকুটে ছোট করে লেখা 'জরুরী দরকার, এক্ষুনি চলে আয়।' নিচে কেউ সই করেনি, তবু বুঝতে অসুবিধে হল না।

—কোথায়? অরুণ জিজ্ঞেস করল।

ছেলেটার পিছনে পিছনে এসে রাস্তার মোড়ে দেখলে ট্যাক্সিতে ঊর্মি বসে আছে।

ঊর্মি গম্ভীর। শুধু পরিচয় দেয়ার জন্যে বললে, আমার ভাই।

তারপর বললে, ভাইটি, তুমি ট্রামে চলে যাও। অরুণকে বললে, উঠে আয়।

ঊর্মিকে অনেকদিন দেখেনি অরুণ। ওর কেমন মনে হয়েছিল ঊর্মি ওদের এড়িয়ে চলছে আজকাল। দুদিন ফোন করেছিল। একদিন ঊর্মি কি একটা অজুহাত দেখিয়েছিল। আরেকদিন কফি হাউসে যাবে বলেও যায়নি।

অরুণের সেজন্যে মাঝে মাঝে বড় খারাপ লাগত। কণুর সঙ্গে দেখা করতে না পাওয়ার মত তীব্র জ্বালা নয়। কেমন একটা অভাব-অভাব।

টিকলুর কাছে, সুজিতের কাছে বুকের আবেগ চেপে রাখতে হয়। অনেক কথা বলা যায়

না। রুণু অয়নকে ভালবাসত একথা ওদের বলাই যায় না। উর্মিকে বলা যায়। উর্মি বোঝে। উর্মির কাছে তার জন্যে রুণুর দাম একটুও কমে যায় না।

কিন্তু উর্মিকে দেখে ওর মনে হল কি যেন হয়েছে ওর। সাংঘাতিক কোন অসুখ।

—তোর চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে উর্মি।

উর্মি কোন উত্তর দিল না।

অরুণের হঠাৎ মার কথা মনে পড়ে গেল। বললে, মার ভীষণ অসুখ রে। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

উর্মি এবারও কোন কথা বলল না।

উর্মির মুখে সেই হাসি নেই, ওর শরীরে সেই উচ্ছল সৌন্দর্য নেই। ওর কথা জাদু হারিয়েছে।

—তুই অ্যাদ্দিন ডুব মেরেছিলি কেন ? কি হয়েছিল ?

উর্মি কোন উত্তর দিল না। ও কি যেন ভাবছে। সমস্ত পৃথিবীটা যেন ওর মাথার ওপর ভেঙে পড়েছে।

চলন্ত ট্যাক্সিটা ভিড়ের রাস্তা দিয়ে যেতে শুরু করেছে দেখেই অরুণের ভয় হল। ছোটমাসীকে নয়, বড়মামাকে নয়। রুণুকে।

রুণু যদি দেখতে পায় কি ভাববে সে। নির্ঘাত ভাববে অরুণ একটা লম্পট। উর্মির সঙ্গে তার প্রেম, রুণুর সঙ্গে খেলা করছে। অথচ উর্মিকে এ-সময় বলা যায় না, আমি নেমে পড়ব।

ভিড়ের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখছিল অরুণ, কোথাও রুণু আছে কিনা। রুণু দেখছে কিনা।

অরুণ হঠাৎ ফিরে তাকাল উর্মির দিকে। দেখলে ট্যাক্সির জানলায় হাত রেখে, হাতের ওপর মাথা উর্মির মুখ চাপা কান্নায় থমথম করছে।

□

কয়েকদিন অবিরাম বৃষ্টির পর, আজ অসহ্য রোদ্দুর। না, গতকালও বৃষ্টি হয়নি। তবু মেঘ মেঘ ঠাণ্ডা একটা আমেজ ছিল। এখন দুপুরের রুটি-সেঁকা রোদ্দুর। চতুর্দিক নির্জন, নির্জন কিন্তু অরুণের বড়ো নিঃসঙ্গ লাগছিল। এখন রুণু সঙ্গে থাকলে এই দুপুরেই নির্জনতা। গাছের ছায়া এই প্রচণ্ড রোদ্দুর মুছে দিত। উর্মির সঙ্গ কখনও কখনও রুণুর অভাব মুছে দিয়েছে। একদিন টিকলুদের প্রেসে বসে টেলিফোন বেজে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করে অপেক্ষা করে বিস্বাদ হতাশ মন নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, একা একা রাস্তায় ঘুরেছিল, কেমন একটা শূন্যতা বুকে নিয়ে ছায়া খুঁজছিল, রাস্তায় বাসে-ট্রামে ছুটন্ত গাড়ির জানলায় সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে শান্ত হতে চেয়েছিল, তারপর অনেককাল আগে চেনা একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল, ঈশা, কথার ফাঁস ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে টেনে রাখতে চেয়েছিল অরুণ, পারেনি। কিন্তু রুণুর জন্যে ব্যথাটা অনেক কমে গিয়েছিল তখন। তখন অরুণ একা, তবু নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয়নি।

আজ উর্মি সঙ্গে রয়েছে, তবু কেউ যেন সঙ্গী নয়। কারণ উর্মির মন আজ অনেক দূরে চলে গেছে। পাশে পাশে দু-একবার ছোঁয়া লাগছে। তবু যেন উর্মি কাছে নেই। কি ভাবছে কে জানে। কি ব্যথা বোঝা যায় না।

একটা চীনেবাদামওয়ালা নোংরা-ঘাগরা টান-কাঁচুলির মেয়েটার সঙ্গে রসিকতা করছে।

আইসক্রিমওয়ালা একজন গাছের ছায়ায় আইসক্রিমের গাড়িটার ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

ঘূর্ণি-গ্যেট ঘুরিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতরে ঢুকল ঊর্মি আর অরুণ।

আমাকে বোধ হয় একটুও বিশ্বাস করে না রুণু। অরুণ ভাবল। দোষ কি ওর, টিকলু আর সুজিতই বিশ্বাস করে না। ওরাও একটু একটু সন্দেহ করে, কখনও মুচকি মুচকি হাসে। 'বন্ধু তো আমাদেরও। তবু ঊর্মির মুখে এক কথা—অরুণটা এলে বেশ জমত। কেন বাবা, আমরা কি কেউ নই।'

মনে পড়তেই ঊর্মিকে ভীষণ ভাল লাগল অরুণের, আপন মনে হল। শুধু আশঙ্কা, রুণু যদি দেখতে পায়। রুণু যদি ভুল বোঝে। আরে সে তো স্বাভাবিক। ঊর্মির হাসি, কথা, ঊর্মির ব্যবহারই তো সন্দেহ জাগিয়ে দেয়। সুজিত টিকলু কিংবা কলেজের অন্য ছেলেদের সামনে সেটা ভালই লাগত। অরুণ বেশ মজা পেত। কিন্তু রুণু কেন ভুল বুঝবে? তাহলে আর ভালবাসা কিসের? কি জানি রুণু হয়তো ভালই বাসে না। আচ্ছা, এখন এখানে ঐ রেস্তোরাঁর মধ্যে যদি রুণু থাকে, রুণু আর একটি ইয়াং ছেলে, সুন্দর চেহারা, কিংবা অয়ন? অরুণ মরে যাবে, মরে যাবে। কিছু কষ্ট হয় না, নিজে জানতেও পারব না, অথচ মরে যাব, এমন কোন উপায় নেই? বাঃ রুণু যদি আঘাত দেয়, রুণু যদি ঠকায়, ওর যত খুশি ও আমার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে ভরতনাট্যম নাচুক না, আমি বোকার মত মরে গিয়ে লোক হাসাব কেন! আমি খারাপ হয়ে যাব, একদম খারাপ হয়ে যাব। সেও তো এক ধরনের মৃত্যু।

রেস্তোরাঁয় মুখোমুখি এসে বসল দুজনে।

অরুণ বললে, এবার বল্।

তাকিয়ে দেখল ঊর্মির মুখ পাথর, নিঃশব্দ। তাকিয়ে দেখল ঊর্মির চোখ কাচের মার্বেলের মত—ঘোলাটে। ঠিক এমনি চোখ অরুণ আরেক বার দেখেছিল। নন্দিনীর। নন্দিনী যেদিন বাড়ি থেকে চলে এসেছিল। নন্দিনীর প্রেম যেদিন ভয়, দুশ্চিন্তা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঘা খেয়ে মরে গিয়েছিল।

ঊর্মির এই থমথমে মুখের আড়ালে কি আছে অরুণ কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না। ঊর্মির কোন দুঃখ থাকতে পারে, কখনও ভাবেনি।

সব মেয়েরাই মুখে স্নো-পাউডার মাখে, ঊর্মির মুখে এতকাল আরেকটা বাড়তি জিনিস দেখে এসেছে—ঊর্মির হাসি। ওর মুখে হাসি, ওর চোখে হাসি। তাই ঊর্মি যখন যেখানে থাকে সে-জায়গাটা পলকের মধ্যে বেল ফুলের ঝাড় হয়ে পুটপুট করে গাছভর্তি কুঁড়ি ফোটায়। সুখ-সুখ সুগন্ধে চারপাশ ভরে ওঠে।

'আসল ফুর্তি তো টাকায়। অমন একটা দাদা পেলে আমার মুখেও মার্কারি ল্যাম্পের আলো জ্বলত।' টিকলু একদিন বলেছিল।

কথা মিথ্যে নয়। ঊর্মির দাদা গভর্মেন্টের একটা প্রচণ্ড অফিসার, এটুকুই জানত। যেদিন ওদের তিন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়েছিল ঊর্মি, অরুণ তো অবাক হয়ে গিয়েছিল। চোখ ঝলসে গিয়েছিল সুজিতের। আর টিকলু যে অমন স্মার্ট ছেলে, সেও কেমন বোকা বোকা কথা বলেছিল। ওর দাদা-বৌদি ভদ্রভাবে কথা বলেও ওদের কেমন যেন এড়িয়ে এড়িয়ে গিয়েছিল। ও একটা চাপা গলার চাপা হাসি শুনেছিল ঊর্মির বৌদির, দরজার ওপারে। সে হাসিটা যেন ঠোঁট উল্টে বলেছিল, কি সব বন্ধু!

'জানিস অরুণ, বাড়িটা আমার কাছে একটা জেলখানা, অসহ্য লাগে আমার', ঊর্মি বলেছিল একদিন। 'লোকে বিরাট বাড়িটাই দেখে, সামনে লন, কিন্তু আমার নিজের বলতে শুধু এই ছোট্ট ঘরখানা। ঘরের বাইরে, ঘরের ভেতর সব জায়গায় ওদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। আমার যেন রুচি নেই, ভালমন্দ বিচার নেই, আমার নিজের পছন্দ অপছন্দ

কিছু নেই।'

—কিন্তু, তুই তো ফ্রি। আমাদের চেয়েও ফ্রি। অরুণ বলেছিল।

উর্মির মুখের হাসিটায় ব্যথার ছাপ পড়েছিল, নিজেকে নিজেই ঠাট্টা করে বলেছিল, ফ্রি? ঠিকই তো, সেজন্যে তোদের আব কোন দিন এ বাড়িতে ডাকব না।

অরুণ হয়তো একটু বুঝতে পেবেছিল, হয়তো সবটা বুঝতে পাবেনি। তাই চুপ করে গিয়েছিল।

কিন্তু উর্মি তো চুপ করে থাকার মত মেয়ে নয়। ও বলেছিল, জানিস অরুণ, একদিন দাদার অফিসে গিয়েছিলাম। এত মাইনে পায, এত বড অফিসাব, অথচ সেখানে গিয়ে দেখলাম ওর মত কিংবা ওর চেয়েও বড আরও কত বয়েছে। দেখলাম, সেই ছোট্ট একখানা ঘর। প্রকাণ্ড অফিস বিলডিংটার মধ্যে দাদা একেবারেই তুচ্ছ।

অরুণ হেসে উঠেছিল। —তাতে কি, সকলেই তো তাই।

উর্মি হাসেনি। 'ওরা জানে ওবা কত তুচ্ছ, তাই ওবা বড় বড় ফ্ল্যাট চায, ঘর সাজায, মেপে মেপে চলে। নিজেকে জাহিব করে। এক জাযগায মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না বলেই আরেক জায়গায় নিজেকে জাহির কবতে চায।'

অরুণ চুপ করে গিযেছিল।

উর্মি হঠাৎ বলেছিল, তোদেব যে কোন পবিচয নেই, তাই তোবা ওদের কাছে তুচ্ছ। জানে না, যে যতই বড হোক, সকলেবই সেই একখানা ছোট্ট ঘর।

অরুণ বলেছিল, তোব ওপর তো আমাদেব কোন রাগ হযনি উর্মি। ওঁদেব দোষ কি, আমরাই ওঁদের সঙ্গে নিজেদেব খাপ খাওযাতে পাবি না।

উর্মি খানিক চুপ করে থেকে বলেছিল, আমার ওপব আমার নিজেবই রাগ হয়। —আমি নাকি ফ্রি, কিন্তু এ যে কি যন্ত্রণা তুই জানিস না।

অরুণ বুঝতে পাবেনি, অবাক হয়ে তাকিযেছিল উর্মিব মুখের দিকে।

আর উর্মি ধীবে ধীরে বলেছিল, কলেজেব মেয়েগুলো ব্যবহারে দেখায় কত মডার্ন, এদিকে বাড়িতে বিয়েব চেষ্টা চলে, মেযে দেখতে এলে চটাচটিও করে, তাবপব খুশিখুশি মুখে বিয়েব পিড়িতে বসে। অথচ আমাব সমস্যা ভাব তো, বৌদি ঠাট্টা কবে বলে, 'ধানবাদ কদ্দূর উর্মি', দাদা একদিন বললে, 'অন্তত এক মাসের নোটিশ দিবি আমাকে।' অথচ যাকে নিয়ে ওরা এত নিশ্চিন্ত, সেই মাইনিং এঞ্জিনিযাবের মন বোঝা দায।

অরুণ কোন কথা বলেনি।

উর্মিব গলা গাঢ় হযে এসেছিল। —দাদা-বৌদি, আত্মীযস্বজন সবাই জানে, সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, অথচ বল তুই, তাকে কি ভাবে ধবে বাখব আমি নিজেই জানি না, নিজেই নিশ্চিন্ত নই।

এদিকে দ্যাখো, উর্মি সম্পর্কে অরুণ কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিল।

সেদিনের কথাগুলো মনে পড়তেই উর্মিব সেই অসহায মুখখানা চোখেব সামনে ভেসে উঠল।

কিন্তু উর্মিকে যেন আজ আবও অসহায মনে হচ্ছে। মৃতেব মুখের মত।

হাল্কা কথায় উর্মিকে হাসাবার চেষ্টা কবল অরুণ। —তোব ভাইয়ের হাতে S.O.S. পেয়ে আমি তো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

উর্মির মুখে সেই চেনা হাসিটা আসব আসব করে বিষণ্ণতায় মরে গেল।

অরুণ চুপ করে রইল. উর্মি চুপ কবে রইল।

তারপর হঠাৎ এক ঝলক হাসি উর্মির মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়তে গিয়ে সেটা দু চোখের পাতায় বৃষ্টি হয়ে গেল। দূর থেকে বেস্তোরাঁর বয় বিস্ময়েব চোখে উর্মির দিকে তাকিযেছে।

অরুণের বড়ো অস্বস্তি লাগল। দুপুরের রেস্তোরাঁয় আর কেউ নেই দেখে নিশ্চিন্ত হল।

ঊর্মির দু-চোখে জল টলটল করছে। কি যেন বলতে চায়, বলতে পারছে না।

গলার স্বরে চাপা কান্নাব গাঢ়তা ফুটিয়ে ঊর্মি হঠাৎ বলে উঠল, অরুণ, তোর কাছে আমার লজ্জা নেই, তোর কাছেই আমার কোন লজ্জা নেই। আমি—আমি বিপদে পড়েছি অরুণ।

—বিপদে ? অরুণের মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। —কি বলছিস ঊর্মি ?

পরক্ষণেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চুপ করে গেল। তারপর ভেঙে পড়া অবসন্ন গলায় বললে, তুই এত বোকা ঊর্মি ? তুই এত বোকা ?

ঊর্মি এখন আর চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। অরুণ এখন আর ঊর্মির মুখের দিকে চোখ তুলতে পারছে না।

অরুণ প্রগাঢ় লজ্জায় মাথা নিচু করে খুব ধীর স্বরে বললে, এস কে এম ?

—ছি ছি, কি বলছিস অরুণ ? ঊর্মি বলে উঠল।

অরুণ মিথ্যে সন্দেহ করার জন্যে অপ্রতিভ বোধ করল। —তুই বলতিস মাইনিং এঞ্জিনিয়াব খুব ভাল, ওর মত কেউ নয়, তুই বিশ্বাস করতিস।

ঊর্মি ম্লান বিষণ্ণ হাসি হাসল, তবু চোখ তুলল না। চায়ের কাপে অকারণ চামচ নাড়ল। বললে, তুই জানিস না অরুণ। ভয় শুধু নিজেকে, নিজেকে বিশ্বাস কবা যায় না।

অরুণ প্রশ্ন করল।

ঊর্মিব হাসিটা হিস্টিরিয়ার হাসি হয়ে গেল। —কি বলছিস তুই ? যে আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে···আমার কি একটু আত্মমর্যাদাও নেই ? ··আমি, না না, আমি ওকে একটুও দোয দিই না। দোষ তো আমাব, আমার।

চমকে চোখ তুলে ঊর্মির মুখেব দিকে তাকাল অরুণ। আরে আরে, এ তো মুক্তোর মত মেয়ে। নিজেব মধ্যে এক কণা বালি নিয়ে মুক্তো হয়ে গেছে। কিন্তু এখন··

অরুণ প্রশ্ন করলে,

ঊর্মি তার জলে ভাসা দুটো চোখ তুলে বললে,

একটুক্ষণ চুপচাপ।

অরুণ বললে, কি জানি···

টিকলুর কথাটা মনে পড়ল। 'চঞ্চলকে মনে আছে অরুণ ? চঞ্চল রুদ্র ? চঞ্চলদা বলতাম। খুব টাকা পিটছে, দেখা হল সেদিন।'

ঊর্মি হঠাৎ বললে, তুই আছিস, শুধু এইটুকু জানি। আমি আব কিচ্ছু জানি না, আমি আর কিচ্ছু জানি না।

অরুণ হাত বাড়িযে ঊর্মির হাতেব ওপর হাত রাখল। মুঠো করে ধরল। বললে, আছি। আমি আছি।

তারপর প্রশ্ন করলে,

ঊর্মি মাথা নাড়ল, বললে,

তাবপর ব্যাগ থেকে, সাদা ঢাউস ব্যাগটা খুলে একটা কাগজে মোড়া কি যেন দিল।

অরুণ শুধু অনুভবে বুঝল। খুলে দেখল না। নিঃশব্দে সেটা পকেটে রেখে দিল।

ঊর্মি যেন অনেকখানি নিশ্চিন্ত।

অরুণ বললে, জানি না, তবু···

টিকলুব কণুকে নিযে ঠাট্টাটা মনে পড়ল। 'দরকার হলে বলিস।' কিন্তু টিকলুর কথা ঊর্মিকে বলা যাবে না। টিকলুকে ঊর্মির কথা বলা যাবে না। ও নিশ্চয় ভাব দেখাবে যেন যুদ্ধজয় করেছে। বলবে—আমি বলেছিলাম, আমি আগেই বলেছিলাম।

অরুণ বললে,

ঊর্মি উত্তর দিল,

অরুণ বললে,

ঊর্মি বললে,

ঊর্মি যেন সেসনস্ কোর্টে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ দিনেব সওয়াল-জেরার পব শেষ বিচারের বায শুনবে। ঊর্মি উৎসুক দুটি চোখ তুলে তাকাল অরুণেব মুখেব দিকে।

অরুণ সান্ত্বনার কণ্ঠে বললে, আছি, আমি আছি।

সঙ্গে সঙ্গে ঊর্মির দু চোখ বেয়ে ঝরঝর কবে জল গড়িয়ে পড়ল। জলে ভাসা দুটো চোখের মধ্যে দিয়ে হেসে উঠল। —জানতাম অরুণ, আমি জানতাম।

কিন্তু অরুণেব মনে তখন দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে, অরুণেব মুখ ম্লান। ঊর্মির তখনও উৎকণ্ঠা, ঊর্মির মুখ ম্লান। ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, ওপবে সব পড়া দু কাপ চা পড়ে আছে। কেউ ছোঁয়নি। ঠিক ওই ঠাণ্ডা সব পড়া চায়েব মত ম্লান মুখ দুজনেব।

একা একা বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক কথা, অনেক দুশ্চিন্তা ওব মনেব মধ্যে ঘুবল। আচ্ছন্নের মত মনে হল নিজেকে। আবাব এক এক সময নিজেকে অনেক দামী মনে হল। মাথাটা যেন সকলকে ছাড়িয়ে ভিক্টোবিয়া মেমোবিয়ালেব চূড়াব পরীটাব মত অনেক উঁচুতে উঠে গেছে।

ধীরে ধীবে লুকিয়ে মোড়কটা বেব কবল অরুণ। খুলে দেখল, বেখে দিল। ছোট ছোট রুদ্রাক্ষেব মত প্যাটার্ন। অরুণেব হঠাৎ নিজেকে রুদ্রাক্ষের মত বিশুদ্ধ লাগল।

নন্দিনীর বিয়ের নোটিশ দেয়াব কথায় টিকলু বলেছিল, ও-ও শালা টাকা।

সর্বত্র টাকা।

কিন্তু অরুণ কি কোন অন্যায় কবছে ? তাহলে মনেব মধ্যে খিচখিচ কবছে কেন ?

পুবনো সংস্কাব, প্রাচীন বিবেক, বিগত দিনেব বিশ্বাস তাহলে কি এখনও অরুণের রক্তের মধ্যে খেলা করছে ? সব কিছু তুচ্ছ কবতে গিযেও নিজেকে মুক্ত কবতে পাবছে না ? নতুন বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে গ্রহণ কবতে চাইছে, বুকেব বিশ্বাসকে বাজি কবাতে পাবছে না। আমরা তাই দোটানাব মধ্যে জ্বলছি, যন্ত্রণা ভোগ কবছি।

অরুণেব মনে হল, এ দেশে যৌবন একটা পাপ। তা যেন ভিন্ন গ্রহ থেকে ফ্লাইং সসারে চড়ে হঠাৎ এসে নেমে পড়েছে। তাই সকলে ভাবে, পাপ বিদেয হলে বাঁচি।

টিকলু বলেছিল, কোথাও কিচ্ছু নেই রে, শুধু একটাই জিনিস আছে—টাকা।

পরক্ষণেই অরুণেব মনে হল, ভাগ্যিস টাকাব এমন অদ্ভুত শক্তি ছিল। তা না হলে আজ অরুণের মত অসহায আর কেউ থাকত না। তা না হলে ঊর্মি আজ লাশকাটা ঘবে ফালা ফালা কবে কাটা নেকেড অ্যাণ্ড দি ডেড। একটা ডেড বডি।

আমি কি জানি এস কে এম নয ছি ছি মাইনিং এঞ্জিনিযাব আমাব দোষ চঞ্চলদা কি বিচ্ছিরি সন্দেহ টাকা অনেক টাকা বিশ্বাস নেই হ্যাঁ গাইনোকোলজিস্ট সুন্দব প্রেম পারবে না মরে যাব না তো দেখি খোঁজ করি জানি না আছি অসম্ভব যে এড়িয়ে যায দাদা-বৌদি আমি নেই অসম্ভব মরে গেছে প্রেম মরে গেছে একদিন একটা দিন কি দুটো দিন ছি ছি চিনেছি ছোট ছোট মুহূর্ত চেনা যায অসম্ভব সে তখন এগিয়ে এলেও ছোট ছোট মুহূর্ত দিয়েই প্রেম মরে গেছে চিনেছি বাড়ি বলে দেব না না কোন সমস্যা নয় বাঁচব বেঁচে উঠব মুছে দিয়ে নতুন প্রেম কোনটাই শেষ নয় কোথাও শেষ নেই অরুণ, মবে যাব না তো ! আছি, আমি আছি।

ম্যাজিসিয়ানের দুটো হাতে দশটা বল খেলা কবার মত অসংখ্য শব্দ অরুণের মাথাব মধ্যে ঘুরছে, ঘুরছে ! নিজেকে বড় অসহায মনে হল অরুণের। মার অসুখ বাড়াবাড়ি। মার মাথার মধ্যে ক্যান্সাব। অরুণের মাথাব মধ্যেও হবে নাকি ? ক্যান্সার কি কুরে কুরে খায় ?

না, ক্যান্সার ঠিক কি জিনিস অরুণ জানে না। শুধু একটা ভযঙ্কর শব্দ। ঊর্মির মুখে 'বিপদ' কথাটার মত ভয়ঙ্কর। ক্যান্সার বোধ হয় উইঢিবি। কুরে কুবে মাটি ফেলে, তারপর রাতারাতি একটা উইঢিবি হয়ে যায়। বাড়ে, দিনে দিনে বাড়ে। থামাতে না পারলে মৃত্যু, অবধারিত মৃত্যু। থামাবাব রাস্তা নেই। অরুণের মনে হল ক্যান্সার—ঊর্মির ক্যান্সার। আজকের মানুষের বুকে মাথায বক্তে সর্বত্র। আজকের সমাজের সব জায়গায়।

টিকলুকে বলবে কিনা ভাবল অরুণ। টিকলুকে বিশ্বাস নেই। ও কোন কিছুই চেপে রাখতে পাবে না। ঊর্মিব মান-সম্মান? শালা মাইনিং এঞ্জিনিয়াব। হাতের কাছে পেলে তাকে খুন করত অরুণ। তারপব ধরা পডলে লোকে বলত রাইভ্যাল, বলত জেলাসি। ঊর্মির ওপব টিকলুর কুৎসিত লোভ, টিকলু ব্যাটা হয়তো সুযোগ নিতে চাইবে। তাহলে টিকলুকেও আমি খুন কবব।

হঠাৎ রুণুর কথা মনে পডল। টিকলুকে যদি কিচ্ছু না বলি, অরুণ ভাবল। তোব চঞ্চলদার সঙ্গে আলাপ কবিযে দে। বাড়ির সামনে নেম-প্লেট যেন দেখতে পেল—ডাঃ চঞ্চল রুদ্র। একজন বড বিপদে পড়েছে। না না, মানুষ কথা বলতে জানে না, কথা বলতে পাবে না। কথা বলাব উপায নেই। টিকলু নির্ঘাত ভাববে রুণু বিপদে পড়েছে। ছি ছি, রুণু সুন্দব একটা বঙিন পালকেব আকাশে-ওড়া-পাখি, বোদ্দুবে তাব নীল পালক চিকচিক করছে। জাল পেতে ঐ পাখিকে ধবতে চায় না অরুণ। ও বড়ো জোর কাছে নেমে এসে গাছেব ডালে বসুক, কিংবা অনুকম্পায একটা বঙিন পালক ঝবিযে দিযে উড়ে যাক।

আচ্ছা, রুণুর তো এমন বিপদ হতে পাবত। হযতো অযন। তখন তো সেটা অরুণেব নিজেরই সমস্যা। রুণুর জন্যে ও সব পাবে, সব পাবে। হয়তো আমি নিজেই। 'তুই এত বোকা ঊর্মি?' অরুণ বলেছিল। ঊর্মির কথাটা মনে পড়ল, নিজেকে বিশ্বাস নেই। অরুণ নিজেকে বিশ্বাস করে না। শবীবেব বক্তকে বিশ্বাস করা যায না।

রুণুকে একদিন স্বপ্নে দেখেছিল।

টিকলু ভাববে রুণু বিপদে পড়েছে। ভাবতেও খাবাপ লাগছে। অরুণ চায না রুণুর গাযে এতটুকু মলিন ছাপ পড়ে।

তার চেয়ে অরুণ নিজেকে কালো কবে দেবে, নোংবা কবে দেবে। সমস্ত অপবাধ নিজের ঘাড়ে নেবে। প্রেমফ্রেম সব বাজে কথা বে টিকলু। হলুদ শাড়ির সেই মেয়েটাকে তোর মনে আছে? বাবান্দায দাঁড়িযে হাসত? তাব সঙ্গে জডিযে পড়ে কি কেলেঙ্কাবি·

টিকলুব সঙ্গে দেখা হতেই অরুণ বলে উঠল, টিকলু, আমি বিপদে পড়ে গেছি মাইবি। ভীষণ বিপদ!

□

টিকলু ভীতু। ভাগ্যিস ভীতু, তা না হলে ঊর্মিকে বিশুদ্ধ আর পবিত্র রাখতে পাবত না অরুণ। ঊর্মি ওর কে? কেউ নয়! আমরা তো গাছ, অরুণ ভাবল। কিন্তু চন্দনের বনের মধ্যে অন্য গাছও চন্দনের গন্ধ বিলোয।

টিকলু সামনে যেতেও সাহস পায়নি। শুধু টেলিফোনে বলে দিয়েছিল।

অন্ধকার বারান্দার মধ্যে দিযে গিয়ে ডাক্তার রুদ্রর ঘব।

অরুণের পবিচয পেয়েই ঊর্মিব দিকে তাকালেন। ঊর্মির বজনীগন্ধাব মত শরীবের দিকে। তারপর নার্সকে বললেন, নিয়ে যাও।

—মরে যাব না তো, অরুণ? ঊর্মি হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিব মধ্যে থেকে ভয়

ফুটে বের হল।

যাবার সময় একবার অরুণের দিকে ফিরে তাকাল উর্মি।

একখানা কাগজ এগিয়ে দিলেন ডাক্তার রুদ্র। —সই করুন।

—সই ? অরুণ বুঝতে পারল না।

অরুণ পড়ল, পড়ে দুচোখ বন্ধ করে সই করে দিল। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। রাস্তায় বেরিয়ে এসে নার্সিং হোমটার দিকে ফিরে তাকাল।

সামনে একটি 'বার'। ভিড় জমতে শুরু করেছে। পানের দোকানে মদ্যপ লম্পটের ভিড়। একটা সস্তা মেয়ে খালি ট্যাক্সির মত ধীরে ধীরে অনিচ্ছায় হাঁটছে, হেলেদুলে। কেউ এগিয়ে গেলেই সওয়ারি পাওয়া ট্যাক্সির মত সময়কে দামী মনে করবে।

অরুণের বুকের মধ্যে একটা কান্না আর ভীষণ ভয় মাখামাখি হয়ে তোলপাড় শুরু করেছে। ও যেন ভেঙে পড়ছে।

নোংরা অন্ধকার নার্সিং হোম। নার্সের মুখ নির্বিকার। 'মরে যাব না তো, অরুণ'—কথাটা শুনে মৃদু হেসেছিলেন ডাক্তার রুদ্র। বলেছিলেন, ভয় নেই।

কিন্তু সই কেন ? সই করার আগে পর্যন্ত ও টিকলুকে ভীতু ভেবেছে। এখন মনে হচ্ছে কাগজটা ফিরিয়ে আনা যায় না ?

সই করতে গিয়ে হাতটা কেঁপে গিয়েছিল।

বুকের মধ্যে সাহস আনল অরুণ। ও আর এমন কি ! সামান্য একটা সই। সত্যি তো নয়। আসলে এ তো একটা খেলা। স্টেজের ওপর অভিনয় করতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী হওয়ার মত। স্বামী-স্ত্রী সেজেছে শুধু, একটা দিনের জন্যে। কিংবা দুটো দিন। উর্মির সব বিপদ কেটে যাবে, সব কিছু ও আবার ফিরে পাবে।

উর্মি আমার বন্ধু। তার জন্যে যে-কোন বিপদকে ও তুচ্ছ করতে পারে।

কিন্তু নির্ভয় হতে পারছে না কেন ? সমস্ত পৃথিবীটা যেন ওর মাথার ওপর ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

অরুণ কোথায় বাসে উঠেছে, কখন উঠেছে, কিভাবে বাড়ি ফিরেছে কিছুই মনে পড়ল না। একটাও মানুষ দেখেনি ও। কিছুই দেখেনি। মাথার মধ্যে শুধু একটা গভীর দুশ্চিন্তা।

আমি উর্মির স্বামী ?

ডাক্তার রুদ্র তো বলেছেন, ভয় নেই। ভয়ই যদি নেই, তবে সই দিতে হল কেন ? সকলেই নিজের নিজের গা বাঁচিয়ে চলেছে। উর্মি মারা গেলে···ঈস্, অরুণ ভাবতেও পারছে না। ওর দুচোখ অন্ধকার দেখল। অবিনাশবাবু সার্টিফিকেটের জন্যে লেটারহেডের কাগজটা দিয়ে বলেছিলেন, কেউ এনকোয়ারি তো করে না। ডাক্তার রুদ্র বলেছেন, ভয় নেই। অরুণ বোকা, বোকা। ও নিজের ঘাড়ে ঝুঁকি নিয়েছে। অরুণরাই হয়তো ঝুঁকি নেয়। না নিয়ে উপায় নেই। অবিনাশবাবুরা বা ডাঃ রুদ্ররা নেবে না, ওরা সাকসেসফুল। যারা সাকসেস দেখেছে তারা শুধু বাঁচিয়ে চলে।

অরুণের মনে হল ওর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। মনে হল প্রচণ্ড জ্বর। কিংবা বুকের মধ্যে ক্যান্সার। হ্যাঁ, একটা তক্ষক কুকুর কুকুর করে ফুসফুস হৃৎপিণ্ড পাঁজর সব চিবিয়ে খাচ্ছে।

বাড়ি ফিরে এল অরুণ। ক্ষিদে নেই, একদম ক্ষিদে নেই। সেই কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছিল, তখনও ভাল করে খায়নি। কদিন থেকেই ওর ক্ষিদে চলে গেছে। এখন বাঁচার ক্ষিদেও চলে গেছে।

মার ঘরে গিয়ে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়েই চলে এল। একটু বসতে ইচ্ছে হল না, কপালে হাত রাখতে ইচ্ছে হল না, কিছু না কিছু না, ভয় এসে ওর মাকে ওর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে

গেছে। এখন শুধু ভয়।

মানুষ সহ্য করতে পারছে না অরুণ। মিলু না, বাবা না, ছোটমাসী না, দিদি না। এমনকি রান্নার লোকটাকেও না। সোনার মা কি জিজ্ঞেস করল, উত্তর দিল না।

ঊর্মি বাঁচবে তো? যদি মারা যায়, সমস্ত পৃথিবী জানবে, ছি ছি করবে। মিলু ভাববে, ছি ছি, দাদা এই! অথচ দিব্যি ইনোসেন্টের মত হেসে হেসে কথা বলছিল? দিদি বলবে, সে কি রে, মার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল ভাবলাম···

বাবাকে বিশ্বাস নেই। গ্লানিতে লজ্জায় শেফিল্ড লেখা ক্ষুরটা স্ট্র্যাপের ওপর শান দিয়ে দিয়ে গলায় বসিয়ে দেবে হয়তো।

মা, তুমি তো কষ্ট পাচ্ছ, তুমি তো বাঁচবে না, তুমি মরে যাও, তাড়াতাড়ি মরে যাও। তোমার শোকের মধ্যে ওরা ডুবে যাবে, জানতেও পাববে না তোমার ছেলে একটা ক্রিমিন্যাল। একজন খুনী আসামী।

টিকলু হাসবে। আমি জানতাম, আমি জানতাম। ভাব দেখাত ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না।

আচ্ছা, ঊর্মি যদি মারা যায়, পুলিশ, হ্যাঁ পুলিশ যাবে। ডাক্তার রুদ্র তো সই করা কাগজটা এগিয়ে দেবেন। স্বামী সই করে দিয়ে গেছে। স্বাস্থ্যের জন্যে ইট ওজ এ নেসেসিটি· স্বামী? খোঁজ খোঁজ লোকটাকে। পোস্টমর্টেমে লাশ পাঠিয়ে দাও।

টেরিবল্! নাঃ, আর পারছে না অরুণ। একটা বুক একটা ছোট্ট হৃৎপিণ্ড কতখানি ভার সহ্য করতে পারে। এক পৃথিবী অপমান, ধিক্কার। বুকের মধ্যে ধুকধুক আওয়াজটা কানে শুনতে পাচ্ছে অরুণ। কই, আগে তো পেত না।

টেবিলে মাথা দিয়ে বসেছিল অরুণ। দিদি এল, মাথায় হাত রাখল। —যা অরুণ, মার মুখে একটু জল দিয়ে আয়।

বলেই অরুণের তক্তপোশের ওপর লুটিয়ে পড়ল দিদি। ডুকরে কেঁদে উঠল।

অরুণ ফিরে এল। নাড়ি নেই। মা অনেকক্ষণ আগেই হয়তো মারা গেছে।

কিন্তু অরুণের কোন দুঃখ নেই। মা কষ্টের যন্ত্রণার নদীটাকে পার হয়ে গেল।

'স্কাউন্ড্রেল, তুমি—আপনি আমাকে কোনদিন আর ফোন করবেন না, এরপর পুলিশে খবর দেব।' রুণুর গলা শুনতে পেল অরুণ।

অরুণ কাঁদছে, হাউ হাউ করে কাঁদছে। ওর দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে অরুণ।

ছোটমাসী নিজেও কাঁদছে, অরুণের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছে, কাঁদিস না অরুণ, কাঁদিস না। মা তো চিরকাল থাকে না রে।

মিলু কাঁদছে। —দাদা, তুই কাঁদিস না দাদা, তুই কাঁদিস না।

আরও কে যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে। অরুণ জানে না। অরুণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, মনে মনে বলছে, রুণু, আমি একটা স্কাউন্ড্রেল, আমি লম্পট, আমি ঊর্মির স্বামী, আমি একটা ক্রিমিন্যাল। আমি খুনী আসামী। কিন্তু তুমি আমাকে অপমান করো না রুণু।

হুজুর ধর্মাবতার! আমি কিচ্ছু জানতাম না। আমার মার এই কঠিন অসুখ, সেদিনই মারা যাবেন, আমি জানতাম। আমার মনের অবস্থাটা বিবেচনা করুন হুজুর। ঊর্মি আমার বন্ধু, সে নিয়ে গিয়ে সই করতে বলল। হুজুর, আমি ভেবেছিলাম তাকে বাঁচালে হয়তো আমার মা বেঁচে উঠবে। আমি তাকে মারতে চাইনি, আমি আমার মাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম।

গঙ্গা, আমার সব পাপ ধুয়ে নাও। আমাকে রুণুর যোগ্য কর।

মা, আমি আবার জন্ম নেব। তুমি থেক, তোমার কোলেই জন্ম নেব। দেখ, এবার আর তোমাকে বুঝতে ভুল হবে না। তোমাকে আমি কোনদিন কষ্ট দেব না। সমস্ত কষ্ট আমি নিজে নেব।

ঊর্মি তুই কি মারা গেছিস? তুই অপেক্ষা করিস। আমরা বড়ো তাড়াতাড়ি, সময়ের আগে বন্ধু হয়েছিলাম। অনেককাল পরে আমরা আবার বন্ধু হব। তখন সকলে আমাদের বুঝবে, বুঝতে পারবে।

রুণু, ভালবাসাকে বিচার করতে যেও না। চল আমরা সেই গুহার ধাবে ছোট্ট ঝবনায় পা ভিজিয়ে বসব। আমি তোমার গলায় চুলে, তোমার বুকে রক্ত-ফুলের মালা দুলিয়ে দেব। আমি তোমার দুটি চোখের পাতায় ছোট্ট করে চুমু খাব। আমি তোমাব দুটি নগ্ন বুকের উপত্যকায় মুখ ডুবিয়ে শান্তি চাইব।

গঙ্গায় স্নান করে উঠে এল অরুণ। সকলেব পিছনে পিছনে বাড়ি ফিরল।

এখন অরুণের মন স্নিগ্ধ। বিস্তৃত গঙ্গার জল থইথই বুকের মত স্নিগ্ধ। উড়ন্ত পাংচিলের মত হাল্কা। অশৌচবস্ত্রের মত নির্মল সাদা।

কিন্তু থেকে থেকে ঊর্মির জন্যে একটা উৎকণ্ঠা বুকের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠছে। আচ্ছা, ঊর্মির হার্ট দুর্বল নয় তো? যদি ক্লোরোফর্ম···ক্লোরোফর্ম না অ্যানাসথিসিয়া? কি জানি,···সহ্য করতে পারবে তো?

সমস্ত বাড়ি আচার-অনুষ্ঠানে ব্যস্ত। সমস্ত বাড়ি নিঃশব্দ। কেউ কোন কথা বলছে না। কিংবা খুব ধীরে বাতাসের শব্দের মত কথা বলছে। মিলু বসে আছে, দিদি বসে আছে, ছোটমাসী বসে আছে। শোকাহত।

অরুণের বাবা পাথর। নির্বিকার।

ঊর্মিব কোন খবর নেই কেন? কে খবব দেবে! ঊর্মি হয়তো এখনও নার্সিং হোমেই আছে। এক দিন, একটা কি দুটো দিন। ঊর্মি নিশ্চয় চলে আসেনি, এলে একটা খবব দিতই। হয়তো ভাইয়ের হাতে। অকণেব মনে হল ও খুব ভুল কবেছে। ঊর্মিকে বলেনি কেন, একটা খবব দিস। বাঃ, তা বলে কৃতজ্ঞতা নেই! জানে না, অরুণ উৎকণ্ঠায় ঘুম হারিয়েছে!

অরুণ ভাবল, ডাক্তাব রুদ্রকে একটা ফোন করলে হয়। কিংবা নিজেই চলে যাবে এই সাদা থানের পোশাকে? দেখে আসবে ঊর্মিকে? না, বড়ো ভয় করছে অরুণের। যদি কাল রাতেই ঊর্মির মৃত্যু হযে থাকে? প্রায়ই তো কাগজে দেখে। কেউ বলতে পারে না, কেউ ভরসা দিতে পারে না। মৃত্যুর কাছে, অদৃষ্টের কাছে বিজ্ঞানও অসহায়।

সেখানে চলে যেতে ইচ্ছে হল অরুণের। সিসটার, ঊর্মি ভাল আছে তো?

অন্ধকার করিডরটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। অন্ধকার ছোট ছোট কেবিন, নোংবা বিছানা, ম্লান মুখ, কেমন চুপচাপ, নিঃশব্দ, রহস্যময়। ভয়েব রাজত্ব যেন। ফিসফিস কথা নার্সের, রোগীর, ডাক্তারের। প্রতিটি পদক্ষেপে শুধু আতঙ্ক, আতঙ্ক। তখন ঐ অন্ধকারে আশা ছিল, বাঁচবার মন্ত্র ছিল। এখন ভয়, শুধু ভয়।

খবরের কাগজটা খুঁজে নিয়ে এল অরুণ। তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কোন ছোট্ট খবর, কিংবা চাঞ্চল্যের বড হরফ। কাল যদি মৃত্যু হয়ে থাকে ঊর্মির, তাহলে নিশ্চয় তা খবর হয়ে যেত। হত না? কি জানি। যদি মৃত্যু না হয়ে থাকে, তাহলেও তো খবর—ঊর্মি সে-খবব নিশ্চয় অরুণের কাছে পাঠাত। বাঃ, সে-খবব কে দিয়ে যাবে! ঊর্মি তো এখনও ঐ রহস্যেব অন্ধকারে।

যদি ঊর্মি মারা গিয়ে থাকে? ডাক্তাব রুদ্রই নিশ্চয় পুলিশে খবর দিয়েছেন। কিংবা

পুলিশ নিজেই খবর পাবে। এ-সব গোলমেলে ব্যাপার কোনটা কিভাবে হয়, কি আছে আইনকানুন, অরুণ কিছুই জানে না।

ও শুধু চোখ বুজে একবার প্রার্থনা করল, ঊর্মি যেন বেঁচে থাকে, ঊর্মি যেন বেঁচে ওঠে। মার চিতাভস্ম-অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন দেবার পর গঙ্গার জলে ডুব দিয়ে উঠে ও একবার প্রার্থনা করেছিল। ঊর্মি যেন বেঁচে থাকে, ঊর্মি যেন বেঁচে ওঠে।

'আপনার সই, আপনার', পুলিশের লোক যেন সেই কাগজখানা বাড়িয়ে ধরেছে ওর সামনে। আপনার স্ত্রী নয়, মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলেন ডাক্তারের কাছে, মেয়েটি অবিবাহিতা, আপনি ক্রিমিন্যাল। চলুন, ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।

না না, খবর নিতে যাবে না অরুণ। হয়তো পুলিশ ঘিরে ফেলেছে নার্সিং হোমটা। কিন্তু অরুণের ঠিকানা নেই সে-কাগজে। ঊর্মি কি কোন ঠিকানা দিয়েছিল ? হয়তো নিজের, হয়তো বানানো। পুলিশ ওকে খুঁজবে, খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। নাও পেতে পারে। পাবে পাবে। ডাক্তার রুদ্র নিশ্চয় টিকলুর ঠিকানা বলে দেবেন। টিকলুর ঠিকানা কি তিনি জানেন ? শুধুই তো চঞ্চলদা চঞ্চলদা বলত। হয়তো টিকলুর বাড়ি চেনেন না।

অরুণের মনে হল সমস্ত কলকাতা তোলপাড় করছে ওরা। অরুণ, অরুণ। অরুণ কে ? কোথায় থাকে ?

কার ডাক শুনে চমকে উঠল অরুণ। বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। একটা পুলিশের গাড়ি, কালো রঙের পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কেন ?

—অরুণ। আবার ডাক শুনল।

পরক্ষণেই সুজিতকে দেখে বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। ও ভয়ে কেঁপে উঠল। তা হলে টিকলুকেও ধরেছে। ধরা পড়েছে টিকলু। এবার অরুণ। এবার লাঞ্ছনা, ধিক্কার। অরুণের ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে এখনি আত্মহত্যা করে। কিভাবে করবে ? আত্মহত্যা করার কোন পথই এখন আর ওর মনে পড়ছে না।

সমস্ত মুখ কালো করে এগিয়ে এল অরুণ।

—আজ শুনলাম। সুজিত বিষণ্ণভাবে বললে।

কি শুনল সুজিত ? কি শুনেছে ?

—দুঃখ করিস না। সুজিত বললে। —মা চিরকাল কারও থাকে না! আমার তো—সেই পাঁচ বছর বয়সে।

সমস্ত শরীর থেকে ভয়, সমস্ত আতঙ্ক ঘামের মত ঝরে পড়ল। সারা গা ঘামে ভিজে গেছে অরুণের। কপাল ঘেমে গেছে।

আঃ, কি শান্তি। পুলিশের গাড়িটাও হর্ন বাজিয়ে চলে গেল। ওটা তো প্রায়ই এ রাস্তা দিয়ে আসে যায়।

—চল্ সুজিত, একটা সিগারেট খেয়ে আসি। অরুণ বললে। এই শোকের পোশাকে সিগারেট খেলে ওরা ভাববে মার জন্যে ওর কোন দুঃখ নেই। মার জন্যে সমস্ত শোক, দুঃখ, অনুশোচনা এখন শুধু একটা ভয়ের ঘরে বন্দী হয়ে আছে।

ঊর্মি। ঊর্মি ওর সমস্ত দেহমন জুড়ে আছে। এখন রুণুও ওর কাছে অসহ্য। হয়তো টিকলুর প্রেসে ফোন করে করে বিরক্ত হয়ে গেছে। কিংবা ভেবেছে অরুণ ওকে ভুলে গেছে।

না, এখন রুণুর সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। যদি সত্যি ঊর্মি মারা গিয়ে থাকে, যদি সত্যি ও ধরা পড়ে, রুণু তখন কি ভাববে! 'স্কাউন্ড্রেল। একটা লম্পট। আমি এই লোকটাকে বিশ্বাস করেছিলাম। সে-কথা ভাবতেও লজ্জা।'

অথচ অরুণ কিছুই চায়নি। ও শুধু ঊর্মিকে বাঁচাতে চেয়েছিল। কলঙ্ক থেকে, মৃত্যু

থেকে। একটা ছোট্ট ভুলের জন্যে একটা বৃহৎ মাশুল কেন দেবে ঊর্মি ! 'আমি বিশুদ্ধ, আমি পবিত্র।' কথাটা নতুন করে বিশ্বাস হল। যাবা পবিত্র তারাই এমন ছোট্ট ভুল করে। যারা অপবিত্র তারা ভুল করে না। তারা সতর্ক।

যারা পবিত্র তাবাই গঙ্গার ধারে, অন্ধকারে, নির্জনে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ধারে, লেকে—কোন আবেগের প্রস্ফুটিত মুহূর্তে শরীরকে আদর করে। যাবা অপবিত্র তাদের জন্যে সারা কলকাতার দরজা অবারিত। হোটেলের দরজা।

কিন্তু এখন ও-সব তত্ত্বকথা ভাল লাগছে না অরুণের। কাউকে বোঝানো যাবে না। অরুণ ভাবল, আমাদের কেউ বোঝেনি, বুঝবে না। বুড়োদের হাতে, ব্যর্থপ্রেম যুবকদের হাতে, সমাজের হাতে, সরকারের হাতে—শুধু একটাই রঙ। কালো। তারা সব কিছুকে কালো করে দিতে চায়। কালো চশমা পবে সব কিছু দেখতে চায। তাই অন্ধকারকে তারা এড়িয়ে চলে, কালো চশমা পরে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায না। খোঁজা যায না। যা কিছু কালো তারা এড়িয়ে চলে। কাবণ তাব ওপব কালো বঙ চডানো যায না। তাই আলোব ওপব, শুভ্রতাব ওপর তাদেব দৃষ্টি।

—সুজিত শোন্। অরুণ ওর হাতটা বাড়িযে দিল। —দ্যাখ তো, আমাব কোন বিপদ আছে কিনা ?

সিগারেটের প্যাকেটেব উল্টো পিঠে কুষ্ঠির ছকটা এঁকে দিল অরুণ। —বেশ তাই দ্যাখ। ভয়েব কিছু আছে কিনা।

সুজিতকে এতদিন ঠাট্টা করে এসেছে অরুণ। আজ তাব মুখেব দিকে এমন উদ্‌গ্রীব আতঙ্কিত চোখ তুলে তাকাল, যেন সুজিত কোন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষি। মুখেব কথায় ওকে অবধারিত কলঙ্ক থেকে রক্ষা কবতে পাবে।

'কি অধঃপতন ! মা মারা যাচ্ছে ছেলেটাব, তখন, দ্যাখ কি কাণ্ড', সাবা পৃথিবী যেন অরুণকে বিদ্রূপ কবে উঠল।

□

মার একটা ছোট্ট ছবি ছিল, বড মামা সেটাকে বড করে বাঁধিযে এনেছে। ছবিটা দেখে দিদি বলে উঠল, দ্যাখ দ্যাখ অরুণ, মাযেব ছবিটা দেখে মনে হচ্ছে মাযেব মনে বড কষ্ট ছিল বে, মুখেব মধ্যে ফুটে উঠেছে।

মিলু ছবিটা দেখল, বললে, সত্যি তাই বে দিদি, মাকে দেখে এতদিন বোঝাই যায়নি, ছবিটায় ব্যথাটা এক্কেবাবে স্পষ্ট।

অরুণ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখল ছবিটা। সেই চেনামুখ, কিন্তু কি যেন আছে ছবিটায, যা কোনদিন অরুণ দেখেনি। অরুণেব মনে হল, ঠিক তো, মার একটাও হাসিমুখের ছবি নেই। অরুণের মনেই পডে না, মাকে কোনদিন হাসতে দেখেছে কিনা।

মার মনে সত্যি বড় কষ্ট ছিল। অরুণ ভাবল, আমাদেব সকলের মনেই বড কষ্ট, কেউ সেটা দেখতে পায় না, বুঝতে পারে না।

বাবাব বুকের মধ্যেও তো অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা। কই, বাবাকে দেখে এখন কি ওরা বুঝতে পারছে ? একটুও না। মা যখন মাবা গেল বাবার চোখ বেয়ে তখন ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে দেখেছে অরুণ। বাবা তাবপব থেকে কেমন চুপচাপ, কিন্তু অনুষ্ঠানে এতটুকু ত্রুটি হতে দেয়নি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নির্দেশ দিয়েছে, নিজেব হাতে খাট সাজিয়েছে, এখন অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকর্ম খুঁটিয়ে দেখছে, মেনে চলছে।

অনুষ্ঠান আসলে একটা যন্ত্রেব মত। যন্ত্রের মতই বাবা চলছে, ফিরছে, কথা বলছে। অরুণ নিজেও তো সবই মেনে চলছে। কেন তা ঠিক অরুণ নিজেও জানে না। ও তো আগে এ-সব মানতই না। ভাবত, ভণ্ডামি। হিপোক্রিসি। হৃষিকেশবাবুকে একদিন প্রণাম করতে হয়েছিল বলে বাবা-মার ওপর রেগে গিয়েছিল। এখন সব মানছে। বোধ হয় এতকাল মার দিকে চোখ তুলে তাকায়নি, মার কষ্ট বোঝেনি, তাই নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অনুশোচনা প্রকাশ কবছে। কিংবা মার সেই কথাটা কানে বাজছে : তোকে সবাই যে হীরের টুকরো ছেলে বলছে রে ' তাই। সব নিয়ম মানলেই লোকে বলে হীরের টুকরো। নিয়মটাই বড়, কেউ বুকের ভেতরটা দেখে না। রুণুই কি দেখে ? ও শুধু মুখের কথাকে দাম দেয় ; গুছিয়ে, মন জুগিয়ে চলতে পারলেই হল। বুকের মধ্যে অসহ্য অভিমান নিয়ে যদি একটু বিবক্তি দেখায় তাহলে রুণু ভাবে, ও ভালবাসে না। কিন্তু মা ? এখন মার ছবিটা যেন হাত তুলে আশীর্বাদ কবছে। মার ছবিটার দিকে তাকিয়ে উর্মির জন্যে ভয সহ্য করতে পারছে।

মা উর্মির জন্যেই মারা গেল না তো ' হয়তো উর্মিকে বাঁচিয়ে দিয়ে মা মৃত্যু ডেকে নিয়েছে ছেলের মুখ চেয়ে। ছেলের গায়ে কলঙ্ক লাগবে জানতে পেরে মা হয়তো ·

'ছেলেটা ভেবেছিল প্রেমিকার চেয়ে বড় কেউ নেই। মা বলে, ওর কাছে যাসনে, যাসনে। মেয়েটা বললে, এসো না, এসো না, যদি ভালবাসাব প্রমাণ দিতে পাব তবেই আসবে। কি প্রমাণ চাও ? ছেলেটা জিজ্ঞেস কবলে। প্রেমিকা মেয়েটি বললে, তোমার মাকে হত্যা কবে তার হৃৎপিণ্ডটা উপহাব এনে দিতে পাব ? ছেলেটা নিঃশব্দে চলে গেল, তারপর মার বুক চিরে হৃৎপিণ্ডটা তুলে নিল হাতে। প্রেমিকাব কাছে ছুটে এল তাজা বক্তেব হৃৎপিণ্ডটা হাতেব তালুতে বেখে। কিন্তু প্রেমিকাব ঘবে ঢুকতে গিয়ে চৌকাঠে হোঁচট খেল। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডটা বলে উঠল, আহা, বাছা, তোব লাগল ?

উর্মির জন্যে মনেব মধ্যে আতঙ্ক, কিন্তু মাব ছবিটার দিকে তাকালেই মনে হয মা বলছে, ভয কি বে, আমি তাহলে মবলাম কেন।

দুব, কি আজেবাজে ভাবছে অরুণ। উর্মি কি ওব প্রেমিকা নাকি ' বন্ধু তো।

কিন্তু সে কথা কে বিশ্বাস কববে, যদি উর্মি মাবা যায়, যদি অরুণ ধবা পড়ে ? ছি ছি, ওর জন্যে সকলের মাথা নিচু হবে। বাবা-দিদি-মিলু। লোকে উপহাস কববে, দিদি শ্বশুববাডিতে খোঁটা খাবে, মিলুর বিয়েই হবে না হয়তো। দাদাই যখন এবকম· ·বাঃ, আমরা যদি গাছ, সব একা একা দাঁড়িয়ে আছি, তা হলে অরুণেব জন্যে ওরা কেন মাথা হেঁট করবে। শিকড়ে শিকড়ে মেশামেশি হয়ে আছে বলে ?

না, উর্মিকে একটা ফোন না কবে শান্তি নেই। এতকাল মনে হত শজারুর কাঁটাগুলো উল্টোমুখে শরীরে বিঁধে আছে। এখন সেই বিরক্তি যদি বা সবে গেছে, মন জুড়ে এখন শুধু ভয়।

পোস্ট আপিস এখান থেকে অনেক দূরে। সেখানে গেলে উর্মিকে ফোন কবা যায। কিন্তু এই পোশাকে, সাদা 'কাছায়', মুখে দাড়ি, ট্রামে উঠতে একটু অস্বস্তি হয়। খালি পায়ে আবও। তবু ওসব কথা একটুও মনে হল না, ট্রামে উঠল, পোস্ট আপিসের সামনে এসে নামল।

রুণুর কথা একবার শুধু একটু মনে পড়ল। তারপব ভাবল, যাক, উর্মির খবরটা জানা আরও বেশি প্রয়োজন। নম্বরটা ডায়াল করে ক্র-র্-র্ শব্দ হতেই পয়সা ফেলল। স্লট মেশিনটা এক যন্ত্রণা। এখন যদি কেউ না ধবে, পয়সাটা বববাদ। আবার হ্যালো শুনে পয়সা ফেললে, তোমার কথা ও-প্রান্ত শুনতে পাবে দেরিতে, দুবার 'হ্যালো হ্যালো' বলেই রেখে দেবে, বলবে, কিরে বাবা, কেউ সাড়াই দিল না। গাভমেণ্টের মাথায় এতটুকু বুদ্ধি

নেই। সিস্টেমটা এমন কর না, আমার কথা ও-প্রান্ত শুনতে পাবে, পয়সা ফেললে তার কথা আমি শুনব। তাহলে সে ঝট করে নামিয়ে রাখবে না। অনেকে বলে, আগে শ্লট মেশিন ভাল ছিল। তখন কিরকম ছিল অরুণ জানে না। আগে তো সবই ভাল ছিল!

ক্রু-র্-র্ ক্র-র্-র্, রিং হচ্ছে, আর অরুণের বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে। এ দুদিনে আতঙ্কটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল, এখন দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত ভয়। কি জানি কি শুনতে হবে। ঊর্মির বৌদি বোধ হয়, গলা শুনে বুঝতে পারল অরুণ।

ঊর্মিকে দিন না। ঊর্মি আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে পারল না।

—সে তো ফেরেনি। বউদি উত্তর দিল। —দিঘা গেছে, কাল আসার কথা ছিল।

অরুণের হাত কেঁপে গেল, হৃৎপিণ্ড যেন দুরমুজের মত আওয়াজ করছে। ফেরেনি, দিঘা গেছে, পাস করার আনন্দে, কলেজের মেয়েদের সঙ্গে, ফেরেনি, কাল আসার কথা ছিল।

দিঘা! দিঘা! ও তো একটা অজুহাত। ঊর্মি নিজেই বলেছিল।

অসহ্য কষ্টে, দুঃখে, ভয়ে অরুণের চোখে জল এসে গেল। গলা কেঁপে গেল কথা বলতে গিয়ে, হাত কেঁপে গেল রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে।

কি করবে কিচ্ছু ভেবে পেল না। একবার ইচ্ছে হয়েছিল রুণুকে ফোন করবে ঊর্মির খবর পেয়ে, এখন আর রুণুর কথা মনেও পড়ল না।

ফেরেনি, ফেরেনি, ফেরেনি। কেন ফেরেনি? ডাঃ রুদ্রর বাড়ি তো চেনে, প্রথম দিন টিকলু যায়নি, ও একা গিয়ে ঘুরে এসেছিল। সেখানে যাবে? ডাঃ রুদ্রকে ফোন করবে? সাহস হল না।

ফিরতি ট্রামে অরুণ একেবারে সেই 'বার'টার সামনে গিয়ে নামল। পাশের পানের দোকানটার কাছে দাঁড়িয়ে, ওর চেহারায় শোকবস্ত্র, দাড়ি কামায়নি, খালি পা, ও কেন 'বার'-এর কাছে, কয়েকজন দেখল ওকে। আর অরুণ দূর থেকে সেই বাড়িটা, রহস্যের দরজার মধ্যে দিয়ে সেই অল্প-আলোর লম্বা করিডরের দিকে, দোতলার ছোট ছোট ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে দেখল। ভিতরে যেতে সাহস হল না। একবার শুধু ইচ্ছে হল পানের দোকানদারটাকে জিজ্ঞেস করে, থানা-পুলিশ হইচই কিছু হয়েছিল কিনা। ঐ বাড়িটাকে কেন্দ্র করে!

নার্সিং হোমটার দিকে তাকাতেও ভয়, যেন বাড়ি নয়, একটা বিকট আতঙ্ক।

সত্যি বলছি রুণু, আমি নির্দোষ, ঊর্মি আমার বন্ধু, শুধু বন্ধু, সে বিপদে পড়েছিল, আমার বুকের ভেতরটা সেই মুহূর্তেই কেমন করে উঠল···

মা, তুমি তো সবই জানো। তুমি তো অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব দেখতে পাচ্ছ। ঊর্মির সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিলাম সে কথা ছোটমাসীর কাছে শুনে বলেছিলে, তুই গোল্লায় গেছিস। এখন তুমি অন্তত বল, হীরের টুকরো!

অরুণের এক একবার দুঃসাহসের ইচ্ছে জাগছিল। কি আছে, সেদিনের মতই গটগট করে না হয় ঢুকে যাবে, ডাঃ রুদ্র যদি নাও থাকেন, নার্সকে ডেকে বলবে, সিসটার···

আশপাশের লোকগুলো মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকাচ্ছিল। অরুণের কেমন ভয়-ভয় করল, তবু নিজের মনকে বোঝাল, নাঃ, সন্দেহ করবে কেন, নিশ্চয়ই ওর খালি গায়ে জড়ানো চাদর, খালি পা, কিংবা দাড়ি কামায়নি বলেই···এত ভয়ের মধ্যেও অরুণ হঠাৎ হেসে ফেলল। নিশ্চয়ই ওরা ভাবছে, ব্যাটার মা নয়তো বাপ মারা গেছে, তবু মদের জন্যে ছুঁকছুঁক!

আনমনা এদিক ওদিক পায়চারি করল অরুণ, ফাঁকে ফাঁকে নার্সিং হোমটার পর্দা দেওয়া জানলাগুলোর দিকে তাকাল।

পর্দা সরিয়ে জানলায় একবার দাঁড়াক না ঊর্মি। তাহলেই তো সব ভয় ঘুচে যায়।

—দ্যাখ সুজিত, আমরা প্রেজেন্ট টেন্স নিয়ে এত বিব্রত, কিন্তু আসলে ওটা কি জানিস, একটা গামছার মাঝখানে গিঁট দিয়ে টানছি, একদিকে পাস্ট একদিকে ফিউচার। অরুণ কবে যেন হঠাৎ বলেছিল।

বুকের ভেতবটা গামছার মত কে যেন নিঙড়ে দিচ্ছে। ভয, যন্ত্রণা, দুঃখ—কত কি। আসলে কেন ভয পাচ্ছে অরুণ। মা তো এখন পাস্ট টেন্স। তবু রক্তেব মধ্যে সেই পুরনো সংস্কার, বিবেক, অন্যাযবোধ মা হযে বেঁচে আছে। সকলের বক্তেব মধ্যে। তা না হলে ও বুক ফুলিয়ে বলতে পারত, কোথাও কোন অন্যায় হয়নি। ওর কর্তব্যটুকু ও করেছে, ঊর্মি স্বভাবের বিরুদ্ধে যাযনি, নিয়ম যাবা বানিযেছে তারা জীবনেব নিয়ম মানেনি।

মা যদি অতীত, তাহলে রুণু ওব ভবিষ্যৎ নাকি ? একদিকে সংস্কার, অন্যদিকে আশা গামছার মত নিঙডে দিচ্ছে। আচ্ছা, আচ্ছা, এখন মনে হচ্ছে, আমবা পুবনো ভেঙে-যাওযা বিশ্বাস আর নতুন গড়ে-ওঠা বিশ্বাসের মধ্যে পাক খাচ্ছি, তাই এত কষ্ট, এত ব্যথা। এক মূল্যবোধ থেকে আরেক মূল্যবোধে পৌঁছনোব রাস্তা পাব হচ্ছি।

দুধাব থেকে রাশি বাশি গাডি, ডবল-ডেকাব বাস, ট্রামের ঘণ্টি ·এদিকেব ফুটপাত থেকে ওদিকেব ফুটপাতে পৌঁছে ঝট করে একটা চলন্ত বাসে উঠে পডল অরুণ।

বাডি বাড়ি···সেখানে যদি শান্তি থাকে !

ফিরে এসে গলিব ভেতর সবে ঢুকেছে, দেখল একটা পুলিশেব লোক হাতে কি একখানা কাগজ নিযে বাড়ির নম্বর খুঁজছে।

অরুণ সেখানেই থেমে পডল। এক পাও এগোতে পাবল না। মাথা ঘুবে গেল, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মত কেমন অন্ধকার অন্ধকাব।

আবেকটু হলেই অরুণ টলে পডত। দেখল পুলিশের লোকটা এগিযে আসছে। অরুণেব দিকে এগিয়ে আসছে।

ও কি ছুটে পালাবে ? কিংবা বলবে, অরুণকে ও চেনে না ?

—আট নম্বব কোনটা জানেন ? পুলিশেব লোকটা জিজ্ঞেস করলে—অবনীবাবু, অবনী চ্যাটার্জি ?

আঃ, কি আবাম। ওদেব বাডি তো সাতাশ। কি আবাম !

বাড়ি ফিবে মাব এনলার্জ কবা ছবিটার দিকে তাকিয়ে অরুণ অনেকখানি শান্তি পেল। মনে হল মা বুকেব ওপর হাত বুলিয়ে দিযে বলছে, অরুণ, তোব কোন ভয নেই। বন্ধুর বিপদে··তুই তো মানুষ, মানুষের মত মানুষ !

বিকেলের দিকে টিকলু এল। বললে, রুণু তোব ওপব চটে ফাযার। পব পব কদিন ফোন করেছে, কাউকে পায়নি, আজ আমি ছিলাম··

নাঃ, শান্তি নেই ! যখন তেতো হযে গিয়েছিল, তখন তবু নিজেকে সহ্য কবতে পারত। তখন একটু কিছু পেযেছিল, এখন ভয়। ঊর্মির জন্যে ভয়, রুণুব জন্যে ভয !

টিকলু ফোন ধরেছিল ! ওকে কোন বিশ্বাস নেই, রুণু তো এমনিই কিচ্ছু জানে না, রেগে আছে, তার ওপব টিকলু কি বলেছে কে জানে। হলুদ শাডির কথা শুনে টিকলু বলে উঠেছিল, ইযাল্লালা, কপাল নিয়ে এসেছিস তুই। একটাকে আমাদেব দিকে একটু ঢিল দে না বাবা, এক লাটাইয়ে দুটো ঘুডি, প্যাঁচ খেযে শেষে দুটোই সাফ হযে যাবে। টিকলু বলেছিল, প্রেম-প্রেম যন্তরনা—কত কি ভডং মারতিস, তলায তলায় সবাই দেখি এক।

অরুণ কিছু বলতে পারেনি। নির্দোষ হলুদ শাডির গায়ে কলঙ্ক লেপে দিয়েছে। এরপর টিকলুর সঙ্গে কারও কথা হলে সে বলবে, আরে জানি জানি, ও হলুদ শাড়ির কথা আর জানতে বাকি নেই। হলুদ শাডিব কাছে একটা থাপ্পড় খেলেও টিকলু একই কথা বলত।

ছেলেরা সব এক, সব মেয়েই তাদের চোখে বাজে, বাজে—খারাপ, খাবাপ, প্রেমে পড়লেই ফুলের মত সুন্দব দেখে তাকে।

ঊর্মিব কিছু একটা যদি হয়ে থাকে, অরুণ যদি ধবা পড়ে, তখন কি ভাববে এই টিকলু ? কিন্তু এখন মনের মধ্যে আরেক ভয়, রুণুকে কি বলেছে টিকলু। হলুদ শাড়ির একটু আভাস ? ব্যস, তাহলে কণু, রুণুর প্রেমও এখন মৃত। মা, ঊর্মি, কণু—সব মরে যাবে।

—না রে, মেয়েটা ভীষণ ভাল, ভীষণ সিম্পল, তোব মা মাবা গেছেন শুনে গলার স্বরটা এমন হয়ে গেল, বিকেলে তোব সঙ্গে দেখা কববে··

টিকলুব কাছে সব নির্দেশ জেনে নিল অরুণ। গালে হাত বুলিয়ে দেখল, আয়নার সামনে নিজেকে, খালি গায়ে থান চাদবটা জড়িয়ে চেহারা একটু মানানসই হয় কিনা। বড়ো অস্বস্তি লাগল এই শোকবস্ত্রে রুণুব সামনে যেতে।

—তুমি কি, আমাকে একটু খবরও দিলে না ! কণুর চোখেব পাতা মেঘেব মত। বললে, মাকে একবাব দেখব, এত সাধ ছিল। একটু থেমে বললে, আমি তো শ্মশানে যেতে পারতাম, অচেনা লোকের মত দূব থেকে দেখতে পারতাম।

অকুণ চুপ করে রইল। ও তখন মনে মনে ভাবছে. কণু এত আপন মনে কবে মাকেও, অথচ ঊর্মি হয়তো সব ভেঙে দেবে।

—তুমি মাকে ভীষণ ভালবাসতে, তাই না ? রুণু বললে। —তোমাব মন ভীষণ নবম, মাকে ভাল না বাসলে এমন নবম মন হয় না।

অকুণ বললে, মাকে সকলেই ভালবাসে।

ওর মনে হল ও একটুও মিথ্যে বলছে না। ওব মনে পড়ল না, মা বেঁচে থাকতে ও শুধু তিক্ততা পেয়েছে, তিক্ততা দিয়েছে। কিন্তু সেটা তো শুধু বাইবেব পোশাক। নাকি এই খোঁচা খোঁচা দাড়ি. উস্কখুস্কো চুল সাদা থানকেই লোকে ভালবাসা মনে কবে। বুক চিবে কেউ কিচ্ছু দেখতে চায না।

—মামীমা বোজ বলছে, তোব বন্ধুকে একদিন নিয়ে আয, নিয়ে আয। না গেলে ভাববে শুধু বন্ধু নয। বলে ঈষৎ হাসল কণু।

কণুর হাসিটা এত যে সুন্দব, অরুণেব কিন্তু আজ তা মনে হল না।

—আচ্ছা, ঊর্মি গিয়েছিল ? ওকে তো নিশ্চয় খবব দিয়েছিলে।

অকুণ অসহায বাগে চুপ কবে রইল. তাবপব বললে, না।

—বাঃ, ও তো বন্ধু। কণুব গলাব স্ববে কোন সন্দেহ ছিল না। তবু অরুণের মনে হল ঊর্মিব নামটাও ও যেন সহ্য করতে পাবছে না। —ও গেলে কিই বা ক্ষতি ছিল।

আরও দু-পাঁচটা কথাব পব রুণু চলে গেল, আর অরুণ এসপ্লানেড থেকে সব কটা খবরেব কাগজ কিনে নিল।

পাড়ার রিডিং রুমে গিয়ে সব কটা কাগজ তন্ন তন্ন কবে দেখছে এ কদিন। সকালে রাজ্যের লোক গিয়ে ভিড করে, ভাল করে দেখাই হয় না। নিজেই কিনে ফেলবে তেমন পয়সাও হাতে থাকে না। মা নেই, এখন কাব কাছে হাত পাতবে।

—মাকে তুই মনিব্যাগ বলে ডাকলেই তো পারিস। দিদি একদিন বলেছিল। —টাকার দরকাব না থাকলে মা আছে কি নেই খববই রাখিস না।

ঠিক মনে পড়ছে না, কে যেন বিয়েবাড়িতে স্বামীকে ডেকে পবিচয করিয়ে দিয়েছিল, আমাব মনিব্যাগ ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিদির ননদেব কে হয বউটা—খুব স্মার্ট, হাসিখুশি, দিদি নাক বেঁকিয়ে বলেছিল, ঢঙি।

□

মেয়েরা অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। ওরা বন্ধু হতে পারে না, প্রেমিকা হতে পারে না, স্ত্রী হতে পারে না। ওরা শুধু আত্মপ্রেমে ডুবে থাকতে চায়। তুমি দিনরাত আমার ফ্ল্যাটারি কর, আমার গুণগান কর, আমাব কপের বর্ণনা দাও, আমাকে পুজো কর। আমি বলব, অরুণ আমাকে, জানিস ভাই, দারুণ ভালবাসে, বড্ড মায়া হয়।

ঊর্মি হয়তো তাব নিজের মনকে বলছে, রুণু হয়তো তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে। কেউ বলবে না, আমি অরুণকে ভালবেসে ফেলেছি।

শেষ অবধি অপেক্ষা করে কবে একদিন আবাব ফোন কবে বসল অরুণ। প্রথমটা গলার স্বর নতুন নতুন ঠেকল। তাবপব। —হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ঊর্মি। ওর হাসিব শব্দটা চিনতে অসুবিধে হয়নি।

ঊর্মি বললে, বাঃ সে তো কবে, কবে ফিবে এসেছি।

ভয়টা তরতর করে শবীব থেকে নেমে গেল মুহূর্তের মধ্যে, বক্ত তবতব কবে উঠে বাগ হয়ে গেল। অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। নিজেব মনে মনেই বললে অরুণ।

ব্যস্, আব কোন দুশ্চিন্তা নেই। দুশ্চিন্তাব বন্ধ ঘবে কেউ যেন ওকে আটকে বেখেছিল। সেই ঘরের দেয়ালগুলো পটাপট খুলে গিয়ে অসংখ্য জানলা হয়ে গেল। আনন্দে, খুশিতে তখনই ঊর্মির সঙ্গে দেখা কবতে ইচ্ছে হল অরুণেব। অভিমানে সে-কথা বলতে বাধল, কেন, ঊর্মি নিজে বলতে পাবে না? ও এখন হাসছে, যেন হাসিব ব্যাপার।

সেদিনের কথা মনে পড়তেই বাগে জ্বলে উঠল। ঊর্মির সঙ্গে আমার আব কোন সম্পর্ক নেই। ঊর্মি আমাব বন্ধু নয়। ও কি ভেবেছে? নিজের সুন্দব শবীব আব সুন্দব হাসিটাকে ম্যাজিক ল্যাম্প বানিয়ে বুড়ো আঙুলে টুসকি দেবে, আব অরুণ সেই দৈত্যটার মত শুধু হুকুম তামিল কববে?

অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। তার চেয়ে রুণু অনেক সুন্দব, অনেক সহজ।

—না না, ওসব আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না, আমি আজ দেখা করবই। সেদিন তো দু মিনিটও থাকোনি। রুণু বলেছিল।

অরুণের তবু অস্বস্তি। নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে হেসে ফেলেছে। —কি করি বল্ তো টিকলু?

—আরে ফল্‌স্ চুল নিয়ে কত মেয়ে তো দিব্যি কেশবিলাস, তোর তো ফল্‌স্ টাক।

অরুণ আর সুজিত দুজনেই হেসে ফেলেছে। কিন্তু অরুণের অস্বস্তি যায়নি। এখন জীবনে আবার রঙ ফিরে এসেছে, রুণুকে আবার তীব্র ভাবে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে দেখল অরুণ, ফল্‌স্ টাক—বেশ বলেছে টিকলু।

নাঃ, শার্ট প্যান্টের সঙ্গে কামানো মাথাটা একদম মানায় না। মনে হয় অন্য কার মাথা যেন ধার করে এনে বসিয়ে দিয়েছে। দিদি একবার পুজোর সময় ধুতি পাঞ্জাবি দিয়েছিল। খুঁজে খুঁজে সেটা বের করে পরল অরুণ। আয়নায় দেখল।

মিলু পিছন থেকে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে, ভাল লাগছে রে দাদা, তোকে বেশ লাগছে। তারপর হেসে উঠে বললে, শুধু ভুরু দুটো মনে হচ্ছে আঠা দিয়ে সেঁটেছিস।

চুল গজাতে এখন কতদিন লাগবে তার ঠিকঠিকানা নেই। এতদিন রুণুকে না দেখে, দেখা না দিয়ে থাকতে পারবে নাকি।

অরুণ এক প্যাকেট সিগারেট কিনল, দেশলাই কিনতে গিয়ে থেমে গেল। একদিন ওর দেশলাইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে রুণু বলেছিল, মোম লাগানো ঐ ছোট্ট বাক্স কেনো না কেন? ওগুলো খুব সুন্দর। এরপর থেকে ওগুলোই কিনবে।

অরুণ খোঁজ করল। এই ছোট্ট একটা অনুরোধ রাখতে পারলে যেন নিজের কাছেই খুশি হত। খোঁজ করল, খোঁজ করল। পর পর কয়েকটা দোকান, অনেকখানি হেঁটে অনেকগুলো দোকান খুঁজে সেই ছোট্ট দেশলাইয়ের বাক্সটা কিনল।

—ধুতি-পাঞ্জাবিটায় তোমাকে অদ্ভুত ভাল দেখাচ্ছে। রুণু বললে।

অরুণ হাসল, তারপর দেশলাইটা দেখাল।

রুণু দেশলাইটা হাতে নিল, একটার পর একটা কাঠি জ্বালল। চাপা আলোর রেস্টুরেণ্টে কাঠিগুলো ফস্ ফস্ করে জ্বলছে আর রুণুর মুখ আলো করছে।

রুণু হঠাৎ বললে, খুব সুন্দর লাগে এই দেশলাইগুলো, অয়ন ব্যবহার করত।

রুণু একদিন একটা জাপানী দেশলাইয়ের বাক্স, খুব সুন্দর ছবি আঁকা, এনেছিল।

অরুণ খরচ হয়ে যাবার ভয়ে রোজ ঘুমোবার আগে তার একটা করে কাঠি জ্বালাত, সিগারেট ধরাত। যেন ওটা যতদিন কাছে থাকবে ততদিন রুণুও কাছে।

সাদা তাঁতের শাড়িতে রুণুকে অন্যরকম লাগছিল। চওড়া জরিপাড় সাদা শাড়িতে ওর উজ্জ্বল বয়সের শরীর খুব ঠাণ্ডা আব স্নিগ্ধ মনে হচ্ছিল। খোঁপা বাঁধেনি, পিঠ বেয়ে ওর ঘন চুল কোমর ডিঙিয়ে ঢেউ হয়ে ভেঙে পড়েছে। রুণু কথা বলতে বলতে এক একবার সেই চুলের রাশ বুকের ওপর টেনে আনছিল, এক একবার এলো খোঁপায় তাকে শাসন করছিল, আব হাসির সঙ্গে সঙ্গে খোঁপা ভেঙে পড়ছিল।

কথা বলতে বলতে বার বার মুগ্ধ হয়ে রুণুর দিকে তাকাচ্ছিল অরুণ।

রুণু বললে, আজ তোমাকে যেতেই হবে। মামীমা বলে দিয়েছেন।

মামীমাকে বড়ো ভয় অরুণের, বড়ো অস্বস্তি।

—না গেলে কোনদিন আর আসব না। রুণু ঠোঁট ফোলাল।

বাঃ রে, এ কথাটায় যে অরুণ আঘাত পায়, রুণু একবারও বোঝেনি। রেগে গেলেই ও বলে, কোনদিন আর আসব না। যেন ওর ভাল ছেলে হয়ে থাকাব, রুণুর মন জুগিয়ে চলার পুরস্কার দিতেই ও আসে। ওর নিজের কোন ইচ্ছাব তাগিদ নেই। কোন ভালবাসার টান নেই। অর্থাৎ রুণু জানে, ও না এলে অরুণ কষ্ট পাবে। রুণুর একটুও কষ্ট হবে না। ও শ্লেটের ওপর জল বুলিয়ে দিয়ে সব মুছে দিতে পারবে।

অরুণ অসহায় বোধ করল। মুখে হাসি টেনে বললে, যাব যাব। কিন্তু আজকের বিকেল··

আজকের বিকেল ও কৃপণের মত খরচ করতে চায়। কতদিন, কতদিন রুণুর সঙ্গে দেখা হয়নি।

রুণুর সমস্ত শরীর ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। তারপর তাকে একটা উদ্দাম ঝড়ের মধ্যে ফেলে তার ফুলের মত শরীরের একটি একটি করে সব পাপড়ি ঝরিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

—তুমি আমাকে কত দিন আদর করোনি। রুণু বললে।

তখন আবছা-আবছা সন্ধ্যা, অন্ধকার, একটা প্রকাণ্ড গুঁড়ির আড়ালে, নির্জনে, গঙ্গার দিকে তাকিয়ে. শান-বাঁধানো বেঞ্চের ঘনিষ্ঠতায়, গঙ্গার বুকে মোটর লঞ্চের বাঁশি, রুণুর চুলে কি এক মিষ্টি গন্ধের আমেজ, নির্জন, রুণুকে কাছে টেনে তার দুটি চোখের পাতায়, চোখ বুজলে রুণুর চোখ লিলিফুলের ফাঁপানো কুঁড়ি, অরুণ একটি একটি চুমু রাখল। রুণু হাসল, চোখ খুলল, চোখ তুলল। রুণু লজ্জায় চোখের পাতা এবার বন্ধ করল। রুণুর শরীর অবশ হল। রুণু দুরন্ত সুখে অরুণের আরও কাছে ঢলে পড়ল।

এক পলকের আশ্লেষে হৃৎপিণ্ডকে হৃৎপিণ্ড সাড়া দিল, অরুণ পাগলের মত লক্ষ লক্ষ চুমু খেল, উত্তেজনায় স্নান করল।

—আরে পাগল, আরে পাগল, এটা তোমার রবিনসন ক্রুশোর দ্বীপ নয়। রুণু ঝট করে দাঁড়িয়ে হাসতে শুরু করল।

অরুণ বললে, আরেকটু বস, লক্ষ্মীটি।

এই সুন্দর সন্ধ্যাটাকে একটু একটু করে আপন করে নিতে চাইছিল অরুণ। এতদিন ওর মনে হয়েছে, যেন অন্যের সন্ধ্যাকে ও চুরি করছে।

ঘড়ির দিকে তাকাল রুণু, বলে উঠল, সর্বনাশ!

তিনটে ফাজিল ছোকরা ওদের পিছন দিয়ে যাচ্ছিল, রুণুর কথা কানে যেতেই ফিরে তাকাল, একজন শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, এরই মধ্যে? আরেকজন হয়তো কবি-কবি, বললে, তোমার চোখে দেখেছিলাম—

ওরা দুজনেই লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এল।

রুণু রেগে গিয়ে বললে, আর কোনদিন না, কোনদিন না।

ছেলেটি আর মেয়েটি স্বর্গে পৌঁছবে বলে রোজ দুটি করে সিঁড়ির ধাপ গড়ত। আর কে একজন প্রতিদিন এসে একটি করে সিঁড়ি ভেঙে দিত। শেষে রেগে গিয়ে মেয়েটি একদিন সমস্ত সিঁড়িটাই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। বললে, যাব না, যাব না।

মা কোথায় গেছে, কোথাও গেছে কিনা, অরুণ মাঝে মাঝে ভাবে। স্বর্গ সত্যি সত্যি থাকলে অনেক সান্ত্বনা থাকত।

আমাদের তো কিছুই নেই। না অতীত, না ভবিষ্যৎ। শুধু বর্তমানকে টুকরো টুকরো ভাবে, একটু একটু করে ভোগ করতে পার। চারপাশের অতৃপ্তির মধ্যে একটুখানি সুখ।

বাবা যন্ত্র হয়ে গেছে, অরুণের আজকাল মনে হয়। কর্তব্যের পায়ে দাসখত লিখে দেওয়া একটা নির্ভুল যন্ত্র। কিংবা পাথর। কিংবা গাছ। গাছের মত নির্বাক, অথচ অটল অনড়।

সকালে বাবা ডেকচেয়ারটায় শরীর এলিয়ে চুপচাপ বসেছিল। বাবা আজকাল চুপচাপ বসে থাকে। কারও সঙ্গে কথা বলে না। কেউ বাবার সঙ্গে বড় একটা কথা বলে না। শোকের দেয়াল তুলে বাবা নিজেকে পৃথক করে ফেলেছে।

বাবা হঠাৎ ডাকল, অরুণ!

অরুণ গিয়ে চুপ করে কাছে দাঁড়াল।

—তোর চাকরিটার কিছু হল? বাবা জিজ্ঞেস করল।

অরুণ বললে, বোধ হয় এই সপ্তাহে চিঠি পাব, ছোটমেসো বলেছিল। একজন দুবছরের লিয়েন নিয়ে বিলেত যাচ্ছে, পড়তে, তার জায়গায়। চাকরিটা টেম্পরারি।

চাকরিটা পেলেও কোন বিশেষ আনন্দ নেই। এখনই এখনই কিছু পাওয়া গেল এই যা। টেম্পরারি। তা হোক, স্থায়ী তো কিছুই নয়। কিন্তু অরুণের যা কিছু আনন্দ উবে গিয়েছিল ঐ একটা কথায়। একজন লিয়েন নিয়ে বিলেত যাচ্ছে। অর্থাৎ অরুণ একটা ফালতু। ওরা সবাই—টিকলু, সুজিত, অরুণ সবাই ফালতু। ওদের জন্যে কিচ্ছু নেই, ওদের কোন ভূমিকা নেই। ওরা অস্থায়ী, ওরা এক্সট্রা। ওরা শুধু অনুপস্থিত অভিনেতার হয়ে দু-এক রাত্রি হাততালি পেতে পারে।

হয়তো তাও পাবে না। অনেকদিন আগে ওরা একবার থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল, ঊর্মিও ছিল সঙ্গে। বিখ্যাত একটা নাটক, বিখ্যাত একজন অভিনেতা ছিল সে নাটকে। ওরা আগেই একবার দেখেছিল, ঊর্মি দেখেনি। তাই আবার গিয়েছিল। 'তুই ভাবতে পারবি না ঊর্মি, ছোট্ট একটা রোল, কিন্তু কি দারুণ অভিনয়।'

গিয়ে বসেছে সিটে, স্টেজ থেকে কে একজন ঘোষণা করলে, আমরা দুঃখিত। আপনারা অনেকেই এ নাটকে যাঁর অভিনয় দেখতে এসেছেন, তিনি আজ অনুপস্থিত।

একজন নতুন কে, অরুণ কিংবা সুজিত কিংবা টিকলুর মত কেউ একজন সেই চরিত্রে অভিনয় করল। অরুণের তো মনে হয়েছিল খুব ভাল অভিনয়, বোধ হয় সে আসল অভিনেতার চেয়েও ভাল, কিন্তু কেউ হাততালি দিল না। কেউ খুশি হল না। সকলেই একটা অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে এল।

অরুণ তেমনি একজন। আসল অভিনেতা অনুপস্থিত বলেই ওর ডাক পড়ছে। ও যত ভাল অভিনয়ই করুক হাততালি পাবে না।

—অয়ন কক্ষনো এমন করত না। ফেবার পথে রুণু বলেছিল।

একটু আগে অরুণের মনে হয়েছিল ওব চেয়ে সুখী কেউ নেই। মনে হয়েছিল ওরা কেউ কিচ্ছু বোঝে না। এর মধ্যে শরীর নেই, সেক্স বলতে কি বোঝায় কেউ জানে না, টিকলু না, রুণু না, বুড়োরাও জানে না। এ তো শরীবকে রোদ্দুরে বাতাসে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের মত ফুটিয়ে দেওয়া। এ এক ধরনের মৈত্রী, সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে আমবা দুজনে এক।

অয়ন কক্ষনো এমন করত না।

জানি, জানি, তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না। আমি অযনকে কোনদিন ঈর্ষা করিনি, বরং ব্যথা পেয়েছি, রুণুর জন্যে, অয়নের জন্যে। অরুণ ভাবল, রুণু যেন ওকে তুলনা করছে, বিচার করছে। বলছে, অনুপস্থিত অভিনেতার মত ভাল অভিনয় করতে পারছ না। তুমি আসল অভিনেতার মত নও।

—খুব সুন্দর লাগে এই দেশলাইগুলো। অয়ন ব্যবহাব করত। রুণু বলেছিল।

আর অরুণ মুখ কালো করে বিমর্ষ হাসি হেসেছিল। ঈর্ষা দিয়ে সেই মুহূর্তকে নষ্ট করতে ইচ্ছে হয়নি।

রুণুর মামীমার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার তখন আর একটুও ইচ্ছে ছিল না অরুণের। তবু যেতে হয়েছিল। হাততালি পাবে না, সকলে আঙুল দেখিয়ে বলবে, নকল নকল, তবু স্টেজের ওপর উঠতে হবে, অভিনয় করতে হবে। দুঃখ পাবে, ব্যথা পাবে, হয়তো লাঞ্ছনা জুটবে শুধু, তা জেনেও। তুমি যে অভিনয় কবতে চাও, ঐ ভূমিকাটা তুমি যে ভালবেসে ফেলেছ।

এখন আর অরুণের ফেরার পথ নেই। ফিবতে গেলেও যন্ত্রণা, এগিয়ে গেলেও যন্ত্রণা, যন্ত্রণা।

□

ভয় বোধ হয় এক ধরনের মৃত্যু। ভয়ই বোধ হয় এই যুগটার ভেতর থেকে সব রস কেড়ে নিচ্ছে, সমস্ত আনন্দ কেড়ে নিচ্ছে। বিরাম আর নন্দিনীর কথা মনে পড়ল অরুণের। নন্দিনীর সেই উদ্‌ভ্রান্ত বোকা বোকা চোখ। ওরা পরামর্শ কবছে, চক্রান্ত করছে, উপায় বের করতে চাইছে কিছু একটা। অথচ নন্দিনীর কানে যাচ্ছে না একটা কথাও। বিরাম বলেছিল, ওর দাদা নিশ্চয় পুলিশে খবর দেবে। নন্দিনী অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে হঠাৎ ভেঙে-পড়া গলায় বলে উঠেছিল…কি বলেছিল এখন আর ঠিক মনে নেই।

পুলিশ নয়, দাদাকে নয়, আসলে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে ভয় পেয়েছিল নন্দিনী। ভয় এসে ওর প্রেমকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলেছিল। একটা দিনেই নন্দিনীকে মনে হয়েছিল একটা মৃত বিবর্ণ শবদেহ, প্রাণ নেই, প্রেম নেই।

অরুণের মনে হল ওর মধ্যেও আর কোন প্রেম নেই। ঊর্মির জন্যে ভয় এ কটা দিনে ওকে সকলের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। বাবা, মিলু, দিদি, এমন কি মার কাছ

থেকেও। কারও সঙ্গে ও মুখ তুলে কথা বলেনি, বলতে পারেনি। সুজিত আর টিকলুকেও অসহ্য লেগেছে।

—হিপ হিপ হুর্‌রে, হিপ হিপ হুর্‌রে।

মুখ-ভর্তি হাসি নিয়ে প্রায় লাফাতে লাফাতে এসে ঢুকেছিল সুজিত, হাতে একখানা লম্বা সাদা খাম : 'কোজি নুকের' চায়ের টেবিলে খামটা ছুঁড়ে দিতেই বিদেশী ডাকটিকিটখানায় চোখ পড়েছিল।

—জব-ভাউচার! উৎফুল্ল মুখে সুজিত বলে উঠেছিল, মেরে দিয়েছি!

বিলেতে একটা ভাল চাকরি, ভাল মাইনে। ব্যস, সুজিত যেন আর কিছুই চায়নি।

—শালার ফরেন এক্সচেঞ্জের ধার ধারি না আর। তেল দিয়ে দিয়ে পি. ফর্ম আর পাসপোর্ট, তার পরেই···খুশি খুশি মুখ, দু আঙুলে একটা তুড়ি দিয়েছিল সুজিত। তারপর জমানো রাগ ফুটে বেরিয়েছিল। —এ দেশে মানুষ থাকে না, বুঝলি অরুণ। তুই শালা টাকা রোজগার করবি, ইনকাম ট্যাক্স দিবি ; মন্ত্রীরা বিলেত যাবে ফুর্তি করতে। তোর বেলায় দেশ দেখাবে, ফরেন এক্সচেঞ্জ পাবি না।

অরুণের এসব কিচ্ছু ভাল লাগেনি। ওকে যেন কোন কিছুই আর স্পর্শ করছে না। ভয় ওর মন থেকে সব রস কেড়ে নিয়েছে।

—তুই মাইরি কেমন যেন হয়ে গেছিস। সুজিত বলেছে, রুণুই তোকে ডোবাবে।

রুণু ? রুণুর কথা তো ভাবেইনি অরুণ, ভাবতে ভালই লাগে না। তবু অন্যমনস্কের মত হেসেছে।

সুজিত হেসে বলেছে, গিয়েই রুণুর জন্যে কি পাঠাব বল্।

অরুণ উত্তর দেয়নি। টিকলু বলেছে, ওর তো রুণুই আছে। আমার জন্যে বরং ব্রিজিত বার্দো টাইপের কচি মেমসাহেব একখানা পাঠিয়ে দিস।

ওরা সকলেই হেসে উঠেছে। সুজিত বলেছে, পারলে নিজেই নিয়ে আসব।

ব্রিজিত বার্দো! অরুণ মনে মনে ভেবেছে, তোরা তো বুঝতে পারছিস না আমার মনের অবস্থা, জিনা লোলোব্রিজিডা মিনি স্কার্ট পরে এসে দাঁড়ালেও তাকে মেয়ে বলে মনে হবে না।

সত্যি, ভয় এমন জিনিস, যা একবার দেখা দিয়ে সরে গেলেও, মানুষ আর তার পুরনো জায়গায় ফিরে যেতে পারে না। নন্দিনীর ভয় সরে গিয়েছিল, তবু তার প্রেম ফিরে আসেনি। উর্মি এখন আর কোন দুশ্চিন্তা নয়, তবু রুণুর জন্যে এখন আর সেই গুমরে-মরা ভালবাসা খুঁজে পাচ্ছে না অরুণ। সিনেমা দেখছি, দারুণ একটা রোমান্টিক সিন, হঠাৎ রিল কেটে গিয়ে পর্দায় সাদা আলো, লোকেদের চিৎকার, তারপর আবার ছবি শুরু হলেও যেমন সুর কেটে যায়—ভয় যেন ঠিক তেমনি সাদা পর্দা।

বাবা শেষ অবধি বিরাটির জমিটা কিনেই ফেলল। রিটায়ার করে থাকতে তো হবে কোথাও, একখানা ছোটখাটো বাড়ি অন্তত···বাবার মধ্যেও সেই ভয়। আর দুদিন পরে কি হবে, কোথায় থাকব। ভবিষ্যৎকে ভয় পেয়েছে সারা জীবন, তাই কিছু ভোগ করল না বাবা। ছোটমেসোকে একদিন বলেছিল, কিছু জমাচ্ছটমাচ্ছ, না অদ্যভক্ষ্য করে ভবিষ্যতে···ছোটমেসো হেসেছিল। —সে কথা ভাবলেই ভয় হয়, তাই ওসব আর ভাবি না। যে কদিন চাকরি আছে ভোগ করে নিই।

সেইজন্যেই হয়তো অরুণের চোখে ছোটমেসো অনেক কাছের মানুষ। এখনই, এখনই। এখন না পেলে আর পেয়ে কি লাভ। এই তো, উর্মি দিব্যি বেঁচেবর্তে আছে, ভাল আছে, অথচ অকারণ একটা ভয় এসে রুণুকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু···শালা মাইনিং এঞ্জিনিয়ার! ও ব্যাটাও হয়তো ভেবেছিল, এখনই, এখনই!

সকলেই তাই ভাবছে, কাকে দোষ দেবে অরুণ। আচ্ছা, উর্মিও তো ভয় পেয়েছিল, এখন ও কি আবার সেই পুরনো উর্মি হতে পারবে ? সেই রজনীগন্ধার ঝাড় হয়ে হাসির শরীরটা দুলিয়ে···মাইনিং এঞ্জিনিয়ারকে সে নিশ্চয় ঘৃণা করতে শুরু করেছে। ঘৃণা করাই তো উচিত। কিন্তু উর্মির ওপর অরুণের রাগ হচ্ছে কেন।

—অত ভয় পাচ্ছ কেন ? রুণু হাসতে হাসতে বলেছিল, ভয় নেই, মামীমা পুরুত রেডি করে রাখেননি, গেলেই ধরে বিয়ে দিয়ে দেবেন না।

অরুণ অপ্রতিভ মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে বলেছিল, আরে দুর্, ভয় কেন হবে।

আসলে ও অস্বস্তি বোধ করছিল। রুণু তো সরল মনে নিয়ে গিয়ে হাজির করতে চায়, কিন্তু মামীমাটি কি আর বুঝবেন না ! নাকি তাঁকে সবই বলেছে রুণু। নন্দিনীকে তো বলেছিল। ওদের কি কোন বিশ্বাস আছে নাকি। কিন্তু বিয়ের কথায় একটু বিব্রত বোধ করেছিল অরুণ। 'গেলেই ধরে বিয়ে দিয়ে দেবেন না।' তা হলে বিয়েব কথা ভাবছে নাকি রুণু ?

তবু না গিয়েও পারেনি।

রুণুর মামীমা দেখেই হেসে উঠেছিলেন। —এই অরুণ ? আমি ভেবেছিলাম···

হাসিটাকে এক পলকে সুইচ-অফ করে দিয়েছিলেন, পাছে অরুণ ভাবে তার বেলের মত মুড়োনো মাথা দেখে হাসছেন।

দেখা করার আগে অস্বস্তি ছিল অরুণেব, কিন্তু গল্প কবতে করতে কখন ভুলেই গিয়েছিল, ও এই প্রথম এসেছে।

নিজের ন্যাড়া মাথাটাব কথা মনেও ছিল না। আজকাল মনেই থাকে না।

মামীমা এক ফাঁকে চা কবতে উঠে গেলেন, আর রুণু কাছ ঘেঁসে এসে ফিসফিস কবে বললে, তোমাব পাশে না আমার নিজেকে কেমন বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া লাগছে।

অরুণ হেসে ফেলে মাথায় হাত বোলাল। ধোপদুবস্ত ধুতি-পাঞ্জাবিব ভাঁজ ঠিক করল। ধুতি পরে হাঁটাচলায় অনভ্যাসের ছাপ পড়ে, অস্বস্তি হয়, তবু মামীমার কথাটা শুনে ওর মনে হল, ভালই করেছে প্যান্ট পরে আসেনি।

চায়ের জল চাপিয়ে মামীমা ফিরে এলেন। মুখে করুণ বিষণ্ণ একটা ছাপ ফুটিয়ে বললেন, রুণুর তো খুব রাগ, কান্নাকাটি কবছিল, তোমার মা মারা গেলেন, অথচ ওকে নাকি খবরই দাওনি।

কান্নাকাটি করছিল। অরুণ মনে মনে ভাবল, দেখেছ, মামীমাকে তাহলে সবই বলেছে। ওর খুব অস্বস্তি লাগল। আবার মনে হল, রুণু একটা স্টুপিড, কান্নাকাটি করলে তো মামীমা সবই বুঝে গেছেন।

—তোমার কথা এত বলে, আমি তো ভেবেছিলাম চোঙা প্যান্ট পরা আজকালকাব ছেলেদের মত ! মামীমা হাসি-হাসি মুখে বললেন, এসব যে মানো, সত্যি খুব ভাল লাগল।

অরুণ হাসতে পারল না। ভিতরে ভিতরে ওর নিজেকে খুব ছোট মনে হল ! মনে হল ও যেন অন্যের ভূমিকা চুরি করেছে। নাম ভাঁড়িয়ে জাল মানুষ সেজেছে। এসব যে মানো ! ও কি মানে নাকি ! কিছু না, বড়মামার কাছে কথা শুনতে হবে, লোকে বলবে, বেঁচে থাকতে মাকে ভালবাসত না, মাবা গিয়েও একটু দুঃখ পেল না, কিংবা নিজের মনের কাছে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যেই মাথা ন্যাড়া করেছে। নিয়ম মেনেছে। নিযম মানলেই হীরের টুকরো। ধুতি-পাঞ্জাবি ন্যাড়া মাথা—ব্যস, মামীমার চোখে অরুণেব দাম বেড়ে গেল।

—তোর বন্ধুটি বেশ ভাল রে রুণু, আজকালকার ছেলে বলে মনেই হয় না। রুণুর মামীমা চা নিয়ে এসে কাপটা টি-পয়েব ওপর নামাতে নামাতে আবার বললেন।

পোশাক, পোশাক। পোশাকটাই সব। পোশাকি ঢঙে একটু ফর্সা ভাষায় কথা বলো,

'চমৎকার ছেলে'। মামীমার কথা শুনে ঈষৎ লজ্জায় চোখ তুলে অরুণ একবার চোখোচোখি করল রুণুর সঙ্গে, আর রুণু ফিক করে হাসল। অর্থাৎ মামীমার চোখে খুব তো ধুলো দিচ্ছ!

টিকলু ঠিকই বলে। —ছাতার বাঁটের মত ঘাড় কাত করে কথা বলবি, কথায় পালিশ দিবি, আর হৃষীকেশবাবুদের পেন্নাম ঢুকবি, পিসীমা বলবে 'নক্ষী ছেলে'।

অনেকক্ষণ গল্প করে অরুণ উঠল।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে মামীমা বললেন, আবার এস যেন।

অরুণ ঘাড় নেড়ে রুণুর পাশে পাশে নামছিল।

রুণু ওকে নীচে অবধি এগিয়ে দিতে এল।

সন্ধে হয়ে গেছে তখন। সিঁড়ির জানলা দিয়ে দূরের অন্ধকারে লম্বা রাস্তাটার দুধারে দুসারি আলো। সাদা সাদা চন্দ্রমল্লিকার মত ফুটে আছে। অরুণের মুখ খুশিতে ফুটন্ত ফুল হয়ে আছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে অরুণের মুখ ছাই হয়ে গেল।

ডাক্তার রুদ্রর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি।

বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল।

ডাঃ রুদ্র ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছিলেন, অরুণের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই থেমে পড়লেন।আর অরুণ দ্রুতপায়ে তাঁকে পাশ কাটিয়ে নেমে গেল। পিছনে পিছনে রুণুও তরতর করে নেমে এসেছে।

তারপর রুণু কি বলছে, রুণু যাবার সময় হেসেছে কিনা, কথা বলেছে কিনা, অরুণ কিছুই জানে না। অরুণ কিভাবে বাকি পথ হেঁটে এসে বাস ধরেছে, কিভাবে বাড়ি ফিরেছে, কিছুই মনে পড়ে না। ও তখন একটা ভাঙা জাহাজ।

আচ্ছা, ডাক্তার রুদ্র কি ওকে চিনতে পেরেছেন? 'ডাঃ রুদ্র, মামাবাবুর কাছে আসেন', রুণু যেন একবার বলেছিল, সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে। বাঃ, ওর তো তখন মাথায় চুল ছিল, পরনে প্যাণ্ট আর শার্ট। এক পলকে কখনও চেনা যায়! কিন্তু চেনা না গেলে উনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন কেন।

প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করা মাংসের হাড়গুলো কেমন নরম নরম হয়ে যায়। অরুণের শিরদাঁড়া, হাঁটুর হাড়, কাঁধ সব রবারের মত নুয়ে পড়ছে, সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি নেই।

বাড়ি ঢুকেই ছোটমাসীর গলা শুনতে পেল। বাবার সঙ্গে গল্প করছে, ছেলেকে দার্জিলিং কনভেণ্টে দিচ্ছি, এখানে শুধু স্ট্রাইক আর স্ট্রাইক। আজকাল ছোটমাসী মাঝে মাঝে আসে, গল্প করে। না এলে বাবা চুপচাপ একা। একা আর নিঃসঙ্গ। দিদির বাচ্চা হবে, খুব মুটিয়েছে। অরুণ জানত না, তাই ভেবেছিল খেয়ে ঘুমিয়ে মোটা হচ্ছে। দিদির বাচ্চাটা একটু বড় হলে এখানে এনে রাখবে, বাবা সঙ্গী পাবে। দুর্, বাচ্চাটা তখন তো দিদিরও সঙ্গী, দিদি রাখতে চাইবে না।

অরুণ ভয়ে চোখ বুজল রুণুর কথা মনে পড়তেই। মনে পড়বে কি, সিঁড়ির দৃশ্যটা চোখের সামনে থেকে সরাতেই পারছে না। এতক্ষণ নিশ্চয় সব জানাজানি হয়ে গেছে।

—দাদা, খাবি না? মিলু জিজ্ঞেস করলে।

অরুণ বললে, না রে, শরীরটা ভাল নেই।

মিলু একবার তাকাল দাদার দিকে। আহা, মা নেই বলে দাদার নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে। এখন তো ওর অসুখ-বিসুখের খবর নেবারও কেউ নেই।

মিলু এসে ওর কপালে হাত দিতে গেল, জ্বর হয়েছে কিনা। আর অরুণ ওর হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, বিরক্ত করিস না মিলু, বিরক্ত করিস না।

অবিনাশকে তোর মনে আছে টিকলু ? নিভাকে ভাবলবাসত। কি জানি, ওরা ওটাকেই ভালবাসা বলত। অবিনাশ চাকরি পেয়ে রাউরকেলা গেল, স্টেশনে তুলে দিতে গিয়েছি। নিভাও গিয়েছিল। অবিনাশ বললে, নিভা তো ট্যাক্সিতে ফিরবে, তুইও একই রাস্তায়। ভাবলে হাসি পায়, জানিস টিকলু, টালিগঞ্জ যাব, সাদার্ন অ্যাভেনিউ পার হলেই রাঙাকাকীমার বাড়ি, কে দেখে ফেলবে, ভাববে দিব্যি প্রেম করছি, ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, 'বাঁয়ে বাঁয়ে'—রাঙাকাকীমার বাড়িটা এড়িয়ে 'মেনকা'র পাশ দিয়ে ঘুরে যাব ভাবছি, নিভা বলে উঠল, 'এই না না, আজ না, আটটা বেজে গেছে।' তবু, জোর করেই মেনকার পাশ দিয়ে ঘুরে গেলাম। বলতে পারলাম না, ওকে লেকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তাহলে ? আমরা আসলে দুজনে দু ভাষায় কথা বললাম, কেউ কারও ভাষা বুঝলাম না। আমি ভাবলাম, নিভা খারাপ ; নিভা ভাবল, আমি।

টিকলু হেসে উঠেছিল। —ও তো রাজিই ছিল, আমার কাছে পার্সেল করে দিলি না কেন।

টিকলু জানে না, যে মুহূর্তে নিভাকে খারাপ মনে হয়েছে সেই মুহূর্তে তার উপস্থিতি অরুণের কাছে বিছুটি, বিছুটি।

এখন রুণুর কাছে অরুণও হয়তো তাই। খারাপ, খারাপ, ডঃ রুদ্র বলবেন, ছেলেটা খারাপ।

মামীমা চোখ কপালে তুলবেন। —সে কি, দেখে যে এত ভাল মনে হল।

সব শুনে রুণু বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে।

টেম্পরারি চাকরিটাই নয়, প্রেম সুখ অর্থ সুনাম—কোনটাই অরুণদের স্থায়ী নয়। সব অস্থায়ী। যখন যেটুকু পাও লুটে নাও।

বৃষ্টি, বৃষ্টি। —তোমার নতুন নাম বৃষ্টি। বৃষ্টির ঘর, ঘসা-কাচের বৃষ্টির ঘর একদিন অরুণের বুক ভরিয়ে দিয়েছিল। শুকনো ডালে কচি কচি পাতা এনেছিল। রোদ্দুরে আলোয় ঝরে পড়া রুপোর তারগুলো দেখতে দেখতে কালো হয়ে গেল, এখন অন্ধকার।

রুণু মুগ্ধ হয়ে বলেছিল, খুব সুন্দর নাম। এমন সুন্দর নামে বোধ হয় কেউ কাউকে ডাকেনি।

এখন আর ও রুণুকে ফিরে পাবে না, রুণুর কাছ থেকে আর কিছুই পাবে না। এতদিন সব ভাল ছিল, এখন অরুণ খারাপ, খারাপ।

ঊর্মি অনেক দিন আগে একবার বলেছিল, দাদা-বউদি ভাবছে তাড়াতাড়ি বিয়ে করছি না কেন। কিন্তু বেচারি মাইনিং এঞ্জিনিয়ার, তারই বা দোষ কি, তারও তো একটা প্ল্যান আছে···

সেই প্ল্যানের জালে ঊর্মি অরুণকে কেন জড়িয়ে দিল।

—একটা খবর তো দিবি, একবার দেখা তো করবি। অরুণের গলা অভিমানে ক্ষোভে ভারী শোনাল।

ঊর্মি ঝরনা হয়ে হেসে উঠল। যেন কোথাও কিছু হয়নি। ঢাউস সাদা ব্যাগটা পাশের চেয়ারে রেখে আরেকটা চেয়ার টেনে নিল। হাসতে হাসতে বললে, না দেখে ছটফট করবি তবে তো বুঝব রিয়েল প্রেম।

রুণুকে হারানোর ভয়ে অরুণের মন তখন বিস্বাদ। পুরনো দিনের মত হাল্কা রসিকতা এখন আর অরুণের ভাল লাগছে না। একটা তিক্ততার তীর হয়ে এসে সেটা বিঁধল ওকে। অরুণ তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে উঠল, আমি তোর প্রেমে পড়ব ? তোর ?

সিগারেটের ধোঁয়া আর কফির গন্ধ আর হট্টগোল—কথা, তর্ক, কথা—একটা কংক্রিট মিক্সারে ঢেলে কেউ যেন বনবন করে হাতল ঘোরাচ্ছে। অসহ্য লাগছে অরুণের। এতদিন কফি হাউসটা কত আপন মনে হত, এখন অসহ্য। কমবয়েসী জুনিয়র ছেলেমেয়েরা এসে

ভিড় করেছে। এক একজন জায়গা না পেয়ে ওদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে, যেন রিফিউজি ওরা, জবরদখল করে বসে গেছে।

অরুণ হঠাৎ মুখ তুলে উর্মির দিকে তাকাল। উর্মির মুখ ফ্যাকাশে, সাদা। চোখ নামিয়ে নিল উর্মি। কফির কাপে ধীরে ধীরে অবশ হাতে চামচ নাড়ল। তারপর চাপা কষ্টের গলায় বললে, তুই, অরুণ, তুই আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিস, তাই না ?

না, না, উর্মিকে ঘৃণা করবে কেন ? ও আসলে কাঁদছে, ভিতরে ভিতরে কাঁদছে। রুণুকে হারাবার ভয়ে নয়। রুণুর প্রেম হারিয়ে গেছে বলে। ভয় এসে ওর বুকের অসহ্য কষ্ট আর অসহ্য আনন্দকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

—কটা দিন আমার কিভাবে গেছে, জানিস না উর্মি। অরুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মনে মনে বললে, মা মারা গেছে, অথচ তার জন্যে একটু শোক পেতে দিসনি তুই। রুণুর জন্যে এখন আর আমার একটুও প্রেম নেই। শুধু ভয় দিয়েছিস, সন্দেহ দিয়েছিস, অবিশ্বাস দিয়েছিস। এখন অন্তত একটু শান্তি দে।

অরুণ ধীরে ধীরে বললে, একটু শুধু কৃতজ্ঞতা চেয়েছিলাম।

উর্মি চমকে চোখ তুলে অরুণের মুখের দিকে তাকাল। —অরুণ, সবাই শুধু কৃতজ্ঞতার দাম চায়, তুই অন্তত···

অরুণের সমস্ত শরীর ঘৃণায় রি রি করে উঠল। বললে, আমি তোকে শুধু ঘৃণা করতে চাই, ঘৃণা করতে চাই।

অরুণ ভাবল, আমরা কি যে বলতে চাই, আর কি বলে ফেলি। উর্মিব ওপর ওর তো শুধু রাগ, শুধু অভিমান। ঘৃণা করবে কেন।

ডাঃ রুদ্র নিশ্চয় রুণুকে সাবধান করেছেন। —ছেলেটা এক নম্বরের স্কাউড্রেল।

রুণুর মামীমা চমকে উঠেছেন। —দেখেছ কাণ্ড, আমি তো বলছিলাম, ছেলেটি বেশ ভাল রে রুণু।

মামাবাবু, রুণুর মামাবাবু বলছেন, ছি ছি, লোক চিনতে পার না রুণু। ছি ছি।

বুকের মধ্যে ক্যান্সার—হৃৎপিণ্ডে, ফুসফুসে, পাঁজরে পাঁজরে। একটা তক্ষক কুরুর কুরুর করে সব চিবিয়ে খাচ্ছে—ফুসফুস, গলনালি।

অরুণের মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল।

অরুণ তো এখন একটা ক্রিমিনাল। ভগবান-টগবান সত্যি আছে কিনা জানে না অরুণ। পাপপুণ্য আছে কিনা জানে না। আছে, বোধ হয় আছে, বুকের মধ্যে। মাইনিং এঞ্জিনিয়ার বড়ো জোর একটা পাপ করেছে, দুদিন পরে উর্মিকে বিয়ে করে ফেললেই পাপ ধুয়ে যাবে। দুদিন আগে করলেও পাপ ধুয়ে যেত। পাপ যদি সত্যিই থাকে, তার বিচার হয় না। প্রত্যেক মানুষ নিজেই নিজের পাপের বিচাব করে। অথচ অপরাধের বিচার হয়। অরুণ অপরাধী। কেন না শুধুমাত্র একটা আইন আছে বলে। মানুষ মাত্রেই নাস্তিক। কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। ভগবানের আইনকে কেউ মানে না, মানুষের আইনকে দামী মনে করে। তাই ভগবানকে কেউ ভয় পায় না, আইনকে ভয় পায়, মানুষের তৈরি নিয়মকে ভয় পায়। নিয়মে ঘেরা সমাজকে।

—দেখ অরুণ, নিয়মগুলো এমন, নিজেদের মনে হয় লোচ্চা, মনে হয় লোফার আমরা। সেজন্যেই হয়তো আরও লোচ্চামি করতে যাই। নিয়মগুলো বদলে দে, দেখবি আমরাও ভাল।

'তোমার মত ছেলেকে চাবুক মারতে হয়, তুমি এস না, এস না। ফোন কর না। কে বলছেন আপনি ? না না, আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না।' অরুণ যেন কানের

কাছে শুনতে পাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছে রিসিভারটা ঝটাং করে নামিয়ে রেখে রুণু মামীমাকে বলছে, সেই স্কাউন্ড্রেলটা।

—এই, একটা কথা বলব, হাসবে না বলো। প্রেম কি—আমি জানতাম না, তুমিই শিখিয়েছ। রুণু একদিন বলেছিল।

আজ রুণু হয়তো মনে মনে বলছে, ঘৃণা কি—আমি জানতাম না, তুমিই ঘৃণা করতে শিখিয়েছ।

□

অরুণ কোথাও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। সুজিত কিংবা টিকলুই কি পারছে ? কেউ না। কফি হাউসে আড্ডা জমে না। ওখানে এখন সব নতুন মুখ। আরও কম বয়সের ছেলেমেয়ে, উজ্জ্বল মুখ। ওদের সামনে এখনও অফুরন্ত আশা। ওরা হাসে, তর্ক করে, স্বপ্ন···স্বপ্ন দেখে। ওদের কাছে অরুণের নিজেকে বড় ম্লান বিমর্ষ মনে হয়।

—অরুণদা, কি করছেন এখন ? একটি ছেলে ওকে একা একা বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন। —কফি খাওয়াতে হবে অরুণদা।

যেন অরুণদা বার্মা শেলের ডিরেক্টার। নিজের কফির পয়সা জোটে না, কফি খাওয়ান ! কি করছেন জিজ্ঞেস করলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতে ইচ্ছে করে। এখন তো কিছুই করছে না, এর পর মাইনের অঙ্কটা কেবল গোপন করে বেড়াতে হবে। রাধানাথের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, দিব্যি বললে, আটশো টাকা মাইনে। ব্লাফ। কি জানি, সত্যি হতেও পারে, এক একজন তো পায়।

বয়কে তিনটে কফির অর্ডার দিল। নির্ঘাত ছেলে দুটো প্ল্যান করে এসেছে, চল অরুণদাকে যখ দিয়ে আসি। খাবে, আবার বলবেও। ভদ্রতাকে কেউ দাম দেয় না। গোঁফওলা ইনটেলেকচুয়াল ছোকরাটা এখনও আসে, নিশ্চয় বেকার। ঊর্মি সেদিন তাকে ভদ্রতা দেখিয়েছে, ছেলেটা সেঁটে থাকতে চাইছিল। বোধ হয় ভেবেছে, ঊর্মি ওর প্রেমে পড়ে গেছে। নিভা ভদ্রতা দেখিয়েছিল, হঠাৎ সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ে ট্যাক্সি ঢুকতে দেখে, ভেবেছিল লেকে বেড়াতে যেতে চায় অরুণ, তখন কি বলবে ? রেগে যাবে ? ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে বলবে চিৎকার করে উঠে ? ভদ্রতা করে শুধু বলেছিল, এই না, না, আটটা বেজে গেছে। ব্যস, টিকলু শুনে বললে, ও তো সস্তা মেয়ে। অরুণ নিজেও ভাবল, বোধ হয় খারাপ।

ভদ্রতার দাম দেয় না কেউ। হৃদয়ের আবেগকেই বা কে দাম দেয়। ঊর্মি দিল না, রুণু দেবে না। টিকলু তো হাসে।

শুধু একটা জিনিসই পেয়িং—প্ল্যান। সব ব্যাপারে প্ল্যান করে এগিয়ে চলো। প্রেম কিংবা চাকরি, কিংবা সুনাম।

—আমরা গাছও নই রে, আমরা আগাছা। আমাদের কোনও প্ল্যান নেই। অরুণ বলেছিল।

টিকলু হেসে উঠেছিল। —সত্যেনকে মনে আছে ? ইস্কুলের সত্যেন ? ও বলত, জীবনটাকে প্ল্যান করতে হয়। দিনরাত মুখস্থ করত, বি. ই. পাস করল। দুমাস হল ছাঁটাই হয়ে গেছে।

রাধানাথ কি সত্যি আটশো টাকা মাইনে পায় ? সুখেন, সুখেনও বলেছিল, ও অফিসার। আলোকও বিলেত চলে গেল, বড়লোকের ছেলে, ফরেন এক্সচেঞ্জ নাকি পাওয়া যায় না !

শুনলেই নিজেকে ঘৃণা হয়, হিংসে করতে ইচ্ছে করে। একটা হাতবোমা নিয়ে যাকে হোক, যেখানে হোক ধাঁই করে ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে হয় পৃথিবীটাকে লাট্টুর মত তুলে নিয়ে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিতে, কিংবা পৃথিবীটাকে ডিমের মত কারও মুখের ওপর ছুঁড়ে মারতে। ফেটে চৌচির হয়ে যাক, সেও শান্তি। আমি রিক্‌শা টানব সেও ভাল, তোমাকে সুখে ঘুমোতে দেব না।

উর্মির জন্যে বার বার দরজার দিকে তাকাচ্ছিল অরুণ।

উর্মিকে এখন আর ওর ভাল লাগে না। উর্মি ওর প্রেম নষ্ট করে দিয়েছে বলে, কিংবা ও মনে মনে উর্মির যে ছবিটা এঁকে রেখেছিল, সেটাকেই উর্মি নষ্ট করে দিয়েছে বলে।

কিন্তু উর্মি কি-এমন ভুল করেছে ? ওরা সকলেই তো জানে ওরা কিছু পাবে না, তাই সব কিছুর টুকরো টুকরো করে স্বাদ নিতে চায়। সবটুকু, সমগ্রভাবে, কখনও কোনদিন পাব এই আশায় থাকতে চায় না। অল্প হোক, এখনই চাই, এখনই।

কফি হাউস হট্টগোলে ঝমঝম করছে। তর্ক না আলোচনা বোঝা যায় না। একটা কথাও বোঝা যায় না। অথচ সকলেই কথা বলছে, কথা বলছে, কথা বলছে। কিন্তু যে যা বলতে চায়, কেউ বলছে না ; বলতে পারছে না।

কোত্থাও একটা খালি চেয়ার নেই। যে আসবে তারই মনে হবে সে যেন ফালতু।

এই ভ্যাপসা গরমে, এই হট্টগোলে অরুণরা কি করে এতদিন কাটাল। এখন তো নির্জনতাকে খুঁজছে। নিঃশব্দে চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে করছে। রুণুর জন্যে, রুণুকে হারানোর জন্যে দুঃখ পেতে ইচ্ছে করছে।

কফি হাউসের দরজার সামনে একরাশ অচেনা ভিড়ের ফাঁকে উর্মির মুখ হেসে উঠল। উর্মি এগিয়ে এল। বেয়ারাটা ভাল টিপ্‌স্ পায়, ছোটাছুটি করে চেয়ার জোগাড় করে দিল। ছেলেটা আর মেয়েটা মুখোমুখি, ওদিকেব টেবিলে ফর্সা রোগা মেয়েটা ডিসপেপসিয়ার রুগীর মত প্লেটের পর প্লেট সাফ করছে। এদিকের টেবিলে কমলালেবুর কোয়ার মত রঙ মেয়েটাকে ঘিরে চারটে দামাল ছোকরা। মেয়েটার স্বল্প ঢাকা সর্বাঙ্গ শুধু লোভ দেখাচ্ছে।

অরুণদের পাশের টেবিল একেবারে ড্রাই, পাঁচটা জোয়ান ছেলে, একটা বেশ লম্বা, ঘন হয়ে বসে ঝগড়া করছে।

উর্মি চেয়ার টেনে বসেই তাদের দিকে তাকিয়ে বললে, ভেজিটেরিয়ান হয়ে গেলি নাকি ?

অরুণ বললে, লম্বা ছেলেটা আছে, ভাবলাম তোর ভাল লাগবে।

উর্মি হাসল, চাপা গলায় বললে, কাঁধটা সত্যি বেশ চওড়া।

তারপর চুপচাপ। হঠাৎ এলোমেলো সব কথা মনে পড়ে গেল অরুণের। ভিতর থেকে একটা জ্বালা আর রাগ। সেদিন তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল উর্মি। একটাও কথা শোনাতে পারেনি অরুণ।

—তুই অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। অরুণ বলে উঠল।

উর্মির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ও কিচ্ছু বললে না।

আর অরুণের মনে হল এ কথাটা না বললেই হত। আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, এখন, ফিরে আসার পর, উর্মির দারুণ লজ্জা। উর্মি ভাবছে, ও অরুণের কাছে খুব ছোট হয়ে গেছে।

সেদিন তো অল্পক্ষণ ছিল, তারই মধ্যে রসিকতা করে হাল্কা হয়ে পুরনো উর্মিতে ফিরে আসতে চেয়েছিল। পারেনি। ফিরে আসা যায় না।

আজও সমস্তক্ষণ উর্মি একবারও হাসল না, উচ্ছল হল না। ওর বুকের মধ্যে কি এক অসহ্য যন্ত্রণা চাপা আছে।

ফেরার পথে বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে ঊর্মি আস্তে আস্তে বললে, তুই আমাকে ভীষণ ভালবাসিস, তাই না অরুণ ?

অরুণ কোন কথা বলল না, অভিমানে ওর চোখের পাতা ভারী হল।

ঊর্মি হঠাৎ বলে উঠল, তুই আমাকে কোনদিন বলিসনি কেন অরুণ, বলিসনি কেন ?

অরুণ চমকে চোখ তুলে তাকাল ঊর্মির দিকে। ঊর্মিকে কোন দিন অরুণ এমন বিচলিত দেখেনি।

প্রিন্সেপ ঘাটের থামের ছায়ায় বেঞ্চে বসে ঊর্মি একদিন বলেছিল, আমার কি মনে হয় জানিস অরুণ, যার যেখানে যত ব্যথা আছে, বুকের মধ্যে শূন্যতা, আমি তাদের ভরিয়ে দিই। সুখী করি।

—আমাকে ভালবেসে তুই সুখী হতিস ? অরুণ বল, বল তুই।

অরুণ কোন কথা বলল না। চুপ করে রইল।

ঊর্মি ধীরে ধীরে আবার বললে, তোর সই-করা কাগজটা যখন দেখলাম, ডাঃ রুদ্র দেখালেন, আমি জানতাম না অরুণ···

ঊর্মির গলার স্বব কান্নায় কেঁপে গেল।

আর অরুণ বলে উঠল, তুই অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ।

ঊর্মি ধীরে ধীবে বললে, ভালবাসা কিছু না রে অরুণ, কিছু না। তুই যেন কোনদিন আমার কাছে ছোট হয়ে যাস না। তাহলে সমস্ত জীবন আমি বার বার কার কাছে ফিরে আসব।

অরুণ ভাবত ওকে কেউ ভালবাসে না। মা-বাবা-দিদি সকলের কাছ থেকে ও শুধু তাচ্ছিল্য কুড়িয়েছে। তাই কাউকে ওর ভালবাসতে ইচ্ছে করেনি। কণুই ওকে ভালবাসতে শিখিয়েছে।

বাবা ডেকচেয়াবে চুপচাপ বসে থাকে। এখন এক একদিন ও কাছে গিয়ে বসে। কথা বলে।

—আব চাকরি করতে ভাল লাগে না রে। বাবা একদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল।

অরুণের ইচ্ছে হয়েছিল ও যদি একটা ভাল চাকরি পেয়ে যায়, বলবে, বাবা, তুমি আর চাকরি কোর না।

আজকাল দিদিকেও ভাল লাগে। দিদিকে যেদিন অক্ষয়দা নিয়ে গেল, ও সেই প্রথম বলেছিল, দিদি, আর কদিন থাকলে পারতিস ; তুই থাকলে বাবার মন ভাল থাকে।

সত্যি, বাবার বড়ো কষ্ট। বাবাকে কেউ বুঝল না। সবাই যে শুধু বাইরেটা দেখতে চায়। বড় বড় ডাক্তার, হাসপাতাল, নার্স, অজস্র টাকা খরচ—এই সব দেখলেই লোকে বলত, যথেষ্ট করেছে। বলত, ওর নিশ্চয় খুব দুঃখ। বাবা মাকে তাড়াতাড়ি কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে চাইল, বাবার কষ্ট কেউ বুঝল না।

—দাদা, দেখ দেখ, নিমগাছটায় ফলগুলো পেকে হলুদ। একমুঠো পাকা নিমফল জলে ধুয়ে নিয়ে এল মিলু।

অরুণ দেখল, পাকা মহুয়ার মত। আরেকটু ছোট।

মুখে দুটো নিমফল পুরে দিয়ে মিলু আরামে চোখ বুজল। —কি মিষ্টি।

নিমফুলও সুগন্ধ ছড়ায়, নিমের ফল মিষ্টি।

দুপুরে খাওয়ার পর ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল অরুণের। তবু বিছানায় গড়িয়ে নিতে পারল না। ভয় হল হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে।

প্রতিদিন দুপুরে টিকলুদের প্রেসের টেলিফোনের সামনে গিয়ে বসে থাকে। টিকলুর

বাবা বাড়িতে খেতে যান, আর সেই সময়টুকু টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে থাকে ও, যেন ফোন বাজলে ও শুনতে পাবে না।

নিজে থেকে রুণুকে ফোন করতে একটুও সাহস হয় না।

প্রেসের সকলেই চেনা, কেউ কেউ কাজ করতে করতেই অরুণের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়। হাতে কাজ না থাকলে কেউ বা কাছে এসে বসে, গল্প করে। অরুণ হাসে, সাড়া দেয়, হুঁ হাঁ করে, কিন্তু তাদের একটা কথাও ওর কানে যায় না। ওর মন শুধু টেলিফোনটার দিকে। কখন রিং রিং রিং করে বেজে ওঠে। আর মাঝে মাঝে হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে, দেখে হতাশ হয়ে পড়ে।

এ এক অদ্ভুত জ্বালা। সমস্ত দুপুর, কখনও নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলেও অরুণ অপেক্ষা করে। মনে মনে প্রার্থনা করে, যেন টেলিফোন আসে।

—নাঃ, টেলিফোন আসবে না। দীর্ঘশ্বাসের স্বরে একবার অস্ফুটে উচ্চারণ করে ফেলল অরুণ। বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা বিশুদ্ধ যন্ত্রণায়।

আসবে না, আসবে না। সিঁড়ির মাঝখানে ডাঃ রুদ্রর সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ার দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই বুকফাটা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। পর পর কয়েকটা দিন ও ছুটতে ছুটতে এসেছে, সব কাজ ভুলে, সব কাজ ফেলে রেখে। তারপব অপেক্ষা, অপেক্ষা। ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে, টেলিফোনটার দিকে চোখ রেখে। কিন্তু রুণুর ডাক আসেনি, আসেনি।

এক একদিন লোভ হয়েছে ও নিজেই ফোন করবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয়। কি জানি, রুণুর মামীমা হয়তো গলা শুনেই টেলিফোন কেটে দেবেন রাগে ঘৃণায়। 'ছি ছি, এই ছেলেটাকে ভাল ভেবেছিলাম!' কিংবা রুণু চিৎকার করে বলবে ·

কি বলবে কিছুই জানে না অরুণ।

শেষ অবধি পারল না। নিজেই ফোন করল।

রুণুব গলা তেমনি মিষ্টি, ভরা কলসীব মতো।

অরুণ যেন কিচ্ছু জানে না, ডাঃ রুদ্রকে চেনে না, ও কোন অন্যায় করেনি। —রুণু, আমি আর পারছি না, পারছি না।

—বাঃ, আমি তো যাব। এখনই ফোন করতাম। আপনার আজ জন্মদিন। রুণু হাসি-হাসি গলায় বললে।

আঃ, এক বুক আনন্দ যেন ভোরবেলার রাস্তায় হোসপাইপের জল ছড়াল।

জ্বর ছেড়ে গেল শরীর থেকে। ভয় ছেড়ে গেল। ডাঃ রুদ্র নিশ্চয় স্পষ্ট চিনতে পারেননি। ও তো মাব মৃত্যুতে মাথা কামিয়েছে। ও তো সেদিন ধুতিপাঞ্জাবি পরেছিল। কি আজেবাজে ভয় পেয়েছিল অরুণ। ও যদি অপরাধী হয়, ডাঃ রুদ্রও তো অপরাধী। উনি কোন্ মুখে বলবেন, অরুণ একটা স্কাউন্ড্রেল! মন হাল্কা হতেই হেসে ফেলল অরুণ। ডাঃ রুদ্র নিশ্চয় ওকে স্কাউন্ড্রেল ভেবেছেন। ভেবেছেন, উর্মির জন্যে অরুণই দায়ী।

—বাঃ, আমি তো যাব···আপনার আজ জন্মদিন।

তাহলে মামীমা নিশ্চয় কাছেপিঠে আছেন। আপনি, আপনি, আপনি। অরুণের খুব মজা লাগে যখনই বাইরের কেউ সামনে থাকে, রুণু তখন 'আপনি' বলে, যেন ওদের মধ্যে কিচ্ছু নেই।

একদিন সুজিত ছিল, জোর করে সঙ্গে এসেছিল, আর রুণু বার বার ওকে 'আপনি' বলছিল।

সুজিত চলে যাবার পর কিন্তু রুণু হেসে উঠেছিল। —বাব্বা, দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এতক্ষণ। এতক্ষণে 'তুমি' বলতে পাব।

শুনে ভীষণ ভাল লেগেছিল। এখন সুজিত কিংবা অন্য কেউ থাকলেও ও 'তুমি' বলে। শুধু মামীমাকে··· । 'আপনার আজ জন্মদিন—আপনার আজ জন্মদিন।' শুনে ভীষণ ভাল লাগল।

সত্যি, অরুণ নিজেও ভুলে গিয়েছিল আজ ওর জন্মদিন। শুধু জন্মদিন! পৃথিবীটা যে আছে, চলছে, কলকাতা শহরটা, তাও যেন টের পায়নি। সেই পাটনা গিয়ে যেমন মনে হয়েছিল কলকাতা শহরটা ওকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে, তেমনি। না, ঠিক তেমনি নয়! আগে মনে হত, শুধু রুণু আছে, আর কিচ্ছু নেই। এখন—শুধু একটাই ক্ষোভ—হয়তো রুণু নেই। আর সব আছে! আছে বলেই বিরক্তি, রাগ। কেন আছে, কেন? রুণু না থাকলে আর সব কিছু কেন থাকবে?

—যাচ্ছি, এক্ষুনি যাচ্ছি।

মেট্রোর সামনে এসে দাঁড়াল অরুণ। এখন দুপুর। চমৎকাব ফিকে মেঘের ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা আর স্বচ্ছ, আলো-ঠিকরোনো কাচের আকাশ। ওপারে গাছের ছায়ায়দাঁড়ানোএকটা গাড়ির বনেটে বসে ভিখিরি মেয়েটা রেলিঙে বসা ভিখিরি ছেলেটার সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে কথা বলছে। দুটো রুক্ষ কাক উড়ে উড়ে ঝগড়া করছে।

রুণু এল। কিন্তু প্রতিবারের মত ওর মুখ হাসিতে উচ্ছল হল না। আরে দুর, অরুণের মনে শুধু সন্দেহ আর সন্দেহ। এই ভিড়ে, বাসে, গুমোট গরমে মেজাজ ঠিক থাকে না, রুণু কিনা হাসবে!

অরুণ বললে, দুটো টিকিট কেটে রেখেছি!

রুণু ঘাড় কাত করে সায় দিল।

তারপর অরুণ অনেক কথা বলল। আনন্দে, খুশিতে। খেয়ালই কবল না, রুণু শুনছে কি শুনছে না।

সিনেমা হলে ঢুকতে গিয়ে রুণু নিঃশব্দে একটা সিগারেট লাইটার দিল অরুণকে। ওপরে লাল রঙের চমৎকার একটা মনোগ্রাম:

হলের ভিতরে ঢুকে অরুণ লাইটারটা জ্বালল, নেবাল। বললে, খুব সুন্দর। প্রথমবার জ্বাললাম, এর আলোয় তোমার মুখ দেখব বলে।

রুণু হাসল কিনা বোঝা গেল না।

আর পরমুহূর্তেই অরুণের মনে পড়ে গেল, ছেঁড়া টিকিট দুটো। সিনেমার টিকিটের বাকি অংশ দুটো এখনও ওর পকেটে।

ছবি শুরু হল তখনও রুণু চেয়ে নিল না। আহা বেচারী, বোধ হয় ভুলে গেছে। অরুণের জন্মদিনের আনন্দে, সিগারেট লাইটারটা অরুণের খুব পছন্দ হয়েছে এই আনন্দে টিকিট দুটো চেয়ে নিতে ভুলে গেছে। বাড়ি ফিরে যখন ওর দেরাজ খুলবে, রুণুর জীবনের টুকরো টুকরো সুখের দেরাজ, তখন নিশ্চয় মনে পড়ে যাবে। ভুলে গিয়েছিল বলে তখন নিশ্চয় ওর মন খারাপ হয়ে যাবে।

অরুণ রুণুকে একটুও দুঃখ দিতে চায় না। অরুণের জন্যে রুণুর কখনও মন খারাপ হবে ভাবতে ভাল লাগে না।

অরুণ নিজেই তাই বললে, এই। টিকিট দুটো নেবে না?

বলে হাসল অরুণ, টিকিট দুটো এগিয়ে দিল।

রুণু অলস হাতে, যেন অনিচ্ছায় টিকিট দুটো নিল, তারপর ধীরে ধীরে, যেন নিজেব মনকেই বললে, রাখি না, আজকাল আর রাখি না।

অরুণের বুকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। মনে হল রুণু যেন ওকে অপমান করার জন্যেই বলল কথাটা। যেন ঐ টুকরো কাগজের বা অরুণের উপস্থিতির আজ আর কোন

দামই নেই। তাহলে কি.....

অয়নের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হল সেদিন। রুণু একসময় বললে।

আর অরুণের লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হল।

—অয়নকে ঠিক এমনি একটা লাইটার দিয়েছি। রুণু আরেক সময় বললে।

অরুণের মনে হল অয়নের নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে রুণু যেন জল-ভরা সোনার কলসী কণ্ঠস্বরে আরও একটু আন্তরিকতা ঢেলে দিল।

অরুণের মনে হল লাইটারটা অয়নকে দেবার সময় নিশ্চয় আন্তরিকতাও দিয়েছে রুণু। ওকে শুধুই একটা লাইটার।

বিদায় নেবার সময় অরুণ জিজ্ঞেস করলে, আবার কবে আসছ ?

হঠাৎ ভুরু কুঁচকে গেল রুণুর। বললে কি জানি। বললে, জন্মদিন বলেই এলাম।

রুণুর বাসটা যতক্ষণ দেখা গেল, অরুণ সেদিকে তাকিয়ে দেখল। বেশিক্ষণ দেখা গেল না। ব্যথায়, অপমানে অরুণের চোখ ঝাপসা হয়ে গেল।

□

'বৃষ্টি, আমার বড়ো ভয় করে। কেবলই মনে হয় তুমি আমার কাছে-কাছে থাকবে না।'

'বৃষ্টি, জানো, আমাকে কেউ কোনদিন ভালবাসেনি। এতদিন আমি নিজেকে ঘৃণা করতাম, এখন আমি নিজেকে ভালবাসি।'

বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। রুণুর বুকের ভেতরটা তখনও রিমঝিম বৃষ্টির মত নাচছে।

বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে রুণু একদৃষ্টে অরুণের চলে যাওয়া দেখছিল। গলির মোড় থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে অরুণ একবার ফিরে তাকাল। রুণু জানত, অরুণ ফিরে তাকাবে। যদিও এত দূর থেকে ওরা পরস্পরের মুখ স্পষ্ট দেখতে পাবে না তবু রুণু একটু মিষ্টি হাসল। অরুণও নিশ্চয় একটুখানি হেসেছিল।

বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণ রেখে ফিরে আসার পর একদিন ওর ভাল শাড়িখানা ছেড়ে খাটের এক পাশে রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল। সাজপোশাক করে যাবার সময় শাড়িতে, কানের লতিতে, ব্লাউজে একটুখানি সেন্ট লাগিয়েছিল, কিন্তু ফিরে আসার পর সেন্টের গন্ধ আছে বলে মনেই হয়নি। অথচ সকালে ঘুম ভাঙতেই সেই সেন্টের গন্ধটা আরও নরম হয়ে নাকে এসে লেগেছিল। বিয়েবাড়ির সমস্ত আনন্দ, উল্লাস এক ঝলকে মনে পড়ে গিয়েছিল। অরুণ চলে যাওয়ার পর তেমনি একটা বাসি সেন্টের গন্ধে ওর সমস্ত মন উন্মনা হয়ে গেল।

অনেকগুলো টুকরো টুকরো ঘটনা ওর মনে পড়ে গেল। 'বৃষ্টি, তুমি কোনদিন যদি আমাকে ছেড়ে যাও আমি বাঁচব না।' চোখের পাতায়, ঠোঁটে, কপালে যেন সেই বৃষ্টির দিনের উত্তাপটুকু এখনও লেগে আছে। হাতের ঘড়িটা খুলে রাখার পরেও যেমন মনে হয় হাতে লেগে আছে, এও তেমনি। কিংবা কানের দুলের মত। ইস্কুলে পড়ার সময় একদিন একটা দুল কোথায় পড়ে গিয়েছিল, ও টের পায়নি। বাড়ি ফিরে মার কাছে ভীষণ বকুনি খেয়েছিল। দুল হারানোর জন্যে যত-না বকুনি, সোনা হারানোর জন্যে আরও বেশি। সোনা হারানো নাকি খুব ভয়ের। অলক্ষুনে কিছু ঘটবে, তার আভাস। শুনে রুণুর নিজেরও খুব ভয় হয়েছিল।

বাবা চিঠি লিখেছে, মা নাকি খুব ভুগছে, আর ভুগছে। লিখেছে মায়ের সেই তিন ভরি সোনার হারটা পাশের বাড়ির মিনা-বউদি তার বোনের বিয়েতে যাব বলে নিয়ে গিয়েছিল, এখন আর ফেরত দিচ্ছে না। মার ওপর রুণুর ভীষণ রাগ হল, বাবা তো কতবার বলেছে,

আজকালকার দিনে কাউকে অত সহজে বিশ্বাস করতে নেই।

নন্দিনী একটা ক্যাবলা মেয়ে, বিরামকে বিশ্বাস কবে ঠকেছে।

আজ সকালে, হ্যাঁ, আজ সকালেই তো রুণু দোতলার বাবান্দায় দাঁড়িয়েছিল রেলিঙে ভর দিয়ে। চোখ কিছু দেখছিল না। একটা উদাস বিষণ্ণতা কেন জানি ওর বুকের ওপর চেপে বসেছিল। ও লক্ষ্যই করেনি, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পবমদা হঠাৎ ডাকলেন, রুণু শুনছ! নন্দিনীকে নিয়ে এসেছি কাল, তুমি যেও একবার।

রুণুব মুখ এক নিমেষের জন্যে ঝকঝক করে উঠেই আবার নিবে গেল। ঘাড নেডে বললে, আচ্ছা যাব।

প্রথমটা ওর একটু অস্বস্তি লেগেছিল, কিন্তু পাবল না, তখনই চটি পাযে গলিয়ে গিয়ে হাজির হল।

দুটো লোক পাশাপাশি যেতে পারে এমনি সরু একটা ব্লাইণ্ড লেন, রাস্তার মাঝে মাঝে দু-চারটে জল-ভরা গর্তে দু-চারখানা ইট জেগে আছে। শাড়ি বাঁচিযে চটি বাঁচিয়ে একতলার দরজার কড়া নাড়ল ও।

—এ কি চেহারা হযেছে রে তোব! রুণু নন্দিনীকে দেখেই বলে উঠল। মুখের দিকে তাকাতে গিযে আপনা থেকেই নন্দিনীর সিঁথিতে চোখ পড়ল। সিঁদুব আছে কি নেই বোঝা গেল না। সিঁদুর লুকিয়ে রাখা আজকাল অবশ্য মেয়েদের ফ্যাশন। দেখলে রুণুব বিচ্ছিবি লাগে। ওব বিয়ে হলে ও খুব চওডা করে সিঁদুর দেবে, আব কপালে ডগডগে একটা সিঁদুবের টিপ পরবে।

কিন্তু নন্দিনীর ওটা ফ্যাশন নয় ও জানে। তাই নিওন-আলোর বিজ্ঞাপনগুলো দিনের আলোয় যেমন ম্যাটমেটে আর ফ্যাকাশে লাগে, নন্দিনীকে ঠিক তেমনি লাগল।

রুণুকে দেখে নন্দিনী অনেক দিন পরে হাসবার চেষ্টা করল।

নন্দিনীর বউদিব মুখের হাসিটাও বেশ আদুরে আদুবে লাগল। —এসো রুণু, তুমি তো আর আসই না।

নন্দিনী অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। —আমি এখন কি করি বল তো রুণু।

রুণু সবই জানে, সবই শুনেছে। ও দুম কবে বলে উঠল, ডিভোর্স কর।

নন্দিনী একটুক্ষণ চুপ করে ধীরে ধীরে বললে, আমার জীবন তো নষ্ট হযেছেই, ওব জীবনটা নষ্ট করে কি লাভ। গলগ্রহ হওয়ার চেয়ে ডিভোর্স অনেক ভাল।

নন্দিনীব বউদি চুল খুলে চুলে তেল ঘসতে ঘসতে শিশিটা রাখতে এলেন। এসে শুনলেন কথাটা! রুণুর মনে পড়ল, নন্দিনীর চলে যাওয়ায় বউদির কি রাগ, কি রাগ! ওর ভয় হল এখনই হয়তো চিৎকার করে বলবেন, যেমন দাদা-বউদির সম্মান রাখোনি, এখন বোঝ।

না, বউদি তা বললেন না। কাছে এসে বললেন, পাগল মেয়ে, ও নিযে মন খারাপ করতে নেই। দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

নন্দিনী আর কোন কথা বলেনি। আর রুণুর তখন মনে হযেছিল, ওব যদি এমনি একটা বউদি থাকত, ও তাকে অরুণ সম্পর্কে সব—সব বলত। তার ওপব নির্ভর করত।

রুণুর অনেক কিছু বলার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু নন্দিনীকে নিজের কথা কিচ্ছু বলতে পারেনি। ভেবেছিল, ও বেচারার এখন শুনতে ভালও লাগবে না।

অরুণ চলে যাওয়ার পর সকালের ঘটনাটা হঠাৎ একবার মনে পড়ল, ইচ্ছে হল একবার

পরমদার বাড়ি যায়। নন্দিনীকে গিয়ে বলে, অরুণ এসেছিল ; গিয়ে বলে, মামীমা বলেছেন, ছেলেটি খুব ভাল রে।

কিন্তু সন্ধের পর বের হলেই মামীমা বড়ো রাগ করেন। যেদিন অরুণের সঙ্গে দেখা করে, একটু দেরি হয়ে যায়, মামীমা বলেন, বোন দুটোকে পড়াতে যদি না পারো, বলো না, মাস্টার রেখে দিই।

আসলে রুণু জানে, অন্ধকারকে মামীমা বড়ো ভয় করেন।

একটা কথা মনে পড়তেই রুণুর হাসি পেল। চোখের পাতায়, ঠোঁটে, কপালে ও যেন আরেকবার অরুণের উত্তাপ অনুভব করল। পিঠের ওপর অরুণের দুটি হাত, আর বৃষ্টি, অঝোর বৃষ্টি। অরুণটা একটা বদ্ধ পাগল। পাগলের মত ওকে ভালবাসে। একদিন ওকে ঝড়ের মত ভালবেসেছিল। এখনও মাঝে মাঝে ও সুখ-সুখ আনন্দে বুকের মাঝখানের তিলচিহ্ন, ঠোঁট, কপাল, চোখের পাতা দুটি আঙুলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে।

চোখ পাকিয়ে অরুণের চোখের রাগটা নন্দিনীকে একবার না দেখাতে পারলে আনন্দ নেই। দেখিয়ে দুজনে মিলে খুব হাসবে একদিন। কিন্তু রুণুই বা কি করবে। অরুণের কোন বুদ্ধিসুদ্ধি আছে নাকি। তখনও ঝনঝনে রোদ, দূরে দূরে লোক রয়েছে, বলল কিনা 'কেউ দেখছে না। কেউ দেখছে না।' রুণু রেগে বলেছিল, তা হলে আর কোনদিন আসব না। তারপর আরেক দিন, রুণু তখন বাবার চিঠি পেয়েছে, অভাব—অভাব, মা'র অসুখ, ছোট ভাইটা ফেল করেছে। মন-মেজাজ ভীষণ খারাপ। অরুণ ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে আসতেই ও কান্না গলায় বলেছিল, আজ কিচ্ছু ভাল লাগছে না। ব্যস্, তারপর থেকে অরুণ একদিনও কিছু চায়নি। একদিনও না। রুণু জানে, অরুণ ভিতরে ভিতরে রেগে আছে। সেজন্যে ওর কষ্ট হয়। আবার এক একদিন ভয় হয়, অরুণ বোধহয় ওর কাছে কিছু চায় না। কে জানে, এর মধ্যে হয়তো অন্য কেউ কিংবা উর্মি···আচ্ছা, রুণু কিই বা কবতে পারে। ও কি মুখ ফুটে বলবে নাকি। ওর অবশ্য এক একদিন ইচ্ছে হয়, ভাবলে হাসি পায়, বাঃ রে, তা হোক না, কেই বা জানবে, ও সুযোগ পেলে ঝট করে একদিন অরুণকে নিজেই চুমু খেয়ে দেবে। ব্যস, তারপর দেখা যাবে কার কত রাগ থাকে।

'ছেলেটি বেশ ভাল, রুণু, একদম আজকালকার ছেলেদের মত নয়।' সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে একটু আগে বলা মামীমার কথাটা ওব কানে বাজল। মাথা ন্যাড়া করলে কত লোককে তো কুচ্ছিত লাগে, অরুণকে খুব সুন্দর লাগছিল। তাও এখন তো একটু একটু চুল গজিয়েছে। এর আগে আরও সুন্দর ছিল।

—হ্যাল্লো রুণু, এস না এদিকে একবার! রুণু সিঁড়ির মুখ থেকে নিজের ঘরের দিকে পালাতে যাবে, ডাঃ রুদ্র ডাক দিলেন।

মামাবাবু এখনও কল সেরে বাড়ি ফেরেননি, যতক্ষণ না ফেরেন ওর বড়ো ভয় করে। আর মামীমা যেন কি, এত ভালমানুষ, কিছুই বোঝেন না। কেন, বলতে পারেন না, রুণুর এখন পড়ার সময়!

ডাঃ রুদ্রর ডাক শুনে একবার দেখা না দিলেই নয়। রুণু ভয়ে ভয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে ডাঃ রুদ্র প্রশ্ন করলেন, ছেলেটি কে ?

এতক্ষণে রুণুর মনে পড়ল, অরুণের পিছনে পিছনে ও যখন সিঁড়ি বেয়ে নামছিল, ডাঃ রুদ্র তখন উঠে আসছিলেন। দেখে বোধ হয় অবাক হয়েছেন, কিংবা হিংসায় জ্বলছেন।

ছেলেটি কে ? কে তা জানার দরকার কি মশাই আপনার। মনে মনে ভাবল রুণু, মজা পেল, রাগ হল। একবার ভাবলে গালে থাপ্পড় মারার মত করে বলে, আমি ওকে ভালবাসি, ও আমাকে ভালবাসে, ব্যস, আর কিছু জানতে চান ? কিন্তু সত্যি সত্যি তা তো আর বলা

যায় না। শুধু বললে, আমার বন্ধু।

পরমুহূর্তেই রুণু দেখল, ডাঃ রুদ্র মাথা নিচু করে হাতে সদ্য ধরানো সিগারেটটা অ্যাশ-ট্রের ওপর রাগ চাপার মত জোরে চেপে ধরে নিবিয়ে ফেলে দিলেন। ডাঃ রুদ্রর হাতটা তখন বোধ হয় একটু কেঁপে গিয়েছিল।

তা দেখে খুব হাসি পেল রুণুর।

ডাঃ রুদ্র অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, যাও, তোমাব পড়ার সময় হয়েছে বোধ হয়।

রুণুর ভিতরটা তখন কুলকুল করে হাসছে।

রুণুর মনে হয়েছিল অরুণকে ও জানে। কিচ্ছু জানে না, কিচ্ছু জানে না।

প্রতিদিন দুপুরে, তখন তো রুণুদের কলেজ ছুটি, বার বার টেলিফোনটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মামীমা ওধারের ঘরে ঘুমোচ্ছেন; উঁকি দিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছে রুণু। আস্তে হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা ছুঁয়েছে। আঃ, রিসিভারটা ছুঁলেও সুখ, বুকের জ্বালা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, রিসিভারটা যেন অরুণের হাত। কিন্তু পরক্ষণেই অভিমানে বাগে চোখ ঠেলে জল এসেছে। না, ফোন করবে না ও, দেখা করবে না আর। একদিন তো রিসিভার তুলে টিকলুদের প্রেসের নম্বরটা ডায়াল করে ফেলেছিল, কিন্তু রিং হওয়ার কব্‌র্‌র্‌ কর্‌র্‌ব্‌ শব্দ শুনেই ঝট করে নামিয়ে রেখেছিল।

প্রথম সেই বৃষ্টির বিকেলে যেদিন অরুণ ওকে ভালবাসার ছোঁয়া দিয়েছিল, সেদিন রুণু শুধুই রোমাঞ্চিত হয়েছিল, নতুন এক অভিজ্ঞতায় অবাক হয়েছিল। শবীব শবীরকে এমনভাবে আদর করতে জানে, শরীরে এত সুখ লুকিয়ে আছে জানত না। রুণু যেন এক তাল কাদার মত ছিল, কুমোরের হাতে রাতারাতি প্রতিমা হয়ে গিয়েছিল। হাতের ঠোঁটের আবেগের স্বাদটুকু তখনও মনের মধ্যে রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টি হয়ে নাচছে।

—এই, দ্যাখো তো চুল ঠিক আছে কিনা, টিপ?

আরেক দিন প্রিন্সেপ ঘাট থেকে ফেরার পথে হঠাৎ থেমে পড়ে রুণু জিজ্ঞেস করেছিল। তারপর ব্যাগ থেকে লিপস্টিক বের করে একটু লাগিয়ে নিয়েছিল।

তখন অনেক স্বপ্ন ছিল রুণুর মনে।

কিন্তু অরুণের ওপর অবিচাব করছে না তো! ডাঃ রুদ্রকেই বা বিশ্বাস কি? বাঃ, বিশ্বাস না করে উপায় আছে নাকি।

তখনও প্রচণ্ড রোদ্দুর। রুণুব সমস্ত শরীর ঝাঁ ঝাঁ করছে। মুখ, গলা, বুকের ভিতরটা তেষ্টায় শুকিয়ে আছে। কোথাও এতটুকু ছায়া নেই, কলেজ থেকে বেবিয়ে বাস-স্টপ অবধি এসেছে, আর যেন অপেক্ষা করতে পারছে না। পর পর কয়েকটা বাস এল, ভিড়ে বোঝাই, একটাতেও উঠতে পারল না ও। ওর সমস্ত মুখ তখন ঘামে ভিজে গেছে, ব্লাউজের পিঠ।

—রুণু,চলে এস। চলে এস। ডাক শুনে চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখল, ডাঃ রুদ্রের গাড়িটা ঠিক ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে।

হাত বাড়িয়ে ডাঃ রুদ্র দরজাটা খুলে দিতেই ও মুখে হাসি এনে গাড়িতে উঠে বসল। একটুও ভয় করল না। বরং এই অসহ্য রোদ্দুবে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে গাড়িটা অনেক লোভনীয় মনে হল।

না, সেদিন ডাঃ রুদ্রর গাড়িতে না উঠলে হয়তো এত কষ্ট পেত না রুণু। এমন হৃৎপিণ্ড ছিড়ে যাওয়ার মত অসহ্য বেদনায় ভেঙে পড়ত না।

নিজের মনকে শক্ত করল রুণু। কখনও না, কখনও না। যত লোভই হোক, রিসিভারটা

ছোঁবে না। কোনদিন আর অরুণকে ফোন কববে না। ছি ছি। নিজের ভুলের জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিল।

রুণুর বুকের মধ্যে একটা ব্যথার কনকনানি পাঁজর থেকে পাঁজরে ঘুরে বেড়াল। ওর মনে হল যেন দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। আঃ, মৃত্যুর মত নির্ভাবনা আর আছে নাকি।

কিন্তু আজও যেন কিছুতেই নিজেকে শাসন করতে পারছে না। নিজেকে ভীষণ দুর্বল মনে হচ্ছে। এর আগেও যখনই অরুণকে একটা ফোন করার জন্যে ছটফট করেছে, অরুণের সঙ্গে দেখা করার জন্যে, তখনই ডাঃ রুদ্রর দেখানো সেই সই-করা কাগজটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। 'বিশ্বাস করো রুণু, তোমাকে কিছুই জানাব না ভেবেছিলাম, কিন্তু...'

চোখ ফেটে জল এসেছে সে কথা মনে পড়তেই। বালিশে মুখ ডুবিয়ে ও গুমরে গুমরে কেঁদেছে।

কিন্তু শেষ অবধি সব প্রতিজ্ঞা ভেসে গেল, ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ যেতেই। অরুণ, অরুণ, আজ তোমার জন্মদিন।

—জন্মদিনে মাকে আমার অন্যরকম লাগে। জানো রুণু, ঐ একটা দিন বুঝতে পারি মা আমাকে কত ভালবাসে।

রুণুর হঠাৎ মনে হল, এবার তো অরুণের মা নেই। ওকে কে কতখানি ভালবাসে, কেউ ওকে ভালবাসে কিনা, এবার আর ও জানতেও পারবে না।

কি বোকা রুণু! আরে, ডাঃ রুদ্রর দেখানো সই-করা কাগজটা তো জাল হতে পারে। কিংবা অরুণের তো কিছু বলার থাকতে পাবে। আমরা কতটুকুই বা বুঝি মানুষকে।

রুণু মনে মনে প্রার্থনা করেছে অরুণের কিছু যেন বলার থাকে। দোষ, অন্যায়—মানুষ কখন কি করে ফেলে। তাবপর সারা জীবন ধরে শাস্তি পেতে হয়। না, অরুণ যদি...অরুণ হয়তো দেখা হলেই সব কথা বলবে,হয়তো...বাঃ, অরুণ ওকে এত তীব্রভাবে ভালবাসে, এত কষ্ট পায়, তার একটা অন্যায় ক্ষমা করতে পারবে না রুণু?

পর পর কয়েকটা দোকান ঘুরে সুন্দব দেখে একটা লাইটার কিনল রুণু।

অয়নকেও ঠিক এমনি একটা লাইটার দিয়েছিল সেদিন। লাল মনোগ্রাম করা।

অয়ন খুব খুশি হয়েছিল। রুণু খুশি হয়েছিল। রুণুর মনে হয়েছিল অয়নকে ও আরও গভীরভাবে ভালবাসতে শুরু করেছে। অথচ তখন তো অরুণের ভালবাসায় বুক ভরে ছিল।

ডাক্তাব রুদ্রকেও ওব ঘৃণা হয়েছিল। লোকটাব 'ভালবাসি' বলাব ধবনটাই হযতো ওইরকম।

এখন ওব কাছে অয়ন আবার তুচ্ছ হয়ে গেছে। অরুণের মত তুচ্ছ। কারণ, এখন অরুণের ওপর ওর আর কোন বিশ্বাস নেই। সব মিথ্যে, সব মিথ্যে, অভিনয় শুধু।

তবু মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা, ডাঃ রুদ্রর সব অভিযোগ মিথ্যে। দেখা হওয়ার পর অরুণ নিশ্চয় কিছু বলবে। টেলিফোনে অরুণের গলার স্বর তা না হলে এমন বুক-ফাটা যন্ত্রণার মত শোনাবে কেন। অরুণ নিজেই ফোন করবে কেন?

কিন্তু অরুণের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই সমস্ত শরীর রাগে তিক্ততায় বিষাক্ত হয়ে উঠল। রুণু একটুও সহজ হতে পাবল না।

অরুণ ওকে দেখে এত অপ্রতিভ হল কেন? অরুণ সহজ হতে পাবছে না কেন? ও বলছে না কেন, ডাঃ রুদ্রকে আমি চিনি। কিংবা 'রুণু, আমি জীবনে একটা সাংঘাতিক অন্যায় করে ফেলেছিলাম।'

রুণু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আজকের দিন, আজ অরুণের জন্মদিন, আজ ও অরুণকে কিছুই জানতে দেবে না। কোন অভিযোগ করবে না। ও নিজেই সরে যাবে, কষ্ট পাবে, তবু মুখ ফুটে কিছু বলবে না।

অরুণের উপস্থিতিটুকুও ও আজ সহ্য করতে পারছে না কেন। ঘৃণা? ঘৃণা হচ্ছে?

সিনেমা হলে পাশাপাশি বসেও রুণুর মনে হল অরুণের কাছ থেকে ও যেন অনেক দূরে সরে গেছে। মনে হচ্ছে ওদের প্রেমের মৃত্যু হয়ে গেছে।

রুণুর দেওয়া লাইটারটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল অরুণ, খুশি-খুশি গলায় প্রশংসা করল।

রুণু মনে মনে বলল, তোমার কোন প্রশংসা আর আমাকে ছুঁতে পারবে না।

লাইটার জ্বেলে সেই আলোয় রুণুর মুখ দেখল অরুণ।

আমার সেই ভালবাসার মুখ তুমি আর কোনদিন দেখতে পাবে না, রুণু ভাবল।

আর সেই সময় সিনেমার টিকিট দুটো, ছেঁড়া টিকিট দুটো আগের মতই অরুণ এগিয়ে দিতে গেল রুণুকে। —এ দুটো নেবে না?

—কি হবে? শূন্যতার দীর্ঘশ্বাসের মত লাগল কথাটা।

রুণু মনে মনে বললে, এ দুটোর এখন আর কোন দাম নেই, কোন দাম নেই।

অনিচ্ছার হাত বাড়িয়ে টিকিট দুটো নিয়েছে রুণু, কিন্তু ও জানে, ওর সুখের দেরাজে আর কোন নতুন সুখ নেই, স্মৃতি নেই।

এক তাল কাদা কুমোরের হাতের ছোঁয়া পেয়ে একদিন প্রতিমা হয়ে উঠেছিল, আজ সে বিসর্জনের প্রতিমার রূপ হারানো, সুখ হারানো এক তাল কাদামাটি।

প্রথম যেদিন ডাঃ রুদ্রর কাছে সব শুনেছিল, সেদিন অরুণকে কি ভয় কি ভয়, ভয় এবং ঘৃণা, ঘৃণা এবং রাগ। তখন নির্বিকার, মৃত, প্রাণহীন।

ছবি শেষ হওয়ার পর যখন আলো জ্বলে উঠল, রুণু হঠাৎ দেখতে পেল টিকিটের ছিন্ন অংশ দুটো ও কখন নিজেরই অজান্তে ফেলে দিয়েছে। পায়ের কাছে তারা লুটোচ্ছে। ও দুটোর প্রতি ওর আর কোন আগ্রহ নেই। পায়ে ঠেলে টুকরো দুটোকে রুণু সরিয়ে দিল।

ভাঙা জাহাজের মত, বিসর্জনের প্রতিমার মত রূপ হারানো, সুখ হারানো এক তাল মাটি হয়ে রুণু হল থেকে বেরিয়ে এল। তারপর সারাটা পথ বুকের মধ্যে ব্যথা বুকের মধ্যে হতাশ যন্ত্রণা। প্রতিমা বিসর্জনের পর প্যাণ্ডেলের নীচে যেমন খাঁ খাঁ শূন্যতা, রুণুর বুকের মধ্যেও তেমনি।

সে সময় রুণুকে দেখলে মনে হত ওর চোখ দৃষ্টি হারিয়েছে, ওর মন অনেক উঁচুতে আকাশে ডানা-ভাঙা শঙ্খচিল, ওর শরীর রেণু রেণু হয়ে ভেঙে পড়া অবয়বহীন বাতাস, ওর বুকের মধ্যে হতাশ শূন্যতা।

আমি হারিয়ে গেছি, আমার আর কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই।

যন্ত্রের মত অনুভূতিহীন শরীর টেনে টেনে ফিরে এসেছে রুণু। সমস্তক্ষণ ও কিভাবে কাটিয়েছে, কি কথা বলেছে, কিচ্ছু মনে নেই।

রুণুর কেবল ইচ্ছে হচ্ছিল নন্দিনীর কাছে ছুটে গিয়ে ও শব্দ করে কেঁদে ওঠে, ও দু চোখ জলে ভাসিয়ে দিয়ে বুকের পাথরটা হাল্কা করে। কিংবা··

যন্ত্রের মত রুণু ওর ব্যাগ ছুঁল, যন্ত্রের মত কিছু না ভেবেই ওর টেবিলের দেরাজের চাবিটা বের করল।

এক নিমেষের জন্যে কি যেন ভাবল, তারপর চাবি লাগিয়ে ও হঠাৎ ওর সুখের দেরাজ খুলে বসল।

ওর এতদিনের টুকরো টুকরো সুখের দেরাজ। একটু একটু করে পাওয়া আনন্দের স্মৃতির দেরাজ। আমরা, একালের আমরা তো কোনদিনই পূর্ণতাকে পাব না। আমি কিংবা অরুণ, নন্দিনী কিংবা বিরাম, কেউ না, কেউ না। আমাদের মধ্যে কোন আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই। আমরা তো কিছুই পাব না, শুধু কুড়িয়ে কুড়িয়ে চলেছি। দিব্য কিংবা অয়ন কিংবা অরুণ। যা কিছু চেয়েছি, এখনই, এখনই। যা কিছু পাব খণ্ড খণ্ড। রুণু ভেবেছিল, তা নিয়েই বুঝি

বাঁচা যায়। সকলেই তাই ভাবছে, একালের সকলে।

সব ভুল, সব ভুল। টুকরো টুকরো সুখ নিয়ে বুক ভরে না। গোটা জীবনটাকে কোনদিনই আর ছুঁয়ে দেখা হয় না। জীবনকে অনুভব করা যায় না।

ধীরে ধীরে দেরাজটা—রুণুর টেবিলের সেই নিজস্ব দেরাজ—রোমাঞ্চের আনন্দের দেরাজ টেনে বের করল ও।

অসংখ্য টুকরো টুকরো কাগজ, খামের চিঠি, রঙিন খাম, সেন্টের গন্ধ, ছোট ছোট জিনিস, একটি একটি স্মৃতি, একটি একটি সুখ। সেগুলোর ওপর অন্ধের মত হাত বুলিয়ে গোটা জীবনটাকে অনুভব করতে চাইল রুণু। মৃতপুত্রের শবদেহের ওপর শোকার্ত মায়ের হাতের মত রুণুর হাত থরথর করে কাঁপল। কিন্তু কই···চোখ ঠেলে জল এল···রুণু একজনকেও ছুঁতে পারছে না, একটি সুখকেও অনুভব করতে পারছে না। সমস্ত ভালবাসা মরে গেছে, সমস্ত সুখ হারিয়ে গেছে।

সেই চুলের রিবনটায় হাত ঠেকল। কে দিয়েছিল, কোথায় পেয়েছিল, মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না ওর সঙ্গে কোন আনন্দ জড়িয়ে ছিল কিনা। সেই বোনার কাঁটা দুটো এখন শুধুই কাঁটা হয়ে গেছে। ইস্কুলের নিভা দিদিমণি ওকে ভালবাসত ! কেউ ভালবাসে না, ভালবাসেনি। অনুরাধার দাদার সেই বোকামি-ভরা চিঠি, 'আমি তোমার চেয়ে সুন্দর দেখি নাই'—চিঠিটা অর্থহীন, রুণুর মধ্যে আজ আর কিছুই সুন্দর নেই। ও কোনদিন সুন্দর ছিল না। ভালবাসাই মানুষকে সুন্দর করে, রুণুকে কেউ কোনদিন ভালবাসেনি। অন্ধের মত ঝাপসা দেখছে রুণু, দুচোখ জলে ভরা। অন্ধের মত সব টুকরো টুকরো সুখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল। দিব্যর ছোট্ট চিঠি, অয়নের দু লাইনের কবিতা, তারের ম্যাজিক একটা। সেই ছোটবেলায় রথের মেলায় কিনেছিল। তারের ম্যাজিকের মতই দুটি মানুষ বন্ধ দরজা দিয়েও ভেতবে ঢোকে। আগল দিয়েও আটকে রাখা যায় না। কিন্তু মানুষ তো মনের ঘর থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। তারের ম্যাজিক, রঙিন রিবন, বোনার কাঁটা এ-সবের আর কোন দাম নেই। চিঠি, কবিতা, রঙিন পালক···

যত্ন করে রাখা সেই রঙিন পালকের খাম, খামে ভরা সেই রঙিন পালকটা হাতে ঠেকল। ঘন নীল আর আকাশী নীলে মেশামেশি সেই রঙিন পালকটা এর মধ্যে মুখ বুজে পড়ে থেকে থেকে বিবর্ণ হয়ে গেছে। রঙ হারিয়েছে।

আমাদের জীবনে কোন রঙ নেই, রুণু ভাবল। রঙিন পালকটা বের করে ছুঁয়ে দেখল। না, কোন অনুভূতি নেই। বালিশে আঙুল বুলিয়ে অরুণের নাম লিখে শুয়ে থেকেও মনে হবে অরুণ দূরে চলে গেছে।

অরুণের চিঠি, কত কত কান্না, প্রার্থনা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল রুণু। কিন্তু অরুণকে আজ আর ছুঁতে পারল না। সব রঙ মুছে গেছে, তার কান্না শুনতে পাচ্ছে না, তার ভালবাসাকে খুঁজে পাচ্ছে না।

ডুকরে কেঁদে উঠল রুণু। চোখ বেয়ে গাল বেয়ে নিঃস্বতার বিন্দুগুলো দুঃখের সমুদ্র হয়ে গেল। টুকরো টুকরো সুখ, একটি একটি আনন্দের স্মৃতি আজ রুণুর কাছে একটা বিরাট দুঃখ। একটি একটি সুখ কুড়িয়ে নিতে গিয়ে আমরা সকলেই হয়তো বিরাট দুঃখের মধ্যে ডুব দিচ্ছি।

দেরাজের সব টুকরো টুকরো জিনিস, কাগজের টুকরো, সযত্নে জমিয়ে রাখা খামে-ভরা সিনেমার টিকিটের ছিন্ন অংশগুলো---সব, সব ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল রুণু। চিঠি—দিব্যর চিঠি, অয়নের চিঠি, অরুণের চিঠি, অনুরাধার দাদার স্তাবকতা—ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল।

রুণু সমস্ত সুখ, সমস্ত স্মৃতি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল ; তারপর বুকে চেপে বারান্দার

রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। বারান্দার রেলিঙ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে উড়ন্ত পাখির খসে-পড়া পালকের মত সেই টুকরো টুকরো স্মৃতিকে বিষাদের হাওয়ায়, রাত্রির আলোজ্বলা অন্ধকারে উড়িয়ে দিল। টুকরোগুলো পাখির পালকের মত আলোয়-অন্ধকারে ঝিকমিক ঝিকমিক করতে করতে উড়ে গেল।

—কি হয়েছে রুণু? কাঁদছ কেন? মামীমার স্নেহের হাত ওর পিঠে।

রুণু মুখ তুলল না। বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ও কাঁদল, কাঁদল, কাঁদল।

□

ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ, আজ আপনারা যাঁর অভিনয় দেখতে এসেছেন, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, তিনি আজ অনুপস্থিত। তাঁর নির্দিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করবেন নতুন একজন।

অরুণ সেই ভূমিকায় অভিনয় করে গেছে, ও জানতেও পারেনি এ নাটকে ওর কোন ভূমিকা ছিল না।

—কখনও মিউজিক্যাল চেয়ার খেলেছিস টিকলু? আমরা সবাই গোল হয়ে ঘুরছি, ঘুরতে ঘুরতে একবার সুযোগ পেলেই বসে পড়ছি: তখনকার মত মনে হয় ঐ চেয়ারটাই বুঝি আমার। কিন্তু আমাদের জন্যে কোথাও কোন চেয়ার নেই, আমাদের জন্যে কোথাও কোন ভূমিকা নেই। আমরা সবাই ফালতু।

স্টেজের ওপর উঠতে পেয়েছিল অরুণ। স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে ও নাটকীয়ভাবে সংলাপ আউড়ে গেছে, কিন্তু কেউ ওর কথা বুঝতে পারেনি। কারণ, মানুষ কথা বলতে পারে না, কারও কথা বুঝতে পারে না। কিংবা প্রত্যেকেই এক একটা অদ্ভুত ল্যাংগুয়েজে কথা বলে।

অরুণের কথা কেউ বুঝতে পারেনি, অরুণকে কেউ বুঝতে পারেনি। তাই ওকে নেমে আসতে হয়েছে স্টেজ থেকে। অরুণ ফালতু হয়ে গেছে।

সংসারের কাছে বাবা। বাবাকে কেউ বুঝতে পারল না। এখন বাবা চুপচাপ একা বসে থাকে, একা নিঃসঙ্গ। কেউ বড়ো একটা কথা বলে না, কারণ বাবার কথা কারও ভাল লাগে না। এ যুগের কোন কিছুই বাবার ভাল লাগে না। অরুণ এক একদিন দেখেছে, বাবার দুঃখ অনুভব করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ও জানে না, ও বাবার সঙ্গে কি কথা বলবে। বাবা চুপচাপ একা একা বসে থাকে। কোন কোনদিন পুরনো কাগজের দলিল-দস্তাবেজের বাণ্ডিল খুলে বসে। কোন কোনদিন আলমারি খুলে মার শাড়ি শাল জামাকাপড় বের করে রোদ্দুরে দেয়, তারপর আবার গুছিয়ে ন্যাপথলিন দিয়ে তুলে রাখে। এক একদিন মাঝরাত্রে ঘুমের মধ্যে বাবা কেমন একটা শব্দ করে ওঠে। একটা চাপা কষ্ট শব্দ হয়ে বের হয়।

—আমরা সবাই ফালতু রে টিকলু, সবাই ফালতু।

টিকলু পলিটিক্স করতে গিয়েছিল, সেখানেও ফালতু হয়ে গেল। সুজিত পি. ফর্ম. পাসপোর্ট পেয়ে গেছে, দুদিন বাদেই চলে যাবে। এখানে ওর জন্যে কোন চেয়ার নেই।

ওরা 'কোজি নুকে' বসে ছিল। এখনই আবও খদ্দের এলে এই চেয়ারগুলো ছেড়ে দিতে হবে। ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়ম দিতে গিয়ে এক একদিন লিফটে জায়গা পায়। এক একদিন লিফট্‌ম্যান বলে, ব্যস, ব্যস, আর জায়গা নেই। অরুণ এখন আর রাগ করে না, এখন অপেক্ষা করে।

কিন্তু রুণুর জন্যে অপেক্ষা করেও হয়তো আর লাভ নেই। অরুণ ভাবল, ভেবেছিলাম

একটু একটু করে অনেক কিছু পেয়েছি, পাব। কিছুই পাইনি, কিছুই পাইনি। টুকরো টুকরো করে কিছুই পাওয়া যায় না। ভেবেছিলাম, যার কাছ থেকে যা পাওয়া যায়—রুণুর কাছ থেকে প্রেম, ঊর্মির কাছে থেকে বন্ধুত্ব

টিকলু শরীরের মধ্যে ভালবাসা খোঁজে, অরুণ ভালবাসার মধ্যে শরীর চেয়েছিল।

বুকের মধ্যে অসহ্য কষ্ট, তবু ফুটপাতের চলমান সুশ্রী মেয়েটির দিকে চোখ গেল. অদ্ভুত চটক আছে মেয়েটার মধ্যে। এক একবার মনে হয়, অতৃপ্তি থেকে বাঁচবার একটাই উপায়, নতুন কোন অতৃপ্তিতে ডুবে যাওয়া।

সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় অরুণ দেখেছে. বাবা বারান্দায় শতরঞ্জি বিছিয়ে বসে, সামনে একরাশ বাবলার বীজ। কোত্থেকে এক রাশ বাবলার বীজ কিনে আনিয়েছে, এখন বসে বসে ছুরি নিয়ে বীজগুলোকে পরিষ্কার করছে। এই বর্ষায় বিরাটির সেই জমির চারপাশে বাবলার বীজ পুঁতে দেবার ব্যবস্থা করেছে। চারপাশে বাবলার বেড়া দেবে. গাছ লাগাবে, গাছ।

আমরা সবাই গাছ, চারপাশে বাবলাকাঁটার বেড়া।

—ভাল লাগে না, বাড়িতে ভাল লাগে না। মনে হয় দমবন্ধ হয়ে মারা যাব। বিরাম ক্ষোভের সঙ্গে বলল, বিয়ে হল চার দেয়ালের ঘর।

—আর প্রেম সে-ঘরের জানলা নাকি রে? টিকলু রসিকতা করলে।

বিরাম সায় দিল, যে ঘরে জানলা নেই সে-ঘরে বাঁচা যায় না।

টিকলু হেসে বললে, পটাপট জানলা খুলে নিলেই তো হল। ও তো টাকার মামলা. টাকা থাকলেই পটাপট জানলা খুলে যাবে।

প্রেম কি—টিকলু তা জানে না। কিংবা জানে। অরুণের হঠাৎ মনে হল. সেজন্যেই ও প্রেমের দিকে চোখ ফেরাতে চায় না। সেজন্যেই ওর প্রেম জানলা বন্ধ করে।

অরুণ ভাবল, প্রেম পৃথিবীকে ভালবাসতে শেখায়। প্রেম এসেছিল বলেই ও বেখাপ্পা পৃথিবীকে শুধরে দিতে চেয়েছিল, সুন্দর করতে চেয়েছিল। ওকে কেউ রাস্তা বাতলে দিল না। নেতারা শুধুই ওদের হাত তুলতে বলে, হাতছানি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে ডাকে না। ডাকলে অরুণ নিশ্চয় এগিয়ে যেত।

কিন্তু এখন ও আবার পৃথিবীটাকে ঘৃণা করতে শিখেছে। নিমগাছটায় এখন আর কোন রূপ নেই, রস নেই। নিমফুলের সুগন্ধ চলে গেছে,এখন শুধুই তিক্ততার পাতায় ভরে আছে গাছটা। অরুণ নিজে।

ধীরে ধীরে ও বিরামকে বললে, ঊর্মির বিয়ে, আসছে শনিবার।

টিকলু ক্ষোভের সঙ্গে বললে. শালা মাইনিং এঞ্জিনিয়ারের ফুর্তি,আমাদের মাইরি খরচ। বিয়ে মানেই খরচ।

নিমন্ত্রণের চিঠি নিয়ে একেবারে বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল ঊর্মি। —ওর কি দোষ রে অরুণ, জীবনটাকে তো খাপছাড়া করে দেওয়া যায় না। ও বলে, সব কিছুরই একটা প্ল্যান আছে। তারপর তৃপ্তিতে চোখ ছোট ছোট হয়ে গিয়েছিল ঊর্মির। —বিশ্বাস কর, মাইনিং এঞ্জিনিয়ার আমাকে ভীষণ ভালবাসে।

অরুণের মনে হয়েছিল, আসলে ঊর্মিই মাইনিং এঞ্জিনিয়ারকে ভীষণ ভালবাসে। রুণু ওকে একটুও ভালবাসত না।

—ঊর্মিদি দারুণ সুইট রে দাদা, চেহারাটা লাভলি। ঊর্মি চলে যাওয়ার পর মিলু বলেছিল।

বাবা বলেছিল, মেয়েটি বেশ।

আসলে বাড়িটা এখন একদম বদলে যাচ্ছে। মা চলে যাওয়ার পর সব বেড়া ভেঙে

গেছে। বাবা নতুন করে বেড়া দেবার চেষ্টা করলেও থাকবে না।

উর্মিকে ওদের ভাল লেগেছে, বাবার, মিলুর। সকলে বাইরেটাই দেখে। সব শুনলে আঁতকে উঠত। অথচ অরুণ জানে, তারও আবেকটা ভিতব আছে, আতঙ্কের কিছু নেই।

এদিকে চাকরিতে জয়েন করার পর অরুণের আরেক লজ্জা। সব সময়ে সঙ্কোচ। এতদিন বেকার বলতে লজ্জা ছিল, এখন মাইনের অঙ্কটা। টিকলু-সুজিতদেবও বাড়িয়ে বলেছে, অনেক বাড়িয়ে।

টিকলু বলেছিল, সত্যেনকে মনে আছে? ওব বাবা প্ল্যান কবে ছেলেকে মানুষ করেছেন। বি. ই. পাস করে চাকরি পেল, এখন ছাঁটাই হয়ে গেছে। এখন ও ফালতু'

রুণুর কাছেও অরুণ ফালতু। কারণ রুণু হয়তো অরুণের মধ্যে অয়নকেই খুঁজেছিল।

অরুণ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। —টিকলু যাবি?

রুণুর কথা মনে পডলেই অরুণেব বুকেব মধ্যে অসহ্য কষ্ট হয। রুণু ওকে বার বাব অপমান কবেছে। রুণুর কাছে ওর এখন আব কোন দাম নেই।

টিকলু হঠাৎ বললে, প্রেসটা কিছুতেই দেখাশোনা করতে দিচ্ছে না, দিলে বাবাব চেয়ে ভাল চালাতাম। বাবা মাইবি আমাকে একটুও বিশ্বাস করে না। আমি যেন বাইরেব লোক।

অরুণ আপিসে নতুন ঢুকেছে, সেখানেও ও যেন স্ট্রেঞ্জাব। একটা ফালতু লোক হঠাৎ ঢুকে পড়েছে। মিউজিক্যাল চেয়ারেব একটা খালি পেয়ে বসে পডেছে। কেউ ওকে আপন ভাবে না। যেন বাইবের লোক, ওব কোন যোগ্যতা নেই।

আজ ছুটিব দিন। আজ নিশ্চয় রুণু বাড়ি আছে। সব অপমান সহ্য করে আজ আবাব একবার চেষ্টা করে দেখলে হয।

অরুণ বললে. টিকলু যাবি?

—কোথায়?

অরুণ দীর্ঘশ্বাসের স্বরে বললে, যদি ফোন আসে।

টিকলু বললে, আমার কি ফয়দা, আমাকে তো কেউ ফোন কবে না।

অরুণের ইচ্ছে হল বলে, আমাকেও না। কিন্তু বলতে পাবল না। বলতে পাবছে না. সেও তো যন্ত্রণা। ওবা রসিকতা করে, ওবা কথায় হিংসে ফোটায়। অথচ নিত্যদিন সুজিত আব টিকলুব কাছে ভাব দেখাতে হয. অরুণ ঠিক আগেব মতই স্টেজেব ওপব দাঁড়িযে আছে।

সেই যেদিন—শেষ দিন—সিনেমাব ছেঁড়া টিকিট দুটো রুণুকে দিতে গেল, আব রুণু বললে 'কি হবে' সেইদিনই প্রেম মবে গেছে। তবু প্রেমেব সেই শবদেহটার মাযা ছাড়তে পাবছে না অরুণ। ও জানত না. কখন নিজেবই অজান্তে অযনেব সিটে বসে পড়েছিল। আপিসেও স্বস্তিতে বসতে পারে না, কেবলই মনে হয় কেউ এসে বলবে, এই ওঠ, ওঠ, এটা তোব চেয়ার নয।

না, বহুদিন থেকেই ওব ভয়, ওব অবিশ্বাস। যেদিন প্রথম 'অযন' নামটা শুনেছিল।

ডাঃ রুদ্র কি চিনতে পেরেছিলেন। কিছু বলেছেন? বাঃ. তাহলে জন্মদিনে এল কেন রুণু, এসেও কিছু জিজ্ঞেস কবল না কেন।

এতই অবিশ্বাস যদি, তাহলে আব ভালবাসা কিসেব। যদি সত্যিই উর্মিব সঙ্গে ওব প্রেম ভালবাসা থাকত··· তুমি সদাসর্বদা অয়নকে মনেব মধ্যে বাখোনি? তুমি সবল হাসি দিয়ে বলো, 'অয়নের সঙ্গে দেখা হল'। যেন ওব মধ্যে কোন অন্যায নেই। যেন অরুণ কিছুই বোঝে না, ও একটা নির্বোধ।

ভাবতে গেলেই সমস্ত শবীর রাগ হয়ে যায়। আবার এক এক সময মনে হয়, আমাদেব যুগটাই তো এই। পুরনো ধ্যানধাবণা ছাডতে পাবছি না, নতুন সংস্কাব গড়ে উঠতে চাইছে।

অতীত আর ভবিষ্যৎ যেন গামছার মত নিঙড়ে দিচ্ছে বুকটাকে। অরুণের একটুও ইচ্ছে করে না রুণু অন্য কারও সঙ্গে বন্ধু হয়ে যায়, কারও সঙ্গে হেসে কথা বলে। ও চেয়েছিল, রুণু ওর একার থাক। অথচ, বা রে, ওর নিজেরও তো উর্মি বন্ধু, যে-কোন একটা মেয়ে এগিয়ে এসে আলাপ করলে, ও খুশি হয়ে উঠবে। তবে ?

রুণু উর্মিকে সহ্য করতে পারেনি, অরুণ সহ্য করতে পারছে না অয়নকে। অথচ ওরা আজকের জীবনে এসে গেছে, সরিয়ে দেবার উপায় নেই।

অরুণের এক একদিন অসহ্য শূন্যতার মুহূর্তে মনে হয় রুণুকে সব বলে ফেলে বুক হাল্কা করে নেবে।

ওর মুখ দেখে টিকলু একদিন বলেছিল, কি রে, কেটে গেছে নাকি ? রুণু কি ভোকাট্টা হয়ে গেছে ?

সুজিত হেসেছিল। —ভাল করে আরেক দিন আলাপও কবালি না। আগলে আগলে রেখে লাভ হয় না গুরু, কোথাও না কোথাও নেপো একজন আছেই।

টিকলু বলেছিল, গোলি মারো রুণুয়াকে, নতুন একটা ধর। ও থাকে না রে থাকে না।

অরুণ কি আর করবে, বুকের মধ্যে কষ্ট চেপে মুখের ওপর হাসি ছড়িয়েছে।

দিনের পর দিন আশায় আশায় কাটিয়েছে টিকলুদের প্রেসে টেলিফোনটার কাছে বসে। যদি ফোন আসে, যদি ফোন আসে। আসেনি। নিজে ফোন করবে ভেবেছে কখনও, পরক্ষণেই ভয় এসে ওর কণ্ঠনালি চেপে ধরেছে। যদি ডাঃ রুদ্র কিছু বলে থাকেন !

দুপুরে ফোনটার কাছে গিয়ে বসলেই কম্পোজিটারদের কেউ এসে গল্প জুড়ে দেয়। সারা গা চিড়বিড় করে, বিরক্ত হয় অরুণ। কিন্তু বলতে পাবে না। দুঃখের মধ্যে ও একা হতে চাইছে, কেউ একা থাকতে দেবে না।

একদিন টিকলু ছিল। ফোন না আসার যন্ত্রণা, তার ওপর টিকলুর সামনে আরেক লজ্জা। ও হয়তো ভাববে, রুণু ওকে ছেঁটে দিয়েছে, ও নিজেই শুধু জ্বলে মরছে রুণুর জন্যে ; টিকলু ভাববে, অরুণ একটা পাগল, রুণুর কাছে অরুণের কানাকড়িও দাম নেই।

মাঝে মাঝেই অরুণের ইচ্ছে হয়েছে ও নিজেই ফোন করবে। বলবে। সব কথা বুঝিয়ে বললে কি আর···একবারটি শুধু দেখা করতে চায় ও। একবার।

শেষ অবধি নিজেই ডায়াল কবল অরুণ। রুণুর গলা চিনতে পেরেই অরুণের মুখ উজ্জ্বল হল, পরক্ষণেই পোড়া কাগজের মত কালো। অরুণের গলা চিনতে পেরেই রিসিভার নামিয়ে দিল রুণু।

—কি রে, কি হল ? অরুণের মুখ দেখে টিকলু জিজ্ঞেস করল।

—কেটে গেল।

আর কিছু বলতে পারেনি অরুণ। ওর সমস্ত মুখ তখন লজ্জায় আত্মহত্যার মত বিবর্ণ।

আরেক দিন বাসে যেতে যেতে হঠাৎ দোতলার সিঁটি থেকে নীচে রাস্তায় রুণুকে দেখতে পেল অরুণ। কলেজ স্ট্রীট থেকে ইউনিভার্সিটির পাশের গলি-রাস্তাটায়। প্যারীচরণ সরকার স্ট্রীট না কি যেন—ঢুকছে রুণু। সঙ্গে কে একটি চটপটে চেহারার ছোকরা। অয়ন বোধ হয়। কিংবা অন্য কেউ।

হুড়মুড় করে বাস থেকে নেমে পড়ল অরুণ। বিভ্রান্তের মত ও তাকিয়ে রইল, দেখল দিব্যি হাসাহাসি করতে করতে ওরা হেঁটে চলেছে। একবার বুঝি ছেলেটি রুণুর পিঠে হাত দিয়ে ফুটপাতের দিকে সরিয়ে দিল।

অরুণ কাগজে পড়েছে, ওর মনে হল ঠিক তেমনি করে ওর সমস্ত শরীরে পেট্রোল ঢেলে কেউ একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে দিল, এমনি জ্বালা।

উদ্‌ভ্রান্তের মত অরুণ ওদের পিছনে পিছনে হেঁটে চলল, ঈষৎ দূরত্ব রেখে। চোখ ঠেলে

জল আসা কান্নায় ও প্রার্থনা করলে, রুণু তোমাকে আমি সমগ্রভাবে চাই না। আমাকে ঈর্ষা নিয়ে, টুকরো টুকরো সুখ নিয়ে, তোমার ভালবাসার একটুখানি অংশ নিয়ে আমাকে বাঁচতে দাও। আমি অয়নকে সহ্য করব, দিব্যকে সহ্য করব, সহ্য করতে করতে জ্বলব আর জ্বলব, তুমি আমাকে একটু সহ্য করো।

অরুণ কি এগিয়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াবে, ডাকবে, কথা বলবে!

হঠাৎ রুণু তাকাল। অরুণকে দেখল। কয়েক পা হেঁটে আবার ফিরে তাকাল, আর সে চোখে অরুণ দেখল শুধু ঘৃণা আর ঘৃণা। অরুণ যেন একটা ভয়ঙ্কর দস্যু, একটা বীভৎসতা, এমনি ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল রুণুর চোখেমুখে। ফিসফিস করে পাশের ছেলেটিকে কি যেন বলল। সেও ফিরে তাকাল, প্রতিবাদের চেহারা নিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল।

অরুণ, তুই খুব লাকি!

তাড়াতাড়ি বাঁ দিকেই ইউনিভার্সিটির গ্যেট দেখতে পেয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল অরুণ। একরাশ লজ্জার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। ওর দু চোখ তখন জলে ভরে গেছে। বেদনায়, অপমানে। একটা তক্ষক তখন ওর ফুসফুস পাঁজর হৃৎপিণ্ড কণ্ঠনালি সব কুরুর কুরুর করে চিবিয়ে খাচ্ছে।

রুণুকে, এই রুণুকে সম্পূর্ণ অচেনা মনে হল অরুণের। অরুণও রুণুর কাছে বোধ হয় অচেনা হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, আমরা গাছ। কিংবা গাছও নই, আগাছা। কথা বলতে পারি না, যা বলতে চাই বলতে পারি না। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি। বনের মত, ঝোপের মত। এক হতে পারি না। আমরা কাছাকাছি থেকেও পরস্পরের অচেনা। কেউ কাউকে বুঝি না। লোকে বলে, সমাজ সংসার প্রেম বিবাহ। সব মিথ্যে। আমরা সব সময়েই একা, প্রতিটি মুহূর্ত।

মানুষ সব সময়ে একা, মানুষ শুধু নিজের সঙ্গে কথা বলতে পারে।

সেদিনের কথা মনে পড়তেই দেয়ালে টাঙানো মার ছবিটার দিকে তাকাল অরুণ। মা, আমার বুকের ওপর তুমি একটু হাত বুলিয়ে দাও। মার ছবিটায় আজ কে একটা মালা পরিয়ে দিয়েছে। হয়তো মিলু। রুণুর মামীমার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার দিন রুণুকে অরুণ জুঁইফুলের বেশ বড় একটা মালা দিয়েছিল। বাড়ির গলিতে ঢোকার আগে রুণু খোঁপা থেকে মালাটা খুলে হাতে রেখেছিল। তারপর কখন সেটা হাত থেকে টুপ করে ফেলে দিয়েছিল। নোংরা ড্রেনের মধ্যে।

জুঁইফুলের সেই মিষ্টি গন্ধটা যেন এতদিন বাদে আবার নাকে এসে লাগল।

—দাদা, কে তোকে ডাকছে। একটা মেয়ে। মিলু ছুটতে ছুটতে এল। হাসতে হাসতে বললে, তোর কত মেয়ে বন্ধু রে দাদা!

অরুণ চমকে উঠল। কে আর হবে, ঊর্মি বোধ হয়। ওর তো বিয়ে আব দিন কয়েক পরেই। কিংবা নন্দিনী। ওকে অরুণ বহুকাল দেখেনি। অরুণের হঠাৎ ইচ্ছে হল, যেন নন্দিনী, নন্দিনীই হয়। নন্দিনীর মধ্যে কোথাও যেন রুণু মিশে আছে।

অরুণ দরজার কাছে এসে এক মুহূর্তেই ফুল-ফোটানো তুবড়ি হয়ে গেল। অন্ধকারে হাজার হাজার রুপোলি তারার মত।

দিদি নেই, বসবার ঘরখানা খালি।

রুণু দাঁড়িয়েই ছিল।

রুণুর দুচোখে তখন পোখরাজ দুলছে। অরুণের চোখ তা দেখতে পেল না। রুণুর মুখ তখন ওর কাছে ঝাপসা হয়ে গেছে।

—পারলাম না, আমি পারলাম না। বুকফাটা আর্তনাদের মত রুণুর মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল।

অরুণ ধীরে ধীরে বললে, বলব, সব বলব।

রুণু হাসল, গভীর কষ্টের হাসি। বললে, সব জানি, আমি সব জানি। তবু, সব জেনেও···ধরা গলায় বলে উঠল, পারলাম না, আমি পারলাম না।

কথা হারিয়ে গেল অরুণের। ও কোন কিছুই বলতে পারল না। তুমি কিছুই জানো না, রুণু, আমরা কেউ কিছুই জানি না ; অরুণের বলতে ইচ্ছে হল, আমরা কেউ কাউকে চিনি না, জানি না। আমরা শুধু পাশাপাশি থাকি, কথা বলতে পারি না।

বনের মধ্যে দুটি নিঃসঙ্গ গাছের মত ওরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। পাশাপাশি, কাছাকাছি। কিন্তু কেউ কোন কথা বলবে না, বলতে পারবে না। কেউ কারও ভাষা বুঝবে না। ওরা শুধু নিজের সঙ্গে কথা বলবে। সুখে দুঃখে ব্যথায় বঞ্চনায়। কখনও হয়তো একজনের শিকড় আরেকজনের শিকড় ছোঁবে।

বনের মধ্যে অনেক গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। চুপচাপ, নিঃশব্দ। ঝড় উঠলে মনে হয় তারা কথা বলছে। শুধু কথা। 'কোজি নুকে'র হট্টগোলের মত শুধুই আওয়াজ। কান পেতে শুনলে একটা কথাও বোঝা যায় না।

অভিমন্যু

একটা ক্লান্ত অন্যমনস্কতা এসময় অরিজিৎকে আচ্ছন্ন করে থাকে। হাঁটে, বসে, পোশাক বদলায়, কথা বলে, তেমন কৌতুককর কথা শুনে হাসেও, কিন্তু কিছুই মনে থাকে না। পরের দিন স্ত্রী বা মেয়ে প্রসঙ্গ টেনে মনে পড়াতে চাইলে অবাক হয়ে বলে, সে কি, কখন বললে ? শুনিনি তো ! ওরা সকলেই হেসে ওঠে। এতদিনে ওরা সকলেই জেনে গেছে অরিজিৎ মানুষটা কেমন আপনভোলা, রীতিমত অন্যমনস্ক। তাব জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা গর্বও ওদের না থাকার নয়। কিন্তু এই অন্যমনস্কতা শুধু এই সময়টাতেই।

মাথার ভিতরে সমস্ত কোষগুলো এ-সময় কেমন ভোঁতা ভোঁতা হয়ে যায়। হয়তো অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে। হয়তো এতক্ষণ ধরে একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে বসে থাকতে হয় বলে।

অরিজিৎ ব্যানার্জিকে এখন অনেকেই এক ডাকে চেনে। এই পঞ্চাশ বছর বয়েসেই। চল্লিশ পার করেও যে নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিল।

মেয়ে অঞ্জনার কথাগুলো প্রথমে অরিজিতের কানে যায়নি, কিংবা বলা যায় কানে গিয়েছিল দুর্বোধ্য শিলালিপির ওপর চোখ পড়ার মত। পাঠোদ্ধার করতে পারেনি। কয়েকটা পরিচিত শব্দ শুধু, যার নিহিত অর্থ পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। আসলে ঐ ক্লান্তি আর আচ্ছন্নভাবের বেশটা এ-সময়ে থেকেই যায়, মানুষটাই তখন যন্ত্রের মত কৃত্রিম।

অঞ্জনা দ্বিতীয়বার খুব উল্লাসের সঙ্গেই বললে, বাপি সত্যি বলছি, এইমাত্র টি ভি-তে শুনলুম। কি গ্র্যান্ড খবর, বলো বাপি ?

স্ত্রী পারমিতার মুখেব দিকে তাকিয়ে অবিজিৎ দেখল, তার মুখ আনন্দে হাসি হাসি।

পারমিতা অরিজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি ওকে কংগ্র্যাচুলেট করবে না ? অঞ্জু ডায়াল করে দেবে ?

টেলিফোন এতক্ষণ নীচে চেম্বারে ছিল। গোপাল রিসিভার তুলে এনে প্লাগপয়েন্টে লাগিয়ে সেটা ঝাড়ন বুলিয়ে মুছে দিয়ে চলে গেল। ওটা দেখেই পারমিতা বললে। অরিজিৎ ওপরে থাকলে এতক্ষণে নিজেও কংগ্র্যাচুলেশনস জানাত, হয়ত কাল সন্ধেবেলা খাবার নেমন্তন্নও জানিয়ে রাখত।

এ তো একটা অভাবনীয় সাকশেস। দীপঙ্কবের।

অরিজিৎ টি ভি দেখে না, দেখার সময় পায় না। সেজন্যেই খবরটা জানতে পারেনি।

অবাক হয়ে বললে, দীপঙ্কর ? দীপঙ্কর রায় ?

পারমিতা হেসে উঠে বললে, শুনছ কি তাহলে ? আমাদের দীপঙ্কর !

'আমাদের' কথাটায় পারমিতা হয়তো একটু বেশি জোর দিয়ে ফেলল, আর সেজন্যেই অরিজিতের কানে খট্ করে লাগল। চেনাজানার মধ্যে একজন নিশ্চয়ই, কিন্তু অরিজিৎ জানে মাঝখানে অনেকখানি দূরত্ব আছে। সেই দূরত্ব কেন তা নিজেই জানে না।

অরিজিতের দিনগুলো ব্যস্ততার মধ্যে কাটে, জীবনটাও। জীবনকে ও অনেক পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে গড়ে তুলেছে। ওর মধ্যে যতটুকু যোগ্যতার সম্ভাবনা ছিল সব উজাড় করে দিয়ে।

এখন নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য লাগে। বিলেত থেকে ফিরে এসে চাকরি নিয়ে কলকাতায় এক বছরও কাটেনি. মফস্বলে মফস্বলে ঘুরতে হয়েছে। শেষে অনেক চেষ্টাচরিত্তির করে কলকাতা। তখন ভাড়ার ফ্ল্যাট, ছোট্ট চেম্বার। দু-চারটে হঠাৎ রুগী,

বেশির ভাগ সময় কাটাতে হত বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করে, কিংবা উপন্যাস পড়ে।

তারপর কোত্থেকে কিভাবে যেন দিনগুলো বদলে যেতে শুরু করল। তখন রাতারাতি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে। চেম্বারে ভিড়। এখন আরও।

দক্ষিণে খুব সুন্দর একখানা বাড়ি বানিয়েছে, আধুনিক ডিজাইনের গ্রিল আর কাচ আর বে-উইন্ডো নিয়ে, বাইরে থেকে দেখলে, স্বপ্নপুরীর মত। ভিতরটাও। দামী মোজেক, প্রথম প্রথম তার মসৃণতায় পা হড়কে যেত। গোপাল একবার অনভ্যস্ত ভাবে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে আছাড় খেয়েছিল। এখন ঘরে ঘরে কার্পেট, কাযদার সিঁড়িতে দামী ডোরি। সবচেয়ে সুন্দর হল রাস্তার দিকের ব্যালকনি। রঙিন টবে ঝোলানো গাছ, কোনায় মানিপ্ল্যান্ট লতিয়ে উঠে সবুজের নকশা।

গৃহপ্রবেশে দীপঙ্করও এসেছিল। ফুর্তিবাজ ছেলে, হৈহল্লা কবে জমিয়ে রেখেছিল। অরিজিৎ ব্যানার্জির জীবনে সেও আরেক সাফল্যের দিন। সকলেই এই তিনতলা বাড়িটার এক একটা দিক নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিল। অরিজিৎ নিজেও তখন প্রচণ্ড খুশি। এ রকম পশ্‌ এরিয়ায় এত ভাল জমি পাওয়া যাবে তা যেমন ভাবেনি, তেমনই আর্কিটেক্টেব আঁকা নীল-সাদার জ্যামিতিক বেখাগুলো যে শেষ অবধি এত সুন্দব হয়ে উঠবে তা কল্পনাব বাইরে ছিল। সেই মুহূর্তে অরিজিতের মনে হচ্ছিল বাড়িটা তাব সাফল্যেব সার্টিফিকেট। বিলেতে যেদিন দুষ্প্রাপ্য ডিগ্রিটা হাতেব মুঠোয পেয়েছিল সেদিনও এত আনন্দ হয়নি, কাবণ ভবিষ্যৎ তখন অনিশ্চিত।

এখন তো পঞ্চাশ পাব হতে না হতে ভবিষ্যতের স্টেশনে পৌঁছে গেছে। এখন আবাম-কেদারায় শরীর এলিয়ে দিব্যি উপদেশ দেওয়া যায়, কোন্ ট্রেন ভালো, কিভাবে টিকিট আব রিজার্ভেশন পাওযা যায, কোথায লাঞ্চ, কোথায় ডিনাব, ডাইনিং কাবেব খাবাব ভাল কি মন্দ, সার্ভিস কেমন।

অতিবৃদ্ধ সেই সার্জেন চ্যাটার্জি এখন মারা গেছেন, বয়সেব দরুন সব চুল পাকা, পবিমিত মদ্যপানে রুপোর বেশমের মত ঝকঝকে, বার্ধক্যেব বসিকতায পারমিতাকে বলেছিলেন, নাও ইউ শুড বি দি হ্যাপিয়েস্ট ওম্যান। টাকা থাকলেও এই পজিশনে বাড়ি! তা হলে মিসেস ব্যানার্জি, জীবনে যা-কিছু পাওযার সবই তো পেযে গেলে। এর ওপব অরিজিতেব যা প্র্যাকটিস....রসিকতা কবে বলেছিলেন, হাসতে হাসতেই বলেছিলেন, আব একটাই শুধু অভাব এখন, ইউ নীড এ বোম্যান্টিক রোমিও। তাহলেই যোলকলা পূর্ণ।

সকলেই সশব্দে হেসে উঠেছিল।

পারমিতাকে দেখে বয়েস অনেক কম মনে হয়, শরীরের একটা বাঁধন আছে, পোশাকে আরও। সে হেসে ভুরু তুলে স্মার্ট ভঙ্গিতে বলেছিল, কেন, আপনি?

—গুড লর্ড। ছ ফুট লম্বা কৃষ্ণবর্ণ চ্যাটার্জি শ্রাগ কবে হতাশায় দু হাত ছড়িযে বলে উঠেছিলেন, ইট্‌স্ নট এ কমপ্লিমেন্ট। তুমি কি ভেবেছ বুড়ো হয়েছি বলে আমাব প্র্যাকটিস পড়ে গেছে? ও নো। তোমার স্বামীব মতই আমারও সময় নেই।

ওঁর ভাবভঙ্গি দেখে পারমিতাও হেসে গড়িয়ে পড়েছিল।

সময় সত্যিই নেই অরিজিতেবও। সকালে ভাল করে খববের কাগজেও চোখ বোলানো হযে ওঠে না।

হঠাৎ এক একদিন, নিজের ওপরই রেগে গিয়ে বলে ওঠে, আমি তো এখন শুধু টাকা রোজগারের মেশিন হয়ে গিয়েছি!

অবশ্য জানেন ওটাই আজকের দিনে সাকশেসের জয়তিলক। লোকে টাকা অকারণে দেয় না, অকারণে এসে তারা চেম্বারে ভিড় করে বসে থাকে না। রোগ সেরে যাওযার পর কাবও কারও চোখে কৃতজ্ঞতার যে আপ্লুত দৃষ্টি ও দেখতে পায়, তা সাময়িকভাবে হলেও

ওর বুকের ভিতরটা ভরাট করে দেয়। আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে।

কে যেন একবার বলেছিল, সবই লাক্ ব্যানার্জি, সবই কোষ্ঠীব ফলাফল।

শুনে অরিজিতেব মনে হয়েছিল যেন ওকেই অপমান কবা হচ্ছে। উপহাস করে জবাব দিয়েছিল, তাহলে অসুখে ট্রিটমেন্ট করাব কি দবকাব, ও তো আপনিই সেরে যাবে। স্টার ভাল থাকলে।

মুখে যাই বলুক, অরিজিতের একটা ভয-ভয় ভাবও আছে। ছিল না, আজকাল মাঝে মাঝে হয। নার্ভ? কি জানি।

লাক্ জিনিসটা সেই প্রথম জীবনে বিশ্বাস করত। প্র্যাকটিস শুরু কবার প্রথম দিকে। তারপর সাফল্যের দিকে ছুটে যেতে যেতে ভুলে গিয়েছিল। ওসব নিয়ে ভাবনাচিন্তার সময়ও ছিল না। ইদানীং মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়। কোন কোনদিন ভিজিটর্স শ্লিপের শেষ নম্ববটা দেখে নেয। কমল, না, বাড়ল। কদাচিৎ যদি পাঁচ-দশটি কমও হয, মনে মনে তার কারণ খুঁজে বেব কবে। মাসের শেষ, অথবা এই বর্ষায় কি কবেই বা আসবে।

আসলে সব সাফল্যেব মধ্যেই বোধহয এক ধবনেব আশঙ্কা লুকিয়ে থাকে। তখন অ্যাম্বিশন হিসেবনিকেশেব মধ্যে ধবা পড়ে গেছে। আরও দৌড়তে পাবব কিনা, পৌঁছনোর মত কোন জায়গা আছে কিনা, সে-সব তখন জানা হয়ে যায়। একটাই তখন প্রশ্ন, যেখানে আছি সেখানেই থাকব তো? সেটা শুধুই টাকা-আনাব প্রশ্ন নয। সম্মানেব প্রশ্ন। মর্যাদার প্রশ্ন।

সেই ভয়েই বেসবকাবী একটা নামী হাসপাতাল আব একটা-দুটো নার্সিং হোমেব সঙ্গে নিজেকে যুক্ত বেখেছে।

ডাক্তাব সরকার পি জি থেকে বিটাযাব কবাব বছব দুই বাদে হঠাৎ একদিন তাব সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল অবিজিৎ। চমকে উঠেছিল ধুলো-পড়া চেম্বাবেব চেহাবা দেখে। ভৌতিক নির্জনতায দুটি মাত্র রুগী। অথচ একসময দেখে গেছে তাঁব সেই চেম্বাব ভিড়ে ঠাসা।

যতই বয়েস হচ্ছে অবিজিতেব মনেও দ্বিধা দেখা দিচ্ছে। আমাব খ্যাতি, আমার যোগ্যতাই এই সাকশেসেব মূলে, নাকি ঐ হাসপাতাল, নার্সিং হোম, বন্ধুচক্র?

নাঃ, আমিই। আমাব ভবিষ্যৎ আমি নিজেই গড়ে তুলেছি। আমাব উপার্জনেব প্রতিটি কর্পদক আমাব পবিশ্রমের মূল্য। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার।

এ-সব ক্ষণিকেব ব্যাপাব, এত ধীবে-সুস্থে চিন্তা কবাব সময নেই অবিজিতের। সকালে উঠেই টেলিফোন টেলিফোন, প্রাত্যহিকতা, স্নান সেবে হেভি ব্রেকফাস্ট, নটাব মধ্যে হাসপাতাল। তারই ফাঁকে, পথে পড়লে দু পাঁচটা কল্ সেবে নেয়। কখনো দুপুবেও।

বাড়ি ফিবে সামান্য বিশ্রাম। তাবপব চাবটে বাজলেই নীচেতলাব চেম্বাবে নেমে আসে। গোপাল বিসিভাব খুলে নিয়ে নীচেব প্লাগপয়েন্টে লাগিযে দিযে যায। একসময বলে যায, বাবোটা শ্লিপ জমা পড়েছে। কোনও দিন, পনেরোটা।

কিন্তু চেম্বাবে গিযে বসতে না বসতে ভিড় বাড়তে থাকে। বেশিব ভাগই আসে অফিস ছুটিব পব। নটা সাড়ে নটার আগে ওর কিন্তু ছুটি হয় না। কোনও কোনও দিন বাত দশটা সাড়ে দশটা।

আজকাল প্রফেশনের বাইবে যোগাযোগও কমে গেছে। কোথায কি চলছে খববও পায় না, খবব জানার আগ্রহও কম। এর নাম সাকশেস।

যথাবীতি বিকেল চারটেব সময চেম্বাবে নেমেছিল। একটানা রুগীর পর রুগী দেখে গেছে, প্রথম দিকে ধীরে-সুস্থে, তাবপব শ্লিপ বাখাব ট্রে যত জমে উঠেছে, ততই দ্রুত। অবশ্য বোগবিশেষে। যেখানে প্রযোজন, সময দিতে কার্পণ্য করে না অবিজিৎ। জীবনে

টাকাই সব নয়। একটা দুরূহ রোগ সারিয়ে তোলার মধ্যে যে আনন্দ, হ্যাঁ এখনও পায়, তা প্রচুর টাকা অথবা এই সুদৃশ্য বাড়িটাও দিতে পারেনি।

এরই ফাঁকে দু একজন বন্ধু ডাক্তার কখনো এসে পৌঁছয়, কিংবা পরিচিত অথবা প্রভাবশালী কেউ। তাদের জন্যে একটু বেশি সময়ই দিতে হয়, বুঝতেও পারে, বাইরে অপেক্ষমাণ রুগী অথবা রুগীর আত্মীয়রা অধৈর্য হয়ে উঠছে, চটে গিয়ে দু একটা কটুকাটব্য করছে। কিন্তু অরিজিৎ নিরুপায়। সব দিক সামলেই তো চলতে হবে। এরই ফাঁকে কোনও দিন কোনও মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এসে হাজির হয়। নিজের স্বার্থেই তাকেও সময় দেয়। রুগী ঘরে থাকতে থাকতেই বেল বাজায়। অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতেই থাকে রুগীরা। মুখে বলতেও পারে না, এবার আসুন। নিজেরা এতক্ষণ অপেক্ষা করে থেকেও খেয়াল রাখে না বাইরে আরও অনেকে অপেক্ষা করছে। অতএব ঐ বেল বাজানো। গোপাল বেল শুনে ভিতরে এলেই তার হাতে একটা স্লিপ তুলে দিয়ে দেয়। স্লিপের রুগী নাম ডাকার আগেই চলে এসেছে। এসব ব্যাপারে ওরা নিজেরাই ঠিক হিসেব রাখে কে কার পরে।

সমস্ত রুগী বিদেয় হওয়ার পরই একটা ক্লান্তি নেমে আসে। বেশ বুঝতে পারে, এতক্ষণ নিতান্তই নেশার ঘোরে কাজ করে গেছে। মানসিক এবং শারীরিক দুটো পরিশ্রমই ওকে ক্লান্ত করে দেয়। এই ক্লান্তির মধ্যেই স্লিপগুলো গুছিয়ে তুলে রাখে অরিজিৎ, কাঠের ক্যাশবাক্সের ডালা খুলে একবার দেখে। নোটের তাড়া উপচে পড়ছে। এবার সেটা বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে গোপালকে ডাকে।

দু হাতে ক্যাশবাক্সোটা গোপাল দোতলায় নিয়ে যায়। অরিজিৎ ক্লান্ত পা টেনে টেনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে, তার পিছনে পিছনে।

টাকা মাটি, মাটি টাকা ওসবের আর কোন খোঁজই রাখে না অরিজিৎ। গোপাল বাক্সোটা নিয়ে গিয়ে পারমিতার সামনে টেবিলে রেখে দেয়। তারপর রিসিভারটা প্লাগপয়েন্ট থেকে খুলে ওপরে নিয়ে আসে। অবশ্য আরেকটা টেলিফোন আছে, সেটা দোতলাতেই থাকে। শোবার ঘরে। কিন্তু তার নম্বরটা ডাইরেক্টরিতে ছাপা নিষেধ। ওটা ব্যক্তিগত।

স্নান সেরে এসে খাবার টেবিলে বসল অরিজিৎ। কোন গুরুতর কেস থাকলে, এ-সময় আবার হসপিটালে একটা চক্কর দিয়ে আসতে হয়। বড় গাড়িটা বের করে ড্রাইভার শিউলাল বসে আছে ফটকের সামনে। ওটা ইম্পোর্টেড। বড় গাড়ি মানেই বড় ডাক্তার। অন্তত রুগীদের তাই ধারণা। ছোট গাড়িটা দিশি, ওটা দু তিন বছর অন্তর বদলায়। ইনকাম ট্যাক্সে ডিপ্রিসিয়েশনের রেহাই মেলে। গায়ে আঁচ লাগে না।

খাবার টেবিলে বসে দু হাতে রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে মেয়ে অঞ্জনাকে বললে, শিউলালকে বলে দে, গাড়ি তুলে দিতে। আজ আর হসপিটালে যাব না।

অঞ্জনা উঠে গেল, ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ওখান থেকেই বলে দেবে।

অরিজিৎ এবার পারমিতার দিকে না তাকিয়েই জিগ্যেস করল, হ্যাঁ, দীপঙ্করের ব্যাপারটা কি ভাল করে শুনলামই না।

পারমিতা চোখ তুলে তাকাল, অরিজিৎকে একটুক্ষণ দেখল। আশ্চর্য মানুষ। সবই তো বলা হয়েছে, অথচ কিছুই শোনেনি। এদিকে পারমিতার খুব খারাপ লাগছিল, দীপঙ্করকে ফোন করে অরিজিৎ কংগ্র্যাচুলেশনস জানাল না বলে। ওর নিজেরই ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সে তো আরও খারাপ দেখাবে। অরিজিতের মুখ থেকে শুনতেই তো তার ভাল লাগার কথা। বিশেষ করে অরিজিতের মত একজন টপ প্র্যাকটিশনারের মুখ থেকে।

অঞ্জুকে বেশ মিহি মোলায়েম সুরে কথা বলতে শিখিয়েছে পারমিতা, যদিও নিজে সেভাবে বলতে পারে না। অরিজিৎ ঠিক জানে না, হয়তো অঞ্জু নিজেই শিখেছে কলেজের

কোন বন্ধুকে দেখে। এসব দেখার চোখ নেই ওর, সময়ও নেই। কিন্তু অঞ্জু যখন ফোন ধরে, অথবা কারও সঙ্গে কথা বলে, বেশ লাগে অরিজিতের। 'কে বলছেন ?' 'কি বলতে হবে বলুন।' কিংবা 'ডক্টর ব্যানার্জি এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন' জাতীয় শেখানো কথাগুলো ও সেই ইস্কুলের বয়েস থেকেই কেমন গলে পড়া আইসক্রিমেব মত মোলায়েম গলায় বলে, বড়ো ভাল লাগে।

শিউলালকে গাড়ি তুলে দিতে বলে অঞ্জু ততক্ষণে খাবার টেবিলে ফিরে এসেছে। এসেই বললে, তোমার কিন্তু খুবই অন্যায় হয়ে গেছে বাপি।

অরিজিৎ ভুরু তুলে মেয়ের মুখের দিকে তাকাল, বেশ একটা আদরের ভঙ্গিতে। মেয়ের কোন আব্দার রাখতে পারেনি, কিংবা ফেরার পথে গাড়ি দাঁড কবিয়ে শিউলালকে দিয়ে ফ্লুরির কেক কিনে আনতে।

—দীপঙ্করকাকুকে তোমার একটা ফোন কবা উচিত ছিল না ? বলো ? এতক্ষণে কত লোক ওকে অভিনন্দন জানিয়ে দিয়েছে।

পাবমিতা গম্ভীব গলায বললে, ও তো সবাই জানে একেবারে আনসোশ্যাল।

অরিজিতের এই সব অনুযোগ শোনা অভ্যাস হয়ে গেছে, শুনে হাসে। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে হাসতে পাবল না। কোথায় বুকে গিয়ে লাগছে।

সবই শুনেছে, সবই কানে গেছে। তারপব অনুযোগেব উত্তব হিসেবেই যেন প্রশ্ন করল, ব্যাপারটা তো ভাল করে শুনলামই না। হ্যাঁ, কি যেন কবেছে ?

পারমিতা হঠাৎ কি মনে পডতে উঠে দাঁড়াল, চেযার ঠেলে দিয়ে চাবিব গোছা নিয়ে গিযে গডবেজের আলমাবিটা খুললে। অবিজিৎ চোখ তুলে তাকাতেই লকারের ফাঁকে থবে থবে সাজানো নোটের বান্ডিল দেখতে পেল। ওগুলো অনেক হিসেব কবে ভেবেচিন্তে ব্যাঙ্কে জমা দিতে হয়।

পারমিতা হাসতে হাসতে ফিরে এল, লকার এবং আলমাবি বন্ধ করে। ––ভাবলাম টাকাগুলো তুলে বাখতে ভুলে গেছি।

ক্যাশবাক্সোটা ওপবে তুলে আনার পর পাবমিতাব এই একটাই কাজ।

অরিজিৎ বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণার ক্ষোভ লুকিয়ে বিষণ্ণতার হাসি হাসল। মনে মনে বললে, ঐ টাকাগুলোই আমাব ডিফিট। পরাজয়।

পারমিতার দিকে, অঞ্জুর মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না অবিজিৎ। কেমন একটা দুর্বোধ্য লজ্জায় সঙ্কোচে। যেন হঠাৎ সেই ঋজু দীর্ঘ দেহের মানুষটা ছোট হযে গেছে।

ওদেব জন্যেই। হ্যাঁ, ওদেরই জন্যে। স্ত্রী এবং মেযে যেন এই মুহূর্তে ওব পরম শত্রু হযে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু ঠিক বিশ্বাস কবতেও ইচ্ছে হয না। ওবা হযতো ভুল শুনেছে। তাছাডা, তাছাডা দীপঙ্করকেও বিশ্বাস করা যায না।

সবাই নিঃশব্দে চুপচাপ খাচ্ছিল। অবিজিৎ হঠাৎ বলে উঠল, কাল খবরেব কাগজটা আগে দেখি ; কি শুনতে কি শুনেছো !

পারমিতা কোন জবাব দিল না। শুধু অঞ্জু বলে উঠল, বাঃ রে, আমরা দুজনই ভুল শুনলাম ?

অরিজিৎ হাসবার চেষ্টা করে বললে, কোন দীপঙ্কর কে জানে।

আসলে ও হযতো মনে মনে চাইছিল, যেন অন্য দীপঙ্কব হয। দীপঙ্কর রায় তো আবও কতই থাকতে পারে।

না, ঐ দীপঙ্করই !

রাতে ভাল ঘুম হয়নি, পরের দিন সকালে খববের কাগজটার জন্যে অধীব আগ্রহে

অপেক্ষা করেছে। তাবপর কাগজ আসতেই খববটা খুঁজেছে। বেশি খুঁজতেও হয়নি, কারণ দীপঙ্কবেব একটা ছোট ছবিও ছেপে দিয়েছে।

কাল বাত্রেই পাবমিতার কাছ থেকে খববটা শুনে বুকেব মধ্যে একটা দারুণ ধাক্কা খেয়েছে অরিজিৎ।

মনে হয়েছে সমস্ত জীবন যেন এক লহমায় ব্যর্থ হযে গেল। এটা কি সত্যি ঈর্ষা ? অবিজিৎ বুঝতে পাবে না। নাকি হঠাৎ ধরতে পেবেছে সমস্ত জীবনটাই অর্থহীন। এই প্রফেশনাল খ্যাতি, টাকা, সুখী ব্যস্ততার জীবন, এই বাড়ি, প্রাক্তন ছাত্রদের সমীহ, বহুলোকের কৃতজ্ঞতা।

আজ সকলের চোখ দীপঙ্করের দিকে। এমন কি পারমিতা আর অঞ্জুর কাছেও সে একজন হিরো হয়ে গেছে। অথচ এই দীপঙ্করকে ভেবেছিল একজন ফেলিওর। কত উপদেশ দিয়েছে। পাগলামি করে ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে নিষেধ করেছিল। সকলেই করেছিল। ওকে নিয়ে কত হাসাহাসি।

অরিজিৎ কিন্তু দীপঙ্করের সাকশেস চেযেছিল। মোটামুটি একটা প্র্যাকটিস গডে উঠুক। অরিজিৎ তাহলে সাহায্যও করত। ওর চেষ্টাতেই তো কতজন দাঁড়িয়েও গেছে। দীপঙ্কব ওর চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট, যদি ওর থেকেও তার নাম এবং প্র্যাকটিস বেড়ে যেত, তাহলেও এমন কষ্ট পেত না।

অরিজিৎ ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠল, নিজেই ডায়াল কবল। আজকাল কানেকশন পাওয়া যায় না বড়ো একটা। দু তিনবার ডায়াল করেও না পেয়ে ভাবল, না পেলেই যেন ভাল হয়। কিন্তু না, পাওযা গেল।

—আই হ্যাভ ডান ইট, আই হ্যাভ ডান ইট।

পবিচয় দিয়েই খুব একটা যেন আনন্দ পেয়েছে এমন ভাব দেখাল অরিজিৎ, কথায় হাসিতে।—কি কাণ্ড করে বসেছো দীপঙ্কর! আমি তো ভাবতেই পাবিনি। কংগ্র্যাচুলেশনস।

আঃ, এই সব অভিনয় করা আবও কষ্টকর।

কিন্তু দীপঙ্কর একটুও সন্দেহ করল না। উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলে উঠল, আই হ্যাভ ডান ইট, আই হ্যাভ ডান ইট।

অরিজিৎ হাসতে হাসতে বলল, যাচ্ছি একদিন, গিয়ে কথা হবে। নাঃ, একটা কাজের মত কাজ করলে তুমি!

বিসিভার নামিয়ে রাখল। তারপর নিজের কথাটাই নিজেকে ভাবিয়ে তুলল। ওদিকে কোনও কল্ থাকলে ফেরার পথে কখনো হয়তো হর্ন বাজিয়ে অথবা শিউলালকে পাঠিয়ে দীপঙ্করকে নামিয়ে এনেছে, আবার তার পীড়াপীড়িতে নিজেই নেমে গিয়ে চা খেয়েছে। সে কদাচিৎ। আসলে দীপঙ্করকেই আসতে বলত। চলে এসো একদিন। অথবা, আজ আমাদেব সঙ্গে খাবে। অরিজিতের মনে পড়ল না এর আগে কখনো এ-রকম কথা বলেছে কিনা। যাচ্ছি একদিন। গিয়ে কথা হবে। 'চলে এসো' না বলে 'যাচ্ছি একদিন'। এই ঘটনাটা কি সব কিছু উলটেপালটে দিয়ে গেল নাকি।

অসহ্য, অসহ্য।

একটা মানুষ যে-কিনা সব দিক থেকে অপদার্থ প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল, যার প্রায় কোনও পরিচয়ই ছিল না, কথায় কথায় যাকে অবিজিৎ উপদেশ দিত, তার বন্ধুরাও, সেই মানুষটা হঠাৎ যেন সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকিযে হাসছে।—আই হ্যাভ ডান ইট, আই হ্যাভ ডান ইট।

যত ওপরেই উঠুক, দীপঙ্কর তো অরিজিতের কোন ক্ষতি করেনি। তবে এত কষ্ট কেন!

অরিজিৎ আবার ডায়াল করল। এবার ডাক্তার সান্যালকে। রামানন্দ সান্যাল। ল্যান্সডাউনে বিরাট একটা নার্সিং হোম করেছে। গাইনি হিসেবে যথেষ্ট নাম করেছিল, এখন নার্সিং হোমের ব্যবসায় আরো ফেঁপে উঠছে। অরিজিতের সঙ্গে সেই কলেজ-জীবন থেকে বন্ধুত্ব।

—রামানন্দ, কাগজ দেখেছো ? দীপঙ্করের ব্যাপারটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

অরিজিৎ একটা অট্টহাস শুনতে পেল। ওর নিজের মুখেও হাসি ফুটল।

রামানন্দ বলছে, বিশ্বাস করেছো নাকি ? শিয়ার ব্লাফ। দীপঙ্করকে তুমি কি আজ চিনলে ? রামানন্দ হাসছে।—কোনও দিকে কিছুই তো হল না, ও একটা সেনসেশন কবতে চাইছে। আমি ওর একটা কথাও বিশ্বাস করি না।

অরিজিৎ যেন বেশ নিশ্চিন্ত বোধ কবল। নাঃ ; সব বাজে খবর।

—ইভন থিওরেটিক্যালি ইটস ইমপসিবল। অরিজিৎ যেন তখনও বামানন্দব কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে ! রামানন্দ হাসতে হাসতে যেন বলছে, ওসব যদি সম্ভব হত, সাহেবরা অনেক আগেই তা আবিষ্কার কবে বসত। টু স্পিক দি ট্রুথ, আমাদেব দৌড ঐ কালাজ্বর অবধি। কি বলো ?

রিসিভারটা নামিয়ে বেখে অরিজিৎ দেখল, পারমিতা এসে দাঁড়িযেছে।

—কাকে ফোন করলে, দীপঙ্কবকে ? বললে না, আমিও দুটো কথা বলতাম। পারমিতা হাসি হাসি মুখে বললে, এত ভাল লাগছে।

অরিজিৎ হেসে উঠে বললে, দাঁড়াও, রামানন্দ তো বলছে সব বাজে খবব। ও বিশ্বাসই করছে না।

একটু থেমে বললে, দীপঙ্কর কিন্তু চিবকালই একটু হামবাগ।

পারমিতা অখুশি ভুরু তুলে বলে উঠল, কি যে বলো। অদ্ভুত একটা হাসি অরিজিতেব কথাটাকে টুসকি দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে অরিজিৎ বললে, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই ও তো বলছে ইমপসিবল। আমার জ্ঞানবুদ্ধিতেও যেটুকু বুঝছি····

তারপরই হেসে উঠে বললে, তোমার দুশ্চিন্তার কিছু নেই, আই অ্যাম নট দ্যাট আনসোশ্যাল, ওকে আগেই কংগ্র্যাচুলেট করে দিয়েছি।

কেমন একটা শূন্যতার মধ্যে দিয়ে পারমিতার কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল, তাই বুঝি। অরিজিৎ গায়ে মাখল না। বরং পারমিতাকেই বোঝাবার জন্যে বললে, রামানন্দ বলছে থিওরেটিক্যালি ইমপসিব্‌ল্। আমি বলছি প্র্যাকটিক্যালি ইমপসিব্‌ল্।

পারমিতা হতাশভাবে অরিজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, কিন্তু তোমবা তো ডাক্তার !

কথাটা খট্ করে কানে লাগল।

গতকাল রাত্তিরে কাঠের ক্যাশবাক্সো ভর্তি নোটের তাড়া নিয়ে গোপাল যখন ওপরে উঠে এল, এবং পিছনে পিছনে অরিজিৎ, নোটের রাশি গডরেজের লকারেব মধ্যে ঠেলে দিতে দিতে পারমিতা যখন খবরটা আবার বলল, তখনও ডাক্তার অরিজিৎ ব্যানার্জির কানে কেউ যেন ঠিক এই কথাটাই বলে উঠেছিল। তোমরা তো ডাক্তার !

একটা বিষাক্ত তীরের মত এসে কথাটা বুকের মধ্যে বিঁধেছিল।

২

বঙ্কিমবাবু সকালের কাগজেই খবরটা দেখলেন। তার আগে কেউ এসে বলেও যায়নি। টি ভি নেই, দেখার প্রশ্নও ওঠে না।

খবরটা দু-তিনবাব পড়ে ফেললেন, বেশ উত্তেজিত বোধ করলেন। ওঁর পঁয়ষট্টি বছরের ঢিমে তালের রক্ত হঠাৎ টগবগ করে উঠল। দারুণ একটা আনন্দ, যেন নিজেরই সাফল্য।

দীপঙ্কর, সেই দীপঙ্কর একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছে। খবরটা কাগজে অবশ্য তেমন জোরালো করে বড় করে দেয়নি। ডিটেল্‌স্‌ কিছুই নেই। এসব খবর তো সত্যি খবর নয়, আজকাল এটা পলিটিক্সের যুগ। মন্ত্রীর ফিতে কাটা, ভিত্তি-প্রস্তর বসানো তার চেয়ে অনেক জরুরী।

বঙ্কিমবাবুর সারা শরীরে কিন্তু একটা উত্তেজনা খেলে গেল ঐটুকু খবরেই। দীপঙ্কর একটা কাজের মত কাজ করেছে। বঙ্কিমবাবু জানতেন ও একদিন কিছু একটা করে বসবে। পেরেছে, ও পেরেছে।

বঙ্কিমবাবু খাটে বসে বসে কাগজ পড়ছিলেন, সেখান থেকেই রান্নাঘরের দিকে চিৎকার ছুঁড়ে দিলেন, চা-টা একটু তাড়াতাড়ি দেবে ? একবার বেরোতে হবে।

স্ত্রী কোন জবাব দিল না, কিন্তু বঙ্কিমবাবু জানেন চা এসে যাবে। ওদিক থেকে কোন প্রশ্নও আসবে না, কোথায় যাবে এখন ? কারণ সকালের দিকে বঙ্কিমবাবু মাঝে মাঝেই বেরিয়ে যান। কারো ব্লাড নিতে।

উনি সরকারী হাসপাতালে প্যাথলজিস্টের চাকরি করেছেন, তারপর অবসর নিয়ে নিজেরই একতলার ঘরে একটা ক্লিনিক খুলে বসেছেন। নামেই ক্লিনিক।

বঙ্কিমবাবু ডায়েরির পাতা খুলে দেখে নিলেন, কারো কোন নির্দেশ আছে কিনা। চেনাজানা হাউস ফিজিশিয়ান দু-চারজন ওঁর ওপরই ভরসা রাখে। তাই আগের রাত্রে জানিয়ে দেয়, কিংবা চিঠি লিখে রুগীকে পাঠিয়ে দেয়। ব্লাড নিয়ে আসার জন্যে উনি লোক রাখেননি, নিজেই যান।

না, কোথাও যাবার নেই। সুতরাং দীপঙ্করের কাছেই যাবেন। ওর কাছে গিয়ে ওব সঙ্গে দেখা না করলে যেন শান্তি নেই।

দীপঙ্করের সঙ্গে চেনাজানা দীর্ঘকাল ধরে, কিন্তু দেখা-সাক্ষাৎ কমই হয। বিটায়ারমেন্টের পর তো কারও সঙ্গেই আর দেখা হয় না। তবু এক একটা লোক আছে না, কিংবা এক ধরনের সম্পর্ক বছরের পর বছর দেখা নেই, কিন্তু দেখা হলেই মনে হয়, ঠিক যেখানটিতে ছেড়ে গিয়েছিলাম সেখান থেকেই শুরু হল। মাঝখানে যেন ফাঁক নেই। দীপঙ্করের সঙ্গেও ঠিক তেমনই। হয়তো ভিতরে ভিতরে একটা মিল আছে বলেই।

প্রথম জীবনে ট্রপিক্যালে কিছুদিন ছিলেন বঙ্কিমবাবু, সেই সময়ে একটা রোগ নিয়ে আসেন। তার ফলে চাকরিতে কোন উন্নতি হয়নি, চেষ্টাও করেননি।

অবসর নেবার পর যখনই কেউ ওঁকে বড় কোন ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত হতে বলেছে, কে কত টাকা রোজগার করছে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে চোখেব সামনে, তখনই উনি হেসে হেসে বলেছেন, কিন্তু আমি যে ট্রপিক্যাল থেকে একটা ইনকিওরেব্‌ল ডিজিজ নিয়ে এসেছি সেই ছেলেবেলায়। আর ওসব হয় না হে, হয় না।

পাড়াপড়শিদের টুকটাক কাজ করেই ওঁর চলে যায়। এর ব্লাড ওর স্টুল। সুগার বাড়ল কিনা। দু-দশজন হাউস ফিজিশিয়ান ওঁকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। ওঁর ওপর আস্থা রাখে।

বঙ্কিমবাবু কিন্তু সুখী মানুষ। নীচেতলার ঘরেই ওঁর ক্লিনিক, কাজকর্মও কম। বাড়তি সময়টা কাটাবার মত একটা নেশাও আছে। দি ইনকিওরেব্‌ল ডিজিজ।

আসলে ট্রপিক্যালে গিয়ে হঠাৎ ওঁর মধ্যে একটা রিসার্চের নেশা ঢুকে গিয়েছিল। একটা কিছু করতে হবে, একটা কিছু আবিষ্কার করবেন। এখনো অভ্যাসবশেই সে-সব নিয়ে নাড়াচাড়া করেন।

স্ত্রী চা দিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে কাপটা নিয়ে বেশ হাসি হাসি মুখে বললেন, একটা

দারুণ খবর আছে। দীপঙ্কর রায়....

খবরের কাগজটা এগিয়ে দিলেন, জায়গাটা আঙুল দিয়ে দেখালেন।

পরক্ষণেই একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, স্ত্রী চোখের চশমাটা ঠিক করে নিয়ে খবরটুকু পড়ে শুধু একটা 'হুঁ' বলে চলে গেল দেখে।

মনে মনে হাসলেন। ওর তো এ-সবে কোনওকালেই কোনও আগ্রহ ছিল না। কোন ব্যাপারটার কতখানি গুরুত্ব বোঝে না।

তারপর নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছেন, কে বোঝে ?

প্যান্টে বেল্ট এঁটে গায়ে কোট চাপিয়ে বঙ্কিমবাবু বেরিয়ে পডলেন। গাড়ি নেই, গাড়ি ওঁর ছিলও না। এখন তো পেনশন সম্বল। টুকটাক ব্লাড-ইউরিন করে কতই বা হয়।

হাঁটতে হাঁটতে এসে বাস স্টপে দাঁড়ালেন। তাড়াতাড়ি না পৌঁছতে পারলে দীপঙ্কর হয়তো বেরিয়ে যাবে। কে জানে, আজ সকালেই হয়তো ওর ওখানে বহু লোক ভিড় করবে, আর দীপঙ্কর সেই ভয়ে সরে পড়বে। ওর ধরন-ধারন চিরকালই একটু পাগলাটে।

কিন্তু বাস আসতে খুব দেরি হচ্ছে।

বঙ্কিমবাবু বেঁটেখাটো মানুষ, তবে বেশ স্বাস্থ্যবান। গায়ের রঙ কালো, সামনের দিকে চুল উঠে গিয়ে কপাল বড় হয়ে গেছে। কেউ সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে দিব্যি নিজেকে নিয়ে রসিকতা করে এলেন, টাকই কপাল অবধি নেমে এসেছে, কপাল আর বড় কোথায় হল হে।

—কপাল বড় করার আপনি তো চেষ্টাও করলেন না। কেউ হয়তো সমবেদনা জানিয়ে বলেছে।

উনি হেসেছেন, কোন উত্তর দেননি। কপাল বলতে এরা কি বোঝে তা তো অনেককাল আগেই জেনে গেছেন।

ইতিমধ্যে বাস এসে গেল, বঙ্কিমবাবু উঠে পড়লেন। এত সকালে তেমন ভিড় নেই, কিন্তু বসার জায়গাও নেই।

বঙ্কিমবাবু ভেবেছিলেন দীপঙ্করের ব্যাপার নিয়ে বাসে কেউ না কেউ আলোচনা করবে। এমন একটা খবর। কিন্তু না, কেউই কিছু বলছে না। হয়তো কাগজই পড়েনি।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ শুনতে পেলেন পিছনে কন্ডাক্টরের সঙ্গে কে ঝগড়া জুড়ে দিয়েছে।

কখন টিকিট কেটেছেন, কখন ঠিক গন্তব্যে পৌঁছতেই বাস থেকে নেমে পড়েছেন, সচেতন হয়ে উঠতেই অবাক হয়ে গেলেন। আসলে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

বঙ্কিমবাবু বহুকাল আগেই জেনে গেছেন ওঁর দ্বারা কিচ্ছু হবে না। তার জন্যে এখন আর ক্ষোভ নেই। এখন বুকের মধ্যে নৈসর্গিক আনন্দ খেলে যাচ্ছে। দীপঙ্কর পেরেছে।

উনি যা খুঁজে বের করতে চেয়েছিলেন তার সঙ্গে কোনও মিল নেই, পদ্ধতি পন্থা এক নয়, তবু কোথায় যেন একটা মিল আছে। অন্তত বঙ্কিমবাবু তাই অনুভব করেন। শুধু দীপঙ্করের সঙ্গে নয়। যারাই খুঁজছে তাদের সঙ্গে কেমন একটা আত্মীয়তা বোধ করেন।

—মানুষের একটাই ধর্ম, বুঝলে হে। খোঁজা। মনে পড়ছে, দীপঙ্করকে একদিন বলেছিলেন। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, সবাই খুঁজছে। বেশির ভাগই টাকা খোঁজে। গাড়ি-বাড়ি সুখ। কত লোক শুধুই ভগবান খুঁজে গেল। খুঁজুক না হে, যে যা চায়। কিন্তু মানুষের আসল গর্ব, যে আরেক ধরনের মানুষ আছে, যারা পথ খুঁজছে। পথ আবিষ্কার করছে, আরও কিছু জানার পথ। এই যেমন তুমি....

বলেই অট্টহাস্যে হেসে উঠেছেন। কেমন চমৎকার একটা বক্তৃতা দিলাম বলো, প্রায় মন্ত্রীদের ভাষণ। তাই না ?

দীপঙ্করের মধ্যে এই সব উত্তেজনা, ইমোশন একটুও নেই। আর সেজন্যেই ও হয়তো

শেষ অবধি পেরেছে।

বাস স্টপ থেকে বেশ কিছুটা হেঁটে গিয়ে দীপঙ্করের বাড়ি। ছোট্ট দোতলা বাড়ি, অনেককালের। ওঁর বাড়িটার মতই পুরনো। পুরনো দিনের ভাড়াটে বলেই ভাড়া কম। এটা না থাকলে তো কবেই কলকাতার বাইরে চলে যেতে হত। আসল মানুষগুলো তো এভাবেই বাইরে চলে যাচ্ছে, যেখানে না-আছে ল্যাবরেটরি, না বইপত্তর। পরামর্শ করার মত দুটো বিজ্ঞ লোকও পাওয়া যায় না সেখানে। জীবন বসু মল্লিকের মত একটা ব্রাইট ছেলে এভাবেই তো শেষ হয়ে গেল। যারা শুধুই টাকা খোঁজে, এ-শহর এখন শুধু তাদের জন্যে। ব্যবসায়, প্রফেশনে, চাকরিতে এখন সকলে শুধুই টাকা খুঁজছে।

সেদিক থেকে বঙ্কিমবাবু নিজেও ভাগ্যবান। বাড়িটা খুবই পুরনো, দেয়ালে নোনা ধরা, কিন্তু ভাড়া খুবই কম। সেই চল্লিশ বছর আগেকার ভাড়া। মাঝে সামান্য বেড়েছে। বাড়িওয়ালা আর চুনকাম করায়নি। এই ভাড়ায় হোয়াইটওয়াশ! স্ত্রীর কথা শুনে উনি নিজেই হেসেছেন। নিজেও অবশ্য পারেন না। এই তো সামান্য পেনশন, মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন, দু-চারটে ব্লাড-ইউরিনে ক-টাকাই বা হয়।

বঙ্কিমবাবু এসে কড়া নাড়লেন। দীপঙ্কর আছে তো? উনি তো ভেবেছিলেন ইতিমধ্যে অনেকেই এসে গেছে। ওকে অভিনন্দন জানাতে। মনে মনে স্তোক দিলেন, এত সকালে কি করেই বা আসবে, আজকাল সবাই তো ব্যস্ত। হয়তো দেরিতে আসবে।

দ্বিতীয়বার কড়া নাড়তেই দীপঙ্কর নিজেই দরজা খুলে দিল। বঙ্কিমবাবুকে দেখেই হেসে উঠল, একটু অবাকও হল। কিন্তু তার আগেই দু হাত বাড়িয়ে দীপঙ্করকে জড়িয়ে ধরেছেন উনি।—ইউ হ্যাভ ডান এ গ্রেট জব, দীপঙ্কর! তুমি আমাদের সম্মান রেখেছো।

দীপঙ্কর হাসতে হাসতে বললে, স্যার, আপনি এই সকালে ছুটতে ছুটতে আসবেন, আমি ভাবতেই পারিনি। আমি যেতাম, আপনার কাছে যেতাম।

বঙ্কিমবাবু কপট রাগে বললেন, মিথ্যে কথা বলো না দীপঙ্কর, তুমি যে কি নিয়ে বিসার্চ করছো তাই জানতে দাওনি। অবশ্য ভালই করেছিলে।

দীপঙ্কর হাসতে হাসতে চেয়ার টেনে দিল। বসুন, বসুন।

তারপর নিজেও বসল। বললে, খবরটাও, স্যার আমি দিইনি। আমাব এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রথম থেকে সে সবই জানত, আনন্দের চোটে তাকে বলে ফেললাম···

দীপঙ্কর হাসতে শুরু করল। মানুষটা তখন যেন একটা খুশি আর আনন্দের ফোয়ারা।

তারপরই চিৎকার করে ডাকতে শুরু করলো, সীমা, সীমা! কে এসেছেন দেখে যাও।

সীমা ডাক শুনে দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়িযে কে এসেছেন দেখতে গিযে অবাক হয়ে গেল। ওমা, আপনি? আসুন, আসুন।

তারপর হাসতে হাসতে বললে, আমি তো ভেবেছিলাম ছাত্রটাত্র হবে কেউ, গুরুই এসে হাজির।

দীপঙ্কর হাসল।

—ও নো নো। বঙ্কিমবাবু হাত তুলে বাধা দেওয়ার ভঙ্গি করলেন। বললেন, দীপঙ্কর 'স্যার' বলে ঐ আমার যথেষ্ট সম্মান। গুরুটুরু বলো না, ঠাট্টার মত শোনাবে।

দীপঙ্কর প্রণামটনাম করতে পারে না, ওসব ভণিতা ওর ভালও লাগে না। ও হাসতে হাসতে বললে, খুব একটা বাড়িয়ে বলেনি স্যার, আপনার কাছে কিছু না কিছু প্রশ্ন নিয়ে তো গিয়েছি।

বঙ্কিমবাবু সীমার মুখের তৃপ্তির হাসিটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। ঠিক এই হাসিটাই কোনও দিন ওঁর স্ত্রীর মুখেও দেখতে পাবেন আশা করেছিলেন। ভেবেছিলেন, ওঁর জীবনেও একটা সাকশেস কোনও দিন দেখা দেবে, আর

তখন এই সারাজীবনের গ্লানি, অভাব, ব্যাখ্যাহীন একটা ইনকিওরেব্‌ল ডিজিজ বয়ে বেড়ানোর জন্যে যা-কিছু ক্ষোভ স্ত্রীর মন থেকে মুছে যাবে। সেও ঠিক এই সীমার মতই তৃপ্তিতে আনন্দে হাসতে পারবে।

—চা নিয়ে আসি। সীমা চলে গেল।

অন্যমনস্কতা থেকে সরে এসে বঙ্কিমবাবু বললেন, তুমি আমার লাইফটাকে জাস্টিফিকেশন দিয়েছো দীপঙ্কর, সেটাই তো গর্ব। গুরুটুরু বলো না।

কি যেন ভাবলেন বঙ্কিমবাবু, থেমে থেমে বললেন, ইট্‌স্ দি ক্যারেকটার। তুমি একটা জিনিস খুঁজেছো, এবং পেয়েছো। আমিও খুঁজেছি, পাইনি। আমি অবশ্য অন্য কিছু খুঁজেছি। তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু ক্যারেকটারের কথাটা তুমি ভাবো। পেনিসিলিন আবিষ্কার করার আগের দিন যদি অ্যালেকজান্ডার ফ্লেমিং মারা যেতেন, সেই চরিত্রটাও কিন্তু সমান শ্রদ্ধার।

দীপঙ্কর ধীরে ধীরে বললে, একজ্যাকটলি সো। সীমা আপনাকে গুরু বলে ভুল কিছু বলেনি। হাসতে হাসতে বললে, আপনি বয়স্ক বলে গুরু বলেছে, সমবয়স্ক হলে বলত বার্ডস অফ দি সেম ফেদার।

বঙ্কিমবাবু বললেন, ক্রেডিট কিন্তু সীমারও প্রাপ্য। এমন স্ত্রী না হলে·····

এই সময়েই চা নিয়ে এল সীমা। ওঁদের কথাটা শুনতে পেয়ে বললে, বিয়ের সময় কিন্তু একবারও বলেনি, এত ছেলেমেয়ে আছে মানুষ করতে হবে।

এটা পুরনো রসিকতা, বঙ্কিমবাবুও হেসে উঠলেন। বললেন, চলো চলো তাদের একবার দেখে আসি।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে বুকের মধ্যে খিচখিচ করে লাগছিল বঙ্কিমবাবুর। উনি তো ভেবেছিলেন সকাল থেকে ভিড় লেগে যাবে দীপঙ্করের বাড়িতে। প্রচুর লোকের সঙ্গে তো ওর জানাশোনা। ও একটু মিশুকে ধরনের। তারা তো আসবে! কিন্তু কই! না লোক আসছে অভিনন্দন জানাতে, না টেলিফোন।

নিজের ওপরই সন্দেহ জাগল বঙ্কিমবাবুর। তাহলে কি সত্যি এ-সবের কোনও মূল্যই নেই? এই যে একটা কিছু খুঁজে বের করার পিছনে সারাটা জীবন উৎসর্গ করা, বছরের পর বছর লেগে থাকা, এর কোনও বৈষয়িক মূল্য নেই সেটুকুই উনি জানতেন। কিন্তু সম্মান?

মুখ ফুটে বলেই ফেললেন, আমি তো ভেবেছিলাম হে, অনেকেই আসবে তোমাকে কংগ্র্যাচুলেশনস জানাতে।

হো হো করে সশব্দে হেসে উঠল দীপঙ্কর। বললে, কয়েকজন অবশ্য টেলিফোনে জানিয়েছেন।

তারপরই হাসতে হাসতে বললে, স্যার, আমি তো একটা সামান্য সরকারী ডাক্তার। চাকরি নিয়েই তটস্থ। আমার কাছে কে আর আসবে বলুন। হেসে উঠে বললে, অবশ্য বন্ধুরা আসে।

বঙ্কিমবাবু আর কোন কথা বললেন না। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। দীপঙ্করের ছেলেমেয়েদের। দেয়াল ঘেঁসে কয়েকটা ছোট্ট ছোট্ট কাঠের জালের ঘর। কোনওটায় খোপে খোপে ইঁদুর, ব্রাউন মাইস, কোনওটায় গিনিপিগ। খরগোশও। ভিতর দিকে একটা উঠোন। মেঝের সিমেন্ট ফেটে গিয়ে উঠোন জুড়ে মানচিত্র হয়ে আছে। একপাশে করবী গাছে চেন দিয়ে বাঁধা দুটি বানর শিশু। রিসাস।

বঙ্কিমবাবু দেখেই হেসে ফেললেন।

ওঁর হাসি দেখে সীমা এগিয়ে এল। হাসতে হাসতেই বললে, জানেন তো, আমার আত্মীয়স্বজনরা সবাই জানে ও একটা বদ্ধ পাগল। যারাই এ বাড়িতে এসেছে, দেখে গিয়ে

বাবাকে বলেছে কার হাতে দিলে মেয়েটাকে।
সীমা হেসে হেসে বলছিল।
বঙ্কিমবাবু অবাক হয়ে তাকালেন সীমার মুখের দিকে। বললেন, তুমি তো এক্সপ্লেন করে দেবে হে, তোমার স্বামী একজন সায়েন্টিস্ট। ডাক্তার নয়।
সীমা ঠোঁট উলটে বললে, তাহলে তো আরও হাসত, আমাকেও পাগল ভাবত।
বঙ্কিমবাবু নিজের মনেই যেন বললেন, তা ঠিক তা ঠিক।
দীপঙ্করকে বেশ খুশি-খুশি লাগছিল, লাগবারই কথা। ও বললে, চলুন স্যার আমার ল্যাবরেটরিটা দেখবেন। তা ছাড়া ব্যাপারটা আপনি বুঝবেন। হেসে বললে, বোঝানোর মত লোকও তো কম।
বঙ্কিমবাবুকে নিয়ে দোতলায় উঠে এল দীপঙ্কর। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে বললে, পেপার রেডি করাই হয়নি এখনো।
তারপর বেশ যেন অভিমানের স্বরে বললে, আগে একটা পেপার ছাপা হল, এখানে কেউ কিছু ইম্পর্ট্যান্সই দিল না। আমার তাই জেদ চেপে গিয়েছিল।
সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বললে, অথচ দেখুন স্যার, সারা পৃথিবী এই রোগটা নিয়ে ভাবছে। হাজার হাজার বছব ধরে মানুষকে জ্বালিয়েছে যে রোগটা···
বঙ্কিমবাবু বললেন, সেজন্যেই তো ছুটে এলাম হে, তুমি একটা অসাধ্যসাধন করেছ।
ল্যাবরেটরি বলতে কিছুই নয়। দুখানা টেবিল পাশাপাশি জুড়ে তাব ওপর নানা মাপেব কাচের টিউব আর পাত্র, এক কোণে গ্যাস সিলিন্ডাব। টেবিলে একটা বুনশেন বার্নার। সাবি সারি একরাশ টেস্টটিউব, একটা মাইক্রোস্কোপ, বেশ কিছু বিকার আর ডিস্ক। টেবিলের সামনে একটা গোল টুল।
এরই মধ্যে সীমা কখন পিছনে দাঁড়িয়েছে। হেসে বললে, ব্যস এই।
বঙ্কিমবাবু ফিরে তাকিয়ে বললেন, আবিষ্কার ঐ কাচের টিউব করে না হে, করে এই জিনিসটি। বলে নিজের মাথায় আঙুল ঠুকে দেখালেন।
সীমা হেসে হেসে বললে, কিন্তু এ দেখে কেউ বিশ্বাসই কববে না।
বঙ্কিমবাবু বললেন, তবে তুমি অবশ্য ঠিকই বলছ, বড় গাড়ি আর মোটা ফি না হলে বড় ডাক্তার হয় না। তেমনি অনেক বিলিতি ডিগ্রি আর ইয়াব্বড় ঝকঝকে ল্যাবরেটবি চাই।
দীপঙ্কর হেসে উঠল। সীমাও।
বঙ্কিমবাবু বললেন, ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলো হে, দেখি বুঝতে পারি কি না।
দীপঙ্কর হাসল।—আপনি বুঝবেন, কারণ আপনি তো বুঝতে চাইছেন।
সারি সারি সাজানো টেস্ট টিউবের মাঝ থেকে একটা তুলে নিয়ে দেখাল, ভিতরের তরল পদার্থটি নেড়ে বললে, এটাই আসল। দিস ইজ এক্সোন। পঁয়ত্রিশ বছর আগে অস্ট্রিয়ার ডক্টর আল্টম্যান একটা রিপোর্ট ছেপেছিলেন।
বঙ্কিমবাবু অবাক হয়ে বলে উঠলেন, তাই নাকি হে?
দীপঙ্কর বললে, হ্যাঁ, কিন্তু কমপ্লিট করে যেতে পারেননি। পার্সেন্টেজ অফ সাকসেস ছিল কম।
বঙ্কিমবাবু অবাক হয়ে বললেন, কিন্তু কাজটা কি? ইনকিউবেশন?
দীপঙ্কর বললে, ব্রাউন মাইসে তিনি রোগ সৃষ্টি করতে পারেননি, কিন্তু দেখেছিলেন তাদের কয়েকটা বাচ্চার ও রোগ হয়েছিল। বাট নো ওয়ান টুক নোটিস অফ ইট। কারণ, আল্টম্যান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মারা যান।
একটু থেমে বললে, রোগটা আপনি জানেন হেরিডিটরি নয়। আমি এক্সোনের সঙ্গে একটা হরমোন মিশিয়ে ব্যাসিলিকে গ্রো করাতে পারলাম, এবং সেটাই আমার ভ্যাকসিনের

চাবিকাঠি। ইনকিউবেশন পিরিয়ডকে ছোট করে আনতে আমি এটা ট্র্যান্সমিট করলাম মাদার টু চাইল্ড। রোগটার জন্যে যখনই একটা হোস্ট পাওয়া গেল, তখন সবই তো সোজা।

বঙ্কিমবাবু তারিফের ভঙ্গিতে বললেন, গ্র্যান্ড আইডিয়া।

দীপঙ্কর হাসতে হাসতে বললে, স্টেরিলিটি থাকলে, মানে বন্ধ্যার ক্ষেত্রে কি হবে দেখতে গিয়ে, মজার ব্যাপার, কয়েকটা তেমন রিসাস মাঙ্কিকে ব্রিড করানোর পর একটার বাচ্চা হল। জানি না, ঐ হর্মোনটার জন্যেই হয়তো। গোনাডোট্রপিন।

একটু থেমে বললে, স্যার, এদিকটা নিয়ে আপনি একটু পরীক্ষা করে দেখুন না।

বঙ্কিমবাবু হেসে বললেন, আমার কি আর সে-বয়েস আছে হে!

এই সময়েই নীচের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। সীমা ছুটে চলে গেল, দেখি কেউ বোধহয় এসেছেন।

দীপঙ্করের ওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, গবেষণার বিষয়টা ও বোঝাতে শুরু করল বঙ্কিমবাবুকে। আমি যদি একটা ট্যাবলেট আবিষ্কার করতাম, অ্যাজ এ কিওর, দেখতেন ভিড় লেগে যেত ব্যবসাদারদের। কিন্তু সেই যে ছেলেবেলায় পড়েছিলাম প্রিভেনসন ইজ বেটার দ্যান কিওর····

সীমা উঠে এল হাতে একটা খাম নিয়ে। সরকারী ছাপ মারা।

বললে, লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।

দীপঙ্কর হাসি-হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে নিল খামটা। বললে, বোধহয় হেল্‌থ মিনিস্টার কংগ্র্যাচুলেশনস জানিয়েছেন। প্রয়োজনের সময় এতটুকু সাহায্য না পেলে কি হবে সাকশেসফুল হলেই·····

খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা পড়তে গিয়ে কথা থেমে গেল দীপঙ্করের। একটা আনন্দের খবর আশা করে হঠাৎ অখুশি হবার মত কিছু শুনলে যেমন হয়, ওর মুখের ভাব বদলে গেল।

সীমা বলে উঠল, কি হল? বলেই চিঠিটা টেনে নিল।

তারপরই বললে, ও।

অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারির চিঠি। দশটার সময় গিয়ে দেখা করতে হবে রাইটার্সে।

দীপঙ্কর বিচলিত বিরক্তিতে বললে, এই সব দেখা করা-টরা আমার একদম পোসায় না। সেই গিয়ে ধর্না দেওয়া, এর কাছে ওর কাছে, দিব্যি শুনতে পাচ্ছি খোশ গল্প হচ্ছে, পি এ বলবে উনি বিজি, কিংবা কনফারেন্সে আছেন····

বঙ্কিমবাবু হাসতে হাসতে বললেন, যস্মিন দেশে যদাচার হে, করবে কি। আমার আর চিন্তা নেই, ওদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেছি।

দীপঙ্করকে দশটার মধ্যে রাইটার্সে হাজির হতে হবে। সরকারী চাকরি একমাত্র জীবিকা হলে ওসব নির্দেশ মানতে হবেই। তুমি যত বড় জিনিয়াসই হও!

বঙ্কিমবাবু বললেন, তাহলে আর তোমার সময় নষ্ট করব না।

চলে গেলেন।

দীপঙ্কর আর সীমা বাড়ির দরজা অবধি এসেই ক্ষান্ত হল না, ওঁর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা এগিয়ে দিল।

আর ফেরার পথে দীপঙ্কর বললে, লিখেছে টু এক্সপ্লেন সার্টেন পয়েন্ট্‌স্। কি ব্যাপার বুঝছি না।

কাল থেকেই সীমার মন এমন একটা আনন্দে ভরে আছে যে ও অন্য কিছু ভাবতেই পারছে না। তাই বলে উঠল, ও কিছু না, হয়তো দেখবে এখন অনেক খাতির করবে।

দীপঙ্কর চেষ্টা করে হেসে উঠল। আসলে এই চিঠিটার মধ্যে কোথায় যেন একটা

অসম্মান লুকিয়ে আছে। সীমা তো শিক্ষিত মেয়ে, বুঝতে নিশ্চয়ই তার অসুবিধে হয়নি। দীপঙ্করের খারাপ লাগবে বলে না বোঝার ভান করছে।

কাল থেকেই দীপঙ্কর অস্বস্তির মধ্যে আছে। কেমন একটা নার্ভাস নার্ভাস ভাব। সকলের দৃষ্টি ওর ওপর এভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়বে ভাবতেও পারেনি।

ও তো এতদিন নগণ্য হয়েই ছিল। নিতান্তই আলাপ-পরিচয়ের ফলে দু-একটা উঁচু মহলে নিমন্ত্রিত হয়েছে, হাসি-আড্ডায় সময় কাটিয়ে চলে এসেছে। ওকে নিয়ে কারও কোন মাথাব্যথা ছিল না। সবাই জানত ও বেশ মজার মানুষ, একটু পাগলাটে এই যা।

আসলে রিসার্চের ব্যাপার ও যথাসম্ভব গোপন রেখেছিল। না রেখেই বা উপায় কি। প্রথম যখন শুরু করেছিল, সুবিধে হবে মনে করে সামান্য একটা ট্রান্সফার চেয়েছিল। কেউ বিশ্বাসই করেনি, কেউ কেউ মুখ টিপে হেসেছে। শেষে হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টে একদিন বড়বাবু ধরনের একজন ক্লার্কের সঙ্গে ঝগড়া করে ফেলল রেগে গিয়ে। আর মাসখানেকের মধ্যেই ওকে বদলি করে দিল পাহাড়ি জংলা গ্রামে। সব আশা-ভরসা চলে গিয়েছিল দীপঙ্করের।

অনেক চেষ্টায় আবার ফিরে আসতে পেল। এক বছর পরে।

সরকারী ঐ আমলাদের দোষ দিয়েই বা লাভ কি! সমস্ত পরিবেশটাই তো এ-রকম। এর মধ্যেই টিঁকে থাকতে হবে, কিছু করার ইচ্ছে হলে এরই মধ্যে করতে হবে। ঢেউ থামলে সমুদ্রে স্নান করব ভাবলে তো স্নান করাই হবে না। আর আমাদের এই গলা পচা সমাজে কাজ করতে হলে বিছুটির কম্বল গায়ে দিয়ে দিয়েই করতে হবে।

ওর মধ্যে আগে একটা প্রচণ্ড আবেগ ছিল, কখনো কখনো বলে ফেলত, আর তা শুনে ওর ডাক্তার বন্ধুরাও হাসত। সবচেয়ে আশ্চর্য, একজন সিনিয়র দীপঙ্করকে অপছন্দ করত বলেই হোক, অথবা ঈর্ষা, ওর অসুবিধে সৃষ্টি করে গেছে নানাভাবে।

সীমা হেসে ফেলল একটা কথা মনে পড়তে।

—তোমার মাসীমা কিন্তু আসবে না। সীমা হাসতে হাসতে বললে।

দীপঙ্কর উত্তর দিল, না এলেই ভাল।

গতকাল রাত্তিরেই দু-একজন এসেছে খবর শুনে। সীমার দিদি ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে এসেছিল, হাতে মিষ্টি। এসেই বলেছে, তোদের আর একটুও বিশ্বাস করি না। এত বড় একটা কাণ্ড করছিল দীপঙ্কর, একটা দিনের জন্যেও জানতে দিসনি!

তখন তাকেও গল্পটা বলতে হয়েছে।

দীপঙ্করের ছোটমাসী একসময় বেড়াতে আসতেন মাঝে মাঝে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে। কারও কিছু অসুখবিসুখ হলে দেখিয়ে যেতেন, টুকটাক ওষুধও দিয়ে দিত দীপঙ্কর।

তারপর হঠাৎ এক বিয়েবাড়িতে দেখা। সে কি রাগ ছোটমাসীর। অপরাধের মধ্যে দীপঙ্কর বলে ফেলেছে, আর যাও না কেন?

ছোটমাসী রেগে গিয়ে বললে, আমি যে ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতাম তোর বাড়িতে, বলবি তো একদিন, খারাপ রোগ নিয়ে তুই কি-সব করছিস, বললেও তো পারতিস ছেলেমেয়েদের এনো না।

সে কথা মনে পড়তেই সীমা হেসে ফেলল।

এখন হাসতে পারছে। সেদিন কিন্তু মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। হাসতে পারেনি, উত্তর দিতে পারেনি। উত্তর দিতে ইচ্ছেও হয়নি। রাগ আর ঘৃণায় ভিতরটা জ্বলছিল। ছোটমাসীকে দোষ দিয়ে কি হবে, সমস্ত দেশটাই তো এই রকম মূর্খ মানুষে ভবে আছে।

বাড়ি ফেরার সময় সীমা চাপা ক্ষোভের স্বরে বলেছিল, ওরা যে সকলে আমাদের একঘরে করে দিয়েছে জানতাম না।

যে রোগটা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে ভয় দেখিয়ে এসেছে, মানুষেব জীবন নষ্ট

করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাকে সমাজের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, দীপঙ্কর তখন স্বপ্ন দেখছে সেই রোগটাকে পৃথিবী থেকে নির্মূল করে দেবে। ভাবতেই পারেনি, সমাজ ওকেই ছেড়ে চলে যাবে।

ছোটমাসীর কথাটা তখনও দীপঙ্করের বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছে। ও সীমার কথায় কোন সাড়া দিল না।

সীমা অনুযোগের গলায় বললে, তোমারই তো দোষ, তোমার বড়মামাকে সেদিন বলে না ফেললে তো আর জানতে পারতেন না।

দীপঙ্কর কি করবে, মানুষ সব সময়ে কি তার ভেতরের চাপা আবেগ আগলে আগলে রাখতে পারে। তাছাড়া এই সব দিক ভেবে তো আর ও গোপন করতে চায়নি। ওর ওপর কারও আস্থা নেই, ও যে সত্যি বড় কিছু একটা করে ফেলতে পারে কেউ বিশ্বাস করে না, তাই গোপন করে এসেছে। শুনে হাসবে সকলে, এই ভেবে। আসলে যারাই কিছু একটা আবিষ্কার করে বসেছে, তার আগের দিন পর্যন্ত তো সকলে তাকে অতি সাধারণ মানুষ বলেই মনে করে। কেউ হাসে, কেউ পাগল ভাবে, কেউ উপদেশ দেয়, ভবিষ্যৎ ভাবতে বলে। ভবিষ্যৎ মানে অর্থ-সম্পদ, বাড়িঘর, প্র্যাকটিস জমানো, চাকরিতে উন্নতি।

ডাক্তার সান্যাল একদিন হাসতে হাসতে বলছিলেন, ফি বাড়িয়ে দিলাম দীপঙ্কর। এখন ছুরি ধরলেই হাজার টাকা। আমি একটু ভিড় কমাতে চাই, বুঝলে। আই অ্যাম ড্যামন্ড্ টায়ার্ড।

দীপঙ্কর সেদিন ওর এক চেনাজানা পেশেন্টকে নিয়ে গিয়েছিল।

সেদিন মানুষটাকে ওর খুব ছোট মনে হয়েছিল। সার্জেন হিসেবে যত অসাধারণই হোন, মানুষ হিসেবে ছোট।

কিন্তু ছোটমাসীর কথাটা শুনে মনে মনে ক্ষমা করে দিয়েছিল ডাক্তার সান্যালকে। ওরা বোধহয় ঠিকই করে। কিংবা ওরা নিজেরা ছোট হতে চায় না, চারপাশের এই সমাজই ওদের ছোট করে দিচ্ছে।

ট্যাক্সির এক কোনায় গা এলিয়ে দিয়ে দীপঙ্কর বললে, দোষ ছোটমাসীর নয় সীমা, দোষ ওদের অজ্ঞতার।

তারপর হাসতে হাসতে বললে, ভয় পাওয়াও তো স্বাভাবিক। জানো না, প্রথম যখন বাধ্য হয়ে ঐ ডিপার্টমেন্টে পোস্টেড হলাম, এত তো বই পড়া বিদ্যে ছিল, তবু সাতটা দিন আমি ঘুমোতে পারিনি। সায়েন্স যতই যুদ্ধ করুক, কুসংস্কারকে জয় করা সত্যি খুব কঠিন সীমা।

রাইটার্স বিল্ডিং-এ যাবার পথে সেই কথাগুলো মনে পড়ল দীপঙ্করের।

এখন দীপঙ্কর সাকশেসের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। এত বছর ধরে যা খুঁজছিল, তা এখন ওর হাতের মুঠোয়। সে-সব দিনের কথা মনে পড়লে এখন ওর হাসি পায়। সেই বড়বাবুর হুমকি, ছোটমাসীর অভিযোগ, ডাক্তার সান্যালের ঠাট্টা, ডাক্তার ব্যানার্জির উপদেশ।

তবু বুকের মধ্যে খিচখিচ করে লাগছে একটা অভব্য চিঠি। 'টু এক্সপ্লেন সার্টেন পয়েন্টস।'

ঠিক দশটায় গিয়ে হাজির হতে হবে। হয়তো একজন কেরানীর সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে। অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারির খোশ গল্প কানে আসবে। 'উনি এখন বিজি, কনফারেন্সে আছেন।'

এসব গ্লানি এখন দীপঙ্করের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। ও জেনে গেছে ভবিষ্যতের পৃথিবী ওর নাম মনে রাখবে। একটা কুৎসিত রোগ তিনি পৃথিবী থেকে নির্মূল করে গেছেন।

৩

দীপঙ্করের নিজেকে বড়ো অসহায় লাগছিল।

জীবনের সমস্ত গ্লানি আর অপমান ও ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আর নতুন কোন অপমানের কথা ও ভাবতেই পারছে না।

এখন টিঁকে থাকাটাই বড় কথা।

পেপারটা এখনো তৈরি হয়নি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটা লিখে পাঠাতে হবে বাইরের কোন জার্নালে। তারপর স্বীকৃতি।

হঠাৎ মনে হল অমূল্য ওর উপকার করতে গিয়ে যেন ওর ক্ষতি করে দিয়েছে। অতখানি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওর কাছে সব বলে ফেলা উচিত হয়নি। ও যে একটা নিউজ এজেন্সির রিপোর্টার তা মনে ছিল না। নাকি মনে ছিল, ঐ মুহূর্তে একটা দুর্বলতা উঁকি দিয়েছিল। সকলে জানুক, আমি পেরেছি।

—আফটার অল আপনি একজন গাভমেন্ট সার্ভেন্ট। গাভমেন্টের চাকরি করতে হলে তার নিয়মকানুনও আপনার জানা উচিত।

টেবিলের ওপর থেকে পেপারওয়েটটা তুলে নিয়ে লোকটার মুখের ওপব ছুঁড়ে মাবতে ইচ্ছে হয়েছিল দীপঙ্করের। অথবা রেজিগনেশানের চিঠিটা।

পরমুহূর্তেই বুকের ভিতর থেকে কে যেন ওকে বলে উঠল, শান্ত হও। তাই দীপঙ্কর বিভ্রান্ত মুখে বললে, নিয়মকানুন!

—যাক সে-কথা বাদ দিন। লোকটি এবার হাসল। বললে, আপনি যদি একটা ভাল কাজ করে থাকেন, গাভমেন্ট নিশ্চয় আপনার এগেনস্টে কোন স্টেপ নেবে না।

হাসতে হাসতে বেশ একটা মুরুব্বি চালে সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বেব কবল লোকটা, টেবিলে দুবার ঠুকল, তারপর ঠোঁটে গুঁজে দেশলাই জ্বালল, ধরাল।

—আপনার ওভাবে প্রেসের কাছে রাশ করা উচিত হয়নি।

এই রাতারাতি বিখ্যাত হওয়া, ওকে নিয়ে আলোচনা এবং আলোড়ন, এ-সবে তো অভ্যস্ত নয়, কখনো কল্পনাও করেনি। একটা কিছু খুঁজছি। খুঁজে পাওয়ার নেশাটাই ছিল। তারপর কি হবে, কি হতে পারে তা ভাবেইনি।

সেজন্যে নিজেরই মনে হয়েছিল অমূল্যকে কথাটা না জানালেই হত।

কিন্তু এই লোকটা সে-কথা বলার কে! এটা তো আবিষ্কার, এটা কি সরকারী ফাইলের কোন গোপন খবর।

ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হচ্ছিল দীপঙ্কর। ও অধৈর্য হয়ে জিগ্যেস করল, উনি কি আসেননি এখনো? আমার আবার অনেক কাজ আছে।

—আসবেন, আসবেন। লোকটা যেন সান্ত্বনা দিল। এমন ভঙ্গিতে বললে. যেন দীপঙ্কর প্রার্থী হয়ে এসেছে তাঁর কাছে। যেন সেই প্রথম জীবনের অসহায় ভাব নিয়ে এসেছে দূরের মফস্বলে ট্র্যান্সফার রদ করাতে, কিংবা ইচ্ছেমত ডিপার্টমেন্টে যাবার অনুরোধ নিয়ে।

লোকটি হঠাৎ বললে, আপনারা এক একটা কাজ করে বসেন····জানেন, মিনিস্টার কাল রাত্রেই সেক্রেটারিকে ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন·····আপনি যদি হসপিটালের ডাক্তার না হতেন, মানে, গাভমেন্ট সার্ভেন্ট না হলে তো কিছু বলার ছিল না।

দীপঙ্কর ততক্ষণে নিশ্চিত হয়ে গেছে। আসলে ব্যাপারটা তা হলে এই। মিনিস্টার খবর শুনেই জানতে চেয়েছেন আরও কিছু ডিটেল্‌স্। হয়তো কৌতূহলবশেই। অথবা চিফ মিনিস্টার তাঁর কাছে জানতে চেয়েছেন বলেই তিনি জানতে চেয়েছেন সেক্রেটারি বা ডিরেক্টরের কাছে। কিন্তু দীপঙ্কর লোকটা কে! সে তো একজন নগণ্য ডাক্তার,

গণ্যমান্যদের অনেক নীচের ধাপের একজন সাধারণ মানুষ। সরকারের গোলাম। ওর চেয়ে কত উঁচু ধাপের মানুষকেও এখানে এসে দরবার করতে হয়, প্রয়োজনে। সেজন্যেই অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারির চিঠি।

তিনি এলেন। প্রশ্ন করলেন, একটা শুকনো কংগ্র্যাচুলেশন্‌স্ জানানোব পরই।

না, এখন আর কিছুই বলার নেই দীপঙ্করের।—যেটুকু বলার তা তো কাগজেই বেরিয়ে গেছে। আপাতত আর কিছু বলতে পারছি না।

—তাহলে চলুন, একবার সেক্রেটারির কাছে।

সেক্রেটারি, ডিরেক্টর, মিনিস্টার—এসব কিছুই বুঝতে চায় না দীপঙ্কর। সকলের কাছেই ঐ একই কথা।—আই হ্যাভ নাথিং টু অ্যাড।

ফেরার সময় সেই লোকটা দাঁতে কাঠি খোঁচাতে খোঁচাতে করিডর অবধি এল। বললে, ভুল বুঝবেন না ডক্টর রায়, আপনার জন্যে আমবা খুব গর্বিত, আজ তো চতুর্দিকে শুধু আপনারই আলোচনা। কিন্তু কাজটা খুব ভাল করলেন না।

কাজটা যে খুব ভাল হয়নি দীপঙ্করও জানে। সেজন্যে ভিতরে ভিতরে ও একটু ভয়ও পাচ্ছিল। ঠিক এই মুহূর্তে চাকরিটা ছেড়ে দিলে ওর নিজের পায়ে দাঁড়াবার জায়গা নেই। ও তো একটা প্র্যাকটিস গড়ে তোলার চেষ্টা করেনি এতদিন, চেষ্টা কবলেও পারত কিনা সন্দেহ। অনেকেই তো পারে না। সেটাও তো আরেক ধরনের গুণ। রুগীরা আসে কেন, রোগ তারা সাবাতে পারে বলেই তো। ফি ডবল করে দিলেও ভিড় কমে না কেন? এর নামই তো এফিসিয়েন্সি।

এই চাকরিটা ছেড়ে দিতে হলে চট্ করে অন্য কোথাও একটা বেসরকারী ভাল চাকরি পাবে বলেও মনে হয় না। এতকাল ও একজন সাধারণ ডাক্তার ছিল, এখন সেটুকুও নয়। বিশেষ করে ঐ রোগটার সঙ্গে ওর নাম যুক্ত হয়ে গিয়ে অনেকেব কাছেই হয়তো অচ্ছ্যুৎ হয়ে গেছে। 'আপনি তো একজন স্পেশালিস্ট, বলতে গেলে সায়েন্টিস্ট আপনি, আমাদেব তো সাধারণ একজন জি পি দরকার।'

এখনও অনেকখানি পথ যেতে হবে দীপঙ্করকে। আসল পথটাই বাকি।

যাবার সময় বাঙ্কিমবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন, বি কেয়ারফুল দীপঙ্কর, পেপাবটা তাড়াতাড়ি রেডি করে জার্নালে পাঠিয়ে দাও। বাজা মারা গেলেই বাজার ছেলে কিন্তু রাজা হয় না। অভিষেক হল আসল, দি অথরিটি। তোমার তেমনি অ্যাকসেপ্টেন্স।

একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলা মানে যে যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া, কে জানত।

দুশ্চিন্তায় অনেক রাত পর্যন্ত ওর ঘুম আসেনি। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে।

অদ্ভুত দুঃস্বপ্ন। স্বপ্নটা ভেঙে যেতে তাই নিশ্চিন্ত বোধ করল।

স্বপ্নে দেখছিল, একজন প্রচণ্ড নামী ডাক্তার হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে একটা মুখোশের দোকানে ঢুকল। সরকারী আমলার মুখোশ পরে বেরিয়ে এল। বললে, এসো আমার সঙ্গে। তার পিছনে পিছনে গেল দীপঙ্কর।

লিফট বেয়ে উঠল। তারপর একটা ঘরে মুখোশের লোকটা ঢুকতেই সকলে দাঁড়িয়ে উঠল। সেই ঘরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আরেকটা ঘব। বিরাট টেবিল। একদিকে গদি আঁটা হেলানো চেয়ার। মুখোশের লোকটা সেখানে গিয়ে বসল।—তুমিও বসো।

দীপঙ্কর তার কথা শুনে বসতে গিয়ে দেখল টেবিলের সামনে শুধু কাঠের টুল পাতা আছে। চেয়ার নেই। তবু ভয়ে ভয়ে বসল।

মুখোশ বললে, তুমি যে পোস্টে আছো, আর আমি যে পোস্টে আছি, এই ডিফারেন্স তোমাদের সব সময়ে মনে থাকে না, সেজন্যেই এ-ব্যবস্থা।

বলেই মুখোশ কলিং বেল্‌টা টিপল। একজন বেয়ারা এসে দাঁড়াল। মুখোশ বললে, ফাইল।

সঙ্গে সঙ্গে বড় অফিসার মেজ অফিসার ছোট অফিসারেরা ফাইল হাতে ঢুকতে শুরু করল। আর তার ওপর মুখোশ সই দিয়ে চলল।

তাদের বিদায় করে মুখোশ বললে, এসব নিয়ে রিসার্চ শুরু করার আগেই তোমার উচিত ছিল আমার কাছে আসা। আমি তোমাকে অ্যাডভাইস দিতে পারতাম।

একটু থেমে মুখোশ আবার বললে, তোমার এই ক্লেম কেউ বিশ্বাস করছে না।

দীপঙ্কর অসহায় ভাবে মৃদু প্রতিবাদ করলে, স্যার, সায়েন্স তো বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। আমার পেপারটা ছাপা হলে দেখবেন....

—আই নো, আই নো। মুখোশ রেগে গিয়ে চুরুট ধরাল। বললে, তুমি বলতে চাও, আমি এখন শুধু এই চেয়ারে বসা মুখোশ, তোমরা তো সে-সব কথাই বলো, হসপিটালে ছিলাম বলেই চেম্বারে ভিড় হত, এখন হয় না। আমি জানি, আমি জানি।

দীপঙ্কর অসহায়ভাবে বললে, না স্যার, সে-সব কথা আমি বলি না।

মুখোশ বেগে গিয়ে বললে, কিন্তু এখন তোমার চোখ বলছে, তুমি একজন ইন্টারন্যাশনালি ফেমাস সায়েন্টিস্ট, আর আমি সামান্য একটা গদি-আঁটা চেয়ারে বসা মুখোশ। আই নো, আই নো।

দীপঙ্কর ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ কবল, না স্যাব।

—কিন্তু তুমি কি জানো সাতজন গাইনি আমার কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছে, তোমার ও ব্যাপারটা পাগলের প্রলাপ।

দীপঙ্কর বিভ্রান্ত হয়ে তাকাল মুখোশের দিকে। গাইনি ? এ-ব্যাপারের সঙ্গে তাদের তো স্যার কোন সম্পর্ক নেই !

—আছে। অবশ্যই আছে। তুমি বলছ, তুমি একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কার কবেছ, অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট টু ভ্যাকসিনেট ওনলি উইমেন।

দীপঙ্কর অসহায় কণ্ঠে বললে, কিন্তু উইমেন স্যার শুধু গাইনিদের সম্পত্তি নয়।

মুখোশ রেগে গেল।—কিন্তু ঠ্যালা তো তাদেরই সামলাতে হবে, পরে যদি কোন রি-অ্যাকশন হয়।

দীপঙ্কর বলে উঠল, স্যার সে-সব তো অনেক পরের কথা। তাছাড়া দেখবেন সাহেবরা যদি মেনে নেয়, তখন ওরাও মেনে নেবে। মেয়েদের তো বসন্তের টিকে কলেবার ইনজেকশন সবই দেওয়া হয়।

—কিন্তু ওটা একটা ঘৃণ্য রোগ, সব সমাজেই ও রোগটাকে ঘৃণা করে সকলে।

দীপঙ্কর হেসে উঠল।—আপনি স্যার আনসায়েন্টিফিক কথা বলছেন। রোগটার ভাল চিকিৎসা নেই বলেই ঘৃণ্য মনে হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জার মত চট্‌ করে সেরে গেলে আর ঘৃণ্য মনে হত না। টিউবারকুলোসিস দেখুন, আগে বলত রাজযক্ষ্মা, কারও পরিবারে হলে কেউ আর সে দিক মাড়াত না।

—বাজে তর্ক করো না।

—কিন্তু স্যার, ভ্যাকসিনটা ঐ রোগ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, প্লেগের মত, পক্সের মত।

—ইউ মে গো।

বলেই কলিং বেল্‌ টেপার সঙ্গে সঙ্গে মুখোশ চিৎকার করে ডাকল, বেয়ারা।

সুইং ডোর ঠেলার শব্দে দীপঙ্কর ফিরে তাকিয়ে দেখল দুজন বলিষ্ঠ চেহারার বলিষ্ঠ গোঁফওয়ালা লোক ওর দুপাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর ঘুমটা ভেঙে গিয়ে দীপঙ্করকে নিশ্চিন্ত এবং আশ্বস্ত করল। নাঃ, স্বপ্ন, সত্যি নয়।

কিন্তু দীপঙ্কর জানে সব স্বপ্নের মধ্যেই একটা সত্যের বীজ থাকে। একটা কোনও দুশ্চিন্তা।

পরের দিনও সেই কথাগুলোই ওকে বারবার ভাবিয়ে তুলছিল। নিশ্চিন্ত হয়ে টাইপরাইটারের সামনে বসতে পারছিল না। অথচ নিবিষ্টমনে বসে পেপারটা তৈরি করে ফেলতে হবে।

ও বেশ বুঝতে পারছিল, না জেনে ও একটা ভিমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়ে দিয়েছে।

—তুমি তো কারো স্বার্থে ঘা দাওনি, তোমার এত চিন্তা কিসের ? সীমা ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেছিল।

শুনে হো হো করে হেসে উঠল দীপঙ্কর।—চিন্তা ? চিন্তা নয়, বিরক্তি।

এ রাস্তায় যেদিন এসেছি, সেদিনই মেরুদণ্ডটা খাঁটি স্টিল দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু অনবরত পিঁপড়ে কামড়ালে মানুষ মরে না, জানি, তবে তাকে কাজও করতে দেয় না। পায়ের বুড়ো আঙুল টিপে টিপে তুমি কত পিঁপড়ে মারবে ?

একটু থেমে বলেছিল, স্বপ্নে যে মুখোশ-পরা লোকটাকে দেখলাম, সে হাসপাতাল ভাঙিয়ে বড় ডাক্তার হয়েছিল, এখন আমলা। তাকে হয়তো আমি যথেষ্ট খাতিব করতে পারিনি। অনেক কিছু ডিটেল্‌স্ জানতে চাইছিল, বলিনি। বললেও বুঝত না। সেজন্যেও রাগ হতে পাবে। কিন্তু দুজন বিখ্যাত গাইনি নাকি

সীমা বললে, সাতজন।

দীপঙ্কর হেসে ফেলল। না, ওটা স্বপ্নে। আসলে ডিরেক্টর বলছিলেন, দুজন গাইনি নাকি অবিশ্বাস করছে।

সীমা প্রশ্ন করল, তাবা কারা ?

এই সময় অমূল্য এসে হাজির হল। দীপঙ্কর হেসে বললে, হেয়াব ইজ দি কালপ্রিট। তোমার জন্যেই আমার এখন সব কাজ পণ্ড হতে চলেছে। পেপার রেডি করাব সময় পাচ্ছি না। গাইনিরা কেউ কেউ নাকি অবিশ্বাস করছে।

অমূল্য হেসে বললে, আমি জানি, সব জানি। ডাক্তার চ্যাটার্জি, আর ডাক্তার মৌলিক। ওরা দুজনই বিখ্যাত বলে ওদেরই দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু তাব পিছনেও অনেকে জোট বাঁধছে।

—কেন ? আমি তো একটা রোগ পৃথিবী থেকে নির্মূল করার বাস্তা পেয়েছি, একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছি।

অমূল্য হাসতে হাসতে বললে, আপনি কিন্তু বলেছেন ভ্যাকসিনে যে গোনোডোট্রোপিন হরমোন ব্যবহার করা হবে তার ফলে এক ধরনের বন্ধ্যা মেয়েদেব বন্ধ্যাত্বও দূব হবার সম্ভাবনা। তাহলে গাইনিদের সম্পর্ক নেই বলছেন কেন ?

দীপঙ্কর বললে হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছি। অবশ্য ও দিকটা নিয়ে আব স্টাডি করিনি, বঙ্কিমবাবুকে বলছিলাম, উনি যদি কবেন। কিন্তু এতে তো গাইনিদেবই লাভ। তাছাড়া, ভেবে দ্যাখো, কোনও ভ্যাকসিনই মানুষ চট্ করে নিতে চায়নি, কিন্তু এই দিকটাও যদি প্রমাণ হয় মেয়েরা নিতে রাজি হবে।

দীপঙ্কর বললে. তাছাড়া ওর সঙ্গে তো ভ্যাকসিনের কোন সম্পর্ক নেই। ব্রাউন মাইসের ওপর ওটা প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখলাম····

এই নির্বোধ মানুষটাকে কি বোঝাবে অমূল্য। শুধু বললে, অন্যায়টা আমিই করেছি। কি জানেন সীমাবৌদি, যতই সিনিক হয়ে উঠি না কেন, আমাব মধ্যেও কখনো কখনো

আদর্শ-ফাদর্শ উঁকি দেয়। ভাবলাম, সেই তো বিলেত আমেরিকা ঘুরে খবর আসবে, তখন ছাপা হবে, এমন একটা গর্বের খবর, নিজেরাই ছেপে দিই।

সীমা সান্ত্বনা দিয়ে বললে, না না ভাই, তুমি কোন দোষ করোনি। যা সত্যি, তা ছাপা হবে নাই বা কেন।

দীপঙ্কর হেসে উঠল।—এত ওয়ারিড হবার কিছু নেই অমূল্য। ওরা কাকে খুন করতে পারে, বড়ো জোর আমাকে। সায়েন্স নিডস নো বডিগার্ড, বিজ্ঞানের কোন বডিগার্ড দরকার হয় না। তাকে কেউ খুন করতে পারে না।

অমূল্য হাসল। —ঠিক। কিন্তু দুঃখ কি জানেন দীপঙ্করদা, কিলার্সদের নামগুলো কেউ লিখে রাখে না, আর ইতিহাসে তারা এতই তুচ্ছ হয়ে যায় যে নামগুলো লিখে রাখার কেউ প্রয়োজন বোধ করে না। ওরা টাকা করে, বাড়ি করে, জাঁকিয়ে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়, তারপর একসময় ভ্যানিশ হয়ে যায়।

দীপঙ্কর বললে, এটা রাগের কথা। সব ডাক্তার তা নয়, আমরা যাঁদের কথা মনে করে রেখেছি, ভেবে দ্যাখো....

অমূল্য বললে, তাঁরা শুধু ডাক্তারই ছিলেন না। ফার্স্ট অ্যান্ড ফোরমোস্ট তাঁরা প্রথমে মানুষ ছিলেন, তারপর ডাক্তার।

দীপঙ্কর বললে, একালেও তেমন মানুষ আছেন। সার্জেন, গাইনি....

—আঙুলে গোনা যায়। অমূল্য বললে। একটু থেমে বললে, আসলে এরা তো গাড়ির মিস্ত্রি, মোটর মেকানিক। প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে বলেই এত সম্মান, এবং এত টাকা।

দীপঙ্কর হেসে বললে, তুমি সত্যি সিনিক হয়ে যাচ্ছ। এখন যাও, এখন যাও, আমার এখন অনেক কাজ। হসপিটালে যেতে হবে।

অমূল্য আসে কম, কিন্তু এলে সহজে তাড়ানো যায় না। বসে, গল্প করে, চা-খাবার খেয়ে তবেই বিদায় নেবে।

আরও কিছুটা সময় নষ্ট করে অমূল্য চলে গেল।

স্নান খাওয়াদাওয়া সেরে দীপঙ্কর তৈরি হচ্ছিল, সীমা বললে, ট্যাক্সিতে যেও।

দীপঙ্করের গাড়ি নেই। যা মাইনে পায় তাতে গাড়ি কেনা যায় না। কেনা গেলেও মেনটেন করা যায় না। ও তাই মিনিবাসেই যাতায়াত করে।

দীপঙ্কর হেসে বললে, ভয় নেই, প্রেসার বাড়েনি।

ও ঠিক করে রেখেছে প্রথমেই একবার প্রফেসর কুণ্ডুর সঙ্গে ওঁর কলেজে গিয়ে দেখা করবে। হয়তো অভিমান বশে একটা টেলিফোনও করেননি। আসলে ওঁর কাছে অনেক সাহায্য পেয়েছে এই রিসার্চের ব্যাপারে। এমনকি কয়েকটা ছোট যন্ত্রপাতিও দু-চারদিনের জন্যে ধার দিয়েছিলেন। কলেজের সম্পত্তি, কেউ জানতে পারলে উনি বিপদে পড়তেন, তবু।

দীপঙ্করের উচিত নিজে গিয়ে বলে আসা। ডিটেল্‌স্ ওঁকে এর আগেই কিছু কিছু বলেছে।

সেখান থেকে হসপিটালে।

নানা অ্যাসিডের পাঁচমিশেলি কটু গন্ধে ভরা ল্যাবরেটরি ঘরের শেষ প্রান্তে বসেছিলেন প্রফেসর কুণ্ডু।

দীপঙ্করকে ঘরে ঢুকতে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ছ ফুট লম্বা চেহারা, মাথায় মসৃণ টাক, চোখের তারায় ঈষৎ পিঙ্গল আভা।

উঠে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে একটা অদৃশ্য টুপি খুলে কুঁজো হয়ে বাও করার ভঙ্গি করলেন।

দীপঙ্কর লজ্জা পেয়ে গেল ; কারণ প্রফেসর কুণ্ডু শুধু বয়সেই ওর চেয়ে অনেক বড় নন,

রীতিমত একজন নামকরা বিজ্ঞানী।

এখানে ওখানে ছাত্রছাত্রীরা ল্যাবরেটরিতে কাজ করছিল। প্রফেসর কুণ্ডু তাদের ডাকলেন, বয়েজ !

তারপরই হেসে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, বয়েজ ইনক্লুডস গার্লস। কাম হিয়ার। এখানে এসো সব।

তারা ভিড় করে এল। আর প্রফেসর কুণ্ডু বেশ নাটকীয় ভাবে বললেন, লেট মি ইনট্রোডিউস মাই ফ্রেন্ড, পারহ্যাপস দি গ্রেটেস্ট সায়েন্টিস্ট....

দীপঙ্কর লজ্জায় অস্বস্তিতে বললে, স্যার, আমি তাহলে পালাব।

প্রফেসর কুণ্ডু হেসে ফেললেন, না বুঝে ছেলেমেয়েরাও।

প্রফেসর কুণ্ডু ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, হি ইজ ডক্টর দীপঙ্কর রয়।

সঙ্গে সঙ্গে অবাক হওয়ার একটা সমবেত ধ্বনি শোনা গেল।

ছেলেরা অনেকে একেবারে ওর গায়ের ওপর এসে পড়ল, দু-একটা প্রশ্ন করল।

দীপঙ্কর হাসতে হাসতে উত্তর দিচ্ছিল, একটি মেয়ে এগিয়ে এসে একটি ছেলেকে বললে, এই সরে দাঁড়া।

তারপর দীপঙ্করকে বললে, দাঁড়ান, আপনাকে একটা প্রণাম করব।

বলে মেয়েটি ওকে প্রণাম করল। দেখাদেখি আরেকটি মেয়েও। প্রথম মেয়েটি ওকে প্রণাম করে প্রফেসব কুণ্ডুকেও প্রণাম করল। আর প্রফেসর কুণ্ডু হেসে উঠে বললেন, মেয়ে খুব হিসেবী দেখছি, এখানেও প্যারিটি বজায় রাখছে।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

শুধু দীপঙ্করের একটু অস্বস্তি লাগল। ও কাউকে প্রণামটনাম করে না, অভ্যস্ত নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর মনে হল প্রফেসর কুণ্ডুকে ওর প্রণাম করা উচিত ছিল। কিন্তু পারল না।

দীপঙ্কর ভেবেছিল চুপচাপ এসে প্রফেসর কুণ্ডুকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাবে। এবং কিভাবে ওর গবেষণা সাফল্য লাভ করল তার বর্ণনাও দেবে।

প্রফেসর কুণ্ডু বললেন, শুধু হাতে কেন ? মিষ্টি কই ?

ছাত্রছাত্রীর দল আবার হেসে উঠল।

এরই মধ্যে কেউ হয়তো খবরটা বাইরে পাচার করে দিয়েছে। দেখা গেল করিডরে কেউ কেউ পায়চারি করছে, সুইং ডোর ঠেলে দু-একজন উঁকি দিয়েও গেল।

ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে কি সব ফিসফাস যুক্তি করে এসে আব্দার ধরল, স্যার, আমাদের কলেজে একদিন একটা লেকচার দিতে হবে।

দীপঙ্কর হাসতে হাসতে বললে, দেব।

আর প্রফেসর কুণ্ডু বললেন, উনি শুধু ডাক্তার নন, হি হ্যাজ এ ডক্টরেট ট্যু ইন হিজ পকেট। ডক্টরেট অফ সায়েন্স।

দীপঙ্কর নিজেও যেন চমকে উঠল। ও যে অনেককাল আগে, প্রথম দিকেই একটা ডক্টরেট পেয়েছিল তা যেন ভুলেই গিয়েছে।

প্রফেসর কুণ্ডুর ব্যবহারে, ওঁর ছাত্রছাত্রীদের বিস্ময় মেশানো শ্রদ্ধায় দীপঙ্কর অভিভূত হয়ে গেল। পৃথিবীর রঙ বদলে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

মনে মনে ভাবল, আমরা প্রত্যেকটি মানুষ এই ভুলই করি। আমরা আমাদের কাছের গণ্ডির মধ্যেই নিজেদের মূল্য যাচাই করি, মূল্য না পেলে ভেঙে পড়ি, হতাশ হই।

দীপঙ্কর যেন একটা বিরাট সান্ত্বনা পেয়ে গেল, বটবৃক্ষের ছায়ার মত।

ছেলেবেলায় স্কুলে একটা পিরিয়ড ছিল ফিজিক্যাল ট্রেনিং। একদল ছেলে হাঁটু গেড়ে

চার-হাত-পায়ে বসত, তার পিঠে আরেক দল, এইভাবে ছোট হতে হতে একটা পিরামিড বানানো হয়ে যেত। হয়ে গেলেই টিচাররা হাততালি দিতেন।

এই আমলাতন্ত্রও ঠিক ঐ রকম হাঁটু আর হাতে ভর দিয়ে সেক্রেটারি থেকে কেরানী অবধি পিরামিড হয়ে আছে বলেই বিশ্বভুবনের কোনও ব্যাপারে হাততালি দেবার ক্ষমতা নেই। আর হাততালিতে অভ্যস্ত নয় বলেই কেবল ক্ষমতার দম্ভ দেখিয়ে হাততালি পেতে চায়।

কিন্তু ওর সহকর্মীরা ? ডাক্তার বন্ধুরা ? তাদের কারও কারও চোখে ও এতকাল যে তাচ্ছিল্য দেখে এসেছে, ও ভাবত তা শুধুই অসাফল্যের প্রতি সাফল্যের উপেক্ষা। ও তো সাকশেসফুল ডাক্তার হয়ে উঠতে পারেনি, সেজন্যেই।

আজ প্রফেসর কুণ্ডুর কথায় কারণটা যেন খুঁজে পেয়েছে। প্রফেসর কুণ্ডুই ওকে মনে পড়িয়ে দিয়েছেন। হি হ্যাজ এ ডক্টরেট ইন হিজ পকেট।

ডাক্তার হলেও ওর পিঠে যে একটা বিজ্ঞানীর ছাপ আছে সেটাই কেউ কেউ হয়তো পছন্দ করে না। দীপঙ্কর ভুলে থাকলে কি হবে, তারা ভুলতে পারে না।

গতকাল সেক্রেটারির সঙ্গে প্রথমে এবং পরে ডিরেক্টরের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে ও যখন ওর হাসপাতালে এসেছিল, অনেকেই হেসেছে, অভিনন্দন জানিয়েছে ; দু-একটা কথা জানতেও চেয়েছে।

প্রফেসর কুণ্ডুর সঙ্গে দেখা করে খুশি-খুশি মন নিয়ে হাসপাতালে এসে কিন্তু ওর কেমন খট্‌কা লাগল। হঠাৎ বাতাবাতি কোথায় কি একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে।

সকলেই কেমন চুপচাপ, কিংবা এড়িয়ে চলেছে। দু-চারজন কম বয়েসী হাউস সার্জন শুধু কৃতার্থ হওয়ার ভঙ্গিতে কথা বলছিল।

দীপঙ্কর ওর চেয়ারে বসেছিল। দীপঙ্কর লক্ষ করল গলায় স্টেথিসকোপ ঝোলানো একটি ছেলে ঘুরঘুব করছে। কেন বুঝতে পারছিল না।

হঠাৎ একসময় দীপঙ্কর একা হয়ে যেতেই সে এগিয়ে এল।

তারপব বেশ বিনীত বিগলিত হাসি হেসে ফিসফিস কবে বললে, ডক্টর রয়, ব্যাপারটা সত্যি তো ?

—কোন ব্যাপাবটা ? দীপঙ্কব চমকে উঠে জিগ্যেস করল।

ছেলেটি মুখ কাচুমাচু করে বললে, না, মানে, ওদের কাছে শুনে এত খারাপ লাগছে। তারপর একটু থেমে বললে, আমি কিন্তু বিশ্বাস করেছি।

দীপঙ্কর ভিতবে ভিতরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, তবু নিজেকে যতখানি সম্ভব সংযত করল।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, রুগীর সঙ্গে ডাক্তারেব সম্পর্কটা বিশ্বাসের, ডাক্তারের সঙ্গে ওষুধ কোম্পানির সম্পর্কটা বিশ্বাসের। কিন্তু ওষুধ জিনিসটা সায়েন্স, ওটা বিশ্বাসের ওপব নির্ভব করে না।

ছেলেটি কি বুঝল কে জানে, বললে, ঠিক বলেছেন।

বলেই চলে গেল।

আর দীপঙ্করেব মনে হল ওর অজ্ঞাতে কোথায় কি যেন একটা ঘটে চলেছে। কোন চক্রান্ত ? কিন্তু কেন ?

৪

রামানন্দ সান্যালেব মত সুদর্শন সুপুরুষ চেহারা গাইনিদের মধ্যে বিরল বললে কমিয়ে বলা হয়।

অরিজিৎ ব্যানার্জির স্ত্রী পারমিতা একবার ঠাট্টা করে বলেছিল, ডাক্তার সান্যাল, আপনার

কিন্তু সিনেমায় নামা উচিত ছিল, ভাল হিরোর যা অভাব আজকাল।

রামানন্দ হেসে বলেছিল, ভাল হিরোইনেরও অভাব।

পারমিতা চোখ পাকিয়ে বলেছে, দেখুন মশাই, আমার ছেলে বিলেতে পড়তে গেছে, মেয়ের এবার বিয়ে দেব। আপনাদের চলে, দেখছেন না, পাকা চুল নিয়েও রাজকাপুর দিব্যি হিরো হচ্ছে। উত্তমকুমার ?

অনেকে বলে গাইনি হিসেবে রামানন্দ সান্যালের এই দ্রুত খ্যাতি ও আর্থিক প্রতিপত্তির পিছনে ওর চেহারাটাও কাজে দিয়েছে। প্রায় সিনেমার রোমান্টিক অভিনেতাদের মত একটা সংযত অমায়িক হাসি ওর মুখে লেগেই থাকে। ব্যবহারে কথাবার্তায় এমন একটা আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব এবং বিনয় পরস্পরের সঙ্গে মিশে থাকে যে বিভ্রান্ত রোগিণী এবং তাব অভিভাবকরা মুগ্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ওর ছাপানো লেটাব হেডে যে-সব দেশী-বিদেশী ডিগ্রি আছে, তা লিখতে রোমান হরফের বোধহয় সবকটা অ্যালফাবেটই প্রয়োজন। ওর সার্জারির হাতও অসম্ভব ভালো, যদিও কখনও কখনও রক্তে ভেজা তোয়ালে, কিংবা ছুরি কাঁচি ইত্যাদি ভিতরে রেখে সেলাই সম্পন্ন করেছে। তেমন দুর্ঘটনা অবশ্য কদাচিৎ ঘটেছে এবং তার জন্যে রামানন্দর অনুশোচনা হয়নি বললে অন্যায় বলা হবে।

আসলে রামানন্দ কিন্তু খুবই দায়িত্বশীল চিকিৎসক। প্রভূত টাকা উপার্জন কবেছে এবং এখনও করে। নিজেরই নার্সিং হোম, বেশ বড-সড়, এবং তার চেয়েও বেশি খ্যাতি। এ লাইনের সকলেই যথেষ্ট সমীহ করে। কনফাবেন্সে যায়, প্রেসিডেন্ট হয়, কাগজে ছবি ছাপা হয়।

দীপঙ্কর রায়ের খবরটা রামানন্দ দেখেছিল, তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এ-বকম খবর মাঝেসাঝেই দেখা যায়, সবকারী সূত্রেও হিল্লিদিল্লি নানা রিসার্চ সেন্টারের আবিষ্কাবের দাবি হঠাৎ হঠাৎ খবর হয়ে ছাপা হয়, তাবপব সে-সম্পর্কে আর কিছু শোনা যায় না। ভেবেছিল এটাও সে-রকমই কিছু। খবরটা দেখে হেসেছিল। দীপঙ্কব রায়কে মনেও পডল। দু-একবার দেখা হয়েছে। অরিজিৎ ব্যানার্জির গৃহপ্রবেশের দিন এক কোনায় বসে কটি ইয়াং ডাক্তারের সঙ্গে খুব জমিয়ে গল্প করছিল, হাসছিল। যাবা আবিষ্কার করে, সিরিযাসলি রিসার্চ করে, তারা অন্য ধাতুতে গড়া। রোনল্ড্ রস কিংবা লুই পাস্তুবের ছবির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ধীর স্থির গম্ভীর প্রকৃতিব মানুষ ওঁরা। সমস্ত জীবনটা কাটিযে দিযেছেন একটা আদর্শের পিছনে। রামানন্দ ভাবল, এই যে আমার সাকশেস, এব পিছনেও একটা আদর্শ কাজ করে গেছে। আজ আমার প্রভূত টাকা, বাড়ি করেছি, নার্সিং হোম কবেছি, কিন্তু কজন জানে যে টাকার প্রতি আমার কোন মোহ নেই। কি অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে আমাকে বড় হতে হয়েছে কজন খবর রাখে। কত দুরূহ অপারেশন কবার জন্যে সাহস কবে এগিয়ে গিয়েছি কে তার হিসেব রাখে।

সকাল বেলাতেই অরিজিৎ ব্যানার্জির টেলিফোনটা পেয়ে হেসে উডিযে দিয়েছিল রামানন্দ। খবরটা ও তখনও শেষ অবধি পড়েও দেখেনি। ব্যাপাবটায় ওব কোন ইনটারেস্ট থাকার কথাও নয়।

ও-সব স্কিন স্পেশালিস্টরা ভাববে, কিংবা ঐ সব হোমের স্পেশালিস্ট ডাক্তাবরা। আমাদের সঙ্গে কি সম্পর্ক।

কিন্তু রিসিভার নামিয়ে রেখেই হঠাৎ খটকা লাগল। অবিজিৎ হঠাৎ আমাকে ফোন করল কেন ?

খবরের কাগজটা আবার টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করল। এবং দীপঙ্করের খবরটা শেষ অবধি পড়ে বলে উঠল, আই সি।

জমিটা কিনে এই বাড়িটা করাব সময়ে পাঁচিল দিয়ে ঘিবতে গিযে পাশেব বাড়ির সঙ্গে

একটু ঝগড়া বেধেছিল। ওদের একটা করবী গাছের ডাল এদিকে এসে পড়েছে, ডালটা কেটে না দিলে পাঁচিল ওঠানো যাবে না।

—কেটে দেবেন ? পাশের বাড়ির ভদ্রলোক বলেছিলেন, পাঁচিলটার হাইট এক ফুট কমই রাখুন না।

কি আব্দার।

—আপনার ডালটাই বড় হল আমার পাঁচিলের চেয়ে ?

লোকটা কি অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়েছিল। বলেছিল, তা নয়, মানে, গাছটা মা বসিয়েছিল। মারা গেছেন অবশ্য, তবে তাঁর আশীর্বাদেই তো বাড়িটা করতে পেরেছি। মায়া হয়।

এনক্রোচমেন্ট জিনিসটা লোককে বোঝানো মুশকিল।

দীপঙ্করের খবরটা পড়েও সেজন্যেই রামানন্দ বিচলিত হয়ে উঠল। দিস ইজ এনক্রোচমেন্ট। তুমি হে ছোকরা ঐ সব অস্পৃশ্য রোগ নিয়ে আছো, কিছু করতে চাও করো। কিন্তু গাইনিদের এলাকায় নাক গলাচ্ছ কেন ?

রামানন্দ বিচলিত বোধ করল, মনে হল একটা কিছু করা দরকার। উপস্থিত ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপার নিয়ে বিব্রত হয়ে আছে বলেই রাগ আরও বেড়ে গেল।

দুপুরে নার্সিং হোমের বেডগুলোয় একটা চক্কর দিয়ে আসে রামানন্দ। সে-সময়ে অন্যান্য জুনিয়াররাও থাকে। দু-একজন নামকরা বন্ধু ডাক্তারও আসে, তাদের পেশেন্টদের দেখে যায়।

একজন নার্স আর একজন জুনিয়র ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে বেশ স্মার্ট ভঙ্গিতে ঘরে ঘরে রুগীদের দেখতে দেখতে যাচ্ছিল রামানন্দ।

একটা ঘরে ঢুকে বেডের সামনে এসে দাঁড়াল। হাসতে হাসতে বললে, ব্যস, এবার উঠে পড়ুন, হেঁটে বেড়ান।

ভদ্রমহিলা বালিশে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, দিনকয়েক আগে অপারেশন হয়েছে, জুতোর শব্দে কাগজটা সরিয়ে ডাক্তার সান্যালকে দেখে মুখে স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে দিলেন। ভদ্রমহিলাকে দেখলেই বোঝা যায় বেশ ধনী ঘরের স্বামীসোহাগিনী। যেমন রূপসী, তেমনই সুখী সুখী ভাব। কপালের কাছে কোঁকড়ানো চুল, সুন্দর ভুরু, বাঁ চোখের নীচে ছোট্ট একটা কালো স্পট। তিল বোধহয়।

ভদ্রমহিলাকে দেখে চট করে ধরা না গেলেও বয়েস হয়েছে, চল্লিশ পার করেছেন, ঈষৎ স্থূলত্বের আভাস থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু ধনী গৃহিণী বলেই হয়তো কথায় একটা আদুরে আদুরে ভাব, কিঞ্চিৎ ন্যাকামি এবং অনেকখানি বোকামি মেশানো।

ভদ্রমহিলা ডাক্তার সান্যালকে দেখেই হাসলেন, জিগ্যেস করলেন, ডাক্তারবাবু, আজ কেমন দেখছেন বলুন। ভাল আছি ?

রামানন্দ হেসে ফেলল। বিশেষ করে এই ধরনের কথা নার্স ও জুনিয়ারের সামনে শুনতে হলে হাসি পাবারই কথা। তবু এরাই তো রামানন্দর লক্ষ্মী, অর্থাৎ লক্ষ্মী এনে দেয়।

তাই রামানন্দ হেসে বললে, ফাইন ! এবার একটু একটু দাঁড়াতে, হাঁটতে চেষ্টা করুন। তা হলেই ছুটি।

ভদ্রমহিলাকে বেশ খুশি দেখাল। আর রামানন্দ নার্সের হাত থেকে প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে আরও কিছু ওষুধ লিখে দেবার নির্দেশ দিল জুনিয়ারকে।

ঠিক তখনই ভদ্রমহিলা বলে বসলেন, ডাক্তারবাবু, কাগজে আজ একটা দারুণ খবর আছে দেখেছেন ?

এই রোগিণীর আদুরেপনায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে রামানন্দ, সেজন্যেই হাসতে হাসতে বললে, কি খবর ?

—বা রে, দেখেননি ? বলেই কাগজটা টেনে নিয়ে আঙুল দেখাল সেই জায়গাটায়, যেখানে দীপঙ্কর রায় সম্পর্কে খবরটা ছাপা হয়েছে।

রামানন্দর মুখের চেহারা যেন মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল। কিন্তু সেটা যাতে নার্স বা জুনিয়ার ধরতে না পারে সেজন্যেই রামানন্দ কেমন একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। বলল, হুঁ।

—দীপঙ্কর রায়ের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে ? দেখেছেন ওঁকে ? এমন বিস্ময় মেশানো আদুরে গলায় কথাটা বললেন ভদ্রমহিলা যে রামানন্দর মনে হল চিনি না বললে রামানন্দর নিজেরই মূল্য কমে যাবে ওঁর কাছে।

রামানন্দ হেসে বললে, আছে।

ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে বেশ আদুরে আদুরে কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করে বসলেন, ডাক্তারবাবু আপনি কিছু আবিষ্কার করেছেন ?

ওঁর এই বোকামি দেখে নার্স এবং জুনিয়ার একসঙ্গে হেসে উঠল।

আর রামানন্দর সেই হাসিটাও কেমন অসহ্য লাগল।

অস্বস্তি কাটাবার জন্যে রামানন্দকে ব্যস্ততা দেখাতে হল।

বললে, চলি।

বাইরে বেবিয়ে এসে নার্স আর জুনিয়ারকে উদ্দেশ করে বললে, কত রকম স্টুপিড পেশেন্টদের যে টলারেট করতে হয় !

ওরা নিঃশব্দে শুধু হাসল।

রামানন্দ মনে মনে ভাবল, এই সব মূর্খ সাধারণ মানুষরাই আমাদের বুকের মধ্যে ঈর্ষা জ্বালিয়ে দেয়। দীপঙ্কর রায়ের ওপর ওব তো কোন বাগ নেই, ঈর্ষাও ছিল না। ঈর্ষা কবার মত তাব আছেই বা কি। এতদিনে নামের পাশে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসব লিখতে পাচ্ছে। রামানন্দ কতকাল আগে ওসব পাট চুকিয়ে এসেছে। প্রফেসরও হয়েছিল। একটা পুরো গাইনি ডিপার্টমেন্ট ছিল ওব হাতে। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবে না, কি সব আইনকানুন করতে গেল, চাকরিতেই ইস্তফা দিয়ে দিল রামানন্দ। এর নাম যোগ্যতা।

দীপঙ্করকে ঈর্ষা করবে কেন ? না টাকা করতে পেরেছে, না চাকরিতে উন্নতি। চাকরিতে কি করে উন্নতি করতে হয় সেটুকুও জানে না।

ও যদি সত্যি কিছু একটা আবিষ্কার করে বসে থাকে, রামানন্দর ক্ষতি নেই। কিন্তু ওর কথাবার্তা শুনেই বোঝা যাচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটা পাগলের প্রলাপ। একটা রোগের ভ্যাকসিন, তার সঙ্গে বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ আসে কোত্থেকে ?

—কেন স্যার, চিকেন পক্সের সঙ্গে যদি সম্পর্ক থাকতে পারে, একটা পেপার পড়েছিলাম যেন, চিকেন পক্স যদি পিউবার্টি অ্যাটেন্ড করার পর কোন মেয়ের হয়, অনেক সময়···

রামানন্দ হেসে উঠল। আরে সে অন্য ব্যাপার। একটা রোগ হলে শরীরের কোথাও কোথাও ক্ষতি তো করতেই পারে। যেমন অন্ধ হয়ে যায়।

রামানন্দ নার্সিং হোমে যে ঘরটিতে বসে সে-ঘরে তখন জনাকয়েক গণ্যমান্য চিকিৎসক, বেশ কয়েকজন অল্পবয়সী।

ডাক্তার বিশ্বাস বললেন, আমি কিন্তু বিশ্বাস করেছি।

রামানন্দ হেসে উঠল, আপনার নামেই তো বিশ্বাস।

রামানন্দ বন্ধু হলেও তার এই ধরনের খেলো কথায় ডাক্তার বিশ্বাস একটু আহত হলেন। বিশেষ করে ইয়াং ছেলেগুলো হেসে উঠল বলে।

উনি চুপ করে গেলেন।

রামানন্দ বললে, দীপঙ্করের ওটা একটা স্টান্ট, প্রোমোশন পাওয়ার রাস্তা তৈরি করছে।

কিংবা পি জি-তে ট্র্যান্সফার চাইছে।

আরেকজন বলে উঠল, ঠিক ধরেছেন। হেলথ ডিপার্টমেন্ট আবার এই সব আবিষ্কার-টাবিষ্কার শুনলে ঘাবড়ে যায়, সমীহ্ করে।

ডাক্তার বিশ্বাস ছাড়া আর সকলেই হো হো করে হেসে উঠল।

রামানন্দর ভক্ত শিষ্য এক বাচ্চা ডাক্তার, রুজিরোজগারের জন্যে যাকে রামানন্দর ওপরই নির্ভর করতে হয়, সে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, স্যার, এর নাম তো প্রতারণা।

ডাক্তার বিশ্বাসও একজন সুবিখ্যাত গাইনি। দক্ষ সার্জেন হিসেবেও প্রচুব নাম। তবে খুব গরিবের ঘর থেকে বড় হয়েছেন। টাকা করেছেন, বাড়ি গাড়ি সবই। তবে বামানন্দর মত এতখানি নয়। চরিত্রে রামানন্দর মত এতটা আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন দম্ভও নেই।

ডাক্তার বিশ্বাস অর্থলোলুপ নন, ফি বাডিয়েছেন, কিন্তু যৎসামান্য। দিনকাল যা পড়েছে না বাড়িয়ে উপায় নেই।

কিন্তু টাকার নেশায় পড়ে যাননি। দরিদ্র-দুঃস্থ লোকের কাছ থেকে কখনও কখনও কম ফি নেন। ওঁর মধ্যে কেমন একটা তৃপ্ত ভাব আছে, এবং মানুষেব প্রতি বিশ্বাস।

খবরটা পড়ে ডাক্তার বিশ্বাসের ভীষণ ভাল লেগেছিল। যাক্ গর্ব কবার মত বাঙালীর ভাগ্যে আবার কিছু জুটল। যদি সত্যি হয়, হবে নাই বা কেন, সায়েন্সের ইতিহাসে আরেকটা বাঙালী নাম। বাঙালী বলছি কেন, ইন্ডিয়ান।

বাচ্চা ডাক্তারটি নিঃসন্দেহে বামানন্দকে খুশি করার জন্যে বলে উঠল, এব নাম প্রতারণা।

ডাক্তার বিশ্বাস অবাক হয়ে তাকালেন তাব দিকে। অন্য সকলেব দিকে। মনে হল সকলেই রামানন্দর দিকে। হবারই কথা। কারণ এই নার্সিং হোম রামানন্দর। ওরা সকলেই এটার ওপর নির্ভর করে আছে। ওরা দল হয়ে গেছে। কে দল বানায়? স্বার্থ, আবাব কে!

ডাক্তার বিশ্বাস জানেন রামানন্দ অখুশি হলেও ওঁর কিছু যায় আসে না। ওঁব পেশেন্টবা ওঁর কাছেই আসে। আসবেও।

ডাক্তার বিশ্বাস বললেন, শুনলাম আজ বি বি সি থেকেও খবরটা বলেছে। ওদের দেশ থেকে কেউ স্বীকৃতি না দিলে আমাদের অবিশ্বাস যাবে না।

হেসে বললেন, আমরা তো বিচারক নই, বিচার করার লোক অন্য। তারা সায়েন্টিস্ট। তারা কি বলে দেখাই যাক না।

—তাহলে আপনি বিশ্বাস করেছেন এ-কথা বললেন কেন? একজন বলে উঠল।

ডাক্তার বিশ্বাস হাসলেন। বললেন, একটাই কারণ। আমি দীপঙ্কর বায়কে চিনি না, কখনও দেখিনি। কিন্তু শুনলাম রিসার্চের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন দীর্ঘকাল। সায়েন্সে ডক্টরেটও করেছিলেন। তাছাড়া একজন অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর মেডিকেলেও।

সকলে উচ্চস্বরে হেসে উঠল। —অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসব তো কতই আছে।

ডাক্তার বিশ্বাস ওদের হাসি শুনেও বিব্রত বোধ করলেন না।

বললেন, ডাক্তাব দীপঙ্কর রায় যা হয়েছেন, তাও প্রতিষ্ঠা হিসেবে ফেলনা নয়। একটা লোক জালিয়াতি করে সে-সব বিসর্জন দিতে যাবে কেন? সে তো জানে শেষ পর্যন্ত বিদেশেব সায়েন্টিস্টরা স্বীকৃতি না দিলে কিছুই নয়। উপরন্তু এখানে দুর্নাম।

রামানন্দ ভিতরে ভিতরে ক্রমশই রেগে যাচ্ছিল।

ডাক্তার বিশ্বাসের কথাগুলো শুনে ওর মনে হল, দু-একজন ওর কথাতেও কনভিন্সড হয়ে যেতে পারে। অথচ, এতক্ষণ ওরা রামানন্দর কথাই বিশ্বাস করছিল।

রামানন্দ বললে, বিলেত পর্যন্ত যাতে ব্যাপারটা না গড়ায় সেটা আমাদেরই দেখা উচিত। আমাদের দুর্নাম।

সেই ভক্ত শিষ্যটি বললে, আমাদের ইন্ডিয়ান ডাক্তারদের এমনিতেই বিলেতে আজকাল সেই আদর নেই। এরপর এই সব ফোর্জারি ঘটলে.....

রাইট ইউ আর। রামানন্দ বললে। তাছাড়া দীপঙ্করকে আমি চিনি, দেখেছি। একেবারে হাল্কা টাইপের, কোন সিরিয়াসনেস তার মধ্যে দেখিনি। হাসি ইয়ার্কি ফাজলামিই জানে শুধু।

ডাক্তার বিশ্বাস বললেন, আপনি আইনস্টাইনকে শুধু বেহালা বাজাতে দেখে থাকলেও তো এ-কথাই বলতেন।

ডাক্তার বিশ্বাস হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন।—উঠি। আমাদের তো আবার টাকা রোজগারের ধান্দা, এসব নিয়ে সময় নষ্ট করার মত সময় নেই।

চলে গেলেন।

আর কে যেন বলে উঠল, দাম্ভিক। এই দম্ভ নিয়েই গেলেন।

একজন ওঁর গায়ের রঙ নিয়ে, কিংবা ঐ ধরনের কি একটা নোংবা ব্যাপার নিয়ে মন্তব্য করল।

কিন্তু রামানন্দ কোন কথা বলল না।

আসলে ডাক্তার বিশ্বাসেরও তো একটা প্রতিষ্ঠা আছে, খ্যাতি আছে। এমন দু-একজন যদি দীপঙ্করের দিকে চলে যায়, রামানন্দর ভয়,স্রেফ এই ব্লাফটাই অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যাবে।

এটা শুধু একটা ভ্যাকসিনের ব্যাপার নয়। সায়েন্সের ব্যাপার নয়।

এটা একটা স্থায়ী অটল অনড় পিরামিড ধসিয়ে দেওযার ব্যবস্থা। এসটাবলিশমেন্ট ধসিযে দেওয়ার ব্যবস্থা।

আমরা সকলেই এর মধ্যে জড়িয়ে আছি।

সেই ভক্ত শিষ্যটি বলে উঠল, বন্ধ্যাত্ব দূর হয়ে যাবে। হেসে উঠল সে ; বললে, তাহলে আমাদের কি নিয়ে চলবে ?

ওটা নির্বোধ। কে যেন বলেছেন না, নির্বোধ ভক্তেব চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রু ভাল। রামানন্দ ওসব দিক নিয়ে ভাবছে না। রাতারাতি সব পেশেন্ট কি দীপঙ্কবের কাছে চলে যাবে নাকি ! তা নয়। প্র্যাকটিস পড়ে যাবে না। সে ভয় ও পায় না।

এটা সম্মানের প্রশ্ন। আসনের প্রশ্ন। দি চেয়ার।

আমরা সকলে মিলে একটা পিরামিড গড়ে তুলেছি। সেই ইস্কুলে ড্রিল মাস্টারের নির্দেশে বানানো পিরামিড। ড্রিল বলে না, আজকাল পি টি ক্লাস। একদলের পিঠে বা কাঁধে আরেকদল তারপর পিঠে আরেকদল। ক্রমশই ছোট হয়ে হয়ে রামানন্দ এখন টপে। সকলে অবশ্য স্বীকার করে না, না করুক। সান্ত্বনা এই, কেউই টপে নেই। আমরা কজনই প্রধান।

এই পিরামিড থাকলে আমাদের সকলের পজিশন আছে, সম্মান আছে। দীপঙ্কর রায় যদি একটু একটু করে এই পিরামিডের ওপরের আসনে উঠে আসত, কারও কোনও আপত্তি ছিল না। বরং রামানন্দ তাকে সাহায্যই করত। এমনকি ডিরেক্টরকে ইনফ্লুয়েন্স করে ওকে প্রফেসর বানিয়ে দিতেও পারত। একটাই শর্ত, পিরামিডটা যেন থাকে।

দীপঙ্কর সে-পথে না গিয়ে হঠাৎ যেন একেবারে নীচেব ধাপেব একজনকে ল্যাং মেরে ফেলে দিতে চাইছে। একজন পড়লেই সমস্ত পিরামিডটাই হুড়মুড় করে ধসে পড়বে।

কে বড় কে ছোট, কার কত ফি, আমরা বেশ একটা গোছানো সংসার করে নিয়েছি। সেটাকেই ভেঙে চুরমার করতে চায় দীপঙ্কর।

আমরা তো জানতাম ডাক্তারিতে বড় হলেই সে বড় ডাক্তার। সকলে তা স্বীকার করত। হঠাৎ এর মধ্যে একজন আবিষ্কারক সাজতে চাইছে।

ধনী ঘরের ঐ পেশেন্ট ভদ্রমহিলা যখন জিগ্যেস করে বসলেন, আপনি কিছু আবিষ্কার করেছেন, তখন রামানন্দর নিজেকে বড়ো তুচ্ছ মনে হয়েছিল। এত প্রতিষ্ঠা, অর্থসম্পদ, খ্যাতি যেন মুহূর্তে মূল্যহীন করে দিয়েছে ঐ দীপঙ্কর। ভদ্রমহিলার চোখে তার প্রতি বিস্ময় এবং অভিভূত ভাব লক্ষ করেছে রামানন্দ। শ্রদ্ধা। পিরামিড বেয়ে ধাপে ধাপে না উঠেও দীপঙ্কর একেবারে টপে উঠে গেছে। অথচ এই রিসার্চ করা লোকগুলোকে এতকাল তো করুণার চোখে দেখে এসেছে।

রামানন্দ ধীরে ধীরে বললে, উই মাস্ট ডু সামথিং। বি বি সি-তে নিউজ করেছে, শেষে কি কেলেঙ্কারিই না হবে।

হাসতে হাসতে বললে, রিসার্চ আমবাও করেছি। কিন্তু এ-বকম হৈ চৈ বাধাইনি কখনও। উদ্ভট কিছু ক্লেম করে বসিনি।

কথাটা মিথ্যে নয়। রামানন্দ একাই নয়, বহু বড বড় ডাক্তারই তো এম ডি কবেছেন, মেডিকেল জার্নালে দু-একটা পেপাবও ছাপা হয়েছে। তবে ?

বি বি সি-তে নিউজ করেছে। শেষে কি কেলেঙ্কাবিই না হবে।

সকলেই একবাক্যে রামানন্দর কথায় সায় দিল। হ্যাঁ, একটা কিছু করতেই হবে। উই মাস্ট ডু সামথিং।

কিন্তু কি করবে, কেউই খুঁজে পেল না। উপস্থিত একটাই কাজ কবা যায়। সমস্ত ব্যাপাবটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওযা।

রামানন্দ দুটো কাঁধ কাঁপিয়ে শ্রাগ করল। তোমরাই যা হোক কিছু একটা কবো। একটা জালিয়াতিকে নির্বিবাদে চলতে দেওয়া উচিত নয়।

কে একজন বললে, কিন্তু ডাক্তার বিশ্বাসেব মত কেউ কেউ হয়ত ওঁব হয়ে ওকালতি করবেন।

রামানন্দ হাসল।—বেস্ট অ্যাসিওর্ড, কেউ কিচ্ছু কববে না। এই ধবনেব লোকগুলো খুব নির্বিরোধী হয়।

বলেই উঠে পড়ল। কিছু একটা কবতে হবেই। সযত্নে বানিযে তোলা পিরামিডটা এভাবে ভাঙতে দেওয়া যাবে না। ঐ পিবামিড বেয়েই তো ও ওপবে উঠেছে। ওপবেই দাঁড়িয়ে আছে।

সবচেয়ে ভাল হয ঐ লাইনেবই একজন স্পেশালিস্ট কাউকে সঙ্গে পেলে। কাকে পাওয়া যাবে ?

নার্সিং হোম থেকে বাড়ি ফিবে ফোন নম্বরটা দেখে নিযে বামানন্দ ডায়াল করল অরিজিৎকে। অরিজিৎ ব্যানার্জি।

—দ্যাখো অরিজিৎ, ভেবেছিলাম চুপচাপ থাকব। লেট ইট টেক ইটস ওন কোর্স। ব্লাফ শেষ অবধি ধরা পড়বেই। লোকটা, মানে তোমাব ঐ দীপঙ্কর, শেষে মুখ দেখাতে পাববে না। কিন্তু ভেবে দেখলাম, আমরাও তো মুখ দেখাতে পারব না। আফটাব অল, ও যদি ডাক্তার না হত আমাদের কিছু যায় আসত না।

অরিজিৎ বললে, বাইট ইউ আর। আমাদের লজ্জা। আবে পারমিতাকে সে-কথাই তো বোঝাতে পারছি না। মেয়েদের মাথায়, বুঝলে কিনা, কিস্যু নেই। ও আবার রাত্তিবে ওকে খাবার নেমন্তন্ন করে বসতে চাইছে। আমার পক্ষে ওপেনলি কিছু বলা মুশকিল। গৃহবিবাদ হয়ে যাবে।

অরিজিৎ হাসল।

রামানন্দ বললে, কিন্তু কর্তব্য বলে একটা কথা আছে। আমাদের প্রফেশনকে আমরা মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারি না।

অরিজিৎ বললে, ঠিকই তো। আর শোনো, ডিরেক্টর ফোন করেছিলেন। বললেন, ডেকে পাঠিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন দীপঙ্করকে। হোয়াট অড্যাসিটি, বলেছে কিনা আই হ্যাভ নাথিং টু অ্যাড। খুব চটে আছেন ডিরেক্টর। একসেপশন নিয়েছেন। আমরা সাপোর্ট করছি কিনা জানতে চাইলেন।

—সাপোর্ট ?

রামানন্দ শব্দ করে হেসে উঠল। বললে, নিশ্চিন্ত থাকো, আমি ফেউ লাগিয়ে দিচ্ছি। ওঁকে মেজাজ দেখাতে পারে, বাট হি শ্যাল হ্যাভ টু ফেস অল অফ আস। হি শুড এক্সপ্লেন। আমরা রিপোর্টার নই যে যা বলল বিশ্বাস কবে নিলাম।

অরিজিৎ বললে, ফাইন। তোমরা ওকে মিট করতে বলো। আব হ্যাঁ, ডিবেক্টবের সঙ্গে একবার কথা বলে নাও।

ফোন ছেড়ে দিল অরিজিৎ। তাড়াহুড়ো কবে বললে, এখন রাখছি, এখন বাখছি। পরে কথা হবে।

বামানন্দ স্পষ্ট বুঝতে পারল অরিজিতের স্ত্রী কাছে এসে গেছে। তাই কথা বলতে চাইল না। অরিজিতের এই ব্যাপারটা ওর ভাল লাগে না। ওর স্ত্রী বডলোকেব মেয়ে, তাছাডা অরিজিৎ শ্বশুরের টাকায় বিলেত গিয়েছিল বলে কেনা গোলাম হয়ে গেছে। স্ত্রীকে কনভিন্স করতে পারে না। আবার নেমন্তন্ন করে খাওযাচ্ছে।

এদিক থেকে রামানন্দর কোন ঝামেলা নেই। ও যা বলে স্ত্রী সেটাই বিশ্বাস করে।

সেজন্যেই বেশ নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু ঐ নার্সিং হোমের পেশেন্ট ভদ্রমহিলা জ্বালা ধবিযে দিয়েছে। বোকা বোকা আদুরে গলায় নার্স আর জুনিযাবেব সামনে বললে, আপনি কিছু আবিষ্কাব করেছেন ?

তার ওপর ঐ ডাক্তার বিশ্বাস।

খাবার টেবিলে তিনটে পিপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা তাদের গাযে একে একে ছুঁইয়ে দিতেই জডিয়ে গিয়ে জড়পদার্থ হয়ে গেল। এবার সিগারেটটা অ্যাশ-ট্রেতে টিপে নিবিয়ে দিল রামানন্দ।

৫

আমন্ত্রণ পেয়ে রীতিমত খুশি হয়েছিল দীপঙ্কর।

ওদের বয়েস অল্প। আগ্রহ এবং কৌতূহল হযতো সেজন্যেই বেশি। এর মধ্যে কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা আছে বলে ওর মনে হযনি। প্রফেসর কুণ্ডুর ছাত্রছাত্রীরাও তো বলেছিল, স্যার, আমাদের কলেজে আপনাকে একটা বক্তৃতা দিতে হবে। আসলে সকলে শুনতে চায়, জানতে চায়। কম বযেসী ডাক্তারদেব মধ্যে সে-কারণেই আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।

ওরা পাঁচ-ছজন ইয়াং ডাক্তার এক জোট হয়ে এসেছিল। অমাযিক ব্যবহার কথাবার্তা ওদের। একজন তো হাউস সার্জেন দীপঙ্করের হাসপাতালেই। ছেলেগুলিব চোখেমুখেও বেশ উচ্ছ্বাস লক্ষ করেছে। দুজন বিখ্যাত চিকিৎসকের চিঠি নিয়ে এসেছিল।

বিখ্যাত আধা-বিখ্যাতদের মধ্যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়ে একটু রেষারেষি আছে, দীপঙ্কর জানে। একজনের খ্যাতি বাড়লে আরেকজন কখনও কখনও সহ্য কবতে পারে না, সপার্ষদ বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে টীকাটিপ্পনীও দেয়। কেউ আড়ালে, কেউ প্রকাশ্যে। ঠোঁটকাটা কেউ কেউ রুগীর সামনেই ভুল ধবে দেয়। এথিকস মানে না। এ-সব বহুদিন ধরে দেখে আসছে দীপঙ্কর। দেখে হেসেছে নিজের মনে মনেই। ওব সঙ্গে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের কোনও সম্পর্ক নেই বলেই এ-সব নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি।

ছেলেগুলি এসে অনুবোধ করতেই রাজি হয়ে গেল। একটা কনফারেন্স মত হবে, সেখানে দীপঙ্কর তার গবেষণার কথা একটু বিশদ করে বলবে। ওদের চোখে একটা সমীহ ভাবও দেখেছে। রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু যেদিন বক্তৃতা দেবার কথা, সেদিনই সকালের খবরের কাগজে দেখল, কয়েকজন গাইনি তাঁদেব মতামত জানিয়েছেন। দীপঙ্করের গবেষণার সমস্ত ব্যাপারটা নাকি হোক্স। ওটা নাকি সম্ভবই নয়। হিউম্যান ফ্যাক্টবেব ওপব বিসার্চ না চালিয়ে এ-বকম একটা ক্লেম করা নাকি হাস্যকব। এবং আনএথিক্যাল।

দীপঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ওসব লেকচাব-টেকচারে যাব না।

সীমা ওর মুখোমুখি বসে ছিল, চা খাচ্ছিল। হেসে বললে, তা হয না। যারা এসেছিল তাদের কি দোষ!

দীপঙ্কর হঠাৎ হঠাৎ চটে যায। ওটা ওর চাবিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কেউ ওকে বিশ্বাস না করলে, ওব কথার মূল্য না দিলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

কেউ বোঝালে পবক্ষণেই শান্ত হয়ে যায।

সীমা টোস্টে মাখন লাগিযে প্লেট এগিযে দিযে বললে, যখন ওদের সামনে রাজি হযেছ, যেতে তোমাকে হবেই। তা না হলে যা-খুশি বটাতে শুরু কববে।

দীপঙ্কব হেসে ফেলল। বললে, যাব। তুমি যখন বলছ। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, এর সঙ্গে ওদের কি সম্পর্ক। আসলে এটা ডাক্তাবদেব ব্যাপাবই নয়। এটা অ্যাকসেপটেড হবে কি হবে না, বিচার করবে এ লাইনের সায়েন্টিস্টরা। হিউম্যান ফ্যাক্টবের ওপব এক্সপেবিমেন্ট হবে, তার রেজাল্ট রি-অ্যাকশন দেখা হবে, তবেই ওদের বক্তব্য শোনা যাবে। এখনই ওরা এত অধৈর্য হচ্ছে কেন?

সীমা হাসতে হাসতে বললে, বড় হতে গেলে এ-সব সহ্য কবতে হয।

দীপঙ্কর চায়ের কাপে চামচ নাডতে নাড়তে কি যেন ভাবল।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ওবা জানেই না আবিষ্কারটা আজ হযনি, দু বছর আগেই পেয়েছি। শুধু টক্সিসিটি দূব কবতে একটা বছর কেটে গেছে।

হঠাৎ হেসে উঠে বললে, শুধু একটা জিনিস গোপন কবে যেতে হবে এটাই দুঃখ। রেগে গিয়ে যদি বলে ফেলি সমূহ সর্বনাশ, কি বলো?

সীমা শান্ত গলায বললে, তোমার একাব নয়, সেটাও মনে বেখো। বেচাবা স্বামীনাথন ...

দীপঙ্কর বললে, আমি জানি এরা সবাই মিলে ওখানেই বাধা দেবে। স্বপ্নে দেখা সেই মুখোশ পবা লোকটা এইখানেই পেযে বসবে।

কেমন হতাশ গলায় বললে, তাহলে বাইবে চলে যাব। লন্ডনে, আমেবিকায় যেখানে হোক। কিংবা আফ্রিকায় কোথাও।

একটু থেমে বললে, এই দুটো দেশেই তো আসল প্রবলেম। আফ্রিকা আর ইন্ডিয়া। না, চীন আর সাউথ আমেরিকাতেও।

সীমা দু পা চেয়ারের ওপর তুলে আয়েসে পিঠ এলিয়ে টোস্ট খেতে খেতে বললে, এ কথা বলো না। দেশটা কি তাহলে চিরকালই এ-বকম থাকবে? শুধু টাকা করার কমপিটিশন আর নিচু মনের মানুষ নিয়ে, কাজ কবতে হলেই বাইরে পালাতে হবে?

দীপঙ্কর বললে, আমি দেশ-টেশ বুঝি না, আমি মানুষ বুঝি। যে কোন ওষুধ, এই ভ্যাকসিনই ধরো, এ তো সমস্ত মানুষের জন্যেই। পৃথিবীব সমস্ত মানুষ একটা সাংঘাতিক রোগ থেকে পরিত্রাণ পাবে, চিবকালের জন্যে।

—কিন্তু সেটা যদি এখানেই করে দেখিয়ে দাও, সমস্ত দেশ আত্মবিশ্বাস ফিবে পাবে।

আরও অনেকে হয়তো প্রেরণা পাবে।

এই সব কথা সীমা মাঝে মাঝেই বলেছে, যখনই দীপঙ্কব পদে পদে বাধা পেয়ে অসহায় বোধ করেছে।

সীমার কথা শুনে দীপঙ্কর অসহায়ভাবে বলে উঠল, আমি তো এক্সপেবিমেন্ট করে দেখেছি, স্বামীনাথনের ঐ ম্যাড্রাস হোমে। অথচ কাউকে বলতে পারব না। কাবণ সমস্ত ব্যাপারটা বে-আইনি। যেন ঐ মুখোশ-পরা লোকটা একটা ছাপ মেরে দিলেই সব গঙ্গাজলে শুদ্ধ হয়ে যেত। এখন অফিসিয়ালি প্রমাণ দেখানোর জন্যে তাব কাছেই ধর্না দিতে হবে। স্যার, মানুষের ওপর অ্যাপ্লাই কবাব জন্যে পাবমিশন দিন।

শেষ অবধি দীপঙ্কর ঠিক করল ও যাবে।

গেল।

ট্যাক্সি থেকে নেমে মিটারের টাকা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন এগিযে এল। বেশ খাতির করে ওকে নিয়ে গেল হলের মধ্যে।

সমস্ত চেয়ার ভর্তি হয়েও কিছু ভিড উপচে পডেছে।

"ফ্রেন্ডস,

হাজাব হাজাব বছর ধরে যে রোগ পৃথিবীব সর্বত্র, বিশেষ কবে আফ্রিকায় এবং ইন্ডিযায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট দিযেছে, শুধু রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিটিকেই নয়, তার পবিবারবর্গকেও অস্পৃশ্য করে দিযেছে, সমাজ থেকে, মানুষের সাহচর্য থেকে দূবে সরিয়ে দিযেছে, আমি সেই লেপ্রসির একটা ভ্যাকসিন বেব কবেছি। পনেবো বছরের চেষ্টায়।"

হঠাৎ হল ফাটিয়ে হাততালির শব্দ শোনা গেল।

দীপঙ্করের মনে হল জয় ওর হাতের মুঠোয। ও অকারণ সন্দেহ কবেছে, ও অকারণ ভয পেযেছে।

"আমি আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। তাব প্রয়োজনও নেই, কাবণ আমি আশা করছি এখানে সকলেই চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানী। কুষ্ঠবোগ নামটিই আমাদেব দেশে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ এ বোগে আক্রান্ত হয়। অথচ ছোঁযাচে রোগ বলতে আমরা যা বুঝি এটি ঠিক সে-রকম ছোঁয়াচে নয়, তা আপনারা জানেন। সুতবাং আমাব গবেষণার প্রথম ধাপই ছিল জীবজন্তুব দেহে এই রোগটি সৃষ্টি করা। অনিবার্যভাবে রোগটি সৃষ্টি করতে পাবলে অনিবার্যভাবে তা বোধ কবা যাচ্ছে কিনা তা প্রমাণ কবা সম্ভব।"

ঠিক এই সমযেই শ্রোতাদেব ভিতব থেকে একজন উঠে দাঁডিয়ে বললে. আমরা ভ্যাকসিনের গল্পটা শুনতে চাই।

বাধা পেয়ে দীপঙ্কব থেমে পডেছিল। লোকটিব দিকে একবাব তাকিযে নিযে ও বললে, দীর্ঘকাল ধরে বারংবার কনট্যাক্ট-এ না এলে এ রোগে কেউ আক্রান্ত হয না। অথচ ভারতবর্ষে কুষ্ঠ রোগীব সংখ্যাটাব দিকে তাকালে অবাক হতে হয়।

একটু থেমে বললে, আপনাবা জানেন শিশুদেব, বিশেষ কবে কম বয়েসেই এটি আক্রমণ করে, যদিও ইনকিউবেশন পিরিয়ড বেশ দীর্ঘ।

দীপঙ্কর লক্ষ করছিল শ্রোতাদের মাঝখানে কযেকজন কি যেন বলাবলি কবছে। হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ইস্কুলেব এসে শুনতে আসিনি আমবা।

দীপঙ্করের মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। ও বুঝতে পারল কোথাও কোনও একটা ষডযন্ত্র আছে, ওকে অপদস্থ করার।

দীপঙ্কর তবু শান্ত থাকার চেষ্টা কবে বললে, আমি লেপ্রোমেটাসের কথা বলছি। লেপ্রাব্যাসিলাস কালচার করে যে ভ্যাকসিনটা আমি প্রথমে ইঁদুবের ওপব আই মিন ব্রাউন

মাইসের ওপর পরীক্ষা করি·····

হঠাৎ একটা হট্টগোল শোনা গেল এক প্রান্ত থেকে।

দীপঙ্কর তা উপেক্ষা করে বললে, এই রোগ যে-হেতু ইনফেকশনের বহু পরে, দু-তিন বছর, কখনো কখনো দশ-পনেরো বছর পরেও দেখা দেয় এবং শৈশবেই ইনফেকশন হতে পারে, সেজন্যে আমি দুভাবে পরীক্ষা চালাই। এক ডজন পুরুষ ইঁদুরের ওপর, এক ডজন স্ত্রী ইঁদুরের ওপর। নানাভাবে পরীক্ষা কবে, যাব বিপোর্ট আমি একটি জার্নালে আগেই কিছুটা প্রকাশ করেছি, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মেল এবং ফিমেল দু-দলকেই ভ্যাকসিনেট করার পর মাইকোব্যাকটিরিয়াস লেপ্রিব্যাসিলাস দিয়ে ইনওকুলেট কবলেও তারা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু ভ্যাকসিনেট করা ফিমেল ইঁদুরের সন্তান-সন্ততির সে-বোগ হচ্ছে না। বারংবার ইনফেক্ট করলেও হচ্ছে না। আমি ঐ ব্যাসিলাসকে ফ্রিজ ড্রাইং প্রসেসে·····

একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, এই লোড শেডিং-এ ফ্রিজ কবলেন? কোন্ বেফ্রিজারেটরে বলবেন?

দীপঙ্কব চিৎকাব করে বললে, এখানে কি একজনও সায়েন্টিস্ট নেই? তিনি এর উত্তব দিয়ে দিন। বুঝিয়ে দিন যে ফ্রিজ মানেই আপনাব বাড়ির ফ্রিজ নয়।

একটি চ্যাংড়া টাইপের ছেলে এই সময়ে বসে বসেই হল কাঁপিয়ে চিৎকার কবে উঠল, লেপার ডাক্তারকে বসে পডতে বল।

আর সামনের দিকের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একজন খুব স্মার্ট ভঙ্গিতে বললে, ডক্টব রয়, উই আব নট ইন্টারেস্টেড ইন লেপ্রসি।

দীপঙ্কর বিভ্রান্তভাবে বললে, কিন্তু আমি তো লেপ্রসিব ভ্যাকসিনই আবিষ্কার করেছি। অবকোর্স শুধু লেপ্রোমেটাস। এস্ট্রোন ও হরমোন দিয়ে হোস্ট পাওয়ার পর···

আরেকজন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আপনি কি আশা করেন লেপ্রসিব মত একটা ঘৃণ্য রোগ মেয়েদেব শরীবে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে, শুধু কিছু লোকেব এই বোগ হয় বলেই?

দীপঙ্কব রেগে গেল। বললে, সাম পিপল নয়, সাম মিলিযনস অফ পিপল। তাছাড়া আমাদের দেশে কয়েকটা লেপার জোন আছে, কই পক্সেব ভ্যাকসিনে তো আপত্তি কবেন না! সেও তো সুস্থ শবীবে বীজাণু ঢুকিয়ে দেওযা।

আরেকজন উঠে দাঁড়াল। বললে, গাইনোকোলজিক্যাল সাইড থেকে একটা প্রশ্ন বাখছি। আপনি বলেছেন ক্রোমোসোমেব বদলে ঐ ভ্যাকসিন দিযেই নাকি বন্ধ্যা নারীর গর্ভোৎপাদন ঘটানো যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক অট্টহাসে হেসে উঠল। আর বাগে দীপঙ্করের মাথায় বক্ত উঠল।

ও দাঁতে দাঁত চেপে বললে, এটা সার্কাসের আবেনা নয় বলেই ভেবেছিলাম, কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেকেই এখানে জোকাবের খেলা দেখাচ্ছেন এবং অনেকে তা দেখে বেশ আনন্দও পাচ্ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক চেয়াব ছেড়ে লাফিযে উঠল।—উইথড্র, উইথড্র।

দীপঙ্কর লক্ষ কবে দেখল অধিকাংশ শ্রোতাই তাদের ব্যবহারে বিরক্ত। কিন্তু নিরুপায়।

একজন সাহস করে বলেও বসল, ডক্টর রয়, আপনাব বক্তব্য আপনি বলে যান।

আবেকজন শ্রোতাদের উদ্দেশে বললে, আমাদের শুনতে দিন।

কিন্তু তার আগেই সেই দলের মধ্যে থেকে একজন বললে, আপনার ভ্যাকসিনের সঙ্গে গোনাডোট্রপিনের কি সম্পর্ক?

আবেকজন বললে, ঐ হরমোন দিলে বন্ধ্যা গর্ভবতী হবে তার প্রমাণ কি?

দীপঙ্কর বোঝাবার চেষ্টা করল, আমি ওটাকে মিডিয়া হিসেবে ব্যবহার করেছি। একটা টক্সিক এফেক্ট এলিমিনেট করার জন্যে। আমি বলছি না এর ফলে বন্ধ্যাত্ব দূর হবে, কিন্তু একটা পসিবিলিটি দেখতে পেয়েছি, সে-কথাই বলেছি। আই ডোন্ট ক্লেম দ্যাট।

অমনি আবেকজন চিৎকার কবে প্রশ্ন কবল, গোনাডোট্রপিন আপনি পেলেন কোত্থেকে ? ওটা তো ইমপোর্ট করতে হয়। আপনার ইমপোর্ট পারমিট দেখান।

দীপঙ্কর বললে, ঘোড়ার রক্ত থেকে আমি·····

—ঘোড়াব রক্ত ?

সমবেত স্ববে অট্টহাসে হেসে উঠল সেই দলটি।

আবেকজন চিৎকার করে বললে, অশ্বমেধ যজ্ঞটা কোথায় কবেছেন জানতে পারি কি ?

আর ঠিক তখনই কে দীপঙ্করেব হাত ধবে টানল।—দীপঙ্কবদা, চলুন, চলুন।

দীপঙ্কর ফিবে তাকিয়ে দেখল অমূল্য। অমূল্য যে এই সভায় এসেছে দীপঙ্কব জানত না।

অমূল্য ওব হাত ধবে টানতে টানতে নিয়ে এসে ওর গাড়িতে তুলল। ওদেব অফিসের গাড়ি।

দীপঙ্করকে তখন অসহায় এবং বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে অমূল্যব মনে হল এখনই চোখে জল আসবে। মাথা নিচু কবে বইল দীপঙ্কর। অমূল্য ভাবল, হয়তো লজ্জায় অস্বস্তিতে ওব দিকে তাকাতে পাবছে না।

গাড়িটা স্পিডে ছুটতে শুরু করেছে তখন।

দীপঙ্কর হঠাৎ বললে, অমূল্য ' এ-বকম হচ্ছে কেন বলো তো, বুকের ভিতবে কি রকম একটা যন্ত্রণা '

অমূল্য দীপঙ্কবেব মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পাবল অসহ্য কোনও কষ্ট হচ্ছে। সাবা মুখ দবদর কবে ঘামছে।

ও ভয় পেয়ে গেল।—কোন হাসপাতালে যাবেন দীপঙ্কবদা ? খুব কষ্ট হচ্ছে ?

দীপঙ্কব কোনও বকমে বললে, হাসপাতাল ? ডাক্তার ? না অমূল্য, যদি হার্ট অ্যাটাকও হয়, আই ওয়ান্ট টু ডাই ইন পিস। আমাকে বাড়িতে, সীমার কাছে নিয়ে চলো।

অমূল্য কি কববে ঠিক করতে পারল না। ভাবল বাড়িতেই পৌঁছে দিই, ওখান থেকেই কোনও হার্ট স্পেশালিস্টকে ডাকবে। এখন আব অমূল্যও কোনও হাসপাতাল বা ডাক্তারেব ওপর ভরসা বাখতে পারছে না। কে শত্রু আব কে মিত্র চিনে বের কবা মুশকিল। কে সত্যিই চিকিৎসক, আর কে টাকা রোজগারের যন্ত্র তা খুঁজে বের করা যাবে না।

অমূল্য অবাক হয়ে গেছে। এই একটা মাত্র ঘটনা যেন ওর চোখ খুলে দিয়েছে। ও একজন রিপোর্টার, এবং নিজেকে এতদিন অত্যান্ত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বিপোর্টাব ভেবে এসেছে। সমাজেব কোথায় কি গলদ দেখতে পেয়েছে, এবং দেখিয়েছে। কিন্তু এই প্রথম ওব মনে হল এতদিন ও এই সমাজটাই দেখেনি। আসলে ও এইমাত্র যা দেখে এল তা শুধু একটা সভা নয়। যেন এই দেশেবই একটা ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি।

এই শিক্ষিত সমাজের প্রতীক যেন। এই উচ্চশিক্ষিত সমাজের। এবা শুধু ডাক্তার নয়, এরাই বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, সাহিত্যিক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা, গবেষক, সরকারি আমলা, বাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, অধ্যাপক। এরাই দেশ। এরাই সমাজ। এদের মধ্যে একটা ছোট্ট দল ঈর্ষায় জ্বলছে, স্বার্থে আঘাত লাগলে অন্ধ, জ্ঞানীকে সম্মান জানাতে জানে না, গুণীকে বুঝতে পারে না, বুঝতে চায় না। এরা শুধু দল গড়তে জানে। এরা চিৎকার করে, হট্টগোল বাধায়, অপরকে শুনতে দেয় না। এরা মুষ্টিমেয়, কিন্তু নির্বিরোধ সকলের ওপর কলঙ্ক লেপে দেয়। কেউ একজন ওদেব ছাড়িয়ে উঠছে দেখলে তাকে টেনে নামাবার

জন্যে সমস্ত দেশটাকেই তলিয়ে দেয়।

শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছে অমূল্য। তাদের মুখেব ওপর বিশ্বাস লেখা ছিল। তারা গর্বিত। তারা শুনতে চেয়েছে, বুঝতে চেয়েছে।

কিন্তু একটা ছোট্ট দলের ষড়যন্ত্রের কাছে তাবা কত অসহায়। কাবণ তাবা নির্বিরোধ। তারা প্রতিবাদ করে না, প্রতিবোধ করে না। তাদেব গলাব স্বর ক্ষীণ।

তুমি অধ্যাপক, ভাবছ ওটা ডাক্তারদের ব্যাপাব। তুমি হার্ট স্পেশালিস্ট, ভাবছ ওটা গাইনিরা করেছে। তুমি সাহিত্যিক, তুমি শিল্পী, সবে দাঁড়াতে চাইছ তোমাব সাহিত্যেব বা শিল্পের জগতে। তুমি পদার্থ বিজ্ঞানী, কল্পনাও কোর না, তোমাব ল্যাবরেটরিব দরজা বন্ধ থাকলেই তুমি নিশ্চিন্ত। তুমি বাজনৈতিক নেতা, শোষণ থেকে মুক্ত করাব আগে এদের শাসন থেকে মুক্ত হও। তুমি সরকারি আমলা, এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তুমি বাঁচতে পাববে না। তুমি যত সাধারণ হও, যত খাটো মাপেরই হও, তোমার আপন ভূমিতে দাঁড়িয়েও তুমি একদিন দীপঙ্কর হয়ে যাবে। তুমি যদি ভেবে থাকো নির্বিরোধ নির্বিকার থাকলেই বেঁচে যাবে, ভুল ভেবেছ। তোমবা সকলে মিলে আজ দীপঙ্কব বায়কে একা কবে দিয়েছ, একদিন তুমিও একা হয়ে যাবে, কেউ তখন পাশে এসে দাঁড়াবে না!

—দীপঙ্কবদা, এখনো কি কষ্ট হচ্ছে?

বাড়িব কাছে এসে অমূল্য জিগ্যেস কবল।

দীপঙ্কব শুধু মাথা নেড়ে বললে, না।

বাড়ির দবজায় তখন গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। অমূল্য গাড়ি থেকে নেমে হাত বাড়িয়ে দিল, বললে, আসুন।

দীপঙ্কব হাসল, নিজেই নামতে নামতে বললে, তুমি আব হাত বাড়িয়ে কি করবে অমূল্য। আমাকে তো একা একাই হাঁটতে হবে। এখনও অনেকখানি বাস্তা বাকি।

অমূল্য কোন জবাব দিতে পাবল না।

দীপঙ্কবকে এখন অনেকটা সুস্থ লাগছে। তাব মুখেব দিকে তাকিয়ে অমূল্য বুঝতে পাবল তেমন ভয়েব কিছু নেই।

তবু সীমাকে একটু সাবধান করে দিল।—দবকাব হলেই আমাকে ফোন কববেন।

দু-এক কথায় অমূল্য একটু আভাস দিয়েছে। তাই সীমাব চোখে উদ্বেগ। বললে, আমাবই ভুল, আমিই জোব করে ওকে পাঠালাম।

দীপঙ্কব প্রসঙ্গটা চাপা দেবাব চেষ্টা কবল। সব শুনলে সীমা আবও কষ্ট পাবে। ও তো এতকাল কষ্টই পেয়েছে। আব পাঁচটা মেয়ের মত বিলাস সম্পদ অহঙ্কাব চায়নি। শুধু চেয়েছিল ও যাকে সাফল্য মনে করে তাব চূড়ায় পৌঁছে দেবে দীপঙ্কবকে। ওকে আলো ঝলমল মঞ্চে তুলে দিয়ে অভিভূত দর্শকেব মত দেখবে।

—তুমি যাও ভাই, তোমাকে তো আবাব মিটিং-এব খবব লিখতে হবে। সীমা বললে।

আর অমূল্য বিব্রত মুখে বললে, না সীমাবৌদি। আমাকে খবব লিখতে হবে না। আমি এখন সকলেব চোখে আপনাদেব লোক হয়ে গেছি।

একটু থেমে বললে, আমাব অপবাধ আমিই স্কুপ করেছি। দীপঙ্কবদাব ওপব যাবা ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের থাবাব নখগুলো দেখা যায়। আমি তো সামান্য একজন রিপোর্টাব, নখগুলোও তাই ছোট, চোখে দেখা যায় না।

বলে হাসল। বললে, কাল কি রিপোর্ট বেবোবে আমি জানি। দীপঙ্কবদাকে নস্যাৎ কবতে পারলে আমার স্কুপটাও নস্যাৎ কবা যাবে। আমাকেও।

অমূল্য দীপঙ্কবেব দিকে তাকাল। একটা ক্লান্ত বিষণ্ণ মানুষ, বিভ্রান্ত। কেন এমন হল যেন ভাবতেই পারছে না। সমস্ত ব্যাপাবটা ওঁর কাছে দুর্বোধ্য। বালিশে পিঠ দিয়ে খাটেব

ওপর পা ছড়িয়ে আধ-শোয়া এক রুগীর মত।

অমূল্য একবার দীপঙ্করের মুখের দিকে তাকাল, একবার সীমার মুখের দিকে। বললে, বাট আই উইল নট রেস্ট। এটা তো শুধু দীপঙ্করদার আবিষ্কার করা ভ্যাকসিন নয়। এটা সারা দেশের সারা সমাজের কথা। ঠিক এইভাবেই আমাদের দেশটা চলছে। কেউ কোন ভ্যাকসিন চায় না, কারণ রোগের বীজাণু যে সমাজের ওপর তলাতেই।

সীমা হেসে বললে, তুমি আবার এর মধ্যে ফিলজফি নিয়ে আসছ!

অমূল্য বললে, এতদিন তো আপনি আমাকে সিনিক বলতেন। চোখ খোলা রাখলে মানুষের সিনিক হওয়া ছাড়া উপায় কোথায় বলুন।

দীপঙ্কর এতক্ষণ চুপ করে ছিল। ওর বুকের ভেতরে বোধহয় কিছু কষ্ট হচ্ছিল। তবু ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করল, অনেকে কিন্তু শুনতে চেয়েছিলেন।

একটু থেমে নিঃশ্বাস টেনে ধীরে ধীরে বললে, এরা কারা অমূল্য? এরা কি ভেবেছে এদের হাতেই শেষ বিচার?

অমূল্য হাসতে হাসতে বললে, এরা কারা জানেন? যারা একদিন জগদীশ বসুকে জালিয়াত বলেছিল। যারা তাঁকে ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতির চুরির অপবাদ দিয়েছিল। এরা সব যুগেই আছে।

দীপঙ্কর হেসে ফেলল।—তুমি কার সঙ্গে আমার নাম করছ অমূল্য।

অমূল্যর কানেও গেল না কথাটা। ও কি যেন ভাবছিল।

—কি ভাবছ? সীমা প্রশ্ন করল।

আর অমূল্য সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল। বললে, একটা মজার কথা দীপঙ্করদা। আমরা বড়ো অদ্ভুত মানুষ, তাই না? আমরা গ্যালিলিওকে নিয়ে নাটক করি, হাততালি দিই, তার জন্যে দুঃখও হয়, আর দৈবাৎ তেমন কেউ আমাদের মধ্যে জন্মালে তার ওপর নৃশংস হয়ে উঠি।

একটু থেমে বললে, প্রতিবাদ না করাও তো এক ধরনের নৃশংসতা।

৬

বেশ কয়েকটা দিন অবিজিৎ ব্যানার্জিকে খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। এখন আর নিজেকে নিজের কাছে ছোট লাগছে না।

দীপঙ্করকে নিয়ে একটা উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। একটা আলোড়ন। এখন সব আলোচনা থেমে গেছে।

তার কথা এখন কোনও পেশেন্ট হঠাৎ বললে অবিজিৎ হাসতে হাসতে বলে, হুজুগ। আসলে ও নিজেও তাই মনে করে। অনেকেই মনে করে।

এই সুন্দর বাড়িটার শান্ত স্নিগ্ধ ভাব যেন অবিজিৎ ব্যানার্জির মনেও।

রাস্তার ওপর ঝুঁকে পড়া ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পথের আনাগোনা দেখছিল অবিজিৎ।

গোপাল এসে বললে, এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বলে কার্ডখানা এগিয়ে দিল।

অবিজিৎ দেখল। না, পেশেন্ট নয়। ডাক্তার। তবে কি কনসালটেশনের জন্যে? কোথাও কল দিতে এসেছে? না। নামের নিচে পরিচয়টা দেখেই ভুরু কোঁচকাল। কি হতে পারে?

বলল, বসতে বল।

তারপর পারমিতাকে দেখতে পেয়ে বললে, দেখলে তো, দীপঙ্কর একেবারে সাইলেন্ট। তুমি তো সব বিশ্বাস করে ওকে খেতে বলবে বলেছিলে!

পারমিতা কোনও উত্তর দিল না। সেদিন অরিজিৎ বাধা দিয়েছিল বলেই। বলেছিল, দ্যাখো, এখনই লাফালাফি করো না, ভাল করে ব্যাপারটা জানতে দাও।

কিন্তু এখন অরিজিৎ উদার হতে পেরেছে। কাবণ, দীপঙ্করের ঐ আবিষ্কারের ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে গেছে। যাবা বিশ্বাস করেছিল তাদেরও মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে। এখন অরিজিতের বুকে কোন জ্বালা নেই। এখন আর দীপঙ্কর সকলকে ডিঙিয়ে গিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে অহঙ্কারে হাসছে না।

টেলিফোনে কংগ্র্যাচুলেট করতেই দীপঙ্কব বলেছিল, আই হ্যাভ ডান ইট, আই হ্যাভ ডান ইট। আর তা শুনে অরিজিৎ ব্যানার্জির মনে হয়েছিল, এরই মধ্যে দীপঙ্কর কি অহঙ্কারী হয়ে গেছে।

সেই রাগ থেকে, নাকি ঈর্ষা থেকে, বামানন্দকে বলেছিল ডিরেক্টবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। রামানন্দকে ও চেনে। যোগাযোগের অর্থ কি তাও বোঝে। সেজন্যই দীপঙ্করের বক্তৃতা শুনতে যায়নি। রামানন্দও যায়নি। বামানন্দ বলেছিল, যাওয়ার দরকাব কি। দেখোই না কি হয়।

খবরের কাগজে সেই সভাব বিববণ পড়ে মনটা খুশিতে ভরে উঠেছিল। রামানন্দকে ফোন করে বলেছিল, হাসতে হাসতেই বলেছিল, খববটার মধ্যেও তোমার হাত দেখছি যেন।

রামানন্দ হেসেছে।—না না। আমি তো ভাবছিলাম ডিবেক্টবেব হাত আছে। তারপর বললে, তা নয় অবশ্য। আসলে দীপঙ্কর রাযের এমন মিজাবেবল অবস্থা দেখে বিপোর্টারই বা আর কি লিখতে পাবে।

সভার বিবরণ পড়ে পাবমিতা কিন্তু খুব মুষড়ে পড়েছিল। এত মুষডে পড়ার কি আছে অরিজিৎ বুঝতে পারে না। আসলে মেয়েদের মাথায় বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম, চট্ করে বিশ্বাস করে বসে।

খবরের কাগজটা দেখিয়ে অরিজিৎ বলেছিল, দেখেছ? আমি যা বলেছিলাম, ঠিক তাই। সমস্ত ব্যাপাবটাই একটা বিগ হোক্স। দীপঙ্কব একটা প্রশ্নেবও জবাব দিতে পাবেনি।

কথাটা বলতে গিযে ভিতরের উল্লাস চাপা দিতে পাবেনি অরিজিৎ। তবু মনেব মধ্যে আশঙ্কা ছিল। দীপঙ্কব হযতো খববের কাগজে কিছু একটা জবাব দেবে। সমস্ত বিষযটা ব্যাখ্যা করবে।

কিন্তু অনেকগুলো দিন তো পার হযে গেল। দীপঙ্কর একেবাবে চুপ কবে গেছে। ঐ যে একটা এনকোয়ারি কমিটি বসানোব ভয দেখানো হযেছে খবরেব শেষে। বোধহয় সেজন্যেই ঘাবড়ে গেছে।

ও তো একটা ফাজিল ছোকবা। কোনও ব্যাপারে সিবিয়াসনেস নেই। প্র্যাকটিস জমাবাব চেষ্টাও করল না, চেষ্টা করলেও পাবত কিনা কে জানে। অনেকগুলো গুণেব সমাবেশ হলে তবেই নামী চিকিৎসক হওয়া যায়। একটা প্রতিভার ব্যাপার আছে, কিংবা দৈবশক্তি। অরিজিৎ ওসব বিশ্বাস করে, মনে হয় মঙ্গল আর শনিবার ওর পক্ষে শুভ, যেদিন যেদিন ছুরি ধরে গলায় একটা পেণ্ডেন্টের মত সোনায় বাঁধানো মাদুলি থাকে।

ও খুব ঈশ্বরবিশ্বাসী।

স্বাস্থ্য দপ্তরের এক বড়সড় আমলা অরিজিতের খুব বন্ধু। একসময় পেশেন্ট ছিল। ফোন করে জিগ্যেস করেছিল একটা এনকোয়ারি কমিটি বসানো যায় কিনা। কিছুই তো দীপঙ্কর রায় বলতে চাইছে না, হি শুড বি ফোর্সড টু ক্লারিফাই…

তারপর হঠাৎ জিগ্যেস কবেছে, আপনার কি মত?

অরিজিৎ সম্মতি জানিয়েছে। বলেছে, অবশ্যই, আপনাদের সে রাইট আছে। আফটার

অল সে তো গাভমেন্ট সার্ভেন্ট।

অরিজিৎ নিজেও তাই। ও রামানন্দর মত স্বাধীন নয়। ওর এ ধরনেব কোনও ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তর নাক গলাতে এলে নিশ্চয় চটে যেত। আমার চাকরির এলাকার বাইরে তোমাদের হস্তক্ষেপ কবার অধিকার কোথায় পেলে ? আসলে স্বাস্থ্য দপ্তরেব সঙ্গে অরিজিৎ ব্যানার্জির মত নামী এবং উচ্চপদস্থ ডাক্তারদের বেশির ভাগেরই একটা বিচিত্র সম্পর্ক আছে। ভিতরে ভিতরে পারস্পরিক রেষারেষি থাকলেও। একপক্ষের ধারণা, তুমি যত বড় ডাক্তারই হও, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দিক থেকে তুমি আমাদের অধীন। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলতে অবশ্য কোথাও সীমারেখা টানা আছে তা ওরা বিশ্বাস করে না। অন্যপক্ষ যথাসাধ্য স্বাধীন থাকার চেষ্টা করে, তবে মানিয়েও চলে। আমলাদের অকারণে চটিয়ে দিয়ে ঝামেলা সৃষ্টি করে লাভ তো কিছু নেই।

অরিজিৎ এনকোয়ারিব ব্যাপারে সায় দিয়েছে। কিন্তু দীপঙ্করকে জব্দ কবার জন্যে নয়। ও তো একটু পাগলাটে ধরনের, হয়তো ঠাট্টা-তামাশা করেই, কিংবা নিউজে আসবার জন্যে, হয়তো কোনও রিপোর্টারিকে বলেছিল। শেষ পর্যন্ত সেটা যে হৈ চৈ বাধাবে ভাবেইনি। এখন সে চুপ করে গেছে বলেই অবিজিতেব আর বিশেষ কোনও রাগ নেই। ববং দীপঙ্করের জন্যে মায়া হচ্ছে। বেচাবা এখন উদ্ধার পেয়ে গেলে অরিজিৎ খুশি হয়। কিন্তু এনকোয়ানিব ব্যাপারে সায় না দিয়ে ওব উপায় নেই। কাবণ ওব বুঝতে অসুবিধে হয়নি, এর পিছনে আরো হোমরাচোমরা কেউ আছে। ডিরেক্টর ? সেক্রেটারি ? মন্ত্রী ? কে জানে কে। এখন বেচারার চাকরি নিয়ে টানাটানি না হলেই অবিজিৎ নিশ্চিন্ত হতে পারে।

কিন্তু কেউ কিছু একটা আবিষ্কার ক্লেম কবলে কি সরকারী এনকোয়ারি কমিটি বসে ? কখনো বসেছে ? অবিজিৎ ঠিক জানে না।

এ-সব তো সায়েন্স কংগ্রেসে পডা হয, জার্নালে বেরোয়।

যাদের যোগ্যতা আছে তাবা মতামত দেয়। নানা দেশে আলোচনা হয়, এক্সপেরিমেন্ট হয়, তারপর স্বীকৃতি পায় বা পায় না।

জগদীশ বসুকে নিয়ে কি সরকাবী এনকোযাবি হয়েছিল ? মেঘনাদ সাহা কিংবা সত্যেন বোস ? খুব একটা বড় আবিষ্কাব না হলেও মেডিকেল সায়ান্সেও তো ছোটখাটো আবিষ্কাব অনেকেই করছে, পেপার পড়া হয়, জার্নালে বেরোয়। কই সে-সব নিয়ে সরকারী এনকোয়ারির কথা মনে পড়ে না।

হঠাৎ দীপঙ্করকে নিয়েই বা এ-সব হচ্ছে কেন ? অরিজিতের কাছেও রহস্য ঠেকেছে। খববটা ওর খুব ভাল লাগেনি, একটু ঈর্ষা হয়েছিল ঠিকই, কেমন যেন মনে হয়েছিল ছোট হয়ে গেলাম। বিশ্বাসও হয়নি। মনে হয়েছে ব্লাফ। কিন্তু দীপঙ্করকে নিয়ে এই এনকোয়াবির ব্যাপারটাও ভাল লাগছে না। তোমরা কে হে ?

অরিজিতের নিজেকে বড়ো অসহায় লাগছে। ইচ্ছে হচ্ছে ফোন করে জানিয়ে দেয়, শুধু মাসে মাসে কটা টাকা মাইনে দেন বলে কি আমাদের আপনারা কেনা গোলাম ভাবেন ? আমি কি নিয়ে রিসার্চ করি বা না কবি তাব সঙ্গে আপনাদের কি সম্পর্ক ! তার জন্যে অনেক জ্ঞানীগুণী লোক সারা পৃথিবীতেই আছে। আপনারা কে মশাই ?

কিন্তু, অরিজিৎ ভেবে দেখল, তা সম্ভব নয়। ঐ আমলাদের কাছে ও বড়ই অসহায়। কারণ ডিরেক্টর থেকে শুরু করে কেরানি অবধি সকলেই ওকে খাতির করে। চাকরির জীবনে আরও ওপরে ওঠার সিঁড়িতে ওরা সহায় হবে বলে নয়। আসলে কারও ভাল জায়গায় বদলি বা কলকাতায় ফিরিয়ে আনা, কাবও গাফিলতি ধরা পডলে তাকে বাঁচানো, কারও প্রোমোশন, এসব বিষয়ে ওরা কিন্তু অরিজিতের অনুবোধ রাখার চেষ্টা করে। সম্ভব হলে করেও দেয়। এও তো এক ধরনের প্রতিপত্তি। এটা তো পারস্পরিক সম্পর্কের

ওপবেই নির্ভব করে। সবক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায বিচাব করলে চলে না।

তেমন সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটলে তখন দেখা যাবে।

অবিজিৎ নিজেই তখন দীপঙ্করকে বাঁচাবে।

কিন্তু দীপঙ্করেব কি একবার আসা উচিত ছিল না? অবিজিৎ ভদ্রতা করে বলেছে, যাব একদিন। সেই কংগ্র্যাচুলেট কবাব দিন বলেছিল। অবিজিৎ উঁচু ধাপের যেখানে দাঁড়িযে আছে সেখানে দাঁড়িয়ে 'যাব একদিন' বলাই যথেষ্ট সম্মান। দীপঙ্কবের তো নিজেবই আসা উচিত ছিল।

চা শেষ করে ভিজিটিং কার্ডটা নিযে নেড়েচেড়ে দেখল অবিজিৎ। আরে, এঁকে এতক্ষণ বসিয়ে বেখেছি! ডক্টর স্বামীনাথন' কই মনে পড়ছে না। আলাপ নেই। কিন্তু নামেব পবে বিদেশী ডিগ্রিগুলো চোখে পড়ল, ক্ষুদে অক্ষবেব পবিচযও।

নেমে এল। বসিযে বাখাব জন্যে ক্ষমা চাইল অমাযিক হাসিব পরে ব্যস্ততা জানিযে।—বসুন, বসুন।

—আমি ম্যাড্রাসে একটা লেপ্রসি হোম চালাই।

স্বামীনাথন গুরুগম্ভীব মুখে বললেন, আমাদেব ওদিকে এটা একটা বিবাট প্রবলেম। আমি বিলেতে এ-বিষযেই পড়াশুনো করতে গিযেছিলাম। ফিবে এসে নিজেই একটা লেপ্রসি হসপিটাল শুরু করি।

অবিজিতেব ভুরু কুঁচকে উঠল। কৌতূহল জাগল। লেপ্রসি'

—বলুন কি কবতে পাবি আমি?

স্বামীনাথন হেসে বললেন, না না, তেমন কিছু নয। আসলে আমি ডক্টব বয়েব সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। একটু থেমে বললেন, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ বেঙ্গলিজ'

একটা ক্রুদ্ধ বিবক্তিব বেখা ফুটে উঠল অবিজিতেব কপালে। 'হোযাই?'

স্বামীনাথন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, না না, আপনাকে বলছি না। ডক্টব বযকে যে কজন কংগ্র্যাচুলেট কবেছেন, আপনিও তাদেব মধ্যে একজন। আই নো দ্যাট। ডক্টব রয আমাকে বলেছেন। আমি সেজন্যেই দেখা কবতে এলাম।

কথাটা অরিজিতেব বুকেব মধ্যে কাঁটাব মত বিঁধল। কিন্তু মুখে প্রকাশ কবল না।

স্বামীনাথন বললেন, কিছু মনে কববেন না গ্রেটনেস যতক্ষণ না অ্যাকসেপ্টেড হয ততক্ষণ আপনাবা তাকে খুন কবাব জন্যে নৃশংস হযে ওঠেন। আব যখন অ্যাকসেপ্টেড হয তখন তাকে এমন মাথায তোলেন যেন পৃথিবীতে আব কোথাও কোনও গ্রেট ম্যান জন্মাযনি।

অরিজিৎ বোঝবাব চেষ্টা কবল, লোকটা কোথায যেতে চাইছে।

—আপনার আসল কথাটা বলুন এবার। অবিজিৎ বললে।

ডক্টব স্বামীনাথন বললেন, উনি কিন্তু সত্যি একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কাব করেছেন। লেপ্রসির। ইট উইল ইরাডিকেট দি ডিজিজ ফ্রম দি ওয়ার্লড। আমি গোড়া থেকেই জানি। টক্সিক এফেক্ট নেই।

অবিজিৎ ভিতবে ভিতবে বিব্রত বোধ কবছিল, ঠিক এবকম একটা ওকালতি শুনতে হবে ভাবেনি। বলল, এত তাড়াতাড়ি ক্লেম কবা উচিত হয়নি ওব। আফটাব অল মানুষেব ওপব প্রয়োগ না হলে.....

—হয়েছে। রিমার্কেবল বেজাল্ট। বিলিভ ইট অর নট।

অরিজিৎ চমকে উঠে বলল, কোথায?

স্বামীনাথন মাথা নামিয়ে বললেন, আই কান্ট সে দ্যাট, আপনি ওঁব হিতৈষী জেনেই বললাম, হয়েছে।

তারপর স্বামীনাথন হাসতে হাসতে বললেন, সমস্ত রিপোর্ট আমি বাইরে পাঠিয়েছি, অ্যাব্রড। দু দুটো জায়গা থেকে ওঁর ইনভিটেশন আসছে। ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইজ ওয়েটিং ফর হিম। অ্যান্ড ফর আস, ইন্ডিয়ানস্!

অরিজিতের মুখ দিয়ে কোনও কথা সরল না।

স্বামীনাথন বললেন, হি ইজ কমপ্লিটলি রান ডাউন। ডক্টর রয়। এ-রকম বিহেবিয়ার উনি আশাই করেননি।

হাসতে হাসতে বললেন, আমি জানি না, আসল ব্যাপারটা ছেড়ে কয়েকজন গাইনি কেন গোনাডোট্রপিন নিয়ে পড়ল।

তারপর ঝপ করে অরিজিতের হাতটা ধরলেন স্বামীনাথন। অরিজিৎ আঁতকে উঠে হাতটা ছাড়িয়ে নিল। যেন ঐ লেপ্রসির ডাক্তারের হাতেও লেপ্রসি আছে। বইয়ে পড়েছে এত চট্ করে ইনফেকশন হয় না, অপরকে বুঝিয়েছে। কিন্তু সংস্কার যাবে কোথায়।

স্বামীনাথন বললেন, ডক্টর রয় একেবারে ডিসগাস্টেড। ডিজেক্টেড। আপনি ওঁকে একটু বোঝাবেন, ইনভিটেশন যেন অ্যাকসেপ্ট করেন। বেঙ্গলিজ মে নট, বাট হিউম্যানিটি ডিম্যান্ডস ইট।

স্বামীনাথন চলে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে অরিজিৎ চিন্তিত হয়ে পড়ল।

যাবার সময় ও স্বামীনাথনকে সাবধান করে দিয়েছে, এটা নিয়ে ওর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিত নয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি দীপঙ্কর একটা আনএথিক্যাল ব্যাপার করেছে, এবং আপনিও। ইউ উইল বি ইন ট্রাব্ল।

অরিজিতের একবার মনে হল, বাজে কথা। ওসব ভাঁওতা। পরক্ষণে মনে হল, কি দুঃসাহস। গভর্নমেন্টের পার্মিশন না নিয়ে এ-রকম একটা কাণ্ড কেউ করতে পারে? মানুষের ওপর প্রয়োগ করেছে লুকিয়ে লুকিয়ে? জানাজানি হলে ওকে তো কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাবনা, ইনভিটেশন আসছে। ফ্রম অ্যাব্রড।

—রামানন্দ, যদি জালিয়াতি হয় কি-দুর্নামই না হবে ইন্ডিয়ানদের। সেখানে গিয়ে যদি ধরা পড়ে বাঙালী আর মুখ দেখাতে পারবে না।

স্বামীনাথন চলে যেতেই ফোন করে রামানন্দকে জানিয়ে দিলে অরিজিৎ।

রামানন্দ হাসতে হাসতে উত্তর দিল, নিশ্চিন্ত থাকো, এনকোয়ারি কমিটি ওর বিষ দাঁত ভেঙে দেবে।

পারমিতা শুনছিল। কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। অরিজিতের কথা শুনল, কিন্তু রামানন্দর কথা শুনতে পেল না।

হঠাৎ বললে, কিসের দুর্নাম?

অরিজিৎ বিব্রত বোধ করল। পারমিতা তো বিশ্বাস করে বসে আছে। কিন্তু অরিজিতের মনের মধ্যে যে কি চলছে তা ও বুঝবে না। ও টাকা জানে, বাড়ি জানে, গাড়ি জানে। মেডিকেল কলেজের চাকরির ডেজিগনেশন জানে। তারও বাইরে কিছু আছে তা জানে না। কিংবা তাও জানে। এবং সেটাকেই বড় করে দেখে। দেখছে।

কত নির্দোষ সারল্যে বলে বসেছিল। —তোমরা তো ডাক্তার! যেন ডাক্তারিটা বিজ্ঞান নয়, যেন ডাক্তাররা বিজ্ঞান বোঝে না।

অরিজিৎ বললে, দীপঙ্কর বাইরে থেকে ইনভিটেশন পাচ্ছে। সেখানে গেলে ধরা পড়বেই, তখন আমাদের দুর্নাম, দেশের দুর্নাম।

পারমিতা শব্দ করে হেসে উঠল।—তোমরা এত দেশের কথা ভাব!

তারপর বললে, জানো, রেডিও নিয়ে জগদীশ বসুরও দুর্নাম হয়েছিল। এখন কিন্তু

অনেকেই স্বীকার করছে, বিদেশীরাই।

অরিজিৎ বিরক্তির সঙ্গে বলল, যার তার সঙ্গে জগদীশ বসুর নামটা এনো না।

পারমিতা কেমন অদ্ভুত ভাবে অরিজিতের মুখেব দিকে তাকাল।

অরিজিতের মনে হল ঐ দৃষ্টিটা যেন বলতে চাইছে, ইউ আর জেলাস!

কেমন অসহ্য লাগল। কোনও কথা না বলে গাম্ভীর্যের সঙ্গে সবে গেল, প্রচণ্ড রাগ হল পারমিতার ওপর। বুকের ভেতর থেকে একটা নৃশংস ক্ষোভ যেন অনেকগুলো ধারাল নখ উঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। যাব আরেক দিকে ঠেলে বেরোতে চাইছে অক্ষম কান্না। তোমার জন্যেই। তুমি তো সুখ চেয়েছিলে, বিলাস চেয়েছিলে। প্রতিষ্ঠা, পরিচয়। তাব মধ্যেই আমাকে সারাটা জীবন বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছে। তা না হলে আমিও পারতাম কোনও অসাধ্য সাধন করতে, দীপঙ্করের মতই। এখন আমার ঈর্ষা ছাড়া কিছু করার নেই।

পারমিতার ওপর রেগে যাওয়ারও উপায় নেই। তাহলে ওর চোখে অবিজিৎ আরও ছোট হয়ে যাবে।

রাগটা সেজন্যেই শুধু দীপঙ্করের ওপর। দীপঙ্কব নিজেকে বড়ো বেশি চতুর ভেবেছে। সন্দেহ নেই স্বামীনাথনকে দীপঙ্করই পাঠিয়েছিল। হয়তো ওর এই অসহায় মুহূর্তে চাইছে অরিজিৎ ওর হয়ে প্রকাশ্যে দাঁড়াক।

অরিজিৎ মনে মনে হাসল।

গোপালকে বলল, বড় গাড়িটা বেব করতে বল্।

সটান চলে এল বামানন্দর নার্সিং হোমে।

রামানন্দ ওকে দেখতে পেয়েই বললে, চলো, চলো, কথা আছে।

একটা নির্জন ঘরে মুখোমুখি বসল দুজনে।

রামানন্দ বললে, তোমার দীপঙ্কর তো বীতিমত দল পাকাচ্ছে। ডাক্তার বিশ্বাস সেদিন মুখের ওপরই বললেন, উনি বিশ্বাস করেন। এখন দেখছি, কয়েকজন স্কিন স্পেশালিস্ট, ম্যাড্রাসের ঐ স্বামীনাথন, এমন কি দু-চারজন গাইনিকেও দলে টেনেছে।

ভাবছে এইভাবেই ভাঁওতা দিয়ে চালাবে। কিন্তু আমরা ওর মুখোশ খুলে দেব।

একটু থেমে বললে, আমবা দলে ছোট, কিন্তু আমরাই পাওয়ারফুল। তাছাড়া এথিকস আমাদের দিকে, আইন আমাদের দিকে।

অরিজিৎ বলল, আমাদের তো কোনও দল নেই। উই আর অন দি সাইড অফ ট্রুথ। যা ট্রুথ তা তদন্ত করে বের কবতে হবে। ও যদি প্রমাণ কবতে পারে, করুক না।

রামানন্দ বললে, ও যদি লেপ্রসির ভ্যাকসিন নিয়ে একটা ব্লাফ দিত, কিছু বলতে যেতাম না। কিন্তু ও আমাদের ভাতে মাছি ফেলেছে। বন্ধ্যাত্ব দূর করে দেবে। হোয়াট এ ক্লেম!

অরিজিৎ বলল, কিন্তু এনকোয়ারি কমিটি যদি বিশ্বাস করে বসে।

রামানন্দ হেসে উঠল।

—আইডিয়াটা আমাবই। ও তো সেক্রেটারি, ডিরেক্টর তাদের কাছেও অডাসিটি দেখিয়েছে। দু হাত নেড়ে বলেছে, নাথিং টু অ্যাড। সেটাই সুবিধে হয়েছে।

অবিজিৎ বলল, ও পাগল হয়ে গেছে। ও যদি আমাদের সাহায্য চাইত, একটু বিনয় দেখাত, আমরা নিশ্চয় বিরুদ্ধে যেতাম না। কিন্তু এনকোয়াবি কমিটি নিয়েই আমার দুশ্চিন্তা।

রামানন্দ বললে, এনকোয়ারি কমিটিতে কে কে থাকবে কথা হয়ে গেছে।

—কে কে?

রামানন্দ হাসল।—একজন তুমি।

—আমি ? আঁতকে উঠল অরিজিৎ।—না, না, তা সম্ভব নয়। আমি ফোরফ্রন্টে আসতে পারব না। আমার স্ত্রী, কন্যা, তারা তো এখন দীপঙ্কর বলতে অজ্ঞান। মেয়ে আবার জিগ্যেস করছিল, নোবেল প্রাইজ পেয়ে যেতে পারে কিনা।

রামানন্দ শব্দ করে অট্টহাসে হেসে উঠল।

তারপর বললে, তাহলে দেখি আরেকজন কাউকে।

—কিন্তু কমিটিতে আর কারা থাকবে ?

রামানন্দ বললে, আমাদেরই লোক। একজন বিখ্যাত আর্কিটেক্ট, একজন আই এ এস, একজন অ্যাসট্রনমির প্রফেসর, দুজন গাইনি, আর চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর।

অরিজিৎ বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকাল।—ওবা কি কববে ? এটা তো লেপ্রসির ভ্যাকসিন।

রামানন্দ হাসতে হাসতে বললে, কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট তো করেছে ইঁদুর, খরগোশ, বাঁদরের ওপর। জীবজন্তু নিয়ে কাণ্ড, সেজন্যেই চিড়িয়াখানা।

অরিজিৎ নির্বোধের মত প্রশ্ন করল, অ্যাসট্রনমি কেন ?

রামানন্দ গম্ভীর মুখে বললে, দীপঙ্কর তো বলেছে, এটা সায়েন্সের ব্যাপাব। সেজন্যেই একজন সায়েন্টিস্ট রেখেছি। আই এ এস দরকার, আইনকানুনের জন্যে। ওর এক্সপেরিমেন্টের জন্যে কখন হেলথ ডিপার্টমেন্টের পারমিশন দরকার ছিল, ডিউটি আওয়ার্সে এ-সব করেছে কিনা। গাইনিরা প্রশ্ন করবে ঐ উদ্ভট ক্রেম সম্পর্কে, গোনাডোট্রপিন !

তদন্ত কমিটির সামনে উপস্থিত হবার নির্দেশ পেয়ে দীপঙ্কর রায় যথাস্থানে এবং যথাসময়ে এসে হাজির হল।

দেখে মনে হল একটা ভেঙে পড়া মানুষ যেন শেষ মুহূর্তে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ও বুঝতে পারছে, হয় ওকে চাকরি ছাডতে বাধ্য করা হবে, অথবা কোনও নগণ্য জায়গায় বদলি করে দেওয়া হবে। হয়তো রাত জেগে এ কদিনে যে পেপারখানা তৈবি করেছে সেটা প্রকাশ করার অনুমতিও দেওয়া হবে না।

ওর অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। তিন তিনটে মাস, শুধু পেপার্স তৈরি করতে। কখন করবে ? ও তো নিশ্চিন্তে বসতেই পায়নি। সিংহের মুখোশ পরা লোকটা নানান ট্রাবল্ দিয়েছে। এনকোয়ারি কমিটির ভয় দেখিয়েছে। বন্ধু আর আত্মীয়রাও অবিশ্বাস করেছে। হাসপাতালে মুখ টিপে হাসি। এই মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে কি পেপার্স তৈরি করা যায়।

বিশাল ঘরখানার মধ্যে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দীপঙ্কর।

সেই মুখোশ পরা লোকটা মাঝখানে বসে আছে। মুখোশ উঠে এসে বীভৎস হাসি হেসে ওর সঙ্গে হ্যান্ড শেক করল। তারপর একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

দীপঙ্কর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে পা টানটান করে ছড়িয়ে দিয়ে বসল।

মুখোশ বললে, আপনার এক্সপেরিমেন্টের কথা আমাদের কাছে ডিটেল্‌সে বলুন। সত্যি না মিথ্যে আমরা বিচার কবব।

দীপঙ্কর ফস্ করে একটা দেশলাই জ্বেলে ঠোঁটে ধরা সিগারেটটা ধবাল, এক মুখ ধোঁয়া ছুঁড়ে দিল, তারপর বললে, আপনারা কে ? আসল বিচারকরা নেই কেন ?

মুখোশ রেগে উঠল।—আসল বিচারক বলতে কি বোঝাতে চাইছেন ? এখানে সব ফিলডের টপ লোকরা আছেন।

দীপঙ্কর বললে, আপনি হিস্ট্রি পড়েননি। তাই এ-কথা বলছেন।

মুখোশ বললে, ঠিক আছে, আমরা একজন হিস্টোরিয়ানকেও ডাকছি।

দীপঙ্কর বললে, প্রয়োজন নেই। কাবণ, আমি হিস্ট্রি পড়েছি। যে-কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিচারক হয়ে এসেছেন ধর্মযাজক। আপনারা কোনও পুরুত ঠাকুরকে ডাকেননি কেন ?

মুখোশ বললে, আপনি কি আমাদের ঠাট্টা করছেন, নাকি সত্যি পুরুত ঠাকুর চান ?

দীপঙ্কর বললে, হ্যাঁ চাই। কারণ শাস্ত্র পড়ে তিনিই তো বলে দেবেন এ যাবৎ পূর্বজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে যারা লেপ্রসিতে ভুগে এসেছে, রোগটা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হলে তাদের কি হবে। পৃথিবীতে পাপ বেড়ে যাবে কিনা।

একটু থেমে বললে, একজন জ্যোতিষীকেও ডাকা উচিত।

মুখোশ রেগে গিয়ে বললে, কেন !

দীপঙ্কর হাসতে হাসতে বললে, আপনাদের হাতের আঙুলের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি আপনারা জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন। তাঁকে পেলে আমার কুষ্ঠিটাও একবাব দেখিয়ে নিতাম।

মুখোশ বললে, আমাদের সুমহান ঐতিহ্যের ওপর আপনার যদি বিশ্বাস থাকত তাহলে আপনি এই কাজ শুরু করার আগেই কনসাল্ট করতেন।

দীপঙ্কর হঠাৎ করুণ স্বরে বললে, এখন কিন্তু আমি সবই বিশ্বাস করছি। জ্যোতিষ, গ্রহরত্ন, পুরোহিত এবং পাঁজি। কারণ দেখতে পাচ্ছি, যুক্তি দিয়ে সব কিছুব ব্যাখ্যা কবা চলে না। যেমন আপনারা যে বড় বড় পোস্টে গিয়ে বসেছেন, ক্ষমতাশালী হয়েছেন, কিংবা খ্যাতি পেয়েছেন, তার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পাচ্ছি না, আপনাদের আঙুলের ঐ গ্রহরত্নের অলৌকিক শক্তি ছাড়া এর আর কোনও ব্যাখ্যা নেই।

আর্কিটেক্ট, আই এ এস, গাইনি, চিড়িয়াখানা এবং মুখোশ একসঙ্গে উল্লাস প্রকাশ করল।—ঠিক বলেছেন। ঠিক বলেছেন। আমরা এর অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ করেছি।

একজন গাইনি বললে, এবার আপনার ঐ ভ্যাকসিন, যা বন্ধ্যাত্ব দূর করবে, তাব অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ করতে চাই।

দীপঙ্কর বললে, আই অ্যাম সরি। আমি আপনাদেব তা দেখাতে পাবছি না, এবং দেখাতে চাই না। আমার শুধু একটাই প্রার্থনা আপনাব কাছে, ডক্টব মুখোশ।

একটু থেমে বললে, আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড থেকে দুটো কনফারেন্স অ্যাটেন্ড কবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি, সেখানেই পেপারটা পড়তে চাই। আমাকে শুধু যাবাব পার্মিশনটা দিন।

সঙ্গে সঙ্গে এনকোয়ারি কমিটির সদস্যবৃন্দ হৈ হট্টগোল শুরু করল।

—অসম্ভব, অসম্ভব। আমাদের দেশের এবং আমাদের দেশেব এই নোব্‌ল প্রফেশনের সুনাম বিদেশে খর্ব হতে দিতে পাবি না।

মুখোশ অবশ্য উত্তেজিত হল না। বললে, ওটা থ্রু প্রপার চ্যানেল পাঠিয়ে দেবেন। অফিস বিচার করে দেখবে দরখাস্তটা।

অ্যাসট্রনমার ঠাট্টা করে বললে, আপনাব অনুমতির কি দরকাব, আপনি তো চাকরিটা ছেড়ে দিলেই পারেন। আমেরিকা তো আপনাকে লুফে নেবে।

সকলে শব্দ কবে হেসে উঠল।

আর দীপঙ্কর একের পর এক সকলের মুখের দিকে করুণ ভাবে তাকাল। অসহায় ভাবে বললে, প্যাসেজ মানিটাও আমার নেই, ওরা টিকিটের ব্যবস্থা করে দেবে বলেছে, তাই। পরের মাসের মাইনে না পেলে আমার চলবে কি করে !

মুখোশ বললে, আপনার এই ব্যবহারের পর আপনি নিয়মিত মাইনে পাবেন কিনা আমি সিওর নই।

দীপঙ্কর হঠাৎ অপমানিত বোধ করল। উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠল। বাগ

চাপার চেষ্টা করল, পারল না।

নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হল তার। রাগে অভিমানে চোখ ফেটে জল এল।

ও বুঝতে পারছে একটা অদৃশ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে ও কত অক্ষম। ওর সারা জীবনের সাধনাকে ওরা ব্যর্থ করে দিতে চায়। ব্যর্থ করে দেবে। ও কি বিশাল সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখেছিল। ওর সঙ্গে সঙ্গে সীমাও। সাকশেসফুল লোকের স্ত্রীদের মত সুখ আর বিলাস খোঁজেনি, অফুরন্ত টাকা চায়নি, বাড়ি গাড়ি, কিচ্ছু না। সীমাকে তার পবিবর্তে সাফল্যের আনন্দ দিতে চেয়েছিল। এখন তাকে কিছুই দেবাব নেই। দীপঙ্কর বেশ বুঝতে পারছে সাফল্য পেযেও তাকে ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে বেডাতে হবে। সাবা জীবন। এরা ওকে স্বীকৃতি পেতে দেবে না।

অসহায় ভাবে প্রত্যেকটি মুখের দিকে ও তাকাল। কি নৃশংস হাসি প্রত্যেকের মুখে।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল দীপঙ্কর। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। কঠিন চোখে তাকাল ওদেব দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুখগুলো কেমন আতঙ্কে সাদা হয়ে গেল। এইমাত্র যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরকেব সলতেয় আগুন ধবানো হয়েছে, দীপঙ্করকে দেখে ওদেব মনে হল।

না। দীপঙ্কর শুধু ওর হাতের ফাইল থেকে টাইপ কবা বিপোর্টের কাগজগুলো বেব করল।

—প্রথম দিন থেকে আপনাবা আমাকে একটুও শান্তি দেননি। আমার পেপার্স তৈবি কবতে তিন তিনটে মাস পাব হযে গেছে। আপনারা কেবল এনকোয়ারি কমিটিব ভয দেখিয়েছেন। এখন আব আমি আপনাদেব একটুও ভয় পাই না।

একটু থেমে বললে, এই আমাব বিসার্চের পেপার্স। দেখুন। বলেই উত্তেজিত ভাবে সেগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে আর্কিটেক্ট, অ্যাসট্রনমার, গাইনি, চিঁড়িয়াখানা, আই এ এস আর মুখোশের মুখে ছুঁড়ে মাবল।

চিৎকার করে উত্তেজিত ভাবে বললে, আমি একটা স্টুপিড, স্টুপিড। আমি ভেবেছিলাম কুষ্ঠরোগ থেকে মানুষকে বাঁচাব। তাই তাব ভ্যাকসিন বেব কবার পিছনে সারাটা জীবন খরচ কবে দিযেছি। জানতাম না, এই দেশটাই এখন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। একটা সমাজকে কুষ্ঠবোগ থেকে বাঁচানোর কোনও ভ্যাকসিন আমার জানা নেই।

বলেই ঘর থেকে বেরিযে গেল।

৭

পরেব দিনেব কাগজে খবর বের হল। তিন লাইনে লেখা তদন্ত কমিটির বিপোর্ট।

আপামর জনসাধারণ জানতে পারল বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকদের নিযে গঠিত এনকোয়াবি কমিটির কাছে দীপঙ্কর রায় তাঁর তথাকথিত আবিষ্কার সম্পর্কে কিছুই বলতে পাবেননি। একটি প্রশ্নেবও জবাব দিতে পাবেননি।

জালিয়াত, জালিয়াত।

খবরেব কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পডেছিল দীপঙ্কব। অসহ্য লেগেছিল। এখন আর তাব মধ্যে কোনও হতাশা নেই। রাগ নেই। এখন শুধুই গ্লানি। আমি একটা জালিয়াত, আমি একজন প্রতাবক।

টেলিফোন বাজছিল। একটার পর একটা।

—ডক্টর রায়। আপনি ? ছি ছি, ছি ছি, আমাদের এই নোব্‌ল্ প্রফেশনের নামে আপনি একটা কলঙ্ক লেপে দিলেন ? রাতারাতি বিখ্যাত হওয়ার লোভে ? না না, আমাকে চিনবেন না।

—দীপঙ্কর রায় বলছেন ? আপনার লজ্জা করল না ? ভেবেছিলেন জালিয়াতি ধরা পড়বে না ?

—দীপঙ্করবাবু, সারা ভারতবর্ষে বাঙালী আর মুখ দেখাতে পারবে না। ভাবতেও ঘেন্না করছে।

ছি ছি, ছি ছি, ছি ছি।

দীপু, আমি তোর ছোট মাসী বলছি। হ্যাঁ রে, বড় গলায় গর্ব করে সবাইকে বলেছিলাম, আমার বোনপো। তুই শেষে এমন একটা ধাপ্পা দিতে যাবি কে জানত। পাড়ায় মুখ দেখাতে পারছি না।

অসহ্য, অসহ্য।

দীপঙ্কর রিসিভার পাশে নামিয়ে রাখল, আর কেউ রিং করতে পারবে না। ঐ ক্রিং ক্রিং শব্দটা এখন ওর মাথার মধ্যে পাগলা ঘণ্টি হয়ে বাজছে।

ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। দুহাত শূন্যের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে রাগে ক্ষোভে বলে উঠল, লেপার্স, লেপার্স অল।

রাস্তা দিয়ে টলতে টলতে নিরুদ্দেশ ভাবে হেঁটে চলল দীপঙ্কর। বুকে অসহ্য ব্যথা। সারা শরীরে গ্লানি।

মুখ তুলে তাকাতেও ভরসা হয় না।

ওর কেবলই মনে হচ্ছে সারা শহর যেন অট্টহাসে হাসছে ওকে দেখে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, একজন জালিয়াত। একজন প্রতারক।

সীমা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার কাছে আমার সাফল্যের মুকুট এনে দিতে পারিনি। এনে দিয়েছি শুধু লজ্জা আর অপমান।

কারণ একজন আর্কিটেক্টকে আমি বোঝাতে পারিনি লেপ্রসি কত বড় অভিশাপ। সিংহের মুখোশ-পরা একজন আমলাকে বোঝাতে পারিনি একটা ভ্যাকসিনের কাছে তার পদমর্যাদা এবং অহঙ্কার কত তুচ্ছ। চৌষট্টি টাকা ফিয়ের একজন গাইনিকে বোঝাতে পারিনি বিজ্ঞান তার এলাকা নয়। তুমি ছুরি ধরলেই হাজার টাকা নিতে পারো, তোমার নার্সিং হোম আরও বড় হোক। কিন্তু তুমি একজন সামান্য মেকানিক। আবিষ্কার কি তা তুমি জানো না। তুমি নিজেকেও কোনওদিন আবিষ্কার করতে পারবে না। সুদখোর মহাজনের মত তোমাদের দৃষ্টি ঐ খেরোর খাতায়, সুদের হিসেবে। কুষ্ঠগ্রস্ত মানুষের দুঃখ তোমরা বুঝবে না। মানুষের মহত্ত্ব তোমাদের নাগালের বাইরে।

একটা আবিষ্কার নিয়েই আমি এতকাল মেতে ছিলাম, সীমা। পৃথিবী থেকে কুষ্ঠরোগ চিরতরে দূর করে দেব। কিন্তু আরও একটা আবিষ্কার যে আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে জানতাম না। জানতাম না আমাদের এই সমাজটাই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি নিয়ে যারা ওপর তলায় বসে আছে ঈর্ষা আর অহঙ্কারে সিংহমুখ নিয়ে, তারা ঐ সিংহমুখ শব্দটার অর্থও জানে না।

লায়নস্ ফেস। সিংহমুখ। ওটা ঐশ্বর্য আর প্রতিপত্তির চিহ্ন নয়। ওটাই লেপ্রসির প্রাথমিক উপসর্গ। সমস্ত সমাজ এখন তাই সিংহমুখ হয়ে আছে। জানে না লেপার কথাটার আরেক নাম সিংহমুখ।

রাস্তা ধরে হেঁটে চলল দীপঙ্কর। ওর পা টলছে। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। ওর মনে হচ্ছে যেন সারা শহর অট্টহাসে হাসছে। আঙুল দেখিয়ে বলছে, জালিয়াত, জালিয়াত।

সীমা, আমি বলেছিলাম, এখন সবুর করো। এখন সন্তান চেয়ো না। তা হলে সন্তানের চেয়েও যা আমার কাছে প্রিয়, সেই আবিষ্কার দূরে সরে যাবে। একটি শিশুর হাসির চেয়ে, কোটি কোটি মানুষের হাসি আমার কাছে আরও মূল্যবান।

সীমা, এখন আর তোমাকে আমি একটি সন্তানও দিতে পারব না। কারণ, তার পরিচয় হবে একজন জালিয়াতের সন্তান, একজন প্রতারকের সন্তান।

হ্যাঁ অমূল্য, আমি জানি, ওদের অশেষ ক্ষমতা। ওরা আমাকে অনুমতি দেবে না। বিজ্ঞানীদের সভায় গিয়ে আমি আমার বক্তব্য বলতে পাব না। আমি জানি এই অপবাদের পর আমার পেপার্স ছাপা হবে না। শুধু একটা চাকরি আমাকে বন্দী করে রেখেছে।

—চলুন দীপঙ্করদা, বাড়ি চলুন। কি সব আবোলতাবোল বলছেন, বাড়ি চলুন।

—কে, অমূল্য ? তুমি ?

দীপঙ্কর তাকাল অমূল্যর মুখের দিকে। কি যেন বিড়বিড় করে বলল নিজের মনেই।

—কি বলছেন ? বুঝতে পারছি না। অমূল্য বলল।

দীপঙ্কর তাকিয়ে রইল অমূল্যের মুখের দিকে। কি যেন ভাবল। তারপব বিড়বিড় করে বলল, স্টুপিড, আমি একটা স্টুপিড। সময় থাকতে আমি যদি ওদের মত টাকা করার কথা ভাবতাম, অনেক টাকা। তাহলে আজ আব ঐ সামান্য চাকরিটা আমাকে আটকে বাখতে পারত না। চাকরির আইনে আমি বন্দী হতাম না।

অমূল্য দীপঙ্করের কাঁধে হাত রাখল।—না, দীপঙ্করদা। তাহলে আপনি ঐ টাকার কাছেই বন্দী হয়ে যেতেন। ওদের মতই। চলুন, বাড়ি চলুন। সকলে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্করের মুখ যেন ভয়ে সাদা হয়ে গেল।

চাপা গলায় বললে, আমার জন্যে অপেক্ষা করছে ? কে ? কারা ? ওরা কি আমাকে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারবে ? সেই আগেকার দিনে কুষ্ঠরোগীকে যে-ভাবে মারা হত ? কিন্তু আমি তো লেপার নই। কেন মারবে ওরা ?

অমূল্য বিব্রতভাবে বলে উঠল, চুপ করুন দীপঙ্করদা, চুপ করুন। কি সব বলছেন !

দীপঙ্করের হাত ধরে টানল।—ভেতবে আসুন, দেখুন কারা এসেছেন। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন ওঁরা। আপনার অপেক্ষায়। সীমাবৌদির কথা শুনে তো আমি হন্যে হয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম আপনাকে।

দীপঙ্কর অবাক হয়ে তাকাল অমূল্যর মুখের দিকে।—কেন, আমাকে খুঁজছো কেন। হেসে উঠল, বললে, আমিই তো খুঁজছি। সাবা জীবন ধরে।

অমূল্য বললে, ঐ দেখুন, ডক্টর স্বামীনাথন বসে আছেন।

দীপঙ্কর কি যেন ভাববার চেষ্টা করল। কি যেন মনে পড়ছে না। তারপব হঠাৎ বললে, স্বামীনাথন ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তারপরই খুব চাপা গলায় বললে, আপনি পালান। ডাক্তার স্বামীনাথন, আপনি পালান। এখানে আসবেন না। ওরা বোধহয় জেনে গেছে, সব জেনে গেছে।

বঙ্কিমবাবু এক কোণে বসেছিলেন। খবরের কাগজটা পড়েই সকাল বেলায় চলে এসেছেন। রিসার্চের সেই নেশা, ওঁর সারা জীবনেব ব্যর্থতা এখন তো দীপঙ্করের মধ্যেই সাফল্য দেখতে চাইছে। এখন তো উনি একজন সামান্য প্যাথলজিস্ট।

উনি চেয়ার ছেড়ে কাছে এলেন। দীপঙ্করের হাতখানা ধরলেন মুঠো করে।—ডোন্ট ইউ গেট ডিসাপয়েন্টড, মাই বয়। শেষ বিচার একদিন হবেই হে।

দীপঙ্কর চিনতে পারল।—স্যার আপনি ? আপনাকেই তো খুঁজছিলাম। ঐ-সব কাচের টিউব,গ্যাস বার্নার, সব ভেঙে ফেলে দিয়েছেন তো ?

বঙ্কিমবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললে, সাবধান, আর্কিটেক্ট জানতে পারলে পুলিসে ধরিয়ে দেবে। আপনাব ঐ ছোট্ট ঘরে বিরাট বিরাট ল্যাবরেটরি ধরবে কি করে ? অনেক বড় বড় যন্ত্রপাতি ? আপনাকে প্রমাণ দেখাতে হবে।

প্রফেসর কুণ্ডু অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছিলেন। ওঁর কি রকম যেন সন্দেহ সন্দেহ ঠেকছিল। একবার সীমার মুখের দিকে তাকালেন, একবার অমূল্যর মুখের দিকে।

জানালার কাছটিতে বসে ছিলেন। বসে বসেই ডাকলেন, দীপঙ্কর, এদিকে এস।

ডাক শুনে দীপঙ্কর প্রফেসর কুণ্ডুর দিকে তাকাল। দ্রুত তাঁর কাছে এগিয়ে গেল। তারপর চোখ পাকিয়ে ফিসফিস করে বললে, স্যার আপনি ? খবর্দার, আপনার ল্যাবরেটরির জিনিসপত্তর কাউকে ব্যবহার করতে দেবেন না, ওটা বে-আইনি। সব সময়ে আইন মেনে চলবেন, আইন। খুব কড়া আইন।

অমূল্য বললে, দীপঙ্করদা, এঁদের আপনি চেনেন না। ইনি একজন বিখ্যাত গাইনি, ডাক্তার মল্লিক আর ইনি নামী সার্জেন ডাক্তার সাহা। এঁরা কিন্তু বিশ্বাস করেন যে ··

দীপঙ্কর হেসে উঠল।—বিশ্বাস ? সেই ডাক্তার বিশ্বাস ? যিনি আমাকে ফোন করে সাবধান করেছিলেন ? বলেছিলেন, অনেকে ষড়যন্ত্র করছে ?

—না না, এঁরা আপনার আবিষ্কার যে সত্যি তা বিশ্বাস করেন। কত ইয়াং ডাক্তার এসেছে দেখুন, কমিটি বিশ্বাস করেনি বলে ওরা কমিটির মুখোশ খুলে দেবে বলেছে।

দীপঙ্কর হঠাৎ অমূল্যর মুখের দিকে তাকাল।—কে ? অমূল্য তুমি ? কি বলছিলে ? বিশ্বাস ? বিজ্ঞান তো বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয় অমূল্য। ওটা প্রমাণ করা যায়, ওটা যুক্তি। পরীক্ষা করে ওর ফল দেখানো যায়। আমি তো বিশ্বাস চাইনি। আমি শুধু ভ্যাকসিনটা কিভাবে আবিষ্কার করেছি, কিভাবে পরীক্ষা করেছি ইঁদুরের ওপর, রিসাস বাঁদরের ওপর, এমন কি মানুষের ওপর সে-কথাই জানাতে চেয়েছিলাম। ওরা তো নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখতে পারত।

স্বামীনাথন এগিয়ে এলেন। কি যেন বলতে চান।

হঠাৎ স্বামীনাথনের মুখের দিকে ফিরে তাকাল দীপঙ্কর।-- নো নো ডক্টর স্বামীনাথন। আমি ভুল বলেছি, মানুষের ওপর পরীক্ষা করে দেখিনি। আপনাকে আমি বিপদে ফেলব না।

এবার দীপঙ্কর ঘুরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ভঙ্গিতে বললে, জেন্টলমেন, আমি আর কতটুকু কষ্ট পেয়েছি, যারা আমাদের জন্যে প্রাণ দেয়, নিজের শরীরে রোগ নিয়ে যন্ত্রণা ভোগ করে, তাদের কথা ভেবেছেন কোনওদিন ? আসুন, দেখবেন আসুন।

বাইরে উঠোনে বেরিয়ে এল দীপঙ্কর। ওর পিছনে পিছনে সকলেই।

দীপঙ্কর তর্জনী দেখিয়ে বললে, ঐ দেখুন। সারি সারি খোপে খোপে রাখা ইঁদুর, সাদা ইঁদুর। গিনিপিগ, খরগোশ। ঐ দেখুন রিসাস বাঁদর।

অমূল্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, পৃথিবীতে মৌলিক আবিষ্কার একটাই। ডারুইন আবিষ্কার করেছিলেন। উই আর অল এপস্। বাঁদর।

কেউ হাসল না।

স্বামীনাথন অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছিলেন। কি যেন বলতে চাইছেন, বলার সুযোগ পাচ্ছেন না। হাতে একটা কি জার্নাল গোল করে পাকানো।

স্বামীনাথন এগিয়ে এসে দীপঙ্করকে কি যেন বলতে গেলেন।

আর দীপঙ্কর হঠাৎ পাগলের মত বলে উঠল, আঃ আমাকে বিরক্ত করবেন না। আপনারা চলে যান, চলে যান। আমার এখন ঘুম পাচ্ছে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আমাকে একটু ঘুমোতে দিন। বলেই আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এল দীপঙ্কর। পিছনে পিছনে সকলেই।

স্বামীনাথন ব্যস্ত হয়ে বললেন, কিন্তু ডক্টর রয়, জার্নালটা দেখুন, একটা খবর আছে।

সবাই উদগ্রীব হয়ে জিগ্যেস করল. কি খবর ? বলুন, বলুন।

দীপঙ্কর বললে, আঃ, আমার বড়ো ঘুম পাচ্ছে।

প্রফেসর কুণ্ডু বললেন, বলুন ডাক্তার স্বামীনাথন, কিসের খবর।

স্বামীনাথন ভাঙা গলায় প্রায় কান্নার স্বরে বললেন, লেপ্রসির ভ্যাকসিন।

ঐ কান্নার কণ্ঠস্বর কি আবেগের ? আনন্দের ?

ঘরভর্তি লোক উল্লাস প্রকাশ করল।—হ্যাপি নিউজ।

বঙ্কিমবাবু বললেন, আমি জানতাম। হবেই।

স্বামীনাথনকে কেমন বিচলিত দেখাল। কিংবা বিব্রত।

বললেন, এটা লন্ডনের মাইক্রোবায়োলজির জার্নাল। হাতের জার্নালটা দেখালেন।

বললেন, জার্নালটা জানিয়েছে শেষ পর্যন্ত লেপ্রসির ভ্যাকসিন পাওয়া গেছে।

কৌতূহলে স্তব্ধ হয়ে সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইল। সকলের চোখ থেকে আগ্রহ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। শুনতে চায় ওরা, জানতে চায়। কি বলেছে ঐ জার্নাল ? যেন দীপঙ্কর রায়ের বিচার নয়, ক্ষমতায় অন্ধ ঈর্ষার, স্বার্থের, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এখনই একটা ভার্ডিক্ট শুনতে পাবে।

ওরা সকলেই স্বামীনাথনের মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করল। ডাক্তার স্বামীনাথন নন, যেন একজন বিচারক তাঁর উঁচু আসনে বসে আছেন। অনেক সওয়াল জবাব হয়ে গেছে। অনেক সাক্ষীসাবুদ ডাকা হয়েছে। আর্গুমেন্ট শেষ হয়ে গেছে। বিচারক রায় লিখে এনেছেন। আজই এখনই পড়ে শোনাবেন তাঁর ভার্ডিক্ট।

দীপঙ্কর আর দাঁড়াতে পারছিল না। একটা চেয়ারে বসে পড়ল, ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে দিল। তারপর বিষণ্ণ গলায় বললে, স্বামীনাথন, ফর গডস সেক, তুমি চুপ কর। আমার বড়ো ঘুম পাচ্ছে। জানো, আমার মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল আমি ঘুমোইনি। আমাকে সেই ঘুমের মত শান্তির মধ্যে চলে যেতে দাও।

স্বামীনাথন বললেন, কিন্তু ডক্টর রয়, আপনাকে যে শুনতেই হবে। সকলকেই শুনতে হবে।

প্রফেসর কুণ্ডু উঠে দাঁড়িয়ে আবেগে থরথর করে কাঁপছেন।—আমরা শুনছি, বলুন আপনি, বলুন।

বঙ্কিমবাবু বললেন, আমি জানতাম। এই দিনটির জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম। আমার কি যে গর্ব হচ্ছে।

স্বামীনাথন বিরক্তির স্বরে বললেন, এক্সকিউজ মি, আপনারা বড়ো ডিসটার্ব করছেন। একটু চুপ করুন, একটু চুপ করুন।

দীপঙ্করের চোখ জড়িয়ে আসছে তখন ঘুমে। অনুরোধের গলায় বলে উঠল, প্লিজ স্বামীনাথন প্লিজ। আমার ওসব শোনার আর কোন আগ্রহ নেই। আই ওয়ান্ট টু স্লিপ।

স্বামীনাথন বললেন, জার্নাল বলছে, ডক্টর আলটম্যানের এক্লোন ও একটা হরমোনকে মিডিয়া করে লেপ্রা ব্যাসিলি গ্রো করানো সম্ভব হওয়ার ফলে শেষ অবধি ইঁদুর বা বানরকেও লেপ্রসির হোস্ট করা সম্ভব হয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত লেপ্রসির ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে।

দীপঙ্কর আবার ঘুম জড়ানো চোখে বলে উঠল, আঃ, চুপ করো, চুপ করো।

প্রফেসর কুণ্ডু বলে উঠলেন, আমাদের বলুন ডাক্তার স্বামীনাথন। দীপঙ্করকে ঘুমোতে দিন, ও এক্সজস্টেড, ও ক্লান্ত।

স্বামীনাথন গাঢ় গলায় বললে, এই রিপোর্টে বলা হয়েছে লেপ্রসির প্রিলিমিনারি ইনফেকশন থেকে শরীরে রোগ সৃষ্টি হতে প্রচুর সময় লাগে। ন-মাসও হতে পারে ন-বছরও হতে পারে, সেজন্যেই এর ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা এতকাল ছিল প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার।

এবং এই ভ্যাকসিনের প্রতিরোধ ক্ষমতাও গড়ে উঠতে প্রচুর সময় লাগার কথা।

বঙ্কিমবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, ঠিক ঠিক। দীপঙ্করও আমাকে সে-কথাই বলেছিল। আমি জানি। ও বলেছিল, সেজন্যেই ভ্যাকসিনটা প্রেগনেন্সির আগে চাইলডের মাকে দিতে হবে। এর ফলে সেই বেবি জন্ম থেকেই প্রতিরোধ ক্ষমতা পাবে।

প্রফেসর কুণ্ডু বললেন, আমারও সেই রকমই মনে হয়েছিল। অর্থাৎ সেই লং পিরিয়ড অব ইনকিউবেশন প্রেগনেন্সির সময়ের মধ্যেই কনডেন্সড হয়ে যাচ্ছে। নাও ইট ইজ ক্লিয়ার। কেন কেবল মেয়েদের ভ্যাকসিনেট করাব কথা বলছিল দীপঙ্কর।

স্বামীনাথন বললেন, আরেকটা ব্যাপার হল এই ব্যাসিলিকে ফ্রিজ করে....

বঙ্কিমবাবু হেসে বললেন, সেই বুদ্ধিমান গাইনিরা যে পয়েন্ট-এ লোড শেডিংয়েব কথা তুলেছিলেন হে।

স্বামীনাথন বললেন, ইয়েস। লিকুইড নাইট্রোজেনে অথবা কার্বন ডাই-অক্সাইডে ওটাকে ফ্রিজ করে রাখা যায়, বহু বছব আগেই তা আবিষ্কৃত।

কিন্তু এই পণ্ডিতরা জানতেন না।

ঠিক এই সময়েই দীপঙ্কর বললে, প্লিজ স্বামীনাথন, হ্যাভ মার্সি অন মি। আমাকে একটু ঘুমোতেও দেবে না? আমাব ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

স্বামীনাথন বললেন, আমাকে শেষ করতে দিন। আর সামান্যই বাকি। যা এখানে কেউ বুঝতে পাবেনি, আমাকে বোঝাতে দিন। ঐ ড্রায়েড আপ ব্যাসিলিকে মিডিযা হিসেবে গোনাডোট্রপিন হরমোনে বেখে কালচাব কবাব ফলে ঐ ভ্যাকসিন এক বিশেষ ধবনেব বন্ধ্যা নারীকেও....

এই সময়েই দীপঙ্কর চিৎকার কবে উঠল, প্রায় কান্নাব স্বরে। বললে, তোমবা কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও? আমাকে ঘুমোতেও দেবে না?

স্বামীনাথন বললেন, ফ্রেন্ডস্, আপনাদেব অন্তত শোনা উচিত। এবং শেষ খববটাও। এই জার্নাল সপ্রশংস ভাবে অভিনন্দন জানিয়েছে এর আবিষ্কর্তাকে। আশা প্রকাশ কবেছে, পৃথিবীর আদিমতম যে বোগ হাজার হাজার বছব ধবে মানুষকে রোগযন্ত্রণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, রোগেব আক্রমণে তাকে এমনই বীভৎস কবে তুলেছে, যে স্ত্রী পরিত্যাগ কবেছে স্বামীকে, পুত্র পিতাকে, এবং সমগ্র সমাজ সেই পবিবারটিকে, এই ভ্যাকসিন হযতো একদিন সেই বোগ পৃথিবী থেকে নির্মূল করতে পাববে। যেভাবে প্লেগ এবং পক্স থেকে মানুষ মুক্তি পেয়েছে।

যেন একটা সার্মন পাঠ করলেন স্বামীনাথন। আবেগে কাঁপা গাঢ় কণ্ঠস্বরে যেন কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ঘব ভর্তি লোক উচ্ছ্বাসে চিৎকাব করে উঠল।

প্রফেসর কুণ্ডু বলে উঠলেন, দীপঙ্কব, শোনো, শোনো।

বঙ্কিমবাবু আনন্দে উল্লাসে বলে উঠলেন, আমি জানতাম, আমি জানতাম। বিজ্ঞানকে কেউ চাপা দিযে বাখতে পারে না।

কে একজন গিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন দীপঙ্করেব কাঁধ ধরে নাড়া দিল।---ডাক্তাব রায, শুনুন, শুনুন।

সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্কর ঘুমে জড়িযে আসা চোখ খুলে তাকাবাব চেষ্টা কবে প্রায় কান্নার গলায় বললে, আঃ আপনারা এত গোলমাল কবছেন কেন? আমাকে ঘুমোতে দেবেন না? আমি যে কতকাল ঘুমোইনি আপনারা জানেন না। প্লিজ, আমাকে শান্তির মধ্যে যেতে দিন।

বঙ্কিমবাবু আবেগে থবথর কবে কাঁপতে কাঁপতে দীপঙ্করের কাছে এগিয়ে গেলেন, দু

হাতের মুঠোর মধ্যে দীপঙ্করের একটা হাত ধরে ঈষৎ চাপ দিলেন, বললেন, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ। এতকাল ভাবতাম, একজন ব্যর্থ রিসার্চ-ওয়ার্কার আমি, আমার জীবনের কোনও জাস্টিফিকেশন নেই।

স্বামীনাথন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন। মাথা ঝুলে পড়ল। যেন ওদের দিকে তাকাতে পারছেন না।

কোনও রকমে চোখের সামনে জার্নালটা এনে বিড়বিড় করে বললেন, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ বেঙ্গলিজ। কেউ সকলের মধ্যে বিশেষ হয়ে উঠলে, ইফ হি ডাজ সামথিং এক্সেপশনালি গুড, আপনারা হয় শত্রুতা করেন কিংবা নির্বিকার থাকেন, যখন তার স্বীকৃতি আটকাতে পারেন না, তখন তাকে মাথায় তুলে নাচেন।

বলেই মুখ তুলে কঠিন চোখে সকলের দিকে তাকালেন। কঠিন গলায় বললেন, কিন্তু সব খবর আমি এখনও বলিনি। লিশ্‌ন্, এখনও কিছু বলার আছে।

সমস্বরে সকলেই বলে উঠল, কি, কি বলার আছে ? বলুন, বলুন।

সকলেই উদগ্রীব। যেন এর পরও প্রচণ্ড আনন্দের কোনও খবর আছে।

স্বামীনাথন সকলের মুখের ওপর দিয়ে তাঁর দৃষ্টিটা বুলিয়ে গেলেন, তারপর ভুরু কুঁচকে গম্ভীর গলায় বললেন, কোথায় ছিলেন আপনারা এতদিন ? কেন প্রতিবাদ করে ওঠেননি ? কেন ঐ ষড়যন্ত্রটাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করেননি। ইউ আর সো মেনি, অ্যান্ড দে আর সো ফিউ।

যেন সকলের মুখের ওপর একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিলেন স্বামীনাথন। কেউ কোনও কথা বলতে পারল না। চুপ করে রইল।

স্বামীনাথন বললেন, ওরা আপনাদের মনেও সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছিল। বলুন, সত্যি কিনা ?

কেউ কোনও উত্তর দিল না।

শুধু একজন কে ক্ষীণকণ্ঠে বললে, আরও কি খবর আছে বলছিলেন।

স্বামীনাথন বললেন, হ্যাঁ। সেটাই আসল খবর। ফ্রেন্ডস, আমি, আমি --

গলার স্বর গাঢ় হয়ে এল, কিছু বলতে পারছেন না স্বামীনাথন, কথা আটকে আসছে, হু হু করে কেঁদে উঠলেন। দু চোখ বেয়ে জল।

কোনওরকমে বললেন, আপনারা পড়ে নিন। বলে জার্নালটা এগিয়ে দিলেন।

প্রফেসর কুণ্ডু, বঙ্কিমবাবু, আরও অনেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। স্বামীনাথন এভাবে কেঁদে উঠলেন কেন ?

বঙ্কিমবাবুর হাত থরথর করে কাঁপছে। জার্নালটা স্থির ভাবে ধরতে পারলেন না, লাল দাগ দেওয়া জায়গাটা এগিয়ে দিলেন।

প্রফেসর কুণ্ডু পড়তে শুরু করলেন : এই আবিষ্কার যাঁরা করেছেন, ম্যাসাচুসেটস মাইক্রোবায়োলজি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডক্টর প্রফেসর গ্রাহাম জ্যাস্ট্রো এবং ডক্টর অ্যালবার্টো বিসেলিনি, যাঁরা বারো বছর ধরে এই গবেষণায় রত ছিলেন, আমাদের অভিনন্দন তাঁদের দুজনকেই।

লাইনটা পড়েই চেয়ারের ওপর ধপ্ করে বসে পড়লেন প্রফেসর কুণ্ডু।

নিজেই অবাক হয়ে বললেন, সে কি ! এ কি খবর আনলেন ডাক্তার স্বামীনাথন ?

বঙ্কিমবাবু চিৎকার করে বলে উঠলেন, নো নো। কি বলছেন আপনি ? আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

স্বামীনাথনের জলে ভরা চোখ দুঃখের হাসি হাসল।—আমি সেজন্যেই এত তাড়াহুড়ো করছিলাম। আমি তো জানি, আবিষ্কার একটা রেস। সময় নষ্ট করার সময় নেই সেখানে।

স্বামীনাথন হাত বাড়িয়ে জার্নালটা চাইলেন। বললেন, দাঁড়ান দাঁড়ান, আরও একটা খবর আছে। এই দেখুন·····

জার্নালেব একটা অংশ দেখালেন।

এখন আর কারও কোনও আগ্রহ নেই। কেউ জানতে চাইল না, এর পরেও আর কি আছে।

স্বামীনাথন বললেন, ইন্ডিয়া সম্পর্কেও একটা খবব আছে। জার্নালটি জানাচ্ছে, লেপ্রসিব ভ্যাকসিন আবিষ্কাবের একটা ক্লেম কয়েক মাস আগে ইন্ডিয়া থেকেও হয়েছিল। কিন্তু তাদের সায়েন্টিস্ট এবং ফিজিসিয়ানস্‌রা বলেছে সেটা ফেক।

প্রফেসর কুণ্ডুর বুক ঠেলে একটা শব্দ বেবিয়ে এল, উঃ। বুকের ওপব হাত বোলালেন। একটা দুর্বোধ্য কষ্ট।

বঙ্কিমবাবু চুপচাপ বসে আছেন, চোখের পাতা নড়ছে না।

অন্য সবারই মাথা ঝুলে পড়েছে। যেন নিকটতম আত্মীয়ের শোকবার্তা শুনেছে এখনই।

স্বামীনাথন এতক্ষণে দীপঙ্করেব দিকে তাকালেন। দেখলেন দীপঙ্কর চেয়াবে শরীর এলিয়ে গাঢ় ঘুমে অচৈতন্য।

ওরা আব দীপঙ্করের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করল না।

স্বামীনাথন শুধু বললেন, আমি ওঁকেই শোনাতে চেয়েছিলাম। আফটাব অল ওঁব ক্লেমটা যে ফেক নয়, জালিযাতি নয়, তাব প্রমাণ তো পাওয়া গেল।

একটু থেমে বললেন, আপনারা ডক্টব বায়কে চেনেন না। লেপ্রসিব একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কাব হয়েছে এটাই ওঁব কাছে বড কথা। খ্যাতি নয়।

হাসবাব চেষ্টা করে বললেন, ক্ষতি আসলে আমাদেরই হল। হেবে গেলাম আমবাই, উই ইন্ডিয়ানস।

প্রফেসব কুণ্ডু ধীবে ধীবে বললেন, কোটি কোটি টাকা খবচ করে আমরা বিসার্চ ইনস্টিটিউট কবব, কিন্তু সেদিনও আবিষ্কাবককে আমবা গলা টিপেই মাবব।

একে একে সকলেই উঠে পড়ল। নিঃশব্দে বেবিয়ে এল ঘব থেকে। দীপঙ্কব ঘুমোচ্ছে ঘুমোক।

দল বেঁধে ওবা হেঁটে চলল, কেউ কোনও কথা বলল না। যেন কাবও কিছু বলার নেই।

শুধু বঙ্কিমবাবু অনেকখানি চুপচাপ হেঁটে এসে হঠাৎ কেন যেন ফিরে তাকালেন। দেখলেন, দবজাব সামনে স্থাণুব মত দাঁড়িয়ে আছে সীমা। ওঁদেব দিকে তাকিয়ে আছে। পাষাণের মূর্তি যেন। দুটো চোখও যেন পাথবের।

রূপ

১

এর নাম উষা।

ধূর্জটিপ্রসাদ প্রতিবারই এই হোটেলে এসে ওঠেন। দোতলার এই ঘবখানা ওঁর সবচেয়ে প্রিয়। যে বছর এই ঘরখানা পান না, কেউ আগে থেকে এসে দখল করে বসে থাকে, সে বছর ওঁর এই বেড়াতে আসার আনন্দ কিছুটা অপূর্ণ থেকে যায়। কারণ এই ঘরখানার সামনেই বেশ বড়-সড় একটা ব্যালকনি আছে। অবশ্য এই ছাদ-বারান্দাকে ঠিক ব্যালকনি বলা যায় না। ব্যালকনি শব্দটার এক ধরনের আভিজাত্য আছে, যা এই হোটেলের গায়ে কোথাও লেগে নেই। সামনের এই ছাদ-বারান্দাও একেবারে সাদামাটা। বোদে পোড়া জলে ভেজা একটা ভাঙা তক্তপোশ পড়ে আছে একদিকে, বাকি অংশেরও কোথাও কোনও শ্রী-ছাঁদ নেই।

ধূর্জটিপ্রসাদের তাতে কিছু যায় আসে না।

ওঁর ঘরের জানালা বন্ধ কবলেও সাবা রাত গর্জন শোনা যায়। জানালা খুললেই সমুদ্র-সমুদ্র! তবু ঘুম ভাঙলেই উনি বেতের চেয়াবটা টেনে নিয়ে এসে একেবারে ব্যালকনিব আলসে ঘেঁসে বসেন। চেয়ারেব পিঠস্থানটা বেশ হেলানো, আবাম করে বসা যায়। বেশ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকা যায়।

এই সমুদ্র ব্যাপাবটা বড়ো বহস্যময়। এমন এক বিশাল সৌন্দর্য এব, যারা প্রথম দেখে তাবা রীতিমত ভালবেসে ফেলে। একটু আলাপ-পরিচয় হয়ে গেলেই এর এমন এক আকর্ষণ যে কাছে এগিয়ে না গিয়ে নিস্তাব নেই। দূব থেকে দেখে তৃপ্তি হয না। অথচ যতই এগিয়ে যাও সমুদ্র সেই দূরেই থেকে যায়। কিন্তু কারও কারও জীবনে সমুদ্র বড়ো ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দেয়।

ধূর্জটিপ্রসাদ মনে মনে ভাবলেন, আমি নিজেও কি তাই? জীবনে কত মানুষ তো আমার কাছে এল। আমিও তো এগিয়ে যেতে চেয়েছি। কিন্তু দূবত্ব বুঝি বযেই গেল। আমাব ভিতবের চেহারাটা কেউ কোনওদিন দেখতে পেল না। আমার বাইরেব চেহারাটাই সত্যি বলে ভেবে নিল। এমন কি লাহিড়ীও।

মনে মনে বললেন, সেজন্যেই তো একটু একটু করে আমি দূবে সরে গিয়েছিলাম।

ঘর থেকে বেবিয়ে এসে আলসের গা ঘেঁসে বসলেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

তখনও অন্ধকাব কাটেনি। শুধু পুব-সমুদ্রেব এক কোণে কয়েকটা আলোর বর্শা ঠিকরে পড়ছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ মনে মনে বললেন, এব নাম উষা। 'ডাকযে পাখি না ছাড়ে বাসা'। না, ধারে কাছে একটাও পাখি দেখতে পেলেন না। 'ওড়ে পাখি খায না'। পব পব লাইনগুলো মনে পড়ল না। কিন্তু খনা কে ছিল? কোনও গ্রাম্য মেয়ে! চোখেব সামনে যেন একটা বাচ্চা মেয়ের ছবি ফুটে উঠল।

ধূর্জটিপ্রসাদ মনে মনে ভাবলেন, অঙ্গিবাব পুত্র কুৎস ঋষিও কি এই উষাকেই দেখেছিলেন 'নিত্যযৌবনা শুভ্রবসনা আকাশদুহিতা'! ত্রিষ্টুপ ছন্দেব সেই উষাকেই আমি দেখছি। উশিজ ও দীর্ঘতমাব পুত্র কাক্ষীবান দেখেছেন কৃষ্ণবর্ণজাত এই স্বতোদীপ্তা শ্বেতবর্ণাকে। মৃদুহাস যুবতীর অনাবৃত বক্ষোদেশেব মত এই উষাকে। সেই ধ্বনিময় ছান্দস সূক্তগুলি উচ্চারণ করে উঠতে ইচ্ছে হল ধূর্জটিপ্রসাদের। কিন্তু না, মনে পড়ছে না।

আজ ওঁর মন বড়ো বিক্ষিপ্ত।

ঠিকরে পড়া বর্শাগুলো চোখের সামনেই একটু একটু করে অদৃশ্য হয়ে গেল। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এখন ঝকঝকে রুপো রঙের আলো।

আলো ফুটে উঠেছে, সমুদ্রের উপর ছড়িয়ে থাকা নুলিয়াদের নৌকোগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

'নারীকে অনুসরণ করে পুরুষ, উষাকে সূর্য।' অঙ্গিরা-পুত্র ঋষি কুৎসর সময়েও তাহলে এই একই রীতি। পাশের হোটেলের সেই মেয়েটির কথা মনে পড়তেই ধূর্জটিপ্রসাদ কেমন বিষণ্ণ বোধ করলেন। খবরটা শোনার পর থেকেই এই তিক্ত বিষণ্ণতা। এবং কৌতূহল। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন এক রহস্যের মত মনে হচ্ছে।

এতকাল ধরে আসছেন এখানে, এতবার এসেছেন, কিন্তু কখনও এমন একটা ঘটনা ঘটেছে বলে মনে পড়ল না।

দূর সমুদ্রের এখানে ওখানে কয়েকটা নৌকো যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঝাপসা ঝাপসা পাল তোলা নৌকোগুলো দেখা যাচ্ছে। আলো ফুটছে। অনেক দূরে ছায়া ছায়া কয়েকজন নুলিয়ার ভঙ্গি দেখে বুঝলেন সমুদ্রের জল থেকে একটা দড়ি টেনে আনছে।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল কয়েকটা রঙের বিন্দু তীর ধরে এগিয়ে আসছে। অনুমান করলেন কয়েকটি মেয়ে এই ভোর সকালে ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে আসছে। ঐ উষার দিক থেকে।

মনে মনে হাসলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। ক্ষমার ভঙ্গিতে যেন বললেন, ওদের কি দোষ, সারা পৃথিবীই তো এই। এমন অপরূপ উষার দিকে না তাকিয়ে সবাই ঝিনুক কুড়োয়।

রঙের বিন্দুগুলো ক্রমশই এগিয়ে আসছে।

প্রতিবারই এখানে একা-একা আসেন। এবারও তাই এসেছেন। হঠাৎ সি-বিচেই লাহিড়ীর সঙ্গে দেখা। সপরিবারে এসে উঠেছে স্বর্গদ্বারের কাছে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে।

লাহিড়ী বলেছে, আমরা থাকতে তুমি হোটেলে থাকবে তা হয় না ধূর্জটি।

ধূর্জটিপ্রসাদ রাজি হননি। ওঁর এই একা-একাই ভাল লাগে। অথচ নিঃসঙ্গ থাকতে চান না। যেচে আলাপ করেন সকলের সঙ্গে, গল্পগুজব করেন, কেউ কেউ বন্ধু হয়ে যায়। কিন্তু ফিরে গিয়েই সকলকে ভুলে যান।

রঙের বিন্দুগুলো ক্রমশ পুতুলের মত হয়ে উঠছে, কাছে এগিয়ে আসছে। হয়তো লাহিড়ীর মেয়েরা। ওরাও ঝিনুক কুড়োতে বেরোয়। মাঝে মাঝে দেখা হয়। তনুশ্রীর দিকে তাকিয়ে এক একদিন অন্যমনস্ক হয়ে যান।

পূব-আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। উষা ইতিমধ্যে কখন ছুটে পালিয়েছে। শুভ্রবর্ণা সুন্দরী মেয়ের কপালে ডগডগে লাল বড় একটা সিঁদুরের টিপ হয়ে গেছে সূর্য।

করবী মেয়েটিও তার ফর্সা আর চওড়া কপালে বেশ বড় একটা সিঁদুরের টিপ পরত।

সি-বিচে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছেন যেখানেই ছোট ছোট জটলা, সেখানেই ঐ এক আলোচনা। যার সঙ্গেই দেখা হয়েছে এক প্রশ্ন। কিছু জানেন কিনা, কিছু শুনেছেন কিনা। না, ধূর্জটিপ্রসাদ কিছুই জানেন না। তাছাড়া ওঁর যে এতদিন ধারণা ছিল উনি মানুষ চেনেন, যে-কোন মানুষের মুখ দেখে, তার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারেন লোকটা কেমন, সেই ধারণাটা ওঁর একেবারে ভেঙে গেছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ সকলের থেকে নিজেকে দূরে দূরে রাখতে চান, তবু কেমন করে যেন এক একজনকে তাঁর ভাল লেগে যায়। আর সেই ভাল লেগে যাওয়া মানুষগুলোর জন্যে কখনও কখনও কষ্ট পান।

নিখিলেশ আর করবীকে ওঁর ভাল লেগেছিল।

আলাপের পর নাম জিগ্যেস করতেই স্বামীর দিকে তাকিয়ে সলজ্জভাবে মেয়েটি

বলেছিল, করবী।

আর ওর কপালের ডগডগে সিঁদুরের টিপ দেখে ধূর্জটিপ্রসাদ হেসে বলেছিলেন, দেখে তো মনে হয় রক্তকরবী।

ওর স্বামী নিখিলেশ খুব হেসে উঠেছিল।

এখন নিখিলেশের মুখের দিকে তাকাতে ওঁর কষ্ট হয়, আর নিখিলেশ কারও মুখের দিকে তাকাতেই পারে না।

—আপনার চা।

হোটেলের ঠাকুরচাকরদের দু-এক টুকরো কথা, বাসন-কোসনের আওয়াজ ভেসে আসছিল অনেকক্ষণ থেকে। কাপে-চামচে টিং টিং শব্দও শুনেছিলেন।

হোটেলের ভৃত্যটির দিকে ফিরে তাকিয়ে নিঃশব্দে চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে আলসের ওপর রাখলেন।

চায়ের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। এবার বেড়াতে বেরোবেন। সি-বিচে দু-চারজন করে লোক দেখা যাচ্ছে। পাল তোলা নৌকোগুলো বোধ হয় পাল নামিয়ে নিয়েছে, কিংবা দূরে কোথাও সরে গেছে।

সেই রঙের বিন্দুর দলটা রঙিন পুতুল হয়ে এখন একেবারে স্পষ্ট। জনা তিনেক মা-মেয়ে একটু করে হাঁটছে, ঢেউভাঙা জলের দিকে ছুটে গিয়ে পা ভিজিয়ে আসছে, শাড়ি ঈষৎ তুলে ধরে আছে এক হাতে, আর মাঝে মাঝে নুয়ে পড়ে ঝিনুক কুড়োচ্ছে। না, লাহিড়ীর মেয়েরা নয়।

ধূর্জটিপ্রসাদ দূরে মেয়ের দলটিকে ঝিনুক কুড়োতে দেখে মনে মনে বললেন, দিস ইজ ইয়ুথ। মেঝেতে পয়সা পড়ে গেলে কুড়োতে কষ্ট হয় আমার।

পিছিয়ে পড়া ভদ্রলোককে দেখতে পেলেন, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছেন।

এখন ওঁর বুকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট তনুশ্রীর জন্যেই।

চাটুকু শেষ করে খালি পায়েই নেমে এলেন। এখন রোদ্দুরের কোনও তাপ নেই, বালি গরম হতে অনেক দেরি, এখন বালির ওপর খালি পায়ে হাঁটতে বেশ আরাম লাগে।

হোটেলের ম্যানেজার ত্রিদিববাবু জিগ্যেস করলেন, চা দিয়েছে তো?

ধূর্জটিপ্রসাদ মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ।

ত্রিদিববাবু ওঁকে একটু বেশি খাতির করেন। কারণ হোটেলটা ক্রমশই পড়ে যাচ্ছে, বোর্ডার আসে না আগের মত, তবু এই একজন প্রতিবার এই হোটেলেই এসে ওঠেন। দোতলার ঐ ঘরখানা চেয়ে বসেন।

মালিকের বিরুদ্ধে ত্রিদিববাবুর অনেক অভিযোগ। তাই একদিন বলে বসেছিলেন, এত ভাল ভাল হোটেল থাকতে আপনি স্যার এই হোটেলটাই কেন পছন্দ করেন বলুন তো?

ধূর্জটিপ্রসাদ শুধু হেসেছিলেন।

হোটেলের সামনের রাস্তা পার হলেই বালি, তারপর খানিকটা এগোলেই সারারাত ঢেউ আছড়ে পড়ার ভিজে ভিজে জলের দাগ। এখনও দু-একটা ঢেউ হঠাৎ হঠাৎ অনেকখানি এগিয়ে আসছে, আর ছুটে পালিয়ে আসতে না পেরে মেয়েরা হাসাহাসি করছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ জল থেকে একটু দূরত্ব রেখে হাঁটতে শুরু করলেন।

দুটি চারটি দুটি চারটি করে লোক বাড়ছে।

হাতে একটা মোষের শিঙের বাঁটওয়ালা ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওঁকে পার হয়ে হনহন করে হেঁটে গেলেন। এর আগেও দু দিন দেখেছেন, আলাপ হয়নি। লোকটি বোধ হয় খুব দাম্ভিক! কিসের দম্ভ তা অবশ্য বোঝা যায় না। যারা এখানে ফার্স্ট

ক্লাশে আসে, কিন্তু গুড়েব ব্যবসা করে, তাদের একরকম দম্ভ, যাবা বড অফিসার-টফিসার ছিল কিন্তু বিটায়ার করার পর লুকিয়ে নিচু ক্লাশে আসে তাদের আরেকরকম। অধিকাংশ লোকের আবার দারিদ্র্যই একটা দম্ভ।

লাহিড়ীব আব সব ভাল, কিন্তু ওব মধ্যেও একটা চাপা গর্ব আছে, ও খুব মডার্ন। মেয়েদের প্রচুব স্বাধীনতা দিয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদের সেজন্যেই মাঝে মাঝে বড়ো ভয়-ভয় কবত। বিশেষ কবে তনুশ্রীব জন্যে। কিন্তু এখন তার জন্যে শুধু চাপা কষ্ট।

নিখিলেশকে এখন কি বলে সান্ত্বনা দেবেন তাও খুঁজে পান না।

কে যেন বলে উঠেছিল, নিখিলেশবাবুকেই বা অত ভাল ভাবছেন কেন ? আমাব তো ওঁকেই সন্দেহ। সব বানিয়ে বলছেন, হয়তো ··

সবাই হেসে উঠেছিল তাব কথায়।

গতকাল সি-বিচে দাঁড়িয়ে দাঁডিয়ে গল্প হচ্ছিল। আর তখনই ঐ বুড়ো ভদ্রলোক মোষেব শিঙেব ছড়ি হাতে হনহন কবে হেঁটে গেলেন।

অবাক হওযাব ভঙ্গিতে ওঁব দিকে তাকিযে অরুণেন্দু অস্ফুটে বলেছিল, ভদ্রলোক কে বলুন তো '

ধূর্জটিপ্রসাদের নিজেবও জানতে ইচ্ছে হযেছে। তবু কি একটা সঙ্কোচে আলাপ কবেননি। দিব্যি ছিপছিপে লম্বা চেহাবা, কাগজের মত ফর্সা বঙ, আব মাথায ঝকঝকে সাদা চুল, বোঝা যায় ঘন ছিল, বয়সে বার্ধক্যে একটু ফিকে হয়ে এসেছে।

ভদ্রলোক অনেকখানি এগিযে গেছেন, ধূর্জটিপ্রসাদ দাঁডিয়ে দেখলেন তাঁকে। ঐ দীর্ঘ শবীব, বয়স সত্তরেব কম নয, কিন্তু একেবারে খাড়া হযে হেঁটে চলেছেন। ধোপদুবস্ত আদ্দিব পাঞ্জাবি, আধ-ইঞ্চি রঙিন পাড় ধুতি, হাওয়ায উড়ছে। হাতেব ছড়িটা ভব দেওয়ার জন্যে নয, সম্ভবত ছডি উঁচিযে কথা বলাব জন্যে। ওঁব হাঁটাচলা যেন যৌবনেব বিজ্ঞাপন। কিংবা ব্যক্তিত্বের। টিকিট চেকার এদেব কাছে টিকিট চায না, এরা থানায গেলে ও-সি চেযাব ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। এবা কে এবং কি, তা কেউ জানতে চায না। শুধু জানে এদের খাতির কবতে হয়।

ঐ চেহাবার মধ্যে কিছু একটা আকর্ষণ আছেই, তা না হলে ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে হবে কেন ! আব ইচ্ছে হওযা সত্ত্বেও এত বাধো বাধো ঠেকবে কেন। অথচ অচেনা লোকের সঙ্গে আলাপ কবায ওঁব কোনও সঙ্কোচ নেই।

ধূর্জটিপ্রসাদ আবাব ধীবে ধীবে হাঁটতে শুরু করলেন। নুলিযাদেব জটলা পাব হযে মোটা মোটা দডিগুলো ডিঙিযে এসে থেমে দাঁড়ালেন একবাব।

—এই যে, নমস্কাব।

উনি একটু অন্যমনস্ক ছিলেন বলেই লক্ষ কবেননি। অরুণেন্দু একেবাবে সামনে এসে হাসিমুখে হাত জোড কবে নমস্কাব জানাল।

আঁটসাঁট প্যান্ট পবা অরুণেন্দুর নমস্কার করার ভঙ্গিটা খুব মজার। হাতের কনুই দুটো যথাসম্ভব দূবে সরে যায়, আর আঙুলেব ডগায় আঙুল ঠেকিয়ে ও যখন নমস্কাব করে, মনে হয যেন দু হাতে একটা পিবামিড বানাচ্ছে।

অরুণেন্দুব স্ত্রী আর শ্যালিকাও ততক্ষণে ঝিনুক খোঁজা স্থগিত বেখে হাসি হাসি মুখে কাছে এগিযে এসেছে।

মালার দিকে ফিরে তাকাতেই দেখলেন অরুণেন্দুর নমস্কারের ভঙ্গিটা ক্যারিকেচার করে দেখিযে মালা বলছে, দিদি দ্যাখ, জাঁইবাবু কেমন ভরতনাট্যমেব পোজে নমস্কার করে !

ধূর্জটিপ্রসাদ আগেও দেখেছেন মেয়েটা খুব ফাজিল। কিংবা দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে বেড়াতে এসে এই পরিবেশে ফাজলামি বেড়ে গেছে। এখানে এলেই সবাই কেমন যেন

বদলে যায়। এই যে অরুণেন্দু, ওর স্বভাবে নমস্কার-টমস্কারের বালাই নেই, বাইরে বেড়াতে এসেছে বলেই শিখে নিয়েছে।

অরুণেন্দু মালার ঠাট্টা শুনে একটু অপ্রতিভ হয়েছিল, এবার স্মার্ট হবার চেষ্টা করে বললে, সকাল থেকে মালারানী ঝিনুক কুড়িয়ে কুড়িয়ে থলি ভরে ফেলেছে, তা দেখেছেন ? বলে হাসল।

মালা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আমি রানী-টানি নই, শুধু মালা।

ধূর্জটিপ্রসাদ হেসে ফেললেন। আর অরুণেন্দু হাসতে হাসতেই বললে, সমুদ্রের পাড়ে শুধু উপলখণ্ড কুড়িয়ে যখন নিউটন হওয়া যায়, মালা বোধ হয় ঝিনুক কুড়িয়ে আইনস্টাইন হবে।

কথাটা ও মালার কাছেই শুনেছে, নিউটন বলেছিলেন, সমুদ্রেব পাড়ে শুধু উপলখণ্ড কুড়িয়েছি।

অরুণেন্দু নিজেই হো হো করে হেসে উঠল, কাবণ মালা ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পডছে। তাই ও একটু লজ্জা লজ্জা মুখ করল।

আব তখনই অরুণেন্দু প্রশ্ন করে বসল, নিখিলেশবাবুব খবব কিছু পেলেন ?

এ কদিন যার সঙ্গে দেখা হয়েছে তার মুখেই এই এক প্রশ্ন। এক আলোচনা। এই প্রসঙ্গ উঠবে বলেই আশঙ্কা করছিলেন ভিতরে ভিতবে।

বিরক্তি চাপা দিয়ে শুধু ধীরে ধীবে মাথা নাড়লেন।

এই আলোচনা মালার একটুও ভাল লাগে না। কববীদিকে ওব ভীষণ ভাল লেগেছিল। তার গায়ে একটুও কাদার ছিটে লাগলে ওর এখনো কষ্ট হয।

সেজন্যেই বোধ হয ও কথা পাল্টাতে চাইল। হঠাৎ নুলিযাদের নৌকোটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, আচ্ছা এই ছোট ছোট নৌকো কতদূব যেতে পারে ? গভীর সমুদ্রে যায় ?

সঙ্গে সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁব প্রিয় প্রসঙ্গ পেয়ে গেলেন।—কোথায যেতে পাবে ? সারা পৃথিবী।

অবাক হয়ে তাকাল মালা ওঁব মুখের দিকে।

ধূর্জটিপ্রসাদ মনেব মত শ্রোতা পেয়েছেন ভেবে খুশি হযে উঠলেন। বললেন, জানো মালা, সকলে ভাবে সভ্যতার প্রথম আবিষ্কার গাড়িব চাকা, কিংবা ঘোড়াকে পোষ মানানো। কিন্তু তারও অনেক আগে মানুষ ডিঙি নৌকোয ভেসে বেড়িয়েছে, চতুর্দিকে ছড়িযে পড়েছে। প্যাসিফিকের ছোট ছোট দ্বীপে গিয়ে পৌঁছেছে, আবও কত জাযগায।

ধূর্জটিপ্রসাদ লক্ষ করলেন না মালা আর মালার দিদি ততক্ষণে চোখে চোখে একটা ইশারা করে নিয়েছে, হাসি চেপেছে। অর্থাৎ এই শুরু হল। ধূর্জটিপ্রসাদ লোকটিকে ওরা পছন্দই করে, কিন্তু আড়ালে নাম দিয়েছে জ্ঞানবাবু। দেখেছে কোনও একটা প্রসঙ্গ পেলে উনি আর থামতে চান না। এক একদিন ওদেব খুশি খুশি মেজাজটাই নষ্ট করে দেন।

ওদেব চোখে চোখে হাসি খেলে যাওয়া লক্ষ কবলেন না উনি। লেকচার দেওযার ভঙ্গিতে বলতে শুরু করেছেন, জানেন অরুণেন্দুবাবু, সভ্যতাব খোঁজে আমরা শুধু মিশবেব দিকে তাকাই, মেসোপোটেমিয়ার দিকে, সিন্ধু বা সরস্বতীর দিকে। কিন্তু পলিনেশিয়া থেকে পেরু পর্যন্ত নাবিক সভ্যতার কথা মনে রাখি না। কাবণ কি জানেন ?

অরুণেন্দু অন্যমনস্ক ভাবে শুনছিল, কিংবা পরিত্রাণ পাবার উপায ভাবছিল। অন্যমনস্ক ভাবেই বললে, একদিন আপনার সঙ্গে বসে শুনতে হবে, সত্যি কত কি জানবার আছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ থামলেন না। বললেন, কেন জানেন ? ঘোড়া ব্যাটারও একটা ইমেজ তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ, জীবজন্তু, সভ্যতা সব কিছুরই দুটো চেহারা আছে। একটা ইমেজ,

আরেকটা ট্রুথ। লোকে ইমেজটাকেই বিশ্বাস করে। কালপ্যাঁচার মুখ দেখে মনে হবে না সে-ও কাউকে ভয় পায়। কিন্তু ভয় তো পায়।

কালপ্যাঁচার কথায় ওরা সবাই হেসে উঠল, যেন একটা হাসির কথাই বলেছেন।

অরুণেন্দুর স্ত্রী শুধু বললে, মুখ দেখে সত্যি কাউকে বোঝা যায় না।

ধূর্জটিপ্রসাদ তার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝতে চাইলেন। তারপর চুপ করে গেলেন। কাদের কাছে এ-সব কথা বলছেন উনি। 'মুখ দেখে সত্যি কাউকে বোঝা যায় না।' নিখিলেশ আর করবীর কথাই বোধ হয় ভাবছে ওবা।

উনি থেমে যেতেই অরুণেন্দু আবার বললে, সত্যি কত কি জানার আছে, একদিন বসতে হবে আপনার সঙ্গে।

বলে আবার দু হাতে সেই পিরামিড বানিয়ে নমস্কার করল।—আজ আসি, একবার মন্দিরের দিকে যেতে হবে।

ধূর্জটিপ্রসাদেব কানেও গেল না কথাগুলো। উনি তখন কি এক গভীর চিন্তাব মধ্যে যেন ডুবে গেছেন। বালিব ওপব দিযে খালি পাযে হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনে মনেই বললেন, ট্রুথ কেউ জানতে চায় না, শুধু ইমেজ নিয়েই সন্তুষ্ট।

২

বিয়ের পব পরই আপিসের বন্ধুরা বলেছিল, যাও নিখিলেশ, নতুন বউকে নিয়ে দিনকয়েক কোথাও ঘুবে এস।

ইচ্ছে আমাবও যে ছিল না, তা নয়। ছেলেবেলা থেকেই অনেকগুলো স্বপ্ন দেখে রেখেছিলাম, মনের মধ্যে সেগুলো খোপে খোপে সাজানোও ছিল। কিন্তু কোনওটাই বাস্তবের সঙ্গে মেলেনি। মানুষ কোথাও সমাজেব ওপর নির্ভরশীল, কোথাও নিজের ওপর। আমরা অদৃষ্টেব ওপব। একটা মানুষ হঠাৎ মাবা গেলেই সব ওলোট-পালোট হয়ে যায়। বাবা মারা গেল আমার পড়াশুনো শেষ হবার আগেই। মা গঙ্গার ঘাটে শাঁখা ভেঙে সিঁথির সিঁদুর তুলে ফিরে আসার পব থেকে ঐ সাদা রিক্ত চেহাবাকেই আমি মা বলে জেনে এসেছি। তার আগে যে মার এক অন্য চেহারা ছিল তা আর মনেও পড়ে না। বাবা মাবা যাওয়ায় আমার কষ্ট হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মাকে ঐ বৈধব্যের চেহারায় দেখে আমি বাচ্চা ছেলের মত ডুকরে কেঁদে উঠেছিলাম। মা কিন্তু থমথমে মুখে সংসারের হাল ধবেছিল। আমার এবং আমার দু-দুটি ছোট বোনের। আমাদের পডাশুনোব।

অনেক ঘোরাঘুরির পর একজনের চেষ্টায় একটা চাকরি জুটে গেল। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম বাবা মারা না গেলে চাকবি পেতাম না। মার ঐ বৈধব্যেব বেশ না দেখলে ভদ্রলোকের দয়া হত না। এদিক থেকে আমি ভাগ্যবান। কত সংসার তো এমন অবস্থায় ছন্নছাড়া হয়ে যায়।

মা আর বোনদের ওপর আমার ভীষণ টান ছিল। ওরা ছাড়া আমার আর কেউ তো ছিল না তখন।

বছর দুই পরেই মা একদিন বললে, হানু, তুই এবার বিয়ে কর।

আমার খুব একটা অনিচ্ছা ছিল না।

করবীকে বিয়ে করে আনলাম। বিয়ের পর ওকে কাছে পেয়ে একটা মাস তো প্রায় নেশার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। সে সময় ও যে কখন কি বলেছে, কি করেছে, এখন আর কিচ্ছু মনে নেই। এমন এক ভাল লাগার বন্যার মধ্যে ও আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে যে সেই দিনগুলো শুধু অস্পষ্ট স্মৃতি হয়ে আছে।

শুধু মনে আছে সেই সময় আপিসের বন্ধুরা বলেছিল, যাও নিখিলেশ, নতুন বউকে নিয়ে

দিনকয়েক কোথাও ঘুরে এস।

আমার মাথাতেও ঐ চিন্তা যে ছিল না তা নয়।

আমি করবীকে বলেও ফেলেছিলাম। বলেছিলাম, তোমাব জন্যে একটা সারপ্রাইজ ঠিক করে রেখেছি।

ও অবাক হয়ে সপ্রশ্ন চোখে বললে, কি বলো না।

বললাম, দিনকয়েক ছুটি নিয়ে পুবী কিংবা দার্জিলিং বেড়িয়ে আসব, শুধু তুমি আব আমি।

ও চোখ গোল গোল করে বললে, হানিমুন?

আমরা দুজনেই হেসে উঠেছিলাম।

তাবপর করবী লাজুক-লাজুক ভাবে বললে, মাকে বলেছ?

আমি সাহস দেখিয়ে উত্তর দিলাম, সে একদিন বললেই হবে। কিন্তু মনে মনে আমি চুপসে গেলাম। কথাটা মাব কাছে বলতে আমাব খুব সঙ্কোচ হত। যেন ঐ কথাটাব মধ্যে একটা চরম নির্লজ্জতা লুকিয়ে আছে।

করবীও বোধ হয় তখন মনে মনে অনেক কিছু স্বপ্ন দেখছিল। সংসাবটা গুছিয়ে সুন্দব করে তুলতে চাইছিল। আমিও বোধ হয় বাড়িটাকে কববীর যোগ্য কবে তুলতে চাইছিলাম।

একদিন ছেঁড়া পুরনো পাপোশটা বিদেয় কবে নতুন একটা পাপোশ কিনতেই ছোট বোন মাযা বললে, দাদাব সবতাতেই বাড়াবাড়ি, বেশ তো চলছিল!

আবেকদিন ঘরগুলো চুনকাম কবানোর কথা বলতেই মা বললে, ভাড়া বাড়িতে আবাব কে চুনকাম করায়।

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ওবা দূরে সবে যাচ্ছে। তাব জন্য আমাব কষ্টও হত, কাবণ আমি তখন একটা দোটানাব মধ্যে পড়ে গেছি। একদিকে ওদেব প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, অন্যদিকে করবী।

এই সব কাবণে আমাব মুগ্ধতা দিনে দিনে কেটে যাচ্ছিল।

মাসের মাইনেটা মার হাতে তুলে দিতে দিতে বাইরে বেড়াতে যাওযাব কথাটা বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু হাত পেতে মাইনেব টাকাটা নেওযাব সময মা হাসি হাসি মুখে বললে, তোর মাইনে-টাইনে আর বাড়বে না?

আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। বললাম, এ-সময তো আমাদেব মাইনে বাড়ে না, মা। তাবপর অবাক হয়ে বললাম, কেন বলো তো।

মা এড়িয়ে গেল। বললে, না, এমনি বলছি।

কিন্তু আমার তখন আর বুঝতে বাকি নেই। মার ওপব আমাব অভিমান হল। হযতো রাগও। সংসারে একটা মাত্র লোক বেড়েছে বলে মা পাকেপ্রকাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে এই টাকায় সংসাব চলে না।

আর সেই মাসেই করবী একদিন বসিকতাব ঢঙে বললে, কি গো মশাই, দার্জিলিং না পুরী, কোথায় যাবার কথা বলেছিলে, ভুলে গেলে নাকি।

আমি হেসে বললাম, হবে হবে।

এইভাবেই সময় কেটে যাচ্ছিল। আমরা পরস্পরের কাছে বোধ হয একঘেযে হয়ে উঠছিলাম।

এরই ফাঁকে সুযোগ এসে গেল হঠাৎ। আপিসে পাওনা কযেক শো টাকা বহুদিন থেকে আটকে ছিল। খবর পেলাম, পাওযা যাবে।

আমি করবীকে সে-কথা বলতেই ও ফিসফিস করে বললে, এই, মাকে বোল না যেন, চলো ঐ টাকায় কোথাও বেড়িয়ে আসি।

আমার নিজেরও তাই ইচ্ছে ছিল। একঘেয়ে দৈন্যের জীবনে আমিও একটু বৈচিত্র্য আনতে চাইছিলাম। মার কাছে আমি টাকার কথাটা গোপন করলাম। কিন্তু যাওয়ার কথা তো বলতে হবে। তখন বললেই হবে আপিস থেকে খরচ পাওয়া যাবে।

মা বঁটি পেতে কুটনো কুটছিল, আমি কাছে গিয়ে বসে গল্প করতে করতে হঠাৎ বললাম, ভাবছি দিনকয়েক বাইরে একটু ঘুরে আসব। এই পুরী, নয়তো দার্জিলিং।

ছোট বোন মায়া উল্লসিত হয়ে হাতে তালি দিয়ে বলে উঠল, গ্র্যান্ড। মা বললে, বেশ তো চল না, কতকাল পুরী যাইনি।

মায়া বললে, না মা, দার্জিলিং।

ব্যস, সেবারের মত সব চাপা পড়ে গেল। আমরা তো চেয়েছিলাম শুধু আমরা দুজনে যাব। একা হব। এই ছোট্ট দুখানা ঘরের বদ্ধ আবহাওয়া থেকে দিনকয়েকের জন্যে মুক্তি চাইছিলাম। যেখানে শব্দ করে হাসতে পাবে করবী, ওরা শুনতে পাবে এই ভয়ে চাপা গলায় কথা বলতে হবে না।

টাকার কথা মা সেদিন জিগ্যেস করেনি, তবু আমি নিজেই একদিন বললাম, টাকাটা পাওয়া যাবে ভেবেছিলাম, আবার আটকে গেছে।

আপিস থেকে টাকা কিছু যে পাওনা আছে এ-কথা তো আগে বলিনি। তাই মাকে শোনাতেই হল। মায়াকে তো বিশ্বাস নেই, ও না ভেবে থাকে মাইনেব টাকা থেকে আমি কিছু কিছু বাঁচিয়ে রাখি। হয়তো মাকে বলে বসবে, 'তা না হলে বাইরে যাওয়াব কথা বলল কি করে।'

ক্রমশই আমার খারাপ লাগছিল। মার কাছ থেকে, বোনেদের কাছ থেকে এর আগে তো আমাকে কিছুই লুকোতে হয়নি। করবী আসার পর থেকে সংসারেব মধ্যে থেকেও আমি আর করবী যেন আলাদা হয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের দিকটা ওরা কেউ ভাবত না বলে আমার রাগ হত। কোনও ব্যাপারে আমাকে ভুল বুঝলে আমার বড়ো কষ্ট হত।

বাইরে যাওয়ার স্বপ্নটা এভাবে ভেঙে গেল বলে আমার বুকের মধ্যে একটা দমবন্ধ হওয়া কষ্ট হয়েছিল। করবী ভেবেছিল যাওয়া হবেই, ও বোধ হয় ওব বাবা-মাকেও খুব আনন্দ করে লিখে জানিয়েছিল।

বাধা পড়ল দেখে ও প্রায় চোখে জল এনে বলেছিল, দরকার নেই কোথাও গিয়ে, কোথাও যাব না আমি।

আমি সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলে ফেললাম, সব্বাই মিলে বেড়াতে গেলেও হয়।

আসলে মা তো অনেককাল কোথাও যায়নি, বাবার মৃত্যুর পর থেকে সংসার মাথায় নিয়ে এতকাল মুখ বুজে কাটিয়েছে। তাই আমার নিজেকে বড়ো স্বার্থপর মনে হচ্ছিল। আমি যেন ভিতরে ভিতরে ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম নিজের কাছেই। আমি ভেবে দেখলাম, মা এমন কিছু অন্যায় বলেনি। মায়ারই বা দোষ কি, ওদেরও তো শখ আহ্লাদ আছে। কিন্তু আমি তো তখন একটা দোটানার মধ্যে পড়ে গেছি। আমাদের এই বয়েস, আমার পঁচিশ বছরের এই মুগ্ধতা তো চিরকাল থাকবে না। করবী সবে একুশ। এখনই যদি দুটো দিনের জন্যে একটু স্বাধীনতা না পাই তাহলে গিয়েই বা লাভ কি।

আমি কিছু না ভেবেই বলে ফেললাম, সব্বাই মিলে বেড়াতে গেলেও হয়।

সঙ্গে সঙ্গে করবী বললে, যাও না তোমরা, আমি কি বারণ করেছি। আমি যাব না, কোথাও যাব না।

কথাটা আমার বুকের মধ্যে জ্বলত। আরও রাগ হত আমার নিজেরই অক্ষমতার জন্যে। আমি কেন বলতে পারছি না, না মা, আমরা শুধু দুজনে যেতে চাই।

এই ভাবেই গড়িয়ে গড়িয়ে দু-দুটো বছর কেটে গেল। আর একটু একটু করে আমরা

একই সংসারের মধ্যে থেকেও কিভাবে যেন দুটো দল হয়ে গেলাম। বেশ বুঝতে পারলাম, আমরা পরস্পর পরস্পরকে শুধু সহ্য করছি।

শেষে একদিন আমি মাকে বলেই ফেললাম। বললাম, দুখানা টিকিট কাটতে দিয়ে এলাম।

সব শুনে মা বললে, মায়াকে নিয়ে গেলে পারতিস। তুই তো বাইরে বাইরে ঘুরবি, ও বেচারী একা পড়ে থাকবে।

এই কথাটা মা কি না বললে পারত না। রাগে কিংবা অভিমানে আমাব নিজেকে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হল। যেন করবীর জন্যে মার কত দরদ।

কিন্তু আসবার সময় আমার অনুশোচনা হল। মনে হল মা খুব খুশি। মনে হল মা সত্যি করবীকে খুব ভালবাসে। আমিই বুঝতে পারিনি।

মা হাসিমুখে সব জোগাড়যন্ত্র করে দিল। রাত্রের খাবার তৈবি করে টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে দিল। করবীকে কত খুঁটিনাটি উপদেশ।

মায়া আর ছায়াকেও দেখলাম খুব হাসিখুশি। ওরা কববীকে কত কি ঠাট্টা করছিল। মায়া বললে, আমাদের ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছ বৌদি যাও, এরপর কিন্তু আমরা সব্বাই যাব।

মা বললে, বৌমা, নুলিয়া সঙ্গে না নিয়ে সমুদ্রে নামবে না যেন। আমাকে বললে, তুই আবার সাহস দেখিয়ে বেশি দূর যাস নে।

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মা 'দুর্গা দুর্গা' বলল, করবী মাকে প্রণাম করতেই মা ওর চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাতটা ঠোঁটে ঠেকাল, আর আমার চোখে জল এসে গেল।

সত্যি কথা বলতে কি, ট্রেনে উঠে আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

বুকের মধ্যে কাঁটার মত খিচখিচ করতে লাগল। 'মায়াকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই পারতিস'। আমার মনে পড়ল সেই প্রথমবার যখন কথাটা পেড়েছিলাম, মা বলে উঠেছিল, বেশ তো, চল্ না, কতকাল পুরী যাইনি।

সেই কথাগুলো মনে পড়তেই ট্রেনে উঠেই আমার সমস্ত মন বিস্বাদ হয়ে গেল। আমি এতদিন ধরে এই বেড়াতে যাওয়ার, এই মুক্তি পাওয়ার কত কি স্বপ্ন দেখছিলাম। ভেবেছিলাম অফুরন্ত আনন্দের মধ্যে ভেসে বেড়াব। কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল ওদের সঙ্গে করে নিয়ে এলেই হত। দু দুটো বছর তো কেটে গেছে, এখন আর আমার মনের মধ্যে কোনও রোমান্স নেই। সেই ভাল লাগার নেশা কবেই কেটে গেছে। আমার নিজেকে ভীষণ স্বার্থপর মনে হচ্ছিল। নিজের কাছেই নিজেকে ছোট লাগছিল।

কিন্তু করবীর যেন ওসব চিন্তা একেবারেই নেই। আমার বুকের মধ্যে কি হচ্ছে ও টেরও পায়নি। ট্রেন ছাড়তেই ওর সারা মুখে উল্লাস ফুটে উঠল। বলে উঠল, উঃ কতদিন পরে মুক্তি পেলাম, এত ভাল লাগছে!

তারপর আমি কোনও সাড়া দিলাম না দেখে ও বললে, এই, তোমার ভাল লাগছে না?

আমি হাসবার চেষ্টা করলাম। বললাম, লাগছে!

করবীর সে কি ফুর্তি। ও তখনই জানালায় মুখ রেখে অন্ধকার দেখছে, তখনই সামনের বেঞ্চের বাচ্চা ছেলেটার কথা শুনে হেসে উঠছে। একবাব উঠে দাঁড়িয়ে ওপরের বাঙ্কে রাখা বেডিংটা ঠেলে দিল অকারণেই। ওদিকের সিটের ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে বুঝি বললেন, ভীষণ মাথা ধরেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে করবী বলে উঠল, সারিডন নেবেন, আছে আমার কাছে। বলেই বেঞ্চের নীচের স্যুটকেশটা টানতে গেল।

আমার খুব অবাক লাগছিল, আমার খুব ভাল লাগছিল। করবীর এই চেহারা যেন আমি কোনওদিন দেখিনি। এই উজ্জ্বল হাসি দেখিনি। ও কপালে বড় করে একটা সিঁদুরের টিপ

পরেছিল। ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ও ততক্ষণে সারিডনের ট্যাবলেট বের করে ভদ্রলোককে দিয়ে এসেছে।

আমার শুধু মনে পড়ল, এই সব ছুটকো-ছাটকা ওষুধ-পত্তর মা আর ছোট বোন মায়াই আনিয়ে দিয়েছিল। মা বলেছিল, সঙ্গে নিয়ে যা, কখন কি দরকার পড়ে।

আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, পরের বার যেখানেই যাই সব্বাইকে নিয়ে যাব। আমার শুধু ইচ্ছে করছিল, ওর একটু অনুশোচনা হোক্। করবীও বলুক,এরপর সব্বাইকে নিয়ে যাব।

করবী ওসব কথা ভাবছিল না। ও তখন ঐ সামনের পরিবারের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। ওঁদেরও গন্তব্য একই। করবী বলছে, ভালই হল, চেনা লোক পাব ওখানে। বলে হাসছে।

পুরুস্টু থার্ড ব্র্যাকেটের মত সাদা গোঁফ ভদ্রলোকের। স্ত্রীর বয়েস হয়েছে, কিন্তু খুব সাজগোজ। সঙ্গে তিন-তিনটি মেয়ে।

ওঁরা একসময় অন্যমনস্ক হয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন, সেই ফাঁকে করবী আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বললে, ছোট মেয়েটা কি মিষ্টি, এই শোনো ওর পায়ে শ্বেতি আছে দেখেছো, বেচারী।

আমারও চোখ পড়ল। মেয়েটি বোধ হয় বুঝতে পেরে, কিংবা অভ্যাসবশে শাড়িতে গোড়ালি ঢাকা দিল।

সকলের জন্যে করবীর একটা নরম মন আছে, তা দেখে আমার ভালই লাগছিল। করবীর এই চেহারা যেন আমার অচেনা। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে একটা কাঁটা খিচখিচ করছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমি একটা দোটানার মধ্যে পড়ে আছি। মা কি ভাবল, মায়া কি বলছে কে জানে। হয়তো বলছে, স্বার্থপর স্বার্থপর। হয়তো ভাবছে, দাদাটা কি বদলে গেছে। আমার খুব রাগ হচ্ছিল, কষ্ট হচ্ছিল। সবাই আমাকে এভাবে ভুল বুঝবে কেন।

আমার আরও খারাপ লাগল রাত্রে টিফিন ক্যারিয়ারের খাবার বের করে করবী যখন বললে, 'খোকাবাবু খান, মা যত্ন করে,করে দিয়েছেন তোমার জন্যে।' বলে হাসল।

যেন এই যত্ন ওর একটুও প্রাপ্য নয়। যেন করবীর জন্য মার কোনও ভালবাসা নেই।

বোকা মেয়ে ! তুমি তো জানো না এই সংসারটা ঠিক এমন ছিল না। মা যেদিন গঙ্গার ঘাটে শাঁখা ভেঙে সিঁদুর মুছে এসে দাঁড়িয়েছিল থমথমে মুখে, সেদিন থেকে আমরা ছাড়া মার আর কেউ ছিল না। তুমি তখন কোথায়। তবু তোমার জন্যে মা একটা অদৃশ্য ভালবাসা লুকিয়ে রেখেছিল।

আমাদের বেরোবার সময় মা যখন 'দুগ্‌গা দুগ্‌গা' বলে উঠল, তখন মার গলাটা কেমন যেন কেঁপে গিয়েছিল। সে জন্যেই তো আমার কিছু ভাল লাগছিল না।

রিকশায় স্যুটকেশ আর বেডিং চাপিয়ে আমরা উঠে বসলাম। রিকশাটা চলতে শুরু করল। আমি তো এখানে আগেও এসেছি, তবু সব কেমন যেন নতুন লাগছিল। এই খোলামেলা, সকালের আলো। নতুন মুখ। করবীর মুখ খুশি-খুশি।

ও হঠাৎ বলে উঠল, শেষ অবধি তা হলে আসা হল।

ওর গলার স্বরে বেশ একটা নিশ্চিন্ত ভাব, কিন্তু ওর কথার ফাঁকে যেন একটা চাপা অভিযোগ।

তবু আমিও হেসে উঠে বললাম, যা বলেছ।

আমার সত্যি খুব ভাল লাগছিল।

একটু পরেই সি-বিচের দিকের রাস্তাটা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের গর্জন শোনা গেল। করবীও হাসতে হাসতে বললে, শুনতে পাচ্ছ?

বিয়ের আগে করবীও এসেছে এখানে। কিন্তু এ আসা যেন অন্য।

আপিসের একজন সদ্য ঘুরে গেছে। সে বলেছিল, একটা নতুন হোটেল হয়েছে। খুব ভাল হোটেল। হোটেল মুনলাইট।

রিকশাওয়ালা রিকশা চালাতে চালাতে জিগ্যেস করল, কোথায় উঠব। নিজেই বললে, মুনলাইটের চার্জ সবচেয়ে বেশি।

আমি বললাম, সবচেয়ে ভাল হোটেল তো ওটাই, হ্যাঁ ওখানেই চলো। চার্জ বেশি? তা হোক।

বোধ হয় আমি করবীকে শোনাতে চাইলাম মুনলাইটেব চার্জ সবচেয়ে বেশি।

আসলে আমি এখন তো আর সেই সংসারী মানুষটা নই। বিধবা মার হাতে মাইনের টাকা তুলে দেওয়া কর্তব্যপরায়ণ ছেলেটি নই, আমি এখন হঠাৎ পাওয়া গোপনে জমিয়ে রাখা কয়েক শো টাকার বিনিময়ে হিসেব-হারানো এক সদ্যবিবাহিত যুবক। হ্যাঁ, বিয়েব পর দু দুটো বছরের একঘেয়ে জীবন পার হওয়ার পর এক সদ্যবিবাহিত যুবক।

সি-বিচ বরাবর পিচেব রাস্তাটার ওপর রিকশা উঠতেই চোখের সামনে সেই বিশাল সমুদ্র। ঢেউয়ের পর ঢেউ, সমুদ্রেব গর্জন। সমস্ত মন কেমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

আর করবীর মুখে-চোখে উল্লাস দেখা দিল। ও বলে উঠল, উঃ, কোথায় ছিলাম এতদিন।

আমার নিজেবও ঠিক তাই মনে হল। কিন্তু কববীর মুখে কথাটা শোনাল একটা অভিযোগের মত। আমি গ্রাহ্য করলাম না। কাবণ চোখেব সামনের এই অনন্ত প্রকৃতি তখন আমাকে অনেকখানি উদাব করে দিয়েছে। বুকেব মধ্যে সেই কাঁটা তখন আব খিচখিচ কবে লাগছে না।

আমবা হোটেলেব নাম আর চেহাবাগুলো দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। পিচের রাস্তাটার এপাবে যেন হোটেলের মেলা বসে গেছে। কত নামের বাহার, নামকরণে সবাই যেন সমুদ্রকে নিয়ে টানাটানি করছে। আমি আগেব বার কোনটায় উঠেছিলাম করবীকে দেখালাম, কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে এসেছিলাম সেবাব। কববীরা কোনটায় এসে উঠেছিল আমাকে দেখাল।

তারপর একসময উঁচু বাস্তাটা থেকে গড়িয়ে হোটেল মুনলাইটের গেটের মধ্যে ঢুকল রিকশাটা। নতুন রঙ করা বাইরের চেহারাটা দেখেই আমাদের পছন্দ হয়ে গেল।

বাক্স বেডিংয়েব ওপর পা রেখে বসাব উদ্ভট দৃশ্যটা কল্পনা করে বড অস্বস্তি লাগছিল, হোটেলের সামনের বারান্দায় জনকয়েক আয়েসে বসে গল্প করছিল, তারা আমাদের দিকে তাকাল দেখে আরও অস্বস্তি।

রিকশা থামতেই আমি লাফিয়ে নেমে পডলাম। করবীও।

এতক্ষণ ভিতরে ভিতরে একটু ভয়-ভয় করছিল, যদি জায়গা না পাই। অফিস ঘরে ঢুকতে ম্যানেজাবের আগ্রহ দেখে বললাম, ভাল ঘর হবে তো!

করবী বললে, একেবারে সামনেব দিকের ঘর চাই, বারান্দা থেকে যেন সমুদ্র দেখতে পাই।

সত্যি তেমন একখানা ঘর পেয়ে গেলাম দোতলায়। ছোট্ট একটুকরো বারান্দা।

বাক্সবেডিং রেখে যেতেই দুজনেই ঘরের বারান্দায় বেরিয়ে এলাম সমুদ্র দেখার জন্যে। বললাম, সমুদ্র যতবারই দেখো, একেবারে নতুন।

করবী সমুদ্রের দিক থেকে চোখ না সবিয়ে আবার সেই কথাটাই বলল।—সত্যি,

কোথায় ছিলাম এতদিন।

যেন যেখানে ছিল ও, সেখানে একটুও সুখ ছিল না। আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম ওটা কথার কথা।

হোটেলের বারান্দা থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম নুলিয়ারা একটা নৌকো ভাসাবার চেষ্টা করছে। যতবার সেটা ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ততবারই ঢেউ লেগে সেটা ফিরে আসছে। কি অসীম ধৈর্য। মানুষের জীবনের মতই।

—এই।

করবীর ডাক কানে গেল, কিন্তু আমার সাড়া দিতে ইচ্ছে হল না। নৌকোটা ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ওরা, আর প্রচণ্ড এক একটা ঢেউ এসে নৌকোটাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। তবু ভাসাতেই হবে।

—এই, শোনো না।

ফিরে তাকাতেই করবী হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এল, একেবারে কাছে, আমার বাঁ কাঁধে দু হাতের ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ার নিবিড় ভঙ্গিতে বললে, চলো না, এখনই একবার ঘুরে আসি।

আমাব মনে হল, করবী যেন বিয়ের পরের সেই একুশ বছরের দিনগুলোতে ফিবে গেছে।

—বাবু, ব্রেকফাস্ট দোব আপনাদের।

করবী সরে গেল, পিছন ফিরে দেখলাম হাতে ট্রে নিযে হোটেলের ভৃত্য দাঁড়িয়ে আছে।

আমি মাথা নাড়লাম।

করবী তারই ফাঁকে বেডিং খুলে চাদব বদলে নিযেছে। বালিশ বের করেছে। হোটেলের বালিশ চাদর ওর পছন্দ নয়। সে জন্যেই ওসব নিয়ে আসা।

ব্রেকফাস্ট সেরে সি-বিচে যাওয়ার জন্যে আমবা বেবিয়ে পড়লাম। করবী ততক্ষণে সাজগোজ করে নিয়েছে, ট্রেনের শাড়িটা পাল্টে ফেলেছে। কপালে বেশ বড় করে একটা সিঁদুরের টিপ পরেছে। ডগডগে সিঁদুবের টিপে ওকে বড়ো সুন্দর দেখায়।

আমরা দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামছিলাম।

আর তখনই করবী উল্লাসে প্রায় চিৎকাব করে উঠল, অঞ্জু, তুই!

অঞ্জলি আর তার স্বামী সিঁড়ি বেযে ওপবে উঠছিল। দেখা হয়ে যেতেই দুজনেব সে কি হাসি কথা উচ্ছ্বাস। কাছাকাছি হতেই পরস্পর পরস্পরকে জড়িযে ধরল। তাবপর অনর্গল কথা।

আমি তখনও ওদের নাম জানি না।

অঞ্জলি আমার দিকে এক নজর দেখে নিয়ে হাসতে হাসতে করবীকে বলে উঠল, ওমা, বিয়েতে একটা খবরও দিলি না।

আমি ভাবলাম, সত্যি এত বন্ধু যখন, জানায়নি কেন। হয়তো ভুলে গিয়েছিল কিংবা অসুবিধে ছিল। কিংবা এখন যতটা দেখা যাচ্ছে এত বন্ধু নয়।

অঞ্জলিকে আমার ভাল লেগে গেল, বব ছাঁট চুল ও ব্লাউজের ব্যাপ্তিতে কার্পণ্য তার সর্বাঙ্গে একটা চটক দিয়েছে।

পরে দেখা হবে বলে করবী নেমে আসছিল, আর তখনই কেমন দুঃখী দুঃখী মুখ করে অঞ্জলি বললে, বি এন আরে জায়গা পেলাম না রে। এ হোটেলটা নাকি তেমন ভাল নয়।

অর্থাৎ বি এন আর হোটেলেই ওদের ওঠার কথা। কথাটা আমার একটুও ভাল লাগল না। যেন হোটেলে আসার জন্যেই আসা, সমুদ্র শুধু উপলক্ষ। আমার বলতে ইচ্ছে হল, সমুদ্র কিংবা সূর্যোদয় কোনও হোটেলের প্রতি কার্পণ্য করে না। অঞ্জলির ঐ কথাটায় আমি বেশ একটু বিরক্তই হয়েছিলাম, কিংবা রাগ। কারণ ঐ হোটেলটা আমাদের নাগালের

বাইরে। ওটার কথা আমি চিন্তাই করিনি। পরক্ষণেই আমার হাসি পেল। আমি নিজেও তো বলেছিলাম, মুনলাইটেই চলো, ওদের চার্জ সবচেয়ে বেশি, ওটাই সবচেয়ে ভাল। আসলে আমরা বোধ হয় প্রকৃতির কাছে আসার সময় আমাদের আসল প্রকৃতিটা ফেলে আসতে পারি না।

আমরা সবে দু-তিন ধাপ নেমেছি, আর অঞ্জলি কয়েক ধাপ ওপরে উঠে গেছে, ফিরে দাঁড়িয়ে আবার ডাকল, এই করবী, শোন শোন।

ছুটে নেমে এসে হাসতে হাসতে বললে, এবার একটা বাড়তি জিনিস দেখা হয়ে গেল। আজই দেখলাম।

আমিও সপ্রশ্ন চোখে তাকালাম ওর দিকে। অঞ্জলির স্বামী তখন হাসছেন, ওর ছেলেমানুষি কাণ্ড দেখেই হয়তো। বেশ ঝকঝকে স্মার্ট চেহারা ভদ্রলোকের, হাতে একটা কিং সাইজ দামী সিগারেটের প্যাকেট। দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে আত্মবিশ্বাস।

অঞ্জলি তখন বলছে, একজন বিখ্যাত লোক, কলেজে পড়ার সময় আমাদের হিরো ছিল রে, মনে নেই।

করবী হাসতে হাসতে বললে, কে তাই বল না।

—কি ভাল রে, ভদ্রলোক কি ভাল। তারপর কেমন গাঢ় গলায় বললে, কল্যাণসুন্দর, কল্যাণসুন্দর রায় এসেছেন এখানে। আজ এই প্রথম দেখলাম।

করবী প্রথমটা বুঝতে পারেনি। তারপরই সাগ্রহে বলে উঠল, সেই কল্যাণসুন্দর?

তিনি যে বিখ্যাত ব্যক্তি সে-বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। আমি ওসবের বিশেষ খবর রাখি না। যারা ছবি আঁকা, কাব্যসাহিত্য, গানটান ইত্যাদি নিয়ে পাগলামি করে তাদের কখনও কখনও ঠাট্টাও করি। তবে এই কল্যাণসুন্দরের নাম আমি অনেকের মুখে শুনেছি। তার প্রশংসাও। কিন্তু তার জন্যে অঞ্জলি আর করবী এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে আমি ভাবতেই পারিনি। করবী যে এসবেরও খবর রাখে আমার জানাই ছিল না। ওর লাজুক গৃহবধূর ছবিটাই আমার মনে আঁকা ছিল।

তবু ওদের এই নাচানাচি আমার কাছে বেশ ছেলেমানুষি বলে মনে হল। অঞ্জলির স্বামীও হয়তো সেজন্যেই ওভাবে হাসছিলেন।

আমরা যখন হোটেল থেকে বেরিয়ে সি-বিচের দিকে যাচ্ছি, করবী হঠাৎ বললে, অঞ্জলির স্বামী, জানো, খুব বড় অফিসার। একটু থেমে বললে, সত্যি তো, ওদের বি এন আরেই ওঠবার কথা।

কথাটা একটু বিস্বাদ লাগল বলেই আমি কথা পাল্টালাম। বললাম, তোমাব এত বন্ধু, বিয়েতে বলা উচিত ছিল তোমার।

করবী ঠোঁটে এমন একটা তাচ্ছিল্য আঁকল যা আমাব কাছে খুব দুর্বোধ্য মনে হল। একবার সন্দেহ হল আমিই বোধ হয় দায়ী। আমি খুব বড় একটা কোম্পানির ছোট্ট একটা ব্রাঞ্চে কাজ করি, চোখের সামনে শুধু একটা স্বপ্ন আছে। আর কিছুই নেই। এই পৃথিবীতে আমার কোনও পরিচয়ই নেই।

আমি নিখিলেশ বসু, রেনল্ড্স অ্যান্ড বাগড়ি কোম্পানির শাখা অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি, সর্বসাকুল্যে হাতে পাই পাঁচশো সত্তর, বাড়ি ভাড়া পাই সাতচল্লিশ, দিতে হয় একশ নব্বুই; গ্র্যাজুয়েট, একটা পেপারে ছটির মধ্যে চারটি প্রশ্ন কমন পেয়েছিলাম, কিন্তু মুদির দোকানে পরীক্ষার খাতা বিক্রি হয়ে যাওয়ায় কলেজে স্ট্রাইক, সেজন্যেই কিনা জানি না কলেজ-সুদ্ধ প্রায় সবাই উক্ত বিষয়ে একই নম্বর পেয়ে ব্যাক, তথাপি পরের বার উত্তীর্ণ। জ্ঞানত আমার কোনও ব্যক্তিত্ব নেই, অথবা তা হরণ করেছে পরীক্ষা নামক পাগলামি। আমি এবং সুদীপ দুজনেই মুখস্থ লিখেছিলাম, আমি সুলভ দরের টিউটোরিয়ালের নোট, সুদীপ দামী

অধ্যাপকের, ফলে ফলাফল যথাযথ, সুদীপের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে, আমার নেই।

কিন্তু আমি চাকরি পেয়েছি বাবার আকস্মিক মৃত্যু এবং মার করুণ বৈধব্যের অসহায় মুখের বিনিময়ে, এবং অবশ্যই জনৈক হিতৈষীর বদান্যতায়।

আমি ভাবতাম আমি সুখী।

এখন অঞ্জলির স্বামীকে দেখে মনে হচ্ছে ও আরেকজন সুদীপ।

জলের ঢেউ এসে পড়ছে, এক একটা ঢেউ হঠাৎ হঠাৎ আমাদের কাছ পর্যন্ত এসে পড়ছিল। আমি সেজন্যে একটু দূরে দূরে হাঁটছিলাম। করবী কিন্তু বারবার এক হাতে শাড়ির প্রান্ত তুলে ধরে গোড়ালি ভিজিয়ে জলের দিকে যাচ্ছিল, নিষেধ শুনছিল না।

মা আসার সময় বলেছিল, বৌমা সাবধানে থেকো, বাহাদুরি করে জলের দিকে যেও না যেন। হানুকেও যেতে দিও না।

আমি তাই বললাম, এই, অত কাছ দিয়ে যেও না।

আর তখনই একটা প্রকাণ্ড ঢেউ এসে করবীর হাঁটু অবধি ভিজিয়ে দিল, ও ছুটে পালিয়ে আসারও সময় পেল না। কোনওরকমে টাল সামলাল।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, কেমন! স্নান কবাব সময় নুলিযা থাকবে, তখন যত খুশি বীরত্ব দেখিও।

সমুদ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় ও তখন বেশ ঘাবড়ে গেছে। আমরা চুপচাপ পাড়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছিলাম। কববী বোধ হয় মনে মনে সমুদ্রকে যাচাই করে নিচ্ছিল।

একটা বুড়ো গোছের নুলিয়া কাছে এসে দাঁড়াল। হোটেল থেকে বেরোনোব সময় ওকে দেখেছি। হোটেলের গেটের সামনে ছিল। সেলাম করেছিল তখন। হেসে বলেছিল, আমার নাম বোম্বাইয়া আছে।

লোকটার কথাগুলো কেমন উদ্ভট। আসলে তেলেগুতে নিজেদের মধ্যে কথা বলে, বোর্ডারদের সঙ্গে কি এক বিচিত্র ভাষায়।

লোকটা হাসছিল।

করবী ওকে বললে, সমুদ্রে মানুষ মরে?

নুলিয়াটা হেসে বললে, সমুন্দর কেত্তে মারে দিদি? মনোষ মনোষকে মারে বেশি।

সমুদ্র আর কত মানুষকে মারে, মানুষ মানুষকে মাবে বেশি।

করবী কি বুঝল কে জানে, ও হেসে উঠল।

ঠিক তখনই আমাদের সামনে দিয়ে এক দল মেয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিল। ছোট মেয়েটা হাসতে হাসতে বললে, দিদি পালা পালা, পিছনে জ্ঞানবাবু আসছে।

আমি হাসাহাসির অর্থ বুঝলাম না, ওদের পিছনে কে আসছে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। বুঝতে পারলাম না। বেশ খানিকটা পিছনে কয়েকজনই তো রয়েছে। কিন্তু পাজি লোকটা কে বুঝতে পারা গেল না। নিশ্চয় ওদের পিছু নিয়েছে বা বিরক্ত করে।

করবী সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় বললে, এই, তুমি কল্যাণসুন্দরকে দেখেছো?

কি আশ্চর্য, সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে ও কল্যাণসুন্দরের নাম জপ করছে! আমি একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললাম, না।

—জানো, একরাত্রি উনি আমাকে ঘুমোতে দেননি।

আমি চমকে উঠেছিলাম। বোকার মতই। কিন্তু পরক্ষণেই করবী কেমন স্বপ্নের মত গলায় বললে, জানো, যারা কিছু সৃষ্টি করে, মানুষকে আনন্দ দেয়, তাদের ঠিক মানুষ মনে হয় না। উনি একরাত্রি আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন।

ছাইপাঁশ এই সব সৃষ্টিফিস্টি নিয়ে কথা বলার জন্যে আমি এখানে এসেছি নাকি। যার যা

প্রাপ্য-সম্মান, দেবার কথা বটে, কিন্তু মেয়েরা এক একটা জিনিসকে এত বেশি দাম দিয়ে ফেলে। কল্যাণসুন্দরের খুব নামটাম হয়ে গেছে হয়তো, সেটা এমন কিছু আহামরি ব্যাপার নয়। তার জন্যে এত লাফালাফির কি আছে।

অনেক দূরে ঢেউয়ের মাথায় একটা নৌকো উঠছিল আর নামছিল।

নৌকোটা ফিরে আসছে, না আরও দূরে চলে যাচ্ছে, এত দূর থেকে বোঝা যাচ্ছিল না। নৌকোর মধ্যে একটা কালো কুচকুচে পুতুল, নুলিয়াটা। হঠাৎ নৌকোটা উল্টে গেল ঢেউ লেগে। একটু পরেই আবার সোজা হল। কালো পুতুলটা আবার দেখা গেল নৌকোর মধ্যে।

—ঐ অত দূর যদি যাওয়া যেত। করবী হাওয়ায় ওড়া আঁচল ধরে রেখে হাসতে হাসতে বললে। অর্থাৎ ওর চোখেও পড়েছে নৌকোটা।

আমি হেসে বললাম, সাহস দেখা যাবে স্নান করার সময়। দেখব কতদূর যেতে পারো।

করবী দুহাত নেড়ে বলে উঠল, না না, আমি সমুদ্রে নামব না। সেবার বাবার সঙ্গে এসেও সমুদ্রে নামিনি।

ঠাট্টা করে বললাম, কেন, কালো হয়ে যাবে বলে? ও একটু আহত স্বরে বললে, আমি তো কালোই।

না, করবীর গায়ের রঙ ঈষৎ চাপা হলেও ওকে ঠিক শ্যামলাও বলা যায় না। বেশ উজ্জ্বল মুখ, মুখের গড়ন, আমার চোখে সুন্দরীই।

আমি হেসে ফেলে আবার বললাম, দুর, অত ভয় পাবার কিছু নেই। তাছাড়া নুলিয়া তো সঙ্গে থাকবে।

করবী তা সত্ত্বেও মাথা ঝাঁকাল। বললে, না মশাই, না। সমুদ্রে সাঁতার কাটতে হয় আপনি কাটবেন। আমার দেখেই ভয় করছে।

আমরা লক্ষই করিনি, মাঝবয়েসী ভদ্রলোক একেবারে আমাদের সামনে দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আধাআধি কাঁচাপাকা চুল, মুখে বেশ একটা শান্ত ভাব, থেমে দাঁড়িয়ে একটা তর্জনী তুলে করবীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, সমুদ্র ভয়ঙ্কর ঠিকই, সমুদ্র কিন্তু সুন্দরও।

আমাদের কথাগুলো ওঁর কানে গিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এভাবে আমাদের কথায় নাক ঢোকানো নিশ্চয় ভদ্রতা নয়। আমি একটু বিরক্তই হলাম। আর একজন অপরিচিত লোক ওর আতঙ্ক দেখে ফেলেছে বলে করবীও একটু লজ্জা পেল।

ভদ্রলোক ততক্ষণে দু পা এগিয়ে এসেছেন। বেশ বিস্তৃত কপাল, সম্ভবত সামনেব চুল উঠে গিয়ে কপালটা চওড়া হয়ে গেছে, এরপরই টাক এগোতে শুরু করবে। গায়ে একটা মোটা কেটের পাঞ্জাবি। বেশ সাদাসিধে। মুখে বেশ একটা সরল হাসি নিয়ে এগিয়ে এলেন।

তারপর তর্জনীটা সমুদ্রের দিকে ঘুরিয়ে বললেন, লুক অ্যাট দি সি। এব ভয়ঙ্কর চেহারার দিকে তাকালে মনে হবে মানুষকে টেনে নিয়ে যাওয়াই বুঝি ওর কাজ। কখনও কখনও সত্যি হঠাৎ কি যে হয়ে যায়। কিন্তু জলে নেমে দেখবেন পাড়ের দিকে ছুঁড়ে দিতে চাইছে। কেমন একটা রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, সময়ে টানে, আবার ঠেলেও দেয়।

করবীর তখন আর সঙ্কোচ নেই। বললে, ঠিক বলেছেন, সমুদ্র কিছুই নাকি নেয় না, সবই ফিরিয়ে দেয়।

ওটা একটা প্রবাদের মত, মার কাছে আমিও শুনেছিলাম।

ভদ্রলোক কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে বললেন, জানি না, ফিরিয়ে দেয় কিনা জানি না। তবে শান্তি দেয়।

ভদ্রলোকের চেহারা, কথাবার্তা, লুকোনো দীর্ঘশ্বাস, সব মিলিয়ে ওঁকে আমার ভাল লাগল।

আমি আমার নাম বললাম। বলে আমার প্যান্টের ক্রিজ ঠিক করার ভঙ্গি করলাম, সম্ভবত করবীর সামনে স্মার্ট হবার জন্যে।

উনিও ওঁর নাম বললেন। সেই প্রথম ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে আলাপ হল।

ধূর্জটিপ্রসাদ করবীকে বললেন, তোমারও তো একটা নাম আছে।

করবী আদরে গলে যাবার মত মুখ করে হাসতে হাসতে বললে, করবী।

ধূর্জটিপ্রসাদ করবীর কপালের আধুলি মাপের বড় সিঁদুরের টিপটার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, দেখে তো মনে হয় রক্তকরবী।

আমিও শব্দ করে হেসে উঠলাম।

—আবার দেখা হবে। ধূর্জটিপ্রসাদ চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন।

আর উনি একটু দূরে যেতেই করবী বলে উঠল, ভারী মজার লোক, তাই না?

আমি কোনও উত্তর দিলাম না।

৩

এবার এখানে আসার পর থেকেই ধূর্জটিপ্রসাদ ভয় পাচ্ছিলেন। মানুষের সঙ্গে আবার সম্পর্ক গড়ে উঠছে। আবার একটা মায়ার বন্ধনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন।

একটু একটু করে তো নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। এখানে এসে আবার সব কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে। তাই মনে মনে ভয় পাচ্ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

নিখিলেশ আর করবীকে ওঁর ভীষণ ভাল লেগে গেল।

ধূর্জটিপ্রসাদ প্রশ্ন করেছিলেন, কোথায় উঠেছেন নিখিলেশবাবু।

নিখিলেশ বলেছিল, আমাকে আবার বাবু কেন।

—বেশ বেশ, নিখিলেশই বলব।

করবী সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, আসুন না একদিন আমাদের হোটেলে।

গিয়েছিলেন বলেই তো এত মায়া। সেজন্যেই এখন ওদের জন্যে কষ্ট, ওরা এখন একটা রহস্য হয়ে গেছে। অথচ কি যে হতে পারে কেউ কোনও হদিস খুঁজে পাচ্ছে না। যেখানেই যান সেখানেই ঐ একই আলোচনা।

একটা সুখী দম্পতি, কতই বা বয়েস, দিব্যি হাসিখুশি মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে কটা দিন। সকলের চোখেই ওরা তখন স্বাভাবিক, সাধারণ। কিন্তু একটা অঘটন ঘটে গেছে বলেই রাতারাতি সব কিছু বদলে গেছে। এখন আর নিখিলেশ গোটা মানুষ নয়, করবীকেও কেউ কেউ এখন চিরে চিরে দেখছে। কোনটা কার আসল রঙ সেটাই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ধূর্জটিপ্রসাদকে দেখেও তো সকলে ভাবে উনি খুব মিশুকে। কাউকে ভাল লেগে গেলে ডেকে আলাপ করেন। কিন্তু কেউ জানে না, নিজের ঘরটিতে ফিরে এসে উনি একেবারে একা। তখন ওঁর একমাত্র সঙ্গী বই।

সঙ্গে তাই একরাশ বই নিয়ে আসেন এখানে। ঘরে ফিরে চুপচাপ বইয়ের পাতায় ডুবে যান।

তনুশ্রী একদিন বলেছিল, এসব পড়ে কি হয় বাপি?

বিজয়বাবু হেসে বলেছিলেন, কি হয় হে ধূর্জটি, বলো মেয়েকে।

ধূর্জটিপ্রসাদ হেসেছিলেন শুধু। কী উত্তর দেবেন।

বিজয়বাবু হাতটা চিবুকের কাছ থেকে নামিয়ে এনে একটা দাড়ি দেখানোর মত করে বলেছিলেন, পণ্ডিত হওয়া যায় রে, পণ্ডিত হওয়া যায়।

ধূর্জটিপ্রসাদ ম্লান মুখে বলেছিলেন, না লাহিড়ী,.না। শুধু আনন্দ পাই।

—আনন্দ! চোখ কপালে তুলেছিল তনুশ্রী।

তনুশ্রীর জন্যেও ওঁর কেমন ভয়-ভয় করে। এই মেয়েটার ওপর একদিন সমস্ত স্নেহ আর ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছিলেন। সেজন্যেই বোধ হয় দূরে সরে যেতে হয়েছিল, নিজেকে সরিয়ে নিতে হয়েছিল। সে-সব দিনগুলোয় বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। এখানে এসে আবার সেই সম্পর্কটা নতুন করে বেঁচে উঠতে চাইছে। সেইজন্যেই তো তনুশ্রীর জন্যে ওঁর এত ভয়।

বিজয়বাবুর ছোট মেয়ে এই তনুশ্রী।

ওঁরা এসে উঠেছেন স্বর্গদ্বারের দিকে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে। বিজয়বাবু সপরিবারে এসে উঠেছেন। স্ত্রী শান্তা আর তিন মেয়ে। বনশ্রী, মঞ্জুশ্রী আর তনুশ্রী।

হাঁড়ি-কড়াই নিয়ে এসেছেন, নুলিয়াদের কাছ থেকে সদ্য-ধরা মাছ কিনে আনেন কোনও কোনও দিন। রান্নার লোক এনেছেন সঙ্গে করে।

বিজয়বাবু মাছের খোঁজেই গিয়েছিলেন। সঙ্গে তনুশ্রী।

হঠাৎ ধূর্জটিপ্রসাদকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে বিজয়বাবু চিৎকার করতে করতে ছুটেছিলেন। ধূর্জটি! ধূর্জটি! যেন কমবয়স্ক এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে ডাকছে।

নিজের নাম শুনে চমকে ফিরে তাকিয়েছিলেন উনি। অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

—আরে, লাহিড়ী তুমি?

তনুশ্রীও তখন হাসিহাসি মুখে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ প্রতিবারই এখানে আসতেন বলে একসময় বিজয়বাবু ঠাট্টা করে বলতেন, তোমার আর কি কোনও জায়গা নেই। কত পাহাড়পর্বত আছে, কত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে·····

ধূর্জটিপ্রসাদ বলতেন, আমার কাছে ঐ একটাই জায়গা। সমুদ্র আমাকে টানে।

বিজয়বাবু ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। বোধ হয় কথাটা দুর্বোধ্য ঠেকত।

ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওযাতে বিজয়বাবু খুশি হয়ে উঠলেন।

বললেন, আমরা থাকতে তুমি হোটেলে থাকবে তা হয় না ধূর্জটি। চলো আমাদের সঙ্গে। তনু, তোর মা একেবারে অবাক হয়ে যাবে রে। মেয়ের দিকে ফিরে বললেন বিজয়বাবু।

কিন্তু উনি রাজি হলেন না। আবার কাছে যেতে, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে ওঁর ভয় করে। স্নেহ মমতা মানেই তো বন্ধন, বন্ধন মানেই দুঃখ আর কষ্ট।

বিজয়বাবু সেদিন জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদকে।

আর শান্তা, বিজয়বাবুর স্ত্রী, মৃদু হেসে বলেছিল, বেশ তো, হোটেলের সুখ ছেড়ে কেনই বা আসবেন, কিন্তু রোজ একবার করে আসা চাই।

শান্তা এমনভাবে বলেছিল, ধূর্জটিপ্রসাদ না বলতে পারেননি। ওঁর ভিতরে হয়তো এমন কোনও একটা শূন্যতা আছে যা অনেকগুলো হাত বাড়িয়ে মানুষকে কাছে টানতে চায়। কেউ কেউ ভুল বোঝে, কেউ এড়িয়ে যায়। আর সত্যি সত্যি যারা কাছে আসে, যাদের ভাল লাগে, ধূর্জটিপ্রসাদ জানেন তার জন্যে একটা না একটা দুঃখ অপেক্ষা করে আছে।

জীবনটা তো এভাবেই একা-একা বেশ কাটিয়ে দিলেন। অন্তত সবাই তো তাই ভাবে। বিজয়বাবু ভাবেন, উনি বেশ আছেন, একা-একা। অথচ ওঁর মত নিঃসঙ্গ মানুষ আর নেই। সমুদ্র আর আকাশের সঙ্গে বই জিনিসটাকেও উনি অদ্ভুতভাবে মিলিয়ে নিয়েছেন।

বিজয়বাবু আর ধূর্জটিপ্রসাদের একসময় খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অথচ দুজনেই পরস্পরের বিপরীত।

বিজয়বাবু হই-হই ভালবাসেন। কোথাও বেড়াতে গেলে স্ত্রী এবং তিন মেয়েকে সঙ্গে না নিয়ে গেলে কোনও আনন্দই পান না। তিন মেয়ে : বনশ্রী, মঞ্জুশ্রী আর তনুশ্রী।

ওরা একটু অন্য ধরনের। সমস্ত পরিবারটাই যেন পরস্পরের বন্ধু। মেয়েদের সঙ্গে বিজয়বাবু যখন কথা বলেন, যেন সম্পর্কটা ভুলে যান। প্রথম প্রথম ধূর্জটিপ্রসাদের খুব অবাক লাগত। সমস্ত পরিবারটাকেই।

—রোজ একবার করে আসা চাই কিন্তু। শান্তা বলেছিল।

আর শান্তার দিকে তাকিয়ে ওঁর সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়ে গিয়েছিল।

সেজন্যেই তো প্রতিদিন আসতেন একবার করে। চা খেতে খেতে গল্পগুজব করতেন। শান্তা আর তিন মেয়ে ঘিরে বসত, বিজয়বাবু তেমনি হাসিখুশি।

বিজয়বাবুর মোটাসোটা চেহারার মধ্যে একটা খুশি-খুশি ভাব। সর্বদাই। মুখে থার্ড ব্র্যাকেটের মত পুরুস্টু সাদা গোঁফ। ওটা দেখলেই মনে হয় লোকটা দুঃখ যেন গায়ে মাখে না।

ধূর্জটিপ্রসাদ এসে কাঠেব ফটক খুলতে খুলতেই ডাক দিলেন, লাহিডী !

গতকাল ইউজেনিকসের ওপব একটা বই পডছিলেন। মাথার মধ্যে তখন সেটাই ঘুরছে। লাহিড়ীকে সেগুলো না বলে শান্তি পাচ্ছেন না।

তনুশ্রী মেয়েটা চঞ্চল আর অস্থির। ও ছুটে গিয়ে বললে, আসুন।

কাঠের ফটকের কডাটা খুলতে পারছিলেন না, তনুশ্রীই খুলে দিল।

ধূর্জটিপ্রসাদ সবে গুছিযে বসে শুরু করেছেন।—একটা দারুণ বই পডছি লাহিড়ী। বিবর্তনের ব্যাপারে শুধু তো পরিবেশ পবিবেশ বলা হয়, কিন্তু জেনেটিকস বলছে মিউটেশনের দিকটাও, মানে দুটো জীনের······

ধূর্জটিপ্রসাদকে থেমে পডতে হল। বিজয়বাবুর স্ত্রী শান্তা এসে বসল হাসি-হাসি মুখে। তারপবই জিগ্যেস করে বসল, মুনলাইট হোটেলের ব্যাপারটা কিছু শুনলেন ?

শান্তার মুখের দিকে তাকালেন ধূর্জটিপ্রসাদ। চোখে চোখ রাখলেন। এখন আর কোনও অস্বস্তি বোধ করেন না। অনেকগুলো বছর তো কেটে গেছে, আজকাল আর যাওয়া-আসাও নেই। এখন আর কাবও বিরুদ্ধে ওঁর কোনও অভিযোগ নেই। স্মৃতি থেকে এই পবিবারটাকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন।

এখন হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার পর বুঝতে পারছেন, একটুও মুছে যায়নি।

কথাটা ধূর্জটিপ্রসাদেব মাথায় ঢোকেনি। কেমন অবাক হয়ে তাকালেন।

বিজয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, নিখিলেশেব কথা বলছে হে, নিখিলেশ। এত খারাপ লাগছে।

বনশ্রী, বড় মেয়েও এসে দাঁড়িয়েছে। বললে, জানেন, ট্রেনে আসার দিনেই আলাপ হয়েছিল ! করবীদিকে এত ভাল লেগেছিল !

বিজয়বাবু দুঃখ দুঃখ মুখ করে বললেন, আমাকে সারিডন বের করে দিয়েছিল, মনে আছে শান্তা ?

ধূর্জটিপ্রসাদ চুপ করে গেলেন। ঐ ব্যাপারটাই তো উনি ভুলে থাকতে চাইছেন। এখানেও সেই একই কথা। জেনেটিকস, মিউটেশন, এভোলিউশন সব তালগোল পাকিয়ে গেল মাথার মধ্যে। মুহূর্তের মধ্যে উনি যেন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। একা, একেবারে একা। একা এবং নিঃসঙ্গ। মনের মধ্যে কত কথা ভিড় করে আসছে। একটা নতুন কিছু পড়লে, নতুন কিছু জানলে অপরকে না জানিয়ে কি শান্তি মেলে। চাবপাশে মানুষ থাকলেই সঙ্গী পাওয়া যায় না। সেজন্যেই তো উনি এত নিঃসঙ্গ।

বিজয়বাবু আবার বললেন, কি ভাবছ ধূর্জটি, নিখিলেশের কথা বলছে, নিখিলেশ।

—ও, নিখিলেশ। বইয়ের জগত থেকে যেন বাস্তবে ফিরে এলেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ চুপ করে রইলেন। কি যেন চিন্তা কবছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিখিলেশের উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, তার চোখমুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল।

ধীরে ধীরে বললেন, ওর জন্যে বড় কষ্ট হয় লাহিড়ী। সেদিন যখন এসে দাঁড়াল, ঐ অত রাত্রে, চুল উস্কোখুস্কো, ওর চোখ দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

এ-কথা ওঁরা এর আগেও শুনেছেন। ওঁরা জানতে চাইছেন আরও কিছু জানার আছে কিনা। একটা কোনও ঘটনা ঘটে গেলেই মানুষেব কৌতূহল তার ওপব ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাকে যতক্ষণ না একটা রহস্য বানিয়ে তুলতে পারছে ততক্ষণ শান্তি নেই। মানুষটাকে, দুঃখী মানুষটাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচার করতে হবে। এক একজন তার এক একটা মূর্তি গড়ে তুলবে। তার আসল চেহাবাটা কেউ দেখতে চাইবে না।

শান্তা হাসি হাসি মুখে বললে, আপনি তো বলবেন, নিখিলেশ ভাল, কববীও ভাল! তা হলে এমন একটা ঘটনা ঘটল কি কবে!

বনশ্রী বললে, আমি নিখিলেশবাবুর কথা একটুও বিশ্বাস করি না। অঞ্জলিদি কি বলেছেন শুনেছেন? উনি তো করবীদির অত বন্ধু।

ধূর্জটিপ্রসাদ সত্যি এই রহস্যেব কোনও কিনাবা খুঁজে পান না। অঞ্জলিব স্বামীও ওঁকে বলেছিল। বলেছিল, এমন একটা ঘটনা অথচ নিখিলেশবাবুকে দেখে মনেই হয়নি উনি এতটুকু বিচলিত। বেশ শান্তভাবেই এসে কথাবার্তা বললেন, এমন কি হাসাহাসিও করেছিলেন। আর ধূর্জটিবাবু, আপনি বলছেন....

নিজের মনেই কি যেন ভাবলেন ধূর্জটিপ্রসাদ, তারপর ধীবে ধীবে বললেন, লাহিড়ী, কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে জানা বড় কঠিন। আমরা মানুষের এক একটা ইমেজ দেখতে পাই, প্রকৃত মানুষটাকে তো দেখতে পাই না।

ধূর্জটিপ্রসাদ বলতে শুরু করলে আব থামেন না। সে-সব কথায় কারও কোনও আগ্রহ আছে কিনা তাও দেখেন না।

শান্তা উঠে গেল। বললে, চা আনি আপনাব।

বনশ্রীও উঠে গেল। আসলে এ-সব কথা ওদেব কাছে দুর্বোধ্য, এ-সব কথায় ওদেব কোনও আগ্রহ নেই।

বিজয়বাবুকেই একমাত্র শ্রোতা পেয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ তখনও বলে চলেছেন।—জানো লাহিড়ী, এক একটা মানুষের এক একটা ইমেজ তৈরি হয়ে যায়, আমরা সেটাকেই গোটা মানুষ ভেবে বসি। সেটাকেই সত্যি ভাবি। আসলে একটা মানুষ আমার সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করে, আমি ভাবি লোকটা ভাল। আর একজনেব সঙ্গে অন্য একটা সম্পর্ক। সে ভাবে লোকটা খারাপ।

তনুশ্রী, ছোট মেয়ে বোধ হয় ওঁর কথা শুনছিল না। সে ঘরের কোণে একটা চেয়ারে পা তুলে বসে একটা ছবির পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিল। মেজ মেয়ে মঞ্জুশ্রী ট্যানজিস্টার রেডিও খুব মিহি সুরে বাজিয়ে একা একা গান শুনছিল।

কথাগুলো বোধ হয় অস্পষ্ট ভাবেই কানে গিয়েছিল তনুশ্রীব।

ও হঠাৎ হাসতে হাসতে বললে, মানে একটা লোকেব বাঁ দিকটা ভাল আর ডান দিকটা খারাপ, এই তো!

সবাই হেসে উঠল। ধূর্জটিপ্রসাদ বলে উঠলেন, না, না, তা বলছি না।

বিজয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, মাই ডিয়ার গার্লস, তোমাদের কোনও চিন্তা নেই, কিছু কিছু একসেপশন আছে। যেমন কল্যাণসুন্দর। তার সব ভাল।

মঞ্জুশ্রী শব্দ করে হেসে উঠল। তনুশ্রী হাসল, কিন্তু ঠোঁট ফোলানোর ভান করে।

ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে এখন আর কিছুই অস্পষ্ট নয়। কিন্তু তনুশ্রীর জন্যে ওঁর ভয় করে। মায়া হয়। ও যেন ভুল না করে বসে।

ওঁর ইচ্ছে হয় ছোট্ট একটা চারাগাছের মত ওকে বেড়া দিয়ে আগলে আগলে রাখেন। ওর জন্যে একটা সুখী জীবন গড়ে দিতে পারলে যেন ওঁর সবচেয়ে বড় সুখ। সেই ছোট্টটি থেকে ওকে দেখে আসছেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ তাকালেন ওর দিকে। আর তনুশ্রী ওর পায়ের, গোড়ালির কাছের শ্বেতির দাগটা শাড়িতে ঢাকল। ঐ দাগটা চোখে পড়লেই ওর জন্যে আরও কষ্ট হয়। উনি জানেন, ঐ একটা ছোট্ট দাগ ওকে ভিতরে ভিতরে খুব ছোট করে রেখে দিয়েছে।

তনুশ্রীর জন্যেই তো পরিবারটার ওপর এত মায়া।

বিজয়বাবুর আপিসে যখন বদলি হয়ে এলেন, তখন বিজয়বাবুর সদাহাস্য এই ফূর্তির চেহারাটা ওঁকে কাছে টেনেছিল। ভাল লেগেছিল। তা থেকে নিবিড় বন্ধুত্ব। একেবারে আপনি থেকে তুমি।

একদিন বিজয়বাবু ওঁকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন সটান আপিস থেকেই।

তিন মেয়েই তখন ছোট।

বিজয়বাবুর স্ত্রী শান্তা দু হাত জোড় করে নমস্কার করেছিল। বাড়িটা দিব্যি ছিমছাম সাজানো। শান্তাকেও একটু সাজানো সাজানো লেগেছিল।

ছোট মেয়ে তনুশ্রী তখন ফ্রক পরে। এসেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। আর ছোট্ট মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

তনুশ্রীর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে জিগ্যেস করলেন, কোন্ ক্লাশে পড়ো?

শান্তাকে দেখে মনে হয়েছিল যেন বয়েস ধরে রেখেছে। ঠোঁটে মাপা হাসি। শান্ত কণ্ঠে সে-ই উত্তর দিল। বললে, ক্লাস ফোবে, সবে তো ন বছর।

—ন বছর। কথাটা খট করে কানে লেগেছিল।

ধূর্জটিপ্রসাদ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। মনে মনে কি যেন হিসেব করেছিলেন।

আর তখনই চোখ পড়েছিল ধূর্জটিপ্রসাদের। পায়ের গোড়ালিতে দু আঙুলের মত একটা শ্বেতির দাগ।

বিজয়বাবু বলে উঠেছিলেন, ওর গোড়ালির কাছে····

তনুশ্রী তখন কিছুই বুঝত না, তবু ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

আর ধূর্জটিপ্রসাদেব কেমন একটা কষ্ট হয়েছিল। সেদিন থেকেই তনুশ্রীর জন্যে ওঁর এত মায়া। এত ভয়-ভয়।

বিজয়বাবু কিন্তু দুঃখ গায়ে মাখেন না। কল্যাণসুন্দরকে নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে রসিকতা করতেও ওঁর বাধে না। এভাবেই তনুশ্রীকে কল্যাণসুন্দরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে না তো। ধূর্জটিপ্রসাদের বড়ো ভয়-ভয় করে, অথচ কিছু বলতেও পারেন না। ওরা এসব দিকে প্রচণ্ড আধুনিক। এই আধুনিকতা ওঁর কাছে বড়ো অচেনা অচেনা লাগে।

মঞ্জুশ্রী রেডিওতে মিহি সুরের গান শুনতে শুনতে বলে উঠল, কি রে, গল্প হয়ে যাচ্ছিস না তো।

বিজয়বাবু হেসে উঠলেন। মঞ্জুশ্রী যে ছেলেটিকে পছন্দ করেছে, সে এখন বিলেতে। মাঝে মাঝে চিঠি লেখে ও। বিজয়বাবু একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন, বানান-টানান ভুল করিস না যেন। ধূর্জটিপ্রসাদের সামনেই বলেছিলেন।

তনুশ্রীর গল্প হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও শুনেছেন।

এখানে আসার সময় মঞ্জুশ্রী নাকি বলেছিল, দু-একটা গল্পের বইটই নে।

আর তনুশ্রী দু-কোমরে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল, আমি নিজেই এবার গল্প হয়ে যাব।

সেই কথাটাই মঞ্জুশ্রী শোনাল।

বিজয়বাবু তাই হাসতে হাসতে বললেন, আমি তো বলেছি তাই হয়ে যা, আমাকে কন্যাদায় থেকে মুক্তি দে।

যেন বিজয়বাবু সংসার নিয়ে কিছু ভাবেন, মেয়েদের জন্যে কোনও দুশ্চিন্তা আছে।

চা খেয়ে গল্পগুজব করে ধূর্জটিপ্রসাদ যখন বেরিয়ে এলেন তখনও ওঁর মাথার মধ্যে কথাগুলো ঘুরছে। তনুশ্রীর জন্যে একটা ভয়-ভয়। আমার মেয়ে হলে আমি তো ওকে অন্যভাবে মানুষ করতাম। মেয়েটা ওঁর বুকের মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। অথচ ওঁর কোনও অধিকার নেই। শুধু চোখ মেলে দেখতে হবে, হয়তো কষ্ট পেতে হবে।

কল্যাণসুন্দর নামটা প্রথম শুনেছিলেন বোধহয় করবীব কাছেই। করবী আর নিখিলেশ।

মন্দিরের সামনে একদিন দোকানে দোকানে ঘুরছিলেন ভাল পটের ছবি কিনবেন বলে। টুকিটাকি জিনিসপত্র, পাথরের মূর্তি কেনার জন্যে ভিড় লেগেই থাকে এদিকটায়।

হঠাৎ একটা দোকানে নিখিলেশ আর কববীর সঙ্গে দেখা। অরুণেন্দুরাও ছিল। অরুণেন্দুর স্ত্রী আর মালা।

করবী বলে উঠল, দেখেছেন আপনি ? ইস, আমি দেখতে পেলাম না।

আর মালা বেশ গর্বিত ভাবে বললে, আমরা দেখেছি, এই তো একটু আগে।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ।—কাকে দেখেছো ? কি ?

মালা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠেছে, কল্যাণসুন্দর, কল্যাণসুন্দর।

—বাঃ, বেশ নাম তো। সিনেমার হিরো বুঝি।

সবাই তখন হেসে উঠেছে। হেসে ওঠাবই কথা। উনি তো কোনও কিছু খবর বাখেন না। ধূর্জটিপ্রসাদ বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, মালার চোখে উনি অনেক ছোট হয়ে গিয়েছিলেন। হেসে উঠে মালা বলেছে, সে কি, এই এত এত বই পড়েন ·

ধূর্জটিপ্রসাদ ভেবেছিলেন, আমরা সবাই তো ছোট ছোট জগৎ তৈরি করে নিযে তার মধ্যে বাস করি। একে অপরের জগৎটাকে মূল্যহীন ভাবি।

সেদিনই প্রথম উনি পরিচয় পেয়েছিলেন কল্যাণসুন্দরেব। হোটেলে ফেরার পথে নিজের মনেই বলেছিলেন, আমি ব্যাকডেটেড হয়ে যাচ্ছি, পৃথিবী দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে আর আমি পিছিয়ে পড়ছি।

বিজয়বাবুকে একদিন বলেছিলেন, ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছিলেন, আমাদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে কিছুই মেলাতে পারছি না, লাহিড়ী। যেখানেই যাও সব জায়গাতেই এক একটা নতুন নাম। আমাদের কাছে যারা বড় হয়ে আছে, এ যুগের কাছে তাদের কোনও দামই নেই।

বিজয়বাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন, সময়ের সঙ্গে চলতে হবে তো !

বিজয়বাবু সময়ের সঙ্গে চলেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদের তো সন্দেহ, লাহিড়ী সময়ের আগে আগে চলেছে।

তাই ঠাট্টা করে বলেছিলেন, তুমি তো দিব্যি সময়ের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারো। এবার গোঁফজোড়া বিদেয় দিয়ে একটা চক্করবক্কর শার্ট পরে নাও।

থার্ড ব্র্যাকেটের মত পুরুস্টু সাদা গোঁফজোড়া আঙুলে আঁচড়াতে আঁচড়াতে বিজয়বাবু বলেছিলেন, পারলে তো ভালই ছিল। তবে কি জানো ধূর্জটি, ভেতরের মানুষটা পিছিয়ে না পড়লেই হল।

কল্যাণসুন্দর, কল্যাণসুন্দর। মুখে মুখে নামটা ছড়িয়ে পড়ছিল।

হোটেলের একটি ছোকরা বোর্ডার তো একদিন ওঁকেই জিগ্যেস করে বসল, কল্যাণসুন্দর

কোথায় উঠেছেন জানেন ?

এই সমুদ্র সূর্যোদয় আকাশের চেয়ে ওটাই যেন দর্শনীয় বস্তু।

ধূর্জটিপ্রসাদ মনে মনে হাসেন। নাকি ওঁর নিজেরই ভুল। এই অনন্ত সমুদ্র, ঢেউয়ের পর ঢেউ। নীল সমুদ্র কখনও আলোর খেলায় বদলে গিয়ে শ্যাওলা সবুজ হয়ে যায়। দূরে দূরে নুলিয়াদের নৌকো।

অনেকেই তো আসে। কিন্তু প্রকৃতির দিকে না তাকিয়ে কেউ. ঝিনুক কুড়োয়, কেউ মন্দিরের দিকে ছোটে, কারও কাছে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায় কল্যাণসুন্দর।

সবাই বোধ হয় এক একটা ধারণা নিয়ে বেঁচে থাকে, আসল সত্যটা কেউ জানতে চায় না। আসল সত্যটাকে কেউ ভালবাসে না। ধূর্জটিপ্রসাদ তো চোখের সামনে দেখেছেন সবাই একটু একটু করে কিভাবে কল্যাণসুন্দরের একটা মূর্তি গড়ে তুলছে। একটা ইমেজ।

নিখিলেশ আর করবী সম্পর্কেও তো উনি একটা ধারণা গড়ে নিয়েছিলেন। কেউ কিছু বললে তাই অসহ্য লাগে।

একদিন ওরা ধূর্জটিপ্রসাদকে জোর করে মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল।

করবী অনুনয় করেছিল, চলুন না বাবা, আপনি তো কত কি পড়েছেন, কত কি জানেন, বুঝিয়ে দেবেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ হেসে বলেছিলেন, একটা বিনা পয়সার গাইড চাও ?

নিখিলেশ হাসতে হাসতে বলেছিল, ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড ; আপনি তো আমাদের সবই। কি বলো করবী।

মৃদু হাসি ছিটোনো করবীর চোখ দুটো যেন ধূর্জটিপ্রসাদ দেখতে পাচ্ছেন এখনও। স্পষ্ট।

নিখিলেশের উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার দিকে এখন তাকাতে কষ্ট হয়।

সেদিন মন্দিরে গিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছিলেন, দেবতার মূর্তি এমনি অসম্পূর্ণ থাকাই ভাল। ওটা পুরোপুরি মূর্তি হয়ে গেলে তখন আর দেবতা থাকে না, সেও একটা মানুষ হয়ে যায়। তার একটা ছকে বাঁধা ইমেজ গড়ে ওঠে আমাদের মনে।

নিখিলেশ আর করবী সম্পর্কেও তো দুদিনের পবিচয়েই একটা ধারণা গড়ে নিয়েছেন ধূর্জটিপ্রসাদ। সেটাকে কেউ ভাঙতে পারছে না।

নিখিলেশ তখন একটা ধসে পড়া মানুষ।

মুনলাইটের ম্যানেজারবাবু বললেন, থানায় একটা খবর তো দিতেই হবে। নিজের দায়িত্ব স্খালনের জন্যে সকাল হতে না হতে চলে গিয়েছিলেন নিখিলেশকে সঙ্গে নিয়ে।

তারপর আরেকদিন। নিখিলেশ যেন নিজেব পায়ে দাঁড়াতে পারছে না।

বললে, আপনি যাবেন একবার আমার সঙ্গে। একা ভরসা পাচ্ছি না, কি জানি কি খবর শুনব।

ও সি দিকপতি ধূর্জটিপ্রসাদকে দেখে বলেছিলেন, নুলিয়াদের একটা সার্চ পার্টি পাঠিয়েছি, মানে যদি সত্যিই তেমন কিছু....

নিখিলেশ প্রায় কেঁদে উঠেছিল।—না, না, মৃত্যুর কথা আমি ভাবতেই পাবছি না।

আর ও সি দিকপতি কেমন কঠিনভাবে বলেছিল, আমার মনে হচ্ছে নিখিলেশবাবু, আপনি সব কথা ভেঙে বলছেন না।

নিখিলেশের সেই বিভ্রান্ত অপমানিত মুখের দিকে তাকিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ ও সি দিকপতির ওপরই চটে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, এদের মনে একটুও মায়াদয়া নেই, মানবতা নেই। একটা অঘটনকেও এরা জটিল করে তুলতে চায়।

একটা দুঃখী মানুষ, বুকের মধ্যে হাহাকার, অথচ সবাই তাকেই সন্দেহ করছে। তারই

নামে অপবাদ দিচ্ছে।

মুহূর্তে মুহূর্তে রঙ পাল্টে যাচ্ছে একটা মানুষেব। কোনও মানুষকেই কখনও চেনা যায় না। একটা কথা, কিংবা একটা ঘটনায় মানুষেব রূপ বদলে যায়। আসল মানুষটাকে কোনও সময়েই ধরা যায় না।

ও সি দিকপতির কথাটা কি ধূর্জটিপ্রসাদেব মনেও একটা সন্দেহ ঢুকিযে দিতে চেয়েছিল!

ওরা এখানে আসার দিন কয়েক পরেই হয়তো।

নিখিলেশকে একদিন একা-একা সমুদ্রের ধাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উনি জিগ্যেস করেছিলেন, কি ব্যাপার, একা কেন নিখিলেশ? বেশ রসিকতার সুরেই বলেছিলেন।

নিখিলেশ উত্তর দেয়নি, শুধু হেসেছিল।

এখন মনে হচ্ছে হাসিটা স্বাভাবিক ছিল না। নাকি এখন এত সব ঘটে যাওয়ার পব, কিংবা দিকপতির কথা শুনে ওঁর নিজেব মনেও খটকা লাগছে!

অথচ সেদিনই দুপুরে স্নান করতে আসার সময় ওরা দিব্যি হাসিখুশি ছিল।

সেদিনই কি উনি প্রথম কল্যাণসুন্দরকে দেখেন?

সেই সময়টাতেই সবচেয়ে বেশি ভিড হয়। আবেকটু দেরি হলেই বালি প্রচণ্ড তেতে ওঠে। রোদ্দুবের তেজ বাড়ে।

ধূর্জটিপ্রসাদ তখনো জলে নামেননি। একটু পরেহ নামবেন ভেবে, কিংবা বিজয়বাবু এসে পড়েন কি না সেই অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন দূরের ব্রেকার্সেব দিকে তাকিয়ে। এই স্নানের সময় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উনি এক একদিন বড়ো অন্যমনস্ক হয়ে যান।

একজন অত্যন্ত স্থূল চেহারাব মহিলা নুলিযাব হাত ধরে ফুটবলের মত গডিয়ে যাচ্ছিল, তা দেখে পাড়ে দাঁড়ানো লোকরা হেসে উঠল।

হাসির শব্দে পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলেন নিখিলেশ আর করবী। করবী বুকেব ওপর একটা গোলাপী টার্কিশ তোয়ালে মেলে রেখেছে। নুলিয়াটা আসছে পিছনে পিছনে।

নিখিলেশ করবীর দিকে তাকিয়ে বললে, চলো চলো, নুলিয়া তো আছে, কোনও ভয় নেই।

করবী হেসে উঠল।—নুলিয়া কি ভগবান?

নিখিলেশ বললে, আমি তো আছি।

—কি বীরপুরুষ! কৌতুকের চোখে নিখিলেশেব দিকে তাকাল কববী। তারপর বললে, আগে যাও তো তুমি।

নিখিলেশ তাকাল ধূর্জটিপ্রসাদের দিকে, তারপর একাই জলের দিকে এগিযে গেল। মুখ দেখে বোঝা গেল করবী না যাওয়ায় ও খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছে।

একটু পরেই উনি লক্ষ করলেন, সমুদ্রের ঢেউয়ের ভিতর থেকে যুবক চেহারার একজন হাতছানি দিয়ে কাকে যেন ডাকছে, চিৎকার করে কি যেন বলছে।

উনি প্রথমটা বুঝতে পারেননি।

হঠাৎ দেখলেন, করবী হাত নেড়ে ইশারায় বলছে, যাবে না। হাত নেড়ে অসম্মতি জানাবার সময় কৌতুকে হাসছিল ও।

আর সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে পাড়ের দিকে এগিয়ে এল সে, সারা শরীর থেকে জল ঝরে পড়ছে, দৌড়তে দৌড়তে এসে করবীর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

আর, না না বলতে বলতে হাসতে হাসতেই তার সঙ্গে এগিয়ে গেল করবী।

ধূর্জটিপ্রসাদ ভেবেছিলেন হোটেল মুনলাইটের কোনও বোর্ডার।

ধূর্জটিপ্রসাদ দেখতে পেলেন করবী তার হাত ধরে ঢেউয়ের পর ঢেউ পার হচ্ছে। হাসছে, অবিরত হাসছে। চিৎকার করে করবী কি যেন বলছে নিখিলেশকে, নিখিলেশ কাছে যাবার চেষ্টা করছে।

বিজয়বাবুদের জন্যেই হয়তো অপেক্ষা করেছিলেন উনি। এ সময়টায় প্রতিদিনই আসেন ওঁরা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজয়বাবু সপরিবারে এসে হাজির হলেন।

বিজয়বাবু বললেন, চলো ধূর্জটি, উই আর স্টিল ইয়াং।

এখন আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। বিজয়বাবুর স্ত্রী শান্তাও জলের দিকে এগিয়ে গেল। তিন মেয়েও। বনশ্রী, মঞ্জুশ্রী, তনুশ্রী।

ধূর্জটিপ্রসাদ হাসতে হাসতে বললেন, চলো লাহিড়ী, তাই চলো। তা না হলে ওরা ভাববে আমরা বুড়ো হয়ে গেছি।

হঠাৎ চোখ পড়ল তনুশ্রীর দিকে। তনুশ্রীকেই যেন খুঁজছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন সেই অচেনা ছেলেটি তনুশ্রীকে ডাকছে, আর তনুশ্রী যেন শুনতেই পাচ্ছে না। তনুশ্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে ওঁর কেমন খটকা লাগল। অভিমান কি ?

পরপর কয়েকটা বড় বড় ঢেউ এসে পড়ল, ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেকে সামলাতেই ব্যস্ত ছিলেন। এখন আর সেই যৌবন নেই, উনি বেশি দূর যান না। তবু বালিতে মাখামাখি হয়ে গেলেন, একটা ঢেউ এসে ওঁকে প্রায় পাড়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে।

একটু বুঝি অন্যমনস্ক হয়েছিলেন। দেখলেন, তনুশ্রী অনেক দূবে চলে গেছে। বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেঁপে উঠল ওঁর। লক্ষ করতেই দেখলেন, সেই ছেলেটির সঙ্গে তালে তালে একটা ব্রেকার্স পার হচ্ছে তনুশ্রী। ওর সমস্ত শরীরটা যেন হাসছে। এখন আর ওর মুখে কোনও অভিমান নেই।

ধূর্জটিপ্রসাদ তনুশ্রীকে অনেক দূরে এগিয়ে যেতে দেখে ভয় পেলেন, চিৎকার করে ডাকলেন, তনু, ফিরে এসো, আর যেও না। বিব্রতভাবে বিজয়বাবুকে বললেন, ডাকো, লাহিড়ী ডাকো, বড্ড দূরে চলে যাচ্ছে।

বিজয়বাবু কাছেই ছিলেন, শুনতে পেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, তুমি বড্ড ভীতু ধূর্জটি। ওদের তো এখন দূরে যাওয়ারই বয়েস।

ধূর্জটিপ্রসাদ আর কোনও কথা বললেন না। তুমি বড্ড ভীতু ধূর্জটি। সত্যি হয়তো তাই। তনুশ্রীর জন্যে এতখানি উদ্বেগ দেখিয়ে নিজেই লজ্জিত হয়ে পডলেন।

জলের মধ্যে হুটোপুটি লুটোপুটি শেষ করে একসময় সকলেই একে একে উঠে এল।

কাপড় বদলে ভিজে কাপড়টা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

—থাকো না তুমি যতক্ষণ ইচ্ছে, আমি কি বারণ করেছি।

কথাটা শুনেই ফিরে তাকালেন ধূর্জটিপ্রসাদ, দেখলেন নিখিলেশ বেশ রাগ রাগ গলায় বলল করবীকে। আর করবী নিঃশব্দে ওর পিছনে পিছনে হেঁটে গেল।

নিখিলেশের এই গম্ভীর মুখ কোনওদিন দেখেননি।

একে একে সবাই উঠে এল। সব শেষে তনুশ্রী আর সেই উচ্ছল ছেলেটি।

তনুশ্রী এগিয়ে এসে ধূর্জটিপ্রসাদকে বললে, চেনেন এঁকে ?

ধূর্জটিপ্রসাদ ঘাড় নাড়লেন।

আর তনুশ্রী উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, কল্যাণসুন্দর। ইনিই।

সেই প্রথম তাকে দেখলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। একটু আগে এ-ই তো করবীকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। একে নিয়েই এ কদিন এত আলোড়ন, এত উচ্ছ্বাস। অবাক হয়ে দেখলেন ধূর্জটিপ্রসাদ, এই মানুষটাই ছুটির ঘণ্টা বাজানো এই সমুদ্রতটে যেন একটা ঝড়ের মত

এগিয়ে আসছে। উনি মনে মনে বললেন, ঝড় উঠছে, ঝড়।

কল্যাণসুন্দর সপ্রতিভভাবে হাত জোড় করে নমস্কার করল। হাসতে হাসতে বললে, যাব একদিন আপনার হোটেলে। আমি তো শুনে থেকেই আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে ব্যগ্র। তারপর তনুশ্রীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে মৃদু হেসে বললে, তনুশ্রী কিন্তু আপনাকে দারুণ শ্রদ্ধা করে। ভালও বাসে। একটু থেমে বললে, আপনার কথা শুনে শুনে আমিও।

তনুশ্রী লজ্জা পেল।

কিন্তু সে-সব দিকে চোখ দেবার সময় ছিল না। ধূর্জটিপ্রসাদের সমস্ত বুক ভরে উঠেছে আনন্দে। তনুশ্রী কিন্তু আপনাকে দারুণ শ্রদ্ধা করে, ভালও বাসে। ধূর্জটিপ্রসাদ অভিভূত হয়ে গেলেন।

খুশি হয়েই কল্যাণসুন্দরকে বললেন, আপনি তো প্রচণ্ড বিখ্যাত মানুষ, হাজার হাজার মানুষকে আনন্দ দিতে পারেন, কিংবা দুঃখে সান্ত্বনা....

কল্যাণসুন্দর হেসে উঠে ঝট করে বললে, তুমি বলুন.।

বাধা পেলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। একটু থেমে বললেন, কল্যাণসুন্দর, বড়ো সুন্দর নাম। কিন্তু অর্থ জানো এর ? তনুশ্রীর দিকে তাকালেন, জানো তুমি ?

—যা কল্যাণ তাই সুন্দর। তাই না ? বনশ্রী পাশ থেকে বলে উঠল।

ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন, তাও বলতে পারো।

তারপর কল্যাণসুন্দরের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি জানো না ? তোমারই তো নাম। কল্যাণসুন্দর মানে শিব, শিবের একটা বিশেষ ভঙ্গির নাম। একটা বিশেষ মূর্তি। দেবতাদেরও তো নানারকম ইমেজ থাকে, তার মধ্যে একটা।

বিজয়বাবু, তাঁর স্ত্রী শান্তা, মেয়েরা সবাই ঘন হয়ে এসে শুনছিল।

শ্রোতা পেলেই ধূর্জটিপ্রসাদের কোনও হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সমুদ্রে স্নান সেরে সকলে এই মাত্র উঠেছে। রোদের তেজ বাড়ছে, বালির তাপ বাড়ছে।

বিজয়বাবু ভিজে তোয়ালেটা মাথার ওপর রাখলেন, আর তনুশ্রীর চোখে বাবার ঐ কাণ্ডটা পছন্দ হল না, তোয়ালেটা কেড়ে নিল।

ধূর্জটিপ্রসাদ তখনো বলে চলেছেন, কল্যাণসুন্দর মূর্তি কাকে বলে জানো, শিব আর পার্বতীর বিয়ের দৃশ্যকে।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তনুশ্রীর মুখে লজ্জানত হাসি দেখতে পেলেন উনি।

কল্যাণসুন্দরের দীর্ঘ স্বাস্থ্যবান শরীর তখন হা হা করে হাসছে।

সে বলে উঠল, তাহলে নামটাকে আমি সার্থক করতে পারিনি।

মঞ্জুশ্রী তখনই তনুশ্রীকে একটা চিমটি কেটে বসেছে, ওঁর চোখে পড়তেই সে কপট-গাম্ভীর্য আনল মুখে।

একটু থমকে গিয়েছিলেন উনি, কিন্তু প্রসঙ্গ মনে পড়তেই আবার বললেন, শিব আর পার্বতী পাশাপাশি পাণিগ্রহণ করে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে হাত দিয়ে। এরই নাম কল্যাণসুন্দর মূর্তি।

কল্যাণসুন্দরের বোধ হয় এতক্ষণে মনে হল এই প্রখর রৌদ্রে আর দাঁড়ানো যায় না। বললে, যাব একদিন, আপনিই আসুন না।

ধূর্জটিপ্রসাদ তবু থামতে চাইলেন না। বললেন, শোন, শোন, আমাদের কল্যাণসুন্দর কিন্তু অন্য। বিয়ের সময় দেখেছো তো কনেকে সামনে নিয়ে বর দাঁড়ায়, ঠিক তেমনি শিবের সামনে পার্বতী দাঁড়িয়ে আছে, শিবের হাতে কর্ত্রী। হাসতে হাসতে বললেন, সেটাই এখন জাঁতি হয়ে গেছে।

—ওমা তাই নাকি ! বিজয়বাবুর স্ত্রী শান্তা হাসল।

ধূর্জটিপ্রসাদ হাসতে হাসতে বললেন, হ্যাঁ, যেমন কনের হাতের মুকুর, মানে আয়না, এখন হয়ে গেছে কাজললতা।

শান্তা মৃদু হেসে বললে, আপনি বিয়ের ব্যাপারে এত সব জানলেন কি করে ?

অর্থাৎ ধূর্জটিপ্রসাদ তো ব্যাচেলার মানুষ। কিন্তু কথাটা শুনলেই উনি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যান।

বিজয়বাবু ঠিক তখনই কল্যাণসুন্দরকে বলে উঠেছেন, তুমি তাহলে নামটাকে সার্থক করে নাও তাড়াতাড়ি।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। তনুশ্রী মুখ ঘুরিয়ে সমুদ্র কিংবা দূরের নৌকো, কিংবা কোনও নুলিয়ার দিকে তাকাল। ও হাসল না।

গুড বাই, গুড বাই, যাব একদিন ; আসছো তো। সবাই যে যার পথ নিল।

আর হোটেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ধূর্জটিপ্রসাদের মনে পড়ে যাচ্ছিল সেই কথাটা। শান্তার কথা। বিয়ের ব্যাপারে এত সব জানলেন কি করে ?

কথাটা মনে পড়তেই বুকের মধ্যে একটা শূন্যতা অনুভব করলেন।

বিজয়বাবুদের আপিসে যখন প্রথম বদলি হয়ে এলেন, সেদিন থেকে কি এই জন্যেই তাঁর ওপর বিজয়বাবুর স্ত্রী শান্তা এত অনুকম্পা দেখিয়েছিল !

যেদিন ঐ আপিসে বদলি হয়ে এলেন, পরের দিনই অফিস ক্লাবের কি একটা ফাংশন।

বিজয়বাবু বললেন, ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে আসবেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ একটু চুপ করে থেকে বললেন, নেই।

বিজয়বাবু একটু থমকে গিয়েছিলেন। আরও কে কে যেন ছিল, কে যেন বলে উঠল, ওটা দুঃখেব কিছু নয় ধূর্জটিবাবু, বেঁচে গেছেন, বেঁচে গেছেন। আমাদের যে কি হাল জানেন না তো।

সে বোধ হয় ধূর্জটিপ্রসাদকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল।

বিজয়বাবু বলেছিলেন, তাহলে স্ত্রীকেই নিয়ে আসবেন।

এবার ধূর্জটিপ্রসাদ হাসবার চেষ্টা করে বলেছিলেন, নেই।

আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই খুব হই চই করে উঠেছিল। বলেছিল, আরে আপনি তো মশাই সবচেয়ে সুখী মানুষ। দি হ্যাপিয়েস্ট ম্যান।

বিজয়বাবুর স্ত্রী শান্তার কথায় সেই দিনটা ওঁর মনে পড়ে গেল।

বিড়বিড় করে বললেন, দি হ্যাপিয়েস্ট ম্যান। নিশ্চয়ই, আমি তো সুখী। যখন বইয়ের পাতায় ডুবে যাই, কিংবা এই বিশাল সমুদ্রের, সূর্যোদয়ের কিংবা উষার আলোর সঙ্গে অনন্ত আকাশের সঙ্গে মিশে যাই, তখন তো আমি সত্যিই সুখী।

শুধু এক একজন আমাকে এক একবার দুঃখের স্পর্শ দিয়ে যায়। করবী। করবী আর নিখিলেশের জন্যেও ওঁর মনের মধ্যে একটা দুর্বোধ্য কষ্ট। একটা চাপা রহস্যের ঢাকনি খুলতে পারছেন না।

তনুশ্রীর জন্যেও বড়ো ভয়-ভয় করে। দু হাত বাড়িয়ে যার কাছেই এগিয়ে যান, স্নেহ কিংবা ভালবাসা উজাড় করে দিতে যান, তার জন্যেই দুঃখ পেতে হয়। ওঁর জীবনটাই বোধহয় এরকম। ভয় সেজন্যেই।

৪

সমুদ্রের ধারে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আমরা ফিরে এলাম। আমরা সেদিনই সারা রাত ট্রেন জার্নি করে এসেছি। অথচ একটুও ক্লান্তি লাগছিল না। বোধহয় একঘেয়ে জীবন থেকে একটু ছুটি পেয়ে এই খোলা আকাশের নীচে দাঁড়াতে পেরেছি বলেই বেশ ভাল

লাগছিল।

করবী বললে, ওগুলো কি মাছরাঙা?

আমি বললাম, হয়তো সি-গাল। কিংবা শঙ্খচিল।

করবী খিলখিল করে হেসে উঠল।—তুমি শঙ্খচিলও চেনো না? সে কি ঐ রকম নাকি, খয়েরি রঙ হয়....

আমি তো সি-গাল চিনি না। শঙ্খচিলও চিনতাম না।

জেলেরা একটা জাল টেনে টেনে তুলছিল। প্রথমে বুঝতেই পারিনি ওটা জাল। শুধু একটা মোটা দড়ি টেনে আনছিল কয়েকজন নুলিয়া। আর চক্রাকারে এক রাশ পাখি উড়তে উড়তে মাঝে মাঝে ছোঁ মারছিল।

আমি বললাম, এবার চলো ফেরা যাক, সমুদ্র তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

আমরা হোটেলের ঘরে ফিরে এলাম।

আমি বোধহয় মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম। কিংবা আমার মুখে বোধহয় করবী ততখানি উৎফুল্ল ভাব দেখতে পাচ্ছিল না।

একবার খাটের পাশে চুপ করে এসে বসল। বললে, যাব একবার, অঞ্জুদের সঙ্গে দেখা করে আসব?

আমি বিরক্তির সঙ্গে বললাম, কি দরকার, পরে তো দেখা হবেই। তারপর কথাটা মনে পড়তেই আবার জিগ্যেস করলাম, তোমার এত বন্ধু, বিয়েতে বলোনি কেন?

ও হেসে উঠল। বললে, এখন কি আর মনে আছে। বোধহয় ও ছিল না, কিংবা আমার মনেই পড়েনি।

আমাব কিন্তু বিশ্বাস হল না। আসলে অঞ্জলির কথাগুলোয় আব ওর স্বামীর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল, কি একটা কথায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করেছিল, আমার একটুও ভাল লাগেনি। তার চেয়েও খারাপ লেগেছিল করবীর কথাটা।

ও বলেছিল, অঞ্জলির স্বামী, জানো, খুব বড় অফিসার।

আমার মনে হল করবী যেন আমাকেই তাচ্ছিল্য দেখাল। যেন বোঝাতে চাইল আমি ওর স্বামীর তুলনায় কিচ্ছু না। নাকি এটা ওর এক ধরনের লোভ, ঐ সচ্ছলতার জন্যে? করবী কি জানে না, আমার বুকের মধ্যে একটা জ্বালা রয়েছে ওকে এতদিন এখানে নিয়ে আসতে পারিনি বলে। ও কি জানে না ওর জন্যেই আমি মা আর বোনদেব কাছে ছোট হয়ে গেছি। স্বার্থপরের মত তাদের ছেঁটে ফেলে দিয়ে এখানে এসেছি।

আর আমি তো করবীকে খুশি করার জন্যেই বেহিসেবীর মত এই মুনলাইট হোটেলে উঠেছি। এর চেয়ে সস্তার হোটেল তো অনেক ছিল। অথচ সামান্য একটা কথায় ও আমাকে বুঝিয়ে দিল আমি কতখানি মূল্যহীন।

কিন্তু তার চেয়েও একটা বড় সন্দেহ আমার মনে উঁকি দিল। অঞ্জলি তো ওর খুব বন্ধু। আসলে ওকে ও বিয়ের সময় হয়তো ইচ্ছে করেই বাদ দিয়েছিল। আমার মত একটা অত্যন্ত সাধারণ কেরানি লোককে বিয়ে করছে ও, একথাটা বলতে হয়তো সঙ্কোচ হয়েছিল।

এই যে এতদিন ধরে স্বপ্ন দেখেছি, শুধু আমরা দুজন এখানে বেড়াতে আসব, যেন সমস্ত সুখ এখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। অথচ এমন একটা মুক্তির আস্বাদ পেয়েও আমার কোনও আনন্দ হচ্ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলাম না, কে আমার আনন্দ কেড়ে নিয়েছে। মা বলেছিল, মায়াকে অন্তত সঙ্গে নিয়ে গেলে পারতিস। কথাটা আমার যতবার মনে পড়েছে ততবারই মার ওপর আমার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল।

এই একটা যন্ত্রণা আমার বুকের মধ্যে ছিলই। আপিস থেকে যে টাকাটা পেয়েছিলাম সেটা তো মার কাছ থেকে গোপন রেখেছি। করবী সেটা যত্ন করে এতদিন বাঁচিয়ে

রেখেছিল।

কিন্তু মা কি কিছুই বোঝেনি!

তবু করবীকে আমার বেশ ভাল লাগছিল। আমি বোধহয় ওকে নতুন করে আবিষ্কার করছিলাম। ওর এই স্বতঃস্ফূর্ত ভাব, এই উচ্ছল হাসি আনন্দ, এই মিশুকে স্বভাবটা যেন এতদিন চাপা পড়ে ছিল।

দুপুরে সদানন্দ এসে বললে, বাবু, খাবার কি ঘরে এনে দোব, না ডাইনিং হলে খাবেন?

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, ঘরেই এনে দাও, তার আগেই করবী বলে উঠল, না না, ডাইনিং হলে।

আমরা এসে বসলাম। অনেকগুলো চেয়ার-টেবিল খুব সুন্দর করে সাজানো ছিল। কেউ কেউ তখনই বসে পড়েছে।

আমাদের দেখতে পেয়ে অঞ্জলি আর তার স্বামী আমাদের টেবিলেই এসে বসল।

আমার ভিতরে কেমন যেন একটা অস্বস্তি হল। ভদ্রলোক দারুণ স্মার্ট, হাসতে হাসতে বললেন, আপনাদের ডিস্টার্ব করলাম না তো!

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, না, না। বসুন এখানেই।

তবু আমার একটা সঙ্কোচ হচ্ছিল। ভদ্রলোকের চেহারায়, পোশাক-পরিচ্ছদে, হাঁটাচলা-কথাবার্তায় এমন কিছু ছিল যার সামনে আমার অস্বস্তি হওয়াই স্বাভাবিক।

আমি ওঁর কোনও পরিচয় জিগ্যেস করলাম না। চাকরিবাকরির কথাও না।

আমার ভয় ছিল, তা হলেই উনি আমার কথাও জিগ্যেস করে বসবেন।

আমরা একই হোটেলে উঠেছি। একজন বাধ্য হয়ে, আর আমি বেহিসেবীর মত। সেজন্যেই আমি কোনও ব্যক্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

খাবার দিয়ে গেছে তখন। খেতে গিয়েও আমার বাধো বাধো ঠেকছিল। এই সব হোটেল-টোটেলের আদব-কায়দা তো ঠিক ঠিক জানি না। আগের বার এসে যে হোটেলে উঠেছিলাম সেখানে নেহাতই দিশি ব্যাপার।

আমি অঞ্জলির স্বামীর দিকে দৃষ্টি রেখে তাকে প্রায় নকল করে চলছিলাম।

সে হঠাৎ বলে উঠল, সত্যি এখানে খাওয়া যায় না। প্লেটের দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে শ্রাগ করল, এটা ফুড না ফডার?

অঞ্জলি সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠে বললে, বাথরুমটাও কি বিচ্ছিরি দেখেছিস করবী।

করবী দিব্যি খেতে খেতে হেসে বললে, খিদে থাকলেই খাওয়া যায়, আমার তো কিছু খারাপ লাগছে না।

মুহূর্তের মধ্যে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করলাম। এদের সামনে করবীকে কিছু না বলে বসি। কিন্তু করবী কি ঐ কথাগুলো না বললেই পারত না। আমার মনে হল করবী যেন উঠে পড়ে লেগেছে আমাকে ছোট করার জন্যে।

সারাক্ষণ আমি আর একটিও কথা বললাম না।

করবী কিন্তু বেশ হেসে হেসে কথা বলছিল অঞ্জলির স্বামীর সঙ্গে। অঞ্জলিকেও ঠাট্টা করে বললে, বাড়ি থেকে বাথরুমটা সঙ্গে করে নিয়ে এলেই তো পারতিস।

আর সেই সময়েই অঞ্জলি মাথা ঝাঁকিয়ে ওর বব ছাঁট ঘন চুল ঘাড়ের ওপর সুবিন্যস্ত করে বললে, হ্যাঁ রে, কল্যাণসুন্দরের বাড়ি যাবি আজ? স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, তোমার আপত্তি নেই তো।

করবী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ যাব, কোথায় উঠেছেন কোথায়?

ও এমনভাবে বলে বসল, যেন আমার মতামতের কোনও দামই নেই। অথচ অঞ্জলি তো ওর স্বামীর আপত্তি আছে কিনা জেনে নিল। অবশ্য ওটা ঠিক মতামত জানার জন্যে

কিনা বোঝা গেল না। গলার স্বরে তো মনে হল ওটা রসিকতা।

খাওয়াদাওয়ার পর ওরা তেতলায় উঠে গেল। অঞ্জলি যাবার সময় বললে, আয় না আমাদের ঘরে, কতকাল গল্প করিনি।

করবী বললে, যাব যাব ; তখন আবার হিংসে করিস না যেন। বলে অঞ্জলির স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসল।

অঞ্জলির স্বামী হেসে উঠলেন। আমাকেও হাসতে হল।

আমি যে করবীকে চিনি সে এই সব রসিকতা কখনও করত না। অবশ্য তার সুযোগও কম ছিল। বাড়িতে তো আমরা কথাবার্তাই বলতাম চাপা চাপা গলায়। ঐ টুকুন দুখানা ঘরের ছোট্ট পরিধিতে শব্দ করে হাসতেও লজ্জা করত ওর। হয়তো আমারও। মা কি ভাববে।

ট্রেনে ওঠার পর থেকেই ওকে আমার নতুন লাগছিল। ও যেন ছাড়া পাওয়া পাখির মত আনন্দে অধীর হয়ে উঠছিল। ওর অনর্গল হাসি, অবিরাম কথা, ওর মিশুকে ব্যবহার দেখে তখন মনে মনে গর্ব অনুভব করেছি।

কিন্তু অঞ্জলির স্বামীকে নিয়ে এই রঙ্গরসিকতা আমার ভাল লাগল না। অঞ্জলিদের ঘরে গিয়ে গল্পগুজব করার কথায় ও সঙ্গে সঙ্গে বলে বসল, যাব যাব। কিন্তু করবী তো স্বচ্ছন্দে বলতে পারত, তুই বরং আমাদের ঘরে আয় না।

ব্যাপারটা এমনই যে কথাগুলো করবীকে মুখ ফুটে বলাও যায় না। তা হলেই আমি ওর কাছে ছোট হয়ে যাব। হয়তো বলে বসবে. এত খারাপ তুমি, এত খারাপ মন তোমার।

সে জন্যেই আমি এমন ভাব করে রইলাম যেন আমি কিচ্ছু মনে করিনি।

কিন্তু অঞ্জলির জন্যে আমার চোখে ঘোর লাগছিল। ওর পোশাক পরিচ্ছদ, হাঁটাচলা, কথাবার্তায় একটা অসাধারণ চটক আছে। ওর উন্মুক্ত মসৃণ কাঁধে আমার কয়েকবারই চোখ পড়ছিল।

আমরা তো এখানে আসার স্বপ্ন দেখতাম পরস্পরের আরও কাছে আসতে পারব বলেই। কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছিল আমরা পরস্পর থেকে দূরেই সরে যাচ্ছি।

ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করেই করবী হাসতে হাসতে বললে, অঞ্জলিটা একটুও বদলায়নি, কেবল বড় বড় কথা। ওর বাপের বাড়ির বাথরুম আমি যেন দেখিনি।

আমি স্বাভাবিক হবার জন্যে বললাম, হোটেলের রান্না কিন্তু সত্যি খারাপ।

করবী হেসে ফেলে বলল, যা বলেছ।

আমি করবীর মুখের দিকে তাকালাম। আমার মন হাল্কা হয়ে গেল। না, তা হলে আমি করবীকে ভুল করছিলাম। আমার ভীষণ ভাল লাগল করবীকে।

আমি তখন খাটের বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি। সেখান থেকেই ডাকলাম, এই।

ও ফিরে তাকাল।

আমি ইশারায় বিছানার পাশটা দেখালাম, অর্থাৎ কাছে এসে বসো।

করবী বলে উঠল, ইস, আমি বলে এখন সমুদ্র দেখব।

বলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

সমুদ্র বোধ হয় ওর মধ্যে একটা নেশা এনে দিয়েছিল। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, এই সমুদ্র, এই ঢেউয়ের পর ঢেউ, নীল আকাশ, এই অনন্ত মুক্তি যেন একটু একটু করে করবীকে বদলে দিচ্ছে।

আমাদের আপিসের বন্ধুরা একদিন এসেছিল বাড়িতে। ফাজলামি করে একদিন বললে, চলো, আজ বৌদির হাতে চা খেয়ে আসি। একজন আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়, পান চিবোতে চিবোতে বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো, বৌমার হাতের ফুলকো লুচি দু-চারখানা আর

আলুর দম।

ওরা এমনভাবে ধরল যে সঙ্গে করে না এনে উপায় নেই। অথচ জানি, আমার বিধবা মা আবার বড্ড গোঁড়া প্রকৃতির মানুষ। বৌকে ডেকে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া একেবারে পছন্দ করে না।

করবীকে ওদের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা মার কাছে কিভাবে পাড়ব খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আমি তাই ওদের এনে সামনের বারান্দায় বসিয়ে মাকে বললাম, আপিসের বন্ধুরা এসেছে। খাওয়াতে হবে।

মা হাসি মুখে বললে, বেশ তো, দিচ্ছি খাবারটাবার করে, বৌমা ততক্ষণ যাক না ওদের সঙ্গে গল্প করুক।

মানুষের চেহারা মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যায়। মনের মধ্যে মার একটা ছবি আঁকা ছিল, একটা কথায় ছবিটা বদলে গেল।

আমি করবীকে বলতে ও কেমন সঙ্কোচ বোধ করল। গিয়ে বসল, কথাও বলল, কিন্তু কেমন লজ্জা লজ্জা ভাব। গায়ের শাড়িটা কেবল গায়ে জড়াচ্ছিল। আর আমার খুব খারাপ লাগছিল ওর এই জড়তা।

অথচ এই সমুদ্রের কাছে এসে করবী যেন একেবাবে পাল্টে গেছে। আমার বেশ ভালই লাগছিল। শুধু এক এক সময় আমার মনে হচ্ছিল ও যেন একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছে, সেটুকুই আমার ভাল লাগছিল না।

দুপুরে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি হোটেলের ঘরে। উঠলাম যখন, তখনও করবী ঘুমোচ্ছে। ও কখন এসে আমার পাশটিতে শুয়েছিল আমি টেরও পাইনি।

ওকে ঠেলে তুললাম। তখন বিকেল। রোদ পড়ে আসছে। বললাম, বেড়াতে যাবে না?

জলখাবার সেরে সাজগোজ করে করবীকে নিয়ে বেবিয়ে পডলাম। কোথায় আর যাবার আছে, সেই তো সি-বিচ।

একটু এদিক ওদিক পায়চারি করছি, করবী হঠাৎ উল্লসিত হয়ে বলে উঠল, এই, তারা। সেই ট্রেনের দলটা।

দেখলাম ওরা এদিকেই আসছে। চিনতে পারলাম। ঐ গোঁফওলা ভদ্রলোককেই তো করবী সারিডন বের করে দিয়েছিল।

আমার মনে হল যেন সমস্ত সি-বিচ আলো করে ওরা আসছে।

ভদ্রলোকের স্ত্রীর বয়স হয়েছে। তবু বেশ ছিমছাম সাজপোশাক। আর তিন তিনটি মেয়ে। ছোট মেয়েটিকে দেখে প্রথমটা চিনতে পারিনি। মেয়েটির পোশাক-আশাক এখন একেবারে অন্যরকম। রঙিন সুতোর চিকনের কাজ করা একটা পাঞ্জাবি 'পরেছে, শাড়ির বদলে প্যান্ট। ওগুলোকেই বোধহয় ফ্লেয়ার্স বলে। বাতাসে ওর মা আর দু বোনের শাড়ির আঁচল উড়ছিল পতপত করে। আর ছোট মেয়েটা পাঞ্জাবি পরেছিল বলে বাতাসে ওর শরীরের রেখা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

আমি বললাম, এই, ডেকে আলাপ করো না।

করবী মুখ বাঁকিয়ে বললে, কি দরকার। ওরা যদি চিনতে না চায়, আমিও কথা বলব না।

ওরা ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে। আমাদের দেখে হই হই করে উঠল।

ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন, কোথায় উঠেছেন?

বললাম, মুনলাইটে।

বলার সময় বেশ একটু গর্ব হল।

ওঁরা ওঁদের বাড়িটা কোথায় বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

সেই প্রথম বিজয়বাবুদের নামধাম জানলাম। ছোটটির নাম তনুশ্রী।

ও হাত-পা নেড়ে করবীকে কি সব বলছিল, বাতাস বইছিল জোরে, তাই কথাগুলো কানে আসছিল না।

হঠাৎ একটা কথা কানে এল। তনুশ্রী বলে উঠল, এই করবীদি, শুনেছেন....

বাঃ, বেশ মিশুকে তো মেয়েটা। নাম জানতে না জানতে করবীদি।

আমার বেশ মজা লাগছিল ওর ভাবভঙ্গি দেখে, ভালও লাগছিল।

তনুশ্রী বললে, শুনেছেন ? এখানে একজন ভি আই পি এসেছেন।

বলে আমার দিকেও হাসি হাসি মুখে তাকাল।

আমি হয়তো ওর সঙ্গে কথা বলার ছুতো খুঁজছিলাম। বললাম, কে ?

তনুশ্রী বললে, কল্যাণসুন্দর রায়।

আমি কিছু বলার আগেই করবী বলে উঠল, হ্যাঁ শুনেছি। হাসতে হাসতে বললে, একদিন গেলে হয়।

তনুশ্রী বললে, দেখেছি আমি। বলে দু আঙুলে এক চিমটে বোঝানোর মত করে বললে, একটুখানি আলাপ হয়েছে। এত ভাল না— ।

বিজয়বাবু হা হা করে হাসলেন, বোধহয় মেয়ের ছেলেমানুষি দেখে।

বিজয়বাবুর স্ত্রীর মুখে সেই অদ্ভুত মাপা হাসি। ট্রেনেও দেখেছি।

যাবার সময় বিজয়বাবু বললেন, আসুন না একদিন।

ঘাড় নাড়লাম। ওঁরা চলে গেলেন।

আমরা উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়াতে হল। একটা বাচ্চা ছেলে বালির ওপর আঙুলের টানে সুন্দর একটা ছবি এঁকেছে। নর্তকীর ছবি। আমরা দাঁড়িয়ে পড়ে দেখতে লাগলাম। তখন আরেকটা ছবি শুরু করেছে।

ওর ছবি আঁকা দেখতে দেখতে লক্ষ্যই করিনি কখন একটি ছোকরা, মানে ইয়াং ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে ছবি দেখার অছিলায়। একেবারে করবীর কাছাকাছি প্রায় গা ঘেঁসে, যেন সেও তন্ময় হয়ে ছবি আঁকা দেখছে।

বেশ বুঝতে পারলাম ইচ্ছে করেই করবীর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। অথচ ভদ্রতা এমন জিনিস, মুখ ফুটে বলার উপায় নেই, সরে দাঁড়ান মশাই। করবীর মাথায় কোনও বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। ও কি কিছু বুঝতে পারছে না ? সরে দাঁড়ালেই তো পারে।

আমি রেগে গিয়ে বললাম, চলো চলো, বেড়িয়ে আসি।

—দাঁড়াও না বাপু, একটু দেখি। করবী জবাব দিল।

আর সেই আমার বয়সী ছেলেটি হঠাৎ বললে, চর্চা করলে কিন্তু বড় আর্টিস্ট হবে।

করবী হেসে তার দিকে তাকাল। বললে, হ্যাঁ সত্যি।

আমার গা জ্বলে গেল। ছেলেটা তো একটা অজুহাত খুঁজছে আলাপ করার। করবী ওর কথার পিঠে কথা বলতে গেল কেন।

আমি বললাম, চলো চলো। গলার স্বরে বোধ হয় ঈষৎ ঝাঁঝ ছিল।

করবী এবার সরে এল। চুপচাপ হাঁটতে শুরু করল। তারপর বেশ রাগ রাগ ভাবেই বললে, চলো, কোথায় যাবে চলো।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, ও যে রেগে যাবে তা বুঝতে পাবিনি।

আর করবী ঠিক সেই সময়েই একবার পিছন ফিরে তাকাল। যে ছবি আঁকছিল তাকেই দেখল, না সেই ভদ্রলোককে, বুঝতে পারলাম না।

আমার সে-জন্যেই আরও রাগ হল।

বলেই ফেললাম, তুমি কি! কিচ্ছু বোঝ না, লোকটা তোমার গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াল, সরে দাঁড়াবে তো।

—ওমা, কখন? বলে অবাক হয়েই করবী হেসে ফেলে বললে, ঐ ভদ্রলোক? আরে উনি তো আমাদেরই হোটেলের।

আমার প্রচণ্ড রাগ হল। বললাম, আমাদের হোটেলে থাকলেই কি সে আত্মীয় হয়ে যায়, না পরমবন্ধু?

করবী হেসে উঠে বললে, একটু সমুদ্রের জল এনে তোমার মাথায় দেব?

আর ওর ভাবভঙ্গি দেখে আমিও হেসে ফেললাম। তবু বললাম, লোকটা কিন্তু মোটেই ভাল নয়।

করবী রেগে গেল।—তুমি না জেনে যা-তা বলো না, কি খাবাপ দেখলে ওঁর।

আমি বললাম, বেশ বেশ, হার মানছি। লোকটা ভালই।

করবী আর কোনও কথা বলল না।

আমরা এসে সমুদ্রের ধারে দাঁড়ালাম। কাপড় ছেঁড়ার মত একটা শব্দ হচ্ছে আর ঢেউগুলো ভেঙে গিয়ে সাদা ফেনা হয়ে যাচ্ছে। আর গুমগুম আওয়াজ। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসছে আর ভেঙে পড়ছে। একটু পরেই সূর্যাস্ত হবে, নীল জল একটু একটু করে কালো হয়ে আসছে। তার ওপর পশ্চিমের লাল আকাশেব প্রতিবিম্ব পড়ে অদ্ভুত সুন্দব লাগছে।

করবী হঠাৎ জিগ্যেস করল, এটা শুক্লপক্ষ, তাই না?

আমি বললাম, কেন?

ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। ওকে বেশ খুশি খুশি লাগল। বুঝতে পারলাম ও কি মনে পড়িয়ে দিতে চাইছে।

মুহূর্তে আমার সমস্ত রাগ পড়ে গেল।

করবীর পাশে দাঁড়িয়ে এই বিস্ময়ের সমুদ্র দেখতে আমাব খুব ভাল লাগছিল।

আমাদের সামনে দিয়ে অনেকে হেঁটে যাচ্ছিল। কেউ কেউ সুবেশ সৌন্দর্য নিয়ে।

কিন্তু তাদের দিকে বিশেষ করে চোখ পড়ছিল না। চোখ পড়ল বৃদ্ধ লোকটির দিকে। একটা মোষের শিঙের বাঁটওয়ালা ছড়ি হাতে নিয়ে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদের সামনে দিয়ে হনহন করে হেঁটে গেলেন। কারও দিকে তাকালেন না। দীর্ঘ শরীর, বয়েস যে অনেক হয়েছে বোঝাই যায়। মাথার চুল একটিও কালো নেই। সাদা চুল হাওয়ায় ঝিরঝির করে উড়ছে।

করবী হঠাৎ বললে, ভদ্রলোক কে বলো তো।

আমারও জানতে ইচ্ছে হল। কিন্তু কি করে বলব।

রসিকতা করে বললাম, তোমাদের কল্যাণসুন্দর নয় নিশ্চয়ই।

করবী শব্দ করে হেসে উঠল!—দুর, তুমি কিচ্ছু খবর রাখো না। কল্যাণসুন্দর কি বুড়ো নাকি।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, ও, ইয়াং বলেই এত ভক্তি তোমাদের।

করবী হাসতে হাসতে বললে ইয়াং আর হ্যান্ডসাম। শুনেছি অবশ্য, চোখে দেখিনি কখনও। অঞ্জলি তো ওর জন্যে পাগল ছিল।

ওর চেয়েও বিখ্যাত লোক অনেক আছে, বুড়ো বলেই বুঝি তাদের দিকে চোখ পড়ে না। অঞ্জলি তার জন্যে পাগল ছিল শুনে একটু খারাপ লাগল।

আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই ধূর্জটিপ্রসাদকে দেখতে পেলাম। উনিও

আমাদের দেখতে পেয়েছেন।

উনি এগিয়ে এলেন। হাসতে হাসতে করবীকে বললেন, কি সমুদ্রস্নান হল আজ, ভয় ভেঙেছে তোমার ?

বললাম, না, কিছুতেই নামতে চাইল না।

ধূর্জটিপ্রসাদ হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। লোকটার এই এক স্বভাব, কথা বলতে বলতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যান, অন্য কোথাও যেন ঘুরে আসেন। আমার দিকে তাকিয়ে এবার ধীরে ধীরে বললেন, জোর করবেন না, নিজের যতক্ষণ সাহস না হয় ততক্ষণ জোর করবেন না যেন। থেমে থেমে বললেন, সমুদ্র বড়ো রহস্যময়, নিখিলেশবাবু, বড়ো রহস্যময়। কখন যে কি হয়ে যায়।

ভদ্রলোক আমার চেয়ে অনেক বড বলেই নয়, করবীকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছেন বলেই আমি বললাম, আবার বাবুটাবু কেন ?

তখনই ধূর্জটিপ্রসাদ দূরে কাকে যেন দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ডাকলেন, মালা ! মালা ! অরুণেন্দুবাবু !

ওরা এগিয়ে এল ওঁর ডাক শুনে, আব সঙ্গে সঙ্গে আমি চিনতে পারলাম। সকালে এই দলটিকেই দেখেছি আমাদের সামনে দিয়ে দ্রুত পার হয়ে যাবার সময। মালা মেয়েটি প্রায় ছুটতে ছুটতে যাবাব সময় বলছিল, দিদি পালা পালা, পিছনে জ্ঞানবাবু আসছে।

ওরা কাছে আসতেই ধূর্জটিপ্রসাদ আলাপ কবিয়ে দিলেন।

আর অরুণেন্দুবাবু বললেন, বিজয়বাবুবা আপনার খোঁজ কবছিলেন, একটু আগে গেলেন এদিক দিয়েই।

—তাই নাকি ? আমি তাহলে....

ধূর্জটিপ্রসাদ সেদিকেই হাঁটতে শুরু করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মালা অরুণেন্দুবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে চোখ চাওয়াচাওয়ি করে হেসে উঠল। করবীকে প্রশ্ন করে বসল, উনি কি বলছিলেন এতক্ষণ ? ওঁকে এখানে অনেকে জ্ঞানবাবু বলে, জানেন তো ? বলে মালা হেসে উঠল।

মালার এই হাসাহাসি আমার ভাল লাগল না।

অরুণেন্দুবাবুর স্ত্রীও হাসছিলেন। বললেন, দেখবেন দেখবেন, ধবলে আর ছাড়তে চাইবে না। বিদ্বান করে দেবে আপনাদের।

শুধু অরুণেন্দুবাবু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললেন, ধূর্জটিবাবু কিন্তু লোক ভাল।

মালা কিরকম অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল।

আমি ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম না। ওদের এই হাসাহাসি ধূর্জটিপ্রসাদের চরিত্রের প্রতি কোনও ইঙ্গিত বলেই আমার মনে হল। প্রথম যখন উনি এগিয়ে এসে করবীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন আমিও ওঁকে ভুল বুঝেছিলাম। কিংবা বিরক্ত হয়েছিলাম। এখন ওঁর চেহারাটা আমার কাছে স্পষ্ট।

আমাব সমস্ত মন তাই বিস্বাদ হয়ে গেল ওদেব কথায়।

অরুণেন্দুবাবুরা চলে গেলেন।

আর তখনই টুপ করে যেন সূর্যাস্ত হল। অন্ধকারের মধ্যে বিরাট একটা লাল রঙের চাঁদ জেগে উঠল এদিকের আকাশে।

করবীর চোখে পড়তেই ও বলে উঠল, এই, পূর্ণিমা, পূর্ণিমা।

তারপর একটু নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে বালির ওপর রুমাল পেতে বসে পড়ল। আমিও ট্রাউজার্সের পকেট থেকে রুমাল বের করে পেতে বসলাম।

দু হাঁটুর ফাঁকে থুতনি রেখে সামনের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল করবী।

সমুদ্রের গর্জন যেন ক্রমশই বাড়ছিল। চাঁদের আলোয় ঢেউগুলো ক্রমশই দৈত্যের মত বড় হয়ে উঠছিল।

ব্রেকার্সের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে একটা সাদা ফুটফুটে দুধের মত ফেনার রেখা, তার পিছনে আরেকটা, তার পিছনে আরেকটা। চাঁদের আলোয় যেন স্নান করছিল সমুদ্র নিজেই। বিশাল লাল চাঁদটা ততক্ষণে ছোট হয়ে রুপোর থালা হয়ে গেছে।

দু হাঁটুর মাঝখানে থুতনি রেখে করবী বললে, এই।

আমি ওর দিকে তাকালাম। করবীও তাকাল মুখ ফিরিয়ে। মনে হল মুচকি মুচকি হাসছে ও।

আমি বললাম, কি হল।

ও হাসি হাসি মুখে বললে, হানিমুন।

৫

কোথায় যেতে পাবে করবী ? জলজ্যান্ত একটি মেয়ে এত লোকের মাঝ থেকে কোথায় উবে যেতে পারে !

খবরটা জানাজানি হওয়ার পর সকলেই হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এমন একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা তো কোনদিন ঘটেনি। যারা সপরিবারে এসেছে, কয়েকটা দিন দেখে মনে হচ্ছিল কেমন যেন তটস্থ। সন্ধে হতে না হতে মেয়েরা ফিবে আসছিল। সমুদ্রের পাড়ের এই আবছা অন্ধকার তখন একটা বিভীষিকা। মুখে মুখে একই আলোচনা।

সন্ধের পর থেকে সি-বিচ জমজমাট হয়ে উঠত। লোকের ভিড, মেয়েদের ভিড লেগেই থাকত। সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হত এখানেই। অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে কারও তেমন বাধানিষেধ ছিল না।

এও আশ্চর্য চরিত্র মানুষের। পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে নিত্যদিন দেখা হয়, তবু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। মেয়েরা সেখানে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, ছেলেরা চোখ নামায়। কিন্তু এখানে এসে কে যেন ছুটিব ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে।

ঘটনার পরের দিন। ধূর্জটিপ্রসাদ যথারীতি বেরোলেন। তখন বিকেল। সি-বিচে ভিড় ভেঙে পড়েছে। সমুদ্রের ধারে বেড়ানোর চেয়ে তাদের কাছে আরও বড় আকর্ষণ কৌতূহল। শোনা যাচ্ছে, মুনলাইট হোটেলের একজনকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। একটি মেয়ে। সুন্দরী তো বটেই, অল্প বয়েস। নিখিলেশবাবু, সেই নিখিলেশবাবুর স্ত্রী।

ধূর্জটিপ্রসাদকে দেখতে পেয়েই অরুণেন্দু তার স্ত্রী আর শ্যালিকা মালাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে এল। তার মুখে-চোখে কৌতূহল আর আতঙ্ক মাখামাখি হয়ে আছে।

—খবরটা কি সত্যি ? নিখিলেশবাবুর স্ত্রীকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না ?

ধূর্জটিপ্রসাদের তখন সমস্ত বুক ভারাক্রান্ত। করবীর মুখটা তখন ওঁর বারবার মনে পড়ছে। নিখিলেশের উদ্‌ভ্রান্ত মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ শুধু মাথা নাড়লেন, কথা বলতেই ইচ্ছে হল না। এদের মনে তো শুধু কৌতূহল। আর কিছু নেই। কিন্তু নিখিলেশের জন্যে ধূর্জটিপ্রসাদের তো বুক ফেটে কান্না আসছে। বেচারা মুখ তুলে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। কারও চোখের দিকে তাকাতে পারছে না।

অরুণেন্দু বললে, মালা, আজ আর বেশি দেরি করো না।

মালা হেসে উঠল, কেন ? অন্ধকার হলেই কি আমাদের কেউ ধরে নিয়ে যাবে ! আপনার বউকে নিয়ে ঘরে খিল দিয়ে থাকবেন যান। আমার অত ভয় নেই।

অরুণেন্দুর স্ত্রী বললে, না না, আজ আর বেশি রাত্তির করতে হবে না।

ওদের কি দোষ। ধূর্জটিপ্রসাদ দেখলেন সন্ধে হতে না হতেই সি-বিচ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার সমুদ্রের ধার ছেড়ে সবাই ঘোরাঘুরি করতে শুরু করেছে পিচের রাস্তায়। রাস্তায় আলো আছে, তাছাড়া হোটেলগুলোর আলো, নিওন সাইনের আলো এসে পড়েছে সেখানে। তাই কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

ধূর্জটিপ্রসাদ দেখলেন, মুনলাইট হোটেলের সামনে অনেকে ভিড় করে আছে। কানাকানি ফিসফিস নানারকম আলোচনা। লোকগুলোর ওপব মন বিষিয়ে উঠল। একটা লোক, নিখিলেশ ঘরের মধ্যে মাথা নিচু করে বসে আছে, গভীর লজ্জা আর গভীর দুঃখেব মধ্যে। অথচ ব্যাপারটা এদের কাছে শুধুই মজা। এই মানুষগুলোই নাকি শিক্ষিত সভ্য!

অরুণেন্দুদের মত ওসব কথা উনি ভাবতেই পারছেন না। একটা মেয়েকে এই সি-বিচ থেকে কেউ কি ধরে নিয়ে যেতে পারে নাকি! মিথ্যে ভয় পাচ্ছে সকলে।

কিন্তু কিই বা হতে পারে। কোথায় যেতে পারে করবী।

খাওয়াদাওয়ার পর হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে অনেকেই রাত নটা দশটা অবধি, কি তারও পরে, এই সি-বিচে বসে বসে সমুদ্র দেখে। তখন ঢেউ বাড়ে, জল বাড়ে। সমুদ্রে জোয়ার আসে। এক একদিন নুলিয়ারা এসে সকলকে সাবধান করে দিতে দিতে চলে যায়। দৈত্যের মত ঢেউগুলো। ক্রমশই উঁচু হতে থাকে, পাগলের মত পরস্পরের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর সমুদ্রের শাড়িখানাকে কে যেন দু আঙুলের এক টানে ছিঁড়ে ফালা-ফালা করে দেয়। তেমনি আওয়াজ, আর সঙ্গে সঙ্গে সাদা ফেনা, সমস্ত সমুদ্র জ্যোৎস্না মেখে দুধ হয়ে যায়।

ধূর্জটিপ্রসাদ কতদিন গভীর রাত অবধি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছেন।

—সমুদ্র শুধু নিয়েই নেয় না, ফিরিয়েও দেয়। করবী বলেছিল।

সমুদ্র তো ওঁকে একটা জিনিস ফিরিয়ে দিয়েছিল। শান্তি।

এই একটা ঘটনা আবার ওঁর শান্তি ছিনিয়ে নিয়েছে। নিখিলেশের জন্যে, করবীর জন্যে ওঁর বুকের ভেতর একটা চাপা কষ্ট।

—ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড, আপনি তো আমাদেব সবই। নিখিলেশ হাসতে হাসতে বলেছিল।

অথচ নিখিলেশ জানে না, এখন ওঁর মত অসহায় আর কেউ নেই। নিখিলেশ এখন ওঁর ওপরই নির্ভর করতে চাইছে। অথচ ওঁর কিছুই করার নেই। কি করবেন কিছুই খুঁজে পাচ্ছেন না।

কি হতে পারে। কোথায় যেতে পারে কববী। ওঁর কেবলই মনে হচ্ছে আরেকটা বিপদ যেন ঘনিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে তনুশ্রী আর কল্যাণসুন্দরের জীবনও যেন এই ঘটনাটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

চোখের সামনে কি একটা অজানা বিপদ ঘটতে যাচ্ছে। অথচ অসহায়ের মত শুধু দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

এই সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে একটা অপূর্ব ছন্দ আছে। একটু একটু করে ঢেউগুলো বড় হয়, ফুঁসে ওঠে, ফুলে ওঠে, তারপর পাড়ের কাছে এসে আছড়ে পড়ে।

কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ দেখতে পাচ্ছেন একটা ঝড় উঠছে। সমুদ্রের বুকে ঝড়।

এই শান্ত ছন্দোময় সমুদ্রের বুকে কল্যাণসুন্দর এসে পড়েছে একটা ঝড়ের মতই। ছন্নছাড়া, ছন্দছাড়া।

আবছা অন্ধকার সমুদ্রের ধার দিয়ে একা একা হেঁটে চললেন ধূর্জটিপ্রসাদ। অরুণেন্দুরা চলে গেছে। সি-বিচে এখন শুধুই পুরুষের ভিড়। তাও ফিকে হয়ে গেছে। পিচ রাস্তার ধাব

বরাবর হোটেলের সারি। এ-সময় সব ঘরগুলোই অন্ধকার থাকে। সবাই এখানেই চলে আসে, কিংবা স্বর্গদ্বারের দোকানপাটে ভিড় করে। উনি তাকিয়ে দেখলেন সব ঘরগুলোতেই আলো জ্বলছে। নিখিলেশদের বারান্দার দিকে তাকালেন। ঐ বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়টা। দোতলায়। না, নিখিলেশের ঘরে কোনও আলো জ্বলেনি। বোকা দুঃখী ছেলেটা হয়তো আলো জ্বালতেও ভুলে গেছে। অন্ধকারে মাথা নিচু করে বসে আছে চুপচাপ। এখন কারও দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না।

এদিকটা নির্জন। সারি সারি নৌকো পড়ে আছে বালির ওপর।

সমুদ্রের গর্জনে কিছুই শোনা যাচ্ছে না, তবু মনে হল একটা গানের কলি যেন ভেসে আসছে। এগিয়ে গেলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। গানটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। পুরুষের ভরাট গলার গান। যেন আবেগে আপ্লুত একটা কণ্ঠ।

ধূর্জটিপ্রসাদের সমস্ত শরীর-মন স্নিগ্ধ হয়ে গেল। বাঃ, সুন্দর গলা তো লোকটার। কাছে গিয়ে শুনতে ইচ্ছে করে।

ধূর্জটিপ্রসাদ হাঁটতে হাঁটতে খুঁজে বের করতে চাইলেন, কোত্থেকে আসছে গানটা। কোনদিক থেকে।

আর তখনই অদূরে সারি সারি নৌকোব দিকে চোখ গেল। লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় এতক্ষণ বসে বসে গাইছিল। উঠে দাঁড়াতেই সিল্যুট ছবির মত মনে হল। একটা ছায়ার শরীর। কালো তুলিতে আঁকা যেন।

চিনতে অসুবিধে হল না। কল্যাণসুন্দর। ঐ দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা ওর দেখলেই চেনা যায়। ধূর্জটিপ্রসাদ খুশি মনে এগিয়ে যাবেন ভাবছিলেন, ওব দিকেই। কিন্তু তার আগেই আরেকটা অন্ধকার মাখা ছবি আঁকা হয়ে গেছে। একটি নারীর শরীর। মেয়েটি উঠে দাঁড়াল।

তনুশ্রী কিনা দেখবার চেষ্টা করলেন না।

ধূর্জটিপ্রসাদ দ্রুত পায়ে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। পাছে মুখোমুখি হয়ে যান কিংবা ওরা চিনতে পারে। কিংবা তনুশ্রীকেই দেখে ফেলেন। উনি নিজেই লজ্জা পাবেন।

ওঁর তো কিছুই করার নেই, অসহায়েব মত শুধু দেখতে হবে।

—ধূর্জটি, তুমি বড্ড ভীতু হে। বিজয়বাবু বলেছিলেন।

তনুশ্রীকে তখন সমুদ্রের নেশায় পেয়ে বসেছে। থার্ড ব্রেকার্সের কাছাকাছি চলে গেছে ও। যেন কল্যাণসুন্দরই ওকে বাঁচাতে পারবে।

ধূর্জটিপ্রসাদের বুক কাঁপছিল। চিৎকাব করে উঠেছিলেন। তনু যেও না, যেও না আর।

উনি হয়তো মিথ্যে ভয় পান। কাবণ ওঁর বুকেব মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে তনুশ্রী।

অন্ধকারের মধ্যে মিশে গিয়ে দ্রুত ফিরে আসতে আসতে ধূর্জটিপ্রসাদ যেন সেদিনের মতই চিৎকার করে উঠতে চাইলেন, তনু, যেও না, যেও না, ঝড় আসছে। সমুদ্রের ঝড় বড়ো ভয়ঙ্কর।

—ধূর্জটিবাবু, ধূর্জটিবাবু। পিছন থেকে একটা চিৎকার শুনলেন কল্যাণসুন্দরের।

ফিরে তাকালেন। আর ফিরে তাকিয়েই চমকে উঠলেন।

ভুল, ভুল। আসলে তনুশ্রীর জন্যে ওঁব যে ভয়-ভয় ভাব সে জন্যেই বোধহয় এমন একটা অদ্ভুত ভুল করেছিলেন।

কিছু জানতে হলে, কোনও সত্যে পৌঁছতে হলে আমাদের ধারণাগুলোকে আগেই বিসর্জন দিতে হয়, একথা তো উনি নিজেই বলেছেন কতবার। ইতিহাস, কিংবা সমাজ। কিংবা শিল্পসংস্কৃতির সবচেয়ে বড় শত্রু পূর্বধারণা। তনুশ্রীর চোখে উনি প্রেম দেখেছেন, অসহায় প্রেম। সেজন্যেই ভুল করেছিলেন।

কল্যাণসুন্দরের সঙ্গে অঞ্জলি আর অঞ্জলির স্বামী ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে।

আর অঞ্জলি ব্যথা ব্যথা গলায় বললে, করবীর জন্যে মনটা এত খারাপ হয়ে আছে।

একটুক্ষণ থেমে বললে, ওঁর গান শুনে মনটা হাল্কা হল। এত দরদ দিয়ে গাইছিলেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ ধীরে ধীরে বললেন, তুমি যে গাইতে পারো জানতাম না।

সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জলির কথাটা ওঁকে ভাবিয়ে তুলল। এত দরদ দিয়ে গাইছিলেন। কল্যাণসুন্দর কি তা হলে ধূর্জটিপ্রসাদের মতই দুঃখ পেয়েছে! নাকি, ওর অন্যরকম দুঃখ।

সেই সেদিনের সমুদ্রস্নানের দৃশ্যটা, নিখিলেশের কথা, সব মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেলেই একটা সন্দেহ উঁকি দিয়ে যায়। কল্যাণসুন্দর কি কিছু জানে?

এক একজন হঠাৎ কেন যে হিরো হয়ে যায়। কল্যাণসুন্দরকে নিয়ে এদের মাতামাতি প্রথম প্রথম ওঁর আপত্তিকর লাগেনি। কিন্তু করবী কিংবা অঞ্জলি কিংবা মালার মনে কি মোহ ছিল না? করবীর চোখে কি কখনও মুগ্ধতার ছায়া দেখেননি? একটা মানুষকে বাইরে থেকে কতটুকু জানা যায়!

ধূর্জটিপ্রসাদ চমকে উঠলেন।

এ কি অকারণ সন্দেহ ওঁর মনে উঁকি দিচ্ছে? থানার ও সি দিকপতি তো নিখিলেশকে বলেছিলেন, আপনি বোধহয় সব কথা খুলে বলছেন না।

দিকপতির কথায় ভিতরে ভিতরে রেগে গিয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

ওঁর তো স্পষ্ট মনে আছে, চোখের সামনে সব যেন দেখতে পান এখনও।

অনেক রাত অবধি সি-বিচে একা একা বসেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। খাওয়া-দাওয়ার পর হোটেল থেকে অনেকে এসে বসছিল সমুদ্রের পাড়ে। উন্মত্ত জোয়ারের বিশাল ঢেউগুলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। ঢেউ এগিয়ে আসছিল ক্রমশ। একজন নুলিয়া সকলকে সাবধান করতে করতে গেল। ধূর্জটিপ্রসাদের মুখে বিন্দু বিন্দু জল ছিটকে এসে লাগছিল। একটু একটু করে সকলেই পিছিয়ে বসছিল। কেউ কেউ ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল।

অনেক রাত অবধি ছিলেন উনি। একে একে সকলেই চলে এল। উনিও ফিরে এলেন হোটেলে। ফেরার পথে সেই জায়গাটা দেখলেন, যাবার সময় যেখানে করবীকে একা-একা চুপচাপ বসে থাকতে দেখেছিলেন। আলোয় ছায়ায় বিচের ওপর চুপচাপ সে বসে ছিল। দু-হাতে হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে। হাঁটুর ফাঁকে থুতনি রেখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে ছিল।

ওর তন্ময়তা ভাঙাতে ইচ্ছে হয়নি।

ফেরার পথে করবীকে আর সেখানে দেখতে পেলেন না, ভাবলেন হয়তো হোটেলে ফিরে গেছে।

ফিরে এসে প্রতিদিন এ-সময় কিছুক্ষণ বই পড়েন বিছানায় শুয়ে শুয়ে। তারপর কখন আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছেন বিছানায়, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

তখন রাত কত, কিছুই জানেন না। সবে ঘুম এসেছিল, হঠাৎ কিসের শব্দে কিংবা কারও চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খোলার আওয়াজ শুনলেন।

তারপরই শুনতে পেলেন ওঁর হোটেলের ম্যানেজার ত্রিদিববাবু ধূর্জটিপ্রসাদকে ডাকছেন, দরজার কড়া নাড়ার শব্দ।

ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে দিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। খুলেই দেখলেন ত্রিদিববাবুর পাশেই নিখিলেশ দাঁড়িয়ে। উস্কোখুস্কো চুল, উদ্‌ভ্রান্ত মুখ। চোখে উদ্বেগ, ভয়, কান্না। একটু নাড়া দিলেই যেন জল গড়িয়ে পড়বে।

প্রায় কান্নার গলায় নিখিলেশ ব্যস্তভাবে বলে উঠল, করবীকে খুঁজে পাচ্ছি না, করবীকে পাওয়া যাচ্ছে না। দেখেছেন কোথাও?

—প্যাওয়া যাচ্ছে না ? ধূর্জটিপ্রসাদ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। যেন কথাটা শুনেও তার অর্থ বুঝতে পারছেন না। ওঁর গলার কাছে যেন কান্না আটকে গেল.।

—কোথায় গিয়েছিল ? তুমি ছিলে না ?

কি করবেন কিছুই যেন ভেবে পেলেন না, অসহায়ের মত ত্রিদিববাবুর মুখের দিকে তাকালেন।

নিখিলেশের গলা কেঁপে গেল। বললে, এই তো সি-বিচে কল্যাণসুন্দরের গান শুনতে গিয়েছিল। হোটেলের সামনেই গিয়ে বসে। চেনাশোনা অনেকেই তো থাকে। আমি ভাবলাম এক্ষুনি ফিরে আসবে।

নিখিলেশ হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।—কি করি বলুন তো।

ধূর্জটিপ্রসাদ ভেবেই পেলেন না কি হতে পারে। সত্যি তো অনেকেই এ-সময় গিয়ে বসে। একটু রাত হলেই ফিরে আসে।

কিন্তু কল্যাণসুন্দর নামটা শুনেই কেমন অস্বস্তি বোধ করলেন।

একটা আতঙ্কে ধূর্জটিপ্রসাদের বুক কেঁপে উঠল।

—সি-বিচটা ভাল করে দেখেছ ? ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন, তারপর নিখিলেশের পিছনে পিছনে রাস্তায় নেমে এলেন। মুনলাইটের সামনে তখন রীতিমত একটা জটলা। অনেকেই শুনেছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সকলেই। এমন ঘটনা ঘটেনি কখনও। এমন চাঞ্চল্য কখনও দেখা যায়নি।

ত্রিদিববাবু বলে উঠলেন, সমুদ্রে জোয়ার এসেছে আজ। সে জন্যেই ভাবনা। যাই, নুলিয়া পাড়ায় একটা খবর দিয়ে আসি, যদি কোনও অ্যাকসিডেন্ট ঘটে থাকে।

ত্রিদিববাবু হনহন করে চলে গেলেন।

আর নিখিলেশ তখন অন্ধকার সি-বিচের দিকে ছুটে চলেছে চিৎকার করতে করতে। ধূর্জটিপ্রসাদ শুনতে পেলেন নিখিলেশের 'করবী ! করবী !' চিৎকারটা ক্রমশ দূরে আরও দূরে অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর এক সময় সমুদ্রের গর্জনের মধ্যে সেটা চাপা পড়ে গেল।

ওঁর মনে পড়ল করবীকে একবার একা-একা বসে থাকতে দেখেছেন, তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিল, কিংবা গভীর দুঃখে। পাওয়া যাচ্ছে না শুনেই সে-কথাটা আর বলতে পারলেন না। ওঁর মনেও কি কোনও সন্দেহ উঁকি দিল ? তাহলে কি ওঁরই মনের ভুল, করবী কি কারও জন্যে অপেক্ষা করছিল ? তা না হলে একা কেন ?

ধূর্জটিপ্রসাদ এসে দাঁড়ালেন মুনলাইটের সামনে। বোর্ডাররা সকলেই বেরিয়ে এসেছে। পাশের হোটেলগুলো থেকেও কেউ কেউ। সকলেরই মুখে চোখে একটা উৎকণ্ঠা।

শান্ত নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে সমুদ্র-গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে সেই কান্নামাখা চিৎকার এখনও শুনতে পান ধূর্জটিপ্রসাদ। নিখিলেশের সেই চেহারাটা এখনও দেখতে পান।

এ এক প্রচণ্ড রহস্যের মধ্যে সারা শহরটাকে যেন ফেলে দিয়ে গেছে করবী। নিজেও একটা রহস্য হয়ে গেছে। আহা; করবীর সেই মুখখানা যেন দেখতে পান। বড়ো কষ্ট হয় তার জন্যে। বেচারা নিখিলেশের জন্যেও। সে-ই যেন এখন সকলের চোখে অপরাধী হয়ে গেছে। ও সি দিকপতিও বলেছে, আপনি বোধ হয় সব কথা খুলে বলছেন না।

কদিন ধরেই আলোচনা শুনছেন সর্বত্র। এখন সকলের ভয় ভয় ভাবটা কেটে গেছে। কিন্তু সি-বিচে যেখানেই জটলা সেখানেই ঐ এক আলোচনা।

কে একজন উত্তেজিত হয়ে বলছিল, ভদ্রলোকের নিজেরই ক্যারেকটার কেমন আগে খোঁজ নিন। একটা শান্তশিষ্ট মেয়ে, বিবাহিত, সে কি এভাবে উবে যেতে পারে নাকি।

অরুণেন্দুর স্ত্রী আর মালা বলেছিল, মেয়ে হয়ে জন্মানোই তো অপরাধ। কত কি হতে

পারে, তা নয় আগেই সন্দেহ মেয়েটাকেই। যেন কারও সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

একটা মেয়ে, একটা যুবতী বয়সের মেয়ে, একজনের সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রী, তাকে পাওয়া না গেলেই সন্দেহ করতে হবে কারও সঙ্গে চলে গেছে। মেয়েটা খারাপ, খারাপ।

কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের মনেও তো সেদিন মুহূর্তের জন্যে একটা সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল।

কল্যাণসুন্দর।

সি-বিচের দিকে আরও অনেকে ছুটে গিয়েছিল নিখিলেশের পিছনে পিছনে।

তারপর এক সময় ওরা ফিরে এল।

অঞ্জলি তখন হাউ হাউ করে কাঁদছে। আর অঞ্জলির স্বামী ওকে সান্ত্বনা দিতে চাইছে। বলছে, আরে এত নার্ভাস হবার কি আছে, কারও বাড়ি-টাড়ি হয়তো গিয়েছে। এখুনি ফিরে আসবে।

আর অঞ্জলি কাঁদতে কাঁদতে বলছে, আমার সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল ছিল।

ধূর্জটিপ্রসাদ কি বলবেন নিখিলেশকে, কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। নিখিলেশ তো তখন একটা ধসে পড়া মানুষ। ও যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

মুনলাইটের ম্যানেজারবাবু হঠাৎ বললেন, একজন কেউ স্টেশনে চলে যান না। এ-সময় কি একটা ট্রেন যেন আছে।

অঞ্জলির স্বামী বললে, আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি।

বলেই একটা সাইকেল রিকশায় উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে নিখিলেশও।

আর অঞ্জলি তাদের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল, অসম্ভব, অসম্ভব। করবী কি যে ভাল মেয়ে আপনারা জানেন না।

ধূর্জটিপ্রসাদ মনে মনে ভাবলেন, আহা, তাই যেন পাওয়া যায় করবীকে, স্টেশনে, কিংবা ট্রেনের কামরায়। ওঁর মনও বলছিল, অসম্ভব অসম্ভব। তবু যদি পাওয়া যায়, যদি সত্যিই তেমন কিছু ঘটে থাকে, ধূর্জটিপ্রসাদ মনে মনে ভাবলেন, করবীকে আমি বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনব। নিখিলেশকে বলব, জীবনে ভুলভ্রান্তি তো ঘটেই।

ধূর্জটিপ্রসাদ কি ভাবলেন কে জানে, হঠাৎ বললেন, একটা টর্চ আছে কারও কাছে?

কে যেন ছুটে গিয়ে একটা টর্চ নিয়ে এল। আর সেটা হাতে নিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ হাঁটতে হাঁটতে চললেন স্বর্গদ্বারের দিকে।

বিজয়বাবুদের বাড়ি পার হয়ে আরও কিছুটা গিয়ে সেই হলদে বাড়িটা, লোহার গেট। কোনও এক পুরনোকালের ব্যারিস্টারের বাড়ি। পরিত্যক্ত পড়েছিল। দারোয়ানের কাছ থেকে সেটাই ভাড়া নিয়ে আছে কল্যাণসুন্দর। এর আগেও গিয়েছেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

উনি মনে মনে চাইছিলেন তাই যেন হয়। এখন শুধু করবীকে ফিরে পাওয়াটাই বড় কথা! করবীকে ফিরে পেলে নিখিলেশ বাঁচবে। কারণ সেই প্রথম দিন এদের দুজনকে দেখেছিলেন, পাশাপাশি। নিখিলেশ আর করবী। ওদের চোখেমুখে ভালবাসা আঁকা ছিল।

কল্যাণসুন্দর একটা মোহ। তনুশ্রীর চোখে। হয়তো আরও অনেকের চোখে। ওরা কেউই বুঝতে পারেনি, কল্যাণসুন্দর কি ভাবে দিনে দিনে ওদের কাছে হিরো হয়ে উঠেছে। সাঁতার কেটে কত দূর চলে যায় দেখেছেন? কি সপ্রতিভ অথচ কি বিনয়ী। গানের গলা আছে। কি সুন্দর সুন্দর অটোগ্রাফ দিল দেখলেন। এত দয়ামায়া, একটা ভিখিরির ছেলেকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন সেদিন।

টর্চ হাতে নিয়ে অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে সেদিন কল্যাণসুন্দরের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। অনেক ডাকাডাকির পর চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এসেছিল কল্যাণসুন্দর।

আমি? আমার কাছে? ও একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেই তখন অপরাধী। ছি ছি, একথা আমি ভাবলাম কি করে? কল্যাণসুন্দর কি ভাবল?

ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে সেদিন কল্যাণসুন্দরও এসেছিল।

ধূর্জটিপ্রসাদ জানেন, কল্যাণসুন্দরের চোখে উনি এখন ছোট হয়ে গেছেন। হয়তো ভাবছে, ওর সম্পর্কে এ-সব কথা ভাবলাম কি করে।

একজন মানুষের মূর্তি ঐ মন্দিরের দেবতার অসমাপ্ত মূর্তিটির মতই। তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসম্পূর্ণ। ছোট্ট এক একটা ঘটনা ঘটে, আর তার চেহারা পাল্টে যায়। কল্পনা দিয়ে তখন তার মূর্তিটা গড়ে তোলে। এক একজনের চোখে এক-একরকম মূর্তি।

কল্যাণসুন্দর একদিন বলেছিল, সেই সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে, তনুশ্রী আপনাকে দারুণ শ্রদ্ধা করে, ভালও বাসে। শুনে চোখে জল এসে গিয়েছিল। তনুশ্রীব একটু ভালবাসা পাবার জন্যে তো উনি কাঙাল ছিলেন। ওঁর বুক-ভরা অস্পষ্ট স্নেহেব পবিবর্তে একটুখানি মমতা।

কল্যাণসুন্দর বলেছিল, ওর কাছে শুনে শুনে আমিও।

ধূর্জটিপ্রসাদ জানেন, কল্যাণসুন্দর ওঁকে সেই শ্রদ্ধার আসন থেকে নামিয়ে দিযেছে। ও বলেছিল, আমার কাছে আসতে পাবে ভাবলেন কি করে!

পরের দিন সব শুনে বিজযবাবুরা হেসেছিলেন। শান্তাব চোখে করবীর জন্যে উদ্বেগ ছিল, কৌতূহলও। তবু সব শুনে সবাই হেসে উঠেছিল ওঁর বোকামিতে।

আর কল্যাণসুন্দবের বাড়ি গিয়েছিলেন শুনে তনুশ্রী বলেছিল, ছি ছি, কি ভাবল বলুন তো!

ওর কথার সুরে ওর চোখের দৃষ্টিতে ধূর্জটিপ্রসাদ বুঝতে পেবেছিলেন তনুশ্রীর চোখেও উনি ছোট হয়ে গেছেন।

সব মানুষেরই একটা ইমেজ একটু একটু করে গড়ে ওঠে, অথচ সামান্য একটা ভুলে আঙুলের একটা টুসকিতে সেটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। কিংবা একটা অঘটন ঘটে গেলে।

যেমন নিখিলেশ। কিংবা করবী।

অঞ্জলির স্বামী আর নিখিলেশ স্টেশন থেকে ফিরে এল। বোর্ডাররা সকলেই তখন একে একে নিজের ঘরে চলে গেছে!

নিখিলেশ কারও দিকে তাকাতে পারল না। মাথা নিচু করে হোটেলের ঘরটিতে ফিরে গেল।

আর ধূর্জটিপ্রসাদ সপ্রশ্ন চোখে অঞ্জলির স্বামীর দিকে তাকাতেই সে কাছে এসে ফিসফিস করে বললে, ব্যাড লাক, পৌঁছনোর আগেই ট্রেনটা ছেড়ে গেল। জানতেও পারলাম না করবী ছিল কি না।

ধূর্জটিপ্রসাদ সে-রাত্রে ঘুমোতে পারেননি।

সকালে উঠেই চলে এসেছিলেন মুনলাইটে। বেচারা নিখিলেশ। তাকে সান্ত্বনা দিতে হবে। নুলিয়ারা কোনও খবব নিয়ে আসেনি। তার মানে ধারে কাছে পাওয়া যায়নি।

মুনলাইটের ম্যানেজারবাবু আপিসঘরেই ছিলেন।

আতঙ্কের উৎকণ্ঠার মুখ নিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ জিগ্যেস করলেন, খবর পেলেন কিছু?

ম্যানেজারবাবু মাথা নাড়লেন। আর উনি বলে উঠলেন, কি হতে পারে বলুন তো?

ম্যানেজারবাবু মুখ তুলে তাকালেন ওঁর দিকে। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, সার্ভেন্টরা বলছে....

—কি, কি বলছে?

ম্যানেজারবাবু ফিসফিস করে বললেন, একজন বোর্ডারের সঙ্গে কদিন ধরেই নাকি খুব

মেলামেশা কবছিলেন ভদ্রমহিলা।

ভদ্রমহিলা শব্দটাকে যেন ব্যঙ্গ করে উঠল ওঁর কথাটা। ধূর্জটিপ্রসাদ চটে গেলেন। অসম্ভব অসম্ভব।

ম্যানেজারবাবু বললেন, না, না ; আমার কথা নয়। ওরাই বলাবলি করছিল। অবশ্য নাও হতে পারে।

অর্থাৎ ম্যানেজারবাবু একটু ভয় পেযে গেলেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ মনে মনে বললেন, ওদের কি দোষ, আমিও তো কাল বাত্রে কল্যাণসুন্দরের কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। কেন ? কেন ?

ম্যানেজারবাবু চাপা গলায় আবার বললেন, সেই পূর্ণবাবু, সতেরো নম্বরের পূর্ণবাবু, কাল রাত্রেই কিন্তু বিল মিটিয়ে হঠাৎ চলে গেলেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ কোনও কথা বললেন না, শুধু মাথা নাড়লেন। হতে পারে না, হতে পারে না। করবীকে উনি দেখতে পাচ্ছেন, হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কপালে বড় একটা সিঁদুরের টিপ। একটা পবিত্র নিষ্পাপ মুখ।

ম্যানেজারবাবুর চোখে চোখ রেখে কেমন উদাস বিষণ্ণতায় মাথা নাডলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। হতে পারে না, হতে পারে না। তারপর নিখিলেশেব সঙ্গে দেখা করার জন্যে, সান্ত্বনা দেবার জন্যে সিঁড়ি বেযে ওপরে উঠে গেলেন। কিন্তু কি বলে সান্ত্বনা দেবেন। এখন ওর মুখের দিকে তাকাতেও অস্বস্তি।

দোতলায় উঠেই দেখলেন নিখিলেশের দরজা বন্ধ। কড়া নাডবেন কিনা ভাবছেন, তার পাশের ঘর থেকে এক ভদ্রলোক বেরিযে এলেন, কাধে তোয়ালে হাতে টুথব্রাশ। কাল রাত্রে ওঁকে দেখেছিলেন।

ধূর্জটিপ্রসাদকে দেখে খাটো মাপের পেশিবহুল চেহারাটা এগিয়ে এল। কাঁধের ওপরই যেন মাথাটা বসানো, মাঝখানে গলা বলে যেটুকু ছিল তাও কাঁধে ফেলা তোয়ালেতে ঢাকা পডে গেছে। সে জন্যেই চেহারায় কেমন একটা চাপা চাপা ভাব।

উনি এগিয়ে এসে বললেন, আমার স্যার একটা কথা বলার আছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ ওঁর কথা বলার ধরনে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। —বলুন।

ভদ্রলোক ততক্ষণে টুথব্রাশটা মুখেব ভেতব গুঁজে দিয়েছেন। ব্রাশ করতে করতে টুথপেস্টের ফেনা মাখানো মুখে থেমে থেমে বললেন, কাল কিন্তু আমি....করবীদেবীর.....বা অন্য কারো....গলা....শুনেছি....মনে হচ্ছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ অবাক হয়ে তাকালেন। অর্থ বুঝলেন না। একটু অস্বস্তিও লাগছিল, কারণ লোকটি চাপা কণ্ঠে বলার চেষ্টা করলেও এমনই দরাজ গলা, ওঁর ভয় হল নিখিলেশ শুনতে পাবে।

ভদ্রলোক মুখের ফেনা জব্দ করতে করতে বললেন, মানে ঘুমের মত এসেছিল। (থামলেন) একটা মেয়েলি গলা। (থামলেন)। নিখিলেশবাবু....নাঃ, আসলে তন্দ্রামত আসছিল তো। ভুল হতেও পারে। তবে কে যেন একবার চিৎকার করে উঠেছিল। বোধহয় নিখিলেশবাবুই।

বলেই ভদ্রলোক মুখ ধুতে চলে গেলেন।

নিখিলেশের দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। যেন করবীর আসার আশায় দরজাটা খুলেই রেখেছিল সে।

ওর সেই ভেঙে পড়া উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, সেই মুখ ধূর্জটিপ্রসাদের মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। দেখেছিলেন, খাটের পাশে পা ঝুলিয়ে বসে আছে, দু হাতে ভর দিয়ে। মাথাটাও ঝুলে পড়েছে।

ধূর্জটিপ্রসাদকে দেখে উদ্গ্রীব হয়ে তাকাল। যেন করবীর কোনও খবর এনেছেন কিনা জানতে। তারপর মাথাটা আবার ঝুলে পড়ল।

একটা মানুষকে ভুল বোঝা কত সহজ। একটা মানুষের জীবনে, বা একটা পরিবারের জীবনে কিছু ঘটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া চাই। সকলেই তাই করছে। একটাও সমবেদনার হাত এগিয়ে আসে না, সাহায্যের হাত এগিয়ে আসে না।

সি-বিচে আবছা অন্ধকারে কল্যাণসুন্দরকে গান গাইতে দেখে, আর একটি নারীর ছায়াশরীরকে উঠে দাঁড়াতে দেখেই উনিও তো ভুল করেছিলেন। ভেবেছিলেন, তনুশ্রী।

মনের মধ্যে এক একটা ধারণা গড়ে ওঠে ছোট্ট কোনও ঘটনা থেকে। আর সেই ধারণা নিয়েই আমরা একটা মানুষের গোটা চেহারাটা বানিয়ে তুলি।

সেজন্যেই তো সেই রাত্রে কল্যাণসুন্দরের বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

এখন ওর মুখোমুখি হতেও অস্বস্তি হয়।

মালা একদিন গর্ব করে বলেছিল, আমিই কিন্তু ওঁকে আবিষ্কার করেছি।

—আবিষ্কার ? হেসে ফেলেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

মালা বলেছিল, আবিষ্কারই তো। উনি তো প্রথমে পরিচয় দিতে চাননি।

এখন বোধ হয় কল্যাণসুন্দরই সকলকে, এই জগৎকে আবিষ্কার করে ফেলেছে।

এই জগৎ ধূর্জটিপ্রসাদও চিরে চিরে দেখছেন। যতই দেখছেন অবাক হয়ে যাচ্ছেন।

এক একটা ঘটনা মানুষকে কত বদলে দেয়। মানুষেব ইমেজটাও।

সে অনেককাল আগেকার কথা।

একদিন আপিস থেকে ধূর্জটিপ্রসাদকে বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন বিজয়বাবু।

সেই তনুশ্রীকে প্রথম দেখলেন। মায়া হল। বোধ হয় ওর ফুটফুটে ন বছবের মুখ আর ঐ পায়ের শ্বেতি চিহ্নটার জন্যে।

মাঝে মাঝে বুকটা ফাঁকা ফাঁকা লাগলে, নিঃসঙ্গ বোধ কবলে, তখন আর বইয়েব পাতায় মন বসত না। ছুটে যেতেন বিজয়বাবুব বাড়ি।

শান্তা এসে বসত, গল্প করত। তনুশ্রীকে ডেকে কাছে নিয়ে বসতেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

ধূর্জটিপ্রসাদ একদিন একটা বিরাট গ্যাস বেলুন হাতে নিয়ে ঢুকলেন।—কই, তনু কই ? এসো, তোমার জন্যেই এনেছি!

তনুশ্রীর সেদিন কি আনন্দ। ন বছরের মেয়েটা খুশিতে ওঁকে জড়িয়ে ধরেছে, কাঁধে উঠেছে।

আর তখনই শান্তা, ওর মা, মাপা হাসি আব চাপা গলায় বলে উঠেছে, অসভ্যতা করো না তনু, সরে এসে বসো। বিরক্ত করো না ওঁকে।

কোনটা বিরক্ত করা, কোনটা ভালবাসা, ওবা বোঝে না।

তখন ওঁর মনে একটা নেশা লেগে গেছে। প্রায় প্রতিদিনই অফিস-ফেরতা যেতে শুরু করেছেন বিজয়বাবুর বাড়ি।

খবরটা আপিসে জানাজানি হতেই একটা কানাঘুসো. হাসাহাসি শুরু হয়েছিল। ধূর্জটিপ্রসাদ টেরও পাননি।

বিজয়বাবু মানুষটা খোলামেলা। তাঁকে কে যেন বলেছিল, একটা ব্যাচেলার মানুষ, অনেকে অনেক কিছু বলা-কওয়া করে। আপনি ওঁকে অত বিশ্বাস করবেন না।

বিজয়বাবু হেসে উঠেছিলেন। গায়ে মাখেননি কথাটা। ধূর্জটিকে ওরা চেনেই না। তার চেয়ে বড় কথা, শান্তাকেও চেনে না।

কিন্তু রসিকতা করেই একদিন শান্তাকে বলে ফেললেন, ধূর্জটি কার টানে রোজ রোজ আসে বলো তো ?

শান্তা ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, তনুর জন্যে, ওকে ভীষণ ভালবাসেন।

বিজয়বাবু থার্ড ব্রাকেটের মত সাদা পুরুস্টু গোঁফে পরিহাস মিশিয়ে বলেছিলেন, ওটা তো উপলক্ষ।

শান্তা অবাক হয়ে বিজয়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আর বিজয়বাবু হাসতে হাসতে আপিসের সেই হিতৈষী লোকটির কথাগুলো বলেছিলেন শান্তাকে।

শুনে শান্তা প্রায় অট্টহাসি হেসে উঠেছিল।

ধূর্জটিপ্রসাদ কিছুই বুঝতে পারেননি। এমন কি শান্তার প্রতি ভিতবে ভিতরে তাঁর কোনও আকর্ষণ হয়েছিল কিনা তাও জানেন না।

লক্ষও করেননি, বিজয়বাবুর বাড়ি গেলে শান্তা দু-চারটে কথা বলেই চলে যায়।

এক একদিন এক একটা জিনিস নিয়ে যেতেন উনি তনুশ্রীর জন্যে। লজেন্স, টফি কিংবা ক্যাডবেরি। শান্তা হঠাৎ একদিন বললে, ওসব আনবেন না। ওসব আনতে হলে বরং আসবেন না আপনি।

ধূর্জটিপ্রসাদ কিছুই বুঝতে পারেননি। এমনকি বিজয়বাবুর সঙ্গে আড্ডা দেবার সময় প্রথম প্রথম দেখতেন সবাই এসে বসেছে। শান্তা, তনুশ্রী, কখনও অন্য দু বোন। হঠাৎ একদিন মনে হল শুধু বিজয়বাবু আর উনি মুখোমুখি বসে আছেন।

উনি নিজেই অস্থির বোধ করলেন। চিৎকার করে ডাকলেন, তনু, তনু কোথায়!

শান্তা এসে দাঁড়াল। মাপা হাসি চাপা গলায় বললে, ওব টিউটর এসেছে, পড়ছে। একটু থেমে বললেন, এখন ওর উঁচু ক্লাশের পডা।

বলেই শান্তা চলে গিয়েছিল।

ধূর্জটিপ্রসাদ বিষণ্ণ হযে গিয়েছিলেন। দামী কার্পেট-পাতা বড় সাজানো ঘরখানা একেবারে শূন্য মনে হয়েছিল। মনে মনে হিসেব করে দেখেছিলেন, অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে। তনুশ্রীর এখন উঁচু ক্লাশের পড়া। তনু এত বড় হয়ে গেছে?

তারপরও প্রায়ই শুনতেন, তনু নেই। কিংবা তনু বেরিয়ে গেছে।

একটু একটু করে বিজয়বাবুর বাড়ি যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একটা লুকোনো স্নেহ বুকের মধ্যে অভিমান নিয়ে মুষড়ে পড়েছিল।

তারপর এই এতদিন বাদে বিজয়বাবু বালির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে ডাকলেন, ধূর্জটি। ধূর্জটি।

তনুশ্রীও ছুটে এসে প্রণাম করল।

আর ধূর্জটিপ্রসাদের সাবা মন খুশিতে ভরে গেল।

—তনু, এত বড় হয়ে গেছ?

স্বর্গদ্বারের কাছে ভাড়া নেওয়া বাড়িতে গেলেন বিজয়বাবুর সঙ্গে।

শান্তা হেসে বললে, আমাদের ভুলে গিয়েছিলেন!

ধূর্জটিপ্রসাদের মনে হল আবার সেই পুবনো দিনে ফিরে গেছেন। সব ঠিক তেমনি আছে। কোথাও কোনও পরিবর্তন হয়নি। ভুল, ভুল বুঝেছিলেন উনি সবাইকে।

সেজন্যেই তো তনুশ্রীর জন্যে এত উদ্বেগ। এত ভয়। চারাগাছের মত ওকে বেড়া দিয়ে দিয়ে একটা সুখী জীবনের দিকে নিয়ে যেতে চান। ও যেন কষ্ট না পায়।

অথচ বিজয়বাবু একেবারে অন্য মানুষ। ঢেউ কেটে কেটে কল্যাণসুন্দরের সঙ্গে অনেক দূরে চলে যাচ্ছিল বলে উনি চিৎকার করে ডেকেছিলেন, তনু, তনুশ্রী, দূরে যেও না আর।

বিজয়বাবু হেসে হেসে বলেছিলেন, তুমি বড্ড ভীতু হে ধূর্জটি।

ধূর্জটিপ্রসাদ জানেন, ওঁকে শুধু তাকিয়ে দেখতে হবে। যা কিছু ঘটুক না কেন। ওঁর শুধু উদ্বেগ আর কষ্ট। তনুশ্রীর ওপর ওঁর কোনও অধিকার নেই। বেশ কয়েকদিন আগের সেই

দৃশ্যটা ভুলতে পারছেন না। ভয় সেজন্যেই। তখন করবীও ছিল। নিখিলেশ ছিল।

সেই দিনটার পরই তো করবীর জন্যেও ভয়-ভয়। সে-জন্যেই তো কল্যাণসুন্দরের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন সেই রাত্রে। করবীর খোঁজে।

কদিন থেকেই বইয়ের পাতায় মন বসছিল না ধূর্জটিপ্রসাদের। সব সময় নিজেকে অস্থির অস্থির লাগছিল।

বিকেলের জানালা থেকে দেখলেন রোদ পড়ে এসেছে। ঘরের মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। কোথায় যাবেন ঠিক করতে পারলেন না। তখন কিছুই ভাল লাগছে না ওঁর।

সমুদ্রস্নানের দৃশ্যটা ওঁর তখনও চোখে লেগে আছে। তনুশ্রীর অভিমানের মুখখানা। তারপর কখন অভিমান ভেঙেছে দেখেননি। হঠাৎ দেখেছিলেন দুজনে ঢেউয়ের পর ঢেউ পার হয়ে যাচ্ছে।

কল্যাণসুন্দর বলেছিল, আসুন না একদিন।

করবী সেদিন সকালেই বলেছিল, আমরা সবাই যাব আজ, চলুন না আপনিও।

বইটা শব্দ করে বন্ধ করলেন, জামাটা গায়ে দিয়েই হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

যাই, কল্যাণসুন্দরের ওখানেই যাই।

কল্যাণসুন্দরকে ভালই লেগেছে। বেশ সপ্রতিভ। মনেব মধ্যে কোনও খাদ নেই। কেমন সহজ ভঙ্গিতে কববীকে হাত ধবে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল। মেয়েদের সঙ্গে মেশায় ওর কোনও জড়তা নেই। প্রাণচঞ্চল সজীব মানুষ একটা। দেখলেই ভাল লাগে। কিন্তু এই সব মানুষকে বড়ো ভয়ও করে।

বিজয়বাবু আর শান্তার অবশ্য ওকে খুবই ভাল লেগেছে।

বিজয়বাবু তো মেয়েদের স্বাধীনতা দিয়েছেন প্রথম থেকেই। তবু নিজেই দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছিলেন বনশ্রীর, বড় মেয়ের। দু বছর যেতে না যেতেই স্বামীব সঙ্গে বনিবনা হল না বলে বনশ্রী ফিরে এল। ভিতরেব কষ্ট আর সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলে বনশ্রী এই সুখের সংসারে নিজেকে মিলিয়ে নিয়েছে। একটা কলেজে লেকচারাব। হয়তো কোনওদিন ওকে আবার কেউ বিয়ে করতে চাইতে পারে। ওকে দেখে কেউ পিছনের ইতিহাসটা আন্দাজ করতে পারে না। আর মঞ্জুশ্রী, সে যাকে বিয়ে করবে ঠিক করেছে, হপ্তায় হপ্তায় তাকে চিঠি লেখে বিলেতে।

—একটু সাবধান হলে দোষ কি। ধূর্জটিপ্রসাদ না বলে পারেননি একদিন।

বিজয়বাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন, দিনকাল পাল্টে গেছে ধূর্জটি। তনু তো এখন সাবালক হয়ে গেছে। যদি কাউকে ভাল লাগে আমি আপত্তি করব কেন। তারপর হেসে উঠে বলেছিলেন, নিজের নিজের ব্যবস্থা করে নিলে আমি তো ফ্রি ম্যান হে।

আর একটু থেমে বলেছিলেন, মেয়েদের আমি যে-ভাবে মানুষ করেছি, ওরা বোকার মত কিছু করে বসবে না।

আসলে বড় মেয়ে বনশ্রীর ব্যাপারটাই ওঁকে এমন করে দিয়েছে কিনা কে জানে। সব দেখেশুনে, অনেক ভেবেচিন্তে, খোঁজখবর নিয়েই তো বিয়ে দিয়েছিলেন। বিজয়বাবু তাই কথায় কথায় হাসতে হাসতে বলেন, কিছুতেই কিছু হয় না হে ধূর্জটি, যতই অঙ্ক কষে চলো, একজন কে হঠাৎ হঠাৎ সব গরমিল করে দেয়। তার চেয়ে মানুষ নিজের সুখ নিজেই বেছে নিক।

কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের একটাই মায়া। তনুশ্রীর জন্যে। কেন, সে-কথা কাউকে কোনওদিন বলতে পারেননি।

করবী বলেছিল, আমরা সবাই যাব আজ, চলুন না আপনিও।

হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে কল্যাণসুন্দরেব বাড়িটায় পৌঁছে গেলেন। তখন বিকেলের নরম রোদ্দুর পড়েছে সমুদ্রের ওপারে।

ধূর্জটিপ্রসাদকে দেখেই ছুটে এল কল্যাণসুন্দব।—আসুন, আসুন, আমার কি ভাগ্য। আমিই তো যাব ভেবেছিলাম, পর্বতই চলে এল আমাব কাছে!

ওর বাড়ির সামনে বিশাল খোলা বারান্দা। বেশ উঁচু প্লিন্থ। সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন। তার আগেই সকলকে দেখতে পেয়েছেন। সবাই হৈ-হল্লা কবছিল।

বারান্দায় এসে বুঝলেন ব্যাপারটা। অঞ্জলি আর অঞ্জলিব স্বামীকে দেখতে পেলেন। নিখিলেশ আর করবীকেও।

সেদিনের কথা মনে পড়লে ধূর্জটিপ্রসাদের বুকেব ভিতব কষ্ট হয। যেন চোখের সামনে করবীর সজীব উচ্ছল মুখখানা দেখতে পান।

ধূর্জটিপ্রসাদ হাসি-হাসি মুখে সকলেব দিকে তাকালেন। অরুণেন্দু, অরুণেন্দুর স্ত্রী আর মালাকে দেখলেন। দূরে থামের ধারে দাঁড়িয়েছিল তনুশ্রী।

ওদেব কারও কারও হাতে দেখলেন অটোগ্রাফের খাতা। কারও হাতে শুধুই কাগজ কিংবা একসারসাইজ বুক।

বুঝতে পারলেন সবাই অটোগ্রাফ নিতে চায়।

অঞ্জলি নতুন কেনা অটোগ্রাফ খাতাটা এগিয়ে দিল, প্রথম পাতাতেই আপনাব নাম থাক। একটা কিছু লিখে দিন।

মালা বললে, আমাকে কিন্তু প্রথমে। আমিই তো আপনাকে আবিষ্কার করেছিলাম। অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে বললে, জানেন অঞ্জলিদি, প্রথমে পবিচযই দেননি, নাম জানতে পেবেই আমি চেপে ধবলাম।

কল্যাণসুন্দর লাজুকের মত হাসল।

ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন, খ্যাতিব তো বিডম্বনা আছে, সেজন্যই বিখ্যাত লোকবা নিজেকে লুকিযে রাখে।

কল্যাণসুন্দর বললে, ধূর্জটিবাবুব মত পণ্ডিত ব্যক্তিব সামনে আমি কি অটোগ্রাফ দিতে পারি?

ধূর্জটিপ্রসাদ খুশি হয়েছিলেন। বিনয করে বলেছিলেন, আপনারা হলেন স্রষ্টা।

ওরা সকলেই অটোগ্রাফের জন্যে ঘিবে ধরেছিল কল্যাণসুন্দরকে।

আর তখন ধূর্জটিপ্রসাদ লক্ষ করলেন তনুশ্রী একটা থামের গায়ে ঠেস দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে আছে।

কল্যাণসুন্দরেরও বোধহয় চোখ পডল। অটোগ্রাফ দিতে দিতে ও হঠাৎ বললে, তনুশ্রী এত চুপচাপ কেন? তোমার কি অটোগ্রাফ চাই না?

আর তখনই তনুশ্রী কেমন অদ্ভুত গলায় বললে, আমিও তো ভিড়েরই একজন। বলে হাসবার চেষ্টা করল।

ধূর্জটিপ্রসাদ বিস্মিত হয়ে তাকালেন ওর মুখের দিকে। কল্যাণসুন্দরের মুখেব দিকেও। না, কল্যাণসুন্দরের মুখে কোনও পরিবর্তন লক্ষ করলেন না।

কিন্তু তনুশ্রীর কথাটা কেমন যেন লাগল। আমি তো ভিড়েরই একজন। কি বলতে চাইল তনুশ্রী?

অরুণেন্দুর স্ত্রী তখন বলছে, দু লাইন কিছু লিখে দিন, ফিরে গিয়ে পাতা ওলটালে আপনার কথা মনে পড়বে।

করবী হেসে বললে, না, মনে পড়লেই বরং পাতা ওল্টাব।

কল্যাণসুন্দর দু হাত মেলে দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, কিন্তু আমি? আমার কাছেও

তো কিছু থাকা চাই, যাতে আপনাদের মনে পড়ে।

বলেই ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। একটা ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে এল।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান, সব্বারই ছবি রাখব।

বলে পর পর ছবি তুলে গেল সকলের। যাকে সামনে পাচ্ছিল তারই ছবি তুলছিল পট পট করে।

এক ফাঁকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তনুশ্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, এই, এখানে এসে দাঁড়াও, ওখানে আলো কম।

তনুশ্রী মাথা নেড়ে বললে, না।

কল্যাণসুন্দর হাসতে হাসতে বললে, এসো না, তোমার ছবি ভালই হবে।

আর তনুশ্রী মাথা নেড়ে বলে উঠল, না, আমার ছবি তুলবেন না বলছি!

কল্যাণসুন্দর হেসে উঠল। ধূর্জটিপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বললে, একেবারে স্কুল গার্ল। তনুশ্রীর গলা নকল করে ঠাট্টা করল, আমার ছবি তুলবেন না বলছি।

সবাই হেসে উঠল।

আর ক্যামেরা ঘুরিয়ে কল্যাণসুন্দর তাব ছবি তুলতে যেতেই দু হাত নেড়ে তনুশ্রী বলে উঠল, তুলবেন না, তুলবেন না বলছি।

বলেই দু হাতে মুখ ঢাকল। আর ধূর্জটিপ্রসাদের মনে হল, মুখ নয়, কান্না।

সঙ্গে সঙ্গে সকলের সামনে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল তনুশ্রী। লোহার গেট পার হয়ে বালির ওপর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে চলে গেল।

ধূর্জটিপ্রসাদ অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। দেখলেন, তনুশ্রী বালিব ওপর দিয়ে দৌড়চ্ছে, দৌড়চ্ছে।

৬

অঞ্জলির স্বামীর দিকে তাকিয়ে আমার প্রথম দিনই মনে হয়েছিল, ভদ্রলোকের চেহারায় হাবভাবে এমন একটা স্মার্টনেস আছে আমার মধ্যে যার একান্তই অভাব। একেই ব্যক্তিত্ব বলে কিনা জানি না, কিন্তু এরাই চড়চড করে উন্নতি করে কিংবা একেবারে উন্নত চেয়ারে এসে বসে। দেখেছি অধস্তন লোকেরা এদের রীতিমত সমীহ করে।

হোটেল থেকে বেরনোর সময় সেদিন ওঁর শার্টের দিকে চোখ পড়েছিল। বিলিতি টেক্সচারাইজড শার্টিংয়ের জামা, দামী জোডিয়াক টাই ওঁর টুটি টিপে ঝুলছিল। ও সব আমার নাগালের বাইরে, এবং ওসবের জন্যে একটা লোভ যে আমার ছিল না তাও নয়। কিন্তু সমুদ্রের ধারে ভোরবেলায় বেড়াতে যাওয়ার সময় এই দৃশ্য নিশ্চয়ই হাস্যকর। তবু ওঁকে যেন সব কিছুই মানিয়ে যাচ্ছিল।

টাই আমি পরি না, আমার এই সামান্য চাকরিতে টাই পরলে লোকে হাসবে। কিন্তু পুজোর সময় আমার জন্যে টেক্সচারাইজড শার্টিংয়ের একটা জামা করানোর খুব ইচ্ছে ছিল করবীর। তার আগেই বোনাসের টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল। করবী বলেছিল, বাবাকে বলব।

শুনে আমার আরও খারাপ লেগেছিল। সম্ভবত নিজের অক্ষমতার জন্যেই।

অঞ্জলির স্বামীর শার্টের ঐ কাপড়টা করবী চিনতে পেরেছে কিনা বুঝতে পারলাম না। পুজোর সময় ও যেটা দেখেছিল সেটা অন্য ডিজাইনের।

অঞ্জলি প্রতিদিন ভোরবেলাতেই এসে ওকে ডাক দিত। সমুদ্রের ধারে চলে যেতাম ঝিনুক কুড়োবার জন্যে। অঞ্জলি বলেছিল, খুব সকালে গেলে নাকি অনেক রঙবেরঙের ঝিনুক পাওয়া যায়।

প্রথম দিন অঞ্জলির স্বামীও এসেছিলেন।—যাবেন নাকি নিখিলেশবাবু?

অঞ্জলিও বললে, কি রে করবী, যাবি তুই ?

যাওয়ার ইচ্ছে আমার একটুও ছিল না। চোখ থেকে তখনও ঘুম ছাড়েনি।

তবু বললাম, চলুন যাওয়া যাক্।

আমি জানতাম করবী যেতে চাইবে। ও আগেই বলে রেখেছিল, সানরাইজ দেখব, একটু সকাল সকাল উঠো।

আমি জবাব দিয়েছিলাম, অত ভোরে কি ওঠা যায়। তুমি বরং এই বারান্দা থেকে দেখো।

করবী বলে উঠেছে, আহা রে ! সেজন্যেই যেন এসেছি এখানে।

ও একটুও বিমর্ষ হয়নি, রাগ দেখায়নি। সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, বেশ বেশ, ঘুমিয়ো তুমি যত খুশি। আমি অঞ্জলিদের বলে রেখেছি, ওদের সঙ্গেই চলে যাব।

কিন্তু সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখার সময়, সমুদ্রের ধারে ধারে ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে করবী সারাক্ষণ অঞ্জলির স্বামীর সঙ্গে হাসাহাসি করছিল, গল্প করছিল। যেন আমার অস্তিত্বই ও ভুলে গেছে। আমার ভিতরে ভিতরে একটা চাপা রাগ গুমরে উঠছিল।

ওঁর সঙ্গে করবীর অত হেসে হেসে কথা বলাটাই আমার চোখে বেমানান লাগছিল।

অথচ অঞ্জলি তো আমার সঙ্গে সেভাবে গল্প করছিল না।

ফিরে এসে ওর কুড়নো ঝিনুকগুলো জলে ধুয়ে পরিষ্কার করতে করতে করবী বললে, অঞ্জলির স্বামীটা কিন্তু খুব রসিক লোক, একটু ইংরিজি বেশি বলে এই যা।

এখানে এসেই আমার মনে হচ্ছে করবী যেন আরো দূরে সরে যাচ্ছে। ও যেন এখন আর শুধু আমার নয়। আমাদের নয়।

মা বলে দিয়েছিল, পৌঁছেই একটা চিঠি দিস্ হানু।

করবীকে বলেছিল, ওকে মনে পড়িয়ে দিও বৌমা। হানুর অত সব মনে থাকবে না।

আমি অপেক্ষা করেছিলাম, ও মনে পড়িয়ে দেয় কিনা দেখার জন্যে।

ও কিন্তু কিছুই বলল না। যেন যা কিছু পিছনে ফেলে এসেছে সবই মুছে গেছে ওর জীবন থেকে। এই উদ্দাম চঞ্চল জীবনের মধ্যে ও যেন একটা বিচিত্র নেশার স্বাদ পেয়ে গেছে। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও আমার বুকের মধ্যে একটা কাঁটা খিচখিচ করে লাগছিল।

আমি ওর সামনেই বসে বসে একটা চিঠি লিখলাম। তারপর ভাবলাম হোটেলের লোকদের হাতে ওটা ডাকে দেবার জন্যে বলে দিয়েও কোনও বিশ্বাস নেই। তার চেয়ে আমি নিজেই ওটা ডাকবাক্সে দিয়ে আসি।

চিঠিটা ডাকে দেব বলে আমি বের হচ্ছিলাম, করবী হঠাৎ টেবিল থেকে রিস্টওয়াচটা এনে বললে, ঘড়িটা পরেই যাও। লাল শার্টটাও এনে দিল।

হেসে বললাম, এই তো কাছেই ডাকবাক্স, ঘড়ি কি হবে ?

ও বললে, এখুনি আসছি বলে কত দেরি করবে তার তো ঠিক নেই।

আমি খুশি মনেই বের হলাম। কিন্তু মনে একটা খোঁচা লাগল।

অঞ্জলির স্বামী অত সেজেগুজে বেরোয় বলেই কি এসব করছে করবী ? ও কি আমাকে অঞ্জলির স্বামীর সমান সমান করার চেষ্টা করছে ! কিন্তু সেটা তো অসম্ভব। এর আগে তো তার হাতে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক ঘড়ি দেখেছি। এদের সঙ্গে পাল্লা দেবার উপায় হল একেবারে সাদামাটা পোশাক, প্যান্টে ইস্ত্রি থাকবে না। আসলে পাল্লা দেওয়ার কথা আসছে কেন। একজন জায়গা পায়নি বলে বাধ্য হয়ে এখানে এসেছে, আর একজন অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে রাখা টাকায়, দুদিনের জন্যে বেহিসেবী হতে।

দেখে মনে হয় অঞ্জলির সমস্ত ব্যাপারটাই অঞ্জলির স্বামীর চোখে একটা খেলা। বেশ

বোঝা যায় এই ঘাড়ের ওপর ছড়ানো বব ছাঁট, অর্ধমুক্ত মসৃণ কাঁধ থেকে গড়িয়ে পড়া জ্যোৎস্নার ঢেউ, শাড়ির আড়াল থেকে উঁকি দেওয়া শ্বেতশুভ্র এক ফালি নাভিদেশ, এবং তার চোখের দৃষ্টি, ঠোঁটের হাসি, সবই যেন একটা সাজানো নৈবেদ্য। কিন্তু অঞ্জলির স্বামীর ব্যক্তিত্বের হাতে একটা অদৃশ্য লাটাই আছে, সুতোর টানে ঘুড়িটাকে সে আকাশ থেকে যে কোনও মুহূর্তে নামিয়ে আনতে পারে, অন্তত তার লুকনো হাসি এবং অঞ্জলির প্রতি তার কপট অমনোযোগ দেখে তাই মনে হয়।

চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে ফিরে আসছিলাম। স্বর্গদ্বারের মোড়ে একটা দোকানের সামনে হঠাৎ ভিড় দেখে তাকালাম। ভিড়ের মধ্যে দেখি বিজয়বাবুরাও রয়েছেন। আর ওঁর মেয়েরা ছিল বলেই হয়ত সবাই ভিড় করেছিল।

আমি এগিয়ে গেলাম, কৌতূহলবশত উঁকি মেরে দেখলাম ওরা কি দেখছে। বিজয়বাবুর পিঠে হাত দিয়ে ফেলেছিলাম বলেই উনি ফিরে তাকালেন।—আরে, নিখিলেশবাবু যে। একা কেন, আপনার তো জোড়ে আসার কথা।

বিজয়বাবুর স্ত্রীও নাম শুনে ফিরে তাকিয়ে একটুখানি হাসলেন।

উঁকি দিয়ে দেখলাম, একজন এক টুকরো পাথরের ওপর নরুনের মত কি একটা দিয়ে কুঁদে কুঁদে একটা মূর্তি গড়ছে। ক্রমশ মূর্তিটা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল চোখের সামনে। এই ধরনের ছোট ছোট মূর্তি দোকানে দোকানে অঢেল বিক্রি হতে দেখেছি, কয়েকটা কিনে নিয়ে যাব ভেবেও রেখেছিলাম। কিন্তু চোখের সামনে খোদাই করতে কখনও দেখিনি। মুগ্ধ হয়ে আমিও দেখছিলাম, একটি সুন্দর নারীমূর্তি একটু একটু করে গড়ে উঠছে। নাক মুখ চোখ, তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি, একটি অশোকতরুর শাখার দিকে হাত বাড়ানো লাস্যময়ীর মূর্তি হয়ে উঠছিল সাদামাটা সফটস্টোনের টুকরোটা। একই পাথর, শিল্পীর ছোঁয়া লেগে এখন অন্য রূপ।

তনুশ্রী লোকটাকে কি সব টুকিটাকি জিগ্যেস করছিল আর সে কাজ করতে করতেই উত্তর দিচ্ছিল।

আমি কিছুক্ষণ দেখেই বললাম, চলি।

দেরি করতে পারি বলেই হয়তো করবী ঘড়িটা পরে আসতে বলেছিল। আমি নিজেই বোধহয় ঐ সব আজেবাজে কথা ভেবেছি। অঞ্জলির স্বামীর কথা।

বিজয়বাবু বললেন, আজ বিকেলে আমাদের ওখানে কল্যাণসুন্দর আসবে। অনেককে বলেছি, আপনারাও আসুন না।

ওঁর স্ত্রী মৃদু হেসে বললেন, করবীকে নিয়ে আসবেন কিন্তু।

হাসতে হাসতে বললাম, দেখি, তাঁর আবার মেজাজ ভাল থাকলে হয়।

নেহাতই কথার কথা। কল্যাণসুন্দর সম্পর্কে ওরই তো আগ্রহ।

ফিরে এসে কিন্তু আমার মেজাজ বিগড়ে গেল।

ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে করবী কি একটা কথায় শব্দ করে হেসে উঠল। রুমালে জড়ো করা ঝিনুকগুলো দেখাল যাকে, এগিয়ে এসে তাকে দেখেই আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম। সেই ছোকরা যে গতকাল বিকেলে করবীর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বালির ওপর ছবি আঁকা দেখছিল।

সে বললে, ঠিক আছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বলে যাবার সময় আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, কিন্তু আমার ভ্রূকুটি অথবা রাগ বুঝতে পেরে তার হাসি নিভে গেল।

করবী হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল। নিজের মনেই বললে, বাঁচা গেল, পূর্ণবাবু একটা কৌটো দেবেন বললেন।

আমি কোনও কথা বললাম না।

এই ব্যাপারটা নিয়ে সকালেই রাগারাগি হয়েছিল। ঝিনুক কুড়িয়ে এনে থেকেই ও একটা

কৌটোর খোঁজ করছিল।

হোটেলের বাচ্চা চাকর সদানন্দকে ডেকে বলেছিল, বেশ আদুরে ঢঙে, বাবা সদানন্দ আমাকে একটা টিনের কৌটো জোগাড় করে দেবে ?

আমরা তো পয়সা দিয়ে হোটেলে আছি। সদানন্দকে যা হুকুম করব তাই করে দেওয়ার কথা। কৌটো দরকার হয়, পয়সা ফেলে দিলেই হবে, কিনে আনবে। তার জন্যে আবার অত মোলায়েম হওয়া কেন।

কিন্তু করবী ওকে ব্রেকফাস্ট আনতে বলার সময়েও এমন বাবাবাছা করে কথা বলে দেখে গা জ্বলে যায়।—সদানন্দ ভাই, আমাকে একটু গোলমরিচ গুঁড়ো এনে দাও না।

আমি রেগে গিয়ে বলেছিলাম, ওভাবে বলার কি দরকার। শুধু কি চাই বললেই তো পার। আমরা তো টাকা দিয়েই আছি।

আমি ইচ্ছে করেই হেঁকে বললাম, এই সদানন্দ, সেদ্ধ ডিম দুটো নিয়ে গিয়ে বদলে নিয়ে আয়, এ তো ইঁট হয়ে গেছে।

করবীর নিশ্চয় আমার এই কথা বলার ধরন খারাপ লেগেছিল।

বলেছিল, দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেও তুমি ওদের সঙ্গে এভাবে কথা বলছ কেন।

আমার মধ্যে একটা রাগ জমা হচ্ছিল। বললাম, দু দিনের জন্যে এসেছি বলে কি গায়ে ঢলে ঢলে পড়তে হবে !

করবী ঝট করে ফিরে তাকাল। ওর মুখ দেখেই বুঝলাম, প্রচণ্ড রেগে গেছে। আমাকে চোখ সরিয়ে নিতে হল।

আর একটু পরেই যখন সদানন্দ ডিম বদলে নিয়ে এল তখনই করবী আবার বলেছিল, সদানন্দ ভাই, একটা কৌটো দেখে দাও না, ঝিনুকগুলো রাখব।

কিন্তু সেই একটা সামান্য কৌটোর জন্যে ঐ পূর্ণ না পূর্ণবাবু লোকটার সঙ্গে এত হেসে হেসে কথা বলার কি আছে। ওর কাছে চাওয়াই বা কেন।

আমার সারা গা জ্বলে গেল, যখন সদানন্দ একটা বেবিফুডের কৌটো এনে করবীকে দিয়ে বললে, সতেরো নম্বরের বাবু দিলেন।

ঝিনুকগুলো একটা খবরের কাগজের ওপর রেখে নিজের মনেই রঙ মিলিয়ে মিলিয়ে সাজাচ্ছিল ও। টিনটা হাতে পেয়েই হেসে উঠে বললে, বাঁচালে !

বেশ বুঝতে পারছিলাম ও আমার দিকে ইচ্ছে করেই তাকাচ্ছে না। সেজন্যে আরও রাগ হচ্ছিল।

আসলে করবীর ওপর আমার যে কোনও অবিশ্বাস আছে, তা নয়। কিন্তু অন্য বোর্ডাররা কি ভাববে। আমি ছিলাম না, অথচ করবী ওর সঙ্গে এভাবে হেসে হেসে কথা বলছে দেখলে ওরা তো কত কি বলাবলি করতে পারে ! অঞ্জলির স্বামীর চোখে পড়লে করবীর সম্পর্কে কি ভাববে ? করবীর সম্পর্কে কিছু ভাবা মানেই তো সেটা আমার গায়ে এসে লাগা।

করবী একবার কি একটা জিগ্যেস করল আমার দিকে না তাকিয়েই।

আমি ক্ষেপে গিয়ে বললাম, জানি না।

ব্যস, ও আর কোনও কথাই বলল না। আমিও গম্ভীর গম্ভীর থাকলাম।

দুপুরে কেউই সমুদ্রে স্নান করতে গেলাম না। আমার নিজের যাওয়ার ইচ্ছে তো ছিলই, ওকেও বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজি করাব ভেবেছিলাম।

খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরে একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ও হঠাৎ বললে, যাই অঞ্জলিদের সঙ্গে একটু আড্ডা দিয়ে আসি।

বলে আমার দিকে একবার তাকিয়েই বেরিয়ে গেল।

আমাকে রাগাবার জন্যেই। আমি গম্ভীর গম্ভীর ভান করছিলাম। কিন্তু আবার কথাবার্তা বলে স্বাভাবিক হবার সুযোগ খুঁজছিলাম। ফুর্তিতে কয়েকটা দিন হেসে-খেলে কাটাব বলেই আসা। কত কি অফুরন্ত আনন্দের স্বপ্ন দেখেছিলাম, অথচ এমন একটা ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে যে মনের মধ্যে সুখ নেই, উপরন্তু অশান্তি।

করবী চলে যাচ্ছে দেখে ওকে বললাম, বিজয়বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কল্যাণসুন্দর আসবেন ওঁর ওখানে, যেতে বললেন।

করবী যেতে যেতে বললে, জানি।

বলেই চলে গেল।

জানি! অর্থাৎ সকালে কোন সময়ে অঞ্জলিদের সঙ্গে কথা হয়েছে। যখন চিঠি ফেলতে গিয়েছি হয়তো তখনই। ঐ ঝিনুক রাখার জন্যে কৌটোর খোঁজেই গিয়েছিল।

আমি গুম্ হয়ে রইলাম। সারা দুপুর একা-একা বিছানায় শুয়ে ছটফট করলাম, একবার উঠে বসি, একবার শুয়ে পড়ি। ঘুমও এল না।

হানিমুন শব্দটা তখন আমাকে ব্যঙ্গ করছে।

এই এক প্যাকেট সিগারেটে আমার সারাদিন চলে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই প্যাকেট শেষ হয়ে গেল। বেশ বুঝলাম একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে যাচ্ছি।

সকালে ঝিনুক কুড়োতে যাবাব সময় অঞ্জলির স্বামী একটা দামী সিগারেটের প্যাকেট বের করে আমাকে একটা দিয়েছিলেন, নিজে একটা নিয়েছিলেন। তারপর রনসন লাইটাব বের করে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। পর পর আরও কয়েকটা ধরিয়েছিলেন। আমি আর সিগারেট নিইনি। ফেরাব পথে আমার একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু কম দামী প্যাকেটটা বেব করতে হবে এই অস্বস্তিতে সিগারেট ধরাইনি।

এ-সব নিয়ে অন্য সময় অস্বস্তি হয় না। আমার যে ব্র্যান্ড পছন্দ আমি তাই খাব, তাতে কার কি বলার আছে। আপিসে বা আড্ডায় এই অস্বস্তি কখনও হয় না। কিন্তু অঞ্জলি করবীর বন্ধু বলেই কেমন একটা প্রতিযোগিতার ভাব এসে গেছে। অঞ্জলির স্বামীর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে আমি কি একটা কমপ্লেক্সে ভুগছিলাম?

সারা দুপুর অঞ্জলিদের ওখানে কাটিয়ে বিকেল বেলায় বেশ খুশি খুশি ভাবে ও তেতলা থেকে নেমে এসেই বললে, এই, বিজয়বাবুদের ওখানে যাবে না?

ড্রেসিং টেবলের সামনে দাঁড়িয়ে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতে শুরু করল ও।

সাজগোজ কবতে করতেই হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে বললে, কি, যাবে না?

আমি এক মুহূর্ত ওব মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটার প্রকৃত অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। ও কি উত্তর চাইছে? ও কি চাইছে আমি বলে উঠি, না, যাব না। অথবা বলতে চাইছে, চলো তুমি।

করবী বড় স্যুটকেশটার ভেতর থেকে ধোপদুরস্ত প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট বের কবে দিল।

কল্যাণসুন্দরকে সেদিনই দেখলাম। আলাপ হল। তাকে নিয়ে এত মাতামাতির কি আছে বুঝলাম না। তবে ভদ্রলোক বেশ মিশুকে। কোনও অহঙ্কার নেই। অর্থাৎ আছে, তবে সেটা লুকিয়ে রাখেন। একটা জিনিসই ভাল লাগছিল, অঞ্জলির স্বামীকে কেউ তেমন সমীহ করল না।

এই পৃথিবীটা বড়ো বিচিত্র জায়গা। যে যতই সফল হোক বা ওপরে উঠুক তার সম্মান পাবার জায়গা একটা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। সকলেরই এক একটা বাসরঘর আছে, যেখানে একমাত্র সে-ই খাতির পায়। কল্যাণসুন্দর এসে এমন উজ্জ্বল হয়ে আছে যে, অঞ্জলির স্বামী এখানে একেবারে মুহ্যমান। আবার খেলার মাঠে গেলে, তা কেন, ট্রেনের রিজার্ভেশন

কাউন্টারের সামনে কল্যাণসুন্দরও নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।

দিন কাটছিল।

যতই দিন কাটছিল করবী ততই বদলে যাচ্ছিল। সমুদ্রের মধ্যে কিছু একটা নেশা আছে। মানুষের বুকের মধ্যেও একটা সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে।

আমার নিজের মধ্যেও কি কোন পরিবর্তন ঘটছিল?

খুব ভোরবেলায় সমুদ্রের ধারে বেড়াতে, সমুদ্র এবং সূর্যোদয় দেখতে ভালই লাগে। তবে করবী যতখানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত আমার তেমন কিছু মনে হত না। বুঝতে পারছিলাম করবীর মধ্যে একটা সুপ্ত শিল্পীমন আছে, যা আমার একেবারেই নেই। ও সূর্যোদয় দেখতে দেখতে দু একটা কবিতার লাইন আউড়ে গিয়েছিল। আমি ফুটবল খেলা দেখা নিয়েই এতকাল মেতে থেকেছি, চাকরি করেছি, করবীর ভিতরে আর কিছু আছে কিনা তার খোঁজ রাখিনি। বিজয়বাবুদের বাড়িতে এবং পরেও কল্যাণসুন্দরের সঙ্গে ও যখন কথা বলেছে, তখনই প্রথম বুঝতে পেরেছি ও অন্য জগতের মানুষ। কল্যাণসুন্দরও ওর প্রশংসা করেছে। করবীর এই দিকটা আমার অচেনা ছিল। সেই দিকটার পরিচয় পাওয়ার পর থেকে আমার যেমন একটু গর্বও হচ্ছিল, তেমনি আবার ভয়-ভয়।

পরের দিন ভোরে ঝিনুক কুড়োতে যাবার সময় অঞ্জলি একাই এল। হাসতে হাসতে বললে, ও পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, যাবে না।

করবী হেসে বললে, আমাবটিও তাই, জোর করে না নিয়ে গেলে যেতই না।

হাসলাম ওর কথায়।

কিন্তু একটা খটকা লাগল। অঞ্জলির স্বামীর সঙ্গে করবীর ঐ অত হাসাহাসি, কথা বলা, আর বারবার এগিয়ে এগিয়ে যাওয়া অঞ্জলির চোখেও হয়তো খারাপ লেগেছে। কিছু রাগারাগি হয়েছে কিনা কে জানে। সেজন্যেই হয়তো আসেনি।

আমি সেই লাল শার্টটা পরেছিলাম।

অঞ্জলি ঠাট্টা করে করবীকে বললে, তোর বরটাকে দারুণ দেখাচ্ছে রে!

আমরা হাসলাম।

সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার অঞ্জলিকে ভালই লাগছিল। বাঁ-হাতে শাড়ির কুচি মুঠো করে বেশ কিছুটা তুলে ধরে ঢেউভাঙা জলের ওপর দিয়ে হাঁটছিল অঞ্জলি। ওর ধবধবে ফর্সা পায়ের গোছ দেখা যাচ্ছিল।

করবী ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে এক এক বার পিছিয়ে পড়ছিল। ইচ্ছে করে কিনা বুঝতে পারছিলাম না।

অঞ্জলি আমার সঙ্গে দিব্যি সপ্রতিভ ভাবেই গল্প করতে করতে হাঁটছিল আর মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ে ঝিনুক কুড়োচ্ছিল। আমার চোখ বারবার আটকে যাচ্ছিল ওর কালো ব্লাউজের ফ্রেমে বাঁধানো চৌকো কণ্ঠতটের উন্মুক্ত মসৃণ সাদা জায়গাটুকুতে। সৌজন্যবশত চোখ সবিয়ে নিতে হচ্ছিল। একবার সুন্দর একটা ঝিনুক পেয়ে আমাকে দেখাতে ছুটে এল।—দেখুন, দেখুন, কি পেয়েছি! যেন একটা অমূল্য রত্ন কুড়িয়ে পেয়েছে। এমনভাবে গা ঘেঁসে এসে সেটা দেখাল এবং হেসে উঠল যে, আমার মুহূর্তের জন্যে একটু বিভ্রম ঘটল।

ফিরে তাকিয়ে দেখি করবী দাঁড়িয়ে পড়ে ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে গল্প করছে।

এরপর আমি একটা রঙিন ঝিনুক কুড়িয়ে পেয়ে অঞ্জলিকেই ডেকে দিয়ে দিলাম। বললাম, এই নিন। আরও সুন্দর।

অঞ্জলি হাত পেতে নিল, তারপর বললে, আপনার বউ কিন্তু রেগে যাবে। বলে হাসল।

ও কথা বলতে বলতে হাসছিল, আর মাথা ঝাঁকিয়ে বব করা চুল ঘাড়ের ওপর

সুদৃশ্যভাবে সাজিয়ে নিচ্ছিল। আবার একটা ঝিনুক পেয়েই একেবারে ঘন হবার মত কাছে এসে দেখাল, তারপর সরে গিয়ে পিছন ফিরে চিৎকার করল, করবী, দ্যাখ, দ্যাখ, কি পেয়েছি।

করবী ছুটে এল, দেখল। বললে, ছাই। এই দ্যাখ আমারটা।

সেদিন আমার মনমেজাজ বেশ খুশি-খুশিই ছিল।

ঘরে ফিরেই করবী আড়চোখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই বললে, কি ব্যাপার, খুব যে....

আমি বুঝতে পারিনি ভাব দেখিয়ে বললাম, কি।

—না, কিছু না।

করবী একটা কিছু বললে আমি তো বলতে পারতাম যে আগের দিন অঞ্জলির স্বামীর সঙ্গে ওর অত হাসাহাসি, এগিয়ে এগিয়ে হাঁটাও সমান দৃষ্টিকটু। ও তখন বুঝত।

কিন্তু তা যেন হবার নয়।

সকালের রাগারাগির পর অঞ্জলিদের ওখানে সারা দুপুর কাটিয়ে এসে চুলে চিরুনি দিতে দিতে ও হঠাৎ বললে, এবার ফিরে গিয়ে আমি অঞ্জলির মত বব করব।

আমি বলে উঠলাম, পাগল নাকি! এই চুল কেউ কেটে ফেলে!

তারপর বললাম, মা একদম পছন্দ করে না।

আসলে অঞ্জলির মাথা ঝাঁকানো, এবং ঘাড় অবধি চুল আমার ভালই লেগেছিল, কিন্তু করবীর বেলায় তা পছন্দ নয়। কিন্তু বব চুলের কথা ও কেন বলল?

ও কি টের পেয়েছে অঞ্জলিকে আমার ভাল লাগছে? সেজন্যেই কথাটা শোনাল?

আমি ভাবলাম, ধূর্জটিপ্রসাদেব সঙ্গে দেখা হলেই ওর রাগ পড়ে যাবে।

ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে আমাদের মাঝে মাঝেই দেখা হত। সি-বিচে ভোরবেলাতেও কয়েকদিন দেখা হয়েছে। একদিন করবী ওঁকে আমাদের হোটেলে ডেকে নিয়ে এল। চা খাওয়াল।

ধূর্জটিপ্রসাদ সেদিন সমুদ্র সম্পর্কে কত কি বলেছিলেন, আমরাও মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলাম।

আমি কথা প্রসঙ্গে রিজার্ভেশনের কথা তুলেছিলাম, অনেক আগে থেকে না করলে এখানে ট্রেনে রিজার্ভেশন পাওয়া নাকি খুবই কঠিন।

ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন, সে আমি বলে দেব, আমার চেনা লোক আছে।

সঙ্গে সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদকে আমার খুব আপন মনে হল। ওঁকে আমার ভীষণ ভাল লেগে গেল। একটা মানুষের কাছে উপকার পেলেই সে কত তাড়াতাড়ি আপন হয়ে যায়।

ওঁকে দেখলেই মনে হত, ভিতরে কোথায় একটা নিঃস্বতা আছে। বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে সে জায়গাটাই ভরিয়ে তুলতে চান। করবীর কথাবার্তায় কেমন একটা মায়ামমতার ভাব আছে। সে-জন্যেই ওকে বোধহয় এত ভালবাসেন। উনি বোধহয় কারও কাছে স্নেহ-ভালবাসা পাননি। আর তাই হয়তো যাকেই দেখেন ভালবেসে ফেলেন। অরুণেন্দুবাবুরা ওঁকে একেবারেই চিনতে পারেনি।

আর সেদিনই কল্যাণসুন্দরের সঙ্গে আলাপ হতেই মনে হল এ যেন একেবারে বিপরীত চরিত্র। দেখে মনে হয় ক্রমাগত মানুষের ভালবাসা কুড়িয়ে চলেছে। এবং তার নিজের মধ্যেও যেন ভালবাসা উপছে পড়ছে।

সেদিন দেখা হতেই ধূর্জটিপ্রসাদ প্রশ্ন করে বসলেন করবীকে, কি, সমুদ্রস্নান হল?

আমি সেদিনও একা-একা সমুদ্রে স্নান করেছি, কিছুতেই করবীর ভয় ভাঙাতে পারিনি। করবী পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলের স্নান দেখেছে। অঞ্জলি আর অঞ্জলির স্বামীও সমুদ্রের জলে নেমেছে সেদিন, তবু করবী ওদের সেই বড় রঙিন ছাতার ছায়ায় বালিতে বসে কাটিয়ে

দিয়েছে।

আমি তাই হেসে বললাম, না, ভয় ভাঙাতে পারলাম না।

আমার নিজেরও খারাপ লাগছিল। এত দূর অবধি এসে করবী একদিনও সমুদ্রে স্নান করবে না? মা তো ফিরে গেলেই জিগ্যেস করবে। তখন আমাকেই দোষ দেবে। তাছাড়া যে-কোনও আনন্দ দুজনে মিলে উপভোগ না করলে কি তৃপ্তি হয়!

শেষ অবধি আমি একদিন করবীকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজি করালাম। ও একখানা তোয়ালে নিয়ে বের হল। কিন্তু সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে মত বদলে ফেলল। বললে, তুমি আগে যাও তো।

ওর এই একগুঁয়েমি দেখে রেগে গেলাম ভিতরে ভিতরে। সমুদ্রকে এত ভয় করার কি আছে আমি বুঝলাম না।

আমি রেগে গিয়ে একা একাই জলে নামলাম। করবী পাড়ে দাঁড়িয়ে রইল। এটা ক্ষোভ না রাগ জানি না। আসলে এখানে এসে সকলেই তো ঢেউয়ের সঙ্গে নাচানাচি করে, এটাই তো সবচেয়ে বড় আনন্দ। অথচ করবীর কেন যে ইচ্ছে হচ্ছিল না বুঝতে পারলাম না। আমার ইচ্ছেকে ও কোনও দাম দিল না।

হোটেলে ওকে যখন রাজি করানোর জন্যে চেষ্টা করছি তখনই ও একবার হেসে ফেলে বলেছিল, মা গো, ভিজে কাপড়ে উঠে আসব আর সবাই প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে থাকবে। ও আমি পারব না।

ওটাই কি একমাত্র কারণ? আমি বিশ্বাস করিনি। এখানে সকলেই তো জলে নামে, স্নান করে, কেউ পাড়েই কাপড় বদলে নেয়, কেউ বা ভিজে কাপড়েই হোটেলে ফিরে আসে। এ নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই।

আমি জলে নেমে সবে দু-একটা ঢেউ সামলে এগিয়ে যাচ্ছি, দেখি কল্যাণসুন্দরও স্নান করছেন একটু দূরে।

হঠাৎ দেখি কল্যাণসুন্দর হাত নেড়ে কাকে ডাকছেন। পাড়ের দিকে তাকাতেই দেখলাম করবীও হাত নাড়ছে। কল্যাণসুন্দর তারপরই জল থেকে উঠে গিয়েই করবীকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এলেন। করবীর বিশেষ আপত্তি দেখলাম না আর।

ঘটনাটা খুবই সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে ঘটে গেল। ওটা এমন কিছু অশোভনও মনে হল না। কিন্তু আমার রাগ হল অন্য কারণে। আমার এত অনুনয়-বিনয়ের তা হলে করবীর কাছে কোনও দামই নেই। কল্যাণসুন্দরের ডাক তো কই ও উপেক্ষা করতে পারল না।

চাপা রাগ নিয়েই আমি একসময় করবীর কাছে গিয়ে বললাম, চলো এবার ওঠা যাক।

ও তখন ভীষণ খুশি। জলের মধ্যে দাপাদাপি করতে করতে বললে, আরেকটু। আরেকটু।

আমি একটুক্ষণ পরে প্রায় ধমকের স্বরেই বললাম, চলো চলো, অনেক হয়েছে, আর নয়।

ও রেগে রেগে আমার সঙ্গে উঠে এল, হঠাৎ বললে, তাড়াতাড়ি যদি উঠেই পড়বে তা হলে নামতে বলেছিলে কেন।

আমি রেগে গিয়ে বললাম, থাকলেই পারতে, আমি তো বারণ করিনি।

ও কোনও কথা বলল না।

আমিও কোনও কথা বললাম না।

ডাইনিং হলে গিয়ে খেতে বসার মেজাজ তখন নষ্ট হয়ে গেছে। আমি সদানন্দকে ডেকে বললাম, ঘরে খাবার এনে দাও।

আর করবী বাথরুমে ঢুকল সারা শরীরের লেগে থাকা বালি ধোবার জন্যে।

নিজেদের ঘরে খেতে বসলাম।

বাথরুম থেকে আরেকবার স্নান সেরে শাড়ি বদলে করবী চুল আঁচড়াতে শুরু করল। ও কিছুতেই যেন মুখোমুখি হচ্ছিল না। কেবল এটা-ওটা নিয়ে ব্যস্ততা দেখাচ্ছিল।

আমি ভাতেব থালার সামনে চুপচাপ বসে অপেক্ষা করছি দেখে বললে, তুমি খেয়ে নাও, আমি এখন খাব না।

মনে হল ও খুবই রেগে আছে। রাগটা কি জন্যে ? সমুদ্রের নেশায় আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারেনি বলে, নাকি নেশাটা কল্যাণসুন্দরের জন্যে। ভাবতেই আমার গা জ্বালা করে উঠল।

ঝট করে উঠে পড়ে বললাম, আমিও পরে খাব।

করবী ফিরে তাকাল। বললে, বেশ বেশ। বসছি আমি।

ও বসল। আমিও বসলাম। মুখোমুখি। কিন্তু কেউ আব কোন কথা বললাম না। খাওয়ার সময় এই সব রাগাবাগি আমার একটুও ভাল লাগে না।

সহজ হবার জন্যে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললাম, কাল যতক্ষণ ইচ্ছে....

কথা শেষ কবার আগেই ওব কানের দিকে চোখ গেল। দুটো কানই চুলে ঢাকা থাকলেও দেখতে পেলাম দুকানেই দুল নেই।

বলে উঠলাম, এই, তোমার দুল কি হল ?

ও শান্তভাবে বললে, খুলে রেখেছি।

কিন্তু আমার কেমন একটা সন্দেহ হল। ঐ দুলেব কথা কিছুতেই ভুলতে পাবছিলাম না। ও যে-ভাবে চুল দিয়ে কান ঢেকেছিল তাতে ওকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। ও ভাবে কান ঢেকেছিল কেন ?

খাওয়ার পর আবার বললাম, দুল পরে নাও, কানে দুল না থাকলে তোমাকে কেমন অন্যরকম লাগে।

ও এড়িয়ে যাবার মত করে বললে, পরে 'পরব।

আমার সন্দেহ বেড়ে গেল। প্রায় ধমক দিয়ে বলে উঠলাম, মিথ্যে কথা বলো না, কই দেখাও তো দুলজোড়া।

ও ধরা পড়ে গেল। মুখ কাচুমাচু করে তাকাল আমার দিকে। তারপর ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ থেকে একটা দুল এনে প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, সমুদ্রে স্নান করার সময় আরেকটা কখন পড়ে গেছে।

দুটো বড় বড় মুক্তো বসানো ইয়ার-বিং বিয়ের সময় মা দিয়েছিল।

আমার ভিতরের চাপা রাগটা হঠাৎ ফেটে পডল। বলে উঠলাম, কখন আবার ! কল্যাণসুন্দরের সঙ্গে যখন ছুটোপুটি করছিলে তখনই।

করবী এমন এক দৃষ্টিতে তাকাল যে চোখ নামিয়ে নিতে হল।

আমি কথা পাল্টানোর জন্যে বললাম, ফিরে গিয়ে মা যখন জিগ্যেস করবে, কি বলব বলো তো।

করবী কোনও কথাই বলল না। ওর মুখ দেখে মনে হল দুলটা হারিয়ে ওর মনও খারাপ হয়ে আছে। নাকি কল্যাণসুন্দর সম্পর্কে কথাটা বলেছি বলে।

করবী রসিকতা করে বলেছিল, হানিমুন। অথচ এখানে এসে থেকেই তিক্ততায় মন ভরে উঠছিল। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, ফিরে যাই, সেই চার দেয়ালের দমবন্ধ হওয়া বন্ধনই ছিল ভাল। এখানে করবীর কাছে যেন আমার কোনও ইচ্ছে-অনিচ্ছে পছন্দ-অপছন্দের দাম নেই।

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়াব পর এলাচ সুপুরি চিবোতে চিবোতে করবী বেশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বললে, সি-বিচে যাচ্ছি।

বলে গটগট করে বেরিয়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পব এ-সময়টায় অনেকেই গিয়ে বসে। বাত্রিব সমুদ্র বড উত্তাল হয়ে ওঠে, ঢেউ এগিয়ে আসে অনেক কাছ অবধি। শুক্লপক্ষেব আবছা আলোয় সমুদ্রের ঢেউগুলো রহস্যময় লাগে আর ব্রেকার্সের ফেটে পডা সাদা ফেনায় যখন সমুদ্র ছেয়ে যায় তখন বড়ো সুন্দর দেখায়।

প্রতিদিনই আমি আব কববী গিয়ে এ-সময় সমুদ্রের পাডে বসি।

কিন্তু কল্যাণসুন্দবকে নিয়ে সকালে খোঁটা দেওয়ার ফলে ও হঠাৎ কেমন জেদী হয়ে উঠল। কিংবা প্রচণ্ড রেগে ছিল। সাবাদিন প্রায় কথাই বলেনি। বিকেলে বেডাতে যেতেও রাজি হয়নি।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়াব পর বললে, সি-বিচে যাচ্ছি।

বলে বেরিযে গেল। অর্থাৎ আমাকে সঙ্গে যেতেও বললে না।

দুর্ভাবনাব কিছু ছিল না। কিন্তু ও এভাবে একা-একা চলে যাবে, আমার মতামতের তোয়াক্কা না করুক, আমাকে যেতেও বলবে না, আমি ভাবিনি।

আমি বারান্দায় বেরিয়ে দেখলাম ও সি-বিচে গিয়ে দাঁডিযে আছে। আরও কেউ কেউ ছিল বলেই নিশ্চিন্ত বোধ করলাম।

কিন্তু কল্যাণসুন্দর নামটা আমার মনেব মধ্যে একটা বিষের কাঁটা হয়ে রইল।

আমাব আর করবীব মনোমালিন্য একটু একটু করে এমন পর্যায়ে উঠেছিল যে আমরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি সুযোগ পেলেই ওকে আঘাত করতে চাইছিলাম। আর ও ক্রমাগত আমাকে উপেক্ষা করছিল। যেন আমার মতামতের কোনও দামই নেই ওর কাছে।

সবচেয়ে অসহ্য লাগছিল দিনের পর দিন আমাকে অভিনয় কবতে হচ্ছিল বলে। বাইরের লোকেব সামনে আমাদের আদর্শ সুখী স্বামী-স্ত্রী সেজে থাকতে হচ্ছিল। কথা বলতে হচ্ছিল, হাসতে হচ্ছিল।

তৃতীয় ব্যক্তি সরে গেলেই আবাব যেমনকার তেমনি।

অঞ্জলি বা অঞ্জলির স্বামী একটুও টের পায়নি। আমরা ভোরবেলায় ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ছিলাম, করবী ঝিনুক কুডোতে কুডোতে আমাকে দু একটা কথাও বলছিল। কিন্তু ঘরে ফিরেই চুপচাপ।

এই ভাবে চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার একটা কারণও ছিল।

ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছিলেন, ট্রেনে রিজার্ভেশনের ব্যাপারে বলে দেব. আমার চেনা লোক আছে।

ওঁর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে স্টেশনে গিয়েছিলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও লোকটির দেখা পেলাম না। শুধু চোখের সামনে একটা লম্বা লাইন দেখে ফিরে এলাম। আমার মন-মেজাজ এমনিতেই বিগডে গিয়েছিল অতক্ষণ অপেক্ষা করেও তার দেখা না পেয়ে। উপরন্তু খোঁজ নিয়ে দেখলাম লাইনে দাঁড়িয়ে রিজার্ভেশন পেতে হলে আরও কয়েকদিন থেকে যেতে হবে। হিসেব করে দেখে একটু অস্বস্তি, একটু ভয় হচ্ছিল।

সঙ্গে যা টাকা নিয়ে এসেছি অতদিন থাকতে হলে হোটেলের চার্জ দিতেই ফুরিয়ে যাবে।

বিক্ষিপ্ত মনে এবং ধূর্জটিপ্রসাদের ওপরই রেগে গিয়ে আমি ক্লান্ত শরীরে হোটেলে ফিরে এসে দেখি সেই পূর্ণবাবু আমার খাটে বসে বালিশে কনুই রেখে গল্প করছে আর করবী বেতের চেয়ারটায় বসে। তখনই কি একটা কথায় শব্দ করে হেসে উঠেছে করবী।

পূর্ণবাবু আমাকে দেখে সোজা হয়ে বসে জিগ্যেস করলেন, রিজার্ভেশন পেলেন ?

আমি ওঁর কথায় কোন সাড়া দিলাম না।

পূর্ণবাবু কি বুঝলেন কি জানি, বললেন, আমি চলি।

আমি বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

পূর্ণবাবু চলে যেতেই করবী বললে, তুমি ভদ্রতাও ভুলে গেছ।

আমি বললাম, আমি যথেষ্ট অভদ্র হতে পারছি না এটাই দুঃখ। একটু থেমে বললাম, ঐ লোকটার সঙ্গে তুমি কথা বলবে না বলে দিলাম। ও ব্যাটা এবপর কোনদিন যদি আমার ঘরে ঢোকে আমি ওকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।

করবী ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। তারপর বললে, ছোটলোক।

আমরা কেউ কারও সঙ্গে আর কোন কথা বললাম না।

বিকেলে অঞ্জলি আর অঞ্জলির স্বামী এসে দাঁড়াল দরজাব সামনে। অঞ্জলি বললে, কল্যাণসুন্দরের বাড়ি যাবার কথা আজ, যাবেন না ?

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এমন ভাব দেখাতে হল যেন আমাদের মধ্যে কিছুই ঘটে যায়নি। করবী হাসি-হাসি মুখে বললে, তোরা একেবারে বেডি হযে নেমে এলি ? আমার কর্তাটিব তৈরি হতে এখন কত সময় লাগে দেখি।

আমি অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, আমি তো তৈরি হয়েই আছি, আমাব গিন্নীটি এখন সাজগোজ করতেই সন্ধে হয়ে যাবে।

করবী হেসে বললে, না মশাই না, আমার শুধু শাড়িটা বদলানো। দ্যাখো দু মিনিটেব মধ্যে বেরোতে পারি কিনা।

এ সবই নিছক অভিনয়। এই অভিনয করতেও বুকেব ভিতরে অসহ্য কষ্ট হচ্ছিল। আমরা যখন পরস্পরের সঙ্গে হেসে কথা বলছি, তখন মনে মনে পবস্পবকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করছি।

রাস্তায় বেরিয়ে অঞ্জলি বললে, অটোগ্রাফ নিবি তো ? আনিয়েছিস ?

করবী একটা নতুন অটোগ্রাফ বই দেখাল অঞ্জলিকে। বললে, পূর্ণবাবুকে দিয়ে কিনে আনালাম।

অঞ্জলির স্বামী হেসে উঠলেন। বললেন, পূর্ণবাবু দেখছি তোমাদের খুব বশংবদ। অ্যান ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট।

অঞ্জলি আর করবী দুজনেই হেসে উঠল।

তাহলে এ-জন্যেই করবী ওকে এত খাতির আপ্যায়ন করছিল। আমিই বোকাব মত ভুল বুঝেছি।

আমার মন কিছুটা হাল্কা হল। কিন্তু কল্যাণসুন্দরের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে আমার একটুও ছিল না। ওঁর সামনে সকলে মিলে এমন কাণ্ড করে যে নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হয়। এই মাতামাতির আমি কোনও কারণ খুঁজে পাই না।

তাছাড়া ভদ্রলোককে আমার ক্রমশই খারাপ লাগছিল। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না এমন ভাব করে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে, দেখলেই গা জ্বলে যায়। তবু প্রথম প্রথম ওঁকে সরল ভাবতাম।

কিন্তু আমি ? আমি তো কল্যাণসুন্দরকে পছন্দ করছি না। কিন্তু আমি নিজে ?

গত রাত্রে হোটেলের ডাইনিং হলে খেতে বসে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে।

চারজনের বসার চৌকো টেবিল আর একটাও খালি আছে কিনা খুঁজছি, হল গমগম করছে, হঠাৎ কোণের টেবিল থেকে অঞ্জলির স্বামী ডাকলেন, আসুন, আসুন।

টেবিলে ওরা দুজন, আরও দুজনের জায়গা রয়েছে।

করবী মৃদু হেসে ওদিকেই এগিয়ে গেল। আমিও।

আর করবী কাছে যেতেই অঞ্জলির স্বামী উঠে দাঁড়িয়ে নাটুকে ভাবে বাও করলেন, করবীকে চেয়ার টেনে দিলেন বসার জন্যে।

করবী আর অঞ্জলি হেসে উঠল ওঁর ভাবভঙ্গি দেখে।

উঠে দাঁড়াইনি এবং চেয়ার টেনে দিয়ে অঞ্জলিকে আমি কিন্তু প্রথম দিন বসতেও বলিনি। শুধু মুখে শুকনো একটা 'বসুন' বলেছিলাম। সেজন্যেই একটু সঙ্কোচ লাগছিল। এগুলোকেই ম্যানার্স বলে কিনা কে জানে।

খেতে খেতে গল্প করছিলাম আমরা। অঞ্জলির স্বামীই বেশি হাসছিলেন, বেশি কথা বলছিলেন। আমি দু-একবার অঞ্জলির দিকে তাকালাম। চোখোচোখি হল। অঞ্জলিও হাসছিল। আর আমার কেবলই সেই ঝিনুক কুড়োনোর সময় ঘন হয়ে এসে দাঁড়ানোর ছবিটা মনে পড়ছিল। বেশ বুঝতে পারছিলাম আমার মধ্যে কেমন একটা নেশা জাগিয়ে দিয়েছে ও।

ওর বব করা চুল হাসির দাপটে এলোমেলো হচ্ছিল, বার বার মাথা ঝাঁকিয়ে চুল ঠিক করছিল।

সমুদ্রে স্নান করা নিয়ে কি একটা কথা উঠতেই অঞ্জলির স্বামী বললেন, অ্যাম নট গোয়িং টু মিস এ ডে। এমন ওপেন-এয়ার বিউটি কম্পিটিশন আর কোথায় দেখা যাবে।

অঞ্জলি তখন শব্দ করে হেসে উঠেছে। করবীও মুচকি মুচকি হাসছে।

অঞ্জলির স্বামী বললেন, রিয়াল বডি লাইনস তো ওখানেই ধরা পড়ে।

এবারও অঞ্জলি হেসে উঠল। কিন্তু এ ধরনের কথায় আমার একটু অস্বস্তি লাগছিল। বিশেষ করে মেয়েদের সামনে। করবীর সামনে।

অঞ্জলির স্বামী বললেন, অনেস্টি ইজ নট্ দি বাস্ট পলিসি, জানেন নিশ্চয়।

এ ধরনের নিচু রসিকতা আমার একটুও পছন্দ নয়। কিন্তু অঞ্জলি তখন অট্টহাসে হেসে উঠেছে।

পরমুহূর্তেই আমি টের পেলাম আমার পায়ের ওপর কে যেন নরম পায়ের ঠাণ্ডা বুড়ো আঙুল টিপে রাখল একটুক্ষণের জন্যে।

একটু আগেই এই ব্যাপারটা ঘটেছিল। তখন চমকে পা সরিয়ে নিয়েছিলাম, ইঁদুর-বেড়াল ভেবে।

এবার আর পা সরিয়ে নিলাম না। একটুক্ষণের মধ্যেই সেই স্পর্শটা সরে গেল। আর আমার সমস্ত শরীরে শিহরন খেলে গেল।

অঞ্জলি কি ?

আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু নিঃসন্দেহ হতে পারলাম না। তবু ভাবতে ভাল লাগছিল, অঞ্জলিই। ওর কিংবা করবীর চোখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। ওরা দুজনেই হাসছিল।

কিন্তু কে ? অঞ্জলির স্বামীর ঐ ইয়ার্কির জন্যে করবীই কি গোপনে তার অস্বস্তি বা কৌতুক প্রকাশ করতে চাইল ! না অঞ্জলি ? ওদের যে কেউই হতে পারে।

অথচ কেবলই মনে হচ্ছিল অঞ্জলি।

আর সে কথা মনে হতেই অঞ্জলির চেহারাটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। অঞ্জলির স্বামী মনে হল সব ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। ওর সেই হাতের লাটাই খসে পড়েছে। সুতোর টানে এখন আর ও ঘুড়িটা নামিয়ে আনতে পারবে না।

কিন্তু করবীও তো হতে পারে। আমার বুকের মধ্যে তখন অদম্য কৌতূহল, বুকের মধ্যে একটা মিঠে গুঞ্জরণ। অথচ করবীকে জিগ্যেস করার উপায় নেই। যদি করবী হয়, জিগ্যেস

করলেই তো বলে উঠবে, তুমি কি ভেবেছিলে অঞ্জলি ? আর ও না হলে ঝট করে রেগে গিয়ে বলবে, পায়ে পা ঠেকিয়ে রেখেছিল ! সত্যি বলছ !

আমি এই দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যেই দুলছিলাম। হয়তো একটা নেশাও পেয়ে বসেছিল। আমি অঞ্জলির কাছে পৌঁছতে চাইছিলাম।

ভেবেছিলাম, অঞ্জলিকে মন্দির দেখতে যাওয়ার কথা বলব। অর্থাৎ ওকে একটু কাছে পেতে এবং নিবিড় হতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

কিন্তু সেদিনই ধূর্জটিপ্রসাদ হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, মন্দির দেখেছ ?

করবী সঙ্গে সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদকে বললে, আপনিও চলুন।

গিয়েছিলাম। ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গেই।

তারপর মন্দিরের চারপাশ ঘুরে দেখতে দেখতে উনি এক জায়গায় দাঁডিয়ে পড়ে বলেছিলেন, তোমরা মন্দিরটা ঘুরে দেখে এস।

কল্যাণসুন্দর আর তনুশ্রীকে সেদিন দেখতে পেয়েছিলাম, মন্দিরের পিছন দিকের সিঁড়িতে বসে গল্প করছে। কল্যাণসুন্দর কি বলছিল আর তনুশ্রী মুগ্ধ হয়ে শুনছিল।

তনুশ্রী আমাদের দেখতে পেয়ে হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

আমরা ধূর্জটিপ্রসাদকে সে-কথা কিছু জানতে দিইনি।

করবী প্রথম দিন বিজয়বাবুদের বাড়িতে কল্যাণসুন্দরকে দেখে এবং আলাপ করে ফেরার পথে বলেছিল, ভদ্রলোক কি ভাল। খুব সিম্পল, তাই না ?

আমি মন্দির থেকে ফেরার দিনও তাই করবীকে বলেছিলাম, ভদ্রলোক খুব সিম্পল।

করবী বেশ রাগত স্বরেই বলেছিল, একজন কাউকে ভালবেসে ফেললেই মানুষটা খারাপ হয়ে যায় না।

কল্যাণসুন্দরের বাড়ির দিকে যেতে যেতে আমার কেবলই আশ্চর্য লাগছিল এই কথাটা ভেবে যে, একই মানুষকে দুজনের চোখে দুরকম মনে হয় কেন। এতগুলো লোকের কাছে কল্যাণসুন্দর হিরো হয়ে গেছে। সকলেই মুগ্ধ। অথচ আমি তার চেহারাটা অন্য রকম দেখতে চাইছি, অন্যরকম এঁকে নিতে চাইছি। তাহলে আমার মধ্যেও কি দুটো মানুষ আছে ?

আছেই তো। অঞ্জলি কাছে এলেই আমি তখন অন্য মানুষ।

ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছিলেন, সমুদ্রকে কেউ সুন্দর দেখে, কারও কাছে তা ভয়ঙ্কর।

আমার মনে হল মানুষও বোধহয় তাই। তার মধ্যেও হয়তো একটা ভয়ঙ্কর মানুষ থাকে, একটা সুন্দর মানুষ। আমার মধ্যেও, করবীর মধ্যেও। করবীকে সত্যি এক এক সময় আমার সুন্দর মনে হত, এক এক সময় ভয় পেতে শুরু করেছিলাম।

কল্যাণসুন্দরের বাড়িতে গিয়ে যখন আমরা পৌঁছলাম তখন আরও অনেকে এসে গেছে। তনুশ্রী একাই। ও একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

সকলেই কল্যাণসুন্দরের কাছে অটোগ্রাফ নিল।

অঞ্জলিই বোধহয় বলেছিল, ফিরে গিয়ে অটোগ্রাফের খাতা ওল্টালেই আপনার কথা মনে পড়বে।

আর কল্যাণসুন্দব বললে, আমার কাছেও কিছু থাক, যাতে আপনাদের কথাও আমার মনে পড়ে।

বলে ক্যামেরা নিয়ে এসেছিল। আর তখনই তনুশ্রী পাগলের মত একটা কাণ্ড করে বসল। কেন করল কিছুই বোঝা গেল না। শুধু বুঝলাম, মেয়েটা সত্যি সত্যি কল্যাণসুন্দরকে ভালবেসে ফেলেছে। ও হয়তো কল্যাণসুন্দরকে একা-একা পাবে আশা কবেছিল, এই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে হবে ভাবেনি।

কল্যাণসুন্দর কিন্তু ঐ ঘটনার পরও বিচলিত হল না।

পর পর আমাদের কয়েকটা ছবি তুলল। তারপর হঠাৎ বললে, বাঃ রে, ছবির মধ্যে তো আমিই থাকছি না।

বলে অ্যাপার্চার ঠিক করে দিয়ে ক্যামেরাটা আমার হাতে দিয়ে বললে, তুলুন, তুলুন।

কল্যাণসুন্দর হাসতে হাসতে করবী আর অঞ্জলিকে কাছে আসতে বলল।

আমি ছবি তুলতে গিয়ে দেখলাম ওর দুপাশে করবী আর অঞ্জলি এসে দাঁড়িয়েছে।

ওরা দুজনেই কৌতুকে হাসছিল।

ছবিটা আমিই তুললাম। তুলতে বাধ্য হলাম। কিন্তু আমার এ ছবি তোলার একটুও ইচ্ছে ছিল না।

আমি অক্ষম বিদ্বেষে করবীর ওপবই রেগে গেলাম। কারণ ছবি তোলাব সময় কল্যাণসুন্দর ওদের দু-জনেরই কাঁধে হাত রেখেছিল।

হোটেলে ফিরে এসেই ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি করবীর দিকে তাকিয়ে বেশ রূঢ়স্বরে বললাম, ক্রমশই তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

করবী অবাক হয়ে তাকাল। কিংবা অবাক হবার ভান করল।

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, এই শেষ, আব কোনদিন ঐ লোকটার সঙ্গে এভাবে নাচানাচি করবে না। আমি চাই না তুমি ও লোকটাব সঙ্গে কথা বলো।

করবী ভুরুতে বিস্ময এঁকে বলে উঠল, কল্যাণসুন্দর?

যেন আমি একটা অদ্ভুত কিংবা উদ্ভট কথা বলেছি। যেন কল্যাণসুন্দবকে নিয়ে কারও কোন আপত্তি বা সন্দেহের কারণ থাকতেই পারে না।

—কি বলছ তুমি? করবী আশ্চর্য হয়ে গেছে যেন।

আমি ওব সহজ সবল ভঙ্গি, অবাক-অবাক চোখের দিকে তাকিয়ে আবও বেগে গেলাম। বললাম, আমবা সমুদ্র দেখতে এসেছিলাম, কল্যাণসুন্দরকে দেখতে নয। আমি চাই না তুমি ওব সঙ্গে এখন থেকে কোন সম্পর্ক রাখো, ও একটা স্কাউন্ড্রেল।

সঙ্গে সঙ্গে করবী ক্রুদ্ধ চোখে ফিবে তাকাল।—তোমার চাওয়াটাই বড নয, আমারও একটা ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে।

করবী কথাগুলো এমন দৃঢভাবে বলল, একটা প্রতিজ্ঞার মত শোনাল।

ফেবার সমযেই ওরা সকলে, অঞ্জলি আর অঞ্জলির স্বামী, করবী, অরুণেন্দুবাবু, তার স্ত্রী আর মালা কল্যাণসুন্দবকে গান শোনাতে বলেছিল। ভদ্রলোকের সত্যি অনেকগুলো গুণ আছে, ভাল গানও গাইতে পারেন। একবাব শুনেছি।

কল্যাণসুন্দর বলেছিল, বাত্রে খাওয়া-দাওয়াব পর সি-বিচে আসবেন সকলে। ওখানেই সমুদ্রের ধারে বসে চাঁদের আলোয় গান শোনাব। আব সকলেই সঙ্গে সঙ্গে বাজি হয়ে গেছে।

করবীর মুখ দেখেই বোঝা গেল ও রাত্রে সি-বিচে গান শুনতে যাবে।

আমি সেজন্যেই রেগে গিয়ে কববীকে বললাম, আমি চাই না তুমি ওর সঙ্গে এখন থেকে কোনও সম্পর্ক রাখো। ও একটা স্কাউন্ড্রেল।

করবী বলে উঠল, আমি যাবই।

আমি আরও রেগে গিয়ে বললাম, যাবার পথ তোমার খোলা আছে, কিন্তু তাহলে ফিরে আসার পথ তোমার বন্ধ হয়ে যাবে।

করবী, কেন জানি না, নৃশংসের মত হেসে উঠল।

আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, আমি এতদিন ধরে যে করবীকে চিনতাম এ যেন সেই করবী নয়। সেই ভীতু-ভীতু লাজুক-লাজুক মেয়েটার মধ্যে একটা ঘুমন্ত শিল্পীমন আছে

একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলাম। আজ আবার আবিষ্কার করলাম ওর মধ্যে একটা নির্মম নৃশংস মানুষ আছে। কোনটা সত্যি ? কোন চেহারাটা ওর আসল। আমি বুঝতে পারছিলাম না।

কিন্তু আমি নিজেকে সংযত করতে পারছিলাম না, শান্ত করতে পারছিলাম না। আমার মনে হচ্ছিল একটা সাংঘাতিক কোন দুর্দৈব ঘটতে যাচ্ছে।

আমরা পরস্পরের সঙ্গে আর একটাও কথা বলিনি। রাগ চেপে আমি শুধু অপেক্ষা করে থেকেছি। আমি শুধু দেখতে চাই করবীর ওপর আমার কোন জোর আছে কি না। আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে ও কোন দাম দেয় কি না।

খাওয়া-দাওয়ার পর করবী এলাচ চিবোতে চিবোতে হঠাৎ বললে, সি-বিচে যাচ্ছি। দাঁতে দাঁত ঘসে উচ্চারণ করার মত।

আমি অক্ষম অসহায় রাগে শূন্য ঘরে একা একা পড়ে রইলাম। যেন হেরে গেছি। যেন একটা তুড়ি দিয়ে করবী আমাকে তুচ্ছ করে দিয়ে চলে গেছে।

রাগে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

ক্রমশ রাত বাড়তে লাগল। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেও ইচ্ছে হল না। সমুদ্রের পাড়ে বসে করবী তাহলে আমাকে দেখতে পাবে। ভাববে ওকেই আমি খুঁজছি। কিংবা আমার অনুশোচনা হয়েছে। আমি ওর কাছে হারব না।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি পায়ের শব্দে একসময় টের পেলাম সবাই একে একে ফিরে আসছে। সিঁড়ির ওপর দিয়ে আনাগোনা। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল করবী এখনই ফিরে আসবে।

সেজন্যেই আমি ঘরের দরজায় খিল তুলে দিয়েছিলাম। অথচ আমার বুকের ভেতরটা ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল।

সব শব্দ মিলিয়ে গেল। কিন্তু করবী ফিরছে না কেন।

ঠিক তখনই দরজায় টোকা পড়ল।

আমি সাড়া দিলাম না।

—এই, দরজা খোল। চাপা গলার আওয়াজ। করবীর গলা।

নিঃসন্দেহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার রাগ বেড়ে গেল।

দরজা না খুলেই রুক্ষস্বরে বলে উঠলাম, কে, কি চাই তোমার ?

করবী চাপা গলায় অনুনয় করল, কি হচ্ছে কি, দরজা খোল লক্ষ্মীটি।

আমি চুপ করে রইলাম।

দরজার কড়াটা ও খুব ধীরে ধীরে নাড়াচাড়া করল।

চাপা গলায় বললে, এই, সবাই শুনতে পাবে, খোল।

আমি দরজা খুললাম না। আমি প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠে বললাম, ফেরার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। আর কোন কথা শোনা গেল না। কোন শব্দ শোনা গেল না। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভেতরটা ভয়ে কেঁপে উঠল।

আমি ছুটে এসে দরজা খুললাম।

করবী নেই।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম। ছুটে একবার নীচে অবধি নেমে গেলাম।

তারপর হঠাৎ মনে হল হয়তো অঞ্জলিদের ওখানে গেছে। ওখানেই যাবে, আর কোথায়।

একটা দুর্বোধ্য আশঙ্কা আমার বুকের মধ্যে ছিল। কিন্তু অঞ্জলিদের কাছে সেটা প্রকাশ

করে ফেললে চরম নির্বুদ্ধিতা হবে। করবী হয়তো এখনই ফিরে আসবে, কোথাও লুকিয়েছে। কিংবা অঞ্জলিদের ঘরেই আছে। আমি ওর জন্যে এতখানি বিচলিত হয়েছি দেখলে ওরা এরপর হাসাহাসি করবে।

আমার মন বলে উঠেছিল, কোথায় আর যাবে, আশেপাশেই কোথাও আছে।

আমি তাই খুব শান্তভাবে তেতলায় উঠে গেলাম। অঞ্জলিদের ঘরে কড়া নাড়লাম।

অঞ্জলির স্বামী দরজা খুলে দিলেন।

—করবী এসেছে? আমি হাল্কা সুরে বললাম।

অঞ্জলি হাসল। বললে, বোধহয় সি-বিচে। আজ তো কল্যাণসুন্দরের গান শুনতে যাওয়ার কথা ছিল। আপনি যাননি?

বললাম, না, আমি যাইনি।

অঞ্জলির স্বামী বললে, আমরাও যেতে পারিনি।

আমি শান্ত মুখেই ফিরে আসছিলাম। এদের কাছে উদ্বেগ দেখানো যায় না।

অঞ্জলি রসিকতা করে বললে, বউ পালায়নি আপনাব, এখনি এসে পড়বে। হয়তো গান শুনছে।

আমি নেমে এলাম সঙ্গে সঙ্গে, উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। আমি ঘবে ফিরে এলাম। না, এখনও আসেনি। তা হলে কি সতেবো নম্বরে? দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি ঘরটা তালা বন্ধ। আমি নীচে নেমে এসে সদানন্দকে দেখতে পেয়েই জিগ্যেস করলাম। ও মাথা নাড়ল। না, দেখেনি।

ও বোধহয় হোটেলের গেট বন্ধ কবতে যাচ্ছিল। আমি বললাম, থাক, খোলা থাক। বলে ছুটে বেরিয়ে গেলাম।

বাস্তায় রাস্তায় সি-বিচে তখনও দু চারজন আছে। সি-বিচেব দিকে ঘোবাঘুরি করে কোথাও যখন করবীকে দেখতে পাচ্ছি না আমার দু চোখ ঠেলে জল এল। আমি তখন উদ্‌ভ্রান্ত। কি করব কিছুই বুঝতে পাবছি না।

আমি ছুটতে ছুটতে ধূর্জটিপ্রসাদের হোটেলের দিকে গেলাম। ঐ মানুষটার ওপরই এখন নির্ভর করতে হবে। ভেতরে ভেতরে কেমন আশা হচ্ছিল, করবী হয়তো ওঁর কাছেই গেছে। ওঁর কাছেই সব কথা বলা যায়। হয়তো আমার বাগ ভাঙাবার জন্যে সঙ্গে করে নিযে আসতে গেছে।

আমি ছুটতে ছুটতে ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর আমি কি বলেছি, কি করেছি কিছুই মনে নেই। আমি তখন পাগল হয়ে গেছি।

কিন্তু একটা কথা আমি কাউকেই বলতে পারিনি। ধূর্জটিপ্রসাদকেও না।

আমি বললাম, সি-বিচে কল্যাণসুন্দবেব গান শুনতে গিয়েছিল। আমি তো ভেবেছিলাম ওখানেই বসে আছে।

সত্যি কথাটা কাউকেই বলা যায় না। একটা মানুষ একটা মুহূর্তে এতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে আমি যে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি নিজেকেই নিজে চিনতে পারছি না।

করবীর যে চেহারাটা আমি দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম সেটাকে বদলে যেতে দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। এখন আমার নিজেব চেহাবাটাই আমার কাছে অচেনা।

আমি চতুর্দিকে তাকে খুঁজে বেড়ালাম।

না না, করবী নেই। কোথাও নেই।

বুকের মধ্যে একটা শূন্যতা, একটা হাহাকার। আমার চোখ ফেটে জল এল। কারণ, করবীকে যে আমি সত্যি ভালবাসতাম।

আমি লজ্জায় অপমানে কারও দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। আমি জানি

ওদের মধ্যে একটা নির্দয় অপবাদের গুঞ্জন উঠেছে।

ও সি দিকপতির দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম লোকটা আমার দিকে কঠোর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি বলতে চায়।—নিখিলেশবাবু, আপনি সব কথা খুলে বলছেন না।

দিকপতি কি সন্দেহ করছে আমি করবীকে খুন করেছি?

সব কথা খুলে বলা যায় না। কেউ জানে না, জীবনে এক একটা মুহূর্ত এসে যায় যখন সব কথা বলা যায় না। অথচ সেই সামান্য একটা ব্যাপারের জন্যেই এক একটা মানুষের রূপ বদলে যায়, তার চেহারা একেবারে অন্য রকম হয়ে যায়।

আমি সেই সামান্য অথচ ভয়ঙ্কর কথাটা বলতে পারছি না। পারছি না বলেই সমস্ত লোকগুলো মনে মনে আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।

আমি এখন একটা দো-টানার মধ্যে পড়ে গেছি। আমি ইচ্ছে করলেই এখান থেকে চলে যেতে পারি। কিন্তু কেবলই আশা হচ্ছে আমাকে শুধু যন্ত্রণা দেবার জন্যেই, আমি যাতে নিজেকে চিনতে পারি সে জন্যই করবী ফিরে আসছে না।

কিন্তু আমি কোন মুখে ফিরে যাব। আমার সেই চিরদুঃখী বিধবা মাকে ফিরে গিয়ে কি বলব, গঙ্গার ঘাটে শাঁখা ভেঙে সিঁদুর মুছে যে মা ফিরে এসেছিল সাদা থান কাপড়ের শুদ্ধতায়, আমাদের সুখী করবে বলে শক্ত হাতে সংসার ধরেছিল, তাকে আমি ফিরে গিয়ে কি বলব! কোথায় দিয়ে এলাম করবীকে?

—সে কি রে হানু! মা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠবে।

মায়ার চোখ ভাসিয়ে জল।

আর আমার বুকের মধ্যে হাহাকার।

আমার যে আর ফিরে যাবারও রাস্তা নেই। করবী, তোমাকে ফিরে আসতে দিইনি, তুমি আমার ফেরার রাস্তাও বন্ধ করে দিলে।

৭

ধূর্জটিপ্রসাদের মন এখন শান্ত। নিখিলেশকে সান্ত্বনা দিয়ে গতকাল ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছেন। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে ওঁর মুখ থেকে এমন একটা কথা বেবিয়ে এসেছে যেটা বিশ্বাস করতে ভাল লাগছে।

করবীর কাছেই একদিন কথাটা শুনেছিলেন।

নিখিলেশের ভেঙে পড়া বিষণ্ণ চেহারার দিকে যতবার তাকিয়েছেন, করবী চলে যাওয়ার পর ও যা-কিছু বলেছে, ধূর্জটিপ্রসাদের মনে হয়েছে যেন নিখিলেশেব মনের ভিতর একটা অনুশোচনা গুমরে মরছে। সেজন্যেই কি ওঁর মনে কোথাও একটু সন্দেহ উঁকি দিয়ে গেছে?

—আমার কোথাও আর যাবার জায়গা নেই ধূর্জটিবাবু। নিখিলেশের গলার স্বর একটা শূন্যতার দীর্ঘশ্বাসের মত শুনিয়েছিল।

আর সান্ত্বনা দিতে গিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন, সমুদ্র তো কিছুই নিয়ে নেয় না নিখিলেশ। সবই ফিরিয়ে দেয়।

করবীর সেই কথাটাই। সেই প্রথম আলাপের দিন বলেছিল।

ধূর্জটিপ্রসাদ একখানা হাত রেখেছিলেন নিখিলেশের পিঠে। হাসবার চেষ্টা করে বলেছিলেন, আমার মন বলছে করবীকে ফিরে পাবে।

উনি ঠিক কি বলতে চেয়েছিলেন উনি নিজেই জানেন না।

কিন্তু নিখিলেশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। প্রশ্ন করেছিল, পাব? আপনি বলছেন?

—বলছি।

ট্রেন, ট্রেনের জানালায় নিখিলেশের মুখ একটু একটু করে সরে গেছে। কুয়াশার মত কি যেন এসে সব কিছু ঝাপসা করে দিয়ে গেছে। কিংবা ধূর্জটিপ্রসাদের অশ্রুসিক্ত দুটি চোখ।

ধূর্জটিপ্রসাদের নিজেরই কেমন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়েছে। হয়তো....

সেজন্যেই বুঝি ধূর্জটিপ্রসাদের মন এখন শান্ত।

প্রতিদিনের মতই ভোর বেলাতেই হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সেই অনন্তকালের উষাকে দেখেছেন। উষার পিছনে পিছনে ধাবমান সূর্য শেষে একটা বিশাল সিঁদুরের টিপ হয়ে গেল।

করবীর সেই শান্ত স্নিগ্ধ মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল।

মুনলাইটের ম্যানেজারবাবু বলেছিলেন, কি উপকার যে করলেন ধূর্জটিবাবু।

অঞ্জলি আর অঞ্জলির স্বামী বলেছিল, বাঁচালেন আপনি আমাদের। পারতাম না, আমরা পারতাম না ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে।

ও সি দিকপতি বলেছে, স্যার ঐ সতেরো নম্বরের পূর্ণবাবুর সঙ্গেই হয়তো ভেগে গেছে, কি করে মুখের ওপর ওঁকে বলি সে কথা।

ধূর্জটিপ্রসাদ কোনও কথা বলেননি। ওঁর মনে হয়েছে নিখিলেশ চলে যাওয়ায় এরা সকলেই যেন মুক্তি পেয়েছে। ম্যানেজারবাবু ভাবছেন হোটেল মুনলাইটের অপবাদ এবার মুছে যাবে। অঞ্জলি ভাবছে নিখিলেশের মার সামনে কিংবা করবীর বাবা মার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে না।

ও সি দিকপতি ভাবছে, তার কর্তব্য শেষ।

আর ধূর্জটিপ্রসাদের মন এখন শান্ত। করবীকে এখন আর কোনও ক্লেদ স্পর্শ করবে না। কোনও কলঙ্ক নয়। এখন ওর কাছে করবীর ছবিটা সেই আগের মতই হয়ে যাবে। নিষ্পাপ শিশুর মত সরল।

ধীরে ধীরে হোটেলে ফিরে এলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। ওঁর বুক থেকে এখন একটা বিরাট ভার নেমে গেছে।

নিখিলেশ হাসতে হাসতে বলেছিল, ফ্রেন্ড ফিলজফার অ্যান্ড গাইড, আপনিই তো আমাদের সব।

এই তো সেদিন নিখিলেশ আর করবীকে মন্দির দেখাতে নিয়ে গেলেন। শুনতে পাচ্ছেন, করবী আদুরে আদুরে গলায় বলছে, চলুন না বাবা, আপনি তো কত কি জানেন, বুঝিয়ে দেবেন আমাদের।

ধূর্জটিপ্রসাদ কিছুই জানেন না, কিছুই বোঝেন না। লোকে মনে করে উনি কত কি বই পড়েছেন কত কি জানেন। ওঁর পাণ্ডিত্যকে কেউ কেউ সমীহ করে। এমনকি কল্যাণসুন্দরও। বিজয়বাবুর স্ত্রী শান্তার চোখে উনি কখনও কখনও মুগ্ধ বিস্ময় দেখেছেন। তনুশ্রীদের চোখে। হয়তো অরুণেন্দুরাও ভিতরে ভিতরে ভাবে, উনি একজন বিজ্ঞমানুষ। কত কি পড়েছেন, কত কি জানেন। অথচ জীবনে কত কি ঘটে যায়, কেন যে ঘটে! ধূর্জটিপ্রসাদ তার কিছুই বুঝতে পারেন না। মানুষের মনের মধ্যে আরও একটা বিরাট মহাশূন্য আছে, সে আরও রহস্যময়। জীবনের মতই কখন যে কি ঘটে যায়। কিছুই খুঁজে পান না উনি। অসহায় মানুষকে কে যেন আরও দুঃখী করে দেয়, কেন করে, তার কিছুই ওঁরা জানতে পারলেন না।

কেন এই অসহায় স্নেহ আর ভালবাসা নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হয়? দেখেন আর কষ্ট পান। এখন তনুশ্রীর জন্যে ওঁর উদ্বেগ, ওঁর ভয়। অথচ তার ওপর ওঁর কোনও অধিকার নেই, সাবধান করতে পারবেন না, যেমনটি চেয়েছিলেন, বেড়া দেয়া চারাগাছের

মত তাকে সুখী জীবনের দিকে নিয়ে যেতে পারবেন না। কারণ সেও তার নিজের সুখের পথ নিজেই বেছে নিতে চায়। ধূর্জটিপ্রসাদ ভাবলেন, তা হলে মানুষের কল্পনার ঈশ্বরও কি ঠিক এমনি অসহায় ? এমনি অকারণ ভালবাসা, এমনি অকারণ উদ্বেগ আর তারও কি এমনি অকারণ কষ্ট পাওয়া ?

তনুশ্রীর মুখখানা উনি দেখতে পাচ্ছেন।

বইয়ের পাতার অক্ষরগুলো মিলিয়ে গিয়ে সেখানে কখনও করবীর, কখনও তনুশ্রীর মুখ।

বই আর এখন ধূর্জটিপ্রসাদকে তেমনভাবে টানে না। কি হয় এই সব জ্ঞানগর্ভ বই পড়ে ? কতটুকু জানা যায় ?

চলুন না বাবা, করবী আদুরে আদুরে গলায় বলছে, আপনি তো কত কি জানেন, বুঝিয়ে দেবেন আমাদের।

ওর এই অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি। গিয়েছিলেন। অনর্গল কত কি বলে গেছেন। ইতিহাস শিল্প সমাজের মানুষ। বলেছেন, দেবতার মূর্তি তো এমনি অসম্পূর্ণ হওয়া উচিত। সম্পূর্ণ হলেই সে একটা মানুষ হয়ে ওঠে, মানুষের মত নাক মুখ চোখ।

এখন মনে হচ্ছে মানুষের চেহারাও তো এমনি অসম্পূর্ণ। কোনও মানুষেরই একটা স্পষ্ট ছবি আমরা দেখতে পাই না।

ধূর্জটিপ্রসাদ বুঝতে পারছেন, ওঁর নিজের এই অক্ষম চেহারাও কেউ দেখতে পায় না। ওঁর যৌবনের সেই গোপন দুঃখের দিন থেকেই উনি জানেন, কিছুই শেষ অবধি জানা যায় না। এই সমুদ্রের অবিরাম ঢেউয়ের মতই অনন্তকাল ধরে শুধু খুঁজে বেড়াতে হয়। যা কিছু জানার আছে, যা কিছু জানতে চাই।

আমরা তো শুধু অসহায় চোখ মেলে দেখি। অস্পষ্ট ঝাপসা, অনেক দূর থেকে দেখার মত করে। অন্ধকার রাত্রির শেষ সীমান্তে দাঁড়িয়ে রোমাঞ্চিত উষার আলোকিত বিস্ময় দেখার মত করে।

শোনো করবী, নিখিলেশ শোনো, ধূর্জটিপ্রসাদ বলে যাচ্ছেন, টুরিস্ট বাসে যাবে তো বলছ একদিন। এখান থেকে একটু দূরেই ধাওলি, একবার নেমে দেখো। সেই রক্তগঙ্গা, চণ্ডাশোক ভেবেছিল সব তার হাতের মুঠোয়—সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য, যশ, ভোগ এবং অহঙ্কার। কিন্তু সব পেয়েও কি যেন পাওয়া হল না তার। সেজন্যেই শেষে মুঠি খুলে দিয়ে ধর্মাশোক হয়ে গেল। কিন্তু ধর্মের কাছেও কি সে তার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিল ?

ধূর্জটিপ্রসাদ বলছেন, আর করবী মুগ্ধ হয়ে শুনছে, নিখিলেশ মুগ্ধ হয়ে শুনছে।

এই রাশি রাশি বই, অসংখ্য ধর্মশাস্ত্র বাণী, এত এত ঈশ্বর—সব কিছু এখন মনে হয় অর্থহীন। একজন অজ্ঞ মানুষের কথা যেন আরেকজন অজ্ঞ মানুষ মুগ্ধ হয়ে শুনছে। সেদিন করবী আর নিখিলেশ যে-ভাবে ধূর্জটিপ্রসাদের কথাগুলো শুনেছিল।

সেদিন ঘুরে ঘুরে ওদের মন্দিরগাত্রের মূর্তি আর অলঙ্কারগুলো দেখিয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন মন্দিরের কারুকার্যের দিকে তাকিয়ে।

বলেছিলেন, একদিন তো কোণারক যাবেই তোমরা, কারুকার্য আর মূর্তির সে এক বিশাল মিউজিয়াম, এখানে তো কিছুই নেই।

মন্দির পরিক্রমা করতে করতে পিছনের দিকে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

মন্দিরের পিছনে সিঁড়ির ধাপে বসে আছে কল্যাণসুন্দর, আর তার পায়ের কাছে ঠিক নীচের ধাপটিতে তনুশ্রী উন্মুখ হয়ে শুনছে। তাকিয়ে আছে কল্যাণসুন্দরের মুখের দিকে। কল্যাণসুন্দর কি যেন বলছে, হয়তো কোনও কবিতা আবৃত্তি করছিল, আর তনুশ্রীর সেই

পবিত্র দৃষ্টি, স্নিগ্ধ বিশুদ্ধ প্রেমের মুখ তন্ময় হয়ে শুনছিল।

থমকে থেমে গিয়ে বলেছিলেন, আমি আছি ওদিকে, তোমরা মন্দির পরিক্রমা করে এসো।

এক লহমায় দেখা তনুশ্রীর মুখখানা এখনও মনে পড়ে।

সেই মুখ, সেই চোখের দৃষ্টি ওঁর বুকের মধ্যে ছবি হয়ে আটকে আছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ যথারীতি সকালে সমুদ্রের ধারে ঘোরাঘুরি সেরে বিজয়বাবুদের বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। কোনও কোনওদিন এখানেই দেখা হয়ে যায়। একসঙ্গেই যান। ওখানে বসে গল্প-গুজব করে চা খেয়ে নিজের হোটেলটিতে ফিরে আসেন।

চতুর্দিকে তাকিয়ে খুঁজলেন ওদের, পেলেন না।

এখানে এসে বিজয়বাবুর বাড়ির ওপর ওঁর সেই পুরনো টান ফিরে এসেছে। বিজয়বাবুর স্ত্রী শান্তা বলেছিল, হোটেলের সুখ ছেড়ে কেনই বা আসবেন। রোজ একবার করে চা খেতে আসতে হবে কিন্তু।

ভালই লাগে ওঁর। একটা সুখী সংসারের মাঝে কিছুক্ষণের জন্যেও তো নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারেন। শান্তা, না তনুশ্রী, না এই সংসার ওঁকে এভাবে আকর্ষণ করে উনি বুঝতে পারেন না।

কিন্তু তনুশ্রীর ওপর ওঁর একটা অদ্ভুত মায়া। সেজন্যেই হয়তো এই ভয়-ভয়।

তনুশ্রী যেন এখনও সেই ন বছরেব ছোট্ট মেয়েটিই, পায়ে একটা শ্বেতির দাগ, জন্মদিনে ওঁর হাত থেকে দম দেওয়া পুতুলটা নিয়ে খুব খুশি-খুশি মুখে বলছে, তুমি আমাকে একটা এত্ত বড় পুতুল এনে দেবে ?

আর শান্তা ধমক দিয়ে বলছে, তনু, আপনি বলতে হয়। তুমি বলবে না।

ধূর্জটিপ্রসাদ কিছু বলতে পারেননি। একটা বাচ্চা মেয়ের অকৃত্রিম ভালবাসা এরা চিনতে পারে না, সেটাকেও ভদ্রতার রাংতায় মুড়ে রিবন দিয়ে বেঁধে দিতে চায়।

ধূর্জটিপ্রসাদের মনে পড়ে, একটু একটু করে ওদের ব্যবহারে তারতম্য দেখতে পেয়েছিলেন। কেমন যেন ওরা সরে যাচ্ছিল। শান্তা এসে আর আগের মত বসত না। তনু পড়ছে। তনুর টিউটর এসেছেন, ওব এখন ওপরের ক্লাশের পড়া। ছোট্ট মেয়েটাকে ওরা দূরে সরিয়ে নিয়েছিল।

সমস্ত ব্যাপারটা অনেক পরে জেনেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। তখন কি এক বোবা অভিমানে নিজেই নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এই পরিবারের সঙ্গে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন।

তারপর আপিসের সেই কানাঘুসো একদিন নিজেও শুনতে পেলেন। শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন উনি। চোখ ঠেলে জল এসেছিল। এই সমাজ, এই বিচিত্র মানুষগুলো কারও দুঃখের খোঁজ রাখে না, কারও ভালবাসার দাম দিতে জানে না।

এখানে এসে উনি পুরনো দিনগুলোকে আবার যেন ফিরে পেয়েছিলেন।

ধূর্জটিপ্রসাদের হঠাৎ মনে হল তনুশ্রীর ভালবাসাকে তো আমিও চিনতে পারছি না। তনুশ্রীকে ভালবাসেন বলেই কি তার জন্যে এত ভয়-ভয় ! ওর মুখের দিকে তাকালেই উনি বুঝতে পারেন মেয়েটার সমস্ত মন জুড়ে বসে আছে কল্যাণসুন্দর।

ওঁর কেবলই আশঙ্কা মেয়েটা ঘা খাবে, আঘাত পাবে। কল্যাণসুন্দরকে দেখে, ওর উচ্ছলতা, ওর উদ্দাম ঝড়ের চরিত্রটা দেখে মনে হয় কারও কাছে বাঁধা পড়ে যাওয়ার মত মানুষ এরা নয়। মেয়েটা কষ্ট পাবে। দুঃখ পাবে।

কাঠের ফটক খুলে ভিতরে ঢুকতেই একটা উল্লাস আর আনন্দের ঢেউ ভেসে এল বিজয়বাবুদের ঘরের ভিতর থেকে।

ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। যেন একটা খুশির ঘূর্ণি ঘরখানার মধ্যে

কেঁপে কেঁপে উঠছে। বনশ্রী, মঞ্জুশ্রী, দুই বোনই বোধ হয় গলা মিলিয়ে গান গাইছিল। ধূর্জটিপ্রসাদকে দেখেই কেমন লাজুক-লাজুক মুখ করে তনুশ্রী উঠে গেল।

দূরে হেলানো চেয়ারে বসে বনশ্রী আর মঞ্জুশ্রী গান গাইতে গাইতে ওঁর দিকে তাকিয়ে কেমন হাসল।

শান্তার চোখও হাসছিল অশেষ তৃপ্তিতে।

ধূর্জটিপ্রসাদ ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলেন না।

আর বিজয়বাবু বলে উঠলেন, শান্তা, ধূর্জটিকে মিষ্টি খাওয়াও, মিষ্টি খাওয়াও।

শান্তা উঠে দাঁড়িয়েছিল, মৃদু হেসে বললে, বসুন। বলে বেরিয়ে গেল।

বিজয়বাবু দু হাত দুদিকে মেলে ধরে বললেন, আয়াম দ্য হ্যাপিয়েস্ট ম্যান অন আর্থ।

মঞ্জুশ্রী হঠাৎ গান থামিয়ে হাসতে হাসতে বললে, না বাপি। হ্যাপিয়েস্ট তো ওরা দুজন।

সবাই হেসে উঠল। আর শান্তাও তখন সত্যি সত্যি এক প্লেট মিষ্টি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিজয়বাবু তখনও বলছেন, আমি মুক্ত, আমি সুখী।

শান্তা হাসতে হাসতে বললে, তুমি আবার কবে অসুখী ছিলে।

বিজয়বাবুর সাদা পুরুস্টু থার্ড ব্রাকেটের গোঁফ হেসে উঠল।

বললেন, তনু অ্যান্ড কল্যাণসুন্দর, দে আর এনগেজড, কলকাতায় ফিরেই বিয়ে।

বিজয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, অবশ্য মঞ্জুর বিলেতের চিঠিও এসে গেছে, সেও ফিরে আসছে।

তারপর সিরিয়াস হবার ভঙ্গিতে বললেন, কল্যাণসুন্দর পাত্র হিসেবে বেশ ভালই, ভাল চাকরিও করে, আবার....

ধূর্জটিপ্রসাদ সকলের মুখেব ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলেন। সকলেই যেন একটা খুশির বন্যায় সাঁতার কাটছে।

বিজয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, সেই কালপ্রিটকে ধরে নিয়ে আয়, পালাল কেন।

সকলে হেসে উঠল।

আর মঞ্জুশ্রী গিয়ে তনুকে হাত ধরে ডেকে নিয়ে এল।

ধূর্জটিপ্রসাদ তাকিয়ে দেখলেন। তনুশ্রীর সমস্ত শরীর মন, দুটি চোখ যেন আনন্দে, লজ্জায় আপ্লুত হয়ে আছে।

তনুশ্রী এসে লাজুক-লাজুক মুখ করে ধূর্জটিপ্রসাদকে প্রণাম করল।

ধূর্জটিপ্রসাদের মনে হল উনিও সুখী, প্রচণ্ড সুখী।

দুপুরে বইয়ের পাতায় কিছুতেই মন বসছিল না ধূর্জটিপ্রসাদের। কোলের ওপর বইটা খোলা পড়েছিল। উনি জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। এক ঝাঁক সামুদ্রিক চিল বৃত্তাকারে উড়ছে একটা নৌকোকে ঘিরে। দু-একটা মাঝে মাঝে ছোঁ মেরে যাচ্ছে।

একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়েছিলেন। তা না হলে জুতোর শব্দ শুনতে পেতেন।

নিখিলেশ চলে গেছে। এখন ওঁর মন শান্ত। করবী এখন ওঁর কাছে স্মৃতি হয়ে গেছে, এখন ও কোনও রহস্য নয়। সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখার সময় কে-ই বা তার রহস্যের খোঁজ করে। সে শুধু সুন্দর একটা স্মৃতি হয়েই থাকে।

ওঁর মন জুড়ে ছিল তনুশ্রী।

দরজাটা হাট করে খোলাই ছিল। কিন্তু জুতোর শব্দ শুনতে পাননি ধূর্জটিপ্রসাদ। হয়তো অন্যমনস্ক ছিলেন।

—আসতে পারি ?

চমকে চোখ ফেরালেন উনি। একটু অবাক হলেন। এ সময় তো ওরা আসে না কোনওদিন।—এসো এসো। হঠাৎ তোমরা, কি ব্যাপার ?

অবাক হবারই কথা। অঞ্জলি আর অঞ্জলির স্বামী।

—বসো তোমরা, দাঁড়িয়ে কেন। চেয়ারটা এগিয়ে দেবার ভঙ্গি করলেন।

অঞ্জলি খাটের পাশে বসল। কি যেন বলবে।

অঞ্জলির স্বামী চুপচাপ।

ধূর্জটিপ্রসাদ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন।—কিছু বলবে ?

অঞ্জলি কি যেন বলতে চায়, বলতে পারছে না। কেমন যেন সঙ্কুচিত, লজ্জিত।

অঞ্জলির স্বামীকে দেখে মনে হল রেগে আছে। যেন এখনই ফেটে পড়বে।

ধূর্জটিপ্রসাদ একবার অঞ্জলির মুখের দিকে তাকালেন, একবার অঞ্জলির স্বামীর মুখের দিকে।

অঞ্জলি অনেক কষ্টে বললে, একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার।

বিভ্রান্তের মত ধূর্জটিপ্রসাদ ওর মুখের দিকে তাকালেন।—বল, বল, তোমরা বলছ না কেন ? কিছু কি হয়েছে ?

ওঁর কেমন যেন মনে হল নিখিলেশ বা করবী সম্পর্কে কিছু বলতে চায়। কিছু কি জানা গেছে তা হলে ? এই তো গতকাল নিখিলেশকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছেন। সান্ত্বনা দিয়েছেন।

বললেন, কিছু বলছ না কেন ?

ওঁকে খুব উৎকণ্ঠ দেখাল।

আর অঞ্জলি বললে, একজন আমাদের সবাইকে ঠকিয়েছে।

—ঠকিয়েছে ? কথাটার কোনও অর্থ বুঝতে পারলেন না ধূর্জটিপ্রসাদ।

অঞ্জলি হাসবার চেষ্টা করল। হাসিটা বিচিত্র লাগল।

বললে, আমাদের বোকা বানিয়েছে।

অঞ্জলির স্বামী বলে উঠল, এ ড্যাম লায়ার। লোকটাকে আমার খুন করতে ইচ্ছে করছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। একবার অঞ্জলির মুখের দিকে, একবার অঞ্জলির স্বামীর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

তখনই অঞ্জলি বলে উঠল, ও লোকটা জাল। ও আমাদেব ঠকিয়েছে। জানেন, ও কল্যাণসুন্দর নয়।

—কল্যাণসুন্দর নয় ? অবাক হয়ে গেলেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

অঞ্জলি বললে, আসল কল্যাণসুন্দর আজই আমাদের হোটেলে এসে উঠেছেন, সেজন্যেই তো জানতে পারলাম।

ধূর্জটিপ্রসাদ কোনও কথা বলতে পারলেন না।

আর অঞ্জলি বললে, আমাদের কি দোষ বলুন, আমরা তো ওঁকে চিনতাম না। কখনও কোথাও একটা ছবিও দেখিনি। দেখে থাকলেও সে কতদিন আগে, সবই তো এখন অস্পষ্ট....

অঞ্জলির স্বামী রাগে ফুঁসে উঠল, ঐ স্কাউন্ড্রেলটাকে আমি একটা উচিত শিক্ষা দেব। ও সবাইকে ঠকিয়েছে। একটা লোফার নিজেকে কল্যাণসুন্দর বলে চালিয়েছে।

অঞ্জলিও কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল।

ওরা আরও কি সব বলে গেল। কিন্তু কিছুই আর কানে গেল না ধূর্জটিপ্রসাদের।

শুধু একটা কথাই ওঁব মাথাব মধ্যে ঘুবছিল। লোকটা জাল, লোকটা আসল কল্যাণসুন্দব নয়। একটা মিথ্যে পবিচয় দিয়ে সে সকলেব প্রশংসা কুড়িয়েছে। অন্তবঙ্গ হয়েছে সকলেব।

অঞ্জলি বলে উঠল, আমি সব্বাইকে জানিয়ে দিয়েছি, বিজয়বাবুদেব, মালাদেব। মুষড়ে পড়া গলায় বললে, শেষে একটা লোফাব কিনা আমাদেব সকলকে বোকা বানিয়েছে!

অঞ্জলিব স্বামী বললে, কি কবা যায় বলুন। কিছু একটা কবতেই হবে।

ধূর্জটিপ্রসাদ হতাশভাবে বললেন, আমাকে ভাবতে দাও, ভাবতে দাও।

তখন একটা কথাই উনি ভাবছেন। ওঁব চোখেব সামনে তখন একটাই মুখ ভেসে উঠেছে। একটা করুণ বিষণ্ণ মুখ। সে মুখ তনুশ্রীব।

দেখতে দেখতে অরুণেন্দুবাও এসে গেল। তাব স্ত্রী। এবং মালাও। সবাবই চোখে উদ্বেগ, অবিশ্বাস, বাগ।

মালা বলে উঠল, কয়েকদিন থেকেই আমাব কিন্তু এক এক সময় খটকা লাগছিল।

অরুণেন্দুব স্ত্রী বলে উঠল, ওকে পুলিশে দেওয়া উচিত।

অরুণেন্দু বেগে উঠে বললে, আমি ওকে জেল খাটিয়ে ছাড়ব, ও আমাদেব ঠকিয়েছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ তখন আব ভাবতে পাবছেন না। ওদেব কথা তখন ওঁব কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে।

আশ্চর্য। একটা মানুষ। একই মানুষ। তাকে এবা দেবতাব আসনে বসিয়ে ছিল। এখন প্রতিশোধ নেবাব জন্যে নৃশংস হয়ে উঠেছে। এখন সে একটা লোফাব।

অথচ আজ সকালেই তো অঞ্জলি বলছিল, কি সুন্দব গানেব গলা কল্যাণসুন্দবেব, আপনাব সঙ্গে সেদিন দেখা হল সি-বিচে, মনে আছে। কি দবদ দিয়ে গাইছিলেন। কববীব জন্যে সত্যি খুব দুঃখ পেয়েছেন।

মালা গর্ব কবেছিল, আমি ওঁকে আবিষ্কাব কবেছি। উনি তো পবিচয়ই দিচ্ছিলেন না।

অরুণেন্দু বলেছিল, ভদ্রলোকেব অনেক গুণ, সাঁতাব কেটে দিব্যি থার্ড ব্রেকার্স পাব হয়ে গিয়েছিলেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেও ভেবেছিলেন, ছেলেটা বেশ সপ্রতিভ, মনে কোনও খাদ নেই, কববীব হাত ধবে কেমন হাসতে হাসতে তাকে টেনে নিয়ে গেল, তাব ভয় ভাঙিয়ে দিল।

বিজয়বাবুব বাড়িব সেই উদ্দাম আনন্দেব ছবিটা ভেসে উঠল চোখেব সামনে। তনুশ্রীব সুখী লাজুক মুখ।

এখন ধূর্জটিপ্রসাদও ওকে ক্ষমা কবতে পাবছেন না। কেউই পাবছে না। এখন সকলেই তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে এনে পায়েব নীচে দলতে চায়। অথচ একটাই মানুষ। একই মানুষ।

কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ তো এদেব কথা ভাবছেন না।

ওঁব হঠাৎ নিজেকে বড়ো নিঃস্ব মনে হল। আহা, সেই ন বছবেব ছোট্ট মেয়েটা, ফুটফুটে মুখ, পায়ের গোড়ালিব কাছে একটা শ্বেতিব দাগ, দেখে মায়া হয়। একটু একটু কবে তাকে চোখেব সামনে বড় হয়ে উঠতে দেখেছেন। একদিন একটা বিশাল গ্যাসবেলুন নিয়ে গিয়েছিলেন, হাতে সুতোটা ধবে আছেন, বেলুনটা ওঁব মাথা ছাড়িয়ে অনেক ওপবে স্থিব হয়ে আছে, বাস্তাব চাবপাশেব লোক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। একজন হেসে ফেলল।

বিজয়বাবু হাসতে হাসতে বলছেন, কালপ্রিটটা কই, ডেকে নিয়ে আয়।

তনুশ্রী লাজুক লাজুক তৃপ্তিব মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, প্রণাম কবেছে। সব যেন দেখতে পাচ্ছেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

শান্তা কি আমাকে ভুল বুঝেছিল ! কাছে এসে গল্প করত না, এড়িয়ে এড়িয়ে যেত। কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল ধূর্জটিপ্রসাদের। সেজন্যেই আর ঘন ঘন যেতেন না। তনুশ্রীকে দেখার ইচ্ছে হত। ভালবাসতে। তবু নিজেকে আটকে আটকে রাখতেন। বুকের মধ্যে অসহ্য কষ্ট, কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন, তনুশ্রীকে নিয়ে, তাই ছুটে গিয়েছিলেন একদিন। ডেকেছিলেন, তনু কোথায় ? এস একবার। আর শান্তা না বনশ্রী কে যেন উত্তর দিয়েছিল, ও এখন পড়তে বসেছে। ওপরের ক্লাশের পড়া। সেদিন ফেরার পথে ওঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

তনুশ্রীর সেই মুখখানা এখন ভেসে উঠছে। ওর জন্যে একটা সুখী জীবন গড়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেজন্যেই এত ভয়-ভয় করত।

বিজয়বাবু বলেছিলেন, তুমি বড্ড ভীতু হে ধূর্জটি !

ধূর্জটিপ্রসাদ জানেন ওঁকে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হবে, কষ্ট পেতে হবে। বুকের মধ্যে ওর জন্যে স্নেহ ভালবাসা, কিন্তু শুধুই অসহায় ভালবাসা, ওঁর তো কোনও অধিকার নেই।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ অস্ফুটে বলে উঠলেন, মেয়েটা মরে যাবে। আমি ভাবতেও পারছি না।

উনি অস্থিব হয়ে উঠলেন। কি করবেন কিছুই ঠিক করতে পারছেন না।

বিড়বিড় করে বললেন, মেয়েটা মরে যাবে।

আর অঞ্জলি বলে উঠল, কি বলছেন আপনি ? মেয়েটা তো বেঁচে গেল।

অঞ্জলির মুখের দিকে তাকালেন ধূর্জটিপ্রসাদ, অঞ্জলির স্বামীর মুখের দিকে, অরুণেন্দু, অরুণেন্দুর স্ত্রী এবং মালা, সকলের মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা বুলিয়ে এনে ধূর্জটিপ্রসাদ মিনতির স্বরে বললেন, তোমরা সবুর কর, তোমবা আমাকে একটু ভাবতে দাও।

ব্যর্থ বিক্ত একটা মানুষ হেঁটে চলেছে, অথচ গন্তব্য নেই। মানুষের জীবনের মতই। কোথাও শুধু পৌঁছনো যায়,আমরা শুধুই কোথাও পৌঁছোতে চাই, তার বেশি নয়।

ধূর্জটিপ্রসাদের চোখের সামনে এখন অসীম শূন্যতা। সমস্ত পৃথিবী যেন হঠাৎ নির্জন হয়ে গেছে, কোথাও কোনও শব্দ নেই।

লাহিড়ী, আছ তো ? বলে অন্যদিনের মত ডাকতেও পারলেন না। গলা দিয়ে কোনও স্বর বের হল না।

অঞ্জলি বলেছিল, আমি বিজয়বাবুদেরও খবর দিয়ে দিয়েছি, ও লোকটা কল্যাণসুন্দর নয়, জাল।

একটাই মানুষ, একই মানুষ। তবু সবই যেন এখন বদলে গেছে। অঞ্জলি বলেছিল, এখন ঐ লোফারটার কাছে আমার যেতেও ভয় করছে।

অরুণেন্দুর স্ত্রী বলেছিল, সি-বিচে বেড়াতে যেতেও ভয়, পাছে লোকটার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যাই।

মালা বলেছিল, একটা খুনী আসামীর মত লোকটার মুখচোখ।

অঞ্জলির স্বামী আর অরুণেন্দু বলেছিল, একটা কিছু করতেই হবে, উই মাস্ট ডু সামথিং।

আর এখন ধূর্জটিপ্রসাদ একটাও কথা বলতে পারছেন না। এমন অসহায় যেন জীবনে কখনও নিজেকে মনে করেননি।

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন দু হাত দুদিকে মেলে দিয়ে বিজয়বাবু বলছেন, আমি মুক্ত আমি সুখী।

মঞ্জুশ্রী বলছে, না বাপি, হ্যাপিয়েস্ট তো ওবা দু জন।

কাঠের ফটক খুলে ধীরে ধীরে ধূর্জটিপ্রসাদ এগিয়ে গেলেন। কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে একটা বারান্দা, বারান্দার দুপাশে সিঁড়ির গা বেয়ে দুটো থাম উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে মনে হল সারা বাড়িটাই যেন থমথম করছে। ধূর্জটিপ্রসাদের বুকের মতই।

সিঁড়ির ধাপ কখানা পার হয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

নিজের পায়ের শব্দকে নিজেই যেন ভয় পাচ্ছেন।

চৌকাঠ পার হলেন। গলা দিয়ে কোনও কথা বের হল না।

বিজয়বাবু বসে আছেন, মাথাটা ঝুলছে। একপাশে শান্তা, নিথর চুপচাপ।

বনশ্রী আর মঞ্জুশ্রী চুপচাপ বসেছিল, ওঁকে দেখেই মাথা নামিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল। কোন কথাও বলল না।

সমস্ত বাড়িটার ওপর যেন একটা শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কিংবা শোকের চেয়েও আরও গভীর কোনও দুঃখ।

ধূর্জটিপ্রসাদ নিঃশব্দে এসে বসলেন এক কোণে। চুপচাপ। কোনও কথা বললেন না। একটু পায়ের শব্দ কিংবা একটা উচ্চারিত বাক্য যেন এখানে এখন সবচেয়ে বেমানান। কুৎসিত। মৃতদেহের সামনে হেসে ওঠার মত।

বিজয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ তুলে এক পলকের জন্যে ধূর্জটিপ্রসাদকে দেখলেন। কোনও কথা বললেন না। মাথাটা আবার ঝুলে পড়ল।

শান্তার দিকে তাকাতে পারলেন না ধূর্জটিপ্রসাদ। ওঁর সেই মাপা হাসির চাপা কণ্ঠস্বরের সাজানো মুখখানা এখন একেবারে বদলে গেছে। একটু সমবেদনা পেলেই চোখ ছাপিয়ে জল আসবে।

অসীম অনন্ত সময় ধরে যেন ধূর্জটিপ্রসাদ নিশ্চুপ বসে আছেন। কি বলবেন কিছুই খুঁজে পাচ্ছেন না।

বিজয়বাবু একবার অসহায়ের মত চোখ তুলে তাকালেন। দীর্ঘশ্বাসের মত কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করলেন, ধূর্জটি, সব সত্যি?

ধূর্জটিপ্রসাদ দেখলেন, বিজয়বাবুর দুচোখে দুফোঁটা জল থেমে আছে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন ধূর্জটিপ্রসাদ। মন্থর নিঃশব্দ পায়ে পাশের ঘরের দিকে গেলেন। ওঁর বুকের মধ্যে উদ্বেগ, ওঁর বুকের মধ্যে চাপা কষ্ট। তনুশ্রীর জন্যে। সেই ন বছর বয়সের ফুটফুটে মেয়েটা। পায়ে একটা শ্বেতির দাগ। যা তার সমস্ত হাসি আনন্দের মধ্যেও একটা দুঃখের বিদ্যুৎ হয়ে আছে।

ঘরের ভিতর ঢুকতে পারলেন না ধূর্জটিপ্রসাদ। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

তনুশ্রী। জানলার পাশটিতে বসে আছে, জানলার গরাদে গাল চেপে। চোখের নিঃস্ব রিক্ত উদাসীন দৃষ্টি বাইরের অসীম শূন্যতার দিকে তাকিয়ে আছে।

উপবাসে ক্লিষ্ট প্রতীক্ষারতা ঋষিকন্যার মত দেখাচ্ছে ওকে। নাকি নিদারুণ বেদনাহত নিঃশেষ হয়ে যাওয়া মুখ।

ধূর্জটিপ্রসাদ জানেন, ওর জীবন থেকে সব আনন্দ সব স্বপ্ন মুছে গেছে। আর সকলে শুধুই হেরে গেছে। অঞ্জলি, মালা, অরুণেন্দুর স্ত্রী, বনশ্রী, মঞ্জুশ্রী, তিনি নিজেও। হারিয়েছে শুধু একজনই।

ধূর্জটিপ্রসাদ তনুশ্রীর ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। ওঁর বুকের মধ্যে একটা ঝড়। সমুদ্রের বুকে ঝড়ের মতই। সব কিছু যেন তোলপাড় করে দিচ্ছে।

দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। ধীরে ধীরে ফিরে এলেন বিজয়বাবুর কাছে।

আর তখনই বিজয়বাবু চোখ তুলে তাকালেন, সঙ্গে সঙ্গে জলে ভাসা চোখে বুক উজাড় করা আর্তনাদ করে উঠলেন।—ধূর্জটি!

—লাহিড়ী চল, আমার সঙ্গে চল তুমি।

আলোয় অন্ধকারে সমুদ্রের পাড়ে এসে বালির ওপর পাশাপাশি বসে আছেন দুজনে। দুই প্রাচীন বন্ধু। ধূর্জটিপ্রসাদ আর বিজয়বাবু। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

সব অভিযোগ, সব অভিমান কবেই তো ধুয়ে মুছে গেছে। লাহিড়ী, তুমি তো আমাকে কোনওদিন বুঝতে পারনি, কেন বারবার তোমার কাছে ছুটে যেতাম। আপিসের লোকগুলো কোনওদিন বুঝতে চায়নি। শান্তাও কি আমাকে ভুল বুঝেছিল ? তনুর এখন ওপর ক্লাসের পড়া। তনু নেই।

ধূর্জটিপ্রসাদ অন্ধকারে বসে সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে কিংবা তারও ওপারে তাকিয়ে ছিলেন উদাস দৃষ্টিতে। হঠাৎ বলে উঠলেন, লাহিড়ী, খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার ?

বিজয়বাবুর হাতের ওপর হাত রাখলেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ধূর্জটিপ্রসাদ। বললেন, আমি তনুর দিকে তাকাতে পারিনি, লাহিড়ী। তাকাতে পারিনি। বলতে গিয়ে ওঁর গলার স্বর গাঢ় হয়ে গেল। কান্নার মত শোনাল।

বিজয়বাবু ধূর্জটিপ্রসাদের হাতখানা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলেন।—ধূর্জটি, তুমি কাঁদছো ? আরে, কি বোকা তুমি, আমি তো ওর বাবা, আমারই তো মেয়ে, এই দ্যাখো আমার কিচ্ছু হয়নি।

বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন বিজয়বাবু।

ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেকে সংযত করলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, সমুদ্র যা-কিছু নেয় সে ফিরিয়েও দেয়। তনুকে তো ফিরিয়ে দিয়েছিল আমার কাছে।

বিজয়বাবু বুঝতে পারলেন না। বললেন, সন্তান দুঃখ পেলে সে দুঃখ কি, বুঝবে না, ধূর্জটি।

কি যেন ভাবলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। গলার স্বর গাঢ় হয়ে এল। বললেন, আমার মেয়ে বেঁচে থাকলে আজ তনুর মতই হত, লাহিড়ী। আমি জানি তোমার বুকের মধ্যে কি হচ্ছে।

ধূর্জটি ! চিৎকার করে উঠে অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকালেন বিজয়বাবু। অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পেলেন না। বিজয়বাবু অবাক হয়ে বললেন, কি বলছ ধূর্জটি ?

ধূর্জটিপ্রসাদ যে-কথা কোনওদিন বলতে চাননি, বলতে পারেননি, সে-কথাটা আজ না বলে যেন শান্তি নেই।

ধূর্জটিপ্রসাদ কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, আমার মেয়েকে আমি এই সমুদ্রের কাছেই দিয়ে গিয়েছিলাম, লাহিড়ী। সে কতকাল আগে, মনে হয় যেন এই সেদিন....নুলিয়ার হাত ফস্কে....এইটুকুন একটা মেয়ে, কি যে হয়ে গেল। মানুষের জীবনে কখন যে কি ঘটে যায়।

বিজয়বাবু ধূর্জটিপ্রসাদের হাতখানা শক্ত করে ধরলেন।—ধূর্জটি, তুমি কোনওদিন বলনি।

ধূর্জটিপ্রসাদ সে-প্রশ্ন শুনতেও পেলেন না। বলে চললেন, কেউ বাঁচাতে পারল না তাকে, কেউ না। সেই শোকেই অসুখে ভুগে ভুগে স্ত্রীও চলে গেল একদিন। সেই জন্যেই আমি সমুদ্রের কাছে বারবার ছুটে আসি, লাহিড়ী। তোমরা বারবার প্রশ্ন করতে, আর কি কোনও যাবার মত জায়গা নেই। আমার সত্যিই যে আর কোথাও যাবার নেই।

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

হেসে ওঠার চেষ্টা করলেন, হাসিটা কান্নার মত হয়ে গেল। বললেন, প্রথম যেদিন বদলি হয়ে এলাম, একটা ফাংশন ছিল, তোমরা ছেলেমেয়েদের আনতে বললে, আমি বললাম নেই। স্ত্রী ? আমি বললাম নেই। তোমরা হৈ হৈ করে উঠলে। যেন কত বড় একটা

আনন্দের কথা, ব্যাচেলার, তুমি তো সুখী হে। মনে পড়ে ?

ধূর্জটিপ্রসাদ একটু থেমে বললেন, সব কথা সব সময় বলা যায় না, লাহিড়ী। সারা জীবন ধরে লুকিয়ে রাখতে হয়। তনুর কাছে আমি সেজন্যেই বারবার ছুটে গিয়েছি। তোমরা কেউ বুঝতে পারনি, বুঝতে চাওনি।

ধূর্জটিপ্রসাদের তাই বারবার ঐ একটা মুখই মনে পড়ে যায়। তনু, তনুশ্রী নির্জন ঘরের জানালায় বসে আছে, রোগপাণ্ডুর রক্তহীন মুখের মত। জানালার গরাদে গাল চেপে তাকিয়ে আছে শূন্যতার দিকে। ওর চোখের দৃষ্টিতে শূন্যতা।

অঞ্জলির স্বামী বলেছিল, ওকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

অঞ্জলি বলেছিল, ওর কাছে যেতেও এখন ভয় করছে।

কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদকে যেতেই হবে।

অঞ্জলি বললে, আসল কল্যাণসুন্দর আমাদের হোটেলেই উঠেছেন।

বিজয়বাবু জল-ভরা চোখ তুলে বলেছিলেন, ধূর্জটি, সত্যি ?

সমস্ত দৃশ্যটা এখনও যেন ধূর্জটিপ্রসাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

—ও লোকটা জাল, ও আমাদের ঠকিয়েছে। ও আসল কল্যাণসুন্দর নয়।

অঞ্জলির কথাগুলো উনি যেন এখনও শুনতে পাচ্ছেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। তবু একটা ক্ষীণ আশা উঁকি দিচ্ছিল মনে।

উনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, চলো, যাব আমি। ঐ আসল কল্যাণসুন্দরের কাছেই যাব।

ধূর্জটিপ্রসাদ কি মনে মনে কিছু ভাবছিলেন! একটাই তো ভাবনা। ঐ শ্মশানের মত নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া বিজয়বাবুর বাড়িটাতে আবার একটা আনন্দের ঝড় এনে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল ওঁর। শান্তার আর লাহিড়ীর মুখে হাসি ফিরিয়ে দেওয়ার।

আর, আর তনুশ্রীকে আবার সুখী করে তুলতে পারেন না কি ? উনি বোধহয় স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন।

সেজন্যেই হঠাৎ বললেন, চলো, যাব আমি।

অঞ্জলি আর অঞ্জলির স্বামী, অরুণেন্দু, অরুণেন্দুর স্ত্রী, আর মালা। সবাইকে নিয়ে ধূর্জটিপ্রাদ এসে দাঁড়ালেন মুনলাইট হোটেলের সামনে। ওরা কেউই তখনও কল্যাণসুন্দরকে দেখেনি।

ম্যানেজারবাবু বোধহয় ওঁদের দল বেঁধে আসতে দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন। ছুটে এসে বললেন, বসুন আপনারা, বসুন এখানে। আমি খবর পাঠাচ্ছি।

স্বগতোক্তির মত করে বললেন, ভদ্রলোককে যখন তখন ডিস্টার্ব করা উচিত হবে না।

গেটের সামনের সেই চৌকো বারান্দায় ওঁরা সব এসে বসলেন। অপেক্ষা করলেন।

ধূর্জটিপ্রসাদই যেন সবচেয়ে বেশি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। উনি কি মনে মনে কোন স্বপ্ন দেখছিলেন ? তনুশ্রীর মুখে হাসি ফিরিয়ে আনার ? বিজয়বাবুদের অন্ধকার বাড়িতে আবার আলো জ্বেলে দেবার ?

ওরা যেন অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করছে। অরুণেন্দুর স্ত্রী বলে উঠল, আঃ আসছে না কেন!

বসে থাকতে থাকতেই এক ভদ্রলোককে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ম্যানেজারবাবু।

ম্যানেজারবাবু হাসতে হাসতে বললেন, ইনিই কল্যাণসুন্দর। আসল কল্যাণসুন্দর।

আর সঙ্গে সঙ্গে মালা অস্ফুট চাপা গলায় বলে উঠল, এই!

সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ বুঝতে পারলেন সবাই হতাশ হয়েছে। এই

আসল কল্যাণসুন্দরকে যেন কারও পছন্দ নয়।

লোকটিকে খুব যেন কুণ্ঠিত মনে হল।

অস্বস্তির হাসি তার মুখে। এগিয়ে এসে হাত জোড় করে নমস্কার করল সকলকে।

ম্যানেজারবাবু তাকে চেয়ার এগিয়ে দিলেন।—বসুন, বসুন আপনি।

ধূর্জটিপ্রসাদ অবাক হয়ে গেলেন। এই লোকটাই আসল কল্যাণসুন্দর ? মনেই হল না। লোকটা মিথ্যে বলছে না তো ! একটা ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি দিল ওঁর মনে।

—আপনার নাম ? আপনিই ?

ধূর্জটিপ্রসাদ অবিশ্বাসের চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তাঁকে।—আপনি সত্যি বলছেন ? আপনিই কল্যাণসুন্দর ?

লোকটা লজ্জা পেল। একটু আহত হল। বললে, মিথ্যে বলে লাভ ?

ধূর্জটিপ্রসাদ রূঢ় গলায় বললেন, কিন্তু আরেকজন তো আগে থেকেই এসে বলছেন, তিনিই সেই বিখ্যাত কল্যাণসুন্দর।

লাজুক লাজুক ভাবে লোকটি বললে, জানি।

ধূর্জটিপ্রসাদের চোখের দিকে ও তাকাতেও পারছে না। চোখ নামিয়েই বললে, জানি উনিই আগে এসে পড়েন সর্বত্র, আমি পৌঁছনোর আগেই। আমি কোনদিন ওঁর সঙ্গে মুখোমুখি হতে পারিনি।

ধূর্জটিপ্রসাদ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, আজ হতে পারবেন। আমিই তার সঙ্গে আপনার মুখোমুখি করিয়ে দেব।

সে হেসে উঠল। বলল, আপনি উত্তেজিত হয়ে ডঠছেন। পারবেন না, পারবেন না। কেউ কোনদিন পারেনি। উনি আমার আগে আগে এসে পড়েন, সকলে ওঁকে নিয়েই মাতামাতি করে, আমার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

ধূর্জটিপ্রসাদ উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, ঠিক আছে, আমি চললাম। তাকে নিয়ে আসব, আপনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেব।

সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওঁকে এভাবে উত্তেজিত হতে কেউ কোনদিন দেখেনি।

সকলেই গেটের সামনে পর্যন্ত এগিয়ে এল। তাকিয়ে রইল। দেখলে, হন হন করে এগিয়ে চলেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

ধূর্জটিপ্রসাদ ক্রমশই তখন উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। দ্রুত পায়ে হেঁটে চললেন একা একা। ঐ জাল লোকটাকে ধরে এনে দাঁড় করাবেন আসল মানুষটার সামনে।

প্রায় টলতে টলতে ধূর্জটিপ্রসাদ এগিয়ে চলেছেন। ঐ তো সেই হলদে বাড়ি, লোহার গেট খোলা রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন বারান্দায় পায়চারি করছে লোকটা, উদ্বিগ্ন মুখ। বোধহয় খবর পেয়ে গেছে আসল কল্যাণসুন্দর এসে পড়েছেন এখানে।

ধূর্জটিপ্রসাদ দ্রুত এগিয়ে গেলেন। উত্তেজনায় তখন থরথর করে কাঁপছেন।

দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর।

তার বুকের কাছে জামাটা খামচে ধরলেন। বললেন, এবার, এবার আর পালাতে পারবে না।

—আঃ ছেড়ে দিন, পাগলের মত এ কি করছেন। সে বলে উঠল।

ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন, তুমি একটা স্কাউন্ড্রেল, একটা লোফার, তুমি একটা নিষ্পাপ সুন্দর মেয়ের জীবনে হাহাকার এনে দিয়েছ। বলো, বলো, কি নাম তোমার, বলো।

সে বিরক্ত হল। বললে, আঃ ছাড়ুন, আমি মিথ্যে কথা বলিনি। আমার নাম কল্যাণসুন্দর।

—মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা বলে তুমি একটা মেয়ের ভালবাসা ছিনিয়ে নিয়েছ।

সে দৃঢ়ভাবে বললে, আমি আমার গলা দিয়েই কথা বলেছি, গান শুনিয়েছি। আমি আমার এই হাত দিয়েই তাকে স্পর্শ করেছি। আমার এই মুখ কথা বলেছে, এই চোখ দিয়ে ভালবাসা জানিয়েছি। আমিই ওকে স্বপ্ন দেখিয়েছি, ভালবাসা চিনিয়েছি!

ধূর্জটিপ্রসাদ রেগে গেলেন। খামচে ধরা হাতে তাকে এক ঝটকায় কাছে টেনে আনলেন। জামাটা ছিঁড়ে গেল।

ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন, কিন্তু তুমি তো একজন ইমপস্টার, তুমি তো সেই কল্যাণসুন্দর নও। তাঁকে আমি এইমাত্র দেখে এলাম।

সে হেসে উঠল। বলল, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। আসল কল্যাণসুন্দরকে কেউ দেখতে পায় না। কেউ না। সে তার বুকের মধ্যে মানুষের দুঃখের মুখ খোদাই করে নেয়, ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, গান গায়, দুঃখ পায়। আসল কল্যাণসুন্দরকে কেউ দেখতে পায় না।

ধূর্জটিপ্রসাদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে বললে, দাঁড়ান, আপনি আমার জামাটা ছিঁড়ে দিয়েছেন, ওটা খুলে ফেলি।

সে ছেঁড়া জামাটা খুলে ফেলল। বললে, আপনিও ভুল করেছেন। এই রকম একটা জামাকেই আপনি কল্যাণসুন্দর ভেবেছেন। তাকে কেউ দেখতে পায় না।

ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন, তুমি কে সে-কথাই বলো। আসল কল্যাণসুন্দর কে তা তোমাকে চেনাতে হবে না।

সে হাসল। বললে, আমি? আমি তাব ইমেজ, সকলের কল্পনা দিয়ে গড়া তারই মূর্তি।

বলে হা হা করে হেসে উঠল।

আর ধূর্জটিপ্রসাদ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, আমি তোমাকে পালাতে দেব না। তোমাকে আমি আসল কল্যাণসুন্দরের মুখোমুখি দাঁড় করাব।

ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত বাড়িয়ে যেন জাল কল্যাণসুন্দরকে ধরতে গেলেন। কোথায় কল্যাণসুন্দর। উনি তো হাত রেখেছেন লোহার ফটকের ওপর।

এক ধাক্কায় লোহার ফটক খুলে দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

দারোয়ানটা বারান্দায় শুয়ে ছিল। সে উঠে দাঁড়াল। বললে, বাবু তো চলে গেছেন।

—চলে গেছেন!

ধূর্জটিপ্রসাদ এতক্ষণে দেখতে পেলেন ঘরে একটা বড় তালা ঝুলছে।

অস্ফুটে বলে উঠলেন, পালিয়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, পারবেন না, পারবেন না, কেউ কোনদিন ওকে আমার মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারেনি।

হতাশায় ভেঙে পড়ে ধূর্জটিপ্রসাদ ফিরে চললেন। বালি মাড়িয়ে মাড়িয়ে সমুদ্রের ধার দিয়ে। যেতে যেতে বিজয়বাবুর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কাঠের ফটকের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে চমকে উঠলেন।

বাড়ির বাইরে সামনের সিঁড়ির এক কোণে সেই বিশাল থামে হেলান দিয়ে উদাস বিষণ্ণতায় বসে আছে তনুশ্রী। চোখে দৃষ্টি নেই। ধূর্জটিপ্রসাদকে ও দেখতেও পেল না।

ধূর্জটিপ্রসাদ তাকিয়ে রইলেন। বুকের মধ্যে অসহ্য একটা কষ্ট।

আঁচল খসে পড়েছে, যেন একটা নিষ্প্রাণ দেহ, থামে হেলান দিয়ে উদাসীন তাকিয়ে আছে তনুশ্রী। সব আনন্দ মুছে গেছে। সব স্বপ্ন।

ধূর্জটিপ্রসাদ এগিয়ে গেলেন। বুকের সবটুকু মায়া দিয়ে ডাকলেন, তনু। তনু মা।

ও স্বপ্নের চোখ তুলে তাকাল।

ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন, তনু চলো, তোমাকে আসল কল্যাণসুন্দরের কাছে নিয়ে যাব।

তনুর ঠোঁটের ফাঁকে একটা ঈষৎ বিষণ্ণতার হাসি মিলিয়ে গেল।

বললে, কি হবে।

একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস।

ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন, উনি তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। হয়তো ওঁর কাছে সান্ত্বনা পাবে, হয়তো....

কথা শেষ করতে পারলেন না।

'সকলে ওকে নিয়েই মাতামাতি করে, আমার দিকে ফিরেও তাকায় না।' কথাটা মনে পড়ে গেল ধূর্জটিপ্রসাদের।

—চলো তনু। ধূর্জটিপ্রসাদ আবার বললেন।

তনুশ্রী উঠল না। মাথা না তুলেই শান্ত গলায় বললে, ওঁকে তো আমি চিনিও না।

—তবু চলো। উনিই তো আসল কল্যাণসুন্দর। ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন।

তনুশ্রী দুটো ঝাপসা চোখ তুলে তাকাল। তাবপর আবার বললে, কি হবে!

এর নাম উষা।

আর চোখের সামনে সমুদ্র-সমুদ্র। ধূর্জটিপ্রসাদ বারবার এর কাছেই ফিরে আসেন। মনে মনে ভাবেন, আমার তো আর কোথাও যাবার নেই। এই বিশাল পৃথিবীতে আমার আর কোন জায়গা নেই।

এই হোটেলে, দোতলাব এই ঘরটিতেই উনি বারবার ফিরে আসেন। সেই ন বছরের ফুটফুটে মেয়েটাকে নিয়ে এই ঘরটিতেই এসে উঠেছিলেন একদিন। আর স্ত্রী। সেদিন ধূর্জটিপ্রসাদের মত সুখী কেউ ছিল না।

এখন ভাবলেও কষ্ট হয়। চোখের সামনে সেদিনের দৃশ্যটা ভেসে ওঠে।

—ধূর্জটি, তুমি বড্ড ভীতু হে। বিজয়বাবু বলেছিলেন। কল্যাণসুন্দরের সঙ্গে তনুশ্রী থার্ড ব্রেকার্সের দিকে এগিযে যাচ্ছে দেখে উনি সেদিন আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিলেন, তনু যেও না আর, যেও না।

বিজয়বাবু জানেন না, কেন এই আতঙ্ক। কেন এই ভয়।

—ভয় কি রে, নুলিয়া তো আছে, ওর হাত ধরে ধরে এগিয়ে যা। নিজেব ছোট্ট মেয়েটিকেও একদিন সাহস দিয়েছিলেন।

সে-কথা মনে পড়লেই সমুদ্রকে মনে হয় বড় নৃশংস, ভয়ঙ্কর। নুলিয়ার হাত ফসকে ঐ তো ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ভয়ার্ত আর্তনাদ, একটা ন বছরের বাচ্চা মেয়ের। ওঁর আপন কন্যার। নিজেরই রক্তমাংস দিয়ে গড়া, অসীম যত্ন আর ভালবাসা দিয়ে।

স্ত্রীর মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়েও সেই একই দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। ভাবলে এখনও সারা শরীর শিউরে ওঠে ধূর্জটিপ্রসাদের, চোখে জল এসে যায়।

আবার এই সমুদ্রই ওঁকে শান্ত করে। জ্যোৎস্নার রাতে দুধভেজা এই অসীম অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কিংবা ভোরের সমুদ্রের শেষ সীমায় জ্যোতির্বসনা উষাকে দেখে, এই অবিরাম ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সব দুঃখ শোক ভুলে যান ধূর্জটিপ্রসাদ।

কোনটা সমুদ্রেব সত্যিকারের রূপ? সত্য কি কখনও খুঁজে পাওয়া যায়!

ওঁর সত্যিকারের চেহারাটাও তো কেউ জানত না। 'ব্যাচেলার? তাই বলো, তুমি তো

সবচেয়ে সুখী হে।' সবাই বলে উঠেছিল। বিজয়বাবু তো তাই জানতেন। সেজন্যেই হয়তো শান্তাকে নিয়ে এত কানাঘুসো। সেজন্যেই কিনা কে জানে, শান্তা একটু একটু করে সরে গিয়েছিল।

ওঁর বুকের গভীরের ক্ষতটা কেউ দেখতে চায়নি। জানতে পারেনি। বিজয়বাবুও কোনদিন বুঝতে পারেননি, কেন বারবাব এখানে ফিরে আসেন। কেন সারা জীবন বইয়ের পাতার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন।

কোনও মানুষটারই প্রকৃত রূপ কেউ দেখতে পায় না। একই মানুষ, অথচ এক একটা ঘটনায় তার এক এক রকম চেহারা। প্রত্যেকটা মানুষই একদিকে উত্তমপুরুষ আমি, আমার দিক থেকেই দেখতে পাই। আবার সেই অন্যের চোখে একটা থার্ড পার্সন, কাঠগড়ায় দাঁড়ানো মানুষ।

বেচারা নিখিলেশ। একটা দুঃখী মানুষকে নিয়ে সবাই কত কি ভেবেছে। কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাকেই অপরাধী সাজিয়েছে। কেউ বা করবীর গায়েও দাগ এঁকে দিয়েছে। তনুশ্রীর পায়ের শ্বেতি চিহ্নটার মত।

এখন ধূর্জটিপ্রসাদ শান্ত।

উনি সমুদ্রের পাড় ধরে বালি মাড়িয়ে মাড়িয়ে এসে দাঁড়ালেন।

মনে মনে বললেন, এর নাম উষা।

সবে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আলোর বর্শাগুলো ঠিকবে পড়ছে। এখনই পুবের আকাশ আলোয় আলো হয়ে যাবে। সমুদ্রের বুকে দূরে দূরে নুলিয়াদের পাল তোলা নৌকোগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

করবীকে নিয়েও কত কি জল্পনা। বেচারী। তখন তো নিখিলেশ কিছুই বলেনি। একটা ছোট্ট কথা না বলতে পারলে একজন মানুষের চেহারাই বদলে যায়। করবীর ছবিটা বদলে গিয়েছিল। সতেরো নম্বরের পূর্ণবাবু, কিংবা কল্যাণসুন্দর, আরও কত কি ভেবেছে সকলে। ওঁর মনেও তো এক একবার সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল।

গতকাল বিকেলে অঞ্জলির মুখে সে কি খুশি-খুশি ভাব। যেন বুকের ওপব থেকে ভারী পাথরটা নেমে গেছে!

লাফাতে লাফাতে এসে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘাড়ের বব করা চুল নাচিয়ে হাসতে হাসতে বললে, খবর আছে, সুখবর।

একটু থেমে বললে, মেয়ে বটে করবী। হেসে লুটোপুটি খেল অঞ্জলি।

অঞ্জলির স্বামীও তখন হাসছে।

অঞ্জলি একটা চিঠি এগিয়ে দিল। বললে, করবীর চিঠি। এই দেখুন কলকাতার ছাপ।

—দেখি, দেখি। হাত বাড়িয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ।

অঞ্জলি বললে, আমার চিঠি আপনি পড়বেন কেন! বলে হাসল।

তারপর বললে, কি মেয়ে বাবা। রেগে একা-একাই চলে গেছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ প্রথমে অবাক হয়েছিলেন।—কি বলছ অঞ্জলি? সারা মুখ খুশিতে ভরে উঠেছিল।—তাই নাকি? সত্যি? সত্যি বলছ?

সঙ্গে সঙ্গে ওঁর একটা দিনের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

করবীর কি হতে পারে, কোথায় যেতে পারে আলোচনা করতে করতে অঞ্জলির স্বামী সেদিন বলে উঠেছিল, তোমার বন্ধু এমন একটা ন্যাস্টি ব্যাপার করবে আমি ভাবতেই পারিনি।

আর অঞ্জলি মুখ কাচুমাচু করে বলেছে, বন্ধু বলছ কেন, একসঙ্গে পড়তাম, এইটুকুই।

করবী ওর বন্ধু হওয়ার জন্যে অঞ্জলির স্বামীর চোখে অঞ্জলিও কি ছোট হয়ে গিয়েছিল!

নাকি ওদের গায়েও একটু ছিটে লেগেছিল ?

কাউকেই চেনা যায় না, কোন মানুষকেই নয়। মুহূর্তে মুহূর্তে তার চেহারা পাল্টে যায়।

এই তো একটা তুচ্ছ ঘটনা। এখন তো তুচ্ছই। করবীকে এখন যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন।

সমুদ্রের দিকে, আকাশের দিকে তাকালেন। মনে মনে বললেন, এর নাম উষা। নিত্যযৌবনা, শুভ্রবসনা, আকাশদুহিতা। ত্রিষ্টুপ ছন্দের সেই চিবন্তন উষা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি যাকে দেখেছিলেন, উশিজ ও দীর্ঘতমার পুত্র কাক্ষীবান দেখেছিলেন মৃদুহাস যুবতীর অনাবৃত বক্ষোদেশের মত এই উষাকে !

এই তো পৃথিবীর শেষ সীমায় এসে আমি দাঁড়িয়েছি। পৃথিবী এখনই প্রণত হবে সূর্যের পায়ে। সেই আদি মুহূর্ত থেকে অনন্তকাল ধরে পৃথিবী অবিরাম তার প্রণতি জানাচ্ছে সূর্যকে। কিন্তু এই সত্যকে তো কোনদিন উপলব্ধি করতে পারি না। এটা বিজ্ঞানেব বইযেব মধ্যেই থেকে যায়।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর চোখের সামনেই সূর্য যেন করবীর কপালের লাল ডগডগে বড় একটা সিঁদুরের টিপ হয়ে গেল।

ঐ তো দেখতে পাচ্ছেন দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে করবী, হাসি হাসি মুখ। হাসছে, কেবলই হাসছে। বলছে, কেমন জব্দ।

আর নিখিলেশ অবাক হয়ে গেছে। সেও হাসছে। বলছে, কি কাণ্ডটাই না কবলে। সকলে কত কি ভাবছে বলো তো !

করবী তখনও হাসছে। বলছে, তুমিই তো কত কি ভেবেছ। আরে পাগল। আমি তো কল্যাণসুন্দরেব গান শুনতে যাইই নি। একা-একা রাগ করে বসেছিলাম সি-বিচে।

অঞ্জলি বলেছে, জানেন, কববী সব লিখেছে আমাকে। নিখিলেশবাবু কত কি ভেবেছিলেন সেদিন। অথচ করবী তো যায়ইনি গান শুনতে।

সঙ্গে সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন, জানি, জানি, আমি তো ওকে দেখেছিলাম একা-একা বসে ছিল সমুদ্রেব পাড়ে, তন্ময় হয়ে।

তারপর একটু থেমে বলেছেন, কলকাতায় ফিবেই যাব একদিন। কি বোকা মেয়ে।

এখন আব কোন দুঃখ নেই। অনুশোচনা নেই। করবীর সেই আগেব ছবিটাই ফিবে এসেছে। নিষ্পাপ, সুন্দর। এখন আর তাব গায়ে একটুও কালি লেগে নেই।

ধূর্জটিপ্রসাদ বলতেন, ট্রুথ কেউ জানতে চায় না, সবাই ইমেজ নিয়েই পাগল।

এখন তো বুঝতে পারছেন, ট্রুথ কখনও জানা যায় না। সত্যকে সব সময় শুধু খুঁজে বেড়াতে হয়। আমি নিজেও তো এই ইমেজকেই সত্য বলে ভেবেছি, ইমেজকেই ভালবেসেছি। তনুশ্রীর মতই।

এই উষা, এই সূর্যোদয়, এও তো একটা রূপক। একটা কল্পনা। ট্রুথ নয়।

পৃথিবীর শেষ সীমায়, ভূমণ্ডলের শেষ প্রান্তে এসে আমি দাঁড়িয়েছি। পৃথিবী প্রণত হচ্ছে সূর্যের পায়ে, অবিরাম, অবিরত। আর আমরা ভাবি সূর্যোদয়। কোন ছবিটা সত্য ? উষা ক্রমাগত ছুটে চলেছে, এক যুবতী শ্বেতশুভ্রা তরুণী, আব পিছনে ধাবমান সূর্য। জ্যোতির্বসনা আকাশদুহিতা উষাকেই তো আমরা দেখি এবং সূর্যোদয়। আমাদেব দেখাটাকেই সত্য বলে মনে করি। সেই কল্পনা দিয়ে গড়া ইমেজটাকেই।

তনুশ্রী তো এমনি একটা ইমেজকেই ভালবেসেছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ ভাবলেন, অন্ধকার বিদীর্ণ করে হীরকবর্ণা উষা। তনুশ্রী আমার অন্ধকার দূর করে দিয়েছে। সমস্ত কিছু জানার পরও তো এই সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছেন

সেই আদি ও অনন্ত রূপটাই। একটুও বদলায়নি। প্রকৃতি এখনও তেমনি সুন্দর, তেমনি চিরন্তন আর রোমাঞ্চকর।

মুনলাইট হোটেলের সামনের চৌকো বারান্দায় ওঁরা অপেক্ষা করছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ, অঞ্জলি, অঞ্জলির স্বামী, অরুণেন্দু, তার স্ত্রী আর মালা।

ধূর্জটিপ্রসাদ দেখতে পাচ্ছেন, ম্যানেজারবাবু সেই ভদ্রলোককে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, ইনিই কল্যাণসুন্দর।

আর সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ বুঝতে পারলেন, সকলেই যেন হতাশ হয়েছে। যেন একটা উজ্জ্বল ছবি দেখতে চেয়েছিল সকলে।

মালা বলে উঠেছিল, এই ? এই নাকি কল্যাণসুন্দর !

তনুশ্রীর কাছেও তাই কল্পনার মানুষটাই বড় হয়ে আছে। সেই জাল মানুষটা।

নিঃস্ব রিক্ত দুটি চোখ তুলে তাকিয়েছিল তনুশ্রী। উদাস বিষণ্ণ গলায় বলেছিল, কি হবে, আমি তো ওঁকে চিনিই না।

মুনলাইট হোটেলের আসল কল্যাণসুন্দরের কাছে আসতে ও রাজি হয়নি। ধূর্জটিপ্রসাদ বুঝতে পেরেছিলেন, আসল কল্যাণসুন্দবেব কোনও মূল্যই নেই ওর কাছে। ঐ নকল মানুষটাকেই ও ভালবেসেছে।

'আমি তো আমার এই মুখ দিযেই কথা বলেছি, এই গলা দিয়েই গান গেযে শুনিয়েছি। আমার এই হাত দিয়েই ওকে স্পর্শ করেছি। আমার এই চোখ দিয়েই ওকে ভালবাসা চিনিয়েছি।'

ধূর্জটিপ্রসাদের মনে পড়ল কথাগুলো। জাল কল্যাণসুন্দবেব কথা। জাল ? নাকি কল্যাণসুন্দরের ইমেজ ! অফুরন্ত জীবনীশক্তির একটা মানুষ, সাঁতার কেটে কত দূর চলে যেতে পারে, কত সুন্দর সুন্দর কথা বলে, ভবাট গলার গান, কি সবল স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত, কববীর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল। কি মুগ্ধ বিস্ময়ে মন্দিবের পিছনে সিঁড়ির ধাপে বসে ওর কথা শুনছে তনুশ্রী। ওব সারা মুখে ভালবাসা আঁকা হয়ে আছে।

তনুশ্রীকে যেন দেখতে পাচ্ছেন ধূর্জটিপ্রসাদ। একটা ভেঙে পড়া বিষণ্ণ নিঃস্বতাব শবীব। করুণ বেদনার মত মুখ। জানলার গরাদে মুখ চেপে বসে আছে। যেন কারও প্রতীক্ষায়। সিঁড়ির ধাপে থামে হেলান দিয়ে বসে আছে একটা বিক্ত দুঃখী মুখ।

তনু, তনুশ্রী ঠিক ঐভাবেই বসে থাকবে। সারা জীবন। কাঁটা-খিচখিচ বুকে সেই প্রাণচঞ্চল নকল-মানুষটার কথাই ও ভাববে আর ভাববে। হযতো, পরিমল, সেই ছটফটে ছেলেটি যে ওকে চিঠি দিয়েছিল, যাকে নিয়ে তনুশ্রী হাসাহাসি করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই ছেলেটিই হয়তো একদিন ওব পাশে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু তখনও ভিড়ের মধ্যেও ও সেই জাল মানুষটাকেই খুঁজে বেড়াবে। যে ওকে প্রথম ভালবাসা চিনিয়েছে।

কিংবা কে জানে, খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে, খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে একদিন ঐ ইমেজটার পাশেই, ঐ জাল কল্যাণসুন্দরের পাশেই গিয়ে দাঁড়াবে তনুশ্রী। তনু। আমার কল্পনায় গড়া, ওই সমুদ্রের কাছে হারিয়ে যাওয়া আমার সেই ন বছরের ফুটফুটে মেয়ে।

ভাবতে ভাবতে ধূর্জটিপ্রসাদের বুকের মধ্যে অসহ্য একটা কষ্ট হল।

উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সমুদ্রের দিকে তাকালেন। গভীর দুঃখের মত সমুদ্রের দিকে।

চড়াই

সমীরণের মধ্যে কোথাও একটা দুর্বোধ্য অস্থিরতা আছে। ও নিজেও তা জানে। অথচ ওর এই ছটফটানি কিসের জন্যে তা সমীরণ চেষ্টা করেও খুঁজে পায়নি। আমার তো কোন অভাব নেই, অসুখ নেই, কোন দুঃখ নেই। তা হলে!

অফিসের বন্ধুদের সঙ্গে, মেটা দত্ত লাহিড়ীদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিতে দিতে ও হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল। চলি, কাজ আছে।

কাজ কিছুই ছিল না। কাজ কিছুই থাকে না। বেরিয়ে আসার পরক্ষণেই ওর মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বের হয়—বোর্‌ড। আসলে জীবনটাকেই ওর খুব একঘেয়ে লাগে, নাকি এটা ভিতরের কোন অস্থিরতা, সমীরণ বুঝতে পারে না।

স্টিয়ারিঙে বসে গাড়ি চালাতে চালাতে সামনের ক্ষুদে আয়নায় ও একবার নিজেকে দেখেও নিল। সদ্য চল্লিশ পেরোনো শরীরে একটু মেদ, দু-গালে একটু মাংস ওকে আরও যুবক করে দিয়েছে। কানের দু-পাশের কাঁচা-পাকা চুলগুলো দেখে নিল সমীরণ। এখানেই বয়েসটা ধরা পড়ে। নিজের মনেই একবার হাসল। অশোক বলেছিল, ঐ একটু একটু পাকা চুল তোমাকে বেশ একটা ব্যক্তিত্ব দিয়েছে। কথাটা শুনে ও সেদিন হেসেছিল, কিন্তু চুলের ফাঁকে ফাঁকে বয়সের এই ঈষৎ বিজ্ঞাপন ও সেজন্যেই ধরে রেখেছে কিনা কে জানে। কিংবা ও বোধহয় জানে ওর চেহাবার সঙ্গে ঐ সামান্য পাকা চুলেব রেখা দিব্যি মানিয়ে গেছে। আর ব্যক্তিত্ব? বোধহয় এই মোটা ফ্রেমের চশমায়। কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিমানুষটাকে কিছু দিতে পারে নাকি?

কোথাও তো যাবার নেই, অথচ কোথাও যেতে হবে, সমীরণ মনে মনে ভাবল। আমি লোকটা ব্যাচেলার, বিয়ে-থা করব না, কারণ দিব্যি চলে যাচ্ছে। এটাই সকলকে বলি, কিন্তু নানা ঝামেলায় যথাসময়ে হয়ে ওঠেনি। অর্থাৎ ছোটবোন চিকোর বিয়ে। আর প্রিয়তোষরা ভাবে সেজন্যেই আমার অস্থিরতা, কোথাও দু-দণ্ড স্থির হয়ে থাকতে পারি না। মনে হয় সবাই বড়ো অনর্গল বাজে অর্থহীন কথা বলে যাচ্ছে। এবং সেই সব কথায় মশগুল হয়ে থাকছে। আসলে কারও কোথাও তো যাবার নেই, অথচ কোথাও যেতে হবে। সুতরাং ক্লাবে কিংবা পার্ক স্ট্রিটের ঠাণ্ডা রেস্তরাঁয়. প্রেম-বিয়ে-কিংবা-সংসারে, দামী ফ্ল্যাটে অথবা আরও দু-ধাপ উঁচু পোস্টে। মনে মনে, আমি নিজেও কি তাই?

একবারটি কি ভেবে নিয়ে সমীরণ প্রিন্সেপ ঘাটের দিকে গাড়ি ঘোরাল। দ্রুত বাঁক নিল, স্পীড বাড়াল।

ওদিকটা বেশ ছিল আগে। আরেকটা ব্রিজ হবো হবো করে জায়গাটাকে ছন্নছাড়া করে দিয়েছে। কি মজা দ্যাখো, একটা কিছু হতে গেলেই অন্যটা ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে।

না, আজও অবশ্য ভিড় আছে। সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ধার বরাবর ওদিকটায় টিউবলাইটের ফ্যাকাসে সাদা আলোয় প্রতিদিনই একটা উজ্জ্বল ভিড় দেখা যায়। সেজেগুজে বেশ একটা ফুর্তি ফুর্তি ভাব নিয়ে এন্তার মেয়েপুরুষ যখন কাগজের নৌকোর মত ভেসে ভেসে হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়ায় এখানে, হাসে কথা বলে, টিকিয়া কিংবা ভেলপুরি খায়....এটাই সুখী কলকাতা কিনা সমীরণ জানে না। ওর মত কেউ কেউ কি দম বন্ধ হওয়া জীবন থেকে মুখ বাড়িয়ে নিশ্বাস নিতে আসেনি। অথচ অঙ্কের নিয়মে তো সমীরণ সুখী।

একটু অস্থিরতা, একটু চিড়বিড়ে বিরক্তি, এই যেমন গাড়ি পার্ক করা নিয়ে। দু-পাশেই সারি দিয়ে দাঁড় করানো গাড়ি, ফাঁকে ফাঁকে আরেক উপদ্রব জুটেছে স্কুটার, এমনভাবে রেখে

গেছে, পুরো একখানা গাড়ির জায়গা জুড়ে।

কম বয়সে বাসে উঠেই যেমন দুটো মানুষের মাঝখানে এক বিঘত জায়গা খুঁজত তন্নতন্ন করে, ঠেলেঠুলে বসে পড়ত, সমীরণ ঠিক তেমনি চোখে গাড়ি পার্ক করার জায়গা খুঁজল। ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল, দূর থেকে হঠাৎ একটা ফাঁক দেখতে পেয়েই স্পীডে এগিয়ে গেল, নাক ঢুকিয়ে দিল গর্তে, আর সামনে যে গাড়িটা ব্যাক করে ওখানে ঢোকার চেষ্টা করছিল, তার পথ আটকে দিল। বোকা বনে যাওয়া চোস্ত ভদ্রলোক বিড়বিড় করে কিছু একটা গালাগাল দিল কিনা জানার ইচ্ছেও নেই সমীরণের। ও গাড়ি রেখে চাবি লাগিয়ে জেটির দিকে হাঁটতে শুরু করল। ভদ্রলোককে বোকা বানাতে পেরেছে বলে খুশি খুশি লাগল। একটু লজ্জা একটু অস্বস্তি হল না তা নয়, কিন্তু সুযোগ পেলে ঐ লোকটাও ঠিক এই কাজই করত। ওপরতলার এই ঝকঝকে মানুষগুলো সকলেই তো এমন করে। বাসে সিট দখল করার স্মৃতি বোধহয় রয়ে গেছে সকলের মধ্যেই।

এই সব নিয়ে থাকলে জীবনটা একঘেয়ে লাগে না।

জেটির মুখ, সমীরণ দেখল একেবারে মৌচাক হয়ে আছে।

ভেলপুরির ভিড় ডিঙিয়ে নানান ধাঁচের মেয়েদের পোশাককে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে একটা দৃশ্য সমীরণের ভারি ভাল লেগে গেল। একটি কিশোরী মেয়ে তার আইসক্রিমের পট থেকে কাঠের চামচে আইসক্রিম তুলে ধরেছে সামনের কিশোরটির মুখের কাছে, কানে এল সে বেশ নরম গলায় বলছে, একটু খাও না। ছেলেটি আদুরে হাসি হেসে মাথা নাড়ছে—ন্না।

সমীরণ মনে মনে বলে উঠল, বাঃ!

এক একসময় এই সব দৃশ্য ওর ভিতবের মনটাকে বড়ো নরম করে দেয়। সমীরণ জেটির দিকে এগিয়ে গেল। এগিয়ে যেতে যেতে কেমন একটা উদ্দেশ্যহীন চোখে চাবপাশের সকলকে দেখছিল, সৌজন্য ও ভদ্রতার চোখ যেভাবে মেয়েদের দেখে। চেনে বাঁধা গাড়ির চাবির রিংটা ঘুরছিল আঙুলের ডগায়। ওটা প্যান্টের পকেটে রেখে দেওয়া যায়, রাখে না কেন? বোধহয় বিজ্ঞাপন। সমীরণের বাবা মফস্বলের হেডমাস্টার ছিলেন। সমীরণ তা থেকে বেশ কিছুটা উঠেছে। ওর মনে কোন ক্ষোভ নেই। গাড়িটা নতুন রঙ করিয়েছে। সেকেন্ড হ্যান্ড। সস্তায় পেয়ে হঠাৎ কিনে ফেলেছিল। আজকাল যাতায়াতের যা অসুবিধে। না, চাবির রিং ঘোরানো ওর অভ্যাস, অহঙ্কার নয়। পকেটে রাখলে কোথাও পড়ে যেতে পারে, তখন ওই গাড়িই বাহন থেকে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে, সেই ভয়। হঠাৎ কোনদিন মাঝপথে গাড়ি খারাপ হলে যাচ্ছেতাই ব্যাপার। তখন সমস্ত মেজাজ নষ্ট হয়ে যায়।

আজ এখানে এসে কিন্তু সমীরণের মন বেশ ফুর্তি ফুর্তি।

ছিপছিপে ঐ কিশোরী মেয়েটির ছেলেবন্ধুকে আইসক্রিম খাওয়ানোর গল্পটা চিকোকে বললে, চিকো ওর ছোট বোন, সে চাপা হাসি হেসে বলবে, তার চেয়ে তুই একটা বিয়েই করে ফেল না দাদা, ওসব দেখে বেড়ানোর কি দরকার। সমীরণ অবশ্য চিকোকে গল্পটা না বলে পারবে না, বলবে এবং তারপর জিজ্ঞেস করবে বিয়ের আগে তোর বয়ফ্রেন্ডকে তুইও ওভাবে আইসক্রিম খাইয়েছিস নাকি? সমীরণ জানে, জবাবে চিকোর ঐ রসিকতা ফেরত আসবে।

অবাঙালী ছেলেমেয়েদের একটা ঢেউ যেন ওকে স্নান করিয়ে দিয়ে তরতর করে বয়ে গেল। তাপ্পি দেওয়া জিন, খাটো শার্ট পরা দুটো মেয়ে, একটা সলমা-চুমকি বসানো নীল শাড়ি, একজন কাপ্তান পরা বেশ লম্বা চেহারার। ছেলে দুটোকে সমীরণ দেখলই না।

—স্যার! বেড়াতে এসেছেন?

ওরই অফিসের একজন কেরানী ছোকরা, সঙ্গে বন্ধু, দেখা হওয়ার আর জায়গা পেল না, সমীরণ সদাশিব হেসে এক মুহূর্ত দাঁড়াল, হ্যাঁ চলি। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ছোকরা গেটের বাইরে বেরিয়ে গেল, সমীরণ স্বস্তি বোধ করল।

জেটিতে আজ কোন জাহাজ-টাহাজ লেগে নেই, থাকলে সমস্ত চেহারাটাই অন্যরকম হয়ে যায়। আজ গড়ানো গ্যাংওয়ে, মাথা-তোলা বয়ার সারি, ভাসমান ফ্লোট মানে প্লাটফর্ম কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া। তাই বোধ হয় গ্যাংওয়ে ধরে খুব কম লোক নীচে নেমে গেছে। মাত্র কয়েকজন, এক দঙ্গল স্মার্ট পোশাকের ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা ছেলে নিজেদের মধ্যে লাফালাফি করছে, দু-চারটি মেয়ে হয়তো বিরক্ত হয়েই উঠে আসছে তড়বড় করে, সঙ্গের পুরুষ সঙ্গীরাও। ওদের অভব্য হাসাহাসি লক্ষ করে লক্ষ্যস্থল আবিষ্কার করল ও, রেলিং ধরে দাঁড়ানো একা একটি মেয়ে, বেশ সুশ্রী বলেই মনে হচ্ছে দূর থেকে। এইসব বাঁদরামি সমীরণ একেবারেই সহ্য করতে পারে না, কিন্তু প্রতিবাদ করার মত সাহস পায় না। মেয়েটির তো উঠে চলে আসা উচিত, দাঁড়িয়ে আছে কেন একা একা, সমীরণ আশেপাশে তাকিয়ে দেখল সঙ্গের কোন পুরুষ, স্বামী বা প্রেমিক বা অন্য কেউ ওখানেই আছে কিনা। না, নেই। তা হলে জলের দিকে অন্ধকারের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে কি দেখছে মেয়েটি, অথবা তন্ময় হয়ে কিছু ভাবছে, বুঝতেই পারছে না ওকে নিয়েই ছেলেগুলোর বেলেল্লাপনা। একেবারে জলের ধার ঘেঁসে রেলিং ধরে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, একেবারে তুলিতে আঁকা ছবির মত। স্নিগ্ধ, পবিত্র। নাকি মেয়েটাই খারাপ ? কি আশ্চর্য, এখনও একা কোন মেয়েকে, বিশেষ করে এসব জায়গায়, দেখতে পেলেই আমবা খারাপ ভেবে নিই।

সমীরণ একবার ভাবল নীচে নেমে গিয়ে দেখে আসবে, কৌতূহল, তারপর নিজেরই খারাপ লাগল। একটু আগেই অফিসের একজন বলেছে, স্যার, বেড়াতে এসেছেন। কেন, সে কি ভেবেছিল, ভেলপুবি বেচতে এসেছি ?

সমীরণের মধ্যে আবার সেই অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে। আর ভাল লাগছে না। ও ভাবছিল একটা বেঞ্চ পেলে একটু বসবে, কিংবা ফিরে যাবে। কোথায় যাবে খুঁজে পেল না। কোথাও তো যাবার নেই, অথচ কোথাও একটা যেতে হবে। এখন, প্রতিদিন, সাবা জীবন। সব মানুষের সামনে এই একটাই গোলকধাঁধা।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে কফির দোকানটা পেরিয়ে অনেক দূর অবধি চলে গিয়েছিল সমীরণ। একটা চক্কর দিয়ে জেটির মুখে ফিরে আসতেই দেখল রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি উঠে আসছে। হয়তো এতক্ষণে পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, কিংবা স্বামী ভদ্রলোক এখানেই কোথাও আছেন ! মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুর রয়েছে, এক চোখ তাকিয়েই লক্ষ করল সমীরণ, বেশ ডগডগে। বিয়ের পরপরই মেয়েরা যেমন দেয। তা হলে কি মেয়েটির সদ্য বিয়ে হয়েছে ? বুঝতে পারল না। কিন্তু মেয়েটির ছবি যেন ওর বুকের মধ্যে গাঁথা হয়ে গেল।

এক নিমেষের জন্যেই দেখল সমীরণ, পার হয়ে গেল। ওর ভিতরের অস্থিরতা আবার ওকে কোথাও টেনে নিয়ে যেতে চাইল। ভাবল, চলেই যাই। কিন্তু পারল না ! ঐ মেয়েটি কি এক দুর্বোধ্য কৌতূহলে ওকে যেন টেনে ধরছে। বেড়ানোর জন্যেই তো এখানে আসা। যেন সেভাবেই হাঁটছে সমীরণ। উত্তর-দক্ষিণের গঙ্গার ধারে ধারে পিচে মোড়া রাস্তাটা ধরে ও সেই উজ্জ্বল রেস্তরাঁ পার হয়ে অন্ধকার অবধি চলে গিয়েছিল, ফেরার পথে মানুষজনের ফাঁকে মেয়েটিকে আবার দেখতে পেল। একা একা হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওকে পার হয়ে একবার চলে গেল সমীরণ, আবার ওকে পেরিয়ে কফির দোকানটা অবধি ফিরে এল। কফি খাবে কিনা এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ভাবল। নাঃ। এভাবে একা হাঁটতে দেখে মেয়েটির সম্পর্কে একটু কৌতূহল জাগছে। উত্তর থেকে আবার দক্ষিণে ফিরতে ফিরতে ভিড়ের মধ্যে ও

মেয়েটিকে খুঁজল। পেল না। একটা বেঞ্চের পাশে একজনের মত জায়গা ফাঁকা পেয়ে বসে পড়ল। মেয়েটির মুখ ওকে কিন্তু ছাড়তে চাইছে না।

উঠে পড়ল। ফিরে আসতে আসতে আবছা অন্ধকারের দু-পাশে ও বোধহয় মেয়েটিকে খুঁজতে শুরু করল। হয়তো ইতিমধ্যে চলে গেছে, কিংবা....

হঠাৎ চলন্ত পা মুহূর্তের জন্যে থমকে গিয়েছিল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সমীরণ।

সেই মেয়েটি! আলোয় অন্ধকারে একটি বেঞ্চের কোনা ঘেঁসে বসে আছে। একা, তেমনি একা। খারাপ, মেয়েটা নির্ঘাত খারাপ, সমীরণ মনে মনে বলে উঠল। কারণ ইতিমধ্যে ভিড় ফিকে হয়ে এসেছে, অনেকেই চলে গেছে, এই ঠাণ্ডা জোলো বাতাস আর কালো জলের বুকে লঞ্চের ঝিকমিক আলো আর নৌকোর গলুইয়ে রাখা লণ্ঠনের মায়ায় পড়ে সামান্য কিছু পুরুষ ও রমণী তখনও রয়ে গেছে। ক্রমশই জায়গাটা নির্জন হয়ে আসছে। অথচ ঐ মেয়েটি এখনও একা একা বসে আছে। মানুষকে বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না, বোঝা যায় না। অথচ একটু আগে ওকে এক ঝলক দেখেই সমীরণ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

খারাপ, খারাপ! মনে মনে বলল সমীরণ, কিন্তু একটা অদ্ভুত কৌতূহল যেন ওকে টানছে। ও কিছুতেই চলে যেতে পারছে না। এই বেঞ্চটার কাছেই আরও একবার ফিরে আসার জন্যেই ও কফির দোকানটা পার হয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে গেল। গোল গম্বুজ পার হয়ে, ছায়া ছায়া অন্ধকারে। তারপর দ্রুত পায়ে আবার ফিরে এল, জেটির মুখ পার হয়ে গেল, চোখ খুঁজছে আলো-অন্ধকারের সেই বেঞ্চটাকে।

নেই। মেয়েটি নেই। কখন উঠে চলে গেছে, বেঞ্চটা শূন্য। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকে কোথাও দেখতে পেল না।

নাঃ, ফেরা যাক। সমীরণ চাবির রিংটা আঙুলের ডগায় ঘোরাতে ঘোরাতে গেট পার হয়ে বেরিয়ে এল। লোকজন একেবারেই কমে এসেছে, দু-পাশে গাড়ির সারি হঠাৎ যেন উবে গেছে, ছড়ানো ছিটোনো দু-চারখানা মাত্র, নিজের গাড়িটা দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল সমীরণ। পায়চারি করতে করতে আর বেঞ্চে চুপচাপ বসে এতখানি সময় পার হয়ে গেছে, বুঝতেই পারেনি। ও চাবি লাগিয়ে দরজা খুলল, আর তখনই গোলগম্বুজের ওপারের অন্ধকার দিকটায় একটা হট্টগোল শুনে থমকে দাঁড়াল। কি একটা চিৎকার, লোকজন ছুটছে। জুতোর শব্দ, সামনের কফির দোকানটার দোতলার রেস্তরাঁ থেকে মাথা গলিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে বয়গুলো। পাতাঝোপের বেড়ার ওপর দিয়ে ব্যাপারটা কি জানবার চেষ্টা করল সমীরণ, কিছুই দেখতে পেল না।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ভাবল চলে যাবে কিনা। কি ভেবে এদিকের ফটক পার হয়ে আবার ভিতরে ঢুকল। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছোটখাটো একটা জটলা দেখতে পেল। না, মারামারি খুনোখুনি নয়। দু-একজন ছুটতে ছুটতে ওদিকেই চলে গেল সমীরণকে পার হয়ে।

সমীরণ ব্যক্তিত্বের পায়ে আস্তে আস্তে হেঁটে গেল আঙুলের ডগায় চাবিটা ঘোরাতে ঘোরাতে। হ্যাঁ, শরীরে কিঞ্চিৎ মেদ, গালে মাংস, দু-কানের পাশে সাদা চুলের মিশেল ওকে একটা ব্যক্তিত্ব দিয়েছে। কিংবা ও প্রথমেই একটা ভাল চাকরিতে ঢুকেছিল বলে। কিংবা ও সেই অর্জিত ব্যক্তিত্বটা দেখাতে জানে।

জটলার কাছে গিয়ে সমীরণ বললে, কি হয়েছে, এত গোলমাল কিসের ?

ওর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, কমবয়সী ছেলেগুলো ফিরে তাকাল, একজন উদ্দীপ্ত বিস্ময়ের কণ্ঠে বলে উঠল, সুইসাইড, সুইসাইড করতে যাচ্ছিল।

ততক্ষণে জটলার মাঝখানে দাঁড়ানো মেয়েটির দিকে ওর চোখ পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে

চমকে উঠেছে সমীরণ। সেই মেয়েটি! রেলিং ধরে তন্ময় হয়ে যে দাঁড়িয়েছিল জলের গা ঘেঁসে, অন্ধকারে একটা বেঞ্চের এক কোনাতে যে বসে ছিল একা-একা।

একসঙ্গে অনেক লোক কথা বলছিল। 'আমার দেখেই সন্দেহ হয়েছিল।' 'এই জোয়ার, একেবারে গঙ্গার কাছে চলে যাচ্ছিলেন।' 'আমি দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে না ধরলে ঝাঁপ দিয়ে পড়তেন।'

মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল সমীরণ। আবছা অন্ধকারে মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। মুখ তুলছে না, শুধু একবার বললে, আমাকে প্লিজ ছেড়ে দিন, আমি চলে যাচ্ছি।

মেয়েটি ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল।

কে একজন বলে উঠল, না, না, একা ছাড়বেন না। ওঁর এখন মাথার ঠিক নেই।

মেয়েটি চমকে একবার মুখ তুলে তার দিকে তাকাল, মুখ নামিয়ে নিল।

আর তখনই একটি ছেলে সমীরণের হাতের চাবির রিংটা দেখে বলল, আপনার তো সঙ্গে গাড়ি আছে, কি দাদা।

সমীরণ উত্তর দিল না। কি দাদা! সমীরণের ব্যক্তিত্ব মুহূর্তের জন্যে ধাক্কা খেল। ও 'স্যার' শুনতেই অভ্যস্ত। কিংবা সমীরণবাবু। ওর মধ্যে বেশ একটা আত্মবিশ্বাস আছে। যদিও ওর অধস্তন কর্মচারীদের কোনদিন বলেনি, 'স্যার' বলবেন না, সমীরণবাবু বললেই তো হয়। ঠিক এই কথা ওর সিনিয়র একজন বলেছিল, ওরা হাসাহাসি করেছে তা নিয়ে, শেষ অবধি লোকটাকে কেউ মান্য করত না, সে রিটায়ার করার পর ওরাও বেঁচেছে। ব্যাটা ফিলজফার বলে কিনা 'স্যার' কথাটা কেরানীদের মধ্যে একটা ক্ষুদ্রতা এনে দেয়। এদের এই 'কি দাদা' শুনলে সমীরণের সেই সিনিয়র ভদ্রলোকও হয়তো ভিরমি খেতেন।

'না না, একা ছেড়ে দেওয়া চলবে না। গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসুন আপনারা।' কে একজন বললে।

আরেকজন বললে, 'এসব কেসে পুলিসকেই খবর দেওয়া উচিত।'

মেয়েটি প্রায় কান্নার গলায় অনুনয় করল, আমাকে ছেড়ে দিন,আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি।

সমীরণ হঠাৎ বলে উঠল, আসুন, আপনি চলে আসুন। আপনারাও আসুন না দু-একজন।

'এসব কেসে পুলিসকেই খবর দেওয়া উচিত।' কে একজন বলেছিল। জবাবে আরেকজন বলেছিল, 'আবার পুলিস কেন ?'

পুলিস কথাটাতেই ভিড় ফাঁকা হতে শুরু হল। শুধু দুটি ছেলে বলে উঠল, চলুন দাদা, চলুন, আমরাও যাচ্ছি। গাড়ি আছে তো আপনার ?

সমীরণ কোন জবাব দিল না তাদের, শুধু মেয়েটিকে বললে, আপনার কোন ভয় নেই, আসুন।

ছেলে দুটি পিছনে বসতে যাচ্ছিল, সমীরণ প্রায় হুকুমের গলায় বললে, সামনে, সামনে।

পিছনের দরজাটা খুলে ধরে মেয়েটিকে বললে, উঠুন।

গাড়ির চারপাশের জটলাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সমীরণের গাড়ি স্পীডে বেরিয়ে গেল।

আর তখনই সমীরণের কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। ছেলে দুটি ওর পাশেই বসে আছে, মেয়েটি পিছনে একা। 'সুইসাইড, সুইসাইড করতে যাচ্ছিল।' কান সজাগ রাখল সমীরণ, মাঝে মাঝে সামনের খুদে আয়নায় চোখ। হঠাৎ দরজা খুলে ঝাঁপ দিয়ে না বসে।

পরক্ষণেই একটা সন্দেহ ওর মনে উঁকি দিল। সমস্ত ব্যাপারটা সাজানো নয় তো। এমন তো হামেশাই শোনা যায়। এই মেয়েটি হয়তো ছেলে দুটিরই দলের। মাঝপথে ব্ল্যাকমেল করে বসতে পারে।

ভিতরের নার্ভাসনেস চাপা দেবার জন্যে গাড়ি চালাতে চালাতেই একটা সিগারেট ধরাল

সমীরণ। আড়চোখে ছেলে দুটিকে একবার দেখল।

তারপর স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে বললে, আমাদের প্রথমে কিন্তু পুলিস স্টেশনেই যেতে হবে।

মনে মনে ভাবলে, এই ফাঁকা রাস্তাটা পার হয়ে গেলেই বাঁচি।

ছেলে দুটি কোন কথা বলল না, মেয়েটিও না।

সমীরণ কি ভয় পেল ? কিন্তু মেয়েটির মুখ দেখে ওর তো একবারও মনে হয়নি সব কিছু অভিনয় হতে পারে। বাইরের চেহারা দেখে কাউকে কি কিছু বোঝা যায়। জেটির আলোয় দেখে একবার তো ও মুগ্ধ হয়েছিল, ভেবেছিল কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের সুখী বধূ, আবার বেঞ্চের কোনায় আবছা অন্ধকারে বসে থাকতে দেখে ভেবেছিল, খারাপ, খারাপ।

'আমাদের প্রথমে কিন্তু পুলিশ স্টেশনেই যেতে হবে', কথাটা কি ভেবে বলেছিল সমীরণ, ও নিজেই জানে না।

কোনরকমে স্পীডে গাড়ি চালিয়ে পি জি হাসপাতালের কাছে পৌঁছে ও বোধহয় কিছুটা স্বস্তি পেল। এখানে কিছু কিছু লোক চলাচল রয়েছে, দু-চারখানা খালি ট্যাক্সির মাথায় আলো জ্বলছে।

পি জি হাসপাতালের সামনে এসে পৌঁছতেই একখানা অ্যাম্বুলেন্স পথ আটকাল। অ্যাম্বুলেন্সটা হাসপাতালের গেটে ঢুকবে।

সঙ্গে সঙ্গে সমীরণের পাশের ছেলেটা বললে, একটু থামান দাদা।

চমকে ফিরে তাকাল ও। ছেলেটা মুখ কাচুমাচু করে বললে, আমি এখানেই নেমে যাই, আমার ভীষণ একটা কাজ আছে, ভুলেই গিয়েছিলাম।

সমীরণের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। ও যা সন্দেহ করছিল, সে-রকমই কিছু কি ! এক পলকের মধ্যে অনেক কথা ভিড় করে এল ওর মাথায়। ও যদি জোর করে বলে 'থানায় চলুন', কিন্তু থানায় যদি মেয়েটি আজেবাজে অভিযোগ তুলে বসে, সমীরণ জানে শেষ অবধি হয়তো কিছুই হবে না, কিন্তু একটা দাগ লেগে থাকবে। বিয়েটিয়ে করেননি ? ব্যাচেলার ? ও সি হয়তো বলে বসবে। অফিসে জানাজানি হলে সে আরও কেলেঙ্কারি। ঐ মেয়েটির কথা কেউ অবিশ্বাস করবে না। একবার বৃষ্টিতে ভিজে চুপসে একটি চাকুরে মেয়ে রাস্তায় ওর কাছে লিফ্‌ট চেয়েছিল। কোন উত্তর না দিয়ে সোজা চলে এসেছিল ও।

দু-চারজন অসৎ লোকের জন্যেই তো এই পৃথিবীতে এত অশান্তি, দু-চারজন অমানুষ বলেই তো সব মানুষকেই কখনও না কখনও অমানুষ হয়ে উঠতে হয়। সেদিন মেয়েটিকে লিফ্‌ট না দেওয়ার জন্যে অনুশোচনায় এ ধরনের অনেক কথাই ওকে ভাবতে হয়েছিল।

সেই অনুশোচনাই হয়তো ভিতরে ভিতরে রয়ে গিয়েছিল, আর তাই হঠাৎ এই মেয়েটিকে বলে বসেছে, আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।

না। ওপাশের ছেলেটি ততক্ষণে নেমে দাঁড়িয়েছে দরজা খুলে, আর ওই ছেলেটি নেমে যেতেই সেও গাড়িতে না উঠে বললে, যান, আপনিই নিয়ে যান দাদা, ওসব পুলিশ-টুলিশ ঝুটঝামেলায় যেতে চাই না।

ভয় আর সন্দেহ ততক্ষণে তরতর করে নেমে গেছে শরীর থেকে। এবার একটু উদার হওয়া যায়। আসলে ওরা দুজনে পুলিশের নাম শুনেই সরে পড়ছে, ঝামেলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চায় না আর। হয়তো শুধুই মজা দেখার জন্যে আসছিল, কিংবা বাড়িটা চিনে রাখার জন্যে। কিংবা শুধুই কৌতূহল।

সমীরণ উদার গলায় বললে, আহা চলুন না, কতক্ষণ আর লাগবে।

ছেলে দুটি মাথা নাড়ল। উল্টো পথে চলতে শুরু করল পরিত্রাণ পেয়ে। সমীরণের সমস্ত শরীর তখন হাল্কা হয়ে গেছে। ও অ্যাকসেলেরেটরে চাপ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল, থানা-টানায় আর নিয়ে যাবেন না। আমি তা হলে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

একটু থেমে বললে, আমাকে ছেড়ে দিন দয়া করে, আমি ঠিক বাড়ি চলে যাব।

সমীরণের মাথায় তখন ঘুরছে কথাটা। 'লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না, লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।' এই একটুক্ষণ আগে এই মেয়েটি গঙ্গার জোয়ারে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে মরতে চেয়েছিল। ওর বুকের মধ্যে কি দুঃখ কি কষ্ট, কিছুই জানে না সমীরণ। মেয়েটি এখন ওর কাছে শুধুই একটা রহস্য।

সমীরণের মনের মধ্যেও অদম্য কৌতূহল। জানতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কিছু প্রশ্ন করতে ভদ্রতায় বাধছে।

সমীরণের নিজেরও যেন কষ্ট হচ্ছে মেয়েটির জন্যে। এমন একখানা শ্রীমাখানো মুখ, ক্লান্ত সঙ্কুচিত, সামনের আয়নায় একবার তাকিয়ে মুখের অস্পষ্ট একটা অংশ দেখতে পেল। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। জানালার দিকে হেলে পড়েছে মাথাটা। মেয়েটি এখন হয়তো প্রচণ্ড লজ্জায় মুষড়ে পড়েছে। সমীরণের বুকের ভিতরটা কেমন টনটন করে উঠল। আহা বেচারী!

এই তো কিছুক্ষণ আগে রেলিং ধরে তন্ময় হয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল। তখন ছবির মত সুন্দর লেগেছিল, তখন সমীরণের দৃষ্টি অন্যরকম।

এখন বুকের মধ্যে একটা অবোধ্য ব্যথা। এখন ওর দৃষ্টি সমবেদনার।

সমীরণ ধীরে ধীরে বললে, বাড়ির ঠিকানাটা বলুন। একটু পরে বললে, আপনাকে আমি একা ছেড়ে দিতে পারি না।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর মেয়েটি কেমন হতাশ ক্ষীণ গলায় বললে, চলুন।

—আপনি এবার চলে যান, প্লীজ চলে যান। মেয়েটি বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে অনুনয় করল।

কিন্তু সমীরণ তো এভাবে চলে যেতে পারে না। ও বুঝতে পারছে মেয়েটিকে এখন একরাশ লজ্জা গ্রাস করে বসেছে। এখন হয়ত নিজের ভুল বুঝতে পারছে। দুঃখে কষ্টে কিংবা অন্য কোন রহস্য, মেয়েটিকে হয়তো উন্মাদ করে তুলেছিল, এখন ও প্রকৃতিস্থ। তাই পরিবারের মুখোমুখি হতে এত লজ্জা।

সমীরণ দাঁড়িয়ে রইল।

বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক দরজা খুললেন, তাঁর পিছনে এক মহিলা দূরে দাঁড়িয়ে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ে 'মা' বলে ছুটে গেল। মাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মা তাকে চোখের আড়ালে নিয়ে গেলেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক তখনও অবাক হয়ে একবার মেয়েটির চলে যাওয়ার দিকে একবার সমীরণের দিকে তাকাচ্ছেন।

ভদ্রলোক সমীরণকে ঢুকতে বললেন না, বসতে বললেন না। সমীরণেব অস্বস্তি লাগছিল, একটু বোধহয় অপমানিত। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সমীরণ বললে, ওঁকে একটু সাবধানে রাখবেন।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন।

সমীরণ কথাটা কি ভাবে বলবে ঠিক করতে পারছিল না। এতক্ষণ যা ভেবে রেখেছিল সব কেমন জড়িয়ে গেল। বললে, আউটরামে···উনি গঙ্গায়···আজ প্রচণ্ড জোয়ার···মানে সুইসাইড···সুইসাইড করতে যাচ্ছিলেন।

—সুইসাইড। বৃদ্ধের মুখে শব্দটা দুঃখের দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাল।

সমীরণ মাথা নাড়ল।

তারপর আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বললে, আমি চলি। সত্যি সত্যি পা বাড়িয়েছিল সমীরণ, বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওর সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে এলেন। আর হঠাৎ সমীরণের হাতখানা খপ্ করে ধরে ফিসফিস করে বললেন, দয়া করে কাউকে বলবেন না, কাউকে বলবেন না দয়া করে।

সমীরণের মনে হল, কথাগুলো বলার সময় বৃদ্ধের স্বর কেমন যেন কেঁপে গেল।

২

মাত্র দু-বছর আগে অবসরপ্রাপ্ত আনন্দমোহনকে দেখে এখন আর চেনাই যায় না। রিটায়ারমেন্টের সময় তাঁর আপিসের সহকর্মীরা বিদায়-সংবর্ধনা জানিয়েছিল। সভা করে, আনন্দমোহনকে মাঝখানে বসিয়ে একটা গ্রুপ ফটোও তোলা হয়েছিল। আনন্দমোহনের স্ত্রী অসিতা ছবিটা যত্ন করে বাঁধিয়ে শোবার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছেন। সেই ছবিতে আনন্দমোহন রীতিমত স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, ভাল দর্জির বানানো স্মার্ট ভঙ্গিতে বসে আছেন পায়ের ওপর পা তুলে। এখন আনন্দমোহনকে দেখে বিশ্বাসই হবে না ঐ একই মানুষ। চাকরি করার সময় আপিসে ওঁর প্রভূত দাপট ছিল। দামী কাপড়ের পোশাক আশাক পরতেন। যতটুকু পেরেছেন লোকের উপকার করেছেন। যেটুকু না হলে নয়, ডিসিপ্লিন রক্ষা করে গেছেন। বিদায়-সংবার্ধনার সময় অনেকের মুখে প্রশস্তি শুনে ওঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। বিশ্বাস করেছিলেন সকলেই ওঁকে ভালবাসে। ভুল ভেঙেছিল। অবসর নেবার বছরখানেক পরে একদিন পুরনো মায়ার টানে আপিসে গিয়েছিলেন আনন্দমোহন। পুরনো লিফটম্যান হাতে খৈনি ডলতে ডলতে শুধু হাসিমুখে বলেছিল, কি বুড়াবাবু ভাল আছেন তো! তবিয়ত ভাল? পুরনো বেয়ারা টুলে বসেই রইল, উঠল না। হাসল শুধু। দেখেছিলেন অন্য সকলেও খুব ব্যস্ত। অধস্তন যারা ওঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে সুযোগ খুঁজত, তারাও ওঁকে দেখে দু-চারটে কথা বলেই এমন ভাব করছিল যেন জলের গ্লাসে একটা নোংরা মাছি এসে বসেছে। সেদিনই আনন্দমোহন বুঝতে পেরেছিলেন এই এতগুলি লোকের পাশাপাশি একসঙ্গে তিরিশ বছর ধরে কাজ করে গিয়েও এই মানুষগুলির তিনি কেউই নন। একটি বিরাট যন্ত্রের ছোট একটা নাট-বল্টুর মত। ক্ষয়ে যাওয়া অকেজো হয়ে যাওয়া নাট কিংবা বল্টু বদল হলে কেউ আর পুরনোটার কথা মনে রাখে না।

স্ত্রীকে এসে সে-কথা বলা যায় না। শুধু কথাচ্ছলে একদিন বলেছিলেন, ছবিটা নামিয়ে রাখব ভাবছি, ওখানে একটা পেন্টিং টাঙাব।

অসিতার একটুও মনঃপূত হয়নি, ধমকের সুরে বলেছিলেন, কি যে বলো। আমি বেঁচে থাকতে এ ছবি কাউকে নামাতে দেব না।

দেয়ালের ছবি নামাতে না দিলেও মানুষটা যে একটু একটু করে নেমে যাচ্ছেন অসিতা চোখের সামনেই তা দেখতে পান।

আনন্দমোহন সম্পর্কে অসিতার খুব গর্ব ছিল। স্বামীর যুবক বয়সের সেই চেহারাটা বোধ হয় ওঁর চোখে লেগে আছে, এবং সেই সচ্ছল প্রতিপত্তি। এখন ভেঙে পড়া মানুষটার জন্যে সমবেদনা, আর পৃথিবী সম্পর্কে ক্ষোভ এবং অভিমান অসিতার একমাত্র সঞ্চয়। কারণ ওঁদের দুজনকেই অন্য আরও কয়েকটা অসন্তোষ ও অতৃপ্তি কুরে কুরে ক্ষয় করে দিচ্ছে।

অসিতাকে দেখলে বোঝা যায় একদা উনি খুবই সুন্দরী ছিলেন, এখন শুধু তার স্মৃতিচিহ্ন, সিঁথির চুল উঠে উঠে চওড়া হয়ে গেছে, কিন্তু ঘাড়ে লুটিয়ে যেটুকু আছে তাও কোঁকড়ানো! অল্প বয়সকেই যা মানায়।

বসার ঘরের শোফার রেক্সিন কভার ছিঁড়ে গেছে, সারানো হয়নি। ধুলো জমে, আজকাল কেউ ঝাড়পোঁছ করে না। সেই শোফাতেই বসেছিলেন আনন্দমোহন ; গা এলিয়ে নয়, সামনে ঝুঁকে পড়ে, মাথা নুইয়ে কি যেন ভাবছিলেন, কিংবা কষ্ট চাপছিলেন।

অসিতা নিঃশব্দ পায়ে এসে দাঁড়ালেন, তাকিয়ে দেখলেন। লোকটা বসে আছে। দু-বছর ধরে ঘন ঘন ডাইং ক্লিনিংয়ের ধোপ খেতে খেতে পরনের সেই পুরনো ট্রাউজার্স বিবর্ণ হয়ে গেছে। ইংলিশ কাফের সেই ফোল্ড ওল্টানো হাতার শার্টগুলোই এখনও ব্যবহার করে চলেছেন উনি। গলায় সাদা বকলসের মত দেখায়, কারণ ফল্স কলারগুলো ঘাম লেগে লেগে তেলচিটে ধরেছিল, অসিতা ফেলে দিয়েছেন।

অসিতা একটুক্ষণ অপেক্ষা করে শান্ত গলায় ডাকলেন, শুনছ!

আনন্দমোহন মাথা তুলে তাকাতেই অসিতা দেখলেন ওঁর চোখের কোনায় জল চিকচিক করছে।

ধীরে ধীরে অসিতাকে বললেন, অভিকে বরং একটা ফোন করে এসো, ওরা এসে একটু বোঝাবার চেষ্টা করুক।

ওঁর গলার স্বরে হতাশা। বুকের কষ্ট যেন হতাশা হয়ে বেরিয়ে আসছে।

ফোন ছিল। কিন্তু সেটা অফিসের ফোন। রিটায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে গেছে। ছেলে অভি জোর করে একটা দরখাস্ত করিয়েছিল, কিন্তু নতুন কানেকশন পাওয়া ভাগ্যের কথা। না পেয়ে একটু আর্থিক সুরাহা হয়েছে। তবে থাকলে ভালই হত। মাঝে মাঝে অভিকে কিংবা পুত্রবধূ চন্দনাকে রিং করে খবরাখবর নেওয়া যেত। তার চেয়ে বড় সুবিধে ছিল, ছোট্ট নাতনীর আধো আধো কথা শুনতে পেতেন।

এখন অবশ্য তার চেয়েও বড় দুঃখ ওঁদের বুকে চেপে বসে আছে।

সুইসাইড কথাটা শোনার পর থেকে ওঁরা দুজনেই কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

ফিরে আসার পর নিরূপা সেই যে মাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল, তার পর থেকে আনন্দমোহন তার মুখের দিকে তাকাতে পারেননি।

উঠে দাঁড়ালেন আনন্দমোহন, হ্যাঙারে ঝোলানো শার্টের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে, তা থেকে খুচরো পয়সা বের করলেন, তারপর নিজের মনেই যেন বললেন, যাই অভিকে একটা ফোন করে আসি।

কাছেই একটা ওষুধের দোকান আছে, সেখান থেকে ফোন করতে দেয়।

ছেলের ওপর যত অভিমানই থাক, শেষ অবধি বিপদে আপদে তার কথাই মনে পড়ে। তাছাড়া সে বেচারাই বা কি করবে। সে ব্যস্ত মানুষ, একটা মাল্টি ন্যাশানালে বড় চাকরি, যোগ্যতার জন্যেই পেয়েছে, থিয়েটার রোডে কোম্পানির বিশাল ফ্ল্যাট। আর ওদের একটু অন্যরকমভাবে থাকতে হয়। নিজের চেষ্টায় অভি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পাশ করেছিল। ছেলের জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা গর্বও আছে ওঁর। কয়েকবার গিয়ে দেখেছেন, সাজানো গোছানো বিশাল ফ্ল্যাট, ভাল পোশাক পরিচ্ছদ, তবু খুব সচ্ছল মনে হয়নি ওঁর। চায়ের সঙ্গে চানাচুর খাচ্ছিল। শখ করেও হতে পারে অবশ্য। উনি তো শুধু কল্পনায় ওদের দেখতে পান, ওদের সম্পর্কে ওঁর ধারণাটা স্পষ্ট নয়।

বাইরে বেরিয়েই সেই ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল আনন্দমোহনের। খুব অন্যায় হয়ে গেছে। আসলে, হঠাৎ নিরূপাকে দেখে, তারপর সুইসাইড কথাটা শুনেই ওঁর সব বুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। নিরূপাকে উনি বাঁচিয়েছেন, গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে গেছেন, অথচ তাঁকে বসতেও বলেননি। ভাল করে ঘটনাটা জানতেও পারেননি।

অভিকে ফোন করে ফিরে এলেন। ছোট্ট নাতনী পিঙ্কির সঙ্গে কথা বলার আজ আর একটুও ইচ্ছে হয়নি। ওকে কেন যে মাঝে মাঝে আনে না। আমাদের ওপর পিঙ্কির মায়া

পড়ে যাবে বলে। নাকি আমাদের সংস্পর্শে এলে মানুষ হবে না ?

—অভি ছিল না, চন্দনা বললে কাল আসবে অফিস থেকে ফিরে।

ফোন করে ফিরে এসে অসিতাকে বললেন আনন্দমোহন।

একটু থেমে আবার বললেন, ওসব কথা কিছু অবশ্য বলিনি।

আনন্দমোহনের কথায় কোন সাড়া দিলেন না অসিতা। উনি যেন পাথর হয়ে গেছেন।

আনন্দমোহন কি করবেন কিছুই বুঝতে পারলেন না। ধীরে ধীরে পাশের ঘরে ঢুকলেন!

নিরূপা চুপচাপ শুয়ে ছিল। আনন্দমোহন ওর ঘরে ঢুকে বেতের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন।

—তুই একটু শক্ত হবার চেষ্টা কর নিরু। এসব পাগলামি আর কোনদিন করিস না।

নিরূপার গলার স্বর কেঁপে কেঁপে গেল। শুয়ে শুয়েই সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ও কান্না কাঁপা গলায় বললে, আমি সুইসাইড করতে যাইনি বাবা।

একটু থেমে বললে, হঠাৎ...

ফুঁপিয়ে উঠল ও, কথা শেষ করতে পারল না।

অসিতা এসে দাঁড়িয়েছেন তখন। বললেন, থাক থাক, ওসব পরে শুনলেও হবে। ওকে একটু জিরিয়ে নিতে দাও।

আনন্দমোহন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে উঠে এলেন।

মনে মনে ভাবলেন, অভির বেলায় সমস্ত দুঃখ তো আমারই, আমাদেরই। আমার আর অসিতার। অবশ্য নিরূপাও তখন খুব কষ্ট পেত। কিন্তু সব দুঃখ আমাদের দিয়ে অভি তো সুখী হয়েছে। সেও আমাদের সুখ। তেমনই নিরূপার সব দুঃখ নিয়েও যদি তাকে সুখী করা যেত।

আনন্দমোহনের একটা ইগো আছে। ছেলের রোজগারে ভাগ বসাতে চাননি। এমনকি তার দেয়া জামাকাপড়ও পরেননি। ফলে অভি আজকাল কিছু দেওয়াই বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু মাকে শাড়ি দেয় পুজোর সময়, অসিতা অত দামী শাড়ি পরতে লজ্জা পান। সেগুলো আলমারিতেই জমা থাকে। তবে লুকিয়ে মাকে কিছু টাকাও দেয় কিনা এমন একটা সন্দেহ আনন্দমোহনের আছে। টাকা পয়সার অভিমান ছেলের বিরুদ্ধে নয়, অভিমান ওঁর পুরনো চাকরিটার বিরুদ্ধে। সব চাকরির বিরুদ্ধে। নিজে তো গভর্নমেন্টে চাকরি করতেন, ক্লাস ওয়ান অফিসার, কি সম্মান। ফসফস করে সার্টিফিকেট দিতে পারতেন। আর এখন ? শুধুই একটা পেনশন। এরা গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেয়। সুযোগ পেলেই অভিকে সে-কথা বারবার মনে পড়িয়ে দিয়েছেন। অভিরা এখন সবাই তো স্ট্যাটাস পাগল। না হয়ে বোধ হয় উপায়ও থাকে না। অথচ পেনশনই থাক প্রভিডেন্ট ফান্ডই থাক, রিটায়ারমেন্টের পর নেমে আসতে হবেই। আর টাকা জমিয়েই বা কি হবে, ইনফ্লেশনের বন্যায় সব ধুয়ে মুছে যাবে, যেমন ধুয়ে মুছে যাচ্ছে, তাঁর নিজের সঞ্চিত অর্থ। মনের আক্ষেপে অভিকে একদিন বলেছিলেন, তোরা উন্নতির জন্যে পাগল হোস কিন্তু বি কে রায়, আমাদের ব্রজকিশোর, ডি এম ছিল নদীয়ার, পরে সেক্রেটারি, কলকাতায় একটা বাড়িও করেছিল, এখন ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে বাজারে যায়। আনন্দমোহন এই ছোট্ট বাড়িটুকুই শুধু করতে পেরেছেন, তখন সস্তার বাজার ছিল বলেই। তাও অর্ধেক পেনশন বেচে দিয়ে।

তবু আনন্দমোহন সুখীই ছিলেন!

সত্যি, সংসার জিনিসটা বড়ো বিচিত্র। চতুর্দিক থেকে সব সুখ শান্তি উপচে পড়ছে, হঠাৎ একটা কিছু ঘটে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে সব মানুষগুলো ধসে পড়বে। একজনের দুঃখ সকলের দুঃখ হয়ে যাবে। অথচ এই সংসারগুলো নিয়েই তো সমাজ। সমাজ এখন অফিসের মত। পাশাপাশি, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায় না। সবাই পৃথক পৃথক মানুষ,

কেউ কারও জন্যে ভাবে না। এও তো এক ধরনের সুইসাইড।

আগে কিন্তু এমন ছিল না।

কোনটা ভাল কোনটা খারাপ, আনন্দমোহন ঠিক করতে পারেন না।

আনন্দমোহন বসে থাকতে পারছেন না। থেকে থেকেই চঞ্চল হয়ে উঠছেন। কিছু একটা যেন করা উচিত, অথচ কি করবেন খুঁজে পাচ্ছেন না।

—শোনো।

অসিতা গ্লাসে করে গরম দুধ নিয়ে যাচ্ছিলেন। হয়তো নিরূপাকে খাওয়াতে।

অসিতা এগিয়ে আসতেই ফিসফিস করে বললেন, অবনীর কাছে আমি একবার যাব?

অসিতা এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন, তারপর নিরূপা শুনতে না পায় এমন চাপা গলায় বললেন, এখন মেয়েটা তো বাঁচুক। কাল ভাবা যাবে।

যেতে যেতে দীর্ঘশ্বাসের মত স্বরে বললেন, গিয়ে কিইবা হবে।

সে-কথা তো আনন্দমোহন নিজেই জানেন। কিছুই করার নেই, কিছুই করার নেই, এ এক অসহ্য অবস্থা। তার ওপর এখন নতুন একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে নিরূপা। ওকে নিয়েও ভয় কখন কি করে বসে।

সারারাত ঘুমোতে পারলেন না আনন্দমোহন। অসিতা পাশে থাকলে তবু কথা বলে হাল্কা হতে পারতেন ' কিন্তু অসিতা নিরূপার ঘরে, নিরূপাব কাছে শুয়েছে, হয়তো ওকে একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যে। কিংবা, ওর মনেও আতঙ্ক নিরূপা কখন কি করে বসে। তাই চোখে চোখে রাখার জন্যে হয়তো অসিতাও ঘুমোবে না। নিরূপার চোখের ঘুম তো অনেক আগেই চলে গেছে।

এতদিন নিরূপার জন্য দুঃখ ছিল, কষ্ট ছিল। এখন তার সঙ্গে এসে জড়ো হয়েছে ভয়। সেবার চলে এসে মাসের পর মাস মেয়েটা ঘুমোতে পারেনি, শরীর ভেঙে পডছিল, শরীর ভেঙে পড়বে এই ভয়ে ডাক্তার দেখিয়েছিলেন। কিছুদিন ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল।

খেয়েছিল কিনা সেটাই তো ভাল করে জানেন না। আর আজকাল তো পয়সা দিলেই ঘুমের ওষুধ কিনতে পাওয়া যায়। নিরূপা জমিয়ে জমিয়ে রাখেনি তো? বাতি নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকার বিছানায় ছটফট করতে করতে আনন্দমোহন ভাবলেন, আজ রাতটা পার হোক, কাল অসিতাকে বলতে হবে ভাল করে খুঁজে দেখতে।

—সুইসাইড, সুইসাইড কবতে যাচ্ছিলেন উনি। সেই অচেনা ভদ্রলোক বলে গেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের পরিবারের কাছে সমস্ত পৃথিবীটাই যেন আতঙ্ক হয়ে উঠেছে।

বসার ঘরে বুকে একটা পাথর নিয়ে যখন গুম হয়ে বসেছিলেন, হঠাৎ সিলিংয়ের দিকে চোখ গিয়েছিল। আর পাখা ঝোলানো বাড়তি হুকটা চোখে পড়তেই ভয় পেয়েছিলেন। সামান্য একটা হুক এখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। ওটার কিছু একটা ব্যবস্থা কবতে হবে।

সন্ধের সময় অভি এল। অভি আর চন্দনা। গাডির হর্ন শুনেই বুঝতে পেরেছিলেন।

আনন্দমোহন তো মোটামুটি ভাল চাকরিই করতেন, কিন্তু গাডি কেনেননি। ট্যাকসি চড়াই তখন বিলাসিতা মনে হত। ট্যাকসি মানেই হাওড়া, কোথাও বাইরে গেলে বা ফেরার সময়, সঙ্গে লটবহর থাকত বলে ট্যাকসি করতেন। আপিসে যাওয়া-আসা প্রথমে ছিল ট্রামে, পরে অফিসের গাড়িতে। কিন্তু অন্য কোথাও যেতে হলেই সেই ট্রাম-বাস। তখন মিনি ছিল না। দিনে দিনে চেহারাটা কত বদলে যাচ্ছে।

অভি আর চন্দনা হাসতে হাসতে বাড়ি ঢুকল। ওরা তো কিছুই জানে না, কি অপেক্ষা করছে এখানে। ধপধপে সাদা পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরেছে অভি, সাদা চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবি। মাথায় আনন্দমোহনকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে, অবশ্য সব দিকেই।

ওপরের শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে ওর হাঁটার মধ্যে এমন একটা দ্রুত ভঙ্গি আছে, খুবই চটপটে দেখায়, আর মনে হয় কাজ করার জন্যে যেন ব্যাকুল হয়ে আছে। হাতে পেলেই দু-মিনিটে সেটার সমাধান করে দেবে। ওর নিশ্চয় আপিসে খুব সুনাম।

যত অভিমানই থাক, অভি সম্পর্কে ওঁর একটা গর্বও আছে। আর শেষ পর্যন্ত একটা ভরসা। এই যে অভি এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে বুক থেকে অনেকখানি ভাব নেমে গেছে।

পিঙ্কিকে আনেনি, তাকে তার মাসী নিয়ে গেছে। ওরা ফেরার সময় তাকে তুলে নেবে।

অভি আর চন্দনা বেশ হাসি হাসি মুখে ঢুকছিল। কিন্তু বাবা এবং মার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি থমকে গেল। ভুরু কুঁচকে একবার বাবার মুখের দিকে একবার মার মুখের দিকে তাকাল অভি। বুঝতে পারল কিছু একটা ঘটে গেছে, সাংঘাতিক কিছু।

অসিতা বললেন, আয়।

ছোট্ট একটি কথা, কিন্তু উচ্চারণের মধ্যেই যেন একটা বোবা কান্না আছে।

নিঃশব্দে, একটাও কথা না বলে, পায়ের শব্দ না করে অভি আর চন্দনা মার পিছনে পিছনে শোবাব ঘরে ঢুকল।

চন্দনা বিছানার কোণ ঘেঁসে বসল। মোড়া টেনে নিয়ে অভি বসল। পা দুটো অনেকখানি সামনে এগিয়ে দিয়ে, কারণ ওর চেহারাটা বেশ লম্বা। অনেকে ভুল বোঝে, ওটা অহমিকা নয়।

অসিতা ফিসফিস করে বললেন, নিরূপাকে নিযে কি করি বল তো, আমি যে আব ভাবতে পারছি না। কেমন কান্নার মত শোনাল।

আনন্দমোহন ধীরে ধীরে বললেন, নিরূপা কাল সুইসাইড করতে গিয়েছিল।

—সুইসাইড ? আত্মহত্যা ?

অভি চমকে উঠল। ও এমনই অবাক হয়ে গিয়েছিল যে সুইসাইড শব্দটা যেন যথেষ্ট নয়। ওব মুখ দিয়েও আত্মহত্যা শব্দটা বেরিয়ে পড়ল।

—ও যদি এসব কাণ্ড করে আমাদেব তো সোশ্যাল প্রেসটিজ বলে কিছু থাকবে না, এমনিতেই তো ব্যাপারটা লুকিযে লুকিয়ে বাখতে হয়। কি যে ঝামেলা বাধায। অভিকে রীতিমত বিভ্রান্ত দেখাল।

অসিতা সহ্য করলেন, আনন্দমোহন সহ্য করলেন। মনে মনে বললেন, তোবা কিচ্ছু বদলাসনি, কিচ্ছু বদলাসনি।

ওর মৃত্যু আমাদের কাছে আরও ভয়ঙ্কর আরও দুঃখেব। আমরা সে কথাই ভাবছি, আমরা ওকে বাঁচাতে চাই, সুখী করতে চাই। ব্যাপারটাব জন্যে আমবাও লজ্জায় মরে আছি, লুকোবার চেষ্টা করি। কিন্তু ওর জন্যে কষ্টও হয়। তোর কাছে কি এসব কিছুই নয়, শুধু সোশ্যাল প্রেসটিজ।

মনে মনে অভিকে ক্ষমা করে দিলেন আনন্দমোহন।

অসিতা ভেবেছিলেন অভির ওপব নির্ভব করবেন, কিন্তু ওঁর কথায় একটা ধাক্কা খেলেন।

অসিতা থমথমে মুখে বললেন, অবনীর সঙ্গে কি হয়েছে আমবা তো কিছুই জানি না। আনন্দমোহন ধীরে ধীরে বললেন, কাল রাত্রে কখন একা চলে গিয়েছে। গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল, এক ভদ্রলোক এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

—আশ্চর্য। অভি বলে উঠল।

চন্দনা শান্ত গলায় বললে, ওকে কিন্তু একা বেরোতে দেওয়া উচিত নয় মা। বোধহয কথাটা ঘোরাতে চাইল অভি ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছে দেখে।

আনন্দমোহন ধীরে ধীরে বললেন, ও তো অবনীর ওখানেই ছিল। ভেবেছিলাম, এবার

ভালই আছে।

আর অসিতা কেমন হতাশ গলায় বললেন, ওর জন্যে আমার যে কি কষ্ট ! মা হয়েও এক একসময় ভাবি, মরেই যাক, ও অন্তত শান্তি পাবে।

যে চোখের জল গতকাল থেকে আটকে আটকে রেখেছেন, আর বাধ মানাতে পারলেন না, ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

আনন্দমোহন বললেন, চুপ করো চুপ করো, নিরূপা শুনতে পাবে।

অসিতা আঁচলে চোখ মুছলেন।

অভি এতক্ষণ চুপ করে ছিল। হয়তো কিছু ভাবছিল। আসলে ও খুব বিভ্রান্ত বোধ করছে। ধীরে ধীরে বললে, ইটস্ আ বিট অফ লাক যে পুলিসে রিপোর্ট করেননি ভদ্রলোক। তা হলে আবার সেই মামলা, উকিল লাগাও, জেলও হয়ে যেতে পারত নিরূপার।

—আঃ থাম্। অসিতা বিরক্ত হলেন, বললেন, কি হতে পাবত ভেবে লাভ নেই। কি করা যায় তাই বল।

অভি দুম করে বলে বসল, কি করা যায় সে তো আমি অনেক আগেই বলেছি ! ওকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি করাও। ডিভোর্স। এছাড়া কোন পথ নেই। ডিভোর্স এখন আর কোন অসম্মানের ব্যাপার নয়, অন্তত এখন যা রয়েছে তার চেয়ে অনেক ভাল।

অসিতা দুঃখের হাসি হাসলেন, তুই শুধু সম্মান অসম্মানের কথাই ভাবছিস, মেয়েটার কথা ভাবছিস না। সারাটা জীবন ওব সামনে পড়ে রয়েছে, কি করে কাটাবে বল তো।

—কেন, চাকরি করবে। অভি বলে বসল। নাটকীয় ভঙ্গিতে বাঁ হাতখানা এগিয়ে দিয়ে বললে, আমি তো বলেছি কোথাও একটা ফিকস আপ করে দেব, যদি করতে চায় !

অসিতা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ! কি সহজ সমাধান ! মেয়ে হয়ে জন্মালে বুঝতিস।

এ যে কত বড় অপমান, কত লজ্জা, কতখানি দুঃখ কেউ বোঝে না। ও যে কিসের জ্বালায় ভিতরে ভিতরে জ্বলছে, তোরা বুঝবি না, ডিভোর্স করলেই কি ওর জ্বালা নিববে।

শব্দ শুনে আনন্দমোহন কান সজাগ করেছিলেন।

চন্দনাও বললে, কে যেন কড়া নাড়ছে।

হ্যাঁ, ঠিকই তো, বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। কলিং বেলটা খারাপ হয়ে আছে, মিস্ত্রি ডাকা হয়নি।

আনন্দমোহন নিজেই উঠে গেলেন। কাজের লোকটা নেই, হপ্তাখানেক আগে দেশে গেছে। ভাগ্যিস নেই, থাকলে তাব কাছ থেকেও লুকোতে হত। একটা ঠিকে ঝি শুধু সকাল-বিকেল আসে।

এই তো সেদিনও নিজেদেব মধ্যে বলাবলি করেছেন, নিরূপা হয়তো এখন ভালই আছে।

অবনীর কাছে আছে, স্বামীর কাছে। সেই সেবাব রেখে আসার পর থেকে কোন-রকমে নিশ্চয় মানিয়ে চলছে, সে-কথাই ভাবতেন।

তাই হঠাৎ কাল থমথমে মুখে নিরূপাকে দেখে চমকে উঠেছিলেন। ভয় পেয়েছিলেন।

নিজে উঠে গিয়ে দরজা খুললেন আনন্দমোহন, আর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোককে চিনতে পেরে খুশি হয়ে উঠলেন।

—আসুন আসুন, কাল আমার মাথার ঠিক ছিল না।

বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন ভদ্রলোককে। উনি গতকাল এসে পৌঁছে দিয়ে গেছেন নিরূপাকে, ওঁকে একটা শুকনো ধন্যবাদও দেওয়া হয়নি। অবশ্য একবার ভেবেছেন ভালই হয়েছে। বাইরের একটা উটকো লোক ওঁর অন্দরের খবর জেনে গেছে, ভাবতেও খারাপ

লাগে। এখন আবার মনে হল লোকটা না এলেই যেন ভাল ছিল। যেমন অচেনা অপরিচিত ছিল, তেমনি যদি থেকেই যেত ক্ষতি ছিল না।

মনে মনে ভাবলেন লোকটা আবার এল কেন ? কি এক অস্বস্তিতে কি করবেন না করবেন ঠিক করতে পারলেন না।

শুধু বললেন, আসুন আসুন।

কি বলতে চায় লোকটা, কেন এসেছে ! জিগ্যেস করতেও ভয়। পুলিসে খবরটবর দেয়নি তো। অভি কি-সব বলছিল তখন, অ্যাটেমটেড সুইসাইড, থানা পুলিশ মামলা,জেল।

আতঙ্কে ভেতরটা কেঁপে উঠল। তবু বললেন, কাল আপনি আমাদের কি উপকার যে করেছেন।

এটা নেহাতই সৌজন্য, ভিতরে ভিতরে লোকটির আবার আসা পছন্দ করছিলেন না। একবার ভাবলেন, অভিকেই ডেকে দিই, ও কথা বলুক। কিন্তু অভির তো কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, হয়তো সব কথাই বলে ফেলবে।

—আপনার মেয়ে তো ? মানে কাল যাকে নিয়ে এলাম আপনারই মেয়ে তো ?

আনন্দমোহন মাথা নাড়লেন।

সঙ্গে সঙ্গে সমীরণ পকেট থেকে একটা কাগজেব মোড়ক বের করে এগিয়ে দিল। বললে, দেখুন তো এটা ওঁরই কিনা।

একটা কানের দুল। সোনার, মুক্তো বসানো।

কানের দুলটা হাতে নিয়ে একবাব দুলটার দিকে তাকালেন, একবার সমীরণের মুখের দিকে।

সমীরণ বললে, গাড়িতে পড়ে ছিল।

হ্যাঁ এটা তো নিরূপারই। অনেকবার ওর কানে দেখেছেন আনন্দমোহন।

দুলটা নিয়ে উঠে পড়লেন, এসে দেখালেন অসিতাকে।—নিরূপার কানেব দুল, ওঁর গাড়িতে পড়ে গিয়েছিল।

অভিব দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই একবাব যা অভি। উনি এসেছেন, কালকের ভদ্রলোক।

আর দুলটা হাতে নিয়ে অসিতা নিরূপার ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, সোনা হারিয়ে ফেরত পাওয়া খুব শুভ।

আসলে এই ছোট্ট একটা জিনিস ফিরে পাওয়ার মধ্যে অসিতা যেন একটা বিরাট আশা খুঁজে পেতে চাইলেন।

৩

সমীরণের দোতলার ফ্ল্যাটে চমৎকার বারান্দা আছে চাব বাই দশ। বাড়িটা রাস্তার ওপর, তাই বারান্দা থেকে রাস্তার দু-প্রান্তের অনেকখানি অবধি দেখতে পাওয়া যায়।

সমীরণ এখানেই বসে সকালের চা খায়। ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধুবান্ধব এলেও এখানেই এসে বসে। যখন নিজেকে একা লাগে, এখানেই দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখে, রাস্তার লোকজন দেখে। চেনা অচেনা কত রকমের মানুষ যায় আসে, কত রকম অঙ্গভঙ্গি করতে করতে চলে, এখান থেকে নির্বাক ছবির মত দেখা যায়। কখনও কখনও ঠিক বাড়ির নীচে দিয়ে পার-হওয়া ছেলে মেয়েদের হাসি আর কথার টুকরোও ভেসে আসে। বেশ মজা লাগে। আবার যখন কোথাও ঝামেলা বেধে যায়, মারামারি বা ইঁট ছোঁড়াছুঁড়ি, তখন এখানে বসেই দৃশ্যটা উপভোগ করে এবং কাউকে উঁকি মারা জটলা থেকে ফিরতে দেখলে,ও সতীশ কি

ব্যাপার ? কি হয়েছিল কি ? যতজনকে জিগ্যেস করে ততরকম উত্তর। অথচ সকলেই প্রত্যক্ষদর্শী। সুতরাং তার থেকে প্রকৃত ঘটনাটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে করতে ওর দিব্যি সময় কেটে যায়।

ঘুম থেকে উঠে চোখমুখ ধুয়ে সমীরণ এই বারান্দাতেই এসে বসেছিল। একটু পরে হিন্দুস্থানী হকার পাকিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা খবরের কাগজটা চলন্ত সাইকেল থেকেই ছুঁড়ে দিয়ে গেল, আর সেটা ঠিক ওর সামনেই এসে পড়ল। এটা তো কিছুই নয়, সমীরণ একদিন দেখেছে, চলন্ত সাইকেল থেকে চারতলার ব্যালকনিতে কাগজ ছুঁড়ে দিতে। সেকালে জন্মালে এরা নির্ঘাত অর্জুনের মত তীরন্দাজ হত, একালে অন্তত অর্জুন পুরস্কার পেতে পারে।

খবরের কাগজটা খুলে ও সবে চোখ বোলাতে শুরু করেছে। চিকো, ওর ছোটবোন এসে আরেকটা গা এলানো চেয়ারে বসল। চিকো ওর থেকে সামান্য ছোট, পঁয়ত্রিশ পার হওযার পর থেকেই ওর শরীরে মোটা হওয়ার লক্ষণগুলো দেখা দিয়েছে। রঙ সমীরণের চেয়েও শ্যামলা। স্বামীকে ব্যবসার কাজে মাঝে মাঝেই দিল্লি-টিল্লি যেতে হয়, আর তখন চিকো দাদার কাছে অর্থাৎ মার কাছে এসে থাকে। হৃষিকেশের জনাকয়েক লোক নিয়ে ছোট কারখানা, মানে পেরিমিটার বানায়, এখানে ওখানে সাপ্লাই দেয়। তাই মাঝে মাঝেই বাইরে যায় সে।

ওরা ভাইবোনে বসে চা খাচ্ছে, নীচে রাস্তায় কে ডাকল, আর চোখের সামনে থেকে কাগজ সরিয়ে সমীরণ টিপয়ের ওপর থেকে গাড়ির চাবিটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, টুপ করে সেটা গাড়ি-ধোয়ার লোকটার হাতে ফেলে দিল। লোকটা লুফে নিল।

গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করা শিখিযে দিয়েছে ও, লোকটাই বের করে ধোয় মোছে, ঢুকিয়ে রাখে, জল মবিল চেক করে। মাসে পনেরো টাকা।

—দিদি, ও দিদি !

ওরা দুজনে চা খেতে খেতে গল্প কবছিল, হঠাৎ ডাক শুনে চিকো গাড়িটাব দিকে তাকাল, উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দার রেলিং থেকে ঝুঁকে বললে, কি বলছো বীরজু।

বীরজু সারা মুখ খুশিতে হাসিয়ে বিহারী ঢংয়ে বললে, আপনের কানের দুল পড়ে আছে।

চিকো অবাক হয়ে ওর দু-কানের লতিতে হাত দিয়ে দেখল। বললে, কই দেখি নিয়ে এস।

সমীরণকে বললে, দুল কোত্থেকে এল রে দাদা, আমার তো নয়।

গতকাল সমীরণ অবশ্য চিকোকে একটা দোকানে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

কি ফ্যাসাদ।

ফিরতে রাত হয়েছিল সমীরণের, মার মুখে একটু উষ্মা ছিল, তাই তখন কিছু বলেনি। ভেবেছিল পরে সমস্ত ঘটনাটা বলবে ওদের। আসলে ঐ ঘটনাটা ওকে এমন ভাবে নাড়া দিয়েছে, বলতেও ইচ্ছে করেনি।

অনেক রাত অবধি সমীরণের ঘুম আসেনি। ওর জীবনে এমন বিচিত্র ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। বারবার দৃশ্যগুলো মনে পড়েছে, মেয়েটির মুখ, কি হতে পাবত সেই ভাবনা, সত্যি সত্যি যদি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। 'মা' বলে আর্তনাদ করে ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠা। পাশে বসা ছেলে দুটির পালিয়ে যাওয়া মনে পড়তে হেসেও ফেলেছে একবার। পুলিশকে লোকের কি ভয়।

ঘুম থেকে উঠেও গতকালের ঘটনাব মধ্যে ও আচ্ছন্ন হয়েই ছিল। যতবার মেয়েটির মুখ

মনে পড়েছে, মায়া হয়েছে মেয়েটির জন্যে। তার দুঃখ এবং কষ্ট সমীরণও যেন অনুভব করেছে। সঙ্গে সঙ্গে অদম্য কৌতূহল। কি হয়েছিল মেয়েটির, কি হতে পারে। এমন কি ঘটতে পারে যার জন্যে মানুষ স্বেচ্ছায় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

এমন অনেক আত্মহত্যার খবর ও কাগজে পড়েছে, নানাজনের কাছে শুনেছে। কিন্তু চোখের সামনে ঘটতে যাচ্ছিল বলেই ওর বুকের মধ্যে আলোড়ন উঠছে। মানুষটাকে নিজের চোখে দেখেছে বলে।

সমীরণ হাত বাড়িয়ে বীরজুর কাছ থেকে দুলটা নিল। বললে, পিছনের সিটে পড়েছিল, তাই না?

—হ্যাঁ বাবু।

বীরজু চলে যেতেই চিকো হাসতে হাসতে বললে, তুই উচ্ছন্নে গেছিস।

তারপর হাত বাড়িয়ে বললে, দেখি দুলটা।

ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠল, বেশ দামী রে দাদা। ডিজাইনটাও দ্যাখ কি সুন্দর। দাঁড়া ও ফিরে আসুক, ঠিক এই ডিজাইনের আমি একটা করাব।

সমীরণ চিকোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসল। বয়স হয়েছে, কিন্তু ওর স্বভাব একটুও বদলায়নি। সোনার আর মুক্তোর আর পাথরের দামেই সবকিছু দামী এদের কাছে। হয়তো সুখী বলেই। আসলে জীবনের ডিজাইন সুন্দর হলে তবেই যে আর সব কিছুর দাম, সে-কথাটা সমীরণ যেন সদ্য সদ্য জেনেছে। গতকাল সন্ধ্যায় একটা দুঃখী মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।

চিকো কৌতুকের হাসি হেসে এবার জিগ্যেস করল, মেয়েটা কে রে? নিয়ে আয় না একদিন, দেখি।

সেই কলেজে পড়ার দিন থেকে এমন কথা সমীরণকে অনেকবার শুনতে হয়েছে। কেউ এসে বলেছে রাস্তার মোড়ে দেখলাম সমীরণ একটা মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে। ব্যস, চিকো অনেক কিছু কল্পনা করে নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। পুরনো বইয়ের দোকান থেকে ডিটেকটিভ বই কিনে এনেছে, তার পাতায় একটা মেয়ের নাম দেখে চিকো বলে বসেছে, হুঁ, বুঝেছি। সমীরণকে বলতে হয়েছে, সইটার নীচে তারিখটা দ্যাখ, সে এখন বুড়ি হয়ে গেছে।

প্রেম বিয়ে কিংবা সংসার নিয়ে যে-বয়সে ভাবা যায় ওর ঠিক সেই বয়সেই বাবা মারা যান। চিকোর বিয়ের ভাবনাই তখন বড় ছিল সমীরণের কাছে! তারপর দেখতে দেখতে কখন বয়স পার হয়ে গেছে, মনের মধ্যে ইচ্ছে থাকলেও মা যখনই বলেছে, হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। এখন নিজেই ওসব কথা ভাবে না। কিন্তু চিকো এখনও স্বপ্ন দেখে দাদাটা বিয়ে করে সংসারী হবে, ওর একটা আড্ডা দেবার সঙ্গী পাবে, একসঙ্গে দোকানে যেতে পারবে।

দুলটা ফিরিয়ে নিল সমীরণ, সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। একটা দুঃখী মুখ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। ক্ষণিকের জন্যে আলো-অন্ধকার মাখানো সেই জেটিতে চলে গেল। ঐ তো রেলিং ধরে অন্ধকারের দিকে, ফেঁপে ফেঁপে ওঠা জোয়ারের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। ঐ তো পিচে-মোড়া স্ট্র্যান্ড ধরে সন্দেহজনক ভাবে একা-একা হাঁটছে। ঐ তো অন্ধকারে বেঞ্চের কোনা ঘেঁসে একা বসে আছে। পরিবেশ বদল হলে মানুষের রঙও কত বদলে যায়।

সমীরণের মনের মধ্যে একটা কৌতূহল কিন্তু রয়েই গেছে। একটা রহস্য। কেন, কেন, কি এমন ঘটতে পারে তার জীবনে, যার জন্যে সে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিল!

সেই রহস্যময় সুন্দর মুখখানা ওকে টানছে, অবিরত টানছে।

—কি রে বলবি না? চিকোর মুখ হাসি হাসি।

সমীরণ তার মুখের দিকে তাকাল। —বলব, সব বলব।

তার আগে তো ওকেই সব জানতে হবে। ও যে নিজেই কিছু জানে না।

দুলটা ফেরত দিতে গিয়ে অভিকে দেখে, তার সঙ্গে আলাপ হয়ে সমীরণ মুগ্ধ হয়ে গেল। এমন সজ্জন মিশুকে মানুষ ও কমই দেখেছে। তার হাঁটাচলা হাবভাব কথাবার্তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা দেখে সমীরণ বুঝতে পেরেছে ভদ্রলোক অন্য জগতের মানুষ। দেখেই বুঝেছে, অনেক বড় চাকরি করেন। অভির স্ত্রী চন্দনাও এসেছে, দুহাত জোড় করে নমস্কার করেছে। কেমন স্বপ্নের মত মনে হয়েছে সমীরণের। নমস্কার করার ভঙ্গিটা কি সুন্দর।

শুধু আনন্দমোহনের সঙ্গে, অসিতার সঙ্গে ওদের খুব একটা মেলাতে পারেনি। তবু আনন্দমোহনের পুরনো শার্টপ্যান্টে কোথায় একটা চাপা আভিজাত্য। মনে মনে অবশ্য ভেবেছে, আমার হেডমাস্টার বাবা বেঁচে থাকলে তার সঙ্গেও তো নিজেকে মেলাতে পারতাম না। বিধবা মা দিবারাত্র ঠাকুরঘরে বসে থাকে। বন্ধুদের সঙ্গে যখন কোন ভাল রেস্তরাঁয় বসি তখন সেই ছবিটা সকলের চোখের আড়ালে থাকে। সেজন্য গোটা মানুষটাকে আমরা কোন সময়েই দেখতে পাই না।

লজ্জায় সঙ্কোচে আনন্দমোহন চোখোচোখি তাকাতে পারছিলেন না। যেন অপরাধ তাঁর নিজের। কিংবা অসুখী মেয়ের জন্যে দুঃখ কষ্ট পাওয়া এই সমাজে খুব বড় অপরাধ।

সমীরণের অস্বস্তি লাগছিল।

ও আসার পর থেকে বাড়িটা একেবারে শোকসভার মত থমথমে হয়ে আছে, কিংবা বাড়িটা বোধহয় এইরকমই।

—চলে যাবেন না যেন, বসুন চা খেয়ে যাবেন। কাল আমার একেবারে মাথার ঠিক ছিল না।

আনন্দমোহন দু-একটা কথা বলে পাশের ঘরে গিয়েছিলেন।

আর একটু পরেই অভি এসে ঘরে ঢুকল। অভ্যাসবশে হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে দিতে গিয়ে সমীরণকে নমস্কার করতে দেখে নিজে নমস্কার করল। ওর পিছনে পিছনে চন্দনা ঢুকল, স্মিত হেসে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বসল পায়ের ওপর পা তুলে। মেয়েদের এভাবে বসতে ও বড়ো একটা দেখে না।

চন্দনাই জিগ্যেস করল, কি হয়েছিল বলুন তো। কণ্ঠস্বরে বেশ উদ্বেগ এনেই বলল।

সমীরণ সংক্ষেপে ঘটনাটি বলছিল।—হঠাৎ জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন—

অভি মন্তব্য করে উঠল, এ সর্ট অব লুনেসি। এ ছাড়া আর কি বলব।

সমীরণ ধীরে ধীরে বললে, বাইরের থেকে বিচার করলে তাই মনে হয়। কিন্তু যে সুইসাইড করতে চায় তার মনের মধ্যে কি হয় তা তো আমরা জানি না।

আসলে গতকাল থেকেই নিরূপার ওপর ওর কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে।

চন্দনা ধীরে ধীরে বললে, ওর বিয়েটা, জানেন, মানে বিয়ের পর থেকেই…

অভি সংক্ষেপ করে দিল, দ্য ম্যারেজ ডিড্নট ক্লিক। তারপর হাতে রামকৃষ্ণ দেবের মত মুদ্রা এনে বললে, আমি তো বলি, যথেষ্ট ওয়েট করেছিস, এখন ডিভোর্স ছাড়া কোন সল্যুশন নেই।

এই সব কথা এখানে আলোচনা করার অসুবিধে আছে, তাই চন্দনা হেসে বললে, একদিন আসুন না আমাদের ওখানে।

—কোথায় ? সমীরণ চমকে উঠে প্রশ্ন করল। ও ব্যাপারটা তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি।

আনন্দমোহন বলেছিলেন, ছেলেকে ডেকে দিচ্ছি বসুন। আর অভি এসে চন্দনার পরিচয়

দিয়েছিল, আমার স্ত্রী।

অভি ততক্ষণে পকেট থেকে পার্স বের করে পার্সের একটা খাঁজ থেকে কার্ড বের করে দিল সমীরণকে। বললে, চলে আসুন একদিন, এনি ইভনিং।

কার্ডে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সেটা পকেটে রাখল সমীরণ। ঠিকানা আর ডেসিগনেশন আর কোম্পানির নাম দেখেই যথেষ্ট সম্ভ্রম হল।

অভি চন্দনার দিকে তাকিয়ে বললে, নিরূপাকে ডাকো না একবার। এভাবে মুখ বুজে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না!

চন্দনা অভির মুখের দিকে তাকাল, কিছু বলল না। আসলে সাহস হল না।

অভি যেন নিজের মনেই বললে, আজকাল এ-সব মিডলক্লাশ মেন্টালিটি নিয়ে চলা যায় না।

বলে, নিজেই উঠে গেল অভি। বোধহয় নিরূপাকে নিয়ে আসতে।

সমীরণের মনে তখন একটাই কথা ঘুরছে, মিডলক্লাশ মেন্টালিটি। ও চাকরিতে মোটামুটি উন্নতি করলেও নিজেকে মধ্যবিত্তই ভাবে। আর আনন্দমোহনকেও তো দেখেছে, কথাবার্তা বলেছে, ঘরের আসবাবপত্রও দেখেছে। সেদিন যখন নিরূপাকে পৌঁছে দিয়ে গেছে তখন আনন্দমোহন বলেছিলেন, কাউকে বলবেন না যেন। এই মধ্যবিত্ত পরিবেশ থেকেইতো অভি উঠেছে। সকলেই। অথচ তার প্রতি কি ঘৃণা। যেন ব্যাপারটা ঘৃণারই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভাব-ভালবাসা থাকবে, না থাকলে দুঃখ পাবে, বাপ-মার প্রতি, ছেলে-মেয়ের প্রতি কর্তব্য থাকবে, এ-সবই যেন হাস্যকব। এদের কর্তব্য মানে মোটা টাকার ইনসিওরেন্স, ছেলেকে দার্জিলিংয়ে পড়ানো। কিংবা সমীরণ নিজেই হযতো এদের ওপর অবিচার করছে। মনে মনে ভাবল, বাইরেব চেহাবাটা আলাদা হলেও ভিতবে ভিতরে ওরাও বোধহয় আমাদের মতই। মানুষের মন কি কখনও অন্যরকম হতে পারে! কি জানি।

নিরূপা এল না। অভি আব আনন্দমোহন ফিরে এলেন। একটু পরেই চন্দনা উঠে গিয়ে দরজার বাইরে থেকে চা এনে এনে রাখল। অভির মা সব শেষে ঢুকলেন হাতে আরেক কাপ চা নিয়ে।

সমীরণদের বাড়িতে কেউ গেলে চা আসে চাকরের হাতে। তাই তফাতটা ওর চোখে পড়ল। আগেও পড়েছে। কিন্তু মা তো সাবাক্ষণ ঠাকুরঘবে। চিকো এসে যখন ওব কাছে থাকে, দু-একবার বলে দেখেছে, খেয়াল রাখে না, কিংবা ইচ্ছে করেই আসে না। আসলে ওদের তো দোষ নয়, বাবার সময় একরকম রুচি ছিল, এখন অন্যরকম। সবাই নিজেদের দ্রুত পাল্টে নিতে ব্যস্ত। কেউ কেউ নিজেদের পাল্টাতে চায় না। সমীরণের এক এক সময় মনে হয় ও যেন দু দলের মাঝখানে পড়ে গেছে।

অসিতা সমীরণের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে কি বলে আশীর্বাদ করব বাবা, তুমি মেযেটার প্রাণ বাঁচিয়েছ।

সমীরণ চুপ করে রইল, কোন কথাই বলল না। এরা সকলেই ধরে নিয়েছে, সমীরণই ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে।

আনন্দমোহনকে ও তো কিছু বলার সুযোগই পায়নি, অভিকেও বলতে গিয়ে সব কথা বলা যায়নি।

সমীরণ বলতে চেয়েছিল—একা-একা ওঁকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেই কেমন সন্দেহ হচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ যে জলে ঝাঁপ দিতে যাবেন ভাবতেই পারিনি।

এই কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে অভি বলে উঠেছে, ওকে নিযে আমাদের একটা প্রবলেম, কি যে করা যায়।

ফলে প্রসঙ্গ বদলে গিয়েছিল, আর বলা হয়ে ওঠেনি।

অসিতাও এমনভাবে কৃতজ্ঞতা জানালেন, যে কিছুই বলা গেল না। সে জন্যেই সমীরণের অস্বস্তি লাগছিল।

ও চা-টুকু শেষ করে উঠে দাঁড়াল।—চলি।

অভি বললে, আপনার ঠিকানাটা বরং দিয়ে যান, যদি দরকার হয়।

ঠিকানা এবং ফোন নম্বর লিখে দিল ও, চন্দনা কাগজ আর কলম নিয়ে আসতেই।

তারপর বেরিয়ে পড়ল, বেশ একটা অতৃপ্তি নিয়েই। মনে মনে ভেবেছিল নিরূপা একবার আসবে, অন্তত অভি যখন তাকে আনবার জন্যে উঠে গিয়েছিল। ঐ বিষণ্ণ করুণ মুখখানা আবার একবার দেখার ইচ্ছে হয়েছিল ওর। আসলে ও তো নিরূপাকে ভাল করে দেখেইনি। শুধু ম্যান-ও-ওয়ার জেটির মুখে এক ঝলক আলোতে কয়েক মুহূর্তের জন্যে যা দেখেছিল। তখন সে মুখ দেখে করুণ বিষণ্ণ মনে হয়নি। আসলে প্রতিদিন কত অগুন্তি মানুষের মুখের ওপর দিয়ে তো আমরা চোখ বুলিয়ে যাই, কিছুই তো বুঝি না, সব মুখ একরকম মনে হয়।

সমীরণ যখন সকালে খেতে বসে মা পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। আগে আগে নিজেই রান্নাবান্না করে ছেলেকে খাওয়াতে ভালবাসত। বিধবা হওয়ার পর মা প্রতিদিন মাছ ডিম রান্না করে খাওয়ায় এই ব্যাপারটা সমীরণের একটুও ভাল লাগত না। কিন্তু মুখে সে-কথা বলা যায় না ; যে তুমি নিজে ওসব খাও না, ছোঁয়া বাঁচিয়ে আলাদা রান্না কর, আমার খারাপ লাগে।

তাই মার শরীরের কথা বলে, গরমে রান্না করতে পরিশ্রম হয় এই সব বলে খুব রাগারাগি করত। শেষে রাঁধুনী বামুনের হাতে কাজটা তুলে দিয়েছিল। প্রথম প্রথম মাব একটা অভিমান ছিল, আমার হাতের রান্না তোর আর ভাল লাগে না, হোটেল ফোটেলে খেয়ে বেড়াস, ভাল লাগবেই বা কেন। এখন মা চুপচাপ এসে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, রাঁধুনীকে এটা ওটা দিতে বলে।

সমীরণ নিজেকে খুব সংস্কারমুক্ত ভাবে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় যুক্তি দিয়ে তর্ক করে সব গোঁড়ামি উচ্ছেদ করে দিতে চায়। কিন্তু একটা পার্টিতে কার যেন বিধবা মাকে মাছের চপ খেতে দেখে রীতিমত হাস্যকর লেগেছিল। ফিরে এসে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে তা নিয়ে রসরসিকতা হয়েছিল। নিজের মার কথা তো ভাবতেই পারে না। তাহলে যেন মার চেহারাটাই বদলে যাবে। সতীদাহর সময় কি বিধবাদের ছেলেরাও এ-রকমই ভাবত! কে জানে। আসলে যুক্তিতর্ক এক জিনিস, নিজেকে সংস্কাব থেকে মুক্ত করা অন্য ব্যাপার। তবে তর্ক করতে করতেই তো কুসংস্কার দূর হয়।

মা বলতে সেই পুরনো দিনের মাকেই সকলের ভাল লাগে, অথচ আধুনিকও হতে হবে, এই দোটানার মধ্যে পড়ে আছে সমীরণ। হয়তো সকলেই। যে যত আধুনিকই হোক প্রকাশ্যে মুর্গীর মাংস চিবোনো বিধবা মাকে কোন্ ছেলের ভাল লাগে!

খাবার সময় মাকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর ভালই লাগে। পুজোর ঘরেও।

রাত্রে খাবার সময় একা মা নয়, চিকোও এসে দাঁড়াল। সারাদিন ও কৌতূহল চেপে কাটিয়েছে। বীরজু দুলটা দিয়ে যাওয়ার পর সমীরণ বড়ো অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। প্রশ্নের জবাব দেয়নি। তাছাড়া সকালে অফিসের তাড়া ছিল বলে চিকো আর জিগ্যেস করার সুযোগ পায়নি।

সমীরণ বুঝতে পারছিল চিকো এখনই কথাটা তুলবে, মা হয়তো ভুল বুঝবে।

তাই খেতে খেতে একবার চিকোকে জিগ্যেস করল, হামটি ডামটি কোথায়?

চিকোর দুটি তাগড়া চেহারার যমজ ছেলের নাম দিয়েছে ও হামটি ডামটি। বছর দশেক বয়েসেই দুজনের বেশ পালোয়ান পালোয়ান চেহারা। দুটিতে সারাদিন হুটোপুটি লেগেই থাকে।

—তুই রাত্তির করে বাড়ি ফিরবি বলে কি ওরা এখনও জেগে থাকবে নাকি। চিকো উত্তর দিল।

রাত্তির করে বাড়ি ফেরার মধ্যে ইঙ্গিত আছে।

—কুঁড়ের বাদশা হয়ে তোর মত বাড়িতে বসে থাকাও যায় না। সমীরণ উত্তর দিল।

কুঁড়েমি বা আলস্যের কথা শুনলেই চিকো রাগে জ্বলে যায়। স্বামী ওকে কথায় কথায় ঐ অপবাদ দেয় বলে। অবশ্য রসিকতা করেই বলে।

একদিন চিকোকে সমীরণের সামনেই রসিকতা করে বলেছিল, তুমি যে কুঁড়ে, তার প্রমাণ তো ঐ দুটি। বলে হামটি ডামটিকে দেখিয়েছিল। হাসতে হাসতে হৃষিকেশ বলেছিল, দুটো লেবারের একটা ফাঁকি দিয়েছ।

ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মৌখিক ঝগড়া লেগেই থাকে, চিকো চট করে রেগেও যায়, কিন্তু শান্তশিষ্ট স্বামী-স্ত্রীদের চেয়ে ওরা অনেক সুখী।

কুঁড়েমির কথা তুলে চিকোকে রাগিয়ে দিয়েছে, ও এখনই হয়তো কথাটা বলে বসবে, গাড়িতে দুল পাওয়ার কথা। তখন বলতে গেলে মার কাছে অজুহাতের মত শোনাবে।

তাই খেতে খেতে সমীরণ বললে, জানো মা, একটা বিচ্ছিরি ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গেছি।

ধীরে ধীরে সুইসাইডের ঘটনাটা বললে।

মা এবং চিকো প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল, তারপর একটু একটু করে ওদের মুখেচোখে মমতার ছাপ পড়ল।

শুনতে শুনতে মা বলে উঠল, আহা বেচারী, কত দুঃখ পেলে তবে মানুষ মরতে চায়।

আবার বললে, গতজন্মে অনেক পাপ করলে তবে মেয়ে হয়ে জন্মায় রে। মেয়েদের যে কত দুঃখ।

সমীরণ মার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। ঐসব পুরনো ধারণা মার মন থেকে আর যাবে না। চিকোর বিয়ে দিতে অনেক নাজেহাল হতে হয়েছিল বলেই হয়তো ঐ ধারণাটা রয়ে গেছে। ছেলে বা মেয়ে কেন হয়, এসব এক্স-এক্স-এক্স-ওয়াইয়ের ব্যাপার মাকে বলাও যাবে না, বোঝালে বুঝবেও না। চিকোকে বলতে গেলে বলবে, তুই বিয়েথা করিসনি, ওসব পড়িস কেন।

নিরূপাদের বাড়িতে দুলটা ফিরিয়ে দিয়ে আসার কথা বললে সমীরণ, তার বাবা মা দাদা বৌদিদের কথা। শুধু বলতে পারল না যে নিরূপা একবারও আসেনি। বলতে পারল না যে ওর মনের মধ্যে একটা কৌতূহল চাপা আছে। কেবল জানতে ইচ্ছে হয়, নিরূপার জীবনে সেদিন কি এমন ঘটেছিল যার জন্যে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। দুঃখ তো তার ছিলই, কিন্তু সেদিনই কি কিছু ঘটেছিল।

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হঠাৎ বললে, জামাইয়ের নামধাম জেনে এলি না? আমি তা হলে একবার গিয়ে তাকে বোঝাতাম। কি কষ্ট বল তো মেয়েটার।

চিকো আর সমীরণ দুজনেই হেসে উঠল। সবাই যেন মার আপনজন।

সমীরণ হাসতে হাসতে বললে, তুমি যে রকম ভাবছ, সে-রকম বাড়ি নয় মা।

মা দুঃখের স্বরে বললে, মানুষ আবার দুরকম হয় নাকি রে।

একটু থেমে বললে, তুই নাম-ঠিকানা নিয়ে আয়, আমি যাব একবার তার কাছে।

সমীরণ কোন কথা বলল না। মা একেবারে বদ্ধ পাগল। কিছুই জানে না, কিছু বোঝে না।

৪

বিয়ের পর নিরূপা সত্যি সত্যি সুখী হয়েছিল। সেই সব দিনগুলোর কথা ভাবলে এখন স্বপ্ন মনে হয়। কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে ও বিচার করতে পারে না।

নিরূপার মনে আছে, ওর দাদা অভি তখন এত উন্নতি না করলেও বেশ খানিকটা ওপরে উঠে গেছে। তাছাড়া সদ্য সদ্য একটা আশাতীত ভাল লিফ্‌ট পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দাদার মনে হয়েছে, আমাদের সামাজিক মর্যাদা অনেক ওপরে।

বাবা এক একটা পাত্রের খবর এনেছে, আর নিরূপার দাদা তা নাকচ করে দিয়েছে। কখনও বলেছে, এই রোজগারে খাবে কি। কখনও বলেছে, পাঁচজনের কাছে তো আমাদের পরিচয় দিতে হবে।

বাবা নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে চুপ করে গেছে।

মা রেগে গিয়ে বলেছে, তুই-ই তা হলে ওর বিয়ের ব্যবস্থা কর।

আসলে সবই বড়ো দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে।

আনন্দমোহনদেব সময়ে কেউই সম্ভাবনার কথা ভাবত না, ভবিষ্যতের স্বপ্নও তারা দেখতে পেত না। অথচ তারই মধ্যে দু-একজন দু-চার ধাপ উঁচুতে উঠে যেত। কিন্তু তাদের হাবভাব খুব একটা বদলাত না।বড়োজোর প্যান্ট-কোটের কাপড় আর একটু দামী হত।

অভিরা অন্য যুগের মানুষ। আনন্দমোহন ওদের ঠিক বুঝতে পারেন না। ওদের চাহিদা অনেক বেশি, স্বপ্ন অনেক বেশি, জীবনটাকে ওরা জীবনের মত কবেই উপভোগ করতে চায়।

শেষ অবধি অবনীর সঙ্গেই নিরূপার বিয়ে হয়ে গেল।

অভির খুব একটা পছন্দ না হলেও ও সম্মতি জানিয়ে বলেছিল, খবর নিয়ে দেখেছি ছেলেটি খুবই ব্রাইট, ওদের চাকরিতে প্রসপেক্ট আছে। বেশ বড় সিন্ধি ফার্ম, তেরো কোটি টাকা টার্নওভার। তাছাড়া কোম্পানির এক্সপ্যানশনের প্ল্যান আছে।

নিরূপা এ-সবের কিছুই বুঝত না, বুঝতে চায়ওনি।

তবে কনে দেখার পর্বে ওর মনের মধ্যেএকটু রাগ লজ্জা অপমান জট পাকিয়ে ছিল, সে জন্যেই সপ্রতিভ হতে পারেনি। কলেজে পড়ার সময়ে রাস্তাঘাটে বা কোন বিয়ে বাড়িতে গেলে কত পুরুষই তো ওর দিকে স্তবের মত দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। ইচ্ছে কবলে এবং বাড়িতে সেই স্বাধীনতা আছে জানলে, ও তো যে-কোন ছেলেকে পছন্দ করে বিয়ে করতে পারত। অথচ তাকেই কিনা অন্যেরা এসে পছন্দ করবে। কি অদ্ভুত ব্যাপার।

বাবা-মার সঙ্গে অবনীও এসেছিল। কিন্তু অস্বস্তির ফলে নিরূপা অবনীকে তেমন ভাল করে দেখতে পারেনি। যেটুকু দেখেছিল, ভাল লেগেছিল। আর নিরূপা নিজেও বোধহয় ভাল লাগার জন্যেই মনটাকে তৈরি করে রেখেছিল।

অবনীর বাবা-মা সম্মতি জানিয়ে গিয়েছিলেন। তবু পরে বলে পাঠালেন, সবই ঠিক আছে, তবে অবনী একবার মেয়েকে বাড়ির বাইরে দেখতে চায়। আউটবামে একবার নিয়ে আসুন না।

নিরূপা সেদিন দাদা-বৌদির সঙ্গে এসেছিল এই আউটরাম ঘাটে। অবনীর সঙ্গে ছিল এক বোন আর এক বন্ধু। ওরা সবাই মিলে গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গল্প করেছিল, নিরূপা মৃদু হেসে টুকটাক দু-একটা কথা বলেছিল। তারপর ওরা সকলে মিলে ঐ দোতলার রেস্তরাঁয় গিয়ে বসেছিল।

অবনীকে, অবনীর কথাবার্তা খুব ভাল লেগে গিয়েছিল নিরূপার।

তারপর বিয়ে হয়ে গেল। নিরূপার মনে হল কেউ কখনও ওর মত সুখী হয়নি।

নিরূপার দাদা বলেছিল, ওর চাকরিতে প্রসপেক্ট আছে।

সে-সব কথা তখন নিরূপার কাছে মূল্যহীন। কারণ অবনীকেই তখন ওর ভাল লেগে গেছে।

একদিন অফিস থেকে ফিরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে অবনী মৃদু হেসে নিরূপাকে বললে, এই রূপা, টাইটা খুলে দাও তো ?

নিরূপা কৌতুকের চোখে বললে, কি ব্যাপার ? কেন, নিজে খুলতে পারছ না ?

অবনী হাসতে হাসতে বললে, আর নিজে খুলব না। কাল থেকে আমি জে বি ও।

ওসব এ বি সি কিংবা এক্স ওয়াই জেড নিয়ে নিরূপার কোন আগ্রহ ছিল না। ও শুধু বুঝল অবনী প্রোমোশন পেয়েছে, মাইনে বেড়েছে। ওর মুখচোখেও আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল।

খুশি হয়ে সত্যি সত্যি টাই খুলে দিতে গিয়েছিল। 'পাজি' বলে সরে এসেছিল।

এখন ভাবলেও অবাক লাগে। সেই দিনটার প্রতিটি দৃশ্য ওর এখনও চোখে লেগে আছে। সেই সন্ধেটা। সে-সব কি সত্যি নয় ? সব মিথ্যে ? তা না হলে এমন হল কি করে ?

নিরূপা কিছুতেই কোন যুক্তি খুঁজে পায় না।একটা মানুষ কি এত পাল্টে যেতে পারে ! তা হলে আমিই বা কেন নিজেকে পাল্টাতে পারছি না।

নিরূপার মনে আছে, ও সেদিন আনন্দ চেপে রাখতে পারেনি। অবনীব সুখ যেন ওরও সুখ। পরের দিনই ছুটতে ছুটতে মা-বাবার কাছে চলে এসেছিল।

—জানো বাবা, মা শোনো শোনো, তোমার জামাই জে বি ও হয়েছে।

আনন্দমোহন এবং অসিতাও সেদিন খুশি হয়ে উঠেছিলেন। অভির চটপট এক এক ধাপ ওপরে ওঠা দেখে যেমন গর্ব হত, খুশি হতেন,তেমনি। অভির বেলায় তবু একটু অভিমান জড়িয়ে থাকত। অভির কথাবার্তায় আগেও কখনও কখনও আহত হয়েছেন। কারণ ওপরে উঠে গিয়ে অভি মাঝে মাঝে এমন কথা বলে বসত তার নীচের ধাপের লোকদের সম্পর্কে, যা আনন্দমোহনকে আঘাত দিত। কারণ আনন্দমোহন যে সেই ধাপের মানুষই ছিলেন। অভি ভুলে যেতে পারে, কিংবা ভুলে যেতে চায়, কিন্তু আনন্দমোহন ভুলবেন কি করে। এক একসময় আনন্দমোহন বিস্মিত হয়ে ভাবেন, সমস্ত ছেলেই কি তার বাপ-ঠাকুরদাকে মনে মনে ঘৃণা করে ? শুধু সে যে সমাজে গিয়ে পৌঁছেছে সেটাই তার কাছে মর্যাদার ? পোশাক পরিচ্ছদ, আদব কায়দা ইত্যাদি একটু পুরনো ঢঙের হলেই এরা উপহাস করে। কেউ এদের চোখে গ্রাম্য, কেউ কেরানী, কেউ অশিক্ষিত। তোরা এই যে এত সাহেবিয়ানা করছিস, এত কালচার-কালচার বুলি, তোদের কারও বাপ-ঠাকুরদা, কারও বা আরও একপুরুষ আগের প্রপিতামহটি বেঁচে থাকলে তো তার ল্যাজে আগুন লাগিয়ে দিতিস। তোদের কারও গর্ব করার মত অতীত নেই, সেজন্যেই সেটা লুকোতে চাস। ভাবিস যে কোথায় পৌঁছেছি সেটাই খুব বড়। আনন্দমোহন মনে মনে হাসেন, কার কাছে লুকোবি তোরা, আমার চোখের সামনে যে বাষট্টিটা বছর, তোদের সকলের অতীত।

নিরূপার সঙ্গে আনন্দমোহনের চিরকালই খুব মতের মিল। আনন্দমোহন চাকরিটাকেই জীবন ভাবেননি। বাড়ি ফিরে ওটাকে পোশাকের মত খুলে ফেলতেন। আর একালের অভিরা পোশাককেই জীবন ভেবে নিয়েছে।

বাবার প্রভাবেই হয়তো নিরূপার স্বভাবও ছেলেবেলা থেকেই একটু অন্যরকম। একা-একা। চুপচাপ। অন্য মেয়েদের মত ওর অত শাড়ি গয়নার দিকে লোভ ছিল না, হৈ হৈ পছন্দ করত না। ওর রুচি অন্যরকম।

দিনকয়েক পরেই অবনী বললে, রূপা, একটা পার্টি দিতে হবে সবাই ধরেছে। ভয় পাবার

মত কিছু না, মাত্র কয়েকজন।

একটা বড় হোটেলের নাম বলল অবনী।

অবনীর চোখের দিকে তাকিয়ে নিরূপার বুঝতে বাকি থাকেনি, সবাই ধরেছে কথাটা মিথ্যে। তা হোক, স্বামীর আনন্দ তো মিথ্যে নয়, যদি এভাবেই সেটা উপভোগ করতে চায়, দোষ কি!

হাসিমুখেই বলেছে, বেশ তো।

ভিতরে ভিতরে একটু অস্বস্তিও হয়েছে। সেটুকু অবনীকে জানতে দেয়নি। নিরূপা এ-সবে অভ্যস্ত নয়, পছন্দও করে না। দাদা কতবার এ-সব ক্লাবে হোটেলে নিয়ে যেতে চেয়েছে, রাজি হয়নি। জানে, ওসব জায়গায় গেলে ওর নিজেকে জেলখানার কয়েদির মত লাগবে। তবু হাসতে হবে, কথা বলতে হবে, স্মার্ট হতে হবে।

অবনীরা যখন বলে পাঠিয়েছিল, আউটরামে একবার নিয়ে আসুন না, তখনই ওর ভয়-ভয় করেছিল। বুঝেছিল, ও যথেষ্ট স্মার্ট কিনা সেটাই পরীক্ষা করতে চায়।

নিরূপা অবনীব কথায় সায় দিলেও মনে মনে ওর কেমন ভয়-ভয় করল।

অবনী একটু ইতস্তত করে বললে, দাদা-বৌদিকেও বলতে চাই, তোমাকে গিয়ে কিন্তু ওঁদের রাজি কবাতে হবে।

নিরূপা সপ্রশ্ন চোখ তুলে বললে, দাদাকে কেন?

অবনী আবাব ইতস্তত করল।—মানে, আমাদের চিফ বস্ মিস্টাব নানাজী আসবেন বলেছেন।

নিরূপা প্রথমে বুঝতে পাবেনি, বুঝতে পেরে খাবাপ লাগল। আসলে দাদাব পদমর্যাদা যথেষ্ট, সেই পবিচয় চিফ বস্‌কে জানিয়ে দিতে চায়।

দাদাকে রাজি কবাতে পারবে কিনা সন্দেহ ছিল বলেই নিরূপাব অস্বস্তি হল।

শেষ অবধি দাদা-বৌদিও গিয়েছিল। দাদাব সঙ্গে নানাজীর জমাটি আড্ডাও নিরূপা দেখেছে। আর সবাই বৌদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একেবারে রানীর মত ঘুরছিল, বসে ছিল। কি চমৎকার মাপা হাসি, কথা, কি সুন্দব ভঙ্গিতে ছুবি কাঁটা ধরেছিল, ঠোঁট ফাঁক না করেও দিব্যি চিবিয়ে খাচ্ছিল, কত অল্প ঘাড কাত করছিল কারও প্রশ্নে, আব যখন হেঁটে যাচ্ছিল ঠিক যেন হাওযায় ভেসে যাচ্ছে। আর রানীর মতই তো সেজেছিল বৌদি।

নিরূপা জানে, ও ঠিক মানিয়ে চলতে পারেনি। আসলে ও গোটা ব্যাপাবটাব সঙ্গেই তো নিজেকে মানাতে পারেনি, ভিতবে ভিতরে অস্বস্তি ছিলই, তাই হযতো আরও বেমানান হয়ে পড়েছিল।

ফেবার সময় দাদার গাডির সামনে দাঁড়িয়ে নিরূপা ও অবনী গল্প করছিল, দাদা হাসতে হাসতে বললে, ভাবলাম নানাজীর কাছে অবনীর একটু প্রশংসা কবে দিই, কি বললে জানো? হেসে বললে, ওর আর কোন সার্টিফিকেট দবকাব নেই অভি, তুমি ওকে যখন বাড়ির জামাই বানাতে পেরেছ, সেটাই যথেষ্ট সার্টিফিকেট।

শুনে নিরূপা হেসে উঠেছিল। পরে দাদার কথাটা ভাল লেগেছিল, আবার ভাল লাগেনি। বাড়ির জামাই তো দাদা কবেনি, কবেছেন বাবা। বাবাকেও কি ও লোকটা এই কথা বলত? এরা মানুষ চেনে না, পোশাক চেনে, পদমর্যাদা চেনে!

অবশ্য বাবাও তো সরকারী চাকরিতে অনেক ওপরে উঠেছিল, সবাই সমীহ কবত। এখন এইরকম।

বাড়ি ফিরে অবনীর চোখমুখে খুশির ক্লান্তি। 'ড্যামনড টায়ার্ড' বলে পা ছড়িয়ে ওয়াই হয়ে শুয়ে পড়েছিল।

নিরূপা ভেবেছিল ও পাশ করে গেছে।

কিন্তু দিনকয়েক পরে অবনী কথাপ্রসঙ্গে বৌদির প্রশংসা করে বললে, আহ্‌, সি ওয়াজ আ কুইন, দ্যাট ইভনিং। হাসতে হাসতে বললে,বৌদির কাছ থেকে সব দেখে শিখে নেবে, বুঝলে ? ঠিক বৌদির মত হওয়া চাই।

সঙ্গে সঙ্গে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছিল নিরূপার। ভাবলে, আমি কি এমনই বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার করেছিলাম ? ওর চোখে জল এসে গেল। অভিমান এবং একটু রাগও হল। আমি কেন অন্যের মত হতে যাব ? আমি কেন আমার মত হব না ? চাকরিতে উন্নতি, বেশি মাইনে, কিছু অন্তঃসারশূন্য মানুষের প্রশংসা, এ-সবের কাছে কি আমাকে, আমার যা কিছু নিজস্ব, সব বেচে দিতে হবে ?

অথচ নিরূপা পড়াশুনোয় খুবই ভাল ছিল। ভেবেছিল, ডক্টরেট করবে।

নিরূপার মধ্যে জেদী মেয়েটি হঠাৎ রুখে দাঁড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু ও নিজেকে শান্ত করল। ভাবল, ওটা তো অবনীর অফিসের পোশাক পরা চেহারা। অন্য অবনীকে যে ওর ভাল লাগে, তাকে খুব ভালবাসে। ও তো জানে অবনীকে ছেড়ে ওর এক দণ্ডও চলবে না।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে একটা দুষ্টুমি ওকে পেয়ে বসেছিল। ছুটির দিন বোধহয়। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর হেলানো চেয়ারে গা এলিয়ে বই পড়ছিল অবনী। কখনও হাল্কা ডিটেকটিভ বই, কখনও নানান বিষয়ে মোটা মোটা বই কিনত অবনী, পড়ত।

সেদিনও এমনি একটা কি বই পড়ছিল।

নিরূপা এসে পিছনে দাঁড়াল, দু-হাত বাড়িয়ে বইটা কেড়ে নিয়ে বুকশেলফের মাথায় রেখে দিল।

অবনী হাঁই হাঁই করে বইটা ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছিল। তার আগেই পিছন থেকে দু-হাতে অবনীকে আটকে ধরে নিরূপা মুখ নামিয়ে এনে·· সেদিনের কথা ভেবে ওর কতদিন হাসি পেয়েছে, কখনও লজ্জা-লজ্জা খুশিতে মন ভরে গেছে। নিরূপার পিঠের ওপব অবনীর আঁকড়ে টেনে ধরা হাতের স্বাদ যেন এখনও লেগে আছে।

সেগুলো সত্যি নয় ? সব মিথ্যে ? কোনটা সত্যি, আর কোনটা মিথ্যে তা হলে। নিরূপা বুঝতে পারে না, চোখ জ্বালা করে। এক একটা কথা মনে পড়ে আর রাগে মাথার শিরা ছিঁড়ে যাবার উপরক্রম হয়।

কত রকমের বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করত অবনী। নতুন কিছু একটা পড়লেই নিরূপাকে শোনাত, কখনও কখনও ওকেও পড়তে বলত। মনে মনে নিরূপার একটা গর্বও ছিল।

একদিন শুধু বলেছিল, এত সব সাবজেক্ট একটু একটু জেনে কি লাভ। যে-কোন একটা বিষয়ে ভাল করে স্টাডি করলেও তো পার।

দারুণ হাসির কথা যেন, অবনী হেসে উঠেছিল—আমি কি রিসার্চ করব নাকি হাফ-ফেড অধ্যাপকদের মতো। সব কিছু আমার কিছু কিছু জানলেই চলে। শুধু ওয়েল-ইনফর্মড থাকতে পারলেই দিব্যি কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়, ইমপ্রেস করা যায়। ব্যাটা নানাজী তো এতেই হাঁ হয়ে থাকে।

কথাগুলো শুনে ভুল ভেঙেছিল নিরূপার। ওর মুখের রঙ মুছে গিয়েছিল।

আসলে নিরূপার একসময় কিছু একটা নিয়ে রিসার্চ করার ইচ্ছে ছিল।

তা হলে সবই চাকরি ? চাকরিতে উন্নতি ? কিংবা কাউকে ইমপ্রেস করা ? নিরূপা যখন রেডিও খোলে, রেকর্ড বাজায়, রবীন্দ্রসংগীতের সুরে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, তখনও অবনীর যে মনোযোগ দেখেছে, তা কি শুধু দামী ফ্ল্যাটের বন্ধু-পত্নীদের আড্ডায় দু-এক কলি আউড়ে দেবার লোভে ? রবীন্দ্রসদনে নাটক দেখে বা সিনেমা হলে ভাল ছবি এলে, তা কি শুধু নিজেকে কালচার্ড প্রতিপন্ন করার জন্যে ? আনন্দ পাবার জন্যে নয় ? উপভোগ করার

জন্যে নয় ? অথচ নিরূপার তো মনে হয় এই সব উপভোগের সামগ্রীগুলো আছে বলেই ভোগের সামগ্রীগুলোর দাম।

বাবার একটা কথা ওর মনে পড়ে। দাদুকে ও কখনও চোখে দেখেনি, কেমন দেখতে ছিলেন, পোশাক আশাক কেমন ছিল তাও জানে না। কেমন আর হবে। সবাই যাদের এখন অবজ্ঞা করে, তেমনই একজন! কিন্তু ঐ একটি কথায় ও যেন সেই মানুষটাকে দেখতে পায়।

আনন্দমোহন ছেলেমেয়েদের সামনে একদিন বলেছিলেন, জানিস অভি, জানিস নিরূপা, পরীক্ষা পাস করে চাকরিতে ঢোকার সময় বাবা একটা রুপোর টাকা দেখিয়ে বলেছিল, এই দ্যাখ, এক পিঠে লেখা আছে ওয়ান রুপি, কিন্তু তার জন্যে ওর দাম ওয়ান রুপি নয়। উল্টো পিঠ দেখিয়ে বলেছিল, রাজার ছাপটা আছে বলেই এটার দাম।

নিরূপা হেসে ফেলে বলেছিল, তা তো সবাই জানে।

আনন্দমোহন বলেছিলেন, পরের কথাটা শোন। বাবা বলেছিল, টাকার মতই জীবনেরও দুটো পিঠ আছে, একটা পিঠে যত দামই লেখা থাক, অন্য পিঠে রাজার ছাপ আছে কিনা দেখবি। জীবনের একটা দিকে তোকে রাজা হয়ে থাকতে হবে। মুটেমজুররাও থাকে।

সেই কথাগুলো মনে পড়ে যেতেই অবনীকে নিরূপার খুব ছোট মনে হয়েছিল। কিন্তু আজকের দিনে কারও তো মনে হয় না। সব মেয়েবাই তো কত হাসে, আনন্দ করে, ছুটে বেড়ায়, এক পিঠের দাম দেখেই তাদের গর্ব তাদের আনন্দ। নিরূপা কেন তাদের মত হতে পারল না। তা হলে তো নিরূপাও ওদের মতই সুখী হতে পারত।

অবনীকে ও ভালবাসে, বাসে বলেই তো এই যন্ত্রণা। এই কষ্ট। বুকের মধ্যে এই অসহ্য জ্বালা। ভালবাসার দিনগুলো যে ও স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পায়। তা হলে কেন এমন হল।

দাদা এসে আলতো করে ওর মাথায় হাত রেখেছিল। 'নিরূপা চল একবারটি। সেই ভদ্রলোক এসেছেন। তোকে কাল বাঁচিয়েছেন, আজ তোর ইয়ার রিং কুড়িয়ে পেয়ে দিতে এসেছেন। একবার চল, খুব খারাপ দেখায়।'

নিরূপা বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েছিল। গতকাল ওর ওপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। আউটরাম ঘাটে কাল কি হয়েছে না হয়েছে ও কিছুই জানে না। ঘোরের মধ্যে কেটে গেছে। ঝড়টা চলে গেছে। কিন্তু দোলা রয়ে গেছে এখনও।

দাদার হাতের ছোঁয়া লেগে ওর চোখে জল এসে গেল।

কান্নার স্বরে বললে, না না না।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে, আমি পারছি না। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

অভিকে হাব মেনে চলে আসতে হয়েছিল।

সমীরণ চলে যাওয়ার পর দাদা-বৌদি এসে বসেছিল ওর কাছে।

বৌদি পাশে বসে ওর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, নিরূপা চলো, তুমি দিনকয়েক আমাদের ওখানে থাকবে চলো।

সঙ্গে সঙ্গে নিরূপার দু-চোখ ছাপিয়ে জল এসেছে। কোন সমবেদনা, কোন স্নেহ-ভালবাসার স্পর্শ দুঃখের গায়ে হাত রাখলেই সেটা কান্না হয়ে যায়।

অভি ধীরে ধীরে বললে, ওসব পাগলামি করতে যাস না। নিরূপা চল, তুই বরং আমাদের সঙ্গেই চল।

পাগলামি, পাগলামি, পাগলামি। বাবা-মা, দাদা-বৌদি, এরা সকলেই ভাবছে পাগলামি করতে গিয়েছিল ও। ওরা সবাই ওকে বোধহয় ভয় পেতে শুরু করেছে। কখন কি করে বসে। মা বাবা ওকে এক দণ্ডও এখন আর চোখের আড়াল হতে দিচ্ছে না। ও জানে, ওকে

শুধু শান্ত করার জন্যেই নয়, চোখে চোখে রাখার জন্যেও মা কাল রাত্রে ওর পাশে শুয়েছিল। ওর চোখ থেকে ঘুম তো অনেককাল থেকেই চলে গেছে, কাল রাত্রেও ও এক নিমেষের জন্যে ঘুমোতে পারেনি। ওর বুকের ভেতরটা কেবল হু হু করেছে। বিছানায় পড়ে ছটফট করতে করতে ও কিন্তু টের পেয়েছে মা জেগে আছে, মাও ঘুমোতে পাবছে না। ওর গায়ের ওপর পড়ে থাকা মার হাত ভাবি লাগত মা ঘুমিয়ে গেলে। দাদা-বৌদিও হয়তো ভয় পাচ্ছে ও কখন কি করে বসে। কিন্তু নিরূপার এখন লজ্জাই করছে এমন বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার ঘটে যাওয়ার জন্যে। সেই মুহূর্তে ও মরতেই চেয়েছিল, মরতে পারলে সব জ্বালা জুড়িয়ে যেত। কিন্তু সকলে হৈচৈ করে যখন ছুটে এল, একজন ওকে টেনে ধরল…না, তারপর ওর আর কিচ্ছু মনে নেই। কিছুই দেখেনি, কিছুই শোনেনি। কেমন বিভ্রান্ত মতো হয়ে গিয়েছিল। সব এখন কুয়াশার মতো। ও তার পরের ঘটনা কিছুই জানে না। শুধু মনে আছে, ভয়ে কেঁপে উঠেছিল মৃত্যুর কথা ভেবে। বেঁচে যাওযার পর মুহূর্তেই ওর মৃত্যুকে ভীষণ ভয় করেছিল। মৃত্যুব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুর সামনে থেকে সরে এসে ও তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। এখন লজ্জা। এখন আবার সেই চাপা দুঃখটা ফিরে এসেছে।

দাদা-বৌদির কথা শুনে নিরূপা অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল।

তারপর হঠাৎ বললে, যাব। আমাকে এখন ছেড়ে দাও তোমরা। এখন যাও, এখন যাও।

যেন তাড়িয়ে দেওয়ার মত একটা অনুনয়।

অভি আর চন্দনা আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে এসেছিল।

তারপর একটু একটু করে স্বাভাবিক হয়েছে নিরূপা। আবার একদিন অভি আর চন্দনা এসেছে। দাদা বলেছে, চল নিরূপা, আমাদেব ওখানে গিয়ে কিছুদিন থাকবি, তোর ভাল লাগবে।

বাবা বলেছে, তাই যা, এখানে তো দিনবাত বাড়ির মধ্যে একা-একা পড়ে আছিস।

নিরূপা রাজি হয়েছে। ওর এখন আর কোন মতামত নেই। ও তো একটা জড়পদার্থ হয়ে গেছে।

রাগে লজ্জায় অপমানে ও আগে একবার অবনীর কাছ থেকে চলে এসেছিল। চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। ওর মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, অবনী আসবে, ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ওর বিশ্বাস ছিল অবনী ওকে ভালবাসে। এত সব হওযাব পরেও নিরূপা তো অবনী ছাডা আর কিছু ভাবতে পারছে না। নিজেব ভালবাসার চোখ দিয়েই কি ও সব ভুল দেখেছিল!

বিয়ের আগে দাদা বলেছিল, ছেলেটা খুবই ব্রাইট।

নিরূপার নিজেরও তাই মনে হয়েছিল।

একদিন অফিস থেকে ফোন করে বললে, রূপা রেডি হয়ে নাও।

—কোথায় যাবে?

হাসির শব্দে উত্তর এল, বলব না।

হঠাৎ হঠাৎ এ-রকম এক একদিন করত। স্পষ্ট বলতও না। এসে হাজির হত কোন সিনেমা হলে, কোন ফেয়ারে, কিংবা কোন বন্ধুবান্ধবের বাড়ি। নিরূপার কখনও কখনও ভাল লাগত। ভাবত অবনী ওকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চায়।

নিরূপা প্রায় তৈরি হয়েই ছিল। অবনী কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেল, চটপট স্নান করে নিয়ে পোশাক বদলে বললে, চলো।

স্পীডে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এল অবনী। আউটরাম ঘাটের দিকে। নিরূপা বসে আছে অবনীর পাশেই। হঠাৎ আউটরাম ঘাটের দিকে আসতে দেখেই নিরূপা ভাবতে চেষ্টা করল,

বিয়ের তারিখ নয় তো আজ ? হঠাৎ মনে পড়েছে হয়তো। নাকি, এই তারিখেই ও সেই প্রথম দাদা-বৌদির সঙ্গে এসেছিল, অবনীদের সঙ্গে গিয়ে বসেছিল দোতলা রেস্তরাঁয়।

না, তা নয়।

অবনী গাড়ি রেখে বললে, চলো ঐ ঘাসের ওপর গিয়ে বসি।

নিরূপা অবাক হল, নিরূপার ভীষণ ভাল লাগল। যাবে ?

—হাঁ, চলো।

ফোর্ট উইলিয়ামের দিকটায় ঘাস, অন্ধকার। অপেক্ষাকৃত নির্জন। এর আগে একদিন এখানে বেড়াতে এসে ঐ ঘাসের ওপর বসতে চেয়েছিল নিরূপা। অবনী এমনভাবে 'ইম্‌পসিবল' বলে উঠেছিল, যেন আসলে বলতে চেয়েছে, ওখানে ছোটলোকরা বসে। যেন ওখানে হাঁটু মুড়ে বসে গল্প করলে অবনীর মর্যাদা নষ্ট হবে।

অথচ এখানে বাবা-মার সঙ্গে কতদিন বেড়াতে এসেছে। মাসীমা, মাসতুতো ভাই-বোনদের সঙ্গেও একবার এসেছিল, কত রাত অবধি রুমালচোর খেলেছে। দাদার বিয়ের পর বাবা-মা দাদা-বৌদি সকলে মিলে এসেছে, বসে গল্প করেছে। এখন অবশ্য দাদা-বৌদি বোধহয় এখানে এসে বসে না। বসবে না।

অবনী বলে উঠেছিল, ইম্‌পসিবল।

আঘাত পেয়ে নিরূপার মুখ থেকে আনন্দ উবে গিয়েছিল। মনে মনে ভেবেছিল, উঁচুতে ওঠা মানে অনেকগুলো আনন্দ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য অনেক সুখ আঁকড়ে ধরা। সেদিন ওর কিছু ভাল লাগেনি, কিছু ভাল লাগেনি। এই গঙ্গা, ঠাণ্ডা হাওযা, আলো-অন্ধকার, উজ্জ্বল ভিড়, এবং ঐ দোতলা রেস্তরাঁর দিকে যেতে যেতে কোমরে অবনীর হাত—সব বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল।

তাই অবাক হয়ে গেল নিরূপা, অবনীর কথা শুনে। স্বামী নিজে থেকেই কিনা ঐ ঘাসের ওপর গিয়ে বসতে চাইছে। নিরূপার খুব ভাল লাগল। একদিন নিরূপাকে আঘাত দিয়েছিল সে-কথা হয়তো বুঝতে পেরেছে, আজ মনে পড়ে গেছে, আজ ওকে খুশি করতে চাইছে।

পাশাপাশি হেঁটে এসে একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে বসতে যাবে, অবনী হাসতে হাসতে বললে, একটা দারুণ খবর আছে।

নিরূপা খুশি খুশি চোখে অবনীর ম্লান আলোয় ভেজা মুখের দিকে তাকাল।—কি বলো না ?

—আমি সি· বি· এম· হয়েছি, অফিস থেকে ব্র্যান্ড নিউ একখানা ফিয়েট, মানে ঐ প্রিমিয়ার পদ্মিনী।

নিরূপা হেসে বললে, মানে পদ্মিনী প্রিয়দর্শিনী ? ঠাট্টা করে বলে উঠল, সত্যি সত্যি প্রিয়দর্শিনী দেবে না তো ? পি এ হিসেবে কোন সুন্দরী মেয়ে ?

অবনী প্রাণ খুলে হাসল।—আমার এই একটি প্রিয়দর্শিনীই যথেষ্ট। বলে নিরূপার কাঁধে হাত রাখল। বোধহয় একটু কাছে টানার ভঙ্গি করেছিল।

নিরূপা বলে উঠল, এই কি হচ্ছে। চতুর্দিকে ভিড় গিজগিজ করছে দেখছ না।

নিরূপার তখন সমস্ত শরীর মন ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে গেছে। 'আমার এই একটি প্রিয়দর্শিনীই যথেষ্ট।' কথাটা আজও মনে আছে। মনে আছে বলেই তো বুঝতে পারে না, কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে। সেই মানুষটা কি করে এমন বদলে যায়।

অবশ্য সেদিনও হঠাৎ বদলে গিয়েছিল।

অবনী বলেছিল, আমি সি· বি· এম· হয়েছি।

নিরূপা হেসে বলেছিল, ওসব ভাওয়েল আর কনসোনেন্ট আমি বুঝি না, আসল ব্যাপারটা কি বলো।

অবনী ওর দায়দায়িত্ব কত বাড়ল, এবং মাইনে আর পার্কস, তা বোঝাল।

সঙ্গে সঙ্গে নিরূপা বললে, সবই আমার জন্যে, এটা মনে রেখো।

অবনী চট করে রেগে গেল। —কেন, তোমার জন্যে কেন, তুমি কি করেছ ?

নিরূপা স্তম্ভিত হয়ে গেল। ও অবাক হয়ে তাকাল অবনীর মুখের দিকে।

অবনী তখন রেগে গিয়ে বলছে, তুমি কি ভাবো, তোমার দাদা আরও বড় চাকরি করে বলে, নানাজীর কাছে সার্টিফিকেট দিয়েছিল বলে…

—কি বলছ তুমি। নিরূপার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

কি কথায় কি কথা এসে গেল। বিয়ের পর স্বামীর উন্নতি হলে সবাই তো রসিকতা করে বলে বউয়ের ভাগ্যে হয়েছে। এর আগে যখন একটা লিফট্ পেয়েছিল, মা মেয়ে-জামাইকে আদর করে খাওয়াতে খাওয়াতে হেসে বলেছিল, নিরূপার ভাগ্যে হয়েছে, বুঝলে অবনী।

নিরূপা সেকথাই ঠাট্টার ছলে বলতে গিয়েছিল। ও কি সত্যি তাই বিশ্বাস করে নাকি। অবনীর যোগ্যতা আছে বলেই এত তাড়াতাড়ি উন্নতি করছে তা কি ও জানে না। কিন্তু স্বামী এ কি কথা ভেবে বসল। বলে বসল।

ও অবনীব হাতখানা ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, বিশ্বাস করো, আমি ওসব কথা কিছু ভাবিনি। মা ঠাট্টা করে বলেছিল, বউয়ের ভাগ্যে, সে-কথাই বলছিলাম।

অবনী শান্ত হয়েছিল। কিন্তু নিরূপার মন তখন একেবারে বিস্বাদ। এই এক টুকরো ঘাসের আসনে ও মনে মনে যে স্বর্গ গড়ে রেখেছিল তা তখন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

শুধু সময় কাটিয়ে ফিরে এসেছিল সেদিন, শুধু সময় কাটানোর মত কথা বলে।

তবু সেই দুটো বছর, নাকি আড়াই, এখন তো মনে হয় কত আনন্দেই কেটেছিল।

এখন নিরূপার সময়ও কাটে না।

বিশেষ করে ঐ সুইসাইড করতে যাওয়ার পর থেকে।

ওর বাইরের চেহারা এখন একটু সহজ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। না হয়েও তো উপায় নেই। বুকের ভিতরে যতই জ্বালাযন্ত্রণা দুঃখকষ্ট থাক, চেপে রাখতে হবে। মুখে হাসি এনে অভিনয় করে যেতে হবে। পাড়াপড়শি না জানতে পারে. আত্মীয়স্বজনরা না বুঝতে পারে। কারণ আত্মীয় মানেই তো স্বজন নয়।

নিরূপাকে আবার মুখে হাসি আনতে হল, বানানো হাসি। উঠে বসতে হল। কেউ এলে ওর আরও কষ্ট। হেসে হেসে কথা বলতে হয়, তাদের কথাব পিঠে কথা বলে গল্প করতে হয়, ভাব দেখাতে হয় আমি সুখেই আছি। একটু অনামনস্ক হলে গেলেই প্রশ্ন আসবে, কি রে, কি ভাবছিস এত।

—কি নিরূপা, খুব লম্বা ছুটি দিয়েছে বর, তাই না ? পাড়ার একটি মেয়ে, ওর ছেলেবেলার বন্ধু, বলেছিল সেবারে। ও যখন চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। বলেছিল, আমার ভাই এক সপ্তাহের বেশি ছুটি জুটল না কখনও :

বাপের বাড়িতে এসেও শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। বেশি দিন থাকলেই নানান কৌতূহল, নানান রটনা। অসুখী মেয়েদের কোথাও যাবার জায়গা নেই, কোথাও পালাবার জায়গা নেই। শুধু ভিতরে ভিতরে জ্বলতে হবে, কষ্ট পেতে হবে।

অভি এল আবার, বললে, আমার ওখানেই চল্, দিনকয়েক থেকে আসবি।

বাবা বললে, তাই যা, এখানে ঘরের মধ্যে একা-একা।

নিরূপার মনও তাই বলছিল।

ছোটকাকীমা এরই মধ্যে বেড়াতে এসেছিল একদিন। মুখে হাসি এনে চটপট কথার উত্তর দিয়ে এমন ভাব করতে হয়েছিল যেন খুব সুখেই আছে। সে যে কি কষ্ট।

নিরূপা বললে, তাই চলো দাদা, তোমাদের ওখানেই যাই।

তবু তো বাপের বাড়ি থেকে সরে যাওয়া হবে, প্রতিবেশীদের সন্দেহ হবে না, ছোটকাকীমা আবার একদিন এসে বলবে না, সে কি রে, তুই এখনও আছিস ?

অভির ফ্ল্যাটে এসে ও কোনদিনই স্বস্তি পায়নি। এই জীবনের সঙ্গে ও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। তবু এল। এখানে আর কিছু না থাক্, এক ধরনের মুক্তি আছে। বোধ হয় কেউ কারও খোঁজ নেয় না, অকারণ কৌতূহল বোধহয় এদের নেই। নিরূপা অবশ্য ঠিক জানে না।

দাদা আর বৌদি, দুটি মাত্র প্রাণী। আর ঐ ছোট্ট বাচ্চাটা, কি সুন্দর আধো আধো ভাষায় কথা বলে। কিন্তু এই বিশাল ফ্ল্যাট এই কটা মানুষ দিয়ে তো ভরানো যায় না। তাই বাবুর্চি আছে, দু দুটি ভৃত্য, বাচ্চার জন্যে আয়া, চব্বিশ ঘণ্টার ড্রাইভার, নীচেই থাকে। এই বিস্তৃত অবসর তো শুধু গান গেয়ে কিংবা রেকর্ড বাজিয়ে, বই পড়ে কিংবা টি ভি দেখে, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে মার্কেটিং করে, সিনেমা দেখে কিংবা ক্লাবে পার্টিতে গিয়ে কাটানো যায় না। সেজন্যেই কোন কোনদিন সন্ধেবেলায় ফিরে এসে অভিকে একটু-আধটু ড্রিঙ্ক করতে হয়। বৌদিকে সঙ্গ দিতে হয়। আহা মানুষটার কত দায়দায়িত্ব, কত পরিশ্রম করতে হয়, এটুকু না করলে চলবে কেন। সহধর্মিণীকে স্বামীর সব ধর্মেই একটু একটু অংশ নিতে হয়, বুঝলে নিরূপা।

কখনও কখনও অভির বন্ধুবান্ধবরাও সস্ত্রীক এসে বসে। দামী দামী বোতল বের হয় সেলার থেকে, পাশের ঘরে চুপটি করে বসে থাকে নিরূপা, তাদের কথাবার্তা শোনে। কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত নাম বোতলগুলোর, এখানে নাকি কোথাও পাওয়া যায় না। অভি গর্বের সঙ্গে তাদের জানায় কত দাম দিয়ে জোগাড় করেছে। ওসব ইম্পোর্ট করতে দেয় না বলে গবর্নমেন্টকে বিচ্ছিরি সব গালাগালি দেয়। 'শালারা শুধু ধেনো খায় বলে দেশসুদ্ধ লোককে ধেনো খাওয়াতে চায়।' কিংবা 'ওরা তো ঠিকমতো সাপ্লাই পায়, অন্যেরা খাবে কেন !'

নিরূপা নিঃশব্দে চুপটি করে বসে থাকে পাশের ঘরে, আর শোনে। কখনও বা বিরক্ত হয়ে বারান্দায় চলে যায় !

বাচ্চাটাও থাকে না, আয়া তাকে বেড়াতে নিয়ে যায়। তা না হলে তাকে নিয়েও ওর সময় কাটত।

নিরূপা চুপচাপ বসে ভাবে, বাবা রিটায়ার করার পর কত কষ্টে সংসার চালাচ্ছে। বাবা সেই অফিসের পুরনো শার্ট আর প্যান্ট পরে। নষ্ট করে কি লাভ। আবার তো ধুতি পাঞ্জাবি করাতে খরচ,আজকাল ধুতির কি দাম। কলার হারানো গেলাগলা শার্ট পরে বাবা বাজারে যায়। কারণ, ছেলের হাত থেকে একটা পয়সাও নেবে না। তা হলে এতকাল চাকরি করে করলাম কি। পেনশন তো আছে। ওটা বোধহয় অভিমান। কিছুটা ছেলের ওপর,কিছুটা চাকরির ওপরই হয়তো, আসলে বাবাও তো বড় চাকরিই করত, তবে সরকারী চাকরি। তাই রিটায়ার করার পর এইরকম।

অভির বারো তলার ওপরের এই ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে অনেকখানি কলকাতা দেখা যায়। বাড়ির পব বাড়ি, গড়ের মাঠ, মনুমেন্ট, হাওড়া ব্রীজ। সব কত ছোট ছোট, গাছ মানুষ সব পুতুল হয়ে গেছে। প্রথম যেদিন দেখেছিল নিরূপা, সেদিন খুব ভাল লেগেছিল। ছবির মতো। এখন একঘেয়ে লাগে। মানুষ দেখা যায় না, এখানে থাকলে বোধহয় মানুষকে মানুষ বলে মনে হয় না। অথচ ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসলে নিজেকেই কত ছোট মনে হয়। একটা ছোটখাটো থিয়েটর হলের মত বিশাল ড্রয়িংরুম। কি পরিপাটি সুন্দর সাজানো, দামী কার্পেট, অ্যান্টিক ধাঁচে বানানো একেবারে হাল ফ্যাশনের আসবাবপত্র। কিন্তু যত কাছেই

বসো, মনে হবে অনেক দূরে।

বৌদি পায়ের ওপর পা তুলে বসে একটা বিলিতি ফ্যাশন ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল। বৌদি সব সময়েই সাজগোজ করে থাকে।

দাদা স্নান করছে, শাওয়ারের শব্দ আসছিল। বাথরুমের দরজা খুলে বাইরে এলেই বৌদির মোলায়েম সেন্টের গন্ধ ছাপিয়ে এক ঝলক মিষ্টি সুগন্ধ ভেসে আসবে দামী বিলিতি সাবানের।

পিয়ানোর তিনটে রীড বাজানোর মত আওয়াজ হল, কেউ এসে কলিং বেল টিপছে। কলিং বেল নয়, ডোর বেল বলবি, দাদা শুধরে দিয়েছিল।

বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে নিরূপা উঠল।

ল্যাচ ঘুরিয়ে দরজা খুলল।

—অভিরূপবাবু আছেন ?

লোকটির দিকে তাকাল নিরূপা। চেনাচেনা লাগল, চিনতে পারল না। বললে, আসুন।

লোকটি কেমন দ্বিধাগ্রস্ত, একটু বোধহয় অবাক। নিরূপার মুখের দিকে কিছুক্ষণ যেন তাকিয়ে রইল।

ঘরের ভিতর দু-পা এগোতেই চন্দনা তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে, একমুখ হাসি হয়ে বলে উঠেছে, আসুন, আসুন।

—নিরূপা. তুমি ওঁকে চিনতে পারলে না ? সমীরণবাবু।

চন্দনা ডিভানের দিকে হাত দেখিয়ে বললে, বসুন।

নিরূপা সত্যিই চিনতে পারল না। পারার কথাও নয়। সেই হৈ হট্টগোলের মধ্যে ও কাউকে তো দেখেইনি। কারও মুখ দেখেনি। ওর মনের অবস্থা তখন একেবারে অন্যরকম। বিভ্রান্ত। মরতে যাচ্ছিলাম এই কথা ভেবে ও তখন মৃত্যুকেই ভয় পাচ্ছে। মৃত্যু যে কি ভয়ঙ্কর ওর এখন আর জানতে বাকি নেই।

গাড়িতে ও পিছনে বসে ছিল মুমূর্ষু রুগীর মত। ধসে পড়া একটা মানুষ। তখনও সমীরণের মুখ দেখেনি, দেখতে ইচ্ছে হয়নি। ও তখন শুধু নিজের কথাই ভাবছিল।

সমীরণ নামটা পরে দাদার কাছেই শুনেছে।

সমীরণ বসল, চন্দনাও। নিরূপাও একটু সঙ্কোচের সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখে বসল।

ঠোঁটে মৃদু হাসি আনার চেষ্টা করে নিরূপা বলল, আপনি বোধহয় আমাকে খুব অকৃতজ্ঞ ভাবছেন। মৃত্যুর মুখ থেকে আমাকে টেনে আনলেন, অথচ আপনাকে আমি চিনতেই পারিনি !

সমীরণ ভদ্রতার হাসি হাসল।—আমি তো ভেবেছিলাম আপনি আমার ওপর রেগে আছেন।

নিরূপা চুপ করে রইল।

আর সমীরণ স্পষ্ট করে বলতে পারল না, ও বাঁচায়নি, ও শুধু সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়েছিল। অবশ্য সেই মুহূর্তে সমীরণ ওখানে থাকলে, ওর চোখের সামনে দৃশ্যটা ঘটলে, ও নিশ্চয় ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে বাঁচাত।

আনন্দমোহন, অভি···এখন নিরূপা। এরা সকলেই ধরে নিয়েছে সমীরণই ওকে বাঁচিয়েছে। এখন আর সত্যি কথাটা বলতে ইচ্ছেও হচ্ছে না সমীরণের।

৫

সমীরণকে সকলেই জানত একটা অস্থির প্রকৃতির মানুষ বলে। ও কোথাও দু-দণ্ড স্থির

হয়ে বসতে পারত না। অথচ ওর মধ্যে কি যে আছে, কে ওকে এমন চঞ্চল করে তোলে ও নিজেও বুঝতে পারে না। কোন অতৃপ্তি ? না তো।ও কি কিছু খুঁজে বেড়ায় ? না তো।

সেই সমীরণ হঠাৎ যেন শান্ত হয়ে গেছে। ভাবুক হয়ে গেছে।

চিকো ঠাট্টা করে বলেছে, কি এত ভাবিস বল তো ! তুই যেন কেমন হয়ে গেছিস।

মানুষ যখন নিঃশব্দ যন্ত্রণার মধ্যে থাকে তখন কেউ খুঁচিয়ে প্রশ্ন করলেও বিরক্ত হয়। সমীরণ উঠে চলে গেছে। কোন উত্তর দেয়নি।

আসলে সেই না-দেখা মেয়েটি ওর মনের মধ্যে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা রহস্য হয়ে। অদম্য একটা কৌতূহল হয়ে। ভিতরে ভিতরে তার জন্যে যেন সহানুভূতি জমিয়ে রেখেছে ও বুকের মধ্যে। কি হতে পারে, কি ঘটেছিল মেয়েটির জীবনে কিছুই জানে না ও। দুঃখী হলেই কেউ কি আত্মহত্যা করতে যায় ?

কিন্তু তাকে আরেকবার দেখার ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল সমীরণের। দুলটা ফেরত দিতে যাবার সময় ভেবেছিল দেখতে পাবে। পায়নি। সব শুনে, ওর আরও খারাপ লেগেছে। কেবলই মনে মনে ভেবেছে, আহা, তার হারিয়ে যাওয়া সুখও কোনরকমে খুঁজে এনে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না ! দুলটার মতই। কিন্তু সমীরণ কি করবে, ওর তো কিছুই করার নেই। সেজন্যেই তো নিজেকে ওর ভীষণ অসহায় লাগে। ভাবে, আর অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

অফিসেও আজকাল ওর কাজে মন বসে না।

দুপুরে লাঞ্চ-ব্রেকের সময় ও কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসে, অন্য অফিসের দু-একজন পুরনো বন্ধু আসে, গল্প করে। বাড়িতে তো সকালে খেয়ে আসে, মা দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ায়। মার কষ্ট হয়, ভালও লাগে, তাই দুপুরে হোটেলের লাঞ্চ খাওয়ার কথা মাকে বলতে পারেনি। শুধু বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করার জন্যেই আসে।

অফিসে ভাল লাগছিল না বলেই লাঞ্চ-ব্রেকের অনেক আগেই বেরিয়ে পড়েছিল। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প জমেনি, ওর কথা বলতেই ইচ্ছে করছিল না।

ফিরে আসার পর অপারেটর মেয়েটির অমায়িক কণ্ঠস্বর বললে, আপনি লাঞ্চের আগে কার ঘরে গিয়েছিলেন, খুঁজে পেলাম না।

সমীরণ বললে, বেরিয়ে গিয়েছিলাম, কেন কেউ কি খুঁজেছেন ?

সেদিনের ঘটনার কথা ও বন্ধুদের কাউকেই বলেনি, অফিসেও না। যে কোন তুচ্ছ ঘটনা ঘটলেই ও কাউকে না বলে থাকতে পারে না, অথচ এই ব্যাপারটা কাউকে বলতে ইচ্ছে করেনি। শুধু মনের মধ্যে গোপন করে রাখতে ইচ্ছে করে। যেন প্রকাশ করে ফেললেই মেয়েটির গায়ে মলিনতা লাগবে। কেউ কিছু বাজে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে ফেললে সমীবণ সহ্য করতে পারবে না।

অপারেটর মেয়েটি বললে, হ্যাঁ, বাইরের লাইন, কয়েকবারই ফোন করেছেন, দাঁড়ান দেখছি।

খটাখট অন্যাদের লাইন দিতে দিতে দু এক টুকরো কথা তাদের সঙ্গে···অপারেটর নম্বরটা বলল। হেসে বলল, নামটা ঠিক ধরতে পারিনি।

সমীরণও বুঝতে পারল না কার নম্বর হতে পারে।

তখনও সিরিভার নামিয়ে রাখেনি, অপারেটর বললে, আপনি ফিরে এলেই ওঁকে জানাতে বলেছেন। ওঁকেই জানাব, না আপনাকেই লাইনটা দিয়ে দেব ?

সমীরণের মনে হল অচেনা কেউ তারই প্রয়োজনে ফোন করেছে। যেচে নিজে থেকে ফোন করার কি দরকার। তবু বললে, কোন্ অফিস একবার দেখুন না ডিরেক্টরি এনকোয়ারিতে।

মেয়েটি খুবই ব্যস্ত, খটাখট লাইন দিচ্ছে। বললে, তার চেয়ে ওঁকেই খবর দিচ্ছি।

—তাই দিন। বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

এই ধরনের তুচ্ছ ব্যাপার অকারণ কিছু অস্বস্তি এনে নেয়। অপ্রয়োজনীয় কিছু কৌতূহল জাগিয়ে দেয়। কিন্তু এখন আর এ-সবে ওর কোন আগ্রহ নেই।

রেলিং ধরে ফ্লোটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে নিরূপা। এই ছবিটার পাশাপাশি আরও অনেকগুলো ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়।

নিরূপাকে আরেকবার দেখার খুব ইচ্ছে হয়েছিল সমীরণের। কিন্তু নিরূপা সেদিন আসেনি।

অভি পাশের ঘর থেকে ফিরে এসে লজ্জিত হাসি হেসে বলেছিল, নাঃ পারলাম না। সী ইজ ভেরি মাচ আপসেট।

সমীরণ বলে উঠেছে, থাক থাক, ওঁকে ডিস্টার্ব করে লাভ নেই।

কিন্তু ওর মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

ভেবেছিল কাউকেই বলবে না। শুধু নিরূপার বাবা প্রথমদিন হাত ধরে অনুরোধ করেছিলেন বলেই নয়। সমস্ত ঘটনাটা নিজস্ব করে রাখতে ইচ্ছে করছিল ওর। কিন্তু চিকো ওর ছোটবোন, রাখতে দিল না।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, মেয়েদের যে কত কষ্ট!

মার কথাগুলো ওর ভীষণ ভাল লেগেছ। নিরূপাকে মা দেখেনি, কোন সম্পর্ক নেই, কত মানুষের তো কত দুঃখ, অথচ একটি মেয়ের জন্যে মার বুক ঠেলে কথাগুলো ব্যথা হয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

সমীরণ আবার রিসিভার তুলল।

অপারেটরের সাড়া পেতেই বললে, জানিয়ে দিয়েছেন, সেই যে নাম্বারটা?

—এনগেজড হচ্ছে, আবার দেখছি।

সমীরণের রাগ হল। নির্ঘাত একবার চেষ্টা করেই ভুলে গিয়েছিল। কিংবা এতই ব্যস্ত সময় পায়নি।

রিসিভার নামাতে না নামাতেই ফোন বেজে উঠল। তুলতেই অপারেটর বললে, পেয়েছি, কথা বলুন।

বোধহয় পি এ ধরেছিল, সমীরণ নাম জানাতেই ও প্রান্ত থেকে কথা ভেসে এল, আমি অভিরূপ বলছি। জাস্ট টু রিমাইন্ড ইউ, একদিন আমার এখানে আসার কথা ছিল। আজ আসবেন? মিলিটারি টাট্টু দেখতে যাব, চন্দনা বলছে, আপনাকেও যেতে হবে। রাত্রে ফিরে আমাদের ওখানেই ডিনার। অতি যৎসামান্য। হাসল।

সমীরণ একটু ইতস্তত করছিল। চাপে পড়ে রাজি হতে হল।—ঠিকানাটা আছে তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইলেভেন্থ ফ্লোর, সেভেন ই। ঠিক সাড়ে ছটায়, ও কে?

সেদিন কার্ড দেখে অভি সম্পর্কে সম্ভ্রম জেগেছিল। বড় মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি এবং খুব বড় চাকরি। কিন্তু বেশ মিশুকে মনে হল, কোন স্নবারি নেই। তা ছাড়া কাগজে লিখে দেওয়া সমীরণের নাম-ঠিকানা অফিসের ফোন নম্বর ভদ্রলোক যত্ন করে রেখেছেন।

সমীরণ বলে দিল, যাবে, কিন্তু যাবার সময়ে প্রচণ্ড অস্বস্তি।

এই তল্লাটে আগে বিস্তৃত বাগানসমেত বড় বড় বাড়ি ছিল, বড় বড় চাকরি তো তখন সবই ইংরেজদের হাতে, তারাই থাকত, তাই বাড়িগুলোকে লোকে বলত সাহেববাড়ি। দু-একটা রাজা, জমিদার বা দিশি বড়লোকের বাড়িও এপাড়ায় ছিল, সেগুলো ভাঙা হলেই বিজ্ঞাপন বেরোয় 'সাহেববাড়ি ভাঙা হচ্ছে।' সেই সব জমিতেই এখন বারো তলা চোদ্দ তলা আকাশছোঁয়া বাড়ি উঠছে। এখানে এলে কলকাতার চেহারাই অন্যরকম।

কিন্তু অভির ফ্ল্যাট যে-বাড়িটায়, তার একটু বিশেষ কদর আছে, নাম শুনলেই বিস্ময় মেশানো সম্ভ্রম জাগে। চারটে বড় আকাশছোঁয়া ইউনিট নিয়ে একটা কমপ্লেক্স। গেটের ভিতরে বিস্তৃত লন, কে যেন বলেছিল, একটা সুইমিং পুলও আছে। কোম্পানি লীজে ঐ এক একটা ফ্ল্যাটের ভাড়া নাকি আড়াই হাজার তিন হাজারের বেশি। তাও আবার বর্ণাশ্রমে বাঁধা, কোনও ফ্লোর উচ্চবিত্ত বড়লোকদের, কোনও ফ্লোর মধ্যবিত্ত বড়লোকদের। অর্থাৎ কোথাও টপ ম্যানেজমেন্টের লোকেরা থাকে, কোথাও মিড্‌ল ম্যানেজাররা।

যেতে আসতে দূর থেকে এই বাড়িগুলো সমীরণ দেখেছে। সন্ধের সময় অনেক ফ্ল্যাটে আলো জ্বলে, অনেক ফ্ল্যাটে জ্বলে না। কল্পনা মেশানো এক ধরনের বিস্ময়ের দৃষ্টিতেই ওগুলো দেখে এসেছে ও, কখনও ভিতরে ঢোকেনি। দিশি পাড়ায় কিংবা ক্যামাক স্ট্রিট অঞ্চলের দু-একটা ওনারশিপ ফ্ল্যাটে গিয়েছে। সে-রকম একটা ফ্ল্যাট হলে সমীরণ এত নাভার্স বোধ করত না!

দূর থেকে বাড়িটা দেখতে পেল। সারি সারি বারান্দা, কিন্তু কোন্‌টা অভির ফ্ল্যাট এখান থেকে বোঝার উপায় নেই। অভি নিজেও হয়তো বুঝতে পারে না। মাঝামাঝি জায়গায় যারা থাকে তাদের পক্ষে তো আরও অসম্ভব। নীচে থেকে এক দুই তিন করে গুনে গিয়ে বলবে, ঐ যে সাত তলায় বাঁ দিক থেকে তৃতীয় বারান্দার পাশে জানলায় মভ কালারের পর্দা দেখছেন...অথচ এটাই স্ট্যাটাস। সমীরণের এখনই হাঁটু কাঁপছে।

অভির কাছে আসার কোন ইচ্ছেই ছিল না সমীরণের। ওর বরং ইচ্ছে করছিল আনন্দমোহনের ওখানে যেতে। কিন্তু কোন একটা অজুহাত ছাড়া ওখানে যাওয়া যায় না। দুলটা ফেরত দিয়ে আসার দিনও আনন্দমোহন 'আবার আসবেন' এ-কথা বলেননি।

অথচ স্পষ্ট করে না-দেখা নিরূপার মুখখানা দেখার খুব ইচ্ছে হয়। ঐ দুঃখের মুখখানিতে কি যেন আকর্ষণ আছে।

গেটের ভিতরে ঢুকে গিয়ে এক জায়গায় দু-তিনখানা গাড়ি পার্ক করা আছে দেখে সেখানেই গাড়িটা রাখল। এগুলো শুধু ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের গাড়ি পার্ক করার জায়গা কিনা কে জানে। এখনই কোন দারোয়ান না ছুটে আসে, 'ইধার নেহি, ইধার নেহি' বলে।

রাস্তাতেও প্রচুর গাড়ি দাঁড়িয়েছে, সোঁ সোঁ করে ভিতরের দিকেও কোথায় গাড়ি ছুটছে।

দারোয়ানকে জিগ্যেস করতেই বললে, যাঁহা সাদী হো রহা হ্যায়।

সমীরণ এতক্ষণে লক্ষ করল, একটা দিকে আলো-দিয়ে সাজানো শামিয়ানা সামনের বাড়িটার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে।

একটু এগিয়ে যেতেই ফুলপাতা দিয়ে সাজানো আলো ঝলমল প্যান্ডেল দেখা গেল, পাশের লনে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘাসে ঢাকা লন, ছোট ছোট টেবল ঘিরে চারখানা করে চেয়ার ছড়ানো। খুব মিহি সুরে সানাই বাজছে। আর রঙ-বেরঙের বিচিত্র পোশাক পরা অবাঙালী মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে শামিয়ানার নীচে।

আরেকজনকে জিগ্যেস করে বুঝল. ফুল-পাতা টুনি-বাল্‌বে সাজানো গেট দিয়েই ঢুকতে হবে।

সমীরণ বেশ অস্বস্তি নিয়ে ঢুকল। ঢুকেই পাশাপাশি সামনাসামনি চারখানা লিফ্‌ট। অটোমেটিক। ও একটায় ঢুকে বোতাম টিপল।

ইলেভেনথ ফ্লোর।

লিফ্‌টগুলো ছোট ছোট বলেই বোধহয় পাশাপাশি এতগুলো।

বেরিয়ে এসেই এদিক ওদিক তাকাল সমীরণ। লিফটের দরজাটা টেনে দিয়ে এল। ভাল করে না টেনে দিলে নীচে কেউ বোতাম টিপলে নেমে যাবে না। একবার, তখন জানত না, একটা নার্সিংহোমে গিয়ে টেনে দেয়নি, ডাক্তার এসে অজ্ঞাত সেই অপরাধীকে খুব

গালাগালি দিল ওর সামনেই। ও চুপ করে নির্দোষ সেজেছিল।

সমীরণ লিফট থেকে বেরিয়ে এসে এপাশ ওপাশ তাকাল। এক একটা ফ্লোরে কখানা করে ফ্ল্যাট কে জানে।

কোন দরজাটা অভির খুঁজে দেখার আগেই একেবারে নিঃশব্দ এই পরিবেশে একটা চাপা ফুঁপিয়ে কাঁদার ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল। কান্নাটা যেন রেডিও টি ভি-র মত কোন ভল্যুম কন্ট্রোলে বাঁধা আছে। নীচে বিয়েবাড়ির সানাই এত মিহি সুরে সেজন্যেই হয়তো। এখানে যেন পায়ের শব্দ করা যায় না, জোরে হাসা যায় না, কাঁদতে হয় তাও চাপা গলায়। কিন্তু কেন কাঁদছে ? অভির ফ্ল্যাটেই নয় তো ?

লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে এগিয়ে যেতেই দেখল একটা ফ্ল্যাটের দরজা খোলা, দরজার সামনে কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা। এই সব ফ্ল্যাটে যে-ধরনের সাজপোশাক থাকার কথা।

সেভেন ই ফ্ল্যাট কোনটা জিগ্যেস করতে গিয়েও সমীরণ থমকে দাঁড়াল।

দবজায় ঠেস দিয়ে একটি মেয়ে ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এর আগে বোধহয় অনেক কেঁদেছে। চোখ ফোলা ফোলা। সকলেরই চোখেমুখে শোকের ছায়া, কিংবা উদ্বেগ আর ব্যগ্রতা। ফুঁপিয়ে কাঁদার আওয়াজটা আসছে ঘরের ভিতর থেকে।

অভির ফ্ল্যাটই নয় তো ? না, একজনও চেনা নয়।

—এভাবে ওয়েট করার কোন মানে হয় না। খুব মোটা চেহারার, মাথাখানাও বিরাট, ভদ্রলোক যেন স্বগতোক্তি করেই বললেন, দেশটা উচ্ছন্নে গেছে, উচ্ছন্নে গেছে।

আরেকজন ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরা খুব ফর্সা আর রোগা লম্বা চেহারার ভদ্রলোক বললেন, এত বড় একটা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং, অথচ একটা ভদ্রলোক নেই।

ততক্ষণে সমীরণের চোখ পড়ল দরজার বাইরে দাঁড়ানো লোকগুলির আড়ালে খাটে শোয়ানো একটি মৃতদেহ। প্রচুর ফুলে সাজানো একটি বৃদ্ধের।

সমীরণ একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বুঝতে পারল না ওখান থেকে সরে যাওয়া উচিত, নাকি এগিয়ে গিয়ে কিছু জিগ্যেস করবে।

ট্রাউজার্স পরা কমবয়েসী ছেলেটি বললে, সবচেয়ে ছোটলোক তো দারোয়ানগুলো। বখসিস নেবার বেলায় আছে।

সমীরণ কি ভেবে একটু এগিয়ে যেতেই ছোকরাটি রুক্ষস্বরে বললে, কি চাই ?

—সেভেন ই ফ্ল্যাটটা···

ছেলেটি বিরক্তির সঙ্গে আঙুল দেখিয়ে দিল।

সমীরণ ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। সহানুভূতির স্বরে প্রশ্ন করল, কি হয়েছে ?

মোটা-চেহারা মোটা-মাথার লোকটি বললে, দেখতেই তো পাচ্ছেন।

আদ্দির পাঞ্জাবি পরা ঢ্যাঙা ফর্সা লোকটি কিন্তু সৌজন্যের গলায় বললে, কাঁধ দেবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই যে যার ঘরে খিল দিয়ে বসে আছে। দারোয়ান ব্যাটারাও বলছে ইলেভনথ ফ্লোর থেকে সিঁড়ি ভেঙে মড়া নামাতে পারবে না।

ঘাড়ে-গর্দানে চেহারার মোটা লোকটি আদ্দির পাঞ্জাবির ওপর বিরক্ত হল একটা ফালতু বাইরের লোককে এসব কথা বলা হচ্ছে বলে।

বেশ রাশভারী গলায় বললে, ওঠা বুকলু, ডেডবডি ওঠা।

বুকলু, মানে সেই প্যান্টপরা ছোকরা প্রশ্ন করল, কি লিফটেই ?

ঘাড়ে-গর্দানে বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ উঠিয়ে ধর, আমি হাঁটু দুটো ভেঙে দিচ্ছি, দিব্যি লিফটে বসিয়ে নামানো যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে দু তিনটি মেয়ে একটু উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল।

ঘাড়ে-গর্দানে ওসব মেয়েলি কান্না কেয়ার করল না। বলল, পরে খাটটা খুলে লিফটে করে নামিয়ে নিয়ে যাবি।

সমীরণ থ হয়ে গেল।

আর দাঁড়িয়ে থাকা ভাল দেখায় না বলেও ধীবে ধীরে সবে এল, সেভেন ই ফ্ল্যাটের দরজা খুঁজল।

সারা মন তখন বিষণ্ণ। দূর থেকে দেখা এই মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং ওর কল্পনায় ছিল স্বর্গরাজ্য, নাম বললে অনেকের জিভে জল আসে, পৃথিবীব সমস্ত সুখ যেন এখানে লুটোপুটি খাচ্ছে। বুকলু ছোকরাটি ঐ বৃদ্ধেরই ছেলে, নাকি ঐ আদ্দির পাঞ্জাবি ?

'সবাই যে যার ঘরে খিল দিয়ে বসে আছে' ক্ষোভের সঙ্গে মোটা লোকটি বলেছিল।

সমীরণ মনে মনে ভাবল, তাই তো থাকবার কথা। এই সব ফ্ল্যাটে যারা থাকে, দারুণ মোটা মাইনের চাকরি করে, কিংবা বড় ব্যবসাদার, কিংবা কোলিয়ারিব কমপেনসেশনের টাকা পেয়ে ফ্ল্যাট কিনেছে, তারা কি পাড়ার ছেলেদের মত কোমরে গামছা বেঁধে কাঁধ দিতে আসবে ? এই বারো তলার ওপর থেকে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে সাবধানে মড়া নামাবে এই সব ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা ? তাও কি সম্ভব। এরা তো মানুষের মত বাঁচতে চায়। মানুষেব মত বাঁচতে পেলেই কি জানোয়ারের মত মরতে হবে !

বৃদ্ধ লোকটিব শেষযাত্রার কথা ভেবে সমীবণের মন খাবাপ হয়ে গেল। এদেব বিরুদ্ধে একটু ঈর্ষা, একটু রাগ আছে। তা হলেও এরা দুঃখ পেলে আবও কষ্ট হয়।

ঐ বৃদ্ধ হয়তো সারা জীবন দুঃখকষ্টের ভেতবই কোন গলিব মধ্যে কাটিয়ে এসেছে। হয়তো ছেলেদের প্রচুর উপার্জন, কিংবা বড় চাকবি। কিংবা তাদেবই মুখ চেয়ে সারা জীবনের সঞ্চয় ঢেলে দিয়ে এই ফ্ল্যাট কিনেছিল। এখানে কেনা ফ্ল্যাটও অনেকেব আছে। সমীরণ শুনেছে।

আজকাল লোকে কেমন চটপট ওপরে উঠে যাচ্ছে। অনেকেই। কিন্তু, কোথায় ? নামাবার সময়, কিংবা নামবার সময়...

ঘাড়ে-গর্দানে রাশভারী লোকটার গলা যেন শুনতে পেল সমীবণ। 'উঠিয়ে ধর, আমি হাঁটু দুটো ভেঙে দিচ্ছি।'

কি কুৎসিত, কি কুৎসিত।

ও এখানে প্রসন্ন মন নিয়ে এসেছিল। নীচের লনে ফুলপাতা বঙিন বাল্‌বে সাজানো শামিয়ানা দেখে এসেছে। মিহি সুরের সানাই। আব এখানে এই দৃশ্য। মেয়েদেব ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠা। পাশাপাশি।

সেভেন ই ফ্ল্যাট খুঁজে পেয়ে ফ্ল্যাটের দরজা, সমীরণ নিশ্চিন্ত হল। বেল টিপল।

নিরূপাকে এখানে এসে দেখতে পাবে সমীরণ একবারও ভাবেনি।

ওকে দেখতে পেয়েই মনের তিক্ততা মুহূর্তে উবে গেল। ওর সারা মন খুশি হয়ে উঠল। প্রথমটা ও রীতিমত অবাক হয়ে গিয়েছিল।

নিরূপা চিনতে পারেনি।

সমীরণ ততক্ষণে ছিমছাম সাজানো বিশাল ড্রয়িং রুমের মধ্যে দু-পা এগিয়ে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে।

চন্দনা, অভির স্ত্রী, বোধহয় বসে ছিল। ওকে দেখে ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে এক ঝলক খুশি হয়ে বলে উঠল, আসুন, আসুন।

দামী কার্পেট মাড়িয়ে এসে ডিভানে বসল সমীরণ। একটু দূরত্ব রেখে নিরূপাও বসল শোফাটায়।

চন্দনা তখনও হাসছে।—নিরূপা তুমি ওঁকে চিনতে পারলে না? সমীরণবাবু।

নিরূপা বোধহয় জানত না সমীরণের আসার কথা আছে। অভি হয়তো ওকে বলেওনি।

নিরূপা ওকে চিনতে পারেনি বলে সমীরণ একটু আহত বোধ করেছিল। চোখে-মুখে সেটা ধরা পড়েছে।

সে জন্যেই কিনা কে জানে, অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নিরূপা মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে বললে, খুব অকৃতজ্ঞ ভাবছেন তো!

সমীরণ ওর দিকে তাকিয়ে হাসল, লজ্জা পাওয়ার হাসি।

আর তখনই বাথরুম থেকে অভি ফিটফাট হয়ে বেরিয়ে এল।এক ঝলক সুগন্ধ। স্নান করে এল।

—এসেছেন? জাস্ট আ মিনিট, আসছি, অবশ্য ইউ আর ইন বেটার কম্পানি। পাশের ঘরে ঢুকে গেল অভি।

কি চটপটে। কি স্মার্ট। রঙিন মজাদার হাওয়াই শার্টে অভিকে বেশ মানিয়েছে।

ইউ আর ইন বেটার কম্পানি। এটা হয়তো চন্দনাকে লক্ষ করেই।

সমীরণের মনে হল নিরূপার জন্যেই ওকে আসতে বলেছে অভি। হয়তো সেদিন নিরূপাকে সামনে নিয়ে আসতে পারেনি বলে অভির মনে সঙ্কোচ রয়ে গিয়েছিল। এটা তা হলে নিছক ভদ্রতা।

সমীরণ নিরূপার মুখের দিকে তাকাল, চন্দনার দিকে। তারপর ঐ বিশাল ড্রয়িংরুমের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেল। ওর মনে হল যেন একটা স্বপ্নরাজ্যে এসে পড়েছে।

নিরূপা চুপচাপ বসে রইল। মুখের ওপর থেকে দুঃখের ছাপটা দূর করার জন্যে ও যেন প্রাণপণ চেষ্টা করছে। পারছে না।

ওকে দেখে সমীরণের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এখন আবার সমীরণের মধ্যে বিষণ্ণতা নেমে এল। নিরূপার কষ্ট সমীরণও যেন অনুভব করছে। তবু ওর ইচ্ছে হল নিরূপার মুখে একটু হাসি আনার। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে দুঃখ মুছে দেবার।

একটু পরেই অভি এসে বসল। হুড়মুড় করে কথা বলতে শুরু করল।

হঠাৎ যেন মনে পড়েছে, অভি বলে উঠল, হোয়াট উড ইউ লাইক টু হ্যাভ! যাবার আগে একটু···চন্দনার দিকে তাকিয়ে রহস্যজনক ভাবে হাসল।

তার আগেই দেখেছে সাদা ধপধপে উর্দিপরা খানসামা ঘাড়পিঠ লাঠির মত সোজা রেখে কেমন বিচিত্র ভাবে হেঁটে গেল একদিকে, কিঁক করে ছোট্ট আওয়াজ হতেই সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল ওদিকে পুরোদস্তুর সেলার। খানসামা কি সব বের করছে।

সমীরণ প্রথমে বুঝতেই পারেনি। ভাবল, চা বা কফির কথা। ও বলে বসল, শুধু চা।

সঙ্গে সঙ্গে চন্দনাও হেসে উঠল। আর অভি বললে, চায়ের লিকার ছাড়া সব লিকারই এখানে পাবেন, বলুন···

সমীরণ হেসে বললে, আমি ওসব খাই না।

নিরূপা চোখ তুলে তাকাল, সমীরণের সঙ্গে চোখাচোখি হল, নিরূপা চোখ নামাল।

চন্দনা হেসে বলল, শুধু চা তাহলে? না কফি?

অভি হাসতে হাসতে বললে, আমিও আপনার মতই ছিলাম। কাঁধ ঝাঁকিযে শ্রাগ করে বললে, বাবাকে তো দেখেছেন!

তারপর হাসতে হাসতে বললে, লাইফ-স্টাইল আপনাকে বদলাতে হবেই, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো আপ। আপনি কটা স্ট্যান্ড করতে পারেন সেটাও আপনার এফিসিয়েন্সি।

চন্দনা হেসে উঠল। বললে, উনি তো ভাল ছেলে, কটা স্ট্যান্ড করা মানে কি, হয়তো জানেন না।

সমীরণ হেসে বললে, না তা অবশ্য জানি। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে দু-একবার খেয়েছি, ভাল লাগেনি।

অভি হাসল।—সবই কি ভাল লাগে, ভাল লাগিয়ে নিতে হয়। ইফ ইউ আর ইন দ্য রান।...

সমীরণ হাসতে হাসতে বলল, আমার দৌড়তে ভাল লাগে না।

নিরূপা চুপচাপ বসেছিল। প্রায় থমথমে মুখে। মাঝে মাঝে দু-একবার চোখ তুলছিল।

এবার গম্ভীর মুখখানা তুলল, সমীরণের চোখে চোখ পড়তেই দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে বললে, আপনি আমার মতই।

অভি কেমন অনুসন্ধিৎসু চোখে সমীরণের দিকে তাকাল। যেন বিশ্বাসই হল না, দৌড়তে ভাল লাগে না এমন মানুষ থাকতে পারে! ও তো জানে পৃথিবীতে দু রকমের মানুষ আছে, এক রকম যারা দৌড়তে পারে, অরেক রকম যারা দৌড়তে পারে না।

যেন নিরূপাকেই বোঝানোর জন্যে অভি বললে, পৃথিবীটাকে এই যে এত বদলে দিচ্ছে, কারা? দোজ হু আর ইন দ্য রান।

নিরূপা একটুক্ষণ চুপ করে রইল, সমীরণ উত্তর দেয় কি না। তারপর শান্ত গলায় বললে, পৃথিবী কারা বদলায়? বইয়ে তো পড়েছি তারা অন্য মানুষ।

অভি হো হো করে হেসে উঠল। বললে, দোজ ইনসাফারেব্‌ল টেক্সট বুক্‌স।

চন্দনার নির্দেশে বেয়ারা চা দিয়ে গেল। ট্রে এনে রাখল। ট্রেতে কাশ্মীরী কাজ করা টী-কোজি। চন্দনা সুন্দর নকশার টী-পট থেকে লিকার ঢেলে চা বানিয়ে দিল। চিমটে করে সুগার কিউব ধরে বললে, কটা দেব। হাসল।

চন্দনা সমীরণের দিকে তাকিয়ে বললে, আমার হাসি পাচ্ছে। বলে, স্ন্যাকসের প্লেট এগিয়ে দিল।

হাসি পাচ্ছে। সমীরণের নিজেকে বড়ো সঙ্কুচিত লাগল। ও কি নিজেও পুরনো হয়ে যাচ্ছে? পুরনো এবং প্রাচীন।

খানসামা তখন সেলারের কাছে ব্যস্ত।একটু পরেই সাজিয়ে-গুছিয়ে পানীয় সরঞ্জাম এনে রাখল, অভি আর চন্দনার সামনে গ্লাস। বোতলের নামটা দেখল সমীরণ। শিভাস রিগাল। এক চাঙড় বরফ। চন্দনার কমলকলি আঙুলে ধরা গ্লাস এবং সমীরণের ভালমানুষির প্রতি কৌতুকের হাসি।

কিন্তু সমীরণ যেন নিরূপার চোখে স্বস্তি দেখতে পাচ্ছে। ও বেশ বুঝতে পারছে দাদার এই ফ্ল্যাটের কোন কিছুই নিরূপার পছন্দ নয়। এই জীবন।

সমীরণ চায়ে চুমুক দিতে দিতে ড্রয়িংরুমের চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে গেল। কি সুন্দর করে সাজানো। এখানে ওখানে দামী কিউরিও। হাল ফ্যাশনে বানানো অ্যান্টিক ধরনের আসবাবপত্র। আধুনিক হয়েও সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা প্রাচীন ছোঁয়া আছে। কাঠের ওপর সেই আগেকার দিনের মত নকশা। আজকাল এই অ্যান্টিকের আদর আবার ফিরে আসছে। প্রাচীন হলেই তা মূল্যবান। শুধু পুরনো মূল্যবোধ ছাড়া। অ্যান্টিকের জন্যে এরা হন্যে হয়ে ঘোরে, শুধু অ্যান্টিক হয়ে যাওয়া বাবা-মার কোন দাম নেই।

সমীরণ ভাবল, আমিও তো সেকেলে হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমি মানুষ, সেইজন্যেই আমার কোন অ্যান্টিক-ভ্যালু নেই। চন্দনার হাসি পাচ্ছে।

অভি ঝট করে উঠে দাঁড়াল।—লেটাস মুভ।

মিলিটারি টাট্টু দেখতে যাবার কথা।

চন্দনা বেয়ারা-বাবুর্চিকে কি সব নির্দেশ দিল। আয়া ফিরে এল পিঙ্কিকে নিয়ে। চন্দনা গাল টিপে আদর করল। নিরূপা তার গালে গাল ঘসল।

নিরুপা বললে, আমি থাকলেই পারতাম, ও বেচারী একা থাকবে।

—আয়া তো রয়েছে। চন্দনা অবাক হয়ে বললে, তোমার জন্যেই তো যাওয়া, যা চুপচাপ থাকো···

তরতর করে বারো তলা থেকে নেমে এল ওরা লিফটে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে।

আর নীচে নেমেই সেই ডেড-বডিটা দেখতে পেল সমীরণ।

খাট ফিট করা হয়ে গেছে। হাঁটু ভাঙা ডেড-বডির পা দুটো সেই মোটা চেহারার ভদ্রলোক টিপে টিপে আবার সোজা করে দিলেন। প্রচুর ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে।

সেই ভিড়, আদ্দির পাঞ্জাবি, প্যান্টপরা ছোকরা, ফুঁপিয়ে কাঁদা মেয়েটি, এবং আরও কেউ কেউ।

ওদের সামনে দিয়েই জনকয়েক লোক খাটটা কাঁধে তুলল। সমীরণ দেখল, একটু দূরেই মড়া নিয়ে যাওয়ার কাচের গাড়িটা দাঁড়িয়ে।

লোকগুলো বোধহয় ঐ গাড়িরই।

এদিকে লনে বিয়েবাড়ি। সানাই বাজছে মিহিসুরে। লতাপাতায় সাজানো, টুনি বাল্‌বে সাজানো গেট, উজ্জ্বল মেয়েরা ঘুরছে, তার মধ্যে দিয়ে কি অনুজ্জ্বল দৈন্যে হাঁটুভাঙা বৃদ্ধের মৃতদেহটা চলে গেল।

—সব ব্যাটাই দরজায় খিল দিয়ে বসে আছে, পাছে কাঁধ দিতে হয়। ঘাড়ে-গর্দানে লোকটার কথা মনে পড়ল সমীরণের।

অভি যেতে যেতে বোধহয় চন্দনাকেই বললে, সিক্সথ ফ্লোরের ঐ রত্নাগারের মেয়ের বিয়ে।

মড়াটা যেন কোন খবরই নয়।

সমীরণের এ-জন্যেই এক একবার খারাপ লাগছিল। ভদ্র বিনয়ী এই মিশুকে মানুষটাকেও ঠিক বুঝতে পারছিল না।

মিলিটারি টাটু। ব্যান্ড বাজছে।

সমীরণ বেশ বুঝতে পারছে ওকে অভি কেন ফোন করে ডেকে এনেছে। সেদিন নিরূপা একবারও আসেনি বলে? না, অভি নিশ্চয় চাইছে নিরূপা ঐ দুঃখের পাথরটা বয়ে বেড়ানোর ক্লান্তি থেকে কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত মুক্তি পাক।

সমীরণের ইচ্ছে হচ্ছিল নিরূপা ওর দুঃখ ভুলে এই আনন্দের মধ্যে ডুবে যাক। একটা মানুষ কি সারাক্ষণ তার দুঃখ বয়ে বেড়াতে পারে!

মালখাম্বা, মশাল হাতে কসরত, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে দিয়ে মোটর বাইক চালানো, একটার পর একটা দৃশ্য। অর্কেস্ট্রা বাজছিল। খেলার পর খেলা।

দর্শকদের উল্লাস, হাততালি। সমীরণও দু-একবার হাততালি দিল। কিন্তু নিরূপা চুপচাপ।

সমীরণ দু-একবার ওকে দু-একটা কথা বলেছে। একটা চাপা ব্যথার মধ্যে থেকে যেন দু-এক টুকরো উত্তর বেরিয়ে এসেছে।

সমীরণের নিজেরও আর ঐসব দেখতে ভাল লাগছিল না। ওর কেবলই ইচ্ছে হচ্ছিল নিরূপা একটু হেসে উঠুক, একটু কথা বলুক।

ব্যান্ড বাজিয়ে টাটু শেষ হয়ে গেল। ওরা ধীরে ধীরে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে ফিরছিল যেখানে গাড়িগুলো পার্ক করা আছে সেদিকে।

একসময় ও আর নিরূপা পাশাপাশি।

হাঁটতে হাঁটতে নিরূপা খুব শান্ত গলায় বললে, আপনি বুঝি ওখানে প্রায়ই যান?

—কোথায় ?

নিরূপার কথা শুনতে ওর ভাল লাগল।

নিরূপা ধীরে ধীরে বললে, গঙ্গার ধারে, যেখান থেকে সেদিন আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

সমীরণ হেসে বললে, কালই গিয়েছিলাম। কিচ্ছু ভাল লাগছিল না…

একটু থেমে বললে, কেন জানি না, ঐ জায়গাটায় এত যেতে ইচ্ছে করল। আপনি সেদিন রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলেন তন্ময় হয়ে…

নিরূপা চোখ তুলে সমীরণের মুখের দিকে তাকাল।

সমীরণ বললে, অন্ধকারে একটা বেঞ্চে বসে ছিলেন একা একা…

নিরূপা আবার তাকাল। চোখ নামাল। আস্তে আস্তে বললে, আপনার সব মনে আছে ?

সমীরণ কোন কথা বলল না।

ওরা ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। পাশাপাশি। অভি আর চন্দনা আগে আগে।

সমীরণ বললে, কাল কিছু ভাল লাগছিল না। হাঁটতে হাঁটতে আপনার কথা ভাবতে ভাবতে ঐ অন্ধকার দিকটায় চলে গেলাম। মাঝিমাল্লারা আগুন জ্বেলে গান গাইছিল। সমীরণ হেসে উঠে বললে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ শুনলাম, কি যে ভাল লাগল। বসে পড়লাম ওখানেই।

নিরূপা চোখ তুলে তাকাল, আমাকে নিয়ে যাবেন একদিন ?

সমীরণ হাসল। বললে, ঐ রুক্ষগলার গান আপনার ভাল লাগবে না।

নিরূপা কোন কথা বলল না। চুপ করে রইল।

সমীরণের ভীষণ ভাল লাগছিল। পাশাপাশি হাঁটতে। কথা বলতে।

নিরূপা ধীরে ধীরে বললে, আমার কি যে ভাল লাগে, আর ভাল লাগে না।

যেন একটা স্বগতোক্তি।

সমীরণ যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে চলে গিয়েছিল।

নিরূপা হঠাৎ বললে, একটা উপকার করবেন ?

তারপর ম্লান হেসে নিরূপা আবার বললে, আপনি তো শুধু উপকারই করে যাচ্ছেন।

—বলুন কি করতে হবে। যেন নিরূপার কোন উপকার করতে পারলে সমীরণ কৃতার্থ হয়ে যাবে।

নিরূপা একটু ইতস্তত করল। তারপর অনুযোগের কণ্ঠে একটু বিষাদ এনে বললে, দাদার কাছে বলতে পারিনি, বৌদির কাছে বলতে পারিনি।

একটু চুপ করে থেকে বললে, এখন তো বাবা-মার কাছে যেতেও দেবে না। ওখানে গেলেই নাকি আমি মন খারাপ করব। এখানে যেন আমি সব ভুলে আছি।

হাসবার চেষ্টা করল নিরূপা।

ধীরে ধীরে বললে, একবার যান না বাবার কাছে। একবারটি খোঁজ নিয়ে আসবেন ও এসেছিল কিনা, খোঁজ নিয়েছে কিনা। হয়তো কোন চিঠি দিয়েছে…

সমীরণ বুঝতেই পারেনি, বোকার মতন বলে উঠল, কে ?

নিরূপা মাথা নিচু করল। আর সমীরণ বুঝতে পারল, অবনীর কথা বলছে নিরূপা।

সমীরণ বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা ধাক্কা খেল। ও ভেবেছিল ঐ গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাওয়ার কথায়, এই মিলিটারি টাট্টু দেখতে দেখতে নিরূপা ওর দুঃখের কথা অনেকখানি ভুলে গেছে।

সমীরণের নিজেকে খুব খুশি খুশি লাগছিল। নিরূপার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে, ওর স্নিগ্ধ গলার দু-এক টুকরো কথা শুনতে শুনতে সমীরণ যেন একটা স্বপ্নের রাজ্যে চলে

গিয়েছিল।

নিরূপার কথায় ওর সমস্ত মন আবার বিষণ্ণ হয়ে গেল।

নিরূপা সাগ্রহে ওর মুখের দিকে তাকাল। উদ্‌গ্রীব হয়ে বললে, যাবেন ?

সমীরণ শুধু ছোট্ট করে বললে, যাব।

৬

নিরূপা কাছে থাকলেও দুশ্চিন্তা, দূরে থাকলেও দুশ্চিন্তা।

অভি তাকে জোর করে নিয়ে গেছে। বলেছে, তোমাদের এখানে তো সব সময় চুপচাপ, এখানে থাকলেই ও দিনরাত ব্রুড করবে।

নিরূপাকে বলেছে, আমার ওখানে চল নিরূপা, তবু হৈ-হল্লার মধ্যে ভুলে থাকবি।

আনন্দমোহন সায় দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, সেই ভাল।

এখন ওঁরা দুজন আরও একা হয়ে গেছেন। অসিতা চুপচাপ সংসারের কাজ করে যান। আনন্দমোহন খবরের কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করেন।

কিন্তু একটা ভয় ওঁদের মনের মধ্যে রয়েই গেছে। নিরূপা আবার কখন কি করে বসে। অভির ফ্ল্যাট বারোতলায়।

অসিতা একবার বলেছেন, তুমি ওকে যেতে না দিলেই পারতে। আমার এত ভয় করে। বলেছি তো, ওকে বারান্দায় যেন যেতে না দেয়।

আনন্দমোহন বললেন, ওরা কি আর অত চোখে চোখে রাখবে।

কি যে করবেন কিছুই বুঝতে পারেন না। ঐ একটা দুঃখের আর লজ্জার জায়গা আছে বলেই একটু একটু সবাইকে দূরে সরিয়ে দিতে হচ্ছে। কেউ বুঝতে পারে না, হয়তো ভাবে ছেলের গর্বে আনন্দমোহন মানুষটাই বদলে গেছেন। কেউ কিছু খুঁটিয়ে জিগ্যেস করলে বা বেশিক্ষণ থাকলে ভয় পান সব জেনে যাবে। ভিতরের বিরক্তি থেকে ব্যবহারও খারাপ হয়ে যায়।

এরই মধ্যে একদিন সমীরণ এসেছিল। কেন এসেছিল কে জানে। বললে, নিরূপা ভালই আছে।

নিরূপার জন্যে ওর একটু দুঃখ আছে বোঝা যায়। কিন্তু এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জিগ্যেস করছিল। ওঁর ভাল লাগেনি।

জিগ্যেস করছিল, অবনী কোন খোঁজ নিয়েছে কিনা।

শুনে লজ্জায় সঙ্কোচে উনি গুটিয়ে গিয়েছিলেন। অস্বস্তি লেগেছিল।

অস্বস্তি তো রণেশ আসাতেও।

রণেশ ছেলেটা মাঝে মাঝে আসত। বেকার বাউণ্ডুলে ছেলে, ওঁদের সঙ্গে সম্পর্কটা বেশ দূরের। একটা ক্ষীণ আত্মীয়তা, এই পর্যন্ত। ছেলেটার স্বভাবের জন্যেই সেটুকুও স্বীকার করতে ইচ্ছে হয় না। ওকে সবাই গেজেট বলে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সব খবর জানা চাই তার।

নিরূপাকে যেদিন সমীরণ পৌঁছে দিয়ে গেল, তার দিন দুই পরে হঠাৎ এই রণেশ এসে হাজির হয়েছিল।

ওকে দেখেই আনন্দমোহনের সারা শরীর তিক্ততায় কঠিন হয়ে গিয়েছিল। ও যেন একটা আতঙ্ক।

অথচ এই রণেশই আগে যখন এসেছে, অসিতা বসে বসে তার সঙ্গে গল্প করেছেন। ওঁরাও তো একা-একা, লোকজন এলে তবু কথা বলতে পান। নিঃসঙ্গ বোধ করলে অপছন্দের লোককেও ভাল লাগে।

সেদিন দুপুরে হঠাৎ সেই রণেশ এসে হাজির হয়েছিল।—কি জ্যেঠিমা, কেমন আছেন আপনারা, খবর নিতে এলাম।

ওকে দেখেই ওঁরা দুজন ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে গেলেন। পাশের ঘরেই তো তখন বালিশে মুখ গুঁজে নিরূপা পড়ে আছে। ওর মুখ দেখলেই বুঝতে পারবে কিছু একটা ঘটেছে।

তবু অসিতাকে বলতে হল, আয় আয়, এ-ঘরে বোস। বলে বসার ঘরে বসালেন।

আনন্দমোহনের মুখ গম্ভীর বা বিরক্ত। ছেলেটাকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচেন। রণেশ দু-একটা কথা জিগ্যেস করছিল, আর আনন্দমোহন রুক্ষভাবে জবাব দিচ্ছিলেন। আগে কখনও এমন করেননি।

অসিতা ওকে বসিয়েই চলে গেলেন। পাশের ঘরে, নিরূপার কাছে।

নিরূপা থমথমে মুখে তখন বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। দেখে কষ্ট হয় ঠিকই। কিন্তু সে-সবের এখন সময় নয়।

একটা রাহু এসেছে বাড়িতে। খবর রাষ্ট্র করে বেড়ানোই ওর কাজ। কি দেখে কি সন্দেহ করবে। ঐ রণেশ ছেলেটাকে তখন ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল অসিতার।

অথচ আগে একা-একা লাগত বলে ওকে দেখে খুশি হয়ে উঠতেন, বসে বসে গল্প করতেন।

তাড়াতাড়ি নিরূপার কাছে ছুটে এলেন অসিতা। ফিসফিস করে বললেন, নিরূপা শোন, মুখ-চোখ ধুয়ে আয়, অমন করে থাকিস না। রণেশ এসেছে, ও এখানে যদি এসে পড়ে হেসে হেসে কথা বলবি।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অসহায় কণ্ঠে বললেন, কেন যে আসে!

নিরূপা তখন ওসব কিচ্ছু ভাবতে পারছে না। ও বলে উঠল, আমি পারছি না, পারছি না।

অসিতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তোকে যে পারতে হবে রে।

বলে সেই বসার ঘরে এসে বসলেন। ছেলেটা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে ঘুরে গল্প করে, ওকে বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখাও যাবে না। অথচ ওঁরা তো একবারও বলেননি যে নিরূপা এখানেই আছে। এখানে নেই সে কথাও বলেননি। যদি হঠাৎ উঠে ও-ঘরে যায়, বাধা দেওয়াও যাবে না।

অসিতাই শেষে বললেন, এখন যা রণেশ, ও এখন ঘুমোবে, আমারও ঘুম পাচ্ছে।

শেষে রণেশ চলে গেল। প্রায় ওর পিঠের ওপরই দরজা বন্ধ করে দিলেন অসিতা। ছেলেটা নির্ঘাত চটেছে। চটুক।

ও চলে যাওয়াতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন আনন্দমোহন। কিন্তু খারাপও লেগেছিল। এই ব্যবহারটাই তো রণেশ মনে রাখবে। জানতেও পারবে না ওঁরা কেন এভাবে ওকে তাড়িয়ে দিলেন।

এখনও আশা আছে, সব ঠিক হয়ে যাবে, সেজন্যেই তো এত গোপনতা। সেটুকু আশা যদি না থাকত সকলকে বলে ফেলতে পারতেন।

কি যে যন্ত্রণা। সেজন্যেই হয়তো অভি নিরূপাকে নিয়ে যেতে চাওয়ায় উনি সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়েছিলেন। এখন দুর্ভাবনা।

সমীরণ এসেছিল, চলে গেছে। অবনীর কথা জিগ্যেস করছিল।

ওর গলার স্বরে আন্তরিকতা ছিল, তাই অনেক কথা বলে ফেলেছেন। এমন কি অবনীর ঠিকানা, তার কোম্পানির নাম, সব। এখন মনে হচ্ছে, না বললেই ভাল হত।

একটা বাইরের লোক, উপকার করেছে ঠিকই, কিন্তু তাকে এতখানি ঘরের লোক করে নেওয়ার কি দরকার। এখন অনুশোচনা হচ্ছে।

অবশ্য অবনীর কথা, চিঠি দিয়েছে কি না, নিশ্চয় ওঁকে আঘাত দেবার জন্যে বলেনি।

অভিদের জীবনটাকে উনি স্বীকার করে নিতে পারেন না। সব যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠে নেমেছে। শখ আর শৌখিনতার জীবনই নয়, ওরা সব ব্যাপারে সকলের ওপরে পৌঁছে গিয়ে একটা কৃত্রিম জীবনকেই বেছে নিয়েছে। সেজন্যে ওঁর অভিমান। অভিরা বড়ো বেশি নিস্পৃহ। কিন্তু সেদিন রণেশকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা মনে পড়তেই ভাবলেন, আমাদের এই সমাজ, এই জীবন, এও তো শুধু লুকোচুরি খেলা। এর যে কি যন্ত্রণা। তা হলে আর এটাকেই বা এত ভাল ভাবি কেন। শুধু এই সমাজের মধ্যে মিশে আছি বলে? আসলে আমরা সমাজকে শুধরে নিতে জানি না, একটা মিথ্যের জীবন থেকে আরেকটা মিথ্যের জীবনে লাফ দিতে যাই। এক ধরনের যন্ত্রণা থেকে আরেক ধরনের যন্ত্রণা।

অভিদের বোধহয় এসব সহ্য করতে হয় না। ওদের মধ্যে অত লুকোচুরি নেই।

ওঁদের এখন নিরূপাকে নিয়েই যত কষ্ট, বুকের ভেতরটা যেন পুড়ে পুড়ে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। সুইসাইড করতে যাওয়ার পর থেকে আরও দুশ্চিন্তা।

অভিরাও তো সেই সুইসাইডের দিকেই এগোচ্ছে। আরও ওপরে উঠতে হবে, আরও ওপরে। আর স্ট্যাটাসের পিছনে দৌড়নো। এসব একজন মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, কোন্ গন্তব্যে!

আসলে অবনীকে দোষ দেবেন কি, এক একসময় ওকে তো অভিরই ছায়া মনে হয়।

বিয়ের পর কিন্তু অবনীকে ওঁদের খুব ভাল লেগেছিল। দু-তিনটে বছর তো দিব্যি সুখে কাটিয়েছে নিরূপা। তার পরই কি যে হল।

আনন্দমোহন অবশ্য জানেন না, সে দু-তিনটে বছর সত্যিই নিরূপা সুখে কাটিয়েছিল কিনা। নাকি ওঁদের কাছ থেকে সব চেপে রেখেছিল নিরূপা, কষ্ট পাবেন ভেবে।

ওঁরা শুধু অবনীর ধাপে ধাপে উন্নতির কথা শুনে খুশি হচ্ছিলেন। মানুষটাই বদলে যাচ্ছে বুঝতে পারেননি।

অসিতা একদিন নিরূপাকে বললেন, হ্যাঁ রে অবনী তো আসে না আর। একদিন আসতে বলিস।

নিরূপার মুখ যে মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তা আনন্দমোহনের চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি।

নিরূপা শুধু বলেছে, ও সময় পায় না, মা।

আনন্দমোহন ভেবেছেন হয়তো ওঁদের বিরুদ্ধেই অবনীর অভিমান।

তাই বলে উঠেছেন, আমি নিজেই গিয়ে একদিন ধরে নিয়ে আসব, দেখি কত কাজ তার।

নিরূপা বলেছে, না বাবা না, তোমাকে যেতে হবে না। আমিই বলব।

নিরূপা সেদিন চলে যাওয়ার পর আনন্দমোহন চিন্তিত মুখে অসিতার মুখের দিকে তাকিয়েছেন। বলেছেন, আমার খুব ভাল ঠেকছে না।

নিজেকে বড়ো অসহায় লেগেছে। নিরূপা আগে এখানে এলে কত হৈ-হৈ করত, আজকাল আসে, চলে যায়, কেমন চুপচাপ।

অসিতা ওঁর চোখে চোখ রাখতে পারেননি। শুধু বলেছেন, তোমার যত মিথ্যে দুর্ভাবনা। ওরা ভালই আছে, দেখলে না, কুলের আচার চেয়ে খেল।

অসিতা নিজেও যে তখন সন্দেহ করছেন, ওঁর গলার স্বরেই বোঝা গেল। স্বামী ব্যথা পাবে, দুশ্চিন্তা করবে সে-কথা ভেবেই হয়তো স্তোক দেবার চেষ্টা।

এ বড়ো বিচিত্র খেলা। অসিতা চাইছেন সব কষ্ট নিজের বুকের মধ্যে রাখবেন, আনন্দমোহন ভাবছেন, অসিতা যেন কষ্ট না পায়।

সেজন্যেই বলেছিলেন, তাই হবে, আমারই মনের ভুল। বলে হেসেছিলেন।

কিন্তু আভাসে বুঝতে পারছিলেন কোথাও কিছু একটা ঘটেছে। ঘটছে। এ এক অসহ্য যন্ত্রণা।

শেষ অবধি আর নিরূপা গোপন রাখতে পারেনি। আভাসে-ইঙ্গিতে মাঝে মাঝেই অসিতাকে জানিয়েছে। অথচ নিরূপার জ্বালা কোথায়, কি নিয়ে মনোমালিন্য কিছুই বুঝতে পারেননি।

—ওর তো আমার কোন কিছুই পছন্দ নয়, মা।

অসিতা বলে উঠেছেন, কেন রে!

নিরূপা থমথমে মুখে বলেছে সেই ঘটনার কথা। একজিবিশন থেকে একটা বিশাল মধুবনী ছবি কিনে দেওয়ালে টাঙিয়েছিল ও।

অবনী এসে সেটা দেখেই বলে উঠেছে, হরিব্‌ল্‌। বলেছে, ছবি যদি টাঙাতেই হয় একটা পিকাসো প্রিন্ট আনিয়ে দেব, দেওয়াল জুড়ে থাকবে।

চাকরটাকে ডেকে অবনী তখনই তখনই বলে উঠেছে, ছবিটা নামিয়ে দে।

ছবিটা নয়, নিরূপার সমস্ত ভাল লাগা, ওর রুচিটাকেই নামিয়ে দিয়েছে অবনী।

সে যে কি অপমান, কি আত্মগ্লানি!

অসিতা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলেছেন, কি আর করবি, মানিয়ে চলার চেষ্টা কর। ওসব ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে মন খারাপ করিস না।

ছোটাখাটো ব্যাপার! নিরূপা হেসেছে, দুঃখের হাসি। মাও বোঝে না, বোঝে না।

আনন্দমোহন শুধু অসহায়ভাবে অসিতার মুখের দিকে, নিরূপার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন।

শেষে একবার তো ও সহ্য করতে পারেনি বলে চলেই এসেছিল। অনেক দিন এখানে ছিল।

তারপর আনন্দমোহনই গিয়ে রেখে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন, ভালই আছে।

হঠাৎ তাই সেদিন সমীরণের সঙ্গে নিরূপাকে থমথমে মুখে আসতে দেখে ভয় পেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন অবনীর কাছ থেকেই চলে এসেছে।

তা নয়। নিরূপা সুইসাইড করতে গিয়েছিল।

কথাটা শুনেই মনে হয়েছিল টলে পড়বেন। মাথা ঘুরছিল। নিরূপার মৃত্যু উনি ভাবতেও পারেন না। বেঁচে থাকা মানেই তো একটা আশার খড়কুটো ধরে থাকা। ওঁরা এখনও স্বপ্ন দেখেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

নিরূপা দু-চোখ জলে ভাসিয়ে বলেছিল, আমি সুইসাইড করতে যাইনি, বাবা। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল. জলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে···

কিন্তু সেদিন কি যে ঘটেছিল কিছুই জানেন না। নিরূপা আর কিছু বলেনি।

নিরূপাকে বলেছেন, গঙ্গার ধারে কেন গিয়েছিলি, এখানে তো চলে আসতে পারতিস। তোর কোথাও যাবার না থাকলে একটা জায়গা তো আছে।

নিরূপা হয়তো ভেবেছিল বাবা-মাকে আবার কষ্ট দিয়ে কি হবে। আমি ফিরে গেলেই তো ওদের আবার কষ্ট।

অসিতা একবার বলেছিলেন, একটু মানিয়ে চলার চেষ্টা কর। কি আর করবি।

সেবার মানিয়ে চলার কথা শুনে নিরূপা বলে উঠেছিল, ওদের সমাজ, মা, অন্যরকম। আমি আর মানিয়ে চলতে পারছি না।

দুঃখে কষ্টে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল নিরূপা।

'ওদের সমাজ'। প্রথমে বুঝতেই পারেননি আনন্দমোহন। ঐ বেকার বাউন্ডুলে রণেশ ছেলেটা, সে তো আমাদেরই সমাজের। মধ্যবিত্ত মানুষ তো শাখাপ্রশাখায় সব জায়গাতেই। কেউ অভির মত, অবনীর মত, অনেক ওপরে উঠে গেছে, কেউ আনন্দমোহনের মত মাঝারি জায়গায়, আবার কেউ কেউ খুবই সাধারণ। কারও পরিচয় দিতেও লজ্জা। তবু তাদের সকলকে নিয়েই তো সমাজ। শ্রাদ্ধে, বিয়েবাড়িতে সবাই আসে। আন্তরিকতাও আছে। বিপদে-আপদে ঝাঁপিয়েও পড়ে। আবার অকারণ ঈর্ষা, অকারণ অপবাদ, সে সবও আছে। ভালমন্দ মিশিয়েই তো এই সমাজ।

ওদের সমাজ বলতে একটা আলাদা সমাজ গড়ে উঠছে নাকি! তাই হবে হয়তো। অতিরিক্ত সচ্ছলতায় ওরা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে?

নিরূপা একদিন ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল, আমি তো কালচার্ড নই। আমি ওদের সমাজে বে-মানান।

আনন্দমোহন ভাবেন, আমরা তো কালচার বলতে অন্য কিছু ভাবতাম। ন্যায়নীতির কতকগুলো শিকড় আঁকড়ে ধরে কতকগুলো সুন্দর জিনিস উপভোগ করার মনকেই কালচার বলে বুঝতাম। মাটি থেকে জন্মানো গাছের ফুল হয়ে ওঠা, ফল হয়ে ওঠা। এখন কালচার অন্য জিনিস, অন্তত এদের কাছে। শুধু টাকা ফেললেই যা কেনা যায়, নকল করলেই যা শেখা যায়।

আনন্দমোহন আর অসিতা মুখোমুখি বসেছিলেন। সমীরণ এসেছিল, চলে গেছে।

অসিতা সমীরণকে নিরূপার কথা জিগ্যেস করেছেন; অভি আর চন্দনার কথা। পিঙ্কি কেমন আছে।

ওঁর এসব সময়ে খুব খারাপ লাগে। ওঁরই ছেলের কথা, ছেলের বউ নাতনীর খবর জানতে হবে কিনা বাইরের লোকের কাছ থেকে। অথচ এই কাছেই থাকে, কত আর দূর। পোস্ট-অফিস থেকে কিংবা ওষুধের দোকান থেকে ফোন করেও খবব নেওয়া যায়। নিরূপা যাওয়ার পর একদিন করেছিলেন। অভি কেমন অসন্তুষ্ট হল। বললে, নিরূপাকে এখন ভুলে থাকতে দাও, ফোন করলেই ও তোমাদের কথা ভাববে। আবার ব্রুড করতে শুরু করবে।

ওঁর মনে হয়েছিল, যেন যেতে বারণ করছে।

ফোন করলে পিঙ্কির সঙ্গেও কথা বলা যায়, বাসে যেতেও বেশিক্ষণ লাগে না, অথচ তাদের খবর জানতে হল সমীরণের কাছ থেকে।

অসিতা মাঝে মাঝে ছেলের কাছে যান, কখনও কখনও টিফিন ক্যারিয়ারে করে নিজের হাতে রান্না করা খাবার নিয়ে।

আনন্দমোহনও কয়েকবার গিয়েছেন। চন্দনা খুব খাতির-যত্ন করে, অভি বসে বসে বাবার সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে গল্পও করেছে। তবু ভিতরে ভিতরে একটা অভিমান রয়েই গেছে। নিজেকে অবাঞ্ছিত লেগেছে। সেজন্যেই আজকাল বড়ো একটা যান না। এখন তো যাবার উপায় নেই। রেগে যাবে।

পিঙ্কিকে খুব আদর করতে ইচ্ছে করে। এখানে যেদিন আনে, কি কড়া শাসন। টফি লজেন্স বা সন্দেশটন্দেশ দিলে অভি বলে ওঠে, ওয়র্মস হবে। ওরা কৃমি বলে না।

আব্দার করে দাদুর চশমাটা পরতে চেয়েছিল পিঙ্কি, চন্দনা বলে উঠল, চোখ খারাপ হবে, চোখ খারাপ হবে।

একবারটি পরলেই চোখ খারাপ হয়ে যায় কিনা উনি কিছুই জানেন না।

অসিতা ব্লাউজে বোতাম বসাতে বসাতে বললেন, অভির এটা উচিত হয়নি।

—কোন্‌টা ?

অসিতা বললেন, ঐ ভদ্রলোককে ফোন করে ডেকে আনার কি দরকার ছিল, হাজার হোক একটা বাইরের লোক।

আনন্দমোহন সায় দিলেন। বললেন, আবার ওকে নিয়ে মিলিটারি টাট্টু দেখতে গেছে। অভির কোনদিন বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না।

অসিতা ধীরে ধীরে বললেন, অবনী যদি শোনে, কি ধরো সেও গিয়েছিল, দেখতে পেল ওদের···

আনন্দমোহন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।—ঠিকই বলেছ। ওরা তো শুধু পোশাক-পরিচ্ছদে আধুনিক।

অসিতা বললেন, অন্যায়টা তো অভির। তা ছাড়া ঐ লোকটারই বা এত আসা-যাওয়া কেন।

একটু থেমে বললেন, ওকে তোমার এত সব কথা বলা উচিত হয়নি।

আনন্দমোহনও বুঝতে পারছেন, ভুল করেছেন। তবু বললেন, ওর কথাবার্তা শুনে মনে হল যেন নিরূপার জন্যে, আমাদের জন্যে, ওরও দুঃখ, ওরও কষ্ট। বলে ফেললাম। সব আর কত বুকের মধ্যে জড়ো করে রাখি।

তারপর বললেন, ভদ্রলোক তো নিরূপাকে বাঁচিয়েছেন। সেদিন যদি নিরূপা সত্যি সত্যি কিছু করে বসত।

কিন্তু অবনী তো একদিনও খোঁজ নিতে এল না। চিঠিও দেয়নি।

সময় কোথায়। ওরা যে সব সময়ই ব্যস্ত। আনন্দমোহন ভাবলেন, আমাদের কত সময় ছিল। আত্মীয়ের বাড়িতে যেতাম, তারাও আসত। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বসে কত সময় কেটে যেত। পারিবারিক দায়িত্ব ছিল। স্কুলে তো অভিকে নিরূপাকে নিজেরাই পড়িয়েছেন। প্রাইভেট টিউটার রাখেননি। অথচ অভিদের সেসব কিছুই নেই। তাই সময় কাটাতে পারে না। ক্লাব, পার্টি, মদ—এসবই সময় কাটানোর জন্যে। কিন্তু শেষ অবধি আর সময় পায় না। সব সময়েই ব্যস্ত। আগে তখন ভাবতেন সেজন্যেই অবনী আসতে পারে না।

—তুই তো আজকাল বড়ো একটা আসিস না, মাঝে মাঝে এলে তো পারিস। অসিতা একদিন নিরূপাকে বলেছিলেন।

নিরূপা থমথমে গলায় বলেছিল, কি জানি, হয়তো একদিন একেবারেই চলে আসতে হবে।

ওঁর বুকের মধ্যে ধক্‌ করে উঠেছিল।

নিরূপা বিবর্ণ মুখে বলেছিল, এ বাড়িতে এলে তো আমি খারাপ জিনিসগুলোই শিখে যাই, যেমন বাবা-মাকে ভালবাসা।

তারপর হেসে উঠে বলেছিল, তোমরা তো আমাকে কনভেন্টে পড়াওনি, ম্যানার্স শেখাওনি। ও এখন কত ওপরে উঠে গেছে, লজ্জায় ওর মাথা কাটা যায়।

অসিতা সান্ত্বনা দেবার স্বরে বলেছেন, সে সব তো তুই শিখে নিলেই পারিস। চন্দনা তো শিখে নিয়েছে।

নিরূপার চোখে জল এসে গিয়েছিল। বলেছে, না মা, সব কিছু শিখে নেওয়া যায় না। এতকাল যা বিশ্বাস করে এসেছি সে-সব ফেলে দিয়ে শিখে নেবার মন কোথায় পাব ?

নিরূপা কেঁদে ফেলেছিল কথা বলতে বলতে।

আনন্দমোহন বুঝতে পেরেছিলেন। এরা একটা সুন্দর মূর্তি গড়ে তুলতে গিয়ে মানুষের মনটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। মূর্তি গড়ে, কিন্তু তখন আর তার মধ্যে প্রাণ থাকে না। এরাও তা হলে সেই প্রাচীন কালের মতই মেয়েদের শুধুই একটা সম্পত্তি ভাবে। তারা ইচ্ছেমত

সাজাত, উলঙ্গ করত। একালের এরাও।

কিংবা অভি বা অবনী এরাও কোন যন্ত্রের মধ্যে পড়ে গেছে। যন্ত্র হয়ে উঠছে। অবনী একবার খোঁজ নিতেও এল না। কি নৃশংস, কি হৃদয়হীন। অথচ মুখ দেখে বোঝা যাবে না। বাইরের লোক যে দেখে সেই বলে, কি ভদ্র, কি মিশুকে। একটা মানুষকে বিচার করা এত সহজ নাকি। এক একটা পরিবেশে এক একরকম চেহারা তার।

অসিতা বললেন, তুমি গিয়ে নিরূপাকে বরং নিয়ে এসো। আমার রাতে ঘুম হয় না। ওই বারোতলার বারান্দা, কখন কি করে বসে।

একটু থেমে বললেন, অভিটার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। সমীরণ-টমিরনকে সঙ্গে নিয়ে এখানে ওখানে যাচ্ছে···অবনী কখন কি অপবাদ দিয়ে বসবে!

একটা ভাঙা সম্পর্ক, অসুখী সংসার, তবু কি ভয়! আনন্দমোহন বুঝতে পারছেন না, কোন্ সমাজটা ভাল। আমাদের সেই পুরনো সমাজ, যে পদে পদে দুঃখ লুকোয়, লজ্জা লুকোয়, অপবাদের ভয় পায়—না, নিরূপার কথায় 'ওদের সমাজ', যা শিকড়হীন, স্ট্যাটাস-পাগল, যা কোন কিছুর তোয়াক্কা করে না।

অসিতা বললেন, তুমি ওকে নিয়ে এসো, তারপর আমি একবার যাব অবনীর কাছে।

আনন্দমোহন বলে উঠলেন, না না, তোমাকে যেতে হবে না, তোমাকে যেতে হবে না।

এমন ভাবে বলে উঠলেন, বাধা দিলেন, যেন অসিতা এখনই যাচ্ছিলেন অবনীর কাছে।

অসিতার মনের মধ্যে কি যেন একটা সন্দেহ উঁকি দিয়ে গেল। উনি স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজে বের করতে চাইলেন। বুঝতে পারলেন না। আনন্দমোহন কি কিছু লুকোতে চাইছেন!

ছেলেটা খুবই ব্রাইট। অভি বলেছিল। খবরের কাগজের ভাষায় উচ্চশিক্ষিত। অথচ সরল একটা মেয়ের জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে কি নির্দয় ভাবে, নৃশংস ভাবে।

আনন্দমোহন বললেন, আমিই যাব, আমিই যাব। তোমাকে যেতে হবে না।

৭

নিরূপা একটা আশ্রয় খুঁজছিল। হয়তো অনেকদিন থেকে খুঁজছে, ও নিজেও তা জানত না। মানুষকে তার দুঃখ একা-একাই বইতে হয়, তার লজ্জা একা-একাই গোপন রাখতে হয়। সেজন্যেই আরও অসহ্য লাগত নিরূপার।

সমীরণকে ওর মনে হচ্ছে একটা আশ্রয়।

ওর জীবনে যা-কিছু ঘটে চলেছিল, একটু একটু করে অবনী বদলে যাচ্ছিল, সরে যাচ্ছিল, সে-সব কথা, দুঃখের কথা বাবা-মাকে সব বলতে পারেনি। দাদা-বৌদিকে বলতে পারেনি। শেষ অবধি কতটুকুই বা বলতে পেরেছে।

বাবা-মা কষ্ট পাবে বলেই কি জানাতে চায়নি, নাকি নিজেরই লজ্জা। ও নিজেও বুঝতে পারে না! তবু বাবামা সবই বুঝতে পেরেছে। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে মার মুখের দিকে তাকিয়ে ও বুঝতে পেরেছে ওদের সুখ-শান্তি ও কেড়ে নিয়েছে।

সমীরণকে সেজন্যেই মনে হয়েছে একটা আশ্রয়। ওর কাছে সব কথা বলা যায়। কিছুই গোপন করার প্রয়োজন হয় না। ওর কাছে যে-কোন অনুরোধ করা যায়। নিরূপা দেখতে পেয়েছে সমীরণের ভিতরে একটা সত্যিকারের মানুষ আছে।

—গিয়েছিলেন? খবর পেলেন কিছু? নিরূপার গলার স্বর কেঁপে গিয়েছিল। ও যেন উদগ্রীব হয়ে ছিল শুধু এই ছোট্ট খবরটুকু জানার জন্যে।

সমীরণ অস্বস্তি বোধ করল। অপ্রিয় কথাটা বলতে হবে বলেই মাথা নামাল, নিরূপার

মুখের দিকে তাকাতে পারল না।

ও শুধু মাথা নেড়ে জানাল, না।

নিরূপা যেন হঠাৎ নিশ্চিন্ত বোধ করল। ভাবল সমীরণ যায়নি।

কিন্তু একটু চুপ করে থেকেই সমীরণ বললে, গিয়েছিলাম।

ওর গলার স্বর ভারি হয়ে এল। সমীরণের বুকের ভিতর থেকে একটা চাপা কষ্ট যেন ছিটকে বেরিয়ে এল। বললে, না, আসেনি, খোঁজ নেয়নি।

নিরূপা অপমানে চোখ নামাল। চোখ তুলল। বললে, শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট দিলাম।

সমীরণ কোন কথা বলল না। হয়তো কিছু বলত, তার আগেই চন্দনাকে দেখতে পেল।

বেয়ারা চায়ের ট্রে নামিয়ে রাখতেই চন্দনা হেসে সমীরণের দিকে তাকাল, এগিয়ে এল, আর সেটিতে বসে টী-পটের চা ঢেলে দিল। টী-সেটটা দারুণ সুন্দর।

চন্দনা হাসতে হাসতে বললে, ভাগ্যিস বেরোইনি কোথাও, এসে ফিরে যেতেন।

একটু কৌতুকের হাসি ঠোঁটের গোড়ায় লিপস্টিকের মত লাগিয়ে নিয়ে বললে, আপনাকে মিস্ করতাম, কি খারাপ যে লাগত। একবার তো রিং করে জানিয়ে দেবেন! বলে সমীরণের চোখে চোখ রেখে হাসল।

নিরূপার খারাপ লাগল। এভাবে সমীরণকে বারবার বুঝিয়ে দেওয়ার কি দরকার, যে এ-সব বাড়িতে হুটহাট করে চলে আসা রীতি নয়। ইচ্ছে হলেই বা মনে পড়লেই কেউ চলে আসে না। ফোন করে জেনে নেয় আসা চলবে কি-না, আপনার কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কিনা।

বৌদির এই ফ্লার্ট-ফ্লার্ট হাসি সমপর্যায়ের সঙ্গে, একটু নিচুস্তরের মানুষের কাছে রানী-রানী ভাব, তলার লোকদের কাছে রাশভারি দেবীমূর্তি, এত অভিনয় নিরূপা পারে না বলেই তো যত বিপত্তি। পারে না, ভালও লাগে না। ও যেমন, ও তেমনি থাকতে চেয়েছিল। ওর নিজস্ব একটা রুচি আছে। একটা আন্তরিক ভদ্রতাবোধ ওর স্বভাবে, অদ্ভুত একটা সারল্য। এসব কথা তো ও অনেকের কাছে শুনেছে। কলেজের বন্ধুদের বাড়িতে, আত্মীয়স্বজনের কেউ কেউ ওর কত প্রশংসা করত। জন্মের পর থেকে এ-সব আপনা থেকেই গড়ে উঠেছিল। অবশ্য সত্যি সত্যি ওর এই সব গুণ আছে কিনা ও জানে না।

অবনীও প্রথম প্রথম ওর গুণে মুগ্ধ ছিল।

তারপর হঠাৎ অবনী পাল্টে যেতে লাগল। ওর মনে হতে লাগল, অবনী চায়, নিরূপার যা-কিছু স্বাভাবিক, যা-কিছু সরলসুন্দর তা বিসর্জন দিয়ে ওকে একটা কৃত্রিম মানুষ হয়ে উঠতে হবে।

ওর শাড়ির রঙ কিংবা নক্শা কত লোক প্রশংসা করেছে, ওদের কলেজে কত মেয়ে তো ওকে অনুকরণ করত। অবনী ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কোন্ এক অদৃশ্য জগৎ যেন শাড়ির রঙটাও নির্দেশ করে দিতে চায়, ওর হাঁটার ছন্দ, ওর ঠোঁটের হাসি। কথা বলার সময় প্রতিটি বাক্য ওর নিজের হলে চলবে না, গলার আওয়াজ সব সময়ে নির্দিষ্ট খাদে বাঁধা। সব সময়ে সকলের মত হতে হবে। অর্থাৎ ওদের ঐ ছোট্ট গণ্ডির সকলের মত। অন্যরকম হলেই নাকি আড়ালে অবনীকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হবে! আশ্চর্য, একটা কৃত্রিম গন্ডি, কিন্তু সকলেই তো তাই করে, সকলের মত হতে চায়।

যেন কোথাও একটা অদৃশ্য নির্দেশ আছে। কেউ ব্যক্তি হয়ে থাকতে পাবে না, সকলকেই একটা বানানো ব্যক্তিত্ব হতে হবে।

একা নিরূপা চেষ্টা করেও পারেনি, ভিতরে ভিতরে ছটফট করেছে।

অথচ অবনীকে ও সুখী করতে চেয়েছিল, নিজে সুখী হতে চেয়েছিল। অবনীর মত ওর অত অ্যাম্বিশন ছিল না। মোটামুটি একটা স্বচ্ছন্দ জীবন পেলেই ও খুশি হত। সেজন্যেই

তো অবনীকে ভালবেসে ফেলেছিল। সেজন্যেই তো এত কষ্ট।

বিয়ের পর, তখনও সেই প্রথম মুগ্ধতা কাটেনি, অবনী বললে, আমার অনেক স্বপ্ন, জানো রূপা, আমি অনেক স্বপ্ন দেখি।

অবনীর চোখে চোখ রেখে নিরূপা মুগ্ধ হল। ও নিজেও তো স্বপ্ন দেখে। শুনতে ইচ্ছে হল সেই স্বপ্ন নিরূপাকে নিয়েই কি না।

কৌতুকের হাসি হেসে বললে, কাকে নিয়ে দ্যাখো সে স্বপ্ন।

কিন্তু অবনীর মুখে তখন আর হাসি নেই, দৃঢ়তা। বললে, একটাই স্বপ্ন আমার। আই মাস্ট গো আপ্। একেবারে সকলের ওপর। দ্য স্কাই ইজ দ্য লিমিট।

এখন ভাবলে হাসি পায় নিরূপার। সেদিন কিন্তু ও খুশি হয়েছিল। ভেবেছিল, সত্যি তো, পুরুষের কাজ তো ঐ একটাই, সকলের ওপরে ওঠা। তাতে নিরূপারও গর্ব। এখন বোঝে, কি হাস্যকর। বাবা বলেন, সবাই ঘোড়দৌড়ের মাঠে নেমেছে। সবাই প্রথম হবে।

'আই মাস্ট গো আপ্, দ্য স্কাই ইজ দ্য লিমিট।' কি কথা। যত ওপরেই ওঠো, তারও ওপরে কেউ আছে, থাকবে। তুমি কত বড় হতে পারো? একটা ছোট্ট জিনিস মুহূর্তে তোমাকে নীচে নামিয়ে দিতে পারে। তুমি জানো না সেটা কোনদিক থেকে আসবে, কখন আসবে! কথাগুলো বাবার কাছেই শুনেছে নিরূপা। কেন বলেছিল মনে নেই। নিরূপার জন্যেই কি? বাবা যখন চাকরি করত, রিটায়ার করেনি, তখন বাবাকে ওরা অনেক বড় ভাবত। নিরূপার জন্যেই কি বাবার কাছে সব কিছু অর্থহীন হয়ে গেছে।

অবনী বলেছিল, আমার বাবা জজ কোর্টের সামান্য উকিল ছিলেন, প্রথম জীবনে দেশপ্রেম দেখাতে গেছেন, তাই কিছুই বিশেষ কবতে পারেননি।তাই আমাকে এত নীচে থেকে শুরু করতে হল। আই মাস্ট টেক মাই রিভেঞ্জ, হ্যাঁ, সমাজেব ওপর। আমি অফিসে একেবারে সকলের ওপরে গিয়ে পৌঁছতে চাই। এবং আমি তা পারব।

নিরূপার এখন মনে হয় অবনীর মধ্যে কোথাও একটা ক্ষুদ্রতা লুকিয়ে আছে। সম্মানের পৃথিবীতে ও বোধ হয় কোনওদিন তাচ্ছিল্য পেয়েছিল। এখন সেটারই শোধ নিতে চাইছে।

একদিন নিরূপা হাসতে হাসতে বলেছিল, এত বড় হয়ে কি হবে? এখন তো আমাদের খুব একটা অভাব নেই।

অবনী চুপ করে রইল, যেন গোপন একটা ব্যথা লুকোচ্ছে।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, তুমি বুঝবে না, আমাদের চাওয়ার ওপর কিছু নির্ভর কবে না। আমরা এমন একটা গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছি, যাকে ব্রেক কষে থামানো যায় না। থামা মানেই পিছিয়ে পড়া।

অবনীর মুখে একটা ব্যথার ছায়া দেখল নিরূপা।

একটা দৃশ্য ওর মনে পড়ে গেল।

দাদার কাছে একদিন বেড়াতে গেছে। সাততলার কোন্ ফ্ল্যাটের অবাঙালী মা আর মেয়ে এসেছে বৌদির কাছে, গল্প করছে। বাচ্চা মেয়েটার পোশাক পরিচ্ছদ কি বিচ্ছিরি। বছর পনেরো বয়েস, একটুখানি একটা টাইট ইজের, ওপরে খাটো শার্ট কোমর অবধি, তাও একটা বোতাম খোলা। লম্বা ডিভানে চিত হয়ে শুয়ে ম্যাগাজিনের ছবি দেখছিল, একটা হাঁটুর ওপর আরেকটা পা রেখে। বেয়ারা-বাবুর্চি যাতায়াত করছে, কোন কেয়ার নেই।

সেই সাততলার ভদ্রমহিলা খুব ধূর্ত ভাবে স্বামীর গর্ব করছিল।

ওরা চলে যাবার পর বৌদি হাসতে হাসতে নিরূপাকে বললে, জানো নিরূপা, ওদের ঘরের কার্পেট কিন্তু কোম্পানির দেওয়া নয়। নিজেরা কিনেছে হায়ার পার্চেজে।

হাসতে হাসতে বৌদি বলেছে, ওদের বস্ তো তোমার দাদার বন্ধু...

—ওদের বস্ বলছ কেন! নিরূপা অনুযোগ করেছে, ওর স্বামীর বস্ বলো।

বৌদি বলেছে, ঐ একই। কিন্তু কফি ব্রেকের সময় ওর স্বামীকে ট্রেতে করে কফি দেয় না, তা জানো।

নিরূপা বুঝতেই পারেনি।

বৌদি হেসে বলেছে, ওরা তো সব মিড্‌ল ম্যানেজার, ওদের শুধু কাপে করে দেয়।

নিরূপা বিশ্বাস করেনি। দাদাকে জিজ্ঞেস করেছিল দাদা, সত্যি ? ওর কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই উদ্ভট মনে হয়েছিল।

অভি হেসে বলেছে, ওটার জন্যেই তো সকলে দৌড়োয়। অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড পড়িসনি ? সেই যে গাধাটার মাথার সঙ্গে লাঠি বেঁধে তার চোখের সামনে একটা গাজর ঝুলিয়ে দিয়েছে, আর গাধাটা পই পই করে দৌড়োচ্ছে, ভাবছে গাজরটাকে খেতে পাবে। আমরা সেজন্যেই তো দৌড়োই।

নিরূপা হেসে বলে উঠল, গাজর না মুলো ?

বৌদি হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

সেদিনের সেই কথাগুলো মনে পড়তে অবনীর ওপর নিরূপার মায়া হল। ও বেচারিও হয়তো ঐ জালের মধ্যে আটকে গেছে। ওর এখন আর বাইরে বেরিয়ে আসার উপায় নেই।

সে জন্যেই হয়তো ও সকলের ওপরে উঠতে চায়। জানে না, এর কোন শেষ নেই।

বাবা তো বলে, সব শেষ পর্যন্ত থলি হাতে বাজার করবে রে। আই সি এস, নদীয়ার ডি· এম· ছিল, নিজের চোখে দেখেছি।

তা জানে না নিরূপা। ও ভবিষ্যৎ দেখতে চায় না।

কিন্তু এদের নিজের ভাল লাগা মন্দ লাগা নেই, নিজস্ব রুচি নেই, সব ধার করা। আনন্দ কাকে বলে জানে না, সুখ কোথায় খুঁজে বেড়ায়। ভালবাসা ? কি জানি। নিরূপা মনে মনে ভাবল।

এভাবে কি সমাজের ওপর শোধ নেওয়া যায়। এও তো এক ধরনের সুইসাইড।

সেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তটা মনে পড়লেই নিরূপার এখন হাসি পায়। লজ্জা হয়। এখন বুঝতে পারছে জীবনটাকে কত ভালবাসে। সব দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও।

সেদিন যখন সমীরণ এবং আরো কে কে ওকে টেনে ধরে বাঁচাল, ওর কিছুই মনে নেই, কারও মুখ দেখেনি, শুধু মনে আছে ও ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল, আরেকটু হলেই ও মরে যেত এই কথা ভেবে। মৃত্যু আরও ভয়ঙ্কর। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে বুঝতে পেরেছিল। এখন হাসি পায়, লজ্জা হয়।

এই সুইসাইডের পথে এগিয়ে যেতে যেতে অবনীরও কি একদিন হাসি পাবে না, লজ্জা হবে না। নিরূপা তো সেই প্রার্থনাই করে। সেই একটাই স্বপ্ন, একটাই আশা।

অবনী একদিন বলেছিল, একটাই উদ্দেশ্য, কিছু টাকা জমিয়ে ফেলতে হবে, তারপর স্টেটস। একটা দামী ডিগ্রি নিয়ে আসব, আরও ওপরে উঠব, আরও। আই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ মাই লাইফ।

একটু থেমে বলেছিল, তোমার দাদার মত জায়গায় পৌঁছতে পারলেই আমি খুশি হব না।

নিরূপা বিস্মিত না হয়ে পারেনি। অবনীর এই প্রতিযোগিতা কার সঙ্গে ও বুঝতেই পারে না। পৃথিবীর বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, নাকি ও যেখানে পৌঁছতে চায়, যাদের কাছে পৌঁছতে চায় তাদেরই বিরুদ্ধে ?

ওসব তো অবনীর বাইরের জগৎ, তা নিয়ে নিরূপার কোন আক্ষেপ ছিল না। স্বামী অনেক ওপরে উঠলে, বড় হলে, সে তো খুব গর্বের কথা। কিন্তু মানুষটা বদলে যায় কি

করে ? ভালবাসা বদলে যায় কি করে ?

অবনী তো ওকে ভালবাসত। সে তো মিথ্যে নয়, মিথ্যে হতে পারে না।

একবার মনে আছে ওরা দুজনে দার্জিলিং গিয়েছিল। বিয়ের তারিখটা নিরূপার নিজেরই মনে ছিল না। প্রথম প্রথম মনে থাকত, ভাবত ঐ দিনটার মধ্যে একটা রোমাঞ্চ লুকিয়ে আছে। তারপর একটু একটু করে ওদের দুজনের মধ্যে একটা অদৃশ্য দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছিল বলেই তারিখটা ভুলে গিয়েছিল।

সে এক অদ্ভুত সম্পর্কের দিন গেছে নিরূপার। বাইরে একটা খুশির ভাব, ভিতরে চাপা কান্না। জীবন একঘেয়ে কিংবা উদ্দেশ্যহীন।

অবনীর ব্যবহারে কোন ত্রুটি ছিল না। কোন পক্ষেই কোন মান-অভিমান ছিল না। অবনী হাসত, কথা বলত, তার অফিস কিংবা পার্টি বা কারও বাড়িতে নিমন্ত্রণরক্ষা, চোখ বড় বড় করে মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিরূপার সাজানো শরীরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছে, রূপা, তোমাকে কি অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে আজ। নিরূপাও নিত্যদিনের কাজকর্ম করে গেছে, অবনীকে চায়ের কাপ এগিয়ে দেওয়া, অবনীর নাক-উঁচু বন্ধুদের সঙ্গে বসে গল্প করা, দু-একটা রসিকতা, উচ্ছল হাসি, রাত্রির ঘনিষ্ঠতা সবই ছিল। অথচ নিরূপা বুঝতে পারছিল কি যেন নেই। কোথায় যেন ওরা পরস্পর থেকে সরে যাচ্ছে।

অবনী হাসতে হাসতে সেদিন বলেছিল, নেক্সট উইকে একটা তারিখ খুব ইম্পর্ট্যান্ট। ষোল তারিখ, সিক্সটিন্থ।

নিরূপা ভেবেছে অফিসের জরুরী কাজ। তাই বলেছে, ঠিক আছে, মনে পড়িয়ে দেব। তারপর হাসতে হাসতে বলেছে, আমি কি তোমার পি এ, না প্রাইভেট সেক্রেটারি ?

অফিসের কোন জরুরী কাজটাজ থাকলে নিরূপা এভাবে আগেও মনে পড়িয়ে দিয়েছে, বা অবনী মনে পড়িয়ে দিতে বলেছে।

তাই নিরূপা না বুঝেই দুদিন আগে বলেছে, পরশু ষোল তারিখ, তোমার অফিসের কি যেন কাজ আছে।

অবনী হেসে উঠে বলেছে, আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি পরশু দিন, ভুলে গেছ ? বলে, পকেট থেকে দুখানা টিকিট বের করে দিয়েছে, দার্জিলিঙের টিকিট।

দার্জিলিঙের সেই দিন কটি ওর কাছে স্মৃতি হয়ে আছে আজও।

সেই ম্যালে বেড়ানো, ল্যান্ড রোভারে নেপাল বর্ডারে চলে যাওয়া, হোটেলের ঘরে মুখোমুখি একাত্ম হওয়া। কি আনন্দে কেটেছিল দিনগুলো। সবই কি মিথ্যে ?

সমীরণ আসতেই নিরূপা সেজন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। বৌদি কি কাজে উঠে গেল। আর সেই ফাঁকে নিরূপা জিগ্যেস করল, গিয়েছিলেন ?

আশায় আশায় ছিল নিরূপা। ও এভাবে না বলে কয়ে অবনীর কাছ থেকে চলে এসেছে। অবনীর নিশ্চয় খুব উৎকণ্ঠা হবে, অনুশোচনা হবে। হয়তো লজ্জায় প্রথম কয়েকটা দিন খোঁজ নিতে আসতে পারেনি। ইতিমধ্যে নিশ্চয় এসেছিল। কিংবা চিঠি লিখেছে।

মনের মধ্যে যে একটা প্রচণ্ড রাগ আর অভিমান ছিল, তখন চাপা পড়ে গেছে। অপমানটা ও কিছুতেই ভুলতে পারবে না, তবু অবনী এলেই যেন সব ক্ষমা করে দেবে।

ভুল, ভুল।

সমীরণ মাথা নিচু করে মাথা নাড়ল। না। আসেনি, খোঁজ নেয়নি।

নিরূপার চোখ ছাপিয়ে জল এসে পড়ত, তার আগেই বেয়ারার পিছন পিছন বৌদি এসে পড়ল।

একটু পরেই অভি ফিরল অফিস থেকে, সঙ্গে বোধহয় অফিসেরই কেউ।

সমীরণকে দেখে অভি প্রথম অবাক হল, তারপর হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা। নিরূপা কিন্তু বুঝতে পারল দাদা অখুশি হয়েছে, শুধু আগে ফোন না করে আসার জন্যে।

পরিচয়পর্ব শেষ হতেই অভি হাসতে হাসতে বললে, নিরূপা, তোরা একটু ও-ঘরে বসবি যা, আমাদের একটা জরুরী ডিসকাশন আছে।

সমীরণও বোধহয় অস্বস্তি বোধ করল। নিরূপা তাকে ডেকে নিয়ে গেল বারান্দার পাশের স্টাডিতে। সামনের বারান্দা থেকে ছাদের কলকাতা দেখা যায়। সমীরণ তাকিয়ে রইল, মুগ্ধ হল। গাছ, গড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। যেন একজিবিশনে দেখানো কলকাতার মডেল। এত ছোট ছোট।

একটা রেকর্ড চাপাল নিরূপা, মৃদু সুরে গান। বৌদি দাদাদের কাছেই ড্রয়িংরুমে বসে আছে। ওটাই ভদ্রতা। অতএব নিরূপা এখন নিশ্চিন্ত। রেকর্ডটা বাজিয়ে দিয়েছে, ওর আর সমীরণের কথা যাতে কারও কানে না যায়।

ও এখন একটা আশ্রয় পেয়েছে। সমীরণ। তার কাছে সব কথা বলা যায়। ও আর একা-একা দুঃখ সইতে পারছে না।

ড্রয়িংরুমে হাসি, কথা, বৌদির গলাও শোনা যাচ্ছে।

দাদা ওদের সরিয়ে দিল, সে কি সত্যি কোন ডিসকাশন আছে বলে, না কি সমীরণ বা নিরূপাকে ঐ খাতিরের লোকটার সামনে আনতে চায়নি বলে।

—সত্যি, আমার এত খারাপ লাগছে। আসেননি, চিঠিও দেননি। সমীরণ বলল।

নিরূপা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললে. আমি জানতাম। অদ্ভুত হেসে উঠল নিরূপা।

একটু থেমে বললে, আমি শুধু সেটুকুই জানতে চাইছিলাম।

যেন একটা গভীর নিশ্বাস টেনে নিল। তারপর বললে, বিশ্বাস করুন, এখন আর আমার কোন কষ্ট নেই।

সমীরণ কিছু বুঝতে পারল না।

প্রথম প্রথম অবনীর সঙ্গে নিরূপাও কত আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যেত, তারাও আসত। অবনীর বন্ধুরা। দিনে দিনে বন্ধুর গোষ্ঠী বদল হল। তারাও বোধহয় সঙ্কোচ বোধ করত, কিংবা আন্তরিকতার অভাব। দাদা অনেক উঁচুতে উঠে গেছে, অবনী উঠছে। গাছের মত। আলো-বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে এখন কুড়ুল হাতে শিকড়টাকেই কেটে ফেলতে চায়। সাকসেশফুল মানুষ ছাড়া এখন ওরা আর কারও সঙ্গে মিশতে পারে না। মধ্যবিত্ত মানুষ সম্পর্কে এদের কি অসীম তাচ্ছিল্য। দুদিন আগে অবনীও তাই ছিল, দাদা সেখান থেকেই এসেছে। অবনীর আত্মীয়স্বজনরা কেউ ছোটখাটো চাকরি করে, কাবও সামান্য ব্যবসা, কেউ বড়োজোর ব্যাঙ্কে বা ইনসিওরেন্সে। ওর এক খুড়তুতো ভাই বিজন স্কুলে পড়ায়। এদের সঙ্গে একসময় অবনী কত আগ্রহ নিয়ে কথা বলত, আপন মনে করত। একে একে এরা সবাই ছেড়ে গেছে। বিজনকে তো রীতিমত বুঝিয়ে দিয়েছে এ-বাড়িতে তুমি এস না। সমাজটাকে বদলানো যায় না বলে এরা নিজেরাই একটা সমাজ গড়ে নিয়েছে, বাবা আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন। সমাজ একসময় ধর্ম দিয়ে সংস্কার দিয়ে মানুষকে বাঁধতে চেয়েছিল, এরা এখন বাঁধছে টাকা দিয়ে। কিন্তু সমাজের চেয়ে মানুষটাই যে বড় এ-কথা কারও মনে থাকছে না।

অবনীরা সবাই বদলে যাচ্ছে।

এরা একসঙ্গে প্যান্টের বেড় বাড়ায় আর কমায়, একভাবে হাঁটে চলে কথা বলে, হাসিটাও। এক ছকে বাঁধা জীবন। ব্যক্তিত্ব মনে করে ওরা যেটাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে,

জানে না, সেটা ব্যক্তিত্ব হারানো একটা মানুষের ছবি। জানে না, যেগুলোকে ওদের চোখের সামনে লোভনীয় করে তুলে ধরছে কোন অদৃশ্য ষড়যন্ত্র, সেগুলোই ওদের ব্যক্তিত্ব কেড়ে নিচ্ছে।

কত যত্ন আর চেষ্টায় এই সংসারটা সুন্দর করে গুছিয়ে তুলছিল নিরূপা। যে এসেছে সেই দেখে প্রশংসা করেছে। বলেছে, রুচি আছে। কলেজের বন্ধু সুদেষ্ণা, ওর স্বামী চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, প্রচুর রোজগার, বেড়াতে এসে বলেছে তোর হাতের ছোঁয়া লেগে সামান্য জিনিসও কত সুন্দর হয়ে ওঠে নিরূপা।

অবনী সে-কথা শুনে খুশি হয়েছে। গর্ব করে বলেছে বন্ধুদের কাছে। সেই বিছানার চাদরটা, কত খুঁজে খুঁজে কিনেছিল নিরূপা, কি মিষ্টি হাল্কা রঙ, মির্জাপুর গুহাচিত্রের শিকার দৃশ্য ছাপা। সবাই জিগ্যেস করেছে কোথায় কিনেছিস, কোথায় কিনেছিস!

তখন অবনী কত সহজ ছিল, কত স্বাভাবিক।

তারপরেই তো ওর সেই ওপরে ওঠার নেশা ধরল।

অবনী অফিস থেকে একটা ভাল ফ্ল্যাট পেল। একটু বড় ফ্ল্যাট।

নিরূপা খুশি হয়ে বলেছিল, এবার একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকা যাবে। দেখো, ফ্ল্যাটটা কি সুন্দর করে সাজাব আমি।

একটা মানুষ নিজেকে যতখানি বদলাতে পারে, নিরূপা নিজেকেও তো ততখানি বদলে ফেলেছে ততদিনে।

কিন্তু অবনী কেমন অধৈর্যের মত বলে উঠল, না না, ওসব তোমার কাজ নয়, ইনটিরিয়র ডেকরেটরকে দিয়ে সব ব্যবস্থা হবে···তা ছাড়া এসব খাট-আলমারি ওখানে মানাবেও না।

—মানাবে না? নিরূপা অবাক হয়ে গিয়েছিল। একটু থেমে রসিকতার সুরে বলেছিল, তা হলে তো আমাকেও মানাবে না।

অবনী সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিল, আমার চাকরির সঙ্গে ফ্ল্যাটের সঙ্গে আমাদের নিজেদেরকেই মানিয়ে নিতে হবে। আমি তো পারছি, তুমিই বা পারবে না কেন?

এ এক অদ্ভুত যুক্তি, ফ্ল্যাট বদলাতে হবে বলে নিজেদেরকেই বদলে ফেলতে হবে।

এই খাট আলমারি ফেলে দেব? এগুলো তো বিয়েতে বাবা দিয়েছিল! নিরূপা বিষণ্ণ গলায় বললে।

আর অবনী রূঢ় ভাবে বলেছিল, এসব ওখানে মানায় নাকি?

সত্যি। এখন তো অবনী অনেক দামী জিনিস কিনতে পারে, একেবারে হাল ফ্যাশনের। কিন্তু এগুলোর সঙ্গে যে অনেক সুখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। নিরূপা ভুলবে কেমন করে। ওর নিজের সুখ, বাবা-মার স্মৃতি। নিরূপা জানে বাবা কত ভালবাসা দিয়ে এগুলো কিনেছিল।

কিন্তু তার চেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছিল নিরূপা ওই নতুন ফ্ল্যাটে গিয়ে। মনে হয়েছিল ঐ সংসারটা যেন ওর নয়। অন্যের গোছানো সংসারে ও দু-দিনের জন্যে অতিথি। একটা সুন্দর সাজানো হোটেলের মত।

অবনী বলেছিল, 'শোভন'কে অর্ডার দিয়েছি, ওরাই এখন সবচেয়ে এক্সপেনসিভ। দেখবে ফ্ল্যাটের চেহারাই ওরা বদলে দেবে।

দিয়েছিল। কিন্তু সে যেন নিরূপার সংসার নয়। অন্য কারও।

নিরূপা নির্জীব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। ভাড়াটে রুচিমান লোকেরা ওর ঘরের চেহারা বদলে দিচ্ছে।

ও সামান্য কি একটা নির্দেশ দিতে গিয়েছিল। রুক্ষভাবে অবনী ওদের সামনেই বলে উঠেছে, না, না ওঁরা যা করছেন করতে দাও।

মানুষগুলো তো অনেক আগেই দূরের হয়ে গিয়েছিল, ফ্ল্যাটখানাও সরে গেল কাছ থেকে। চারপাশে শুধু একটা দুঃসহ একাকিত্ব।

তবু এই এত সব কাণ্ডের পরেও নিরূপা সেই অবনীর জন্যেই কষ্ট পায়। কেন ও নিজেই বুঝতে পারে না।

নাকি ওটা শুধু ওর একটা ধারণা।

সমীরণ ধীরে ধীরে বললে, আপনি নিজেই ফিরে যান। হয়তো লজ্জায় সঙ্কোচে আসতে পারেননি অবনীবাবু।

নিরূপা কেঁদে ফেলল।—জানেন, এর আগেও একবার চলে এসেছিলাম। ওর কিচ্ছু কষ্ট হয়নি।

নিরূপা চোখ মুছল।—আমার কি দুঃখ জানেন, আমি ওকে ভালবাসি, সত্যি ভালবাসি।

একটু থেমে বললে, একথা কাউকে বলিনি। দুদিনেই আপনাকে খুব কাছের মানুষ মনে হয়েছে বলেই বলছি। আপনার কাছে সব কথা বলা যায়।

সমীরণ চুপ করে রইল। ও কি মনে মনে কিছু স্বপ্ন দেখছিল ? সেজন্যেই হয়তো ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

নিরূপা থেমে থেমে বললে, দাদা বলে ডিভোর্স কর, ডিভোর্স কর, ডিভোর্স করলেই সব সমস্যা মিটে যাবে ?

একটু চুপ করে থেকে নিরূপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর হঠাৎ সমীরণের হাতখানা মুঠো করে ধরে নিরূপা বলল, এখন আমাব কি ভয় হচ্ছে জানেন, ভয় হচ্ছে আমি সত্যি হয়তো ওকে এখন আব ভালবাসি না।

বলতে গিয়ে ওর গলার স্বর কেঁপে গেল।

সমীরণেব ভাল লাগল এই ছোঁয়াটুকু, এই সারল্যের স্পর্শ। মনে হল যেন নিরূপার হাত কাঁপছে।

নিজেকে সংযত করে নিয়ে নিরূপা বললে, কাউকে বলতে পারিনি,আপনাকেই বললাম। জানি, আমার জন্যে আপনারও কষ্ট।

সমীরণ মৃদুস্বরে বললে, আমার চেয়েও বোধহয় আরেকজন কষ্ট পায়।

নিরূপা হঠাৎ চোখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।—কে ? কার কথা বলছেন ?

সমীরণ মাথা নিচু করে বললে, আমার মা। মাকে তো এখানে আনা যায় না। মানে মা একটু পুরনো দিনের মানুষ, পুজো-আর্চা নিয়ে থাকে, কিন্তু জানেন, মা আপনার জন্যে কষ্ট পায়, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে।

নিরূপা অবাক হয়ে তাকাল সমীরণের মুখের দিকে। এও কি সম্ভব নাকি ? সবাই শুধু দর্শকের দূরত্ব থেকে দেখে যায়। অথচ একটা মানুষ নিরূপাকে চোখেও দেখেনি, শুধুই সমীরণের কাছে শুনেছে, অথচ নিরূপার জন্যে তার দুঃখ। অদেখা একটি করুণ মুখের মেয়ের কথা ভেবে নিয়ে পুজোর ঘরে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে। এও কি সম্ভব। তাহলে কি সমীরণ কষ্ট পাচ্ছে দেখেই তার কষ্ট !

সমীরণ বললে, মা কি বলে জানেন, বলে, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

সমীরণ হাসতে হাসতে বললে, মা প্রায়ই বলে আমাকে,নিয়ে চল মেয়েটির কাছে। সত্যি কি আনা যায় নাকি ?

আসলে অভির এই কায়দাদুরস্ত ফ্ল্যাটের কথা ভেবেই বলল সমীরণ। এখানে ও নিজেই খানিকটা বেমানান, মা তো আরও বেশি।

নিরূপা চোখ তুলে তাকাল, সমীরণের চোখে চোখ রেখে বলল, আমিই তাঁর কাছে যাব, নিয়ে যাবেন একদিন ?

হ্যাঁ, নিরূপা যাবে। ওর মাথার মধ্যে তখন একটাই আশার কথা ঘুরছে। 'দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

নিরূপা নিজেও তো এতদিন সে-কথাই ভেবেছে।

অনেকদিন আগে চন্দনা একবার সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, ওসব নিয়ে ভেব না নিরূপা, একটা বাচ্চাটাচ্চা হলেই দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এখন মনে পড়লে দুঃখের মধ্যেও হাসি পায় নিরূপার।

ও নিজেও অবনীর সংসারের শূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে ভেবেছিল. সমস্ত দুঃখ লুকিয়ে ফেলার মত একজন সঙ্গী পাবে। একটি ছোট্ট শিশু।

—এখন নয়, এখন নয়। অবনীর কথাগুলো যেন শুনতে পাচ্ছে।

অবনী বলছে, আমার জীবনটা আমি প্ল্যান করে গড়ে তুলতে চাই। তাকে যেন আমার মত নীচে থেকে শুরু করতে না হয়। আমি আরও ওপরে পৌঁছব, তারপর। বলে হেসেছে।

বাবা বলত, একটু অ্যাম্বিশন থাকা ভাল। নিরূপার নিজেরও তাই মনে হত। কিন্তু এ কেমন স্বপ্ন, যার কাছে জীবনের অন্য সব স্বপ্ন বিকিয়ে দিতে হয়।

নিরূপা আর কিছু বলতে পারেনি, বলে ফেলার জন্যে ওর ভীষণ লজ্জা করেছিল। দুঃখ পেয়েছিল। শুধু মনে হয়েছিল, ওর ইচ্ছে অনিচ্ছের কোন দাম নেই। ও যেন অবনীর হাতের একটা খেলার পুতুল।

অসহ্য লেগেছে নিরূপার। তবু মানিয়ে চলার চেষ্টা করেছে। ওরএকটুওভাল লাগেনি, তবু অবনীকে খুশি করার জন্যে অবনীর মর্যাদা রাখার জন্যে সব করেছে।

কিন্তু তারপর সেই একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল।

বাড়ি ফিরে এল নিরূপা, অবনীর পাশে বসে। অথচ সারা রাস্তা অবনী একটাও কথা বলেনি। গুম হয়ে বসে ছিল। নিরূপা হেসে হেসে দু-একটা কথা বলেছে, উত্তর পায়নি। অপমানে চুপ করে গেছে।

বাড়িতে এসেও সেই চুপচাপ। নিরূপা পোশাক বদলেছে, অবনীর পছন্দ করে এনে দেওয়া সেই ফিকে নীল নাইটি পরে কাছে এসে ঘোরাঘুরি কবেছে। প্রতি মুহূর্তে আশা করেছে অবনী কিছু একটা বলবে, কিংবা হঠাৎ আগের মতই ওকে ঝট করে হাত ধরে টানবে।

—আমি ভাবতেই পারিনি, তুমি আজ নিজেকে ওভাবে ক্যাডাভারাস করে তুলবে। আমার পালিয়ে আসতে ইচ্ছে করছিল। অবনী বলে উঠল। যেন কথাগুলো ও এতক্ষণ ছিপি এঁটে রেখেছিল, হঠাৎ ফেটে পড়ল।

নিরূপা অবাক হয়ে তাকাল, ওর চোখে কান্না এসে গেল। ও বুঝতেই পারল না, ও কি করেছে।

অবনী বললে, মিসেস গোয়েল আর মিসেস লাহিড়ি তোমাকে লক্ষ করে ঠোঁট টিপে হাসছিল, আমি স্পষ্ট দেখেছি।

একটু থেমে বললে, আর নানাজী সম্পর্কে ওকথা বলা তোমার উচিত হয়নি, উনি আমার বস্। নিশ্চয় শুনতে পেয়েছেন।

অপমানের ওপর অপমান।

আমি অভব্য। আমি ম্যানার্স জানি না। কিন্তু তোমাদের ঐ ঢলাঢলি, ঐ ইতর রসিকতা, ওগুলোকেই ম্যানার্স বলে নাকি। আমি অনেক সহ্য করেছি, আর পারছি না।

নিরূপা বলে উঠল, তুমি আমাকে রেহাই দাও, আমি আর পারছি না। তোমার ঐ স্টেনো মেয়েটা যথেষ্ট ম্যানার্স জানে। ও নাচতে জানে, নাচাতেও। আমাকে তোমার কিসের

প্রয়োজন।

অবনী ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, আমি তোমাকে ধরে রাখিনি, বেঁধে রাখিনি।

এর জবাবে নিরূপা আর কোন কথা খুঁজে পায়নি। শুধু বুকের মধ্যে নিঃশব্দে কেঁদেছে সারারাত।

আর পরের দিন সকালেই স্যুটকেশ গুছিয়ে নিয়ে বলেছে—চললাম।

অবনী বাধা দেয়নি, শুধু চুপ করে থেকেছে।

সে কি দুঃসহ দিন গেছে নিরূপার।

সব কথা বাবাকে বলতে পারেনি, মাকে বলতে পারেনি। বলা যায় নাকি। কিন্তু ওঁরা ঠিকই বুঝেছেন, কোথাও কিছু গোলমাল ঘটে গেছে।

সে কি অসহ্য কষ্ট। অবনী একদিনও খোঁজ নিতে আসেনি।

যে কেউ বেড়াতে এসেছে, হেসে হেসে কথা বলেছে নিরূপা। যেন কোথাও কিছু ঘটেনি। কাকীমা জিগ্যেস করেছে, অবনী কেমন আছে রে! নিরূপা উচ্ছল হাসি দিয়ে সব দুঃখ ঢেকে ফেলে বলেছে, তুমি তো একদিনও গেলে না, কি চমৎকার ফ্ল্যাট পেয়েছি, ও এখন ডি জি এম হয়ে গেছে, জানো তো! তারপর আবার একদিন এসেছে, সে কি রে এখনও আছিস! নিরূপা হেসে হেসে বলেছে, ও তো নিত্যদিন ব্যাঙ্গালোর আর কলকাতা, দেখি পরের মাসে তো কাজ শেষ হবে বলেছে।

সে যে কি কষ্ট!

তার চেয়েও কষ্ট, মার কথা শুনে একটার পর একটা চিঠি লিখেছে অবনীকে। ভালবাসা জানিয়ে, ক্ষমা চেয়ে, কত রাত জেগে জেগে সুন্দর সুন্দর চিঠি লিখেছে, ওর বুকেব ভিতরের সমস্ত যন্ত্রণা উজাড় করে দিয়ে।

অবনী কোন উত্তর দেয়নি।

শেষে বাবা ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। ওর সব ভুল ক্ষমা করে দেবার কথা বলতে গিয়ে বাবার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

অবনী কোন কথা বলেনি, নিরূপা তখন মুখ কাচুমাচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

নিরূপার যত অপরাধই থাক, বাবাকে তো দু-একটা কথা বলতে পারত। একটু সম্মান দেখাতে পারত।

বাবা এক গ্লাস জল চাইল। নিরূপার ভয় হয়েছিল বাবার স্ট্রোক হয়ে যাবে।

অবনী উঠে গেল। বাবা ভেবেছিল জল আনতে গেল, অন্তত বেয়ারার হাতে এক গ্লাস জল আসবে।

এল না। শেষে নিরূপাই বললে,বাবা বোসো,আমি এনে দিচ্ছি।

নিজের অপমান তবু সহ্য করা যায়, চোখের সামনে বাবার অপমান ও দেখতে পারছিল না।

নিরূপা জল আনতে গিয়ে দেখে দরজার বাইরে বেয়ারা 'জীবন' দাঁড়িয়ে আছে, বাবা জল চেয়েছেন শুনতে পেয়েও। ভয়ে! নাকি অবনীর নির্দেশে।

নিরূপা নিজেই গিয়ে জল নিয়ে এল।

শেষ বিন্দু পর্যন্ত জলটা ঢক ঢক করে খেয়ে নিল বাবা।

নিরূপা বললে, তুমি চলে যাও, কিচ্ছু ভাবতে হবে না তোমাকে।

বাবা যাবার সময় বারবার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। নিরূপা দরজার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে। ওর চোখের জলে বাবার চেহারাটা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

অবনী কিন্তু বাবা চলে যাবার সময়েও একবার এল না।

ছেলেটা খুবই ব্রাইট। সত্যি অবনী অনেক ওপরে উঠেছে, ওপরের সমাজে। খবরের

কাগজের ভাষায় ও তো উচ্চশিক্ষিত। আর একটা মাত্র ধাপ উঠতে বাকি। আই মাস্ট গো আপ্। দ্য স্কাই ইজ দ্য লিমিট। অনেক ওপরে উঠে গেছে অবনী। নিজেকে বদলে ফেলেছে। ও হয়তো আরও ওপরে উঠবে।

ওরা অন্যরকম, ওরা ম্যানার্স জানে।

৮

সমীরণের মনের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি। নিরূপাকে নিয়ে।

নিরূপা বলেছে, দেখবেন দেখবেন, একদিন আপনাকে অবাক করে দেব। একদিন গিয়ে আপনার মার সঙ্গে দেখা করে আসব।

ঠিক চলে আসার মুহূর্তে কথাগুলো বলেছিল নিরূপা। মুখে হাসি ছিল। নিরূপার মুখে ঈষৎ হাসি দেখতে পেয়ে সমীরণ ভিতরে ভিতরে কৃতজ্ঞ বোধ করেছিল।

এই মেয়েটির মুখে হাসি আনতে পারলেই ও বোধহয় কৃতার্থ হয়ে যাবে। একে সুখী করাই যেন সমীরণের একমাত্র কাজ।

আনন্দমোহনের কাছে যেদিন গিয়েছিল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব প্রশ্ন করেছিল অবনী সম্পর্কে, অবনীর পরিচয় জেনেছিল, তার ঠিকানা, কিন্তু নিছক কৌতূহল থেকে নয়। সেদিন ওর মনে একটাই প্রশ্ন, একটাই কাজ। নিরূপা জানতে চেয়েছে, অবনী এসেছিল কি না, ওর খোঁজ নিয়েছে কি না। ওই একটা ব্যাপারের সঙ্গেই যেন নিরূপার মানসম্মান সুখ স্বপ্ন জড়িয়ে আছে।

নিরূপার জন্যে এটুকু কাজ করতে পেয়ে সমীরণের খুব ভাল লেগেছিল।

শেষ অবধি স্পষ্টভাবেই সমীরণ জিগ্যেস করেছে।—আচ্ছা, অবনীবাবু কি এসেছিলেন? কোন চিঠি দিয়েছেন?

আর আনন্দমোহন আহত লজ্জায় নিঃশব্দে মাথা নেড়েছেন।—না।

সমীরণ সেজন্যেই ঠিকানাটা লিখে রেখেছিল।

—আপনার সঙ্গে দুটো কথা আছে। সমীরণ বললে।

অবনী ওর দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

পরিচ্ছন্ন ভদ্রতার হাসি হেসে অবনী কেমন স্মার্ট ভঙ্গিতে বললে, আসুন, আসুন, বসুন এখানে। দুটো কথা হলেও দু-মিনিট বসতে আপত্তি কি।

প্রচণ্ড একটা অস্বস্তি নিয়েই সমীরণ এসেছিল। কি ভাবে বলবে, কি ভাবে শুরু করবে ও ভেবে পাচ্ছিল না। ওর ধারণা হয়েছিল মানুষটা রূঢ় কর্কশ অভদ্র ধরনের। হয়তো কথাই বলতে চাইবে না। সুন্দর চেহারার এই মানুষটির ব্যবহার দেখে ও মুগ্ধ হয়ে গেল।

তা হলে নিরূপার সমস্ত কথাই কি বানানো, মিথ্যে? এমন মার্জিত রুচির একজন মানুষ, অপরিচিতের সঙ্গে এত সুন্দর ব্যবহার, সে কখনও এত নির্দয় এবং নৃশংস হতে পারে!

কিন্তু নিরূপার বিষণ্ণ মুখ, গাঢ় কান্নার কণ্ঠস্বর তো মিথ্যে হতে পারে না। সেজন্যেই তো তার ওপর এত মায়া। মেয়েটিকে সুখী দেখতে চায় সমীরণ। একটি দুঃখী মেয়েকে সংসারে ফিরিয়ে দিতে চায়।

আসলে সমীরণের নিজেরও এক একবার সন্দেহ হয়েছে ও কি নিজেরই অজান্তে নিরূপাকে ভালবেসে ফেলেছে! তা না হলে এভাবে জড়িয়ে পড়ছে কেন!

নিরূপা বলেছিল, আমার কি কষ্ট জানেন, আমি ওকে ভালবাসি, সত্যি ভালবাসি। বলেছিল, ভালবাসাকে তো ডিভোর্স করা যায় না।

কথাটা শুনে সমীরণ যেন বুকের মধ্যে একটা আঘাত পেয়েছিল। এক মুহূর্তের জন্যে সন্দেহ হয়েছিল, নিরূপা কি ওকে সাবধান করে দিচ্ছে। ওর এই ব্যবহার, এভাবে জড়িয়ে পড়ায় নিরূপা কি ভেবেছে সমীরণ ওকে ভালবেসে ফেলেছে!

সমীরণ অবশ্য নিজেও তা জানে না। শুধু বুঝতে পারে একটা ভাল লাগা ওকে আচ্ছন্ন করে আছে। নিরূপার কাছাকাছি বসা, কথা বলা, নিরূপা হঠাৎ হাতখানা মুঠো করে ধরেছে, অনুনয়ের কণ্ঠে কথা বলছে, ফেরার সময় হাসতে হাসতে বলছে, দেখবেন দেখবেন, আপনাকে অবাক করে দেব। সব যেন ছবি হয়ে গেছে।

মা বলেছে, আহা বেচারী, আমাকে নিয়ে চল, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সমীরণও তাই চায়। সেজন্যেই তো অবনীর কাছে এসেছে। কেউ জানে না, নিরূপা জানে না, আনন্দমোহন জানেন না, অভি জানে না।

সমীরণ হাসতে হাসতে বললে, আমি একটা বাইরের লোক, হয়তো ভাববেন, আপনার ব্যক্তিগত জীবনে নাক ঢোকাতে যাচ্ছি কেন।

অবনীর মুখ থেকে হাসিটা সরে গেল।—আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

সমীরণ কথা খুঁজে না পেয়ে হঠাৎ বলে উঠল, নিরূপার জন্যে আমাদের সকলেরই কষ্ট। দোহাই আপনার, সংসারটা ভাঙবেন না, সংসারটা ভাঙবেন না।

সমীরণের গলা বোধহয় আবেগে কেঁপে উঠল।

বললে, নিরূপার মুখের দিকে তাকাতেও আমাদের কষ্ট হয়।

আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বিচিত্র হাসি দেখা দিল অবনীর মুখে।

—আপনি তার কে হন জানতে পারি কি? কখনও তো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অবনীর বিচিত্র হাসি যেন কি একটা ইঙ্গিত করতে চাইল।

সমীরণ কেমন নার্ভাস হয়ে গেল।—আমার কথা বলছেন? কেউ না, কেউ না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, নিরূপা আপনাকে ভালবাসে, সত্যি ভালবাসে, সত্যি।

শব্দ করে হেসে উঠল অবনী। হাসি থামিয়ে বললে, আপনি তো দেখছি অনেক খবরই রাখেন, নিরূপার মনের খবরও। ব্যঙ্গের স্বরেই যেন বললে। অবনী কি কিছু সন্দেহ করছে? সমীরণের সঙ্গে কোন অ্যাফেয়ার? দেখে তো মনে হয় খুবই আধুনিক মনের মানুষ। একই, একই।

অবনী হাসল। বললে, কিন্তু আমি আমার ওয়ে অফ লাইফকে আরও বেশি ভালবাসি।

একটু থেমে বললে, আমি কাজের লোক, কাজ ছাড়া কিছু বুঝি না। আমার জীবনের একটা ব্লু প্রিন্ট তৈরি হয়ে গেছে, আমার নিজেরও এখন সাধ্য নেই তা থেকে সরে আসার। কেনই বা আসব? আই হ্যাভ আ লং ওয়ে টু গো।

—কিন্তু এসবের মধ্যে নিরূপা আসছে কোত্থেকে। আমি তো আপনাদের সংসারের কথা বলছি। অসহায় ভাবে সমীরণ বললে।

অবনী হঠাৎ সজ্জন মানুষের হাসি হেসে বললে, বাঃ ভুলেই গেছি, আপনি তো আমার গেস্ট! হোয়াট উড ইউ লাইক টু হ্যাভ? তারপরই ভৃত্যটিকে ডাক দিলে, জীবন!

কাঁধে ঝাড়ন লোকটি এল। এসে দাঁড়াল।

অবনী সপ্রশ্ন চোখে তাকাল সমীরণের দিকে।

—হুইস্কি?

সমীরণ বললে, শুধু এক কাপ কফি।

অবনী হেসে উঠল। —কফি? স্রেফ কফি?

সমীরণ লজ্জা আর সঙ্কোচে হাসল।—হ্যাঁ, শুধু কফি।

ওর মনের মধ্যে তখন একটা কথা উঁকি দিচ্ছে, চাকরটির নাম জীবন। শুধু হুকুম করা, এটাই কি এদের জীবন, নাকি জীবনটাকে এরা হুকুম করে ইচ্ছে মত চালাতে চায়।

—বাট আই ফীল ফর হার। ভাববেন না কাজের চাকায় বাঁধা আছি বলে আমি একটা হার্টলেস ক্রীচার।

সমীরণ দুম করে বলে ফেলল, জানেন, নিরূপা সুইসাইড করতে গিয়েছিল।

সুইসাইড ! চমকে উঠল অবনী।

ওর মুখখানা রক্তশূন্য হয়ে গেল। কেমন বিভ্রান্তের মত বলে উঠল, কি বলছেন আপনি, নিরূপা সুইসাইড করতে গিয়েছিল ? একটু থেমে বললে, ইজ সী সেফ নাও ?

সমীরণ শুধু মাথা নাড়ল। হ্যাঁ। অবনীর এই উৎকণ্ঠা ওর ভাল লাগল। তা হলে ভিতরে ভিতরে নিরূপার জন্যে একটা চাপা ভালবাসা আছে। থাকবারই কথা। "বাট আই ফীল ফর হার।" একটু আগেই তো বলেছে।

অবনীর মুখের চেহারা কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। কেমন একটা বিভ্রান্ত অস্থিরতা।—ক্রেজি, ক্রেজি ! চিরকালই ও এরকম।

সমীরণ মনে মনে ভাবল, আশ্চর্য। দুঃখটা আসল নয়, সবই পাগলামি। আমিও তো প্রথম দিন সে কথাই বলেছিলাম।

অবনী চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে, কিছু একটা করতেই হবে। আমি ভাবতেই পারছি না, আমার সম্মান, আমার মর্যাদা পা দিয়ে না মাড়িয়ে ওর শান্তি নেই।

ধীরে ধীরে বলল, জাস্ট থিঙ্ক অফ ইট। আমি কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব না। নানাজী কি ভাববে, অফিসের সকলে।

নার্ভাস হাসি হেসে বললে, আমার—আমার সোশ্যাল প্রেস্টিজ বলে তখন আর কিচ্ছু থাকবে না।

—ও কিন্তু আপনাকে ভালবাসে, সত্যি ভালবাসে। বেচারী বড়ো কষ্ট পায়। সমীরণ বললে।

একটু থেমে বললে, আপনার কাছে এসেছি, ওরা কেউ জানে না।

চলে আসার সময়ে অবনী সমীরণের হাতখানা ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল। হাসবার চেষ্টা করল।

অবনীর কথাগুলো সমীরণের ভাল লাগেনি। কিন্তু মানুষটাকে ভাল লেগেছে। কি ভদ্র ব্যবহার। কি স্মার্ট। চলে আসার সময় সৌজন্য দেখানোর এতটুকু ত্রুটি ছিল না।

না, অবনী তো বলেছে, বাট আই ফীল ফর হার।

নিশ্চয় বুকের মধ্যে ওর জ্বালা আছে, কষ্ট আছে। 'কিছু একটা করতেই হবে।' অবনী বলেছিল। এর বেশি আর কি বলবে। একটা পুরুষমানুষ কি আর বুক উজাড় করে ভিতরের কান্না প্রকাশ করতে পারে !

খুশি খুশি মন নিয়ে বাড়ি ফিরল সমীরণ। কিন্তু বুকের মধ্যে কাঁটার মত কি যেন খিচখিচ করে লাগছে।

সমীরণ দেখতে পাচ্ছে, নিরূপা হাসছে, হাসছে। নিরূপা আর অবনী। এতদিনের সব দুস্বপ্ন কেটে গেছে। ওরা আবার সুখী।

কিন্তু সমীরণের বুকের মধ্যে একটা অবোধ্য যন্ত্রণা কেন ? ও কি নিজেরই অজান্তে ধীরে ধীরে নিরূপার কাছে এসে গেছে ? ভালবেসে ফেলেছে ঐ দুঃখী মেয়েটাকে। সমীরণ বুঝতে পারে না।

নিরূপাকে এবার অবনী এসে নিয়ে চলে যাবে। ভাঙা সংসার আবার জোড়া লাগবে।

সমীরণের কেমন মনে হল ও একটা বিরাট শূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। জীবনে

কখনও নিজেকে এত একা মনে হয়নি। এখন একেবারে একা। এখন আর উৎফুল্ল চিৎকারে বলে উঠতে পারবে না, মা তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে।

বাড়ি ফিরে এল সমীরণ। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার হৈ-হট্টগোল শুনতে পেল। যেন একটা আনন্দের ঝড় উঠেছে বাড়িতে। কি ব্যাপার!

হামটি ডামটি দু-ভাই সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে ছুটতে এল। দিব্যি নাদুসনুদুস গুণ্ডা চেহারার দুই যমজ ভাই।

জুতো খটমট করে লাফাতে লাফাতে এল।—মামা, মামা, বাবা ফিরে এসেছে, এক্ষুনি।

কি কুঁড়ে ভাই, তোমার বোনটি। দুটো লেবার-প্যেন আলাদা আলাদা নিতেও রাজি নয়। হৃষিকেশ বলেছিল।

ওদের দেখে হৃষিকেশের সেই রসিকতাটা মনে পড়ল, তবু সমীরণ আজ আর হাসতে পারল না। হৃষিকেশ তো প্রায়ই এখানে ওখানে যায়, ফিরে আসে। বাবাকে পেয়ে কি আনন্দ ছেলে দুটোর।

সমীরণ বললে, যাচ্ছি, যাচ্ছি।

হামটি ডামটি এক সঙ্গে বলে উঠল, শিগগির চলো। হাসতে হাসতে বললে, বাবা আর মা খুব ফাইট করছে। হেভিওয়েট।

সমীরণ হেসে ফেলল। এটা ওদের বাঁধা বুলি। চিকো আর হৃষিকেশ সুযোগ পেলেই পরস্পরের পিছনে লাগে, ঝগড়া বাধায়। তর্কবিতর্ক। আর তখন হামটি ডামটি দু-ভাই ঘুসি বাগিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বক্সিং লড়ার অভিনয় করে। হামটি বলে, মায়ের সঙ্গে বাবা পারবে না। ডামটি বাবার পক্ষ নেয়, বলে হেভিওয়েটে বাবা চ্যাম্পিয়ান। আসলে হৃষিকেশের প্রশ্রয় আছে।

চিকো হেসে ফেলে শেষ অবধি। রাগ করে বলে, বাবা মাকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি, উচ্ছন্নে যাবে দেখে নিও। তোমার প্রশ্রয় পেয়েই ওরকম হচ্ছে।

সমীরণ হাসতে হাসতে ওপরে উঠে এল দ্রুত পায়ে, পিছনে লাফাতে লাফাতে হামটি ডামটি। এসেই বাবা-মার দিকে তাকিয়ে বললে, যাঃ, সব ওভার হয়ে গেছে।

—কখন এলে? সমীরণ হৃষিকেশকে জিজ্ঞেস করল।

আর চিকো বললে, দাদার হোটেলে ফেলে রেখে বাবু দুদিন ফুর্তি করে এলেন।

আসলে দুদিন আগেই ফেরার কথা। যখনই দু একটা দিন দেরি হয় চিকো রেগে যায়। আসল আপত্তি, বলে যায় না কেন।

হৃষিকেশ হাসতে হাসতে বললে, পনেরো দিন ছিলাম না, তাতে আপত্তি নেই, দুদিন ওভার-স্টে করেছি বলেই রাগ।

চিকো আরও রেগে গেল।—দু-দিন কেন দশ দিন করো, বলে গেলেই তো হয়। আমি এদিকে ভেবে মরি।

যেন বলে গেলে আর ভাবনার কিছু থাকে না।

সমীরণ হেসে ফেলল।

আর হৃষিকেশ সমীরণের দিকে তাকিয়ে বললে, আর ব্রাদার-ইন-ল, তুমি নাকি এদিকে কি একটা কীর্তি করে বসে আছ?

সমীরণ চিকোর দিকে তাকাল। আশ্চর্য জুটি এ দুজনে। ইতিমধ্যেই সব খবর চালান হয়ে গেছে তা হলে।

ঠিক তখনই ছাদের ঘর থেকে শাঁখ বাজানোর আওয়াজ এল।

আর হামটি বলে উঠল, চুপ চুপ, দিদা আসছে।

মিনিট কয়েক। সমীরণ দেখল মা এসে দাঁড়াল।—হৃষি এসেছে আমি বুঝতেই পেরেছি।

যা চেঁচামেচি। বেশ একটা স্নেহের দৃষ্টিতে হৃষিকেশের দিকে তাকিয়ে মা হেসে বললে, আমার আর আজ ভাল করে পুজো করাই হল না।

যেদিন হৃষিকেশ আসে মার আর আনন্দ ধরে না। এখন তো দিল্লি থেকে ফিরছে, আরও আদর।

মা নিজের হাতে রান্না করবে। মেয়ে-জামাইকে আদর করে খাওয়াবে। গল্প আর ফুরোতে চাইবে না। মাকে তখন বেশ সুখী মনে হয়। তখন আর পুজোয় মন বসে না। মা তো নিজেই সে-কথা বলল। সারা সকাল পুজোর ঘরে বসে বসে কেটে যায় মার, অথচ এরা এলে প্রদীপ জ্বেলে শাঁখ বাজিয়ে কোনরকমে পালিয়ে আসতে পারলেই যেন বাঁচে। এ নিয়ে সমীরণ মাঝে মাঝে ঠাট্টাও করে।

এই মুহূর্তে কিন্তু ওর হঠাৎ মনে হল, এই খুশির ভাব যদি আনন্দমোহনের বাড়িতেও থাকত।

হৃষিকেশ আবার বললে, কি সব সুইসাইডের ব্যাপার শুনছিলাম।

সমীরণ কোন কথা বলল না। নিরূপা সম্পর্কে কোন কথা এখন কেউ হাল্কা ভাবে বললে ওর অসহ্য লাগে।

'আমি ওকে ভালবাসি, সত্যি ভালবাসি।' নিরূপার কথাটা মনে পড়তেই বুকের মধ্যে কেমন একটা খিচখিচ করে।

সমীরণ কি ওকে সত্যি ভালবেসে বসল নাকি।

নিরূপাকে সুখী করতে চেয়েছিল ও, ওর ভাঙা সংসার জোড়া লাগাতে চেয়েছিল। অবনীর কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে নিরূপাকে সেও ভালবাসে। 'কিছু একটা করতেই হবে।' অর্থাৎ ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রথমটা ভীষণ আনন্দ হয়েছিল সমীরণের। ইচ্ছে হয়েছিল চিৎকার করতে করতে এসে মাকে বলে, মা তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হয়েছে।

তখন মা হেসে বলত, আমার পুজো কখনও মিথ্যে হয় রে। ঠাকুরকে ডাকলে ঠাকুর ঠিক শোনে।

কিন্তু এখন আর ওর একটুও আনন্দ হচ্ছে না। ভিতরে ভিতরে ও কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েছে, বুকের ভিতরটা কেমন টনটন করছে। যেন একটা গোপন প্রেমকে এইমাত্র বিসর্জন দিয়ে এল।

নিজেরই অজান্তে যে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেছে, ও কিছু বুঝতে পারেনি, কিছুই বুঝতে পারেনি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আনন্দমোহনের কথা মনে পড়ে গেল।

নিরূপার বাবা আর মা। লজ্জা আর সঙ্কোচে কুঁকড়ে যাওয়া দুটি বার্ধক্যের মুখ।

'কাউকে বলবেন না যেন।' নিরূপাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসার দিনে আনন্দমোহন বলেছিলেন।

বিষণ্ণ করুণ নিস্তব্ধতায় সেই বাড়িটা যেন দেখতে পাচ্ছে সমীরণ। চোখের সামনে ভেসে উঠছে শোকের মত নিঃশব্দ একটা কান্নাচাপা বাড়ি।

অবনী একবারও আসেনি, খোঁজ নেয়নি, একথাটা বলতে গিয়ে গলা ভারী হয়ে এসেছিল আনন্দমোহনের। চোখের কোনায় দু ফোঁটা জল।

না, সমীরণের বুকের মধ্যে এই অবোধ্য কষ্ট, ওটা কিছু নয়। হয়তো সমীরণের মনের ভুল। দুদিন পরে ও নিজেই ভুলে যাবে, ভুলে যেতে পারবে। নাকি নিরূপাকে ও সত্যি ভালবেসে ফেলেছে। নিজেরই অজান্তে। তা না হলে নিরূপার এই আনন্দের মুহূর্তে ওর কেন নিজেকে এমন নিঃস্ব মনে হচ্ছে?

সমীরণের বুকের মধ্যে একটা গর্বও উঁকি দিচ্ছে। একটা নিষ্পাপ বিশুদ্ধতা। আমি একটা দুঃখী মেয়েকে সুখী করেছি। একটা ভাঙা সংসার জোড়া লাগিয়ে দিয়েছি। অবনী সুখী হবে, নিরূপা সুখী হবে।

কল্পনার চোখে ও যেন দেখতে পাচ্ছে, আনন্দমোহনের বাড়িতে একটা উৎসব লেগে গেছে।

নিরূপার মা হাসছেন। অবনী হাসছে, নিরূপা হাসছে। বৃদ্ধ আনন্দমোহনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ঠিক সমীরণদের বাড়ির মতই। মা যেমন ভাবে চিকোর সঙ্গে কথা বলছে, হৃষিকেশের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছে, কি খাবে বলো? চিকোকে হেসে হেসে বলছে, জামাই এসেছে, নাতিরা এসেছে, এখন তো আমার রান্নাঘরই ঠাকুরঘর।

নিরূপার মা হয়তো এমনি করেই বলবে।

নিরূপাকে দিয়ে আসবে নাকি খবরটা! নিরূপা কি রেগে যাবে, ও অবনীর কাছে গিয়েছিল বলে? নাকি কৃতজ্ঞতা জানাবে?

কিন্তু অবনীকে তো ও বলেনি, যে নিরূপা অভির কাছে আছে। অবনী যদি যায়, আনন্দমোহনের কাছে, এমন তীব্র আনন্দের সময়ে নিরূপা থাকবে না তা কি হয়।

সমীরণ ভাবল ও কি করবে, কি করা উচিত।

হঠাৎ মার দিকে তাকিয়ে, হৃষিকেশের দিকে তাকিয়ে সমীরণ বললে, আমি একটা ফোন করে আসছি।

ওর শোবার ঘরের পাশের করিডোরেই ফোন।

কিন্তু বুকের মধ্যে এখন একটা তীব্র যন্ত্রণা। এতদিন ও শুধু নিরূপাকে সুখী করতে চেয়েছে, সুখী দেখতে চেয়েছে। সেই দিনটা এখন ওর চোখের সামনে, অথচ ওর বুকের মধ্যে এখন একটা অন্য কষ্ট। একটা বিশাল শূন্যতার মধ্যে যেন ও দাঁড়িয়ে আছে।

সমীরণের ভয় কবছিল। নিরূপাকে ফোন করে অবনীর কথা, অবনী আসবে এ-কথা বলতে গিয়ে ওর গলার স্বর কেঁপে উঠবে না তো! ওর গলার কাছে একটা নিঃস্বতার কান্না জমে আছে, সমীরণ স্পষ্ট টের পাচ্ছে।

কিন্তু ফোনটা করতেই হবে। ও যে অবনীকে বলেনি, নিরূপা অভির কাছে আছে, অভির ফ্ল্যাটে। অবনী হয়তো আনন্দমোহনের বাড়িতে গিয়ে ওকে পাবে না। ফিরে আসবে।

অভির ফ্ল্যাটের ফোন নম্বরটা দেখে নিয়ে ও ডায়াল করল।

কে রিসিভার তুলবে? নিরূপা? চন্দনা? এখন কি অভি বাড়ি আছে?

ফোনে কিছুই বলা যাবে না। এ-সব কথা ফোনে বলা যায় না।

কিন্তু আগের দিন হঠাৎ চলে গিয়ে ও বুঝতে পেরেছে ওসব বাড়িতে ফোন করে আগে জানিয়ে তবেই যাওয়ার রীতি। শুধু ভাল লাগলে বা হঠাৎ যাবার ইচ্ছে হলেই যাওয়া যায় না। সেদিন অভি একজন অফিসের লোককে নিয়ে ফিরে আসায় ও খুব অস্বস্তি বোধ করেছিল।

ওরা ব্যস্ত মানুষ, কাজের লোক! তাছাড়া ওদের সমাজ আলাদা।

বার কয়েক ডায়াল করার পরই ক্রার্‌র ক্রার্‌র আওয়াজ এল।

কে রিসিভার তুলল? নিরূপা কি?

না। পিঙ্কির আয়া বোধহয়।

অভির নাম বলতেই বললে, সাহেব ব্যস্ত আছেন, ধরুন বলছি সাহেবকে।

বোধহয় রিসিভার নামিয়ে বলতে গেল। নিরূপা কি কাছেপিঠে নেই? ও তুলল না কেন? তা হলে সমীরণের এত অস্বস্তি হত না। নাকি নিরূপার গলা শোনার জন্যে ও

উসগ্রীব হয়ে ছিল।

কিন্তু এ কি!

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রিসিভারটা কানের কাছে ধরে রইল সমীরণ। প্রথমে বুঝতে পারেনি। ক্রমশ অবাক হচ্ছে ও।

একটা প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে আয়া বোধহয় বলতে ভুলে গেছে, কিংবা বলতে সাহস পায়নি। অভি হয়তো জানেও না রিসিভার নামানো আছে।

সমীরণ শুনতে পাচ্ছে। অবাক হয়ে যাচ্ছে।

এই নাকি সেই মার্জিত-রুচি অভি?

অভি চিৎকার করছে, স্টুপিড, স্টুপিড, আমি কতবার বলেছি তোমাকে। তোমার জন্যে আমি কি করিনি?

সমীরণের রিসিভার-ধরা হাতখানা কাঁপছিল। প্রথমে ভেবেছে নিরূপাকেই ধমক দিচ্ছে। না, চন্দনাকে। চন্দনাকে বলছে অভি।

অভি কি আজ অতিরিক্ত মদ্যপান করেছে? মাতলামি করছে? গলার স্বরে সেরকমই মনে হচ্ছে।

কে চেঁচিয়ে উঠল, নিরূপা না চন্দনা? এ তো অভির গলা; চিৎকার করে বলছে, স্ক্যাম্পের মত কথা বলো না।

হ্যাঁ চন্দনা, চন্দনাই বলে উঠল, তুমি একটা জানোয়ার হয়ে গেছ।

অভির চিৎকার শুনতে পেল আবার। বলছে, নিরূপা ছিল বলে আমি বলতে পারিনি। হ্যাঁ, জানোয়ার, জানোয়ারের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার পাবার তাই পাবে। আর কোনও দিন যদি শুনি, আই শ্যাল থ্রো ইউ আউট।

এ-সব কথা কেউ স্ত্রীকে বলতে পারে নাকি? কাউকেই বলা যায় না। চাকর বাবুর্চিকেও নয়। নিরূপা ছিল বলে! তাহলে কি নিরূপা নেই। চলে গেছে?

কিন্তু এ কি শুনছে সমীরণ। চন্দনাও চিৎকার করছে সমান রাগে।—তুমি কি ভাবছ আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই আমি ডাস্টবিনে পড়ে থাকব? আমাকে লুফে নেবার জন্যেও অনেকে আছে। তুমি যাকে তোষামোদ করো, সেই ডাভাটিয়া···

না, আর শুনতে পারছে না সমীরণ। ওর হাত কাঁপছে। এখন যদি আয়ার কথা শুনে অভি এসে রিসিভার তোলে, কি করবে সমীরণ? পরিচয় দিতে পারবে না। কথা বললেই গলার স্বর চিনে ফেলবে। তখন সমীরণেরই লজ্জা। অভি হয়ত বুঝতে পারবে, জানতে পারবে, যে ও সব শুনতে পেয়েছে। কি লজ্জা। সমীরণেরই লজ্জা।

সমীরণ ঝট করে লাইন কেটে দিল, টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

সমস্ত মন বিস্বাদ হয়ে গেল সমীরণের।

এই অভিকে ওর ভাল লেগেছিল। কি দারুণ স্মার্ট, কি ভদ্র। মার্জিত ব্যবহার। আর চন্দনাও। কি চমৎকার চাপা হাসি, মৃদু কণ্ঠস্বর, নমস্কারের ভঙ্গিটা কি সুন্দর। সমীরণ ভেবেছিল ওরা প্রচণ্ড সুখী। হয়তো সুখী। এটা শুধুই একটা ব্যতিক্রম। হয়তো দুজনেই প্রচণ্ড ড্রিঙ্ক করেছে আজ।

কিন্তু চাকর বাবুর্চি আয়ার সামনে এই অভব্য চিৎকার, ড্রিঙ্ক করেছে বলেই কি ক্ষমা করে দেওয়া যায়?

নিরূপা ঠিকই বলেছিল; পাশের ঘরে রেকর্ডে গান হচ্ছিল, ওরা দুজনে মুখোমুখি, নিরূপা বলেছিল, আমি তো ওপরে উঠতে চাইনি, আমি শুধু সুখী হতে চেয়েছিলাম।

অথচ সকলেই মনে করে, অত ওপরে উঠলে তবেই সুখ।

ও ঘরে চিকো, হৃষিকেশ আর মা। ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে সমীরণ।

কিন্তু ওর মন বিক্ষিপ্ত। যেতে ইচ্ছে হল না। অভি আর চন্দনার সুখী সংসারের সুন্দর একটা ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল ওর মনে, হঠাৎ যেন সেটা কাচের বাসনের মত ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে এসে রাস্তার দিকের বারান্দায় দাঁড়াল সমীরণ, মন বিষণ্ণ।

হঠাৎ লক্ষ করল একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছে ঠিক ওদের বাড়ির সামনেই।

ঝুঁকে দেখতে গেল সমীরণ। কে একটি মেয়ে বাড়ির নম্বর খুঁজছে। আরে, এ যে নিরূপা!

ওপরের দিকে তাকাতেই সমীরণকে দেখতে পেল নিরূপা। হাসল। তারপর ড্রাইভারকে কি যেন বললে। সোঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। অভির গাড়ি।

সমীরণ দুদ্দাড় করে নেমে এল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি। নিরূপা এভাবে নিজেই চলে আসবে ও ভাবতেই পারেনি।

নিরূপাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে বসতে বলবে সমীরণ খুঁজে পেল না। বাইরের লোকের্ মত ওকে কি বসার ঘরে নিয়ে যাওয়া যায়। এখন ওর মনে হচ্ছে নিরূপা যেন ওর অনেক আপন হয়ে গেছে।

সমীরণকে দুদ্দাড় করে নামতে দেখে, হামটি ডামটি স্কিপিং করছিল, তারাও সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

সমীরণ বললে, আসুন, আসুন। কি আশ্চর্য।

আর নিরূপা বললে, বলেছিলাম না, আপনাকে অবাক করে দেব। আমি তো একাই আসছিলাম, দাদা জোর করে গাড়িতে পাঠাল।

সমীরণ হাসল। সত্যি ও ভাবতেই পারেনি। কিন্তু একটু আগে শোনা অভি আর চন্দনার কথাগুলো ও ভুলতে পারছে না।

বলেছিলাম না, আপনাকে অবাক করে দেব।

নিরূপাকেও অবাক করে দেবার মত খবরটা বলবে নাকি।

নিরূপা দাঁড়িয়েই ছিল।

হামটি বললে, কাম ইন কাম ইন।

ডামটি বলে, ওয়েলকাম।

নিরূপা হেসে ফেলল।

আর সমীরণ বললে, দুটি যমজ ভাগ্নে, দুটি রত্ন।

নিরূপাকে সঙ্গে করে ওপরে নিয়ে এল সমীরণ। বসবাব ঘরে নয়, বন্ধুবা কেউ এলে, রাস্তার দিকে বারান্দায় চেয়ার পাতা আছে, ওখানেই বসে কিংবা ওর শোবার ঘরে।

কিছু ভেবে না পেয়ে যে-ঘরে চিকো, হৃষিকেশ আব মা গল্প করছিল সেখানেই নিয়ে গেল সমীবণ।

বললে, মা,এ-ই নিরূপা।

নিরূপা মার দিকে তাকাল, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল। মা ওর চিবুকে মাথায় হাত দিয়ে মনে মনে আশীর্বাদ করল।

চিকো বলে উঠল, কোথাও বসতে দে ওকে।

ওঘরে চেয়ারটেয়ার কিছুই নেই। শুধু একখানা খাট। আর একটা মোড়া।

—এখানেই বসছি, এখানেই বসছি। নিরূপা খাটের কোনা ঘেঁসে বসল। মোড়ায় হৃষিকেশ।

পরমুহূর্তে মেঝেতে বসে পড়েছে নিরূপা খাটের পিঠে ঠেস দিয়ে। সবাই হৈ হৈ করে

উঠল। আর নিরূপা বললে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমার মেঝেতে বসতে খুব ভাল লাগে।

হৃষিকেশ একটুক্ষণ থেকেই উঠে গেল।

মা এদিকে নিরূপার সঙ্গে গল্প করতে করতে হঠাৎ বললে, এস নিরূপা, একবারটি আমার সঙ্গে ঠাকুরঘরে চলো।

সেজন্যেই তো আসা। সমীরণই জানে নিরূপা কেন এসেছে। সমীরণই তো বলেছিল, মা বলে একবারটি নিয়ে চল আমাকে, আহা বেচারী !

ঠাকুরঘর থেকে ফিরে মা বললে, বোসো, আমি একটু রান্নাঘরে যাই।

মা চলে গেল।

আজ আর নিরূপাকে তেমন দুঃখী দুঃখী লাগছে না। ও হাসছে, অনর্গল কথা বলছে সকলের সঙ্গে। ও কি তা হলে জেনে গেছে অবনী আসবে ? অবনী ইতিমধ্যে অভিকে ফোন করেনি তো।

হৃষিকেশকে ধরে নিয়ে এল চিকো। বললে, পালাচ্ছ কেন। মেয়ে দেখলেই ভয়, আর আমার কাছেই যত হম্বিতম্বি।

নিরূপা হেসে উঠল।

আর তখনই হামটি নিরূপাকে বেশ পর্যবেক্ষণ কবে বললে, ইউ আর বিউটিফুল।

এবারও সবাই হেসে উঠল।

ডামটি বললে, মাদাব ইজ বিউটিফুল, দিদা ইজ বিউটিফুল, ইউ আর ভেরি ভেরি বিউটিফুল।

এবাবও সবাই হেসে উঠল।

মা বললে, তোমার কথা শুনে থেকে এত কষ্ট হয়, ঠাকুরকে ডাকি··

চিকো চোখ পাকিয়ে বললে, সবাই ঐ রকম, সবাই ঐ রকম, এই যে দেখছ মিনি বেড়ালেব মত বসে আছে··

হৃষিকেশ এতক্ষণে কথা খুঁজে পেল। বলল, সেই মিনি বেড়ালেই কেবল মাসে মাসে গয়না গড়িয়ে দিচ্ছে, শাড়িব একজিবিশন কবছে বাড়িতে। এবং একটা কিছু চেয়ে না পেলেই··

চিকো হেসে উঠে বললে, দিতে পারবে না তো বিয়ে করেছ কেন ? তাবপব নিরূপাকে বললে, তুমি এসেছ ভালই হল, সেই দুলটাব প্যাটার্ন দিও ভাই একবাব, এত সুন্দব ডিজাইন, আমিও কবাব ঐ রকম।

হৃষিকেশ হাসতে হাসতে বললে, তোমাব গয়নার ডিজাইন কবাতে করাতে আমাব মুখের ডিজাইনটাই বদলে গেল।

আর হামটি ডামটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, মাদার ফাইট !

বলেই দুজনে বক্সিং লডতে শুরু করল।

আর নিরূপা হেসে লুটোপুটি।

এতদিন পরে নিরূপাকে হাসতে দেখে সমীবণেব মন তৃপ্তিতে ভরে গেল।

কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও মনটা বিস্বাদ ঠেকছে। অভি আর চন্দনাব কথাগুলো। ওরা তো খুব মার্জিত, ধারণা ছিল না ওবা একেবারে নিচুতলার মানুষদের মত ঝগড়া করে।

ফেরার সময় সমীরণ বললে, আপনি তো গাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। চলুন পৌঁছে দিয়ে আসছি।

নিরূপা সমীরণের চোখের দিকে তাকাল। ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

দাদার গাড়ি ওকে পৌঁছে দিয়ে গেছে। ভেবেছিল মিনিবাসে বা ট্যাক্সিতে ফিরবে।

যেতে যেতে নিরূপা বললে, এত ভাল লাগল আপনাদের এখানে। দাদার বাড়িতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

একটু থেমে বললে, কতকাল এ-রকম আনন্দ পাইনি। আনন্দ কি জিনিস আমি যেন ভুলেই গিয়েছিলাম।

সমীরণ গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবল, অবনীব কথা এখন বলবে কিনা। ও কি এখনই বলবে, তোমার দুঃখের দিন শেষ হয়ে গেছে, অবনী আসবে। অবনী নিয়ে যাবে। সে তো বলেছে, কিছু একটা করতেই হবে।

না, বলতে পারছে না সমীরণ!

নিরূপা হঠাৎ পাশ ফিরে তাকাল সমীবণের দিকে।—আজ আমার আপনার কাছে আসতে এত ইচ্ছে করছিল।

সমীরণ চুপ করে রইল।

নিরূপা ওর পাশে বসে আছে। একেবারে পাশে।

সমীরণের ভীষণ ভাল লাগছে। হয়তো এটাই শেষ দেখা। অবনী কালই হয়তো এসে নিরূপাকে নিয়ে চলে যাবে। আর কি কখনো আসবে নিরূপা? কিংবা সমীবণই কি যেতে পারবে! গেলেও শুধু একটা দূরত্বেব সৌজন্য। এই যে এখন এত কাছে এসে গেছে, পরস্পরের ওপর নির্ভরতা, বিশ্বাস, এসব তখন থাকবে না। তখন এই দিনগুলি দুঃস্বপ্ন বলে মনে হবে নিরূপাব। মন থেকে মুছে ফেলবে, চিবকালের জন্যে। মুছে যাবে।

—জানেন, এখন আব আমার কোন দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। নিরূপা ধীবে ধীবে বললে।

সমীরণ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল।

নিরূপা মাথা নিচু করল।—জানি না, কি ঘটে গেছে। আমি বুঝতেই পারছি না। সেজন্যেই তো আপনার কাছে ছুটে এলাম। এত দেখতে ইচ্ছে করল।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল নিরূপা।

অন্ধকারেব রাস্তা দিয়ে স্পীডে গাড়ি ছুটছে। সমীবণের চোখ সামনের বাস্তায়। নিরূপাব মুখের দিকে তাকাতে পারছে না।

নিরূপা ধীরে ধীবে বললে, ও আমাকে একেবারে বদলে ফেলতে চেয়েছিল। পারেনি। ও তো শুধু বাইরেটা বদলাতে চেয়েছিল, এখন কিন্তু আমি ভিতবে ভিতরে বদলে গেছি।

এবারও সমীরণ বলতে পাবল না, আমি অবনীব কাছে গিয়েছিলাম। অবনী আসবে, অবনী আসবে।

নিরূপা আজ যেন সব কথা বলতে চায। সব, সব। সমীরণেব মনে হল নিরূপা সত্যি বদলে গেছে। আগে ও শুধু একটা দুঃখী-দুঃখী মুখ নিয়ে বসে থাকত। এখন অনর্গল কথা বলছে।

নিরূপা হঠাৎ বললে, সবাই জিগ্যেস কবেছে, কেন পাগলামি করতে গিযেছিলাম। সত্যি তো পাগলামি। শুধু বুঝতে পারি না, কোনটা পাগলামি, আর কোনটা নয়।

নিরূপা হেসে উঠল।—সুইসাইড! আত্মহত্যা শুনলেই লোকে চমকে ওঠে। কিন্তু সমস্ত মানুষগুলোই তো সুইসাইডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দাদা-বৌদি, অবনী, ওদের সাজানো সমাজ, তাদের দেখাদেখি আবও সবাই। ওটাও তো এক ধরনের সুইসাইড। তাই না, বলুন?

সুইসাইড। সুইসাইড!

সমীরণ চুপ করে ছিল। ও কিছুই বুঝতে পারছে না। ওর শুধু মনে হচ্ছে নিরূপা, সেই বিষণ্ণ করুণ মুখের মেয়েটি, কেমন যেন বদলে গেছে।

সমীরণ ধীরে ধীরে বললে, আপনি কিন্তু কোনও দিনই বললেন না, কেন সেদিন

সুইসাইড করতে গিয়েছিলেন ?

নিরূপা হেসে উঠল।—আমি কি বোকা, কি বোকা। জানেন, আমি ভেবেছিলাম, ও আমাকে সত্যি ভালবাসে।

একটু চুপ করে থেকে বললে, রাগে-অপমানে বাবার কাছে একবার চলে এসেছিলাম। সেবারও ও খোঁজ নিতে আসেনি। শেষে একটাব পর একটা চিঠি লিখেছি, উত্তব দেয়নি।

নিরূপা একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ওর গলা বুজে এল, বললে, তারপর তো সেই বাবার সঙ্গে নিজেই ফিরে গেলাম। ভেবেছিলাম সব বুঝি মিটে গেল। একটু থেমে বিষণ্ণ গলায় বললে, মিটে যায়নি। হঠাৎ সেদিন বইগুলো গোছাতে গোছাতে দেখলাম একটা বইয়েব মধ্যে সেই চিঠিগুলো। প্রথমটা আমাব ভীষণ ভাল লাগল, আমার সেই চিঠিগুলো যত্ন কবে জমিয়ে বেখেছে ভেবে।

নিরূপা একটুক্ষণ চুপ কবে থেকে বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, তাবপর নাড়াচাড়া করতে গিযে দেখি খামগুলো, জানেন, একটাও খোলেনি। আমাব বাত জেগে কান্না দিয়ে লেখা চিঠিগুলো একটাও খুলে পড়ারও ইচ্ছে হয়নি ওব।

নিরূপার চোখে জল এসে গেল। বললে, আমি ভাবতাম ও আমাকে ভালবাসে। সেদিনই জানলাম কি লিখেছি তা ওব জানাবও ইচ্ছে হয়নি।

আমাব নিজেকে এত ছোট মনে হল, এত তুচ্ছ, মনে হল ওব কাছে আমাব কোন দামই নেই।

—খোলেনি ? একটা চিঠিও পড়েনি ? বিস্ময়েব কণ্ঠে বলে উঠল সমীরণ।

—না। নিরূপা বললে, আমি তো ওব কাছে একটা পোশাক, ওব পকেটেব রুমাল, হাতেব ঘড়ি, কিংবা তার চেয়েও তুচ্ছ। আমাব এত অপমান লাগল, এত মন খাবাপ হয়ে গিয়েছিল, তারপব গঙ্গাব ধাবে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, তখন জোযাব আসছিল, কি যে হয়ে গেল

অনেকক্ষণ চুপ করে বইল নিরূপা। হঠাৎ হেসে উঠে বললে, কি জানি আমিই হয়তো অন্যরকম। আব সব মেয়েবা হযতো একেই সুখ বলত। গর্ব করত।

সত্যি তো। তাহলে আর কোথায় বদলেছে মানুষ। অভি আর চন্দনার পাশাপাশি চিকো আব হৃষিকেশকে দাঁড় করাল সমীরণ। একজন শাড়ি গযনা, আবেকজন দামী কার্পেট, বিলিতি ক্রকারি। তবু চিকো আর হৃষিকেশ যেন অনেক সুখী। অমার্জিত হামটি ডামটিকে নিয়েও ওরা অনেক বেশি মার্জিত। অনেকখানি মানুষ।

টেলিফোনে শোনা অভি আর চন্দনার ঝগড়া শুনে সমীরণ শিউরে উঠেছিল। কল্পনা দিয়ে গড়া ওদের সুখী সংসারের ছবিটা মুহূর্তে ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল।

স্টিয়ারিঙে সমীরণেব হাত। গাড়িটা সেকেন্ড হ্যান্ড, কিন্তু দিব্যি চলে। চোখ সামনের বাস্তায়। একটা লোক ছুটে রাস্তা পার হয়ে গেল। কোনরকমে গাড়িটা তাকে পাশ কাটাল। সমীরণ নিরূপার মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। কিংবা তাকাতে চাইছে না।

সেই প্রথম দিনের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ছোকরা দুটো নেমে গেছে। সমীরণ গাড়ি চালাতে চালাতে সামনের খুদে আয়নায় দেখতে পেল নিরূপাকে। পিছনের সিটে ঢলে পড়া ধসে পড়া জানালায় মুখ রাখা একটি বিষণ্ণ করুণ বিভ্রান্ত মুখ। মৃত্যুর কোল থেকে এখনই ফিরে এসেছে।

সমীরণ কাঁধের ওপর নিরূপার হাতের স্পর্শ পেল।—জানেন, মা তো আমাকে ওপরে নিয়ে গেলেন ঠাকুরঘরে, পুজোর ফুল আমার মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, প্রণাম করো। সব ঠিক হয়ে যাবে।

হাতখানা পড়ে আছে সমীরণেব কাঁধের কাছে। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে নিরূপা, ওর

একটা আঙুল ছুঁয়ে আছে সমীরণের কাঁধ। হয়তো নিরূপাব অজান্তেই। ও হঠাৎ বললে, কিন্তু তার আগেই যে আমি বদলে গেছি।

সমীরণ ভাবল, অবনী কি আজই এসেছে। আনন্দমোহনের ওখানে! অথবা কালই আসবে। এখন কাঁধের ওপর একটা আঙুলের ছোঁয়া, নিরূপা অন্যমনস্ক বলেই হয়তো। তবু এত ভাল লাগছে!

নিরূপা এত সব কথা বলছে, ও জানে না, অবনী আসাব সঙ্গে সঙ্গে ও আবাব বদলে যাবে। তখন ওর মুখে রাজ্যের হাসি। তাই তো হয়, সে-রকমই দেখে এসেছি।

তখন সমীরণের বুকে শুধুই একটা দুর্বোধ্য কষ্ট। একটা স্মৃতি হয়ে যাওয়া ব্যথা, আর নিরূপা তখন অনেক দুর চলে যাবে, অস্পষ্ট হয়ে যাবে। শুধু বুক ভবে একটা গর্ব থাকবে, একটা সব হারানো মেয়েকে সুখী করেছি।

সমীরণের মনে পড়ল, মা বলছিল ওঠাপড়া নিয়েই তো জীবন। আসলে মা নিরূপাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল।

মা বলছিল, জানো নিরূপা, উনি যখন মাবা গেলেন, ওদেব বাবা, আমার তো মনে হয়েছিল বেঁচে কোন লাভ নেই। বলতে বলতে মা আঁচলে চোখ মুছল। বললে, তখন সব অন্ধকার।

একটু থেমে মা বললে, এখন বাঁচতে খুব মাযা। এই সমীরণ, চিকো, হৃষি, ঐ দুটো বিচ্ছু ছেলে হামটি ডামটি।

নামগুলো উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যেন মমতা ঝরে পর্ড়াছল, আনন্দে খুশিতে মার মুখ উজ্জ্বল।

সমীরণ হঠাৎ নিরূপাকে বললে, মা কি বলছিল মনে আছে?

নিরূপা ফিরে তাকিয়ে মৃদু হাসল।—আমাকে সুখী দেখে যাবেন, এই তো?

সমীরণ ভাবল, এখনই অবনীর কথাটা বলি। কিন্তু বলতে পারল না। বলতে গেলে ওর গলার স্বর গাঢ় হয়ে যাবে।

গাড়িটা ততক্ষণে এসে থেমেছে, মাল্টিস্টোবিড কমপ্লেক্সের গেটের ভিতর ঢুকে গেছে।

নিরূপা নামল, গাড়ির দরজা খুলল, দরজা বন্ধ করল।

ঘুরে এসে দাঁড়াল সমীবণের কাছে।

সমীরণ বললে, আমি আর নামব না। বাত অনেক হয়েছে।

নামতে বললও না নিরূপা। শুধু ঘাড নেড়ে সায় দিল।

কিন্তু নিরূপা কি যেন বলবে। কি বলবে নিরূপা!

নিরূপার ঠোঁটের কোনায় একটা বিষণ্ণ হাসি আলো-অন্ধকারে দেখা গেল।

খুব ধীর শান্ত স্বরে নিরূপা বললে, আমি মরতে চেয়েছিলাম, আপনি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, সেজন্যে আপনার খুব গর্ব। তাই না?

সমীরণ প্রতিবাদ করে উঠল।—কি বলছেন, কি বলছেন! একটুও না। ওটা তো মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

এবারও ও বলতে পারল না, ও বাঁচায়নি।

—আপনি বুঝি শুধু কর্তব্যই জানেন? একটু থেমে নিরূপা আরও ধীর. আরও স্পষ্ট করে বললে, যে মরতে চায় তাকে তো বাঁচানো সহজ...

তার পরের কথাগুলো স্পষ্ট করে বুঝতে পারল না সমীরণ। একটা দমকা হাওয়ায় ভেঙে গেল, কিংবা নিরূপাই হয়তো স্পষ্ট করে বলল না।

দ্রুতপায়ে ততক্ষণে নিরূপা আলো থেকে অন্ধকারে চলে গেছে।

আর সমীরণ বাতাসে ভেঙে যাওয়া কথাগুলো পরপর সাজাবার চেষ্টা করল।

বাঁচতে···বাঁচাতে চায়···পারেন ? যে বাঁচতে চায়···পারেন ? যে মরতে চায় তাকে তো বাঁচানো সহজ, যে বাঁচতে চায়···

কি বলে গেল নিরূপা ? যে মরতে চায় তাকে তো বাঁচানো সহজ, যে বাঁচতে চায় তাকে বাঁচাতে পারেন ?

সমীরণের মনের মধ্যে তখন তোলপাড়। ও কিচ্ছু বুঝতে পারছে না, কিচ্ছু বুঝতে পারছে না, কি যেন সব জট পাকিয়ে গেল, গোলমাল হয়ে গেল।

৯

আনন্দমোহন গিয়ে নিরূপাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

ফোন করে বললে অভি হয়তো পৌঁছে দিয়ে যেত, কিংবা নিরূপা একাই চলে আসতে পারত। কিন্তু আনন্দমোহনের ভয় ছিল হয়তো অভি বলবে, ও তো এখানে বেশ ভালই আছে, থাক না আরও কিছু দিন।

কিন্তু অসিতার দুর্ভাবনা নিরূপা আবার কখন কি করে বসে ! ভয় আনন্দমোহনেরও। একবার যে আত্মহত্যা করতে গেছে তাকে নিয়ে অসিতার দুশ্চিন্তা সর্বক্ষণ। রাতে অসিতা ভাল করে ঘুমোতে পারেন না, মাঝে মাঝেই তাঁর ঘুম ভেঙে যায়, লক্ষ করেছেন আনন্দমোহন। তাঁর নিজেরও আজকাল ঘুম হয় না, কে জানে বয়স হচ্ছে বলে কিনা।

অভি ওকে নিয়ে যেতে চাওয়ায় অসিতা প্রথমে খুশিই হয়েছিলেন। আনন্দমোহনও। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার মত লজ্জা তো মধ্যবিত্ত ঘরে আর কিছু নেই। লুকিয়ে লুকিয়ে রাখতে হয়। আর বেশিদিন বাপের বাড়িতে থাকলে পাড়ার লোক হয়তো কানাঘুসো করবে, মুখ ফুটে কেউ জিগ্যেস করে বসলে সে আরও লজ্জা। অভির কাছে গিয়ে থাকলে সকলে ভাববে স্বামীর কাছেই ফিরে গেছে। সেজন্যেই খুশি হয়েছিলেন অসিতা। আনন্দমোহনও।

অথচ নিরূপা চলে যাওয়ার পর ভয় বেড়ে গিয়েছিল। মাঝে-মাঝেই বলতেন, ওর বারো তলার ফ্ল্যাট, সামনে বারান্দা, এত ভয় করে !

আনন্দমোহনেরও সে আতঙ্ক ছিল। একদিন বেড়াতে গিয়ে বারান্দা থেকে ঝুঁকে নীচে তাকিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

নিরূপাও তো ওভাবে নীচে তাকাতে পারে। জোয়ারে জল ফেঁপে উঠছে দেখতে দেখতে ওর নাকি মনের দুঃখে হঠাৎ লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়েছিল। যার মনের মধ্যে এত কষ্ট, এত কান্না, সে তো বারান্দা থেকে নীচে তাকাতে গিয়ে লাফ দিয়ে পড়তে পারে।

অভিরা যে-জীবন বেছে নিয়েছে, এই অবনীও, আজকাল তো ওদের একটা সমাজই গড়ে উঠেছে, সেই জীবন আনন্দমোহনের মোটেই মনঃপূত নয়। কোথায় চলেছে ওরা নিজেরাই জানে না। কিন্তু আমাদের এই মধ্যবিত্ত সমাজটাই বা কি এমন ভাল। কেবল গোপন করো, লুকিয়ে রাখো। আমাদের সমাজ একটা মেয়েকে বুক ফেটে কাঁদতেও দেয় না। দুঃখটাও লুকিয়ে রাখতে হয়। দুঃখকষ্ট ওরাও লুকোয় কিনা কে জানে। অভি আর চন্দনাকে কিন্তু সব সময়েই খুব হাসিখুশি দেখেছেন। দিব্যি সুখী বলেই মনে হয়।

নিরূপাকে আনতে গিয়ে এক ঝলক তাকিয়েই মনে হয়েছিল চন্দনার মুখ কেমন যেন। কিন্তু না, পরমুহূর্তেই ভুল ভেঙে গেছে। চন্দনা অভির দিকে তাকিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলেছে, বাবাকে একটা হ্যামবার্গার করে খাওয়াব ? তুমি আবার গিয়ে মাকে বলে দেবে না তো।

আনন্দমোহন ভেবেছিলেন, নিরূপাকে নিয়ে আসার ব্যাপারে অভি আপত্তি করবে।

সেজন্যেই নিজে গিয়েছিলেন। অভিকে বললেন, নিরূপাকে নিয়ে যাব। ও শুধু বললে, বেশ তো!

ফিরে আসার পর অসিতা হেসে বলেছিলেন, ছাড়তে চাইল?

আনন্দমোহন শুধু হেসেছেন। আসলে অভি একটু আপত্তি করলেই ভাল লাগত। ওরা কি রকম যেন হয়ে যাচ্ছে। নিয়ে যাবার সময়েও জোর খাটায়নি, ফিরে আসার সময়ও কোন আন্তরিকতার ছোঁয়া নেই। বাড়িটা যেন স্টেশনের ওয়েটিং রুম। আর আমাদের বাড়িতে বাইরে থেকে দূর-সম্পর্কের কেউ এসে বেশিদিন থাকলে ভিতরে ভিতরে আমরা বিরক্ত হই, তারপর কেমন ভাল লেগে যায় তাকে, যাবার সময়ে আরও দুদিন থাকার জন্যে ঝুলোঝুলি করি।

—হ্যাঁ রে, অভি চন্দনা পিঙ্কি ওরা সব কেমন আছে? অসিতা নিরূপাকে প্রশ্ন করেছিলেন।

নিরূপা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিরূপা সম্পর্কে তাঁর দুর্ভাবনা কেটে গেছে, তখন চিন্তা অভি সম্পর্কে।

নিরূপা বলেছিল, দিব্যি ভালই তো আছে। একটু থেমে বলেছে, ওদের মা সুখদুঃখ বলে কিছু নেই, জীবনটা শুধু একটা রুটিন!

আনন্দমোহনের মনে হয়েছে অভিযোগ আসলে অবনীর বিরুদ্ধে।

কারণ নিরূপা একটু থেমে বলেছে, ওরা ভালই থাকে।

এই রুটিনের সঙ্গেই তো নিরূপা নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি।

কিন্তু নিরূপাকে দেখে আনন্দমোহন খুশিই হয়েছেন। ওব মুখের ওপর আর সেই চাপা কষ্টের ছাপটা নেই। চোখের দিকে তাকালে মনে হয় না কান্না থমথম কবছে।

এই দুটো সপ্তাহের মধ্যেই নিরূপা সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

আগে যেন ওর কথা বলতেও কষ্ট হত।

কিন্তু নিরূপাকে নিয়ে দুজনে কি যে করবেন ঠিক করতে পারেন না।

অভি অবশ্য বলেছিল, নিরূপা যদি চাকরি করতে চায়, কোথাও একটা ফিক্সআপ করে দেবে। অভির কাছে সব সমস্যারই খুব সহজ সমাধান। ডিভোর্স কিংবা চাকরি। কিন্তু আনন্দমোহন এবং অসিতা যে এখনও আশা রাখেন, স্বপ্ন দেখেন।

অসিতা বললেন, ভাবছি আমিই একবার যাব অবনীর কাছে।

আনন্দমোহন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, না না না, তোমাকে যেতে হবে না, আমিই যাব।

আসলে নিজে একবার অপমানিত হয়ে এসেছেন। অবনী এমন ভাব দেখিয়েছে যেন ওঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। ছিল না। কি করে যে মানুষ এত বদলে যায়। এক গ্লাস জল চেয়েও পাননি।

সে-সব কথা উনি অসিতাকে কিছু বলেননি, বলতে পারেননি। ওঁর অপমান অসিতাও সহ্য করতে পারবে না। উল্টে নিরূপা সম্পর্কেও উদ্বেগ বাড়বে। তাই সেবার অবনীর ওখানে নিরূপাকে রেখে এসে মিথ্যে করে বানিয়ে বানিয়ে বলেছিলেন, দিব্যি কথা-টথা তো বললে অবনী।

নিজেও ভেবেছিলেন, মিটে গেছে।

মেটেনি, বরং আরও খারাপের দিকে চলে গেছে ওদের সম্পর্ক। তা না হলে সুইসাইড করতে যায়!

অসিতা বললেন, ভাবছি আমিই একবার যাব অবনীর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দমোহন বাধা দিয়ে উঠলেন। ওঁর ভয় অসিতাকে যদি ওঁর মতই অপমানিত হতে হয়। আঘাত পাবে। তার চেয়ে বড় কথা বেচারী অসিতা তবু আশা নিয়ে আছে। সেটুকুও চলে যাবে।

চোখের সামনে অবনীর ব্যবহার দেখলে ও সহ্য করতেই পারবে না।

কিন্তু এখন তো চিন্তা নিরূপাকে নিয়েই। ওর মুখে এতদিন দুঃখকষ্টের ছাপ ছিল, তবু এক সান্ত্বনা। এখন ও কেমন যেন বদলে গেছে।

সমীরণকে ওঁর খারাপ লাগেনি। ভদ্র বিনয়ী। সবচেয়ে ভাল লেগেছে ওর চালচলন একেবারে সাদাসিধে।

কিন্তু ওর কথা বলতে গিয়ে নিরূপা এত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে কেন।

নিরূপার এই বয়সটাকে ওঁর বড়ো ভয়।

একদিন অভি সমীরণকেও মিলিটারি টাট্টু দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল শুনে অসিতা ভয় পেয়েছিলেন। অবনী যদি দেখতে পায়, অবনী যদি শোনে। অন্য সময় হলে কিছু যায় আসত না। এখন হয়তো একটা অপবাদ দিয়ে বসবে।

নিরূপার কাছে শুনে আরও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অর্থাৎ সমীরণ তার পরও এসেছে অভির কাছে, অর্থাৎ নিরূপার কাছে।

নিরূপা উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠেছে, জানো মা, সমীরণবাবুদের বাড়িটা কি চমৎকার। ওঁর মার যেমন ঠাকুর ঠাকুর চেহারা, আর বোনের দুটো যমজ ছেলে হামটি-ডামটি!

বলতে গিয়ে নিরূপার চোখ হেসে উঠেছিল। কি মনে পড়ে যেতেই হেসে লুটোপুটি।

অসিতা নিরূপাকে কিছুই বলতে পারেননি, সাবধান করতে পারেননি।

একটা দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছেন আনন্দমোহন। অসিতাও। কি করবেন কিছুই ঠিক করতে পারছেন না। নিরূপা আজকাল প্রায়ই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। আগেও হত। কিন্তু তখন ওর মুখের ওপর একটা ব্যথার ছাপ থাকত! এখন অন্য রকম।

একদিন হঠাৎ বলে উঠেছিল, কই সমীরণবাবু তো আর এলেন না।

অসিতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, কি যেন খুঁজেছিলেন। আনন্দমোহন অবশ্য নিজের মনকে স্তোক দিয়েছেন, একা-একা বেচারী হাঁপিয়ে ওঠে। এ বাড়িতে আমরা দুই বুড়োবুড়ি, সমীরণের সঙ্গে তবু গল্প করতে পায়। সেজন্যেই।

নিরূপাকে অবনীর কাছে ফিরে যাওয়ার কথা বলতে সাহস হয় না। একবার ভেবেছেন নিজেই গিয়ে দিয়ে আসবেন। কিন্তু তখনও দুশ্চিন্তা থেকে যাবে। মেয়েটা কেমন আছে, কেমন থাকছে। অবনী ভাল ব্যবহার করছে কিনা। ওদের মধ্যে কি যে ঘটেছিল জানতে পারেননি, জিগ্যেস করেও উত্তর পাননি। সাংঘাতিক কিছু নিশ্চয়ই, তা না হলে সুইসাইড করতে যাবে কেন।

অসিতা একবার জিগ্যেস করেছিলেন, নিরূপা কেমন এড়িয়ে গেছে।

আনন্দমোহন আর অসিতা মুখোমুখি বসেছিলেন। চুপচাপ। নিরূপা তার ঘরে, হয়তো শুয়ে আছে, কিংবা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে ছবি দেখছে।

আনন্দমোহন নিজের মনেই বলে উঠলেন, কষ্ট শুধু আমাদেরই, আমরা নিজেদের বদলে ফেলতে পারলাম না।

সত্যি, চোখের সামনে সবাই বদলে যাচ্ছে। এ এক ভোগসর্বস্ব ভ্রষ্টতা সকলকে পেয়ে বসেছে। এরা কোথায় যেতে চায় বুঝতে পারছেন না, কোন্ গন্তব্যহীন গন্তব্যে।

আমরাই শুধু পড়ে আছি মাটির নীচে? শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ, দুঃখ পাও। গাছটা কেমন সগর্বে আকাশে মুখ তুলে দাঁড়িয়েছে, দাঁড়িয়ে আছে। আর অহঙ্কারে হাতে কুড়ুল নিয়ে শিকড়টাই কাটছে।

ওরা আমাদের জন্যে দুঃখ পায় না, কষ্ট পায় না। বরং লজ্জা পায়। নিজেদের অতীতকে সবাই মুছে ফেলতে চাইছে, এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন যেখানে পৌঁছেছে সেখানেই সে ছিল চিরকাল। অতীতটা সবারই কাছে যেন লজ্জার। আমরাই শুধু ভেবে মরি, ওদের জন্যে কষ্ট

হয়। ওদের সুখী দেখতে পেলে আমাদেরও সুখ। অথচ আমরা তো জানি না ওরা কিসে সুখী হবে।

হয়তো এটাই সুখ, এই ভোগের প্রতিযোগিতায় নিজেদের বিকিয়ে দেওয়া। এই শিকড়-ছেঁড়া বেড়ে ওঠা জীবন।

অভি আর চন্দনাকে দেখে তো মনে হয় ওরা যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। ওরা তো সুখী। তবু আনন্দমোহন কেন ব্যথা পান, অসিতা কেন থমথমে মুখে বসে থাকেন। শুধুই দূরে সরে গেছে বলে? ওদের ঐ কোম্পানির ফ্ল্যাটে নাকি বাপ-মার গিয়ে থাকার নিয়ম নেই। কার কাছে যেন শুনেছিলেন। অভি অবশ্য বলেনি। নিয়ম থাকলেও কি উনি যেতেন নাকি নিজের এই ছোট্ট বাড়িটা ছেড়ে। অনেক কষ্টে অনেক স্বপ্ন আর পরিশ্রম দিয়ে এ-বাড়ি বানিয়েছিলেন চাকরি করতে করতে, সে তো ঐ অভির কথা ভেবেই। আমরা তো কোথাও একটা স্থির হয়ে বসার কথা ভাবতাম, ওরা ছুটে বেড়ায়। আমরা চাকরিতে ঢুকে একটু একটু করে ওপরে উঠেছি, ওরা সারাজীবন শুধু চাকরি খুঁজে বেড়ায়। অভি তো একটা ছেড়েছে, আরেকটা ধরেছে, ও না করলে নাকি উন্নতি হয় না। নিজেদের পিঠে ওরা সব সময় 'ফর সেল' টাঙিয়ে রেখে দেয়। অভির চোখে আমরা বোধহয় নির্বোধ। নিজেদের সস্তায় বিকিয়ে দিয়েছি। সবই ঠিক, আমরা আমাদের পরিশ্রম সস্তায় বিকিয়ে দিয়েছি, কিন্তু নিজেদের বিকিয়ে দিতে হয়নি। ওরা খুব চড়া দরে নিজেদের বেচতে জানে, কিন্তু নিজেকেই বিকিয়ে দেয়।

তাই তো অভির জন্যে এত কষ্ট। এত কাছে থেকেও সেজন্যই ওরা এত দূরে।

মাঝে মাঝেই ছটফট করে ওঠেন অসিতা, ফোন করে একটা খবর নাও, কিংবা যাও একবার।

ওরা অনেক দূরে সরে গেলে এত দুঃখ ছিল না। দূর কি আর শুধু দূরত্বে? একই ঘরে পাশাপাশি থেকেও। হয়তো পাশাপাশি একই বিছানায় শুয়েও অবনী আর নিরূপা পরস্পর থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।

অভি কি আজকাল খুব বেশি ড্রিঙ্ক করে? ওর চেহারাটা সেদিন ভাল লাগেনি। মুখের সেই ঝকঝকে ভাবটা নেই।

চন্দনা আর অভির কি আজকাল তুচ্ছ ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া হয়? না, ওদের মধ্যে কদাচিৎ ঝগড়া হতে দেখেছেন। বিয়ের পর তো এখানেই, এ বাড়িতে থাকত। একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে অভি কি যেন বলেছিল চন্দনাকে। চন্দনার ছলছল চোখ দেখে আনন্দমোহন ব্যথা পেয়েছিলেন। অভিকে ধমক দিয়ে মিটিয়ে দিয়েছিলেন। অসিতাও বুঝিয়েছেন অভিকে, তোর ইচ্ছে-অনিচ্ছেই সব নয়, ওরও ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে।

তখন তো কেউ একা ছিল না। সবাই মিলে একটা সংসার। কারও দুঃখের, কারও সুখের। কিন্তু দুঃখ সবাই ভাগ করে নিত। সুখ সকলে মিলে উপভোগ করত।

এখন সকলেই একা হয়ে যাচ্ছে। এখন আর কোন উপায় নেই, শুধু দুঃখ পাওয়া ছাড়া।

দুশ্চিন্তা শুধু নিরূপাকে নিয়ে।

আনন্দমোহন আর অসিতা মুখোমুখি, চুপচাপ।

আনন্দমোহন বললেন, অবনীর কাছে তো যাব, নিরূপাকে একবার জিগ্যেস করে দেখ।

নিজের বুদ্ধি বিবেচনার ওপর আনন্দমোহনের আর কোন আস্থা নেই। অবনীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে আরও খারাপ হয়ে যাবে না তো। আরও খারাপ? হেসে ফেললেন, দুঃখের হাসি। কিন্তু নিরূপার একটা মতামত নেয়া দরকার।

টিং করে একটা ঘণ্টি বাজল।

ডাক-পিওন লেটার-বক্সে চিঠি দিয়ে যাবার সময় এমনি হাল্কা করে কলিং বেল টেপে।

চিঠি হয়তো।

আনন্দমোহন বেরিয়ে গেলেন। কার চিঠি কে জানে। আজকাল চিঠিপত্র কমই আসে। দূর সম্পর্কের গরিব আত্মীয়-টাত্মিয়রা কখনও কখনও লেখে, কারও ছেলের চাকরির জন্যে, কেউ নিজের দুঃস্থ-অবস্থার কথা জানিয়ে। চিঠি পেয়ে হাসেন। ছেলে এত বড় চাকরি করে, ওদের ধারণা হয়তো বাপের কথায় একটা চাকরি হয়ে যাবে। কিংবা উনি তো এখন খুবই সচ্ছল, ছেলের হাজার হাজার টাকা মাইনে, পঞ্চাশ একশো টাকা পাঠাতে কি আর অসুবিধে। ওঁর বিধবা পিসী তো মেয়ের বিয়ের জন্যে টাকা ধার চাইতে এসেছিল, মুখ শুকনো করে চলে যাবার সময় বললে, ট্রেন-ভাড়াটাই গচ্চা! আনন্দমোহনের মনে হয়েছিল, কথাগুলোর মধ্যে যেন একটা অভিশাপের কণ্ঠস্বর আছে, নিজের অসহায়তায় চোখে জল এসে গিয়েছিল।

সেই রকম কারও চিঠি ভেবে গিয়েছিলেন আনন্দমোহন।

ফিরে এলেন, হাত থরথর করে কাঁপছে, সারা শরীব, আনন্দে না উদ্বেগে, বুঝতে পারলেন না।

অসিতার সামনে এসে চিঠির খামখানা এগিয়ে দিলেন, চাপা গলায় বললেন, দ্যাখো তো, ভাল করে, দ্যাখো, মনে হচ্ছে অবনীর লেখা। গলার স্বব কেঁপে গেল।

অসিতা দেখলেন।—হ্যাঁ তাই তো মনে হচ্ছে! নিরূপার নাম লেখা। তবে···

আনন্দমোহন তখনও নিঃসন্দেহ নন। কতকাল আগে দেখেছেন অবনীর হতের লেখা, তখন নিরূপা এখানে থাকলে, বিয়ের পর পরই ঘন ঘন চিঠি আসত। তাই হাতের লেখাটা এখনও মনে আছে। খামের ওপর ঠিকানাটা ঠিক সেইরকমই।

আনন্দমোহন বললেন, অবনীরই মনে হচ্ছে। কি জানি, নাও হতে পাবে।

আনন্দমোহন দ্রুত পায়ে নিরূপাব ঘরে ঢুকলেন।—তোব চিঠি, তোর চিঠি। আগ্রহে আনন্দে ওঁর গলার স্বর উত্তেজিত।

নিরূপাও উৎসুক হযে তাকাল। শুয়ে ছিল, ঝট করে উঠে বসল। ব্যগ্র হযে হাত বাড়াল।

বাবার হাত থেকে চিঠিটা যখন নিল, আনন্দমোহন দেখলেন নিরূপাব সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

চিঠিটা হাতে নিল নিরূপা।

ঠিকানা দেখল।

আনন্দমোহন ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করলেন, অবনীর?

নিরূপা তাকাল বাবার মুখের দিকে। দেখল, বাবার পিছনে পিছনে মা এসে দাঁড়িয়েছে। দুজনেরই মুখ উৎসুক হয়ে আছে।

নিরূপা ছোট্ট করে বললে, হুঁ।

তারপর আবার খাটে শুয়ে পড়ল, ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাল, যেন যে ছবিটা দেখছিল সেটাই বেশি জরুরী।

আনন্দমোহন আর অসিতা ভাবলেন, ওঁদের সামনে চিঠিটা খুলে পড়তে নিরূপার লজ্জা করছে। সেজন্যেই ওঘর থেকে চলে এলেন।

চিঠি যখন এসেছে সেটা সুখবর, সন্দেহ নেই। আনন্দমোহন আর অসিতা পরস্পর চোখাচোখি করে হাসলেন। দীর্ঘকাল পরে, যেন এক যুগ পরে ওঁরা পরস্পরেব মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে পারলেন।

নিরূপা কিন্তু খামটা খুলেও দেখল না। বিছানার তলায় রেখে দিল। ঐ চিঠির জন্যে ওর এখন আর কোন ব্যগ্রতা নেই। জানতে ইচ্ছে নেই অবনী কি লিখেছে।

ও উৎসুক হয়ে উঠেছিল চিঠির কথা শুনে। সে অন্য কারও চিঠি। অবনীর নয়।

নিরূপার হাসি পেল। অবনী খোঁজ নিয়েছে কিনা, অবনী কোন চিঠি লিখেছে কিনা, জানবার জন্যে ও একসময় উৎসুক হয়েছিল। দাদার কাছে বৌদির কাছে বলতে পারেনি। তখন সমীরণকে একমাত্র আশ্রয় মনে হয়েছে। মনে হয়েছে তার কাছে সব কথা খুলে বলা যায়। বলেছে। বলে ফেলে বুক হাল্কা হয়ে গেছে। তারপর তাকেই বলেছে, এ-বাড়িতে এসে খবর নিয়ে যেতে।

এখন ভাবলেও কষ্ট হয়। সমীরণকে ও বড়ো বেশি কষ্ট দিয়েছে।

তখন শুধু নিজের কথাই ভাবছে, নিজের দুঃখের কথা। তার চেয়েও বড, নিজের লজ্জার কথা।

এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সব। ও যখনই বলল, 'আমি ওকে ভালবাসি, সত্যি ভালবাসি', তখন সমীরণের মুখখানা কি রকম যেন হয়ে গেল! আহত এবং একটা চাপা ব্যথা লুকোনোর চেষ্টা।

তখন বুঝতে পারেনি।

কিন্তু কখন থেকে যে একটু একটু করে ও বদলে গেছে, নিরূপা নিজেই জানে না। ওর সব দুঃখ কষ্ট এখন অলীক মনে হচ্ছে। সব মিথ্যে হয়ে গেছে। অবনীর জন্যে ওর কোন কষ্ট নেই।

এই তো চিঠিটা পড়ে রয়েছে। হাত বাড়ালেই নিতে পারে, ছিঁড়ে ফেলতে পারে কিংবা খুলে পড়তে পারে। কোন কিছুতেই ওর আগ্রহ নেই।

এখন সব যেন শুধুই একটা দুঃস্বপ্ন। ঘুম ভেঙে যেতেই মুছে গেছে। এখন হাসি পায়। কিংবা বড়ো জোর ছিঁড়ে ফেলে না দিয়ে ঐ খামটার মতই ফেলে রেখে দেওয়া যায়।

যে-ভাবে অবনী একদিন ওর চোখের জল দিয়ে লেখা চিঠিগুলো ফেলে রেখেছিল, খুলে দেখার আগ্রহ হয়নি।

সবাই জিগ্যেস করেছে, কেন এই পাগলামি করতে গিয়েছিলি, কি হয়েছিল বল না।

নিরূপা কাউকে বলেনি। বলতে পারেনি। সমীরণকেও সব কথা নয়।

সেদিন অবনীর বইগুলো ও যত্ন করে বুক-শেলফে গুছিয়ে রাখতে গিয়ে দেখল, একটা বইয়ের মাঝখানে কি সব রয়েছে। খুলে দেখে প্রথমটা ভেবেছিল, পড়া চিঠি। নিজেরই লেখা ঠিকানা দেখে ভেবেছিল, নিরূপার চিঠিগুলো যত্ন করে তুলে রেখেছে অবনী। খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু সেগুলো নাড়াচাড়া করতে গিয়েই ধাক্কা খেল। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল ও। একটা খামও খুলে দেখেনি অবনী। খুলে পড়েনি। তেমনি পড়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে ওর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছিল। এক অসীম শূন্যতা। চোখ ঠেলে জল এসেছিল। মনে হয়েছিল অবনীর কাছে ওর কোন দাম নেই। একেবারে মূল্যহীন। ওর হৃদয়কে ছুঁতে পারেনি অবনী, ছুঁতে চায়নি। ও শুধু অবনীর বিছানার পুতুল, ক্লাবে সঙ্গ দেবার পুতুল, পার্টিতে অবনীর গ্ল্যামার বাড়ানোর সাজ-সরঞ্জাম। ওর অফিসের চেম্বারে যেমন রিভলবিং চেয়ার, মেঝেতে কার্পেট, লাল রঙের টেলিফোন, ডিক্টাফোন, পাশে সুন্দরী মেয়ে-সেক্রেটারি, আরও কত কি দিয়ে ওর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়, তেমনি বাইরের জগতে নিরূপাও শুধু অবনীর ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সাজসরঞ্জাম।

রাগে দুঃখে অপমানে নিরূপা কি করবে ঠিক করতে পারছিল না।

সারাদিন ও গুমরে গুমরে কেঁদেছে।

বাবা ওকে অবনীর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসার সময় সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, যদি অসহ্য লাগে, চলে আসবি। চলে আসার পথ তো তোর বন্ধ হয়নি।

নিরূপা প্রথমে সে-কথাই ভেবেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মার দুঃখ চাপা থমথমে মুখ ওর

চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। নিজের কষ্ট তবু সহ্য করা যায়, ওর জন্যে বাবা-মার কষ্ট ও নিজের চোখেই যে দেখেছে।

না, অবনীকে ও কিছু বলবে না। মুখ বুজে সব সহ্য করবে!

অবনী বড় হতে চায়। সকলের মাথার ওপরে পৌঁছতে চায়। আই মাস্ট গো আপ, দ্য স্কাই ইজ দ্য লিমিট। ও একটা বিরাট বড় কোম্পানিতে চাকরি করে। কিন্তু তার চেয়েও তো বড় কোম্পানি আছে। কোথায় পৌঁছতে চায় এরা? যে যত উপরেই উঠুক, তারও ওপরে কেউ আছে। বাবা বলত. যে যত হুকুমই দিতে পারুক, তাকে কারও না কারও হুকুম শুনতে হয়।

অবনী একদিন খুব খুশি-খুশি মেজাজে নিজেদের অফিসের গল্প বলছিল। হাসতে হাসতে বলেছিল, আমাদের অফিসে পাঁচ রকম বাথরুম, বুঝলে রূপা। তোমার দাদাদের অফিসে আবার সাত রকম। বলে হা হা করে হেসেছিল।

নিরূপা বুঝতে পারেনি। অবাক হয়ে তাকিয়েছিল।

অবনী তখন হাসতে হাসতে বলেছে, অফিসারদেরই তিন রকম, বুঝলে। আমার ল্যাভাটরিতে এখন পিঙ্ক কমোড, গোলাপি। লিফ্‌ট পেলেই লাইট ব্লু কমোডে পৌঁছব। আর একেবারে ওপরে উঠলে ঝকঝকে সাদা।

কথাটা শুনে বিশ্বাসই হয়নি। হাসি পেয়েছিল। ও তো জানত মেয়েরাই শুধু শাড়ি গয়নার জন্যে হন্যে হয়। শাড়ি গয়না দিয়েই তাদের ভোলানো যায়। পুরুষ-মানুষও তাহলে সেই একই রকম। লাল টেলিফোন, গোলাপি তোয়ালে, পিঙ্ক কমোডের জন্যে এত ছোটাছুটি? তার জন্যে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে অসুখী করা?

নাকি এও এক ধরনের নেশা?

অবনী একদিন পার্টি থেকে ফিরে বলেছে, তোমাকে আজ এত ক্যাড লাগছিল! ওরা তোমাকে লক্ষ করে ঠোঁট টিপে হাসছিল।

সেদিন কান্না পেয়ে গিয়েছিল নিরূপার। তবু চেষ্টা করেছে নিজেকে এই সব সমাজের যোগ্য করে তুলতে। অবনীর যোগ্য করে তুলতে।

কিন্তু বইয়ের ফাঁকে চিঠিগুলো দেখার পর ওর মনে হল কিসের জন্যে ও নিজেকে এভাবে বিকিয়ে দিচ্ছে! কেন দেবে? ও তো শুধুই অবনীকে ভালবেসে এসেছে। যা কিছু করেছে সেই ভালবাসার জন্যে। কিন্তু অবনী তো ওর হৃদয় স্পর্শ করতে চায়নি। চাইলে চিঠিগুলো খুলে পড়ত।

অবনী সেদিন খুশি-খুশি মুখে অফিস থেকে ফিরে এল।

মনের মধ্যে সমস্ত রাগ লজ্জা অপমান চাপা দিয়ে নিরূপাও হাসল।

আর অবনী হাসতে হাসতে ওর কাছে এগিয়ে ওর গালে একটা ছেলেমানুষি চিমটি দিয়ে বললে, সব ব্যবস্থা করে এলাম।

অবাক হয়ে নিরূপা প্রশ্ন করল, কিসের ব্যবস্থা?

ওর মনের ভিতরটা তখন জ্বলছে অপমানে, ওর চিঠিগুলো অবনী খুলে পড়েনি বলে। অবনীর এই আদরে আগে হয়তো ও গলে পড়ত, এখন অসহ্য লাগছে।

অবনী কিছুই বুঝতে পারল না। ও কোনদিনই তো বুঝতে চায়নি।

অবনী হাসতে হাসতে বললে, ম্যানার্স আর এটিকেট শেখাবার একটা স্কুল হয়েছে, সেখানেই ভর্তি করে দেব তোমাকে। মাসে অবশ্য চারশো করে লাগবে।

ম্যানার্স আর এটিকেট! দপ্‌ করে জ্বলে উঠল নিরূপা।

অবনীর চোখের দিকে তাকাতে ওর ঘৃণা হল। এই লোকটা মাসে চারশো টাকা খরচ করে আমাকে ম্যানার্স আর এটিকেট শেখাতে চায়! যেদিন বাবা আমাকে সঙ্গে করে ফিরিয়ে

নিয়ে এসেছিল, এই অবনী কথা বলেনি বাবার সঙ্গে, সম্মান দেখায়নি, আতঙ্কে অস্বস্তিতে দুর্ভাবনায় বাবার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। এক গ্লাস জল চেয়ে পায়নি, ম্যানার্স শেখাবে।

নিরূপা তেজী মেয়ের মত বলে উঠল, কি শেখাবে ? আমাকে তুমি কি শেখাতে চাও ?

অবনী হেসে হাল্কা করার চেষ্টা করল।

—ম্যানার্স, এটিকেট, আরে সবাই শিখছে, বড় বড় অফিসারদের বউরা। এ-সব আমিও তো শিখেছি, জন্মে থেকেই জানতাম না। আমার বাবা তো দেশপ্রেম দেখিয়েছে, মফস্বল কোর্টের উকিল ছিল।

দাঁতে দাঁত চেপে নিরূপা বলে উঠল, শিখেছ ? তোমরা, তোমাদের ওই সমাজের মানুষগুলো ? একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল ও।

আর অবনী রেগে গিয়ে বললে, হ্যাঁ,এবং তোমাকেও শিখতে হবে।

নিরূপা দৃঢ় কণ্ঠস্বরে বললে, কিন্তু আমি যা আছি তাই থাকতে চাই। গোলাপি কমোড থেকে নীল কমোডে পৌঁছতে না পারলে তোমার জীবন ব্যর্থ হতে পারে, আমি তার জন্যে সব কিছু বিসর্জন দিতে পারব না। আমি অনেক সহ্য করেছি, আর নয়।

অবনীও প্রচণ্ড রেগে গেল।—দেন উই মাস্ট সেপারেট আওয়ারসেলভ্‌স। ডিভোর্স নেব, একটা কাঁদুনে মেয়ের জন্যে আমি আমার ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিতে পারি না।

বলেই প্রচণ্ড রাগের পদক্ষেপে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে নিরূপার সমস্ত বুক হাহাকার করে উঠল। এ কোন্ মিথ্যার জগতে বাস করছিল ও। ওর কাছে এ-সবই, অবনীর ধাপে ধাপে উন্নতি, এই ব্যস্ততার উপদ্রব, পার্টিতে যাওয়া, সাজ পোশাক, এ-সবই মূল্যবান ছিল শুধু একটাই কারণে। ও অবনীকে ভালবাসত।

কিন্তু ওর জন্যে সেই মানুষটার মনেব ভিতরে এতটুকু জায়গা নেই।ওপরে ওঠার অনেক রকমের সিঁড়ির মত নিরূপাও কি একটা সিঁড়ি মাত্র ? আর কিছু নয় !

সমস্ত বুক ঠেলে হু হু করে কান্না এল নিরূপার। ওর সমগ্র পৃথিবী যেন মুহূর্তে শূন্যতায় ভরে গেছে। ও একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেছে নিজের চোখেই। 'দেন উই মাস্ট সেপারেট আওয়ারসেলভ্‌স !' 'ডিভোর্স নেব।' কথাগুলো ওর মাথার মধ্যে ঘূর্ণির মত ঘুরল।

নিজেকে এত অসহায় ওর কখনও লাগেনি। ডিভোর্স কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল ওর কোথাও যাবার নেই, অবনীকে বাদ দিয়ে ওব যেন কোন অস্তিত্বই নেই।

কোথায় যাবে, কি করবে ও। এই বাড়িটার বাতাস যেন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। ও সহ্য করতে পারছে না।

না, বাবা মার কাছে যাবে না। বাবার অনেক দুঃখ, দাদাকে নিয়ে, দাদার মেয়ে পিঙ্কিকে দেখতে পায় না, আমাকে নিয়েও বাবার তো দুঃখের শেষ নেই।

এই বদলে যাওয়া সমাজ, এই শূন্যতার অট্টহাসির সঙ্গে যারা মানিয়ে চলতে পারছে না, বাবা তো তাদেরই একজন। ওদের অনেক দুঃখ, আর দুঃখ বাড়িয়ে লাভ নেই।

নিরূপা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল একা একা, হাঁটতে হাঁটতে, হাঁটতে হাঁটতে একটা বাসে উঠে পড়ল। ভিড়ে ভরা বাস। হট্টগোল। আঃ, সেই কলেজে পড়ার সময় বাসে ট্রামে উঠেছে। ঝুলতে ঝুলতে বন্ধুদের সঙ্গে হাসি গল্প ঝগড়া করতে করতে কোন কষ্ট মনে হত না। এখনও হচ্ছে না।

কোথায় আর যাবে। গঙ্গার ধারে। শান্ত হাওয়ায়। আউটরামে।

তারপর কি হয়েছে, কি ভাবে বাড়ি ফিরেছে, ওর কিছু স্পষ্ট মনে নেই।

সে-সব দুঃস্বপ্নের দিন। অবনী তখন নীল কমোডের স্বর্গে পৌঁছতে চাইছে। আর নিরূপা খুঁজছে শান্তি।

আশ্চর্য, নিরূপা বুঝতে পারে না, ও কি ভাবে বদলে গেল।

বাবা চিঠিটা যখন এনে দিল, ও উদগ্রীব হয়ে হাত বাড়িয়েছিল, ওর সমস্ত মন জুড়ে তখন সমীরণ। ও ভেবেছে সমীরণের চিঠি। হয়তো দাদার ওখানে গিয়ে ফিরে গেছে। শুনেছে নিরূপা নেই। তাই।

নিরূপার এক-একবার মনে হয়েছে ফোন করে সমীরণকে জানাবে আমি এখানে, আমি এখানে। লজ্জায় পারেনি। এখন সমীরণের কাছেই লজ্জা। কেন, কে জানে।

সেদিন সমীরণের গাড়িতে ফিরে আসতে আসতে কি যেন হয়ে গেছে ও।

সমীরণ বলেছিল, এমন সুন্দর মেয়েদের কেউ দুঃখ দিতে পারে আমি ভাবতেই পারি না।

—দুঃখ তো আপনিও দিতে পারেন। নিরূপা সমীরণের চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করেছে। কি যেন খুঁজেছে।

সমীরণদের বাড়িটার মধ্যে ওর মন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত সহজ স্বাভাবিক। সমীরণের মা বলছে, ঠাকুর তোমার সব দুঃখ দূর করে দেবে। চিকো আর তার স্বামীর কপট ঝগড়া, হামটি-ডামটির উপদ্রব, মজার মজার কথা।

অবনীর চিঠিটা খুলে পড়তেও ইচ্ছে নেই। ওটা পড়ে থাক। ওটা এখন অর্থহীন।

দরজায় একটা যেন বেল বাজল। কেউ এসেছে হয়তো।

নিরূপা তেমনি শুয়ে রইল।

—ও আবার কেন এসেছে রে ? মার মুখে বিব্রত ভাব।

—কে ? উঠে বসল নিরূপা।

মা বললে, সেই সমীরণ। একটু থেমে বললে, এত মেলামেশা আমার ভাল লাগছে না। অবনী যদি দেখে, কারও কাছে শোনে···

নিরূপা হেসে উঠল।

মা বুঝতে পারল না। বললে, ওরা শুধু বাইরেই আধুনিক, বাইরেই যত চাকচিক্য, অবনীদেরও মনের ভেতরটা সেই আগেকার দিনের মতই।

নিরূপা হাসল। দ্রুত পায়ে চলে এল বসার ঘরে।

—আমি তো ভেবেছিলাম, রাগ করে আসবেন না হয়তো।

সমীরণ অবাক হল।—রাগ, কেন ?

—খবর দিয়ে আসিনি বলে। এত একা-একা লাগছিল। বাবা গিয়ে নিয়ে এল হঠাৎ···

হাসতে হাসতে বললে, বাড়িতে একটুও ভাল লাগছে না। চলুন একটু বেড়িয়ে আসি।

নিরূপা চট করে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাবা আর মা মুখোমুখি বসে ফিসফিস করে কি বলাবলি করছে। দুজনেরই মুখে দুশ্চিন্তা। ওকে দেখে হঠাৎ চুপ করে গেল।

নিরূপা বললে, আমি একটু বেড়াতে যাচ্ছি মা। তোমরা ভেব না।

আনন্দমোহন আর অসিতাকে বিব্রত দেখাল। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

—চলুন।

বাড়ি থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল এক মুহূর্ত।

সমীরণ বললে, কোথায় যাবেন ?

নিরূপা এক মুহূর্ত কি ভাবল। বললে, সেই জায়গাটা দেখিয়ে আনবেন চলুন, সেই যেখানে আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিলাম।

সমীরণ শিউরে উঠল।

সমীরণ বললে, কিন্তু অবনীবাবু আসবেন বলেছেন।

সমীরণের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল নিরূপা।

সমীরণ যেন অপরাধ করেছে এমনি ভঙ্গিতে বললে, আপনার কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। একদিন ওঁর কাছে গিয়েছিলাম। কালও গিয়েছি। বললেন, চিঠি দিয়েছেন। আজ হয়তো আসবেন উনি।

নিরূপা হেসে উঠল। বললে, কিন্তু আমার এখন তো কোন কষ্ট নেই। সব মুছে গেছে।

একটু থেমে মুখ নিচু করে বললে, আপনি বুঝবেন না, আপনি কিছু বুঝতে পারেন না। আমার এখন অন্য কষ্ট।

নিরূপা দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।—চলুন, চলুন। সেই জায়গাটা দেখব। ওখান থেকেই তো জীবনটা বদলে গেল।

ওদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা কারা খুঁড়ে দিয়ে গেছে। টেলিফোন কিংবা সি এম ডি এ। সে জন্যেই গাড়িটা অনেক দূরে রাখতে হয়েছে সমীরণকে।

ওরা খানাখন্দ ডিঙিয়ে মাটি জড়ো করা ঢিবিব ওপব দিয়ে হেঁটে চলল ; আর তখনই একটা গাড়ির শব্দ শুনল। পর পর কয়েকটা হর্ন।

খোঁড়া রাস্তার ওধারে গাড়ি থামিয়ে অবনী নামল। গাড়ি থেকেই ওদেব দেখতে পেয়েছে।

অবনী ডাকল, রূপা ! রূপা !

সমীরণ থেমে পড়েছিল। বললে, নিরূপা, দাঁড়াও।

নিরূপা ফিরে তাকাল। দেখল অবনীকে। কিন্তু এখন আব ওব মনেব মধ্যে অবনীব কোন জায়গা নেই।

নিরূপা বললে, চলুন চলুন।

হেঁটে যেতে যেতে সমীরণের হাত ধবে টানল। হাত ধরে রইল।

অবনী ছুটে আসছে।—রূপা ! নিরূপা ! আমি এসেছি।

—সমীরণবাবু ! আর্তনাদের মত শোনাল অবনীর গলার স্বব।

অবনী ছুটতে ছুটতে আসছিল, বেশ খানিকটা দৌড়ে এসেছে। হঠাৎ থমকে থেমে পড়ল, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ওদেব দিকে।

অপমানে লজ্জায় ফিরে যেতে লাগল।

সমীরণ বললে, নিরূপা দাঁড়াও।

নিরূপা ফিরে দাঁড়িয়েছে। অবনীকে দেখছে। অবনী ফিরে যাচ্ছে।

কিন্তু নিরূপা নির্বিকার।

সমীরণ তাকিয়ে রইল। অবনী চলে যাচ্ছে। সেই অবনী। যে অনেক ওপরে উঠে গেছে, সকলের মাথা ছাড়িয়ে, সেই মানুষটা এখন পরাজিত, ধসে পড়া, নুয়ে পড়া নিঃস্বতার মত চলে যাচ্ছে।

অবনীর জন্যে সমীরণের বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল।

কিন্তু নিরূপা নির্বিকার। এখন আর অবনী ওকে ছুঁতে পারছে না। নিরূপার কাছে এখন ও একটা অচেনা মানুষ। ওর ডাক এখন নিরূপার কাছে অচেনা ঠেকছে। ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর দুঃস্বপ্নে দেখা একটা মানুষেব মুখের মত।

নিরূপা নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে। এত অচেনা ঠেকছে অবনীকে !

অবাক দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নিরূপা। অবনী লজ্জায় অপমানে ছুটে চলে যাচ্ছে, নাকি নিরূপা নিজেই দ্রুত অতি দ্রুত পিছনে সরে যাচ্ছে। দূরে, ক্রমশ আরও দূরে। অবনীর চেহারাটা ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে, অবনী ছোট হয়ে যাচ্ছে, ছোট হয়ে যাচ্ছে, ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। অচেনা মানুষের মত অস্পষ্ট।

নিরূপা সমীরণের হাতখানা শক্ত করে ধরল।

বললে, চলুন। সেই জায়গাটা দেখব একবার, যেখানে মরতে চেয়েছিল একটা মেয়েকে আপনি বাঁচিয়েছিলেন। একটু থেমে সমীরণের চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললে, কিংবা বাঁচতে চায় একটি মেয়েকে।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে গাড়িটার কাছে এগিয়ে গেল। খানাখন্দের ওপারে রাখা গাড়িটার কাছে।

আর আনন্দমোহন তখনও দাঁড়িয়ে আছেন বাড়ির দরজার সামনে। চৌকাঠে হাত রেখে। আনন্দমোহন আর অসিতা দাঁড়িয়ে আছেন, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে দেখছেন।

সবই দুর্বোধ্য লাগছে। কিছু বুঝতে পারছেন না। চোখের সামনে সব কেমন বদলে যাচ্ছে। চেষ্টা করেও ধরে রাখতে পারছেন না সেই পুরনো পৃথিবীটাকে। শুধু চোখ মেলে দেখছেন, আর মুখ বুজে সহ্য করছেন। এছাড়া কোন উপায় নেই। দুঃখ পাওয়া, শুধু কষ্ট পাওয়া। আনন্দমোহন বোধহয় কাঁপছেন থরথর করে। তাঁর হাঁটু কাঁপছে।

সবাই বদলে যাচ্ছে। সবই বদলে যাবে। শুধু ওঁরাই নিজেদের বদলাতে পারলেন না।

—তুমি এমন করছ কেন ? অসিতার চোখে মুখে উদ্বেগ।—কি হচ্ছে তোমার, কি হচ্ছে বলবে তো !

অসিতা তাড়াতাড়ি অনন্দমোহনের হাতখানা কাঁধের ওপর দিয়ে নিয়ে এসে ওঁকে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলেন। থরথর করে কাঁপছেন আনন্দমোহন। মানুষটার এক্ষুনি কিছু না হয়ে যায়।

শেষের সীমানা

এগুলোর নাম কটেজ। হেমবাবুই বলেছিলেন আর কোন হাসপাতালে এ-রকম ব্যবস্থা দেখেননি।

হাসপাতালের লাল বাড়িটা মাঝখানে, সেই বিশাল বাড়িখানাকে ঘিরে ছোট ছোট কটেজ। একতলা, দুখানা ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম। চারপাশ কাঁটাতার আর মেহেদিগাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট্ট বাগান প্রত্যেকটি কটেজে। একটির সঙ্গে আরেকটির ছোঁয়াছুঁয়ি নেই। বাগানে ফুলের গাছ, গাছে ফুল। বেল জুঁই দোপাটি থেকে সূর্যমুখী। এই কটেজে রঙ করা টবে একটা লিলি গাছও ছিল।

একটু ওপর মহলে যাঁরা চাকরি করতেন তাঁরা এই কটেজ পেতেন, নিজের কিংবা পরিবারের কারও গুরুতর অসুখ হলে। হেমবাবু পেয়েছিলেন।

যেদিন খবর পেলাম হেমবাবু তাঁর মেয়ে সুধন্যাকে নিয়ে এই কটেজে উঠেছেন, সেদিনই প্রথম মনে হয়েছিল, সুধন্যার অসুখটা গুরুতব।

হ্যাঁ, এই কটেজটা। হাসপাতালেব মেন গেট দিয়ে ঢুকে বাঁদিকের প্রথমেই। গেটের পাশের বাড়িগুলো তখনও হয়নি। ফাঁকা ছিল, বেশ বড় একটা বাগান ছিল। কটেজের বাগানগুলোও মালিরা তদারকি কবত। কিন্তু সবাব ওপরে চোখ ছিল চীফ মেট্রনেব। খাঁটি ইংরেজ মহিলা, কিন্তু রুগী ও তার পবিবারেব লোকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভাঙা ভাঙা হিন্দি এবং বাংলা রপ্ত কবে নিয়েছিলেন। খুব কড়া মেজাজ, সদাসর্বদা সারা হাসপাতাল টহল দিযে বেড়াচ্ছেন। সবদিকে চোখ। ডাক্তারবাও ভয় পেতেন। রুগী হযে এলে, বড় বড় অফিসারবাও। সাবা হাসপাতাল ছিমছাম পবিষ্কার ঝকঝকে। করিডবে মিসেস মগ্যানেব উঁচু হিল্‌ সাদা জুতোব খুটখুট আওযাজ কানে এলেই সবাই তটস্থ।

হাসপাতালই যেন তাঁর প্রাণ। তবে সকলে তাঁকে ভয় পেত এবং সমীহ কবত অন্য কারণে। এ শহরের সি এম ই অর্থাৎ সর্বেশ্বর মিস্টাব মগ্যানের স্ত্রী ছিলেন এই মহিলা। কম বয়সে বিলেতে থাকতেও নাকি নার্সের চাকরি করতেন।

আড়ালে সবাই হাসাহাসি করে বলত, কি জাত রে বাবা, লজ্জা ঘেন্নাও নেই। এত বড় একজন অফিসার, খাস ইংরেজ, তার বৌ কিনা শেষে নার্সের চাকরি।

আসলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটা চাপা রাগ তো ছিলই, সেটা প্রকাশ করার সুযোগসুবিধে কেউ এ-শহরে বড় একটা পেত না। কোন কিশোরী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে তার লেডিজ সাইকেল থেকে পড়ে গেলে দূর থেকে প্রচুর হাততালি ও হাসি দিয়ে জ্বালা মেটাত কেউ কেউ। মেয়েটা রেগে গিয়ে 'বাস্টার্ড' বললে কেউ না বোঝার ভান করত, কেউ বেমালুম হজম করত।

এই যেমন চীফ মেট্রন মিসেস মগ্যানকে আড়ালে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। তখন নার্সিং প্রফেশন এবং হাসপাতাল দুই-ই ছিল অচ্ছুত। নার্স বেশির ভাগই ছিল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, কিছু বোধহয় কেরলী ক্রিশ্চান। কেবলী কর্ণাটকী পার্থক্য তখন কেউই জানত না, দক্ষিণের সকলকেই বলা হত মাদ্রাজী।

হাসপাতালের ওপর কাবও কোন আস্থা ছিল না। দূবে থাকতে পারলেই ভাল।

সেজন্যেই হয়তো এই কটেজেব ব্যবস্থা। রুগীকে নিয়ে এসে উঠত এখানে, পরিবারের দু-একজন এখানেই থাকত, এমনকি রান্নাবান্নাও। রুগী থাকত একটি পৃথক ঘরে, সেখানে হাসপাতালের প্রতিদিন বদলানো চাদর-বালিশের ওয়াড়। সিসটার এবং ডাক্তাবরা রাউন্ড

দিয়ে যেতেন। খাবার এবং দুধ আসত রুগীর জন্যে, হাসপাতাল থেকেই। আর মিসেস মগ্যানের কড়া ধমক, নিজেদের রান্না করা কোন খাবার রুগীকে দেওয়া হলে 'উইল থ্রো ইউ আউট অফ দি কটেজ।' সেই সাবধানবাণীতেই কাজ হত। কারণ সকলেই ছিল থরহরি কম্প। ব্যক্তিত্বের জন্যে, নাকি তিনি এ-শহরের সর্বেশ্বরের পত্নী বলে তা কিন্তু স্পষ্ট করে বলা যায় না।

সুধন্যা, যার ডাক নাম টিলু, ঠোঁটে ম্লান হাসি এনে হেমবাবুকে বলেছিল, না বাবা, মিসেস মগ্যানি খুব ভাল লোক। তুমি তো অফিসে চলে গিয়েছিলে, দুপুরে কি সুন্দর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গল্প করছিলেন।

টিলু আমাকে বললে, তোমারও থাকতে ইচ্ছে হবে।

ভয় পেয়ে আমি বলে উঠেছিলাম, না না বাবা, দরকার নেই হাসপাতালে থেকে।

হেমবাবুও হেসে ফেলেছিলেন আমার ভয় দেখে।

সুধন্যা লজ্জা পেয়ে বলে উঠেছিল, বাঃ রে, আমি কি তাই বলেছি।

আসলে বাগানে ঘেরা কটেজগুলো খুবই সুন্দর ছিল। সুবিধেও অনেক।

হেমবাবুদের বাংলোটা ছিল অনেক দূরে। নিত্যদিন দুবেলা আসা যাওয়া খুবই কষ্টকর। তাছাড়া মেয়েটা একা-একা থাকবে, সেও এক দুর্ভাবনা।

হেমবাবু তাঁর এক বিধবা বোনকে আনিয়ে বাংলোয় তাঁর জিম্মায় ছেলেকে রেখে স্বামী-স্ত্রী এখানে এসে উঠেছিলেন। এখান থেকেই অফিস করতেন। অফিস থেকে ফেরার সময় কোন কোনদিন বাড়ি হয়ে আসতেন। ছেলের সঙ্গে, বোনের সঙ্গে দেখা করে কে কেমন আছে খবর নিয়ে আসতেন।

টিলু তার দুর্বল শরীরটা বিছানা থেকে টেনে তোলবার চেষ্টা করতেই হেমবাবু তার পিঠে হাত রেখে সাহায্য করলেন।

টিলুর মা তখন হয়তো রান্নাঘরে, তা না হলে এ-সব সময় উনিই এগিয়ে আসেন। বাড়িতেও দেখেছি। কিন্তু টিলু যে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে জানা ছিল না। বিছানায় উঠে বসতেও যেন কষ্ট, পা দুটো খাট থেকে নামাতেও। হেমবাবু ওকে ধরে ধরে নিয়ে গেলেন, টিলুর মুখে কেমন একটা ঝাপসা হাসি, পারব, আমি পারব।

জানালার ধারে রাখা ক্যাম্বিসের ডেকচেয়ারে ও গা এলিয়ে বসল, তাকিয়ে রইল জানালার দিকে। বোধহয় দাদা, মানে অবু, আসছে কিনা দেখার জন্যে। আসার কথা।

আমি বললাম, চলি মেসোমশাই, আবার আসব।

হেমবাবু বললেন, এসো, মাঝেমাঝে এসো। ও তবু গল্প করতে পারে।

টিলু আমার মুখের দিকে তাকাল, একটু বিষণ্ণ হাসি হাসল, মাথা নামাল। যেন ঘাড় তুলে তাকাতেও ওর কষ্ট।

আমি ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পাশের ঘরখানায় উঁকি দিলাম। মাসীমা বেতের চেয়ারটায় বসে কি একটা সেলাই করছিলেন, চোখোচোখি হতেই তুলে দেখালেন, হেসে বললেন, অবুর মোজাটা ছিঁড়ে গেছে, সেলাই করছি। বলে হাসলেন।

বললাম, আজ চলি মাসীমা।

—এসো।

কটেজ থেকে বেরিয়ে এসে বাগানের ফটকটা খুলে আবার বন্ধ করার সময় জানালাটার দিকে তাকালাম।

এক্সপ্যান্ডেড মেটালের জালে জানালার ভিতরটা এমনিতেই আবছা, টিলুর মুখখানা আরও।

ছোটনকে খুঁজতে গিয়ে সারা হাসপাতালটার দিকে তাকালাম। ঐ বড় লাল বাড়িটা,

একপাশে ডাক্তারদের কোয়ার্টার্স, স্টাফ নার্সদের কোয়ার্টারের সারি, ফুলে ফুলে ভরা বিশাল বাগান, সব কেমন প্রাণহীন মনে হল। যেন কোথাও কোন আনন্দ নেই।

টিলু তো আগেও অসুস্থ ছিল, মাঝে মাঝেই জ্বর হত, কিংবা অন্য কিছু। আমাদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলতে আসত না, বড়ো জোর কোন কোনদিন চেয়ার টেনে নিয়ে চিক-তোলা বারান্দায় বসে খেলা দেখত। তারপরই শুনলাম, ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কটেজে আছে। শুনে খারাপ লেগেছিল, তবু ভাবতে পারিনি ও এত দুর্বল হয়ে গেছে।

খুঁজতে খুঁজতে ছোটনকে পাওয়া গেল রাস্তার ধারে একটা পান দোকানে, লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছে।

সিগারেট তখন কচিৎ কদাচিৎ আমিও খাই, লুকিয়ে লুকিয়ে। তারপর লবঙ্গ কিংবা এলাচ চিবিয়ে নিই। আসলে তখন তো আমরা সত্যি সত্যি বড় হয়েছি, অথচ কেমন যেন মনে হত আরও বড়রা তা স্বীকার করে না। ঐ সিগারেট খাওয়াটা আমাদের কাছে ছিল বড় হয়ে ওঠা।

ছোটন হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে এগিয়ে এল। বললে, শালা।

তারপর বেশ রাগের সঙ্গেই বললে, একা একা গেলি, আমাকে নিয়ে গেলি না। আধঘণ্টা ধরে ফুটওয়ার্ক করছি।

কথাটার মধ্যে কোন ইঙ্গিত ছিল কিনা জানি না আমার খারাপ লাগল। উত্তর দিলাম না।

ছোটনকে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ছোটন এর আগে কখনও ওদের বাড়ি যায়নি, টিলুর সঙ্গে আলাপও নেই। টিলুর দাদা অবু তো ওরও বন্ধু, তার সঙ্গে তো একদিন যেতে পারত। নাকি অবু ওকে নিয়ে যায়নি। ওকে ঠিক পছন্দ করে না।

আমিও যে টিলুকে দেখতে এলাম, আগে থেকে ভেবে আসিনি।

চাঁদমারির ময়দানে সাহেবদের শুটিং প্রাকটিস দেখতে এদিকে আসা। ফেরার সময় হাসপাতালের পাশের রাস্তাটা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মনে হল, টিলুকে এই তো সেদিন নিয়ে এসেছে এখানে, অবু বলেছিল, কটেজে আছে, একবার দেখা করে যাই।

এইরকম রুগণ দুর্বল টিলুকে দেখব ভাবিনি।

পিচঢালা মসৃণ রাস্তা বেয়ে দুটো সাইকেল পাশাপাশি গড়িয়ে চলেছে, রাস্তাটা ঢালু নেমে গেছে অনেকখানি, একধারে পরপর বাগানওয়ালা বাংলোর সারি, আরেকদিকে পাহাড়-কাটা খাদ, অনেক নিচে দিয়ে গেছে রেললাইন। সারি সারি অসংখ্য রেললাইন। কারণ এটা বেশ বড়সড় একটা জংশন স্টেশন। নানা দিকে রেলের লাইন ছিটকে গেছে। যে-কোন সময়ে একটা না একটা ট্রেন হুইসল বাজিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আসছে, কিংবা স্টেশন ছাড়ছে।

এদিকটা পাহাড়ের মত উঁচু, উঁচুতলার মানুষদের জন্যেই। আর বেশ বোঝা যায় পাহাড় কেটে কেটে অনেক নিচে রেলের লাইন পাতা হয়েছিল।

তখন সন্ধে হয়ে আসছে, আলো ঝলমল করে উঠেছে, এত উঁচু থেকে চলন্ত ট্রেনকে দেখাচ্ছে খেলনার মত, ইঞ্জিনের মাথায় মণি জ্বলছে।

আমরা গড়িয়ে চলেছি, পিচের রাস্তাটা ঢালু নেমে চলেছে লেভেল ক্রশিংয়ের দিকে, আরেকটু পরেই ছোটন বাঁদিকে মোড় নেবে, ছাড়াছাড়ি, আমি বললাম, ছোটন, শোন, আমাদের বাড়ি গেলে বাবা-মাকে বলিস না।

আবছা অন্ধকারে ওর মুখ দেখা গেল না, কিন্তু বেশ বুঝলাম ও হাসছে, কথার স্বরেও বোঝা গেল। বললে, টিলুর কথা তো?

বলেই বাঁদিকে মোড় নিল। আমি ডান দিকে।

টিলুকে নিয়ে ছোটনেব কথাবার্তা আমার একটুও ভাল লাগত না। ওকে এত অসুস্থ দেখে এলাম, মুখখানা এত ম্লান, দেখে কষ্ট হয়। তাই ছোটনের কথা আরও খারাপ লাগল।

আমি কি সেজন্যেই গোপন করতে চাইছি ? বোকা, বোকা। ওর মাথায় আর কোন কথা ঘোরে না।

আমার এক একসময় ভয় হত, ও কোনদিন না আমাকে জড়িয়ে অবুকে কিছু বলে বসে।

অবু এত ভাল, তখন আব মুখ দেখাতে পারব না।

কিন্তু ছোটন চলে যেতেই আমি একা হয়ে গেলাম, আর তখন একটা বিশ্রী ভয় আমাকে পেয়ে বসল।

ছোটনকে সাবধান করে কি হবে, হেমবাবুই হয়তো কাল অফিসে দেখা হলে গল্প করে বাবাকে জানিয়ে দেবেন। হয়তো বলবেন, কাল তো সুকুমার গিয়েছিল টিলুকে দেখতে, বলেছে বোধহয় আপনাকে।

আমি যে এ-খবর গোপন রাখতে পারি, হেমবাবু ভাবতেই পাবেন না।

বাবাকে তেমন ভয় নয়, ভয় মাকে।

আগে কোন বাধানিষেধ ছিল না, দিব্যি আড্ডা দিতাম, ব্যাডমিন্টন নয় তো টেনিকয়েট খেলতাম ওদেব সঙ্গে, কতদিন টিলুকে সঙ্গে কবে নিয়ে এসেছি আমাদের বাড়িতে।

মা হঠাৎ একদিন বললে, অবুদেব বাড়িতে অত যাস না।

আমি অবাক হয়ে মাব মুখের দিকে তাকালাম।

ঠিক বুঝতে পারলাম না, মা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ কবল। তারপব ধীবে ধীবে বলল, ওদের বাগানে খেলতে যাস, না হয় যাবি, বাড়ির ভেতর ঢুকিস না।

একটু থেমে বললে, টিলুর কাছে বসে গল্প করিস না।

আমি লজ্জা পেয়েছিলাম, না মাথায় বাগ চিড়িক কবে উঠেছিল, ঠিক মনে নেই। মা বললে,আমাব বড়ো ভয় কবে রে, অসুখ অসুখ, মেয়েটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝেই জ্বব···কাশি···

তখন সবাই টি বি শুনলেই আঁতকে উঠত। জ্বব শুনলেই ভাবত টি বি। বিশেষ কবে একটু সর্দিকাশি লেগে থাকলে।

আমি হেসে উঠেছিলাম—দুব্, ডাক্তার তো বলেছে অ্যানিমিযা।

মা বেগে গেল। বেশ কড়া গলায় বললে, যাবি না বলছি, যাবি না।

বাত্তিরে খেতে বসে বাবাও সেদিন হেমবাবুদেব প্রসঙ্গ তুললেন।

দিনেব বেলায় আমরা সব এক একজন এক একসময খেতাম। বাবার অফিসের তাড়া। বাবা অনেক আগেই খেয়ে বেরিয়ে যেতেন। ঠাকুব অর্ধেক বান্নাও তখন শেষ কবতে পাবত না। মার তাড়া খেয়ে কিংবা তদারকিতে বাকি রান্না শেষ করত বাবা চলে যাবার পর।

বাত্তিরে আমরা সকলে একসঙ্গে খেতে বসতাম। মেঝেতে আসন পেতে দু-সাবি হয়ে সবাই বসতাম। শুধু মা পরিবেশন কবত। সকলের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পব মা যে কখন খেতে বসত কখনও লক্ষ করিনি।

সব বাড়িতে তো এটাই ছিল রীতি।

তখন কারও বাড়িতে খাবার টেবিল ছিল না। ছোটনদের বাড়িতে দেখেছি পিড়িতে বসে খেত। শুধু অবুদেব বাড়িতেই ডাইনিং টেবিল।

আমরা আসনে, কাঁসার থালায়।

মা থালা বাটিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত, ভাল করে মাজা হয়েছে কিনা, ছাই লেগে আছে কিনা।

বাবা দু-চার গ্রাস ভাত মুখে দিয়েই বললেন, মেয়েটার অসুখ নিয়ে হেমবাবু বেচারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

মা বললে, হবারই কথা।

বাবা আবার বললেন, ডাক্তাররা কেউ কিছু ধরতে পারছে না। একটু থেমে বললেন, আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে টি বি।

আমি চমকে চোখ তুলে বাবার মুখের দিকে তাকালাম।

টি বি কথাটার মধ্যে তখন ভয়ঙ্কর একটা আতঙ্ক ছিল। লোকে জানত অবধারিত মৃত্যু। আর ভীষণ ছোঁয়াচে। ধারে-কাছে গেলেই নাকি এ রোগ তাকে ধরে বসে।

শুনে আমার একটু ভয়ও হল। কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ হল মার সঙ্গে বাবা এ নিয়ে আগেই আলোচনা করে নিয়েছেন। আমাকে শোনানোর জন্যেই কথাগুলো।

বাবা আবার বললেন, তুই আর যাস না ওদের বাড়ি।

আমি চুপ করে রইলাম।

বাবা খেতে খেতে আবার নিজের মনেই যেন বললেন, ভয়ঙ্কর রোগ। রুগী তো কদাচিৎ বাঁচে, আর পরিবারটাও নিঃস্ব হয়ে যায়। বেচারা হেমবাবু।

আমার আর খেতে ইচ্ছা হল না। বসে থাকতেও পারলাম না।

আসন ছেড়ে উঠে চলে আসার সময় বেশ বুঝতে পারলাম বাবা আর মা আমার পিঠের দিকে তাকিয়ে আছে।

সত্যি রোগের ভয়, না টিলুর সঙ্গে মেশামিশিটা মা পছন্দ করত না, তা বুঝতে পারিনি।

কিন্তু অসুখটাকে আমারও ভয় ছিল। তবু যেতাম কখনও কখনও।

টিলুর মা একদিন বললেন, সুকুমার, তুমি তো আজকাল আর আসোই না। টিলু ইজি-চেয়ারে পা দুটি সামনে মেলে বসেছিল। ও একটু ম্লান হেসে বললে, শুধু অসুখ অসুখ, কার ভাল লাগে, মা, আসতে। অবু হেসে উঠল।

আমি কি একটা অজুহাত দিয়েছিলাম। মনে নেই।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছিলাম। মাসীমা এক ফাঁকে প্লেটে করে মিষ্টি আর ফল নিয়ে এসে আমাকেও দিলেন। আমি স্পর্শ করিনি। চা—তাও নয়।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার সেদিন কষ্ট হয়েছিল। বাড়ি ফেরার পথে মনে হয়েছিল খেলেই হত। টিলু যদি কিছু ভেবে থাকে, যদি বুঝতে পারে আমরা টি বি বলে সন্দেহ করছি। ভয় পাচ্ছি। কি খারাপ লাগবে ওর।

টি বি নয় নিশ্চয়ই। হেমবাবু তেমন মানুষই নন। ডাক্তাররাও যদি কোন সন্দেহ করত, তা হলে গোপন রাখতেন না। বলে দিতেন।

এর দিনকয়েক পরেই অবু একদিন বললে, কাল টিলুকে নিয়ে বাবা হাসপাতালের কটেজে চলে গেছে।

চমকে উঠে বললাম, কেন?

অবু একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর দুঃখ দুঃখ গলায় বললে, ওর শরীর তো ক্রমশই খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কটেজে রেখে ডাক্তাররা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবেন।

টিলুকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

যেতে ইচ্ছে হয়েছিল তখনই। কিন্তু বাবা-মার কথা ভেবে সাহস পাইনি।

চাঁদমারির দিক থেকে ফেরার সময় হাসপাতালের পাশ দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ ছোটনকে বললাম, ছোটন, তুই একটু দাঁড়া, আমি একবার অবুর বোনকে দেখে আসি। কটেজে আছে।

নেশার ঘোরে চলে গিয়েছিলাম।

বাড়ি ফেরার পথে কিন্তু ভয়টা পেয়ে বসল। বাবা যদি জানতে পারেন হয়তো রেগে যাবেন।

জানতে তো পারবেনই। হেমবাবুব সঙ্গে দেখা হলে উনিই বলবেন। উনি তো আর জানেন না ওঁদেব বাড়িটা আমার কাছে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। হাসপাতালেব এই কটেজটা আরও।

অথচ ওঁরা যখন এখানে প্রথম বদলি হয়ে এলেন, দুটো বছরও হয়নি, তখন দুটি পরিবারে কি হৃদ্যতা। হৃদ্যতা অবশ্য এখনও। কিন্তু মাঝখানে একটা কাচেব দেযাল ফেলে দিয়েছে একটা আতঙ্ক। নাকি রোগের ভয়টা মনগড়া। মাব মনে অন্য কোন ভয়। আমরা দুজনই যথেষ্ট বড় হয়েছি বলে।

কিন্তু তার জন্যে আপত্তিটা তো ওদের বাড়ি থেকেই আসাব কথা।

একজন পাঞ্জাবী, অরোরাসাহেব বলত সকলে, এই বাংলো ছেড়ে চলে যেতেই অবুরা বদলি হয়ে এল এখানে। দিনকযেক বাংলোটা ফাঁকা পড়ে ছিল। বাবান্দাব দু-পাশের সবুজ চিক কেউ ওঠায় না, নামায় না। ভুতুড়ে বাড়িব মত ফাঁকা পড়ে থাকে। তারপর একদিন দেখা গেল পি ডব্লু ডি-ব লোকবা দেযালেব কলি ফেবাচ্ছে, দবজায পালিশ পডছে। অর্থাৎ কেউ একজন আসবে।

হঠাৎ একদিন দেখি কাঁটাতাবের বেড়ার মাঝখানে যে লোহাব ফটক, তার পাশে কালো নেমপ্লেটে সাদা হরফ ফুটছে। যত্ন করে একজন তুলি দিয়ে নাম লিখছে।

তারপর ছুটতে ছুটতে এসে মাকে বললাম, মা, বাঙালী আসছে বাঙালী, নাম দেখলাম।

এতকাল পবে একজন বাঙালী প্রতিবেশী পেযে মাব মনেও আনন্দ।

ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে আব মাকে মিসেস অরোবা কিংবা তাব ছেলেমেয়েদেব সঙ্গে কথা বলতে হবে না।

অবুবা এল। দু লবি বোঝাই আসবাবপত্র। কিন্তু তখনও ওদেব কাউকেই দেখতে পাইনি। দেখতে পেলাম পবের দিন সকালে।

বারান্দা থেকেই দেখলাম, ওরা সবাই বাগানেব নুড়ি পাথব-ফেলা পাযে-চলা বাস্তা বেয়ে লোহাব ফটকেব বাইবে এসে বাস্তার ধারে দাঁড়িযেছে। চাবপাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। অচেনা নতুন জায়গাটাকে যেন খুঁটিযে খুঁটিযে দেখে নিচ্ছে।

আমি শিউলিকে বললাম, চল দেখে আসি।

বাবাও ততক্ষণে ওদেব দেখতে পেযেছেন। চাযেব পেযালা হাতে নিযেই ওদেব দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি শিউলি টুনকু পিছনে।

সেই প্রথম আলাপ।

বাবা হেমবাবুকে বললেন, কখন এলেন কাল, টেরও পাইনি।

তারপর নিজের হাতেব চায়েব পেয়ালাটা দেখে হেমবাবুকে বললেন, আসুন আসুন, সকালেব চা নয আমার বাড়িতেই·

হেমবাবু হেসে উঠে বললেন, কোন আপত্তি নেই।

আমি অবুর সঙ্গে দুটি কি তিনটি কথা বলেছিলাম। টিলুর সঙ্গে একটিও না। তখন তো ও আবও দু-বছরের ছোট। তবু কেমন সংকোচবোধ কবেছিলাম।

বাবা অবুকে তার নাম জিগ্যেস কবার পর টিলুকেও প্রশ্ন কবলেন। টিলু বললে, সুধন্যা।

নামটা ওকে দ্বিতীয়বার বলতে হয়েছিল, কারণ ওরকম কোন নাম আমরা তার আগে শুনিনি। বুঝতে পারিনি। কিন্তু ও প্রথমবার নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে অবু বলে উঠেছে, না না, টিলু টিলু।

এত তাড়াতাড়ি ডাকনামটা ফাঁস করে দেওয়ার জন্যে সুধন্যার ঠোঁটেব কোণে চোখের

কোণে একটু রাগ উঁকি দিয়েছিল। আমি আর শিউলি হেসে ফেলেছিলাম।

সে-সময় টিলু কখনও সাদা ফুটফুটে স্কার্ট পরত, কখনও শাড়ি।

তখনও একটা দূরত্ব ছিল।

আমাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখতাম ওদের, চিৎকার করে অবুকে হয়তো দু-একটা কথা বলতাম।

একদিন ওরা বাগানে নেট টাঙিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলছে, আমরা দাঁড়িয়ে দেখছি। টিলু আর অবু খেলা থামিয়ে কি বলাবলি করল, তাবপর টিলু আরও খানিকটা এগিয়ে এসে হাতের র‍্যাকেটখানা হাতছানির মত কবে নাড়তে লাগল।

অবু বোধহয় চিৎকার করে ডাকল।

শিউলি বললে, যা না দাদা, তোকে তো ওবা ডাকছে।

আমাব নিজেরও যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। চলে গেলাম।

তারপর দু-দিনেই ওরা কেমন আপন হয়ে গেল।

কে জানত সেই চঞ্চল মিশুকে মেয়েটি এমন একটা কঠিন অসুখে পড়বে।

হেমবাবু একদিন বাবার সঙ্গে গল্প কবতে কবতে দুঃখ কবে বলেছিলেন, অফিসে যাই আসি, কাজ করি, অবুকে নিজেই পড়াই, সংসারেব সব দিকেই নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি, কিন্তু জানেন বিকাশবাবু, আমাব মনে কোন শান্তি নেই, ঐ টিলুর জন্যে। অথচ ওর জন্যে যে এত দুর্ভাবনা, এত কষ্ট, সবসময় ওব কাছ থেকে গোপন বাখতে হয। জানলে ওর আবও কষ্ট হবে।

আমাদের বাড়ির বারান্দায বসে গল্প কবছিলেন। আমি পাশেব ঘবে বসে পড়া থামিযে শুনছিলাম।

আর সেদিনই মনে হয়েছিল টিলুব অসুখটা খুবই গুরুতর কিছু।

হেমবাবু বলেছিলেন, ওব অসুখের জন্যেই তো এখানে ট্রান্সফাব নিলাম, বড হাসপাতাল আছে, বড় বড় ডাক্তাব, যদি ঠিকমত চিকিৎসা হয। তা না হলে আমি তো ওখানে সুখেই ছিলাম।

সুখেই ছিলাম! সুখ বলতে তখন তো আমরা বুঝতাম, বড় চাকরি, সম্মান, মর্যাদা, বড় বাংলো, সাজানো ঘর, সুন্দর পর্দা।

এসবই তো অবুদের ছিল।

যখন প্রথম এল সকলেই ভেবেছিল, ওরা সবাই সুখী। অথচ সামান্য একটা অসুখ একটা পরিবারের জীবনের সব কিছু উল্টে দিতে পারে, জানা ছিল না। অথচ হেমবাবুর গলার স্বরে সে-কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

তাও অসুখটা কি জানা যাযনি। জানা যায়নি বলেই হযতো দুশ্চিন্তা আবও বেশি ছিল ওঁদের।

টিলুকে দেখে প্রথম প্রথম কিন্তু বোঝা যেত না, ও দিব্যি হেসে হেসে কথা বলত, বই পড়ত, একদিন খুব জোর বাতাস দিচ্ছিল, টিলু হাসতে হাসতে বললে, এই হাওয়ায় তো শাটল্ কর্ক উড়ে যাবে সুকুমারদা, চলো আজ টেনিকয়েট খেলি।

কিন্তু বেশিক্ষণ খেলতে পারত না, হঠাৎ বলে উঠত, বড়ো টাযার্ড লাগছে, আজ আব না।

আমরা এসে বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসতাম। আমি, অবন, টিলু। মাসীমাও আসতেন। গল্প করতেন।

অবন, মানে অবুর কাছে অনেক গল্পের বই ছিল, আমি মাঝে মাঝে নিয়ে আসতাম। ফেরত দিয়ে বই বদলে আনতাম।

একদিন গেছি, ওর সুন্দর বুক-কেস থেকে বই খুঁজছি, কোনটা নেব, টিলু কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—ছাই, দাদার তো মাত্র কখানা বই।

আমি ফিরে তাকালাম। টিলু হাসল।

অবু ঠাট্টা করে বললে, থাকবেই তো, তুই তো শুধু বই নিয়েই আছিস।

আর টিলু তখনই আমার কলার ধরে টানল। বললে, এসো না তুমি, কত নেবে তুমি নিয়ে যাও না।

বেশ কয়েক পা গিয়ে তবে কলার ছাড়ল। ওর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

এক আলমারি বই। ইংরেজি বাংলা। কারও বাড়িতে এত বই থাকে জানাই ছিল না। কারও বাড়িতে দেখিনি। যাদের নেশা ছিল বই পড়ার, ইনস্টিটিউট থেকে নিয়ে পড়ত।

সেখানে বেশ বড় একটা লাইব্রেরি ছিল। প্রচুর বই। নানা ভাষার। কারণ ও শহরে সব দেশের সব ভাষাব লোক ছিল।

বেশ বড়সড় ইনস্টিটিউট, একপাশে পরপব কয়েকটা টেনিস কোর্ট। বিকেলের দিকে, সন্ধেবেলায় আলো জ্বেলে সেখানে অনেকে টেনিস খেলত। ইনস্টিটিউটের মধ্যে একটা বিলিয়ার্ড কম। বিলিযার্ড খেলত কেউ কেউ। দেযাল ঘেঁসে ধাপে ধাপে চেয়াবেব সাবি। কখনও হযতো সেখানে বসে খেলা দেখেছি।

টিলুকে একদিন নিয়ে গিয়েছিলাম। ওব একটুও ভাল লাগেনি। আমাবও ভাল লাগত না। আসলে খেলাটা আমরা কেউ বুঝতামই না।

ইনস্টিটিউটে একটা থিযেটার হল ছিল, স্টেজ। স্টেজেব স্ক্রীনে কত বকমের ছবি আঁকা। টিলু দেখে কুলকুল করে হেসে উঠেছিল। আসলে স্ক্রীনের ছবিগুলো যে এত খারাপ, হাসি পাওযাব মত সেই ধারণাই আমাব ছিল না। আমি তো গর্ব করে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম।

তাই টিলু হেসে উঠতে আমার খুব অস্বস্তি লেগেছিল।

আমবা তো ঐ শহরে অনেককাল ছিলাম। থাকতে থাকতে ঐ ইনস্টিটিউট, তার সামনের সবুজ লন, টেনিস কোর্ট, স্কুলবাড়ি, শহবের প্রান্তে সিনেমা হল, সারি সাবি কোয়ার্টার্স, দক্ষিণের বাংলোর সারি, ভোরবেলায় কাবখানার একটানা ভোঁ শব্দ দিয়ে শহর কাঁপানো, চাঁদমারির শুটিং প্রাকটিস, স্মার্ট চেহাবাব অ্যাংলোইন্ডিয়ান ছেলে মেয়ে, হকি খেলা, এ-সবই আমবা ভালবেসে ফেলেছিলাম। শহরটাকেই ভালবাসতাম।

টিলু আমার একটাব পব একটা ভালবাসা ছিনিযে নিতে লাগল।

আমাব মামাতো ভাই চন্দন একবাব কলকাতা থেকে বেড়াতে এসে বলেছিল, তোরা এখানে থাকিস কি কবে বে সুকুমার, এ কি একটা থাকাব মত জায়গা।

শুনে ভীষণ খারাপ লেগেছিল। চন্দনেব ওপব রেগে গিয়েছিলাম। অথচ ও তো আমার কাছে তখন একজন হিরো। কলকাতায় থাকে, কলকাতায়। কিন্তু তার জন্যে ও আমাদের শহরটাকে এত ছোট ভাববে কেন। এত খাবাপ ভাববে কেন।

কলকাতা সম্পর্কে আমার মনেও একটা মোহ ছিল। তখনও আমি স্কুলে পড়ি। স্বপ্ন দেখি, কলকাতার কলেজে গিয়ে ভর্তি হব। হস্টেলে থাকব।

বাবা প্রায়ই বলতেন, মন দিয়ে পড়াশুনো কব, তোকে কলকাতায় ভাল কলেজে ভর্তি হতে হবে।

সেই কলকাতাব একটা ছেলে, চন্দন, আমার মামাতো ভাই, এসে বললে, এখানে তোরা থাকিস কি করে!

যেন এ শহরের এত মানুষ কেউই মানুষ নয়।

আমি রেগে গিয়েছিলাম। এবং মনের ভেতরে একটা কষ্ট হয়েছিল।

অথচ টিলু যখন হাসতে হাসতে বললে, এগুলো নাকি স্ক্রীন ? কি বাজে আঁকা, কি বিচ্ছিরি· তখন আমারও মনে হল, সত্যি, টিলু ঠিকই বলেছে, এগুলো খুবই বাজে।

টিলু একদিন বলেছিল, কোথায় আর বেড়াতে যাবে সুকুমারদা, সব সময় তো কেবল ইঞ্জিনের ধোঁয়া, সব সময় ট্রেনের শব্দ। লেবেল ক্রসিং-এর গেট পড়ে গেলে ট্রেন চলছে তো চলছেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা··

আমি অস্বস্তিতে চুপ করে গিয়েছিলাম। কোন কথা বলতে পারিনি। বুকের মধ্যে কেমন করে উঠেছিল।

শুধু অবু বলে উঠল, যাঃ, এমন কি খারাপ !

আমি অস্বস্তি কাটিয়ে হেসে উঠে বলেছিলাম, ঠিকই, শুধু ধোঁয়া, দিনরাত শুধু ট্রেনের শব্দ

আমার নিজেরও মনে হল, সত্যি, এ শহরে কিছুই নেই।

এমনি করেই আমার ভালবাসাগুলো টিলু একটি একটি করে ছিনিয়ে নিচ্ছিল।

আমি একদিন তাই বললাম, তখনও রেজাল্ট বেরোয়নি, তবু বলে বসলাম, সেজন্যেই তো কলকাতায় চলে যাচ্ছি, কলকাতার কলেজে··

টিলু বললে, সে তো দাদাও যাবে, কিন্তু হপ্তায় হপ্তায় তো আসবে। কিরে দাদা, আসবি না ?

অবু শুধু হাসল।

আমি কৌতুক করে কিংবা কপট রাগ দেখিয়ে বললাম, আমি কিন্তু আসব না।

টিলু বিস্ময়ে চোখ তুলে বললে, কেন ?

বললাম, কেন আসব ? কি আছে এখানে ? ধোঁয়া, ট্রেনের শব্দ দিনরাত, কারখানার ভোঁ তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, উত্তরপাড়ায় এলে শুধু ধুলো আর ধুলো

দক্ষিণটা তো আসলে সাহেবসুবোদের জন্যে। তাই বাগানওয়ালা বড় বড় বাংলো, পিচ ঢালা রাস্তা, রাস্তার দু'পাশে গাছের সারি, কেমন শান্ত স্নিগ্ধ। দু-চারজন ভারতীয় ভাগ্যক্রমে সেখানে স্থান পেয়েছে। কিন্তু রেললাইনের এদিকে, উত্তরপাড়া শুধু ইন্ডিয়ানদের জন্যে। কাঁকরের রাস্তা, লাল ধুলোয় টিলুর জামাকাপড় নোংরা হয়েছিল একদিন। এদিকের কোয়ার্টারগুলোর কোন শ্রী নেই। একঘেয়ে ইঁট বের করা সারি সারি কোয়ার্টার।

বললাম, কেন আসব, কি আছে এখানে।

অবু আমার রাগ বা অভিমান বুঝতে পেরে শব্দ করে হেসে উঠল।

আর টিলু ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, বাঃ রে, আমি তো থাকব।

২

সকালবেলাতেই ছোটনের ডাক এসে পৌঁছল। কৌকর কোঁ, কৌকর কোঁ।

মোরগের ডাক নয়, ওটা ওর সাইকেলের হর্ন !

তখন আমাদের সামনে অফুরন্ত ছুটি। কোন উদ্বেগ নেই, দুশ্চিন্তা নেই। এদিকে সময় কাটানোর কোন পথও নেই। ছোটন এই ফাঁকে কার্টল সাহেবের কাছে টেলিগ্রাফি শিখতে শুরু করে দিয়েছে। কার্টল সাহেব স্টেশনের এ এস এম। কিন্তু বাড়িতে রীতিমত একটা টেলিগ্রাফি শেখানোর স্কুল চালায়। দৈত্যের মত চেহারা, আর প্রচুর মদ খায়। মদ খেলে

হাঁড়িব মত মুখটা টকটকে লাল হয়ে ওঠে। কথা এক বর্ণও বোঝা যায় না। এই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাহেবের স্কুলে অনেকেই টেলিগ্রাফি শিখতে যেত। ও বিদ্যেটা শেখা থাকলে ভবিষ্যতে একটা চাকরি জুটে যেতে পারে এই আশায়। যেদিন কার্টল সাহেবের স্কুল বন্ধ থাকত সেদিন ছোটন সকালবেলাতেই এসে হাজিব হত। কৌকর কোঁ কৌকব কোঁ।

আব ছোটনেব সাইকেলের সামনে একটা বাস্কেটে থাকত ওর টরে টক্কা টরে টক্কা যন্ত্রটা। বাড়িতেও প্রাকটিস কবত। কখনও কখনও যন্ত্রটাব ওপর আঙুল টিপে নানাবকম শব্দ করে আমাদের বোঝাবাব চেষ্টা কবত কোন কোডেব কি মানে।

ছোটনেব ডাকে বেবিয়ে আসতে হল।

বেবিয়ে আসতেই বললে, চল, কাজ আছে।

তাবপবই।—শালা এক নম্ববেব ফাঁকিবাজ।

অর্থাৎ কার্টল সাহেব।

পুবী লাইনকে পাশ কাটিয়ে ডান দিকেব বাস্তাটা মোড় নিতেই শুরু হয়েছে কাবখানাব উঁচু পাঁচিল। তাব পাশ দিয়ে গডিয়ে গডিয়ে নেমে গেছে লাল ধুলোব বাস্তা। এদিকে আব পিচ পড়ে না, বাস্তাব ধাবে গাছ লাগানো হয় না।

সেই বাস্তা ধবেই দুটো সাইকেল গডিয়ে চলেছে।

ছোটন যেতে যেতে বললে, দারুণ ইন্টাবেস্টিং, বুঝলি সুকুমাব, এই মর্স কোড। টুকুস কবলি অমনি

আমি হেসে বললাম, বাখ তোব টেলিগ্রাফ, কি কাজ বল।

এখন মনে পড়লে অবাক লাগে।

স্কুলেব জীবনে লেখাপাড়াব দিকে কোনদিনই ঝোঁক ছিল না ওর। কোনবকমে পাশ করতে পাবলেই যেন জীবন ধন্য, কিন্তু মনে হত জীবন সম্পর্কে ও যেন কম বয়সেই আমাদেব চেয়ে অনেক বেশি জেনে ফেলেছে। সে জন্যেই ওব প্রতি আমাদেব একটা আকর্ষণ ছিল।

যে কোন দুঃসাহসী কাজে ওকে সঙ্গে চাই।

সেই ছোটন, আশ্চর্য লাগত, যখন একঘেয়ে টবে টক্কা টরে টক্কা করেও ক্লান্ত হত না, বিবক্ত হত না। স্কুল ফাঁকি দিতে যাব জুড়ি ছিল না, কার্টল সাহেব একদিন ছুটি দিয়ে দিলে তাব কি বাগ। ক্ষোভেব সঙ্গে বলত, ব্যাটা মাসে দশটা কবে টাকা নেয। আব বোজ ছুটি, বোজ ছুটি!

আমবা হেসে ফেলতাম।

ও মাঝে মাঝে এমভাবে কথা বলত যেন টেলিগ্রাফির চেয়ে কঠিন বিদ্যা আর নেই।

কিন্তু ছোটন সেদিন আব ওসব কথাই তুলল না।

তাব বদলে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, আচ্ছা সুকুমাব, তুই টুংবিবাবায় বিশ্বাস কবিস?

আমি অবাক হয়ে ওব মুখেব দিকে তাকালাম।

—ইয়েস অব নো, বল তুই। ছোটন যেন স্পষ্ট উত্তব চায়।

টুংবিবাবাব কথা এ শহবে সবাই জানত। কেউ বিশ্বাস কবত, কেউ করত না। কিন্তু ওসব নিয়ে আমবা কোনদিন মাথা ঘামাইনি। ওসব বুড়ো-বুড়িদেব ব্যাপার।

আমি বললাম, স্রেফ বুজরুকি।

ছোটন আমার কথা শুনে আহত হল। তাই গলায় বেশ একটা জোব এনে বললে, কিন্তু কার্টল সাহেব বিশ্বাস করে।

আমি হেসে উঠে বললাম, তবে আব কি, সাহেব যখন বিশ্বাস করে, তখন তো কোন কথাই ওঠে না।

ও শুনে খুশি হল। বললে, দ্যাখ, টুংরিবাবা মিথ্যে হলে একটা সাহেব বিশ্বাস করত না।

আমি কিন্তু আর প্রতিবাদ করার কিংবা উপহাস করাব জোর পাইনি। অথবা ভেবেছিলাম ওর সঙ্গে তর্ক কবে কোন লাভ নেই। ও যদি বিশ্বাস কবতে চায করুক না। অনেকেই তো বিশ্বাস কবে।

ও শহরে টুংরিবাবার কথা তখন কারও অজানা ছিল না।

টুংরিবাবা কোন বাবা নয়। কোন সাধু সন্ন্যাসী বা পীব মোহন্তও নয। এমন কি মানুষও নয। শুধু একটা বিশাল পাথর।

তাব বয়েস জানত না কেউ। কারও মতে পাঁচশো বছব, কেউ বলত হাজাব দু হাজার বছব। এ শহরের একটা ইঁটও তখন পোড়ানো হয়নি। মাটিব একটা কুঁডেঘবও হয়তো ছিল না এ তল্লাটে।

অবশ্য টুংরিবাবাব বয়েস নিয়ে কাবও মাথাব্যথাও ছিল না। যে যা বিশ্বাস করতে চাইত বিশ্বাস কবত।

স্কুলে পড়াব সময আমাদেব ভূগোলের মাস্টাবমশাই ভুবনবাবু বলতেন, বিন্ধ্যপর্বত যখন সেই আদিযুগে কত্থক নাচ নাচতে শুরু কবেছিল, তখন নাচ থামাবাব আগে এখানেও একবাব পা ফেলেছিল। সেই কাঁপুনিতে এদিকেও দু-একটা টিলা পাহাড মাথা তুলেছিল!

আমবা শুনে হাসতাম। ভুবনবাবুব ভূগোল পডানোব ধবনটাই ছিল এ-বকম।

বলতেন, এই যে দেখছ কোথাও কোথাও সমতল, আব কোথাও বাস্তা ক্রমাগত উঠছে আব ঢালু নেমে যাচ্ছে, তাব কাবণ টিলাব মাথাগুলো ছেঁটে দেওয়া হযেছে। আসলে এ দিকটাই ছিল ঘন জঙ্গল।

ঘন জঙ্গল যে ছিল বুঝতে অসুবিধে হত না। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে মাইল কয়েকেব এই শহব ছাডিয়ে গেলেই পশ্চিমে দক্ষিণে তখনও ঘন জঙ্গল দেখতে পাওযা যেত। ভয়ে কেউ ওদিকে যেত না।

শুধু গাছ আব গাছ, শাল মহুয়ার জঙ্গল। আব এক ধবনেব বাদাম গাছ। বিবাট বড বড গাছ। সে গাছ দু-চাবটে আমাদেব শহবেও ছিল। তাব গায়ে লেখা থাকত 'পযজন'। কারণ ঐ ফল ছাডিয়ে বাদাম বেব কবতে গেলেই হাতে বস লাগলে ঘা হয়ে যেত। সাবতে চাইত না। ভয়ে আমরা কেউ ছুঁতাম না।

এই ঘন জঙ্গলেব মধ্যে দিয়ে একটা সরু পায়ে-চলা বাস্তা। আসলে দল বেঁধে লোকে টুংবিবাবার কাছে যেত বলেই ওটা রাস্তা হযে উঠেছিল। সেই বাস্তা চিনে চিনে দু-তিন মাইল গিয়ে বেশ উঁচু-মাথা একটা টিলা। ঐ অঞ্চলটাব নামই ছিল কাপালিকুণ্ড। আর কাপালিকুণ্ড জঙ্গলের মধ্যে ঐ পাহাডটায় ওঠাও নাকি খুব দুঃসাধ্য। তবু লোকে কষ্ট করে যেত।

পাহাডেব মাথায় উঠলেই একটা বিশাল পাথর যেন একপাযে ব্যালান্স কবে দাঁডিয়ে আছে। পাথবটাব কোন শ্রী নেই, ছাঁদ নেই। শুধু বিশ্বাসী লোকবা এসে পুজো দিয়ে মানত কবে তার নীচের অংশটা সিঁদুবে সিঁদুবে লাল কবে দিয়েছে। এরকম ভাঙাচোবা একটা বিশাল পাথর পাহাড়ের মাথায় এল কি করে সেটাই ছিল বহস্য। সকলেই সে-কথা বলত। আর তার সামনে নাকি একটা ছোট্ট কুণ্ড, জল ভর্তি। লোকে বলত এখানে নাকি একজন কাপালিক বাস কবত। তার নাম থেকেই কাপালিকুণ্ড। আর ঐ বিশাল পাথরটাই টুংবিবাবা। যে মানুষের সব মনস্কামনা পূবণ করতে পারে।

ছোটন বললে, চল, বাজপেয়ীজীকে খুঁজে বের কবতে হবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, বাজপেয়ীজীকে ? কেন রে ?

ছোটন ভাঙল না। শুধু বললে, কাজ আছে।

বাজপেয়ীজীকে এখানে অনেকেই চেনে, অন্তত নামে। আমিও তাকে বাজারে মাঝে মাঝে দেখেছি। কপালে তিলক, ঝাঁকড়া চুল, গেরুয়া পোশাক।

ঘন জঙ্গল, পথে বিপদ আপদ আছে, পাহাড়টায় ওঠাও নাকি দুরূহ, তাই টুংরিবাবার কাছে কেউ একা-একা যায় না। বাজপেয়ীজীকে ধরে।

বেশ বড় একটা দল হলে তবেই বাজপেয়ীজী তাদের পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যায়।

ছোটন কি তবে ঐ টুংরিবাবার কাছে যাবে নাকি? আমার কেমন একটা সন্দেহ হল। পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না এই ভয়ে? ওর পাশ করা সম্পর্কে আমরা অবশ্য কেউই নিশ্চিন্ত ছিলাম না। কিন্তু পরীক্ষা পাশের জন্যে কেউ কখনও টুংরিবাবার কাছে গেছে শুনিনি।

আমার তাই হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু সে-কথা বললেই তো ও রেগে যাবে। কারও কোন বিশ্বাসে আঘাত করলে সে আর তখন মানুষ থাকে না। আর, কে জানে, সব মানুষেরই হয়তো একটা করে টুংরিবাবা আছে।

মোরম ফেলা লাল রাস্তা দুদিনেই লাল ধুলোর রাস্তা হয়ে যায়। আমাদের সামনে সামনে লাল ধুলো উড়িয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি চলেছে। আমরা সেটাকে পার হয়ে চলে এলাম।

নেটিভ ক্রিশ্চানদের একটা গির্জা। তারপরই কোয়ার্টার্সের সারি।

—বাঃ রে, তা হলে আমাদের কেন আলো পাখা থাকবে?

হঠাৎ টিলুর কথাটা আমার মনে পড়ে গেল।

অরু আর টিলুকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অজয়দের বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম।

ফেরার পথে টিলু বলেছিল, তোমার খারাপ লাগে না?

কেমন একটা অপরাধবোধে আমি চুপ করে গিয়েছিলাম।

টিলু বিষণ্ণ গলায় বলেছিল, আমাদের যা আছে, আমাদের বন্ধুদেরও যদি তা না থাকে একটু থেমে বলেছিল, থাকলে কত ভাল লাগত বলো।

অজয়দের কোয়ার্টারটা দেখে ও বোধহয় কষ্ট পেয়েছিল। অথচ সে-কথা আমি কোনদিনই ভাবিনি। বরং সন্দেহ হয়, হয়তো ভেতরে ভেতরে গর্ব বোধ করতাম।

এরই ফাঁকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দু-দশটা ভাল জাতের কোয়ার্টারেই শুধু আলো-পাখা ছিল, জলের কল ছিল।

বাদবাকি সব ভারতীয়দের জন্যে তৈরি এই সব কোয়ার্টারে আলো-পাখার বালাই ছিল না। দুসারি কোয়ার্টার্সের মাঝখানে একটা করে কল, সেখান থেকেই জল নিতে হত। সন্ধে হলে রাস্তার আলোটুকু সম্বল, কিংবা গুমোট ঘরে হ্যারিকেন লণ্ঠন। অথচ এটা নাকি একটা বড় শিল্পনগরী।

এই কোয়ার্টারের সারি আগে আমার খুব সুন্দর লাগত। মনে হত কেমন ছিমছাম সাজানো শহর। এর ভিতরের দুঃসহ জীবনটা কোনদিন চোখে পড়েনি।

আর তখনই মনে হল টিলু আমার আরেকটা ভালবাসা ছিনিয়ে নিয়েছে। আমি, আমি কি শহরটাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছি!

খুঁজতে খুঁজতে বাজপেয়ীজীকে পাওয়া গেল।

উনি তখন অফিসে বের হবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। গেরুয়া ছেড়ে ঢিলেঢালা ফুলপ্যান্ট, সাদা কোট, কপালে লম্বা তিলকটা তখনও শুকোয়নি। শুকিয়ে গেলে আরও সাদা হয়ে ফুটে উঠত।

জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বললেন, এতোয়ারের দিন এসো। নাম লিখাতে হবে।

ছোটন খুশি হয়ে বেরিয়ে এল, আমি পিছনে পিছনে।

আর বাজপেয়ীজীর মোটাসোটা গৃহিণী ঘোমটা টেনে ডাক দিলেন, পরসাদ লিয়ে যাও

বেটা, পরসাদ লিয়ে যাও।

প্রসাদ মানে গোটাকয়েক নকুলদানা। কে জানে, টুংরিবাবারই প্রসাদ কিনা।

নকুলদানা চিবোতে চিবোতে চলে এলাম।

কিন্তু বাজপেয়ীজীকে তো এব আগেও দেখেছি, বাজারে থলে হাতে, কিংবা রামজীর মন্দিরে কুস্তিব আখড়ার ধারে বসে থাকতে দেখেছি, তখন হাতে একটা ছড়ি, পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, গেরুয়া লুঙি ; টুংরিবাবার সঙ্গে ওঁকে মেলাতে অসুবিধে হয়নি।

কিন্তু এই ঢিলেঢালা ফুলপ্যান্ট আর সাদা কোট পবে লোকটার চরিত্রই যেন বদলে গেছে। কপালের লম্বা তিলক সত্ত্বেও। এ চেহারা দেখে বেশ বোঝা যায় টুংরিবাবার পাহাড়ে যাত্রী নিয়ে যাওয়া ওর একটা ব্যবসা। অথচ গেরুযা পবা মানুষটাকে দেখে মনে হত ও নিজেও বিশ্বাস করে।

আমি ঠাট্টা কবে ছোটনকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম। তাব আগেই ও বলে উঠল, চল আগে বাড়ি যাই, মাকে গিযে বলতে হবে।

তারপর হাসতে হাসতে বললে, মাইবি পাথরের টুকবোকে সবাই বিশ্বাস করে, মানুযকে বিশ্বাস কবে না।

টুংরিবাবাকে পাথরের টুকবো বলায় আমি বিস্মিত হলাম। আমার তো ধারণা হয়ে গিয়েছিল, ছোটন নিজেই টুংরিবাবাকে বিশ্বাস করতে শুরু কবেছে।

আমি ওর মুখেব দিকে তাকাতেই বললে, তোকে মা বিশ্বাস করে। তুই চল। আমি বললে ভাববে বাজপেয়ীজীব খোঁজই করিনি, আড্ডা দিয়ে ফিরছি।

যেতে যেতে ছোটন বললে, ভুলে যাই রোজ, বুঝলি সুকুমার, আজ একমাস ধরে মা লেগে আছে, বাজপেযীজীর খোঁজ নে।

আমি হেসে ফেললাম। —শেষে তোর মাও যাবে টুংরিবাবা দর্শন কবতে ?

ছোটন হাসল। —দর্শন কি রে, কুণ্ডে ডুব দেবে, বাবাকে পুজো দেবে।

আমি আব হাসতে পাবলাম না। ছোটনেব মাব, আমবা কাকীমা বলতাম, মুখটা মনে পড়ে গেল। মনে হল এখন টুংরিবাবাকে নিয়ে হাসাহাসি কবলে ওঁকেই অপমান কবা হয়।

ছোটন অনেকক্ষণ চুপ কবে থেকে হঠাৎ বললে, তোর কাছে লুকিয়ে কি হবে, বলিস না যেন কাউকে, আসলে কেসটা দিদিকে নিযে।

দিদিকে নিযে ? মানে বাণীদিকে নিযে ? আমি যেন চমকে উঠলাম। কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হল না। ও নিজেই তো বললে, বলিস না যেন কাউকে। অর্থাৎ ব্যাপারটা সকলের কাছেই লুকোনো আছে। কিন্তু কেন ?

ছোটন ধীবে ধীরে বললে, দিদি আজ একমাস হল এসেছে, বলিনি তোকে।

—সে কি রে ! আমার একটু অভিমান হল। বললাম, বাণীদি এসেছে অথচ আমাকে বলিসনি।

বিয়ের আগে বাণীদি আমাদের সঙ্গে ক্যারম খেলত। আমি, ছোটন, বাণীদি আব অজয়। বাণীদি আমাদের চেয়ে তিন-চার বছবের বড়। কিন্তু খুব মিশুকে, আব খুব সরল। সব সময হাসিখুশি। নানারকম খাবার তৈরি করতে ওস্তাদ। চিনে বাদাম আর চিঁড়ে দিয়ে হালুযার মত কি একটা বানাত, খিদের মুখে আমাদেব মনে হত অমৃত।

তারপর বাণীদির বিয়ে হল। দূরে কোথায়। ছোটনদের বাড়িতে ক্যারম খেলাও উঠে গেল। অনেক কাল বাণীদির কোন খবর আর শুনিনি। ছোটনও বলেনি।

ততক্ষণে আমরা ছোটনদের কোয়ার্টারের সামনে এসে গেছি। পাশাপাশি চাবখানা কোয়ার্টার। বাঁশের বাতা দিয়ে ঘেরা এক টুকরো করে বাগান, কিন্তু বাগানে গাছপালা বিশেষ নেই।

আমি একবাব বলে ফেলেছিলাম, ফুলের গাছ লাগাস না কেন। সাহেবদের দেখবি, বাংলোর সামনে বাগানগুলো কত সুন্দর। আমরা ইন্ডিয়ানবা··· ।

ছোটন রেগে গিয়ে বলেছিল, রাখ তোব বাগান। শালা চান করাব জল আনতে হয় পাবলিক কল থেকে, বোজ সেখানে ঝি-চাকবদের ঝগডা, কে আগে নেবে ···তুই আর বাগান শোনাস না।

শুনে খুব খাবাপ লেগেছিল। বলা যে অন্যায় হযে গেছে বুঝতে পেবেছিলাম। সব সময মনে থাকত না। দেখেও দেখতাম না। ভাবতাম এটাই স্বাভাবিক, কাবণ এটাই তো দেখে আসছি।

আমরা তো সকলেই তাই। যে যা দেখে আসছি, সেটাকেই স্বাভাবিক মনে কবি। তাব মধ্যে কোন অন্যায় দেখতে পাই না, কোন অভিযোগ থাকে না।

ছোটনদের ঘর দুখানাও খুবই ছোট ছোট। প্রায সকলেবই তাই। সামান্য কিছু লোকেব, হযতো একটু বেশি মাইনের চাকবি, তাদেব জন্য তিনখানা ঘবেব কোযার্টার। তাদেব কোযার্টাবে অবশ্য জলেব কল আছে। কিন্তু আলো-পাখা নেই। সে ভাগ্য মাত্র জনাকয়েকের।

বাঁশেব বাতা দিয়ে ঘেবা বাগানের পবেই একটা কাঠের জাফবিতে ঢাকা বাবান্দা।

বোধহয় বাবান্দা থেকেই বাণীদি দেখতে পেযেছিল।

দরজা খুলে এক মুখ হাসি নিযে ছুটে এল।

—সুকুমার, তুই? কতদিন পবে দেখলাম বে তোকে? এত বড হয়ে গেছিস?

বাণীদি ছুটে এসে আমাব হাত ধরল। টানতে টানতে নিয়ে গেল ভিতবে। —ও মা, সুকুমাব কত বড হযে গেছে দ্যাখো।

কাকীমা বেরিযে এলেন। বললেন, তুই যে কতকাল পবে দেখছিস, তাই।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, বাণীদি, আমি একাই বড হয়েছি? ছোটন কি এখনও ছোট নাকি!

বাণীদি হেসে বললে, তুই কোনদিন বড হবি আমি তো ভাবতেই পাবিনি। আমি তো আজ একমাস এসেছি, তুই একদিনও এলি না।

কাকীমার মুখ গম্ভীর।

ছোটন আর আমি চোখ চাওযাচাওযি কবলাম। বলতে পাবলাম না, তুমি এসেছ জানব কি কবে। ছোটন তো জানাযনি।

শুধু অপরাধীর মত মাথা নিচু কবলাম।

বাণীদি আমাব হাত ধরে বললে, এবার আসবি কিন্তু মাঝে মাঝে। আবাব ক্যারম খেলব আগের মত।

ছোটনের দিকে ফিরে বললে, ক্যারম বোর্ডটা আছে তো, না ফেলে দিযেছিস।

বাণীদি অনর্গল কথা বলছিল, হাসছিল।

—দাঁড়া, আজ তোকে চা কবে খাওয়াব। বাণীদি উঠে দাঁডাল, বললে, কি খাবি বল।

আমি বললাম, যা খুশি তোমাব।

বাণীদি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

আব আমি তখন ভাবছি, বাণীদি তো দিব্যি আগের মতই হাসিখুশি। বেশ সুখে আছে মনে হয়। অথচ ছোটন বললে, কেসটা দিদিকে নিয়ে।

আমার কেমন রহস্য-রহস্য লাগছিল।

বাণীদি চলে যেতেই চাপা গলায় একটা প্রশ্ন শুনলাম।—গিয়েছিলি?

ছোটন বললে, সুকুমাবকে জিগ্যেস কবো? ব্যাটা অফিসে বেরিয়ে যাচ্ছিল, বললে

রবিবারে যেতে।

ছোটনের মা ভুরু কুঁচকে তাকালেন ছেলের দিকে। —তুই কি সভ্যতা শিখবি না? বাজপেয়ীজীকে তুই 'ব্যাটা' বললি?

ছোটন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললে, হুঃ। টুংবিবাবার দালাল বলে ও লোকটাও কি গুরুজী হয়ে গেছে নাকি।

ছোটনের মা রেগে গিয়ে বললেন, তোব কথা শুনলেও পাপ।

আমাকে তক্তপোশে বসতে বললেন।

আমি বসলাম।

ছোটনেব মা বোধ হয ইঙ্গিতে কিছু জিগ্যেস কবছিলেন, আমি অন্যদিকে তাকিয়েছি সেই সুযোগে।

ছোটন বললে, হ্যাঁ বলেছি। সুকুমাব তো আমাদেব ঘবেব লোকেব মত। ও কি কাউকে বলবে নাকি?

ছোটনেব মা সঙ্গে সঙ্গে অনুনযেব স্বরে বললেন, হ্যাঁ বাবা, বলো না কাউকে।

আমি তখনও জানি না ব্যাপাবটা কি। বাণীদি এমন কি কবে বসেছে—যা গোপন কবতে হবে। কাউকে জানানো যাবে না।

ছোটনের মা চাপা গলায় বললেন, মেয়েটার কপালে সুখ নেই! কোলে তো ছেলেমেয়ে কিছু এল না·

ছোটন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, শাশুড়িটা এক নম্ববেব হাবামি। ছেলেব আবাব বিয়ে দিতে চায়। খুব জ্বালায রে দিদিকে। দিদি জোর কবে চলে এসেছে। এখন আব নিয়ে যাবে না বলছে।

ছোটনেব মা বললেন, এ কথা কি কাউকে বলা যায়, বলো। পাডাপডশি শুনলে তো বাণীকেই অপবাদ দেবে।

আমি বললাম, কাকীমা, আপনি মিথ্যে ভয পাচ্ছেন, আমি কাউকে বলব না।

কিন্তু শুনে বাণীদির জন্যে আমাব খুব কষ্ট হল। একটু আগে ওব হাসিখুশি মুখ দেখে ভেবেছিলাম বাণীদি বেশ সুখী। আসলে ওটা যে দুঃখ চাপা দেবাব হাসি জানতাম না। নাকি ঐ নবকযন্ত্রণা থেকে বেবিয়ে বাপেব বাডিতে এসে বাণীদি সত্যি এতদিনে একটু সুখেব ছোঁয়া পেয়েছে।

ছোটনেব মা নিজের মনেই যেন বললেন, সবাই তো বলে টুংবিবাবা সত্যি। মানত কবলে ফল পাওয়া যায়। ভাবছি একবার যাই। যদি

ছোটন বলে উঠল, হ্যাঁ মা, টুংবিবাবা সত্যি। আমাদেব কার্টল সাহেবও বিশ্বাস কবে। বলছিল, মিব্যাক্‌ল্।

আমার দিকে ফিবে বললে, পৃথিবীতে এখনও মিব্যাক্‌ল আছে। বুঝলি সুকুমাব। আমরা বিশ্বাস কবি আর না করি।

আমি এ-সবে একেবারে বিশ্বাস কবতাম না। বাবা একেবাবেই বিশ্বাস কবেন না। মাঝে মাঝে মাকে কত বোঝাবাব চেষ্টা কবেন। সেই সব যুক্তি শুনে শুনেই হযতো আমাবও অবিশ্বাস এত দৃঢ়।

কিন্তু সেই মুহূর্তে বাণীদিব জন্যে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বাণীদি আবাব যদি হাসতে হাসতে চা নিয়ে আসে, আমি আব হাসতে পাবব! আমাব হাসিটা এবাব মেকি হাসি হয়ে যাবে।

ছোটনের মা বললেন, তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে।

আমি এক মুহূর্ত চুপ করে রইলাম। বাণীদি তো যাবে, বাণীদির সঙ্গে গল্প করতে করতে

দিব্যি যাওয়া যায়, ভালই লাগবে, অন্তত বাণীদি কিছুক্ষণের জন্যে তো দুঃখ ভুলে থাকতে পারবে।

কিন্তু আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

সকালে এ-সময় অগুন্তি ট্রেন আসে আর যায়। তার ওপর মন্থর গতিতে চলে গুড্‌স ট্রেন. একবার লেভেল ক্রসিংয়ের গেট নামলে আর তোলার নাম নেই। এছাড়া সব সময়েই চলছে ইঞ্জিনের শান্টিং।

তাই লেভেল ক্রসিংয়ের পাশের তারের বেড়া কেটে দিয়ে একটা পারাপারের রাস্তা বানিয়ে নিতে হয়েছে এ পাড়ার লোকদের। মাঝে মাঝে তাই দু-একজন কাটাও পড়ে। পরিচিত লোকজন না হলে সেটা এমন কিছু চাঞ্চল্য ঘটায় না। লোকে শোনে, ভুলে যায়।

লেভেল ক্রসিং পার হয়ে স্টেশন প্লাটফর্ম বাঁয়ে ফেলে একটু এগোলেই পিচের রাস্তা শুরু। রাস্তার দুধারে গাছ, গাছের ছায়া। কারণ এদিকটা হল ইউরোপিয়ান সেটলমেন্ট। যদিও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানই বেশি, ভারতীয়ও আছে কিছু কিছু।

রাস্তার ধার দিয়ে একটা আয়া পেরাম্বুলেটর ঠেলছে। পেরাম্বুলেটরে একটা সাদা বাচ্চা। তাকে পাশ কাটিয়ে বাড়ির পথ ধরতে গিয়েও হঠাৎ বাঁ-দিকে বাঁক নিলাম। এটা হাসপাতালের রাস্তা।

মুহূর্তের মধ্যে মত বদলে গেল। ভাবলাম, একবার হাসপাতালটা ঘুরে যাই।

এ এক অদ্ভুত নেশা। কাছে যাওয়ার নেশা, কথা বলার নেশা।

আমি যে কটেজে গিয়েছিলাম টিলুর সঙ্গে দেখা করতে, এ-খবরটা বোধ হয় হেমবাবু বাবাকে জানাননি। অথবা বাবার সঙ্গে তাঁর দেখাই হয়নি।

পরের দিন রাত্তিরে খেতে বসেছিলাম বেশ ভয়ে ভয়ে। কেবলই অস্বস্তি বাবা হয়তো এখনই বলবেন কিছু। কেন গিয়েছিলি? তোকে তো এতবার সাবধান করা হয়েছে।

মা শুনবে এবং রাগারাগি করবে। বলবে, তোর কি ওরকম একটা মারাত্মক রোগেরও ভয় নেই? আমি মাথা নিচু করে ভাতের গ্রাস তুলব।

কিন্তু না, পর পর কয়েকটা দিন কেটে গেল, বাবা কিছুই বললেন না। আমি নিশ্চিন্ত হলাম। হেমবাবুর সঙ্গে বাবার নিশ্চয় দেখা হয়নি, অথবা দেখা হয়ে থাকলে বাবাকে জানানোর মত খবর মনে করেননি।

আশ্চর্য, প্রথম যখন শুনেছিলাম, ভয় হয়েছিল। টি বি। টি বি নামটা শুনলেই তখন সকলে আতঙ্কিত হত। কোন চিকিৎসাই ছিল না। আর রোগীর পরিবারটাও হয়ে যেত অস্পৃশ্য, কেউ ধারে কাছে যেতে চাইত না। সকলেই ধরে নিত মৃত্যু অবধারিত। যদিও কেউ কেউ বেঁচে যেত।

কিন্তু এত ভয়, তাও কেটে গিয়েছিল নেশার টানে। নিজেকে আটকে রাখতে পারিনি। অথচ কিসের নেশা? ছোটন ইয়ার্কি করে যাই বলুক, টিলুর সঙ্গে তো আমার সে-রকম কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। কিন্তু ওকে ভীষণ ভাল লাগত। নাকি একটা অসুস্থ কিশোরী মেয়ের প্রতি মায়া! আমি বুঝতে পারতাম না।

একটা অবোধ্য টান আমাকে আবার সেই কটেজের দিকে নিয়ে গেল।

হাসপাতালের মত অত কড়াকড়ি না থাকলেও কিছুটা বাধানিষেধ কটেজেও আছে।

হেমবাবু বলেছিলেন, সে-সব বাইরের লোকদের জন্যে। বাড়ির লোকরা এসে দেখা করলে তেমন আপত্তি নেই।

হাসতে হাসতে বলেছিলেন, তুমি তো আর বাইরের লোক নও।

টিলু আমার দিকে তাকিয়েছিল, ক্লান্ত হাসি হেসেছিল।

আমিও ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হেসেছিলাম।

মাসীমা ওকে ফলের রস খাওয়াতে এসেছিলেন, হেমবাবুর কথার পিঠেই যেন বললেন, সুকুমার বাইরের লোক হতে যাবে কোন দুঃখে। ও তো আমাদেরই।

কথাটা আমার খুব ভাল লেগেছিল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মার কথা মনে পড়ে যেতেই কেমন একটা অপরাধবোধ জেগেছিল।

ওঁরা আমাকে এত আপন মনে করেন, হয়তো আমাদের পরিবারের সকলকেই, অথচ আমরা তো সত্যি সত্যি তা নই।

হয়তো এক সময়, যখন ওঁরা প্রথম এসেছিলেন, দুদিনেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, তখন আমরাও ওদের আপন ভাবতাম।

কিন্তু টিলুর অসুখের কথাটা জানার পর, ওর অসুখ নিয়ে হেমবাবুকে এত বিচলিত হতে দেখে—যেদিন থেকে মার সন্দেহ দেখা দিয়েছে, বাবার মনে হয়েছে, রোগটা টি বি হতেও পারে, হেমবাবু জানেন না, সেদিন থেকেই একটা দূরত্ব সৃষ্টি হতে শুরু হয়েছে।

মা একদিন বলেই ফেলেছিল, এর চেয়ে সেই আগে যারা ছিল, সেই অবোবা সাহেবরাই ভাল ছিল।

বাবা বলেছিলেন, মেয়েটাকে স্যানাটোরিয়ামে পাঠাচ্ছে না কেন? পেনড্রা রোডে তো পাঠাতে পারে।

তখন ঐ একটাই স্যানাটোরিয়াম। টি বি রোগীদের জন্যে। কিন্তু বেড পাওয়া যেত না! পেলেও অনেক খরচ।

সান্যালবাবু তাঁর বড় ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন।

একদিন বাবাকে বলেছিলেন, বাড়িতে একটা টি বি রোগী মানে সর্বস্বান্ত হওয়া।

সর্বস্বান্ত অবশ্য তাঁকে হতে হয়নি। কিছুদিন বাদেই ছেলেটি মারা যায়। সেই প্রথম শুনেছিলাম, গ্যালপিং টি বি। যেন শুনতেও ভয়।

বাবা-মার তো কোন দোষ ছিল না। তখন ঐ রোগটাকে সবাই ভীষণ ভয় পেত। কোন চিকিৎসা ছিল না। ওষুধপত্তর ছিল না। ভয় তো পাবেই। তাই নিজের ছেলেমেয়েদের দূরে রাখার চেষ্টা। আর তা থেকেই গড়ে উঠছিল একটা দূরত্ব।

কিন্তু আমার মন বলত টি বি নয়। ওরকম একটা রোগ কি হেমবাবু আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতেন।

আমি একটু অনুযোগ করে বলেছিলাম, তা হলে কি কটেজে রাখতে দিত।

মা বলেছিল, হেমবাবু লুকিয়ে রেখেছেন এ-কথা কে বলেছে? কি হয়েছে জানবার জন্যেই তো নিয়ে গেছেন, পরীক্ষা করে যদি ডাক্তাররা বলে, তখন হয়তো লুকিয়ে রাখবে না। হয়তো অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেবেন।

অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেবেন! টিলুকে? টিলু থাকবে না এখানে?

ও যে একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, বাঃ রে, আমি তো থাকব!

অর্থাৎ এ শহরে কিছুই নেই, কিচ্ছু নেই, কিন্তু আমি তো আছি!

আমি সে-সব দিনের কথা ভাবতেই পারতাম না। টিলু থাকবে না, কিংবা সান্যালবাবুর বড় ছেলের মত পেনড্রা রোডে চলে যাবে। তারপর সেখানে একদিন—

অসম্ভব। ঐ বয়েসে মৃত্যুর কথা ভাবাই যায় না। না নিজের, না টিলুর।

সেজন্যেই আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, টিলুর কিচ্ছু হয়নি, ও ভাল হয়ে যাবে। ভাল হয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসবে।

তেমন কোন অসুখ হলে কি আর ডাক্তাররা ধরতে পারত না!

অবুকে জিগ্যেস করতে অবু বলেছিল, আগের ডাক্তাররাও কিছু ধরতে পারেননি, এঁরাও পারছেন না।এখন একমাত্র ভরসা ডাক্তার ক্রসবি।

আমি নামটা আগে শুনিনি।

অবু বলল, সদ্য বিলেত থেকে এসেছেন। খুব বড ডাক্তার। ছ মাস থাকবেন মাত্র, এখানে, তারপর ফিরে যাবেন। উনি যদি কিছু করতে পারেন।

ডাক্তার ক্রসবিকে দেখার আমার খুব ইচ্ছে ছিল। এত এত ডাক্তার তো আনাগোনা করছেন, কটেজ থেকে হাসপাতালের ওয়ার্ডে, এ ওয়ার্ড থেকে ও ওয়ার্ডে। দু-একজন ইউরোপীয়। কিন্তু তাদের তো সকলেই চেনে। দোকানে বাজারে দেখা যায়।

টিলুদের কটেজের বাইরে, বাগানের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, কোথাও মেট্রন মিসেস মগ্যার্নি ঘোরাফেরা করছেন কিনা।

এখানে ঐ একজনকেই ভয়।

সামনাসামনি পড়ে গেলে হয়তো প্রশ্ন করবেন, কেন এসেছি, কার সঙ্গে দেখা করব।

মেজাজ খারাপ থাকলে হয়তো বের করে দেবেন। দেখা করতে দেবেন না।

দুজন হিন্দুস্থানী, মোটামুটি ভাল চাকরি করে, এই রকম কটেজের রাস্তায় দাঁড়িয়ে জোরে জোরে কথা বলছিল, মিসেস মগ্যার্নি আসছেন লক্ষ করেনি, অথবা লক্ষ করেও জোরে কথা বলা বন্ধ করেনি, মিসেস মগ্যার্নি দারোয়ানদের শুধু তুড়ি দিয়ে ডেকে বলেছেন, নিকাল দেও।

কেউ কোথাও থুতু ফেললে তার নিস্তার নেই।

সবাই জানে চীফ মেট্রন মিসেস মগ্যার্নের কথার ওপর আর কোন আইন নেই। তা তিনি যত বড চাকরিই করুন।

আমি চারপাশ দেখে নিয়ে বাগানের ফটক খুলে ঢুকলাম। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম, ভিতরে আছেন কিনা। হয়তো মুখোমুখি পড়ে যাব। না নেই।

নিশ্চিন্ত হয়ে ঢুকলাম ভিতরে।

মাসীমা বসে আছেন চেয়ার টেনে নিয়ে, টিলুর বিছানার কাছে।

মাসীমা বললেন, এসো।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি বললাম, না না, আপনি বসুন।

আমি হয়তো টিলুর বিছানার পাশে বসে পড়তে পারি, তাই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। রোগীর বিছানার পাশে বসলে মিসেস মগ্যার্নের কাছে তার আর রক্ষে নেই। ওটা নাকি কুৎসিত ইন্ডিয়ান হ্যাবিট।

মিসেস মগ্যার্নি তাঁর কাজে যতই দক্ষ হন না কেন, যতই দায়িত্বজ্ঞান থাক, কথাবার্তায় কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি একটা ঘৃণা প্রকাশ পেত।

ভাব দেখাতেন যেন উনি এই হাসপাতালের সম্রাজ্ঞী। আর আমরা সকলে তার নেটিভ প্রজা।

কিন্তু কারও কোন প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না।

অথচ অদ্ভুত লাগত, রোগীরা যাবার সময় ওঁর গুণগানে পঞ্চমুখ হয়ে উঠত দেখে। সিস্টারদের কোন গাফিলতি ঘটলে রোগীর সামনেই ধমক দিতেন, এমন কি রাউন্ডের ডাক্তার দেরিতে এলেও তাকে জবাবদিহি করতে হত।

টিলুও বলেছিল, মিসেস মগ্যার্নি ভীষণ ভাল।

আমি পাশের ঘর থেকে চেয়ারটা নিয়ে এলাম।

বসলাম। মাসীমাও বসলেন।

টিলু একবার তাকিয়ে দেখে নিয়েই আবার চোখ বুজেছিল। ওর বোধ হয় কথা বলতে ভাল লাগছিল না। কিংবা ঘুম আসছিল।

আমি সেজন্যে কোন কথা বললাম না।

মাসীমাই ধীরে ধীরে বললেন, কাল মাঝরাত্রে, ঐ যে নতুন এসেছেন, ডাক্তার ক্রসবি, এসেছিলেন।

—মাঝরাত্রে? আমি একটু অবাক হলাম।

বললেন, হ্যাঁ, রক্ত নিলেন। কি সব পরীক্ষা করতে হবে।

টিলু চোখ চেয়ে তাকাল একবার। —তুমি এখন কেন এলে?

ওকে খুব ক্লান্ত লাগছিল। বোধ হয় মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙানোর পর আর ঘুমোতে পারেনি।

ধীরে ধীরে বললে, ভাল লাগছে না সুকুমারদা, তুমি এখন যাও।

বলে আবার চোখ বুজল।

ওর নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছিল, কিংবা ক্লান্ত লাগছিল।

আমি মাসীমার সঙ্গে দু-একটা কথা বলে উঠে এলাম। জানি ও খুব ক্লান্ত, ওর হয়তো কোন কষ্ট হচ্ছে, কিংবা ঘুম পাচ্ছে।

কিন্তু একটা অপমান, নাকি অভিমান, কানের মধ্যে বাজতে লাগল।—ভাল লাগছে না সুকুমারদা, তুমি এখন যাও।

৩

কেউ আসে, কেউ যায়। এ শহরের বুঝি এই একটাই চরিত্র। কাউকে বেঁধে রাখতে পারে না। ভালবাসার বাঁধন দিয়ে তো নয়ই।

নিতান্তই স্বার্থের খাতিরে মানুষ এখানে আসে, ডেরা বাঁধে, সুখ দুঃখের সংসার গড়ে তোলে, তারপর এক একদিকে ছিটকে যায়। শিকড় গেড়ে কেউ বসে না। শহর নয়, যেন একটা চলন্ত ট্রেন। কেউ ওঠে, কেউ নামে। ওয়েটিং রুমে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চলে যাওয়া।

হেমবাবু চেষ্টা-চরিত্তির করে এখানে ট্রান্সফার হয়ে এসেছিলেন। কেউ আবার হঠাৎ বদলির হুকুম পেয়ে বসে। তখন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। উদভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেড়ায়। পরিমলদের মত।

পরিমলের বাবা তারকবাবু বড়ো বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। ছোটনের সাইকেলে যে কোঁকর কোঁ কোঁকর কোঁ হর্ন, ওটা তারকবাবুই বানিয়ে দিয়েছিলেন।

কারখানার ফিটার বা মিস্ত্রিদের সঙ্গে ওঁর খুব সৌহার্দ্য। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, ওঁর মাথায় সব সময়েই একটা না একটা আইডিয়া ঘুরছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিলেন, কিন্তু পাশ করতে পারেননি। টাকার অভাবে নাকি বিদ্যেয় কুলোয়নি, তা কেউ জানে না। কিন্তু একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিলেন। তবে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নেশাটা বোধহয় ছাড়তে পারেননি।

নিত্যদিন নতুন নতুন জিনিস তৈরি করার নেশায় মশগুল থাকতেন। কাঠ, র‍্যাঁদা আর বাটালি নিয়ে রবিবারের ছুটি কাটিয়ে দিতেন। বসে বসে নতুন ধরনের টুল কিংবা শেল্‌ফ।

আমরা গেলে দেখাতেন। হাসতে হাসতে বলতেন, আইডিয়াটা কি রকম বলো? এ রকম শেল্‌ফ দেখছ?

তারপর তার বিশেষত্ব কোথায় দেখাতেন। টুলটা দেখিয়ে বলতেন, ইচ্ছে করলে তুমি এটাকে একটা বাক্স করে নিতে পার, আবার দরকারের সময় টুল।

কারখানার যন্ত্রপাতি আর মিস্ত্রিদের সাহায্য নিয়ে কখনও একটা আজব ঘণ্টি বানাচ্ছেন, কখনও বা চাকা-লাগানো বালতি। জল বয়ে আনতে হবে না, ঠেলে ঠেলে আনা যাবে। আমরা দেখে চমৎকৃতও হতাম, হাসাহাসিও করতাম।

টেলিগ্রাফ না টেলিফোনের একটা বেশ বড় ব্যাটারি নিয়ে এসে বাড়িতে তার লাগিয়ে টর্চের বাল্‌ব্‌ জ্বালতেন। ওঁদের কোয়ার্টারে ইলেকট্রিক ছিল না, কিন্তু তার কিছুটা অভাব পূরণ করে নিয়েছিলেন ঘরে ঘরে টর্চের বাল্‌ব্‌ লাগিয়ে। সুইচও ছিল। সুইচ টিপে আলো জ্বাললে অন্ধকার কাটত না, অন্ধকারে বড় মাপের জোনাকি হয়ে জ্বলত শুধু। কিন্তু তারকবাবু সেটুকুতেই খুশি।

মাঝে মাঝে দু-একটা জিনিস তৈরি করে উপহারও দিতেন। যেমন ছোটনকে দিয়েছিলেন ঐ বিচিত্র আওয়াজের সাইকেলের হর্ন। গোল একটা কৌটোর মত, ওপরে স্প্রিং লাগানো একটা বোতাম। সেটা টিপলেই শব্দ বের হত। আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও রহস্যটা বের করতে পারিনি।

আমরা হাল ছেড়ে দিতেই ছোটন বলেছিল, পরিমলের বাবার মাইরি ব্রেন আছে।

সবাই হেসে উঠেছিল।

সেই তারকবাবুর নাকি বদলির অর্ডার এসে গেছে।

অজয় আর আমি পরিমলের বাড়িতে এসে হাজির হলাম। খবরটা শোনার পর থেকেই আমাদের বড়ো খারাপ লাগছিল।

অজয় বললে, পরিমলের নিশ্চয় আরও খারাপ লাগছে। বেচারি।

তারকবাবু আমাদের দেখতে পেয়ে থমথমে মুখে বললেন, এসো।

পরিমলও বেরিয়ে এল।

আমরা কিছুই বলতে পারছিলাম না। এতকাল এক সঙ্গে আছি, খেলাধুলো, পড়াশুনো, আনন্দ, উৎসব—তার মধ্যে হঠাৎ যেন একটা বেসুরো বাজনা।

চলে যাচ্ছি রে। পরিমল হাসবার চেষ্টা করল। একটু থেমে বললে, অনেক কষ্টে বাবা এক মাস সময় পেয়েছে। কিছুতেই দিতে রাজি ছিল না।

তারকবাবু অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন।

কথাটা কানে যেতেই বললেন, হ্যাঁ একটা মাস। আমার এই একটা মাস এখানে থাকা দরকার।

তারপর হাতখানা ঘুরিয়ে বললেন, কি যে করব কিছু বুঝতেই পারছি না।

হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা, একটা খদ্দের দেখে দিতে পার? আমার ঐ আলমারিটা, আর ঐ টেবিল। খুব ভাল কাঠ, সিজন্‌ড্‌ বার্মা টিক।

অজয় বলে উঠল, বেচে দেবেন?

হ্যাঁ। বেচে দিতেই তো হবে। ওখানে কোয়ার্টার পাইনি, কবে পাব ঠিক নেই। ভাড়ার বাড়ি, ছোট্ট ছোট্ট দুখানা ঘর। কি হবে বলো এ-সব রেখে!

যেন আমরাই খদ্দের, ওঁর ঐসব আসবাবপত্র কিনতে এসেছি। নিয়ে গিয়ে দেখাতে শুরু করলেন। টেবিলের ওপর হাত বুলিয়ে এমন ভাবে দেখালেন, যেন কোন ছোট্ট শিশুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলছেন, এটি আমার সন্তান।

আলমারিটা দেখিয়ে বললেন, পালিশটা দ্যাখো, ভাল কাঠ না হলে এরকম পালিশ হয়?

খুবই সাদামাটা ফার্নিচার। কোন শ্রী নেই। টেবিলটা সেই পুরনো দিনের অফিসের টেবিলের মত। উঁচু, চারটে পায়া আর দুটো ড্রয়ার। কিন্তু ঘরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে।

আমাদের অস্বস্তি লাগছিল। এ ধরনের টেবিল বা আলমারি, তাও পুরনো ব্যবহার করা,

কে কিনবে। আমাদের চেনাজানা সে-রকম কারও কথা মনে পড়ল না।

তারকবাবু বললেন, কুড়িটা টাকা পেলেই আলমারিটা দিয়ে দেব। আর টেবিলটা, কে কি দিতে চায় দেখি,...

এ-সব জিনিসের তখন দামই কম ছিল, কেনার লোক আরও কম।

তারকবাবু এমন ব্যগ্রতা দেখাচ্ছিলেন, আমার সন্দেহ হল, উনি যে জায়গার অভাবের কথা বলছেন, তা মিথ্যে।

ঘরের জিনিসপত্র তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন তারকবাবু, হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এত সব কোথায় যে রাখব গিয়ে।

বেশ বোঝা যায়, জিনিসগুলো, আসবাবপত্র, দিনে দিনে একটু একটু করে অনেক কষ্টে কিনেছিলেন। সংসার গুছিয়েছিলেন। শুধু কি টাকা দিয়ে কেনা? হয়তো এর পিছনে অনেক পরিশ্রম গেছে, অনেক ছোটাছুটি। তাই এত মায়া। কুড়িটা টাকা দিয়ে কেউ শুধু ঐ আলমারিটাই কিনবে না,তারকবাবুর অনেক ভাবনা-চিন্তা, কষ্টে বাঁচানো টাকা, পরিশ্রম, আর এতদিন ব্যবহার করার মায়া, সব মুছে দিয়ে যাবে।

আমার কেমন সন্দেহ হল তারকবাবু টাকার জন্যেই বিক্রি করতে চাইছেন। রাখার জায়গা হবে না এটা অজুহাত।

আর তা যদি সত্যি হয়, কুড়িটা তো মাত্র টাকা, মাকে বললেই, মা দিয়ে দেবে। কিন্তু ঐ আলমারি, কিংবা ঐ টেবিল তো নিয়ে যাওয়া যাবে না।

বাবা বলে উঠবেন, ফেলে দে, ফেলে দে।

পুরনো আসবাবপত্র কেনার কথা বাবা ভাবতেই পারেন না। তার ওপর এই রকম বাজে ডিজাইন।

ভাল কাঠ কিনিয়ে ভাল মিস্ত্রি লাগিয়ে ফার্নিচার বানানোর দিকে বাবার ঝোঁক। যখন যা দরকার হয়েছে বানিয়ে নিয়েছেন। শুধু একটা জিনিস কিছুতে মেনে নিতে পারেননি। খাওয়ার টেবিল। টেবিলে বসে খাওয়া একেবারে পছন্দ করেন না।

বলেন, টেবিলে বসে খাওয়া, মনে হয় যেন হোটেলে বসে খাচ্ছি। ওকে কি খাওয়া বলে নাকি!

সেজন্যে আমাদের বাড়িতে আসন পেতে খেতে বসার রীতি। থালার চারপাশে একরাশ বাটি।

সকালে বিকেলে একটা ছত্রিশগড়িয়া মেয়ে বাসন মাজতে আসে। কলের নীচে ডাঁই হয়ে থাকে কাঁসার বাসনের স্তূপ। মেয়েটা কাজ করে আর নিজের মনেই কি সব বলে।

বেশ বুঝতে পারছিলাম, এ-সব জিনিস কেনা যাবে না।

তারকবাবুর কাছে টাকাটাই সমস্যা। অবশ্য তাই যদি হয়।

কিন্তু ওঁকে তো আর কুড়িটা টাকা দান করা যায় না। নেবেন কেন! দিতে যাওয়া মানে অপমান করা। অবশ্য দান করার কথা বললে মার কাছ থেকে পাওয়া যাবে এমন কোন কথা নেই। বাবা-মা' তো তারকবাবুকে ভাল করে চেনেনই না। তবু যদি বা অন্য কিছু বলে চেয়ে নিই, তারকবাবুকে সে টাকা দেওয়া যাবে না।

হয়তো নতুন জায়গায় বদলি হচ্ছেন বলেই এখন অনেক খরচপত্তর, টাকার টানাটানি, সে জন্যেই বেচতে চাইছেন।

অথচ আমার কাছে টাকাটা তেমন সমস্যা নয়। সমস্যা ঐ আলমারি আর টেবিল। যে জিনিসের প্রয়োজন নেই, পছন্দ নয়, সে জিনিস নিয়ে গিয়ে রাখব কোথায়।

তারকবাবু অবশ্য সেই একই কথা বলেছেন। রাখার জায়গা নেই। সত্যি হতেও পারে।

অথচ দুটোর মধ্যে কত তফাত। একজন এই জিনিসগুলোকে ভীষণ প্রয়োজনীয় মনে

করে, সুন্দর মনে করে, এগুলোর ওপর তার কত মায়া। পারলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখত। মায়া-মমতাই ওগুলোকে তারকবাবুর কাছে সুন্দর করে রেখেছে। আর, আরেকজন, মানে, আমরা, টাকাটা দিতে পারি, বাড়িতে প্রচুর জায়গা, কিন্তু ওগুলো সেখানে বেমানান। রাখা চলে না।

আমার একবার মনে হল, বাংলোর পিছনের দিকে, একপ্রান্তে মালি আর চাপরাশিদের ঘর। তাদের যদি দিয়ে দেওয়া যায়। তারকবাবুর কাছে যদি টাকাটাই সমস্যা হয়ে থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, ছি ছি, আমি এ-কথা ভাবলাম কি করে। এ তো তাবকবাবুকে অপমান করা।

তারকবাবু তো আমাব বন্ধু পরিমলেব বাবা। আমরা একসঙ্গে পড়াশুনো করেছি, একসঙ্গে খেলাধুলো, আড্ডা।

তবু বললাম, দেখব আমবা, যদি কেউ নেয়।

মিথ্যে স্তোক দেওযা।

তারকবাবুর মুখ-চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, খুবই বিব্রত বোধ করছেন।

বেশ ক্ষোভের সঙ্গেই বললেন, একটা ট্র্যান্সফাব অর্ডাব দিয়ে দিলেই হল, ওদেব তো কিছু ভাবতে হয় না। এদিকে আমাদেব যে কি অবস্থা·

বললেন, পরিমলকে এখন কলেজেব হস্টেলে বাখতে হবে, মানে খবচ। অথচ এখানে থাকলে···

আমি বললাম, হ্যাঁ মেসোমশাই, পরিমলেব খুব অসুবিধে হবে।

তারকবাবু মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, মেয়ে দুটোকে নিযেও কি কম ভাবনা। এখানে সকলে চেনাজানা ছিল, কোথায গিয়ে যে পডব।

এমনভাবে কথা বলছিলেন, যেন আমরা ওঁব সমবয়সী। যেন আমবা ওঁকে কোন পরামর্শ দিতে পারব, কিংবা সাহায্য।

পরিমলের মা নেই। বছব কয়েক আগে মাবা গেছেন। সোনা আব রুপো দুই মেয়েকে নিয়ে পরিমলের বাবাব সংসার।

আমার মনে হল পরিমলের মা থাকলে হয়তো ভদ্রলোক এত বিচলিত হতেন না।

হঠাৎ বললেন, মেয়ে দুটোব বিয়ের চেষ্টা কবছি এত, এখানে থাকলে হয়তো হয়ে যেত। তখন আমি ঝাড়া হাত পা। এখন আমার মাথায় দু-দুটো গন্ধমাদন পাহাড। ওখানে গেলে তো আর যোগাযোগও করতে পারব না। কি যে হবে!

বিভ্রান্ত দুটি চোখ। বড়ো মায়া হল, দুঃখ হল।

পবিমলদের বাড়ি তো এর আগেও কয়েকবাব এসেছি। পবিমলেব সঙ্গে কতদিন ঘণ্টাব পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়েছি। কত যুক্তি তর্ক, কত স্বপ্ন।

কোনদিন ওদের সংসারের ভিতরের চেহারাটা দেখতে পাইনি। জানতে পারিনি তারকবাবুর বুকের ভেতরে কত দুর্ভাবনা, কত সমস্যা লুকিযে রেখেছিলেন। এখন আরও বেশি।

কেউ বদলি হযে আসে, কেউ হঠাৎ বদলি হয়ে চলে যায়। এটাই তো এখানকার রীতি। একটা চলন্ত ট্রেন, কয়েকটা স্টেশন, এক একটা শহর যেন ওয়েটিংকম। কখন কার অন্য লাইনের ট্রেন আসবে তার জন্যে অপেক্ষা কবা।

সামান্য একটা ট্র্যান্সফার অর্ডার। অথচ একটা সংসারই যেন ভেসে যেতে বসে। এই যে পরিমল, ওকে এখন হস্টেলে রেখে কলেজে পড়াতে হবে। খরচ না জোগাতে পারলে হয়তো পড়াই বন্ধ হয়ে যাবে। সোনা রুপোর বিয়ের যোগাযোগ না করতে পাবলে, ছোট্ট স্টেশন, ওখান থেকে কি করেই বা করবেন, হয়তো শেষে বিয়েই হবে না। যেখানে গিয়ে

থাকবেন, পাড়াপড়শিরা কেমন, জানেন না। মেয়ে দুটোকে নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ থাকবে না।

তারকবাবু হঠাৎ বললেন, অনেক বলে-কয়ে একটা মাস সময় নিয়েছি। কেন জানো?

আমরা তাকিয়ে রইলাম ওঁর মুখের দিকে।

তারকবাবু কেমন বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। বললেন, টুংরিবাবার কাছে পুজো দিতে যাব, সেজন্যে।

আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম।

তারকবাবু বললেন, সকলেই তো বলছে, মানত করলে কাজ হয়। একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমরা বড়ো অসহায় বুঝলে। টাকাও নেই, বড় চাকরিও করি না, মাথার ওপর দুটো মেয়ের বিয়ে। চলেই তো যাচ্ছি, টুংরিবাবাকে অন্তত জানিয়ে যাই।

হাসলেন—আমাদের মত মানুষদের টুংরিবাবা ছাড়া আর কিই বা আছে।

একটু থেমে বললেন, বাজপেয়ীজীর কাছে গিয়েছিলাম, যদি তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, দু-তিন সপ্তাহ পরে নাকি যাবে।

আমি কোন কথা বললাম না।

উনি বোধহয় বুঝতে পারলেন। বললেন, আমাদের টুংরিবাবা ছাড়া আর কি আছে বলো।

তারপর নিজেই যেন নিজেকে স্তোক দেবার জন্যে বললেন, মিরাকল আছে, আমি বিশ্বাস করি মিরাক্‌ল ঘটে

বোধহয় হেসে ফেললেন। কিংবা অত জোর দিয়ে বলা উচিত হয়নি, হেসে হাল্কা করতে চাইলেন। বললেন, অন্তত আমাদের মত অসহায় লোকদের জন্যে থাকা দরকার। না থাকলে আমরা কি নিয়ে বাঁচব বলো।

পরিমলের কাছে একবার বোধহয় শুনেছিলাম, ওর বাবা মেয়ে দুটির বিয়ে নিয়ে ছোটাছুটি করছেন। খুবই চিন্তিত, কোথাও যোগাযোগ করে উঠতে পারছেন না।

শুনেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ভুলেও গিয়েছিলাম। এ-সব সমস্যা তখন আমাদের ছুঁতেও পারেনি। যেন অনেক দূরের ব্যাপার। ডাউরি সিস্টেম নিয়ে 'এসে' লেখার মত।

কিন্তু তারকবাবুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে হঠাৎ যেন একটা অজ্ঞাত দিক খুলে গেল চোখের সামনে।

তারকবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, টুংরিবাবাই এখন শেষ ভরসা।

টুংরিবাবা, টুংরিবাবা, টুংরিবাবা।

আমি ক্রমশই অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

বাড়ির চৌকাঠ পার হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেই মানুষগুলো অন্যরকম। তাদের মুখের ভাষাও বদলে যায়। তারা তখন পৃথিবীর খবরাখবর নিয়ে মাথা ঘামায়। দেশের স্বাধীনতা নিয়ে। দরিদ্রের দুর্দশা নিয়ে। কিংবা হট্টগোল আনন্দের মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে দেয়। কোথাও যেন অসন্তোষ নেই, দুর্ভাবনা নেই। আবার একেবারে আধুনিক মানুষ হয়ে কাজ করে। ফার্নিচারের ডিজাইন বদলায়। পোশাকের। যেমন বাজপেয়ীজী ঢিলেঢালা প্যান্ট আর সাদা কোট পরে অফিসে যান।

কিন্তু সবারই চৌকাঠের ভিতরে হাজারো দুশ্চিন্তা। নানান সমস্যা। দুঃখ, দুর্দশা। এক একটা অসহায় মানুষ কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তাই প্রাণপণে টুংরিবাবাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। সেই টুংরিবাবা কোথাও পাথর, কোথাও বা জ্যান্ত মানুষ। কোথাও একটা চিহ্ন বা মূর্তি।

সকলেরই ধারণা টুংরিবাবা মিরাকল। টুংবিবাবা মিরাকল ঘটাতে পাবে। আর এই মিরাকল ঘটাতে না পারলে টুংবিবাবা স্রেফ পাথব হযে যায়।

ছোটনও বোধহয় এর মধ্যে একদিন গিয়ে নাম লিখিয়ে এসেছে। বাজপেয়ীজীর কাছে।

পরিমলকে তাবকবাবু কি একটা কাজে পাঠিয়েছিলেন। সে ফিবল না দেখে আমি আব অজয বেবিয়ে পড়লাম। তাবকবাবু আবার মনে পডিয়ে দিলেন, টেবিল আব আলমাবি কেউ যদি কিনতে চায দেখো।

আমবা ঘাড নাডলাম।

বেশ খানিকটা দূবে এসে অজয হাসতে শুরু কবল।

—খদ্দেরটদ্দের বাজে কথা, আসলে জানতে চাইছিলেন আমবা কিনব কি না।

পবিমলেব বাবাকে নিয়ে হাসাহাসি আমাব কিন্তু ভাল লাগল না। আমি কোন কথাই বললাম না।

লাল ধুলোব বাস্তা ধবে বামজীর মন্দিব পার হয়ে, গির্জা পাব হযে চল নেমে গেছে ডানদিকে। এক জোড়া বেললাইন আমাদেব বাঁয়ে। লাইন পাব হযে দেবদারু গাছেব সাবি, তাবপব ক্রিশ্চানদেব কববখানা।

পাশের বিবাট মাঠে তাঁবু পডছে।

অজয বলে উঠল, সার্কাস আসছে বে।

সত্যি তাই। বিবাট একটা তাঁবু টাঙানো হচ্ছে। অসংখ্য লোকজন। দূব থেকে সমস্ত চত্বরটা দেখা যাচ্ছে।

আমবা সিমেট্রিব পাঁচিলেব ওপব এসে বসলাম। সুন্দব সুন্দব মার্বেল পাথরেব বেবিয়েল টুম্ব। ওপরে একটা করে ক্রশ চিহ্ন। একটা কববে সদ্য দিয়ে যাওযা একটা ফুলেব তোডা।

একটা কবরেব দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ টিলুব মুখটা চোখেব সামনে ভেসে উঠল। কেন জানি না।

ওর হাসপাতালের সাদা বিছানা, ওব সাদা পোশাক, ওব সাদা ফ্যাকাশে ম্লান মুখ আব ঐ কববেব সাদা মার্বেলেব মধ্যে হযতো কোন যোগসূত্র ছিল।

কিংবা ওদিকেব মাঠে সার্কাসেব তাঁবু ফেলা দেখে মনে পড়ে গিয়েছিল।

হেমবাবু চাবখানা সার্কাসেব টিকিট পেয়েছিলেন। ঐ মাঠ ইজাবা দেওযাব ব্যাপারে হেমবাবুব কিছুটা হাত আছে। সেজন্যেই বোধহয ওঁকে খাতিব করে সার্কাসওয়ালাবা পাশ দেয়।

আমি, শিউলি, অবু আব টিলু। চাবজনে যাব ঠিক ছিল। দুপুব থেকে অবুব পেটে যন্ত্রণা শুরু হল।

হেমবাবু বললেন, ও তো যেতে পাববে না। তোমরাই টিলুকে নিয়ে যাও।

কি হল কে জানে, শিউলি বেঁকে দাঁড়াল। ও যাবে না। শিউলি এইরকমই। ওর মিনিটে মিনিটে মত বদলে যায়।

বাবা-মাও বলে বোঝাতে পারলেন না।

শেয অবধি আমি আব টিলু গিয়েছিলাম।

একেবারে সামনের আসন, খুব ভাল সিট। যে আসন দেখিয়ে দিচ্ছিল সে আমাদের বসিয়ে দিয়েই কালো কোট পরা সার্কাসের একজন লোককে কি বলল, আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিল।

একটু পবেই একটা বাচ্চা ছেলে এসে আমাদের হাতে জোব করে দু-বোতল লেমনেড ধরিয়ে দিয়ে গেল।

সেই সার্কাস এ-বছব আবার আসছে। হযতো অন্য সার্কাসপার্টি। প্রতি বছরই একটা না

একটা আসে।

আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, এবার আর টিলু আসবে না। টিলু সার্কাস দেখবে না। দেখবে না বলেই এবার যেন সার্কাসের আর কোন আকর্ষণ নেই। আমার মনে হল এবার কেউই সার্কাস দেখবে না।

আমি আর টিলু পাশাপাশি বসে সার্কাস দেখছিলাম। টিলু যা দেখছে, হাসছে।

তারপর যখন হাতির দল সারি দিয়ে এসে ছোট ছোট টুলের ওপর চার পা গুটিয়ে দাঁড়াল সারি দিয়ে, টিলু সামনে ঝুঁকে পড়ে দেখছিল, হাততালি দিয়ে উঠল। সমস্ত দর্শকদের হাততালির সঙ্গে ওর হাততালির শব্দ মিশে গেল।

আমি ওকে চটিয়ে দেবার জন্যে বললাম, আরে দুর, এর চেয়ে তো অনেক ভাল ভাল খেলা আছে। এখনই সব হাততালি খরচ করে দিচ্ছ কেন।

কথাটা বলার সময়, কিংবা বলার পর আমি টিলুর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। টিলু সার্কাসের দিকে আঙুল দেখিয়ে ইশারা করল। অর্থাৎ ওদিকে দ্যাখো। শুধুই সে-কথা বলতে চাইল, নাকি বললে, আমার মুখের দিকে নয়।

তারপর একসময় আলো নিভিয়ে ট্র্যাপিজের খেলা শুরু হল। প্রথমে দুদিকের দোলনায় দুজন পুরুষ। তারপর দুদিকে দুটি মেয়ে। টানটান ঝকমকে পোশাক। এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে চলে যাচ্ছে, যেন শূন্যে সাঁতার কেটে।

টিলু মাঝেমাঝেই চাপা আতঙ্কে অস্ফুট শব্দ করছিল। কখনও ইস, কখনও উফ।

আমারও একটু আতঙ্ক হচ্ছিল। এই বুঝি হাত ফসকে পড়ে যায়। আমি একেবারে চুপচাপ, কোনও কথা বলছিলাম না।

টিলু হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে ওর বাঁ হাতখানা আমার বুকের ওপর চেপে ধরল। সরিয়ে নিল।

তারপর হেসে উঠল।

অর্থাৎ ভয়ে আমার বুক দুরুদুরু করছে কিনা। বলতে চাইল আমি ভয় পাচ্ছি।

হেসে উঠলাম।

কিন্তু বুকের ওপর হাতের ছোঁয়াটুকু লেগে রইল।

শেষ হতেই টিলু বলে উঠল, দারুণ সুন্দর। দারুণ।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, আমাদের তো সবই খারাপ। দ্যাখো সার্কাসটা তো ভাল।

ঠোঁট ওল্টাল ও। বললে, সার্কাস তোমাদের নয় ওরা তো সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। সার্কাস সকলের।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে আমরা তখন পা ফেলে বেরিয়ে আসছি, টিলু হাসতে হাসতে বললে, ট্র্যাপিজের খেলাটা যখন হচ্ছিল, ঢিপ ঢিপ ঢিপ ঢিপ শব্দ হচ্ছিল এমন।

আমি বুঝতে না পেরে বললাম, কোথায়? শুনিনি তো?

টিলু হেসে ফেলে বললে, তোমার বুকের মধ্যে। নিজের বুকের শব্দ, নিজে শুনতে পাবে কি করে!

আমাদের পাশেপাশে যারা ছিল তারাও ওর কথা শুনে হেসে উঠল। তারা হেসে উঠল বলেই আমি অস্বস্তিতে আর কোন কথা বলতে পারলাম না।

সার্কাসের ভিড় ছাড়িয়ে মাঠ পেরিয়ে আমরা দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চললাম। এদিকটা সন্ধের পর সাধারণত অন্ধকারই থাকে। সে-সময় কেউ এদিকে বড়ো একটা আসে না। কিন্তু সার্কাস এসেছে বলেই টাউন কমিটি এই কদিনের জন্যে শালবল্লার খুঁটি বসিয়ে মাঝে মাঝে আলো দিয়েছে। মাঠের সর্বত্র, এমন কি ঐ ক্রিশ্চানদের সিমেট্রিতেও। মাঝে মাঝে দু-চারটে

বড় বড় ফ্লাড লাইট। তাই চতুর্দিক আলোয় আলো হয়ে উঠেছে।

অনেকখানি হেঁটে এসে আমি বললাম, চলো ঐ সিমেট্রির মধ্যে দিয়ে যাই। বেশ নির্জন।

অবাক হয়ে তাকাল ও সিমেট্রির দিকে।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, তুমি আমাকে কবরখানায় নিয়ে যেতে চাইছ? বলে হাসল। —না বাবা, আমি এত তাড়াতাড়ি মরতে চাই না।

একটু থেমে বললে, আমি বেঁচে থাকতে চাই, অনেক দিন, অনেক দিন বেঁচে থাকব। তারপর সেই বুড়ি থুথ্থুড়ি হয়ে মরতে চাই। তার আগে নয়।

ও কথাগুলো এমনভাবে বলছিল, যেন নিজেকেই বলছে।

'তুমি আমাকে কবরখানায় নিয়ে যেতে চাইছ?' কথাটা আমার বুকের মধ্যে গিয়ে লাগল। মনে হল সিমেট্রির ভিতর দিয়ে যেতে বলে অপরাধ করে ফেলেছি। কিন্তু ও কথাটাকে এভাবে নিল কেন। ঠাট্টার সুরে বললেও আমার খারাপ লাগল। কারণ, তখন আমি ওর অসুখের কথা জেনে গিয়েছি, হেমবাবুর দুশ্চিন্তার কথা। কি একটা দুর্বোধ্য অসুখে ওর শরীর ভেঙে পড়ছে। হেমবাবু বলেছিলেন বার, ক।

তখন অবশ্য অসুখটাকে আমরা কেউ অত গুরুত্ব দিইনি।

টিলুর ঐ কথাগুলো শুনতে ভাল লাগেনি সেদিন। কিন্তু ভয়ও পাইনি।

সার্কাস দেখে ফেরার সময় সেদিন আমরা দুজনে অনেক ঘোরাঘুরি করে রেল লাইন ডিঙিয়ে তারপর রিক্সা নিয়েছিলাম।

সেই দিনটা আমার স্মৃতির মধ্যে যেন একটা ছবি হয়ে আছে।

অজয় হঠাৎ পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বললে, এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিলি?

আমি চমকে উঠলাম। সত্যি তো, আমি কোথায় চলে গিয়েছিলাম এতক্ষণ। টিলুর সঙ্গে, টিলুর পাশাপাশি। ঐ তো দুজনে পাশাপাশি বসে সার্কাস দেখছি। হাসছি। টিলু আমার বুকের ওপর হাত চেপে দেখছে, ভয়ে ঢিপ ঢিপ করছে কি না। দুজনে রেললাইন পার হয়ে আঁকাবাঁকা চড়াই বেয়ে রাস্তায় উঠছি।

অজয়ের কথায় লজ্জা পেলাম। অপ্রতিভ হাসি হাসলাম। কিন্তু মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল।

সিমেট্রির পাঁচিলের ওপর দুজনে বসে আছি। আমি আর অজয়। একটু আগে পরিমলদের বাড়ি থেকে এসেছি। তারকবাবু তাঁর দুঃখদুর্দশার কথা বলেছেন। আলমারি আর টেবিলের কথা, দু মেয়ের বিয়ের যোগাযোগ, টুংরিবাবা। সব ভুলে গিয়ে টিলুর মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম কেন।

টিলু এখন হাসপাতালের কটেজে। সাদা ফুটফুটে রোগশয্যায়। কিন্তু সিমেট্রির মধ্যে একটা সাদা মার্বেলের রেলিং-এর টুম্বের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সাদা পোশাকের রুগ্‌ণ টিলুর মুখখানা ঝাপসা ভেসে উঠল কেন।

আমার সমস্ত মন বিষণ্ণ হয়ে গেল। ঐ শ্বেতশুভ্র কবরের সঙ্গে সাদা সাদা পোশাকের নার্স কিংবা চীফ মেট্রন মিসেস মগার্নি, কিংবা সাদা চাদরের টিলুর বিছানার কোন মিল খুঁজে পেয়েছিলাম বলেই কি।

নাকি ওদিকের মাঠে সার্কাসের তাঁবু পড়ছে দেখেই ওকে মনে পড়ে গেল। কারণ সার্কাসের সঙ্গে টিলু যে আমার স্মৃতির মধ্যে জড়িয়ে আছে।

কিন্তু ওর সেদিনের কথা মনে পড়তেই আমার ভীষণ খারাপ লাগল। একটা চাপা কান্না যেন গলার কাছে আটকে আছে।

—তুমি আমাকে কবরখানায় নিয়ে যেতে চাইছ?

সেদিন ওর এই রসিকতা শুনতে ভাল লাগেনি। আজ মনে পড়তেই বুকের ভেতরটা

যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। নিজের মনেই প্রশ্ন জাগল, এরকম একটা বিশ্রী রসিকতা ও করেছিল কেন।

কবরখানা কথাটাই এখন যেন আমার কাছে একটা আতঙ্ক।

—না বাবা, আমি এত তাড়াতাড়ি মরতে চাই না।

টিলু হাসতে হাসতে বলেছিল।

সবই তো হাল্কা কথা, ঠাট্টার সুরে বলা। অথচ এখন আর আমি কথাগুলোকে হাল্কাভাবে নিতে পারছি না।

মনে মনে বললাম, না টিলু, না। মৃত্যু তোমাব কাছ থেকে অনেক দূবে সরে যাক। আমি আব কোনদিন তোমাকে কবরখানার ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে চাইব না। তুমি আবাব একবাব আমাব বুকেব ওপব তোমাব নবম হাতখানা চেপে ধরে দেখে যাও, তোমাব কথা ভেবে আমার বুকেব ভিতবটা কেমন থবথব কবে কাঁপছে। আমাব নিজের বুকেব শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি।

৪

বৃদ্ধ মালি হবগোবিন খুর্পি হাতে ফুলগাছেব তলায় মাটি ঢিলে কবতে কবতে ফিবে তাকিয়ে বললে, ছোটাবাবু, ও বাংলোর মিসদিদি কাল হাসপাতাল থেকে ফিবে এসেছেন।

হবগোবিনেব ভাষায় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বা ইউবোপীযদের অবিবাহিতা মেয়েরা মিসিবাবা, আব বাঙালীদেব বেলায় সেটা মিসদিদি। হবগোবিন শিউলিকেও বলে মিসদিদি। তাই প্রথমটা আমি বুঝতেই পাবিনি। পবক্ষণেই হাসপাতাল কথাটাব জন্যেই টিলুদেব বাংলোব দিকে তাকালাম।

হরগোবিন এক মুখ হেসে বললে, হাঁ হাঁ, দত্তসাহেবেব বাংলোব মিসদিদি। সাযেদ ভাল হযে গেছে।

এব চেয়ে খুশি হবাব মত খবব যেন আব নেই। টিলু ভাল হযে গেছে। হাসপাতালেব কটেজ থেকে টিলু ফিবে এসেছে।

গতকাল অজযদেব বাড়ি গিযে আটকে পড়েছিলাম। সন্ধে হযে গিযেছিল বলে হাসপাতালে যাওযা হযে ওঠেনি।

সন্ধেব পর কটেজে যাওযা নিষেধ। তখন ডাক্তাববা আসেন, পেসেন্টকে দেখেন, পেসেন্টেব অভিভাবকদেব সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তাছাড়া সে-সময় রুগী ঘুমোয়। তাকে ডিস্টার্ব কবা হবে তাই হাসপাতালে যাওযা হয়নি। লুকিয়ে চুবিযে যাওয়া যেত না তা নয়। কিন্তু চীফ মেট্রন মিসেস মর্গ্যানেব মুখটা মনে পড়তেই সাহসে কুলোযনি। অ্যাটলাসেব মত পৃথিবীটা ঘাড়ে নিয়ে গম্ভীর মুখে উঁচু-হিল জুতোব খুটখুট শব্দ কবে মিসেস মর্গ্যান এগিযে আসছেন, এই চেহাবাটা মনে পড়তেই সাহস উবে গিয়েছিল।

অজয় বলেছিল, দিদি জামাইবাবু এসেছে, চল চল।

আমাবও যাবার আগ্রহ হয়েছিল।

অজযের জামাইবাবু কলেজে পড়ান, কলকাতায়। উনি কলকাতার অনেক খবব জানেন, কলেজেব খবব।

অজয় বলেছিল, কি পড়ব, কি কি সাবজেক্ট নেব, বাবা জামাইবাবুকে জিগ্যেস করছিল। তুইও চল না।

এখান থেকে খুব কম ছেলেই কলকাতাব কলেজে ভর্তি হতে চায। বেশির ভাগই

কাছাকাছি কোন কলেজে পড়ে। জেলা শহরে।

জেলা শহর খুব কাছেই। সাইকেল-সমেত ট্রেনে ওঠে, মিনিট দশেক পরে স্টেশনে নেমে আরও দশ মিনিটের মধ্যে কলেজ। এভাবেই যাওয়া-আসা করে সকলে।

ছোটনের বাবা বলতেন, বাড়ির ভাত খেয়ে লেখাপড়া কর, যদ্দূর এগোতে পার। কলকাতা কি দরকার। তাছাড়া হোস্টেলে থাকলে ছেলেরা খারাপ হয়ে যায়।

সকলেরই তখন ঐরকম একটা ধারণা ছিল।

পরিমলের বাবা তারকবাবুরও ঐ মত। উনি হঠাৎ ট্রানসফার না হলে ছোটনের মতই পরিমলও হয়তো এখানকার কলেজে পড়ত।

সকলের লক্ষ্য কিন্তু একটাই। কোনরকমে পাশটাশ করলে বাবা তাঁর ওপরওয়ালা সাহেবকে ধরে ছেলের একটা কাজ জুটিয়ে দেবেন। কোন না কোন ভাবে চাকরি পেয়েও যেত সবাই। পাশটাশ করে বড়ো জোর দু-এক বছর বসে থাকতে হত। তখন কেউ মুদালিয়ারের কাছে শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শিখত, কেউ ছোটনের মত টেলিগ্রাফ স্কুলে টরে টক্কা টরে টক্কা করত। সুখেনদা তো রুরকি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিলেন, তিনিও এসে এখানেই চাকরিতে ঢুকেছেন। ডাক্তারি পাশ করে অলকদা ছোট হাসপাতালের এম ও।

আমি আর অরু কিন্তু এখানে ফিরে আসার কথা ভাবতেই পারতাম না।

টিলু তো এই জায়গাটার প্রতি সব ভালবাসা একটু একটু করে ছিনিয়ে নিয়েছিল। জানি না, হয়তো ভিতরে ভিতরে এই ধোঁয়া ধুলো ট্রেনের হুইসল শান্টিংয়ের আওয়াজকে ঘৃণা করতে শুরু করেছি।

যেন একটা অন্ধকূপের মধ্যে আছি, আলোর পৃথিবীতে পালিয়ে যেতে চাই।

এখানে নিরাপত্তা আছে, ভবিষ্যৎ স্থিরনির্দিষ্ট। বাইরের দুনিয়ায় সবই নিজেকে খুঁজে বের করতে হবে। তোমাকে সাহায্য করার জন্যে কেউ এগিয়ে আসবে না। কিন্তু বার্টন সাহেবের খুশ মেজাজের জন্যে তোমাকে অপেক্ষাও করতে হবে না।

আমি অরু আর অজয়—তিনজনই শুধু স্থির করে রেখেছিলাম কলকাতার কলেজে ভর্তি হব।

মা চেয়েছিল আমি কলকাতায় জেঠিমার বাড়িতে থেকে কলেজ করি।

বাবা বলেছিলেন, না না। হস্টেলে থেকে।

আসলে বাবা নিজেও কলকাতার হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করেছিলেন। অরু আর অজয়ের বাবাও তাই।

কিন্তু আমরা তিনজন কে কোন্ কলেজে ঢুকতে পারব ঠিক ছিল না।

অজয় বললে, দিদি জামাইবাবু এসেছে।

ওর জামাইবাবু কলেজে পড়ান। কলেজের খবরাখবর অনেক ভাল দিতে পারবেন। বাবাকে এসে বলা যাবে।

বললাম, চল যাই।

গেলাম।

অজয়ের দিদি পরিচয় করিয়ে দিলে। আমি আগে চিনতাম না। উনি তো খুব কম আসেন। অজয়ের দিদি এলেও দু-চারদিনের বেশি থাকে না।

আমি অনুযোগ করলাম, মিনুদি তুমি আজকাল আসোই না।

মিনুদি বললে, তোদের এখানে গরমের সময় প্রচণ্ড গরম, শীতের সময় প্রচণ্ড শীত। কখন আসব বল।

মনে হল মিনুদিও যেন বলছে, তোরা এখানে থাকিস কি করে রে

অথচ মিনুদি তো এখানেই জন্মেছে, বড় হয়েছে। দুদিনেই জায়গাটাকে ঘৃণা করতে শিখেছে নাকি।

কিন্তু আমিও তো এখন আর পছন্দ করি না, ভিতরে ভিতরে ঘৃণা করি। তবু মিনুদির কথাটা বুকে এসে লাগল। তা হলে কি ভালও বাসি?

একই সঙ্গে এ শহরটাকে তা হলে ঘৃণাও করি, ভালও বাসি। কি আশ্চর্য।

বললাম, কি জানি মিনুদি, তুমি কোন নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে চলে গেছ।

অজয়ের জামাইবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। ভূগোলে পড়া শব্দটা ব্যবহার করেছি বলে। নাকি বাংলায় বলেছি বলে।

কারণ পরক্ষণেই হাসতে হাসতে জিগ্যেস করলেন, তোমরা কি ইতিহাস ভূগোল বাংলায় পড়ো নাকি?

অজয় প্রায় রেগে যাওয়ার দাখিল। বললে, ইংলিশ মিডিয়াম। ও এত রেগে গিয়েছিল, বলে বসল, আমাদের বাংলা সংস্কৃতের প্রশ্নও ইংরেজিতে হয়।

যেন সেটা কত গর্বের।

বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। ওর জামাইবাবু হাসতে হাসতে বললেন, ঠাট্টাও বোঝ না। তুমিও দেখছি দিদির মতই। সেন্স অফ হিউমার একেবারে নেই। বাংলা মিডিয়াম বলে কিছু আছে নাকি. এটা ইংরেজদের দেশ, সবাই জানি।

মিনুদি বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিল, হঠাৎ বলে উঠল, আমার নামে কি যেন বললে?

জামাইবাবু ভদ্রলোক বললেন, তোমার মতই অজয়েরও কোন সেন্স অফ হিউমার নেই।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন, কারণ মিনুদি বেশ জোরে একটা চিমটি কেটেছে।

জামাইবাবু ভদ্রলোক হেসে বললেন, না না আছে, সেন্স অফ হিউমার আছে।

আমরাও হাসলাম। ওর জামাইবাবুকে বেশ ভালই লাগল। মিনুদিও খুব সুখী। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে।

মিনুদি এতক্ষণে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। অজয়ের বন্ধু। ব্যস। তারপর সবই বাবার পরিচয়। কি চাকরি করেন, কোন পোস্টে, কোথায় থাকি, বাংলোটা কেমন ইত্যাদি।

যেন আমার নিজের কোন পরিচয় নেই।

অজয় বললে, স্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়েছি জামাইবাবু। এবার সুকুমারও কলকাতায় পড়বে।

উনি খুশি হলেন। তারপর পড়াশুনোর কথায় চলে গেলেন। সায়েন্স না আর্টস। কিসে চাকরির সুবিধে। কোন সাবজেক্ট নিলে বেশি নম্বর ওঠে।

কেমন সব পোশাকি নাম আছে—বিদ্যা, জ্ঞান। আসলে সকলের কাছেই প্রিয়বস্তু নম্বর উদ্দেশ্য চাকরি।

এইসবই আলোচনা চলছিল। এক ফাঁকে মিনুদি লুডো নিয়ে এসে বসল। খেলতে হবে।

অজয়ের ফ্রক-পরা বেণী দোলানো ছোট বোন ইনু জামাইবাবুর পিঠ ঘেঁসে বসল। হাসিহুল্লোড়ের মধ্যে খেলা চলল।

কখন সন্ধে হয়ে গেছে খেয়ালই করিনি।

যখন সভা ভাঙল প্রফেসর জামাইবাবু বললেন, এখানে লুডো খেলে সময় কাটানো ছাড়া তো উপায় নেই। কাছাকাছি বেড়াতে যাওয়ার মত কোন জায়গাও নেই।

আমি চাঁদমারির ময়দান, দূরের জেলখানার কথা বলতেই বললেন, ওসব তো আগেরবার দেখে নিয়েছি।

অজয় হাসতে হাসতে বললে, তা হলে টুংরিবাবা। পরিমলরা যাবে।

আমি বললাম, ছোটনরাও।

ইনু, অজয়ের বোন, বেণী দুলিয়ে বললে, সেই ভাল জাঁইবাবু। সব একসঙ্গে যাব।

অজয় বললে, এখন নয়। দিদি তুই দু-তিন সপ্তাহ থেকে যা, জামাইবাবু যখন নিতে আসবেন···আমি চিঠি লিখে ডেটটা জানিয়ে দেব।

ইনু জামাইবাবুর হাতটা ধরে ঝুলে পড়ল। —হ্যাঁ জাঁইবাবু, আসতেই হবে। আমরা সব একসঙ্গে যাব। খুব মজা হবে।

বলেই ইনু ছুটে গেল মার কাছে। 'মা মা' ডাক শুনেই বুঝলাম, এমন একটা দারুণ খবর মাকে জানাতে গেছে।

জামাইবাবু ভদ্রলোক তখন অবাক হয়ে জিগ্যেস করছেন, টুংরিবাবা ব্যাপারটা কি ? কার বাবা ?

মিনুদি রেগে গেল। —ঠাকুবদেবতা নিয়ে হাসিঠাট্টা কোর না।

অজয় তার জামাইবাবুকে বোঝাল, সে একটা দারুণ পিকনিকের জায়গা। হেসে বললে, আমরা অবশ্য কেউই দেখিনি।

তারপর অজয় আমাব দিকে ফিবে বললে, সুকুমাব, তুই যাবি তো ?

আমি কোন উত্তব দিলাম না।

বলতে পাবলাম না, বাবা এসব একদম পছন্দ করেন না।

অজযদেব বাড়ি থেকে ফিরতে সন্ধে হযে গিযেছিল। ইচ্ছে থাকলেও মিসেস মর্গ্যানেব ভয়ে হাসপাতালে যেতে পারিনি। সটান বাড়ি ফিরে এসেছিলাম।

দেখতে দেখতে পনেরোটা দিন কেটে গেছে। প্রায় প্রতিদিনই যাই। কখনও একা, কখনও অবুর সঙ্গে। ভেবেছিলাম কাল নিশ্চয টিলু অপেক্ষা কবেছে। ভাবতে ভাল লেগেছিল।

কিন্তু ও যে এত তাড়াতাড়ি ফিবে আসবে জানতাম না।

আমাদের বাগানের মালি হবগোবিন ফুলগাছের তলার মাটি ঢিলে করছিল খুবপি হাতে। ও আমাকে দেখতে পেয়ে বললে, ও বাংলোব মিসদিদি কাল হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছেন।

আমি বুঝতে পাবিনি দেখে জানিয়ে দিল দত্তসাহেবেব বাংলোব মিসদিদি। দত্তসাহেব মানে হেমবাবু।

হরগোবিন বললে, সাযেদ ভালো হয়ে গেছে।

আমিও তাই ভেবেছিলাম। পবক্ষণেই সন্দেহ হল। ডাক্তাব ক্রশবি তো গত পরশুও কিছু রিপোর্ট দেননি। হেমবাবু তো তাই বলছিলেন।

তা হলে কি তিনি বলেছেন, তেমন কঠিন বোগ কিছু নয় ! সেজন্যেই টিলুকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছেন ওঁরা ? বাড়িতেই চিকিৎসা হবে ?

আমার তখনই একবার টিলুদের বাড়িতে যেতে ইচ্ছে হল। কিন্তু এত সকালে যাওয়া যায় না। হযতো ঘুম থেকেই ওঠেননি হেমবাবু। টিলু তো অনেক বেলা অবধি ঘুমোয়। হয়তো দুর্বল শবীর আর ক্লান্তিব জন্যেই।

আমি হরগোবিনকে প্রশ্ন করলাম, কখন এল ওবা ?

হরগোবিন বললে, মালুম নেই। বাতি জ্বলছিল, দেখলাম কি মিসদিদি দত্তসাহেবের হাঁত পাকড়ে, অন্দর গেলেন।

বাবা তখনও ঘুমোচ্ছেন, কিন্তু মা ভোরবেলাতেই উঠে পড়ে।

বারান্দায় বসেই শুনতে পেলাম মা শিউলালকে ডাকছে, চা বানাতে বলছে। শিউলাল

মড়ার মত পড়ে পড়ে ঘুমোয়, কিছুতেই উঠতে চায় না। মার ডাকে সাড়া দেয়, আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এক একদিন রেগে গিয়ে মা নিজেই চা বানায়।

আমি ভিতরে গিয়ে বললাম, মা, টিলুকে নাকি কাল রাত্তিরে ওঁরা ফিরিয়ে এনেছেন।

মা খুশি হয়ে বললে, সত্যি ? দেখলি তুই ?

বললাম, না। হরগোবিন বলছে ও কাল রাত্তিরে দেখেছে।

—যাক বাবা, ভালোয় ভালোয় ফিরেছে। হাসপাতালের নাম শুনলেই ভয় হয়। মা নমস্কারের ভঙ্গিতে দুহাত কপালে ঠেকাল। তারপর নিজের মনেই যেন বললে, মেয়েটার জন্যে এত কষ্ট হয়।

মার গলার স্বরে গাঢ় মায়া লেগেছিল। যেন টিলুর জন্যে সত্যি কষ্ট পায়। দুর্ভাবনা হয়।

অথচ আমাকে সাবধান করার সময মনে হয়েছিল টিলুর জন্যে মার কোন মায়ামমতা নেই। টি বি হতে পারে এই সন্দেহে টিলু তখন মার কাছে যেন অস্পৃশ্য অচ্ছুত। ওদের বাড়িটাই।

এখন ওদের ওপর মায়া দেখে সাহস করে বললাম, দেখি, বিকেলে একবার যাব।

মা বললে, আমিও যাব ভাবছি দুপুরের দিকে। ডাক্তার কি বললে, সেবে গেছে, নাকি অন্য কোন অসুখ, বাইরে নিয়ে যেতে বলেছে কিনা···

বেশ বুঝতে পারলাম মার মন থেকে আতঙ্কটা পুবোপুবি সরে যাযনি।

বাবা ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় বসে চা খান।

বেশ চওডা বাবান্দা, একটা পিং পং টেবল বসিয়ে দিব্যি খেলা যায এত চওড়া। চিক নামিয়ে দিয়ে অরোরা সাহেবের ছেলেমেয়েবা খেলত।

অজয় আর ছোটন একবাব বলেছিল আমাকে। —একটা পিং পং টেবিল কেন্ সুকুমার, এতখানি জাযগা···

হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমার বাড়িতে থাকতে ভালই লাগত না। তাছাড়া বন্ধুদের নিয়ে এসে বাড়িতে আড্ডা বাবা একেবারে পছন্দ করতেন না। বিশেষ করে ছোটনের মত বন্ধুদের।

মাকে খববটা দিয়ে বাগানে চলে গেলাম হবগোবিনের কাজ তদারকি করতে। উদ্দেশ্য অন্য। যদি অবু কিংবা টিলু আমাকে ওদিক থেকে দেখতে পায়। কথা বলে বা ডাকে।

আমার কেবলই ছুটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। আমি যে প্রতিদিনই হাসপাতালে গিয়েছি বাড়িতে জানাইনি। কিন্তু আশ্চর্য, বাবাও কোনদিন কিছু বলেননি। হেমবাবু কি তা হলে বাবাকে সে-কথা জানাননি কোনদিন ? নাকি বাবার সঙ্গে এ কদিন অফিসে দেখাই হয়নি। না হতেও পারে। একই অফিস হলে কি হবে, ডিপার্টমেণ্ট তো অন্য।

কাঁচিটা নিয়ে এসে কোন একটা গাছের পাতা ছেঁটে দিতে বলছিলাম হবগোবিনকে। ও কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। হাসছিল।

মালি হরগোবিনের এই বাগানটাই যেন সংসার। দিনরাত পড়ে আছে এরই পিছনে। বাংলোর একপ্রান্তে ওদের ছোট এক কুঠরি কোয়ার্টার। মাইনে পায অফিস থেকে। বৌ আছে, কিন্তু ছেলেমেয়ে নেই। ওর কাছে এই গাছগুলোই যেন সন্তান। একটা গোলাপ ফুলের পাপড়িতে পোকা বসলে হাত দিয়ে ঝেড়ে দিতেও আপত্তি। একটা কাঠি তুলে এনে ধীরে ধীরে পোকাটাকে ফেলে দিত।

কিছুক্ষণের জন্যে আমি বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ চোখ গেল রাস্তার দিকে। রাস্তার দিক থেকে পাশের বাংলোব ফটকে।

দেখলাম হেমবাবু বেরিয়ে যাচ্ছেন।

না, বেরিয়ে যাচ্ছেন না। বোধহয় এদিকেই আসছেন।

আমাদের গেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি তাকিয়ে রইলাম। উনি হয়তো আসতে চান, নাকি কিছু বলছেন।

আমি দু-এক পা এগিয়ে যেতেই ওখান থেকেই জিগ্যেস করলেন, বাবা উঠেছেন?

আমি বললাম, আসুন, আসুন।

বারান্দায় বেতের চেয়ার কখানা ছড়ানো ছিটানো পড়েছিল। শিউলির কাণ্ড। সন্ধেবেলায় একা একা, কোন জায়গায় বসেই শান্তি নেই। চেয়ারগুলো নিয়ে টানাটানি করে, একবার এখানে বসে, একবার ওখানে।

আমি হরগোবিনকে বললাম, চেয়ারগুলো ঠিক করে দিতে। আর নিজে ছুটে গেলাম বাবাকে খবর দিতে।

বাবা অনেক আগেই উঠেছেন। বললেন, বসতে দিয়েছিস? আমি খবর দিয়েই বেরিয়ে এলাম। এবং হেমবাবুর দিকে তাকিয়ে তখনই কেমন অদ্ভুত লাগল।

শক্তসমর্থ ঋজু চেহারার সেই মানুষ যেন রাতারাতি বদলে গেছেন। আগে লক্ষ করিনি, সটান সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, সোজা হয়ে চলতেন। কিন্তু দেখলাম কেমন নুয়ে পড়ে ধীরে ধীরে হাঁটছেন। যেন পা দুটো ওঁর ভার সহ্য করতে পারছে না। চোখমুখ দেখে মনে হল রাত্তিরে ঘুমোননি।

আমি বললাম, আসুন। বাবা আসছেন।

বলে এগিয়ে গেলাম।

এইটুকু পথ। কিন্তু কি ধীরে ধীরে হাঁটছেন।

উনি বারান্দায় উঠে আসতেই বললাম, বসুন।

হেমবাবু বসলেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন। —বাবা খুব ব্যস্ত নয় তো?

আমি বললাম, না না।

তখনই বাবা বেরিয়ে এলেন।

আর বাবাকে দেখতে পেয়ে হেমবাবু চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। বাবা বললেন, স্ত্রীর কাছে এখনই শুনলাম আপনারা ফিরেছেন।

আমি বললাম, হরগোবিন বলছিল।

হেমবাবু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

তারপর ধীরে ধীরে গাঢ় গলায় বললেন, হ্যাঁ, ফিরেছি।

যেন এতখানি হেঁটে আসার জন্যে হাঁপাচ্ছেন।

হেমবাবুর এ-চেহারা কখনও দেখিনি।

মাথা নিচু করে বসে রইলেন। এবং মাথা না তুলেই আবার বললেন, হ্যাঁ, ফিরেছি, উইথ এ স্যাড নিউজ। তারপর হঠাৎ যেন হাউ হাউ করে বলে উঠলেন, আমি কি নিয়ে বাঁচব মিঃ রায়!

মুখ তুললেন। দুটো চোখ ছলছল করছে।

আমি সরে যেতে পারলাম না, যদিও বাবা আমাকে আর শিউলিকে ছেলেবেলা থেকেই সহবত শিখিয়ে আসছেন, বাবার সহকর্মী বা বন্ধুরা এলে সরে যেতে হবে। দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়।

আমার সমস্ত শরীরে তখন কৌতূহল।

হেমবাবুর এমন কান্নাচাপা গলা, এমন ছলছল চোখ কখনও দেখিনি।

টিলু যে এতদিন ধরে অসুখে ভুগছে, একটার পর একটা চিকিৎসা করিয়ে যাচ্ছেন, তবু একটা আত্মবিশ্বাস দেখেছি ওঁর মধ্যে। টিলুকে সারিয়ে তুলবেনই। টিলুর জন্যেই এখানে

ট্র্যান্সফার নিয়েছেন অনেক চেষ্টা করে। বলেছিলেন, দরকার হয় কলকাতায় ট্র্যান্সফার নেব। দু-চারবার দেখাতে নিয়েও গেছেন। কেউ কিচ্ছু বলতে পারেনি।

হেমবাবু হঠাৎ বললেন, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা কবছে না মিঃ রায়। কি নিয়েই বা বাঁচব।

বাবাকেও খুব উদ্ভ্রান্ত দেখাল।— কেন কি হযেছে ?

হেমবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, ডক্টর ক্রসবি তাঁর ভার্ডিক্ট দিয়ে দিয়েছেন। দুঃখের হাসি হাসলেন হেমবাবু।

—আমাকে শক্ত হতে বললেন। যেন ইচ্ছে করলেই শক্ত হওয়া যায়।

আমার বুকের মধ্যেও তখন একটা তোলপাড় চলছে। ভয়ঙ্কব কোন একটা অসুখের কথা যেন শুনতে যাচ্ছি। টি বি ? নাকি আবও সাঙ্ঘাতিক ? ক্যান্সাব ?

তখন টিউবারকুলোসিস নিয়েই সকলে আতঙ্কিত। বাজরোগ। বলত, রাজাদেরই পোসায়। রাজসিক খরচ তার। তাও প্রাযই বাঁচে না। ওষুধপত্তর নেই।

আমি উদগ্রীব হয়ে বইলাম।

হেমবাবু প্রায় কান্নার গলায় বললেন, আমি পাবব না মিঃ বায়। পাবব না। সাবারাত পায়চারি করেছি, সকাল হতেই ছুটে চলে এসেছি। আমি টিলু-মাব মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। স্ত্রী, অবু, কাবও দিকে তাকাতে পারছি না।

হেমবাবুর যেন নিশ্বাস নিতেও কষ্ট। চোখেব দু-কোণে দু-বিন্দু জল। হেমবাবু এ-ভাবে ভেঙে পড়তে পাবেন কখনও মনে হয়নি।

শিউলাল চা দিয়ে গেল এক ফাঁকে।

বাবা চা খেলেন। আমার হাতেও চায়ের কাপ।

হেমবাবুর ওসব দিকে দৃষ্টিই নেই। পড়ে আছে। খাওযার কথা বলাও যাচ্ছে না।

হেমবাবু হেলানো বেতের চেযারেব পিছন দিকে মাথাটা ছুঁড়ে দিলেন। যেন অসহ্য এক যন্ত্রণা।

ধীরে ধীবে বললেন, ডাক্তাব ক্রসবি ডাক্তাব ভাল হতে পাবেন, শুনছি তো খুবই বড ডাক্তার, লন্ডনেব বোর্ড ছমাসের জন্যে পাঠিযেছে। কে সেদিন বলছিল ওঁকে রুগী দেখাতে পাবাই নাকি সৌভাগ্য।

দুঃখের হাসি হাসলেন হেমবাবু। —পৃথিবীতে এত মানুষ, আমাব কপালেই এমন কেন বলতে পারেন। কি পাপ করেছিলাম।

বাবা সান্ত্বনা দিতে চাইলেন।—পাপপুণ্যের কথা তুলছেন কেন। কিন্তু কি হয়েছে, বোগটা কি ?

হেমবাবু হাসলেন। দুঃখের হাসি। —ভুলেও গিয়েছি, কি যেন নাম, কখনও তো শুনিনি। প্রেসক্রিপশনে লেখা আছে। কিন্তু বোগের নাম জেনে কি লাভ।

হেমবাবু চুপ করে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ।

—আমার অবস্থাটা ভাবুন। মনে করুন একজন গণৎকার বলে দিচ্ছে আপনার এই সন্তান আঠারো বছরের বেশি বাঁচবে না। তাবপব বলছে, ওকে খুব হাসিখুশি রাখবেন, জানতে দেবেন না। আর আপনি নিজেকে শক্ত করুন।

বাবার আর আমার দুজনের মুখ থেকে একটাই কথা ছিটকে বেরিয়ে এল, বাঁচবে না ?

হেমবাবুর দুচোখ বেয়ে তখন ঝবঝর করে জল পড়ছে। বললেন, আপনার কাছেই ছুটে এলাম। একজন কাউকে তো বলতে হবে। কাকে বলব ?

বাবা উদ্ভ্রান্তের মত জিগ্যেস করলেন, এমন কি অসুখ ?

হেমবাবু যেন প্রশ্নটা শুনতেই পাননি। চোখ তাকিয়ে আছে, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছেন

না।

একটু পরে বললেন, পৃথিবীতে এ-রোগ খুব সামান্য লোকের হয়েছে। কি যেন নাম। বারোচোদ্দ বছরের বেশি বাঁচে না। একজনই শুধু আঠারো বছব বয়েসে মারা গেছে।

বাবা কিছুটা যেন অবিশ্বাসের সুরে বললেন, আছে নাকি এমন বোগ ? ডাক্তাব ক্রসবিব ডায়গনোসিস হয়তো ভুল, আপনি এত ভেঙে পড়ছেন কেন।

হেমবাবু যেন একটু আশাব আলো দেখতে পেলেন। —আঃ, তাই যেন হয়।

একটু থেমে বললেন, চোখেব সামনে দিনে দিনে নার্ভগুলো অকেজো হয়ে যাবে, টিসু শুকিয়ে যাবে, আর দিন গুনতে হবে। কি দুঃসহ ব্যাপার, ভাবুন মিঃ রায। প্রত্যেকটি দিন যাবে আর মনে হবে যাক আজকের দিনটা পার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এও তো মনে হবে আঠারো বছর বয়েস আবও একদিন এগিয়ে এল।

বাবা এবার নিজেব মধ্যে ফিবে এসেছেন। এতক্ষণ বাবা নিজেই হয়তো উদ্‌ভ্রান্ত হযে গিয়েছিলেন। টিলুকে এই দুবছর ধরে দেখছেন, মাঝে মাঝেই আসত, গল্প করত। মাস দুয়েক হল আসা বন্ধ কবেছিল।

সেজন্যেই মা আর বাবা টি বি সন্দেহ কবেছিলেন।

বাবা বললেন, আপনি ভেঙে পডবেন না মিঃ দত্ত। এখনই ভেঙে পডাব কিছু হযনি। ডাক্তার ক্রসবি হয়তো ভুল কবেছেন। আব উনিই তো বলেছেন বাবোচোদ্দ বছবেব মধ্যে মাবা যায়, একজন শুধু আঠাবো বছব বেঁচেছিল। যদি ঐ বোগটা হয়েও থাকে, আমাব বিশ্বাস, হয়নি, তা হলেও হয়তো আবেকজন আটান্ন বছব পর্যন্ত বাঁচতে পারে। আপনি এখনই ভেঙে পডবেন না।

হেমবাবু অনেকক্ষণ চুপ কবে বইলেন। যেন অন্ধকাবেব মধ্যে একটা জোনাকি দেখতে পেয়েছেন।

কিন্তু তারপরই হঠাৎ বলে উঠলেন, এই তো আধ ঘণ্টা, আপনাব কাছে বসে কাটিয়ে দিলাম, বেচাবীব পরমায়ু থেকে আধ ঘণ্টা চলে গেল।

আমি আর দাঁডিযে থাকতে পারছিলাম না। আমাব পা দুটোও যেন শবীবের ভাব সইতে পারছে না। ফাঁকা বেতের চেয়াবটা টেনে নিযে বসে পডলাম। বাবাব শেখানো সহবত তখন ভুলে গেছি।

হঠাৎ চোখ পড়ল হেমবাবুকে দিযে যাওযা চায়ের কাপে। ওটা পডেই আছে, ওপবে সব পডে গেছে।

কিছু বলতে পাবলাম না, এমন কি আবার এক কাপ চা দেবে কিনা তাও জিগ্যেস কবা সম্ভব ছিল না।

হেমবাবু আস্তে আস্তে বললেন, কাল সাবাবাত কেবল হিসেব কবেছি, ওব আঠাবো বছব বয়েস মানে আর কতদিন। কতগুলো দিন। কত দিন জানেন ? মাত্র চাবশো বিবাশিটা দিন। ঐটেই শেষ সীমা। অথচ আমাকে টিলু-মাব মুখেব দিকে তাকাতে হবে, তাকে হাসিখুশি রাখতে হবে। তা না হলে আরও আগে মৃত্যু ঘনিযে আসবে।

হেমবাবু উঠে দাঁড়ালেন। —কি নিযে বাঁচব জিগ্যেস কবছিলাম। ঐটুকু নিযেই বাঁচতে হবে। টিলুকে হাসিখুশি রাখার জন্যে। অন্তত এই চারশো বিবাশিটা দিন। তাব মধ্যে আজকের দিনটাও আছে।

তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বাবাব হাত ধরলেন। বাবাও তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন, আমিও।

উনি এগিয়ে গিয়ে বাবাব হাত ধবলেন। —মিঃ রায, প্লিজ, কেউ যেন না জানে। সুকুমার, তোমাকেও বলছি, আমি তো তোমাকে লক্ষই কবিনি। দেখো, একজনও যেন না

জানে। কোত্থেকে কিভাবে টিলুর কানে চলে আসবে, সেইটেই ভয়।

আমি বলে উঠলাম, না না, মেসোমশাই, কেউ জানবে না।

আমি নিজেই টের পেলাম, আমাব গলা কেঁপে গেল, কান্নার মত শোনাল।

হেমবাবু আস্তে আস্তে বললেন, এ যে কি কষ্ট, কাউকে না বলে থাকা।

ধীরে ধীরে তেমনি নুয়ে পড়া শরীর নিয়ে উনি চলে গেলেন। আমি পিছনে পিছনে গেট পর্যন্ত।

আমার দু-চোখে তখন জল।

আমি হঠাৎ মেসোমশাইয়ের সামনে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

বলে উঠলাম, আমি টিলুকে বাঁচাব, বাঁচাবই।

আবার বললাম, মেসোমশাই।

বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। তবু অনুনয়েব ভঙ্গিতে বললাম, একবার, একবার শুধু টুংরিবাবার কাছে চলুন।

হেমবাবু চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে।

বললাম, আমি সব ব্যবস্থা কবে দেব মেসোমশাই, বাজপেয়ীজীকে চিনি, আপনি কিছু ভাববেন না, টিলু সেবে উঠবে।

হেমবাবু আমাব দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইলেন। আমার জলে-ভাসা চোখেব দিকে। তাবপর ঘাড় কাত কবে সায় দিলেন।

ধীবে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে গেলেন। নিজেই ফটক খুললেন, ফটক বন্ধ কবলেন।

আর আমি তখন নিজের কাছেই নিজে দুর্বোধ্য একটা বহস্য হয়ে গেছি। যে টুংরিবাবাকে একটুও বিশ্বাস করি না, চিবকাল উপহাস কবে এসেছি, শেষ সম্বল হিসেবে এখন তাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছি।

আমার কানে বাজছে ছোটনের কথাগুলো। টুংবিবাবা একটা মির‍্যাক্‌ল। যে যা চায়, পেয়ে যায়।

আমি তো জানি, প্রকাশ করে কোনদিন বলতে না পাবলেও, ভিতরে ভিতবে আমি টিলুকে চেয়েছি। টিলুর ভালবাসা।

টুংবিবাবাব কাছে গিয়ে এখন আব তাও চাইব না। এখন আমি নিজের জন্যে কিছু চাই না, চাইব না। এখন শুধু পবমায়ু চাইব, টিলুব পবমায়ু। টিলুব জন্যে। হেমবাবু—এই ভাঙা মানুষটার জন্যে, মাসীমাব জন্যে, অবুব জন্যে। শুধু টিলুব পবমায়ু। ও বেঁচে থাকুক। ও দূবে চলে যাক, যেখানে খুশি চলে যাক, কিন্তু যেন বেঁচে থাকে, সুস্থ শরীর নিয়ে বেঁচে থাকে।

আমি ফিবে এলাম। ভয় কিংবা বাগ থেকে আমি তখন অন্য মানুষ। বাবাকে আব একটুও ভয় নেই। বাবাই তো আমাব মধ্যে অবিশ্বাস জন্মে দিয়েছেন। যুক্তি আর তর্ক দিয়ে।

বলেছেন, মির‍্যাক্‌ল বলে কিছু নেই। থাকতে পারে না। সবই দেখার ভুল, কিংবা নেচার। জ্বালামুখীব আগুনের মত। আসলে গ্যাস।

বলেছেন, হোয়েন ইট হ্যাপেন্‌স্ ওনলি ওয়ান্স ইট ইজ কলড মির‍্যাক্‌ল, ইফ ইট হ্যাপেন্‌স্ এগেন অ্যাণ্ড এগেন, ইটস কলড নেচার।

আমি এই সব অবিশ্বাসের কথা আর শুনতে চাই না। আমি প্রাণপণে বিশ্বাস করতে চাই, টুংরিবাবা মির‍্যাক্‌ল, টুংরিবাবা টিলুকে ভাল করে দেবেন।

ওরাও তো যখন ডাক্তার ক্রসবির কাছে আশা পায় না, তখন ক্রশের কাছে যায়।

বাবার ওপর একটা অন্ধ আক্রোশ, কিংবা আমি টুংরিবাবার কথা বলেছি বলে বাবা রেগে

যেতে পারেন এই ভেবে আমি নিজেই রেগে গেলাম।

বাবা চুপচাপ বসেছিলেন। যেন বাবাও উদ্ভ্রান্ত। যেন সত্যি সত্যি কষ্ট পেয়েছেন।

আমি গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু ইতস্তত করে বললাম, হেমবাবু বোধহয় টুংরিবাবার কাছে যাবেন। আমিই যে যেতে বলেছি সে-কথা বলতে পারলাম না।

আর আমার অবিশ্বাসী বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, একটা কারও কাছে তো যেতেই হবে। একটা আশা তো পেতে হবে। আমি নিজেও তো মিথ্যে মিথ্যে স্তোক দিলাম। মানুষকে একটু আশা না দিলে সে বাঁচবে কি নিয়ে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বাবা তা হলে রাগ করেননি।

আমি বলে বসলাম, চাপা রাগ নিয়ে যে-কথা বলতে এসেছিলাম, এখন আর রাগ নেই। বললাম, আমিই বলেছি ওঁকে। সকলে তো বলে টুংরিবাবা একটা মির‍্যাক্‌ল।

বাবা একটুও রাগলেন না। শুধু ধীরে ধীরে বললেন, ভালই করেছিস, আশায় আশায় এভাবে চারশো বিরাশিটা দিন তো উনি গুনতে পারবেন। সেটাই বা কম কি।

একটু থেমে বললেন, একে একে সব মির‍্যাক্‌লই তো ধরা পড়ে যাচ্ছে। একদিন সব মির‍্যাক্‌ল যখন ফুরিয়ে যাবে, সেদিনও মানুষ নতুন কোন মির‍্যাক্‌ল আবিষ্কার করবে। যার কিছুই নেই, ধরবার মত একটা কিছু তো তার চাই।

না, টুংরিবাবায় বাবার বিশ্বাস ফেরেনি। ওটারও প্রয়োজন আছে শুধু সেটুকুই মেনে নিচ্ছেন। কথাগুলো আমার একটুও ভাল লাগল না।

আমি বিশ্বাস করতে চাইছি। অন্য সকলের মত। ছোটন, ছোটনের মার মত। পরিমল আর পরিমলের বাবার মত।

আমি চাইছি টুংরিবাবা যেন সত্যি হয়।

মিনুদি আর অজয় আর অজয়ের জ্যামাইবাবু ওটাকে পিকনিক স্পট ভেবেছেন। একটা বেড়াতে যাওয়ার জায়গা। আমার তখন ভালই লেগেছিল। এখন বুঝতে পারছি কোন শূন্যতায় পৌঁছে গেলে ওঁরাও ছুটে যাবেন। পিকনিক করতে নয়, বিশ্বাস নিয়ে।

ঠিক আমি যেমন এখন বিশ্বাস করতে চাইছি।

৫

বাজপেয়ীজীকে এখন আর চেনা যায় না, একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ি, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, গেরুয়া লুঙি। কপালে লম্বা তিলক, হাতে আঁকাবাঁকা একটা লাঠি।

ছড়িদার পাণ্ডার মত পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। কিসের পথ? কোথায় পৌঁছনোর পথ। কেউ তো কোথাও পৌঁছতে চায় না। কারও কোন গন্তব্য নেই। সকলেই তো চলেছে সেই ফিরে আসার জন্যে। একটুখানি আশা নিয়ে ফিরে আসবে বলে। বাবা তো সে-কথাই বলছিলেন।

বাবার কথা আমার একটুও ভাল লাগেনি। আমার মনে হচ্ছিল একটা মির‍্যাক্‌ল ঘটে যাবে। দৈব কিছু, অলৌকিক কিছু।

মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছিল সকলেই যেন উদগ্রীব হয়ে আছে; বিশ্বাস করছে, একটা কিছু ঘটবে। শুধু পৌঁছনোর অপেক্ষা। কোন রকমে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই…

খুব বড় একটা দল জড়ো করেছেন বাজপেয়ীজী। সেজন্যেই তিন তিনটে সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়েছে। এখন প্রচুর লোকজন। এখন ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা

অচেনা সরু পথ দিয়ে হেঁটে যেতে কারও ভয় নেই। যাত্রীদের মধ্যে বেশ কিছু দেহাতি লোক, কুলিকামিনও আছে। তাদের কার কি প্রার্থনা কেউ জানে না।

হেমবাবুরা সকলেই চলেছেন। অবু, অবুর মা, টিলু—আর আমি।

ওরা ভাবছে সুন্দর একটা জায়গা দেখতে চলেছে। বেড়িয়ে আসার মত জায়গা।

হেমবাবু হাসতে হাসতে বলেছেন, দূরে দূরে তবু বেড়াতে যাওয়া হয়ে ওঠে, কাছেপিঠে এমন একটা পাহাড়।

আমি জানি ওঁর ঐ হাসির আড়ালে কি আছে।

অবু বললে, সুকুমার, সত্যি? পাহাড়টার চূড়ায় নাকি একটা বিশাল পাথর এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটুও নড়ানো যায় না?

পাথর। পাথর। কথাটা আমার একটুও ভাল লাগছিল না। আমার এখন আর ওটাকে পাথর বলতে ইচ্ছে করছে না।

আমি ধীরে ধীরে বললাম, হ্যাঁ, টুংরিবাবা একটা মিরাক্‌ল।

বাজপেয়ীজী শুনতে পেয়ে অবুকে বললেন, পাথর বোলো না, জাগ্রত দেওতা।

অবু চুপ করে গেল।

মাসীমা কপালে হাত ঠেকালেন।

টিলু বললে, এখন আমি একটু হেঁটেই যাই না। যতটা পারি।

টিলুর জন্যে একটা ডুলির ব্যবস্থা করেছেন হেমবাবু। দুটো লোক ওকে ডুলিতে বয়ে নিয়ে যাবে। ডুলি কোথায় পাবেন, ওটা বানানো হয়েছে।

হেমবাবুর দলটাই দলে ভারী। ওঁর চাপরাশি, বাগানের মালি, রান্নার লোক—সবাইকে সঙ্গে নিয়েছেন। নানান টুকিটাকি জিনিসপত্র, খাবার, একটা বিরাট বড় ফ্লাস্কে চা। হেমবাবু এমন একটা ভান করছেন যেন পিকনিকে চলেছেন। যেন এর সঙ্গে টিলুর অসুখের কোন সম্পর্ক নেই। নেহাতই একটু হৈহুল্লোড় করতে যাওয়া। তা না হলেই তো মাসীমা কিছু ভেবে বসবেন, টিলু কিছু সন্দেহ করবে।

মাসীমাকেও কিচ্ছু বলেননি হেমবাবু, অযথা তাকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ।

সিমেট্রির একপাশে রামলীলার ময়দান। দশেরার দিন রাবণ পোড়ানো হয় সেখানে। সারা শহর ভেঙে পড়ে। অন্য সময় ফাঁকা মাঠ। মাঝে মাঝে গাছপালা।

বাজপেয়ীজী বলে দিয়েছিলেন, রামলীলার ময়দানে সূর্যে সূর্যে এসে জড়ো হবেন, তারপর যাত্রা।

সকলেই জড়ো হয়েছে। সকলেই পৌঁছতে চায়।

যাত্রা শুরু হল।

আর সিমেট্রি পাশে রেখে যেতে যেতে আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ঐ পাঁচিলে বসে একটা শ্বেতশুভ্র কবরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, মার্বেলের মত সাদা বেরিয়েল টুম্ব হঠাৎ সেদিন বদলে গিয়ে হাসপাতালের সাদা পোশাক পরা টিলুর মুখ, তার রোগশয্যার সাদা চাদরের মত মুখ, আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল।

আমি সেই চিন্তাটা মন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা একসময় বনের পথ ধরলাম। সরু পায়ে চলা পথ। বছরের পর বছর, বাজপেয়ীজী তো বলেন যুগ যুগ ধরে, শত শত মানুষ এই পথ দিয়ে গেছে বলেই একটা পথ হয়ে গেছে।

একজন কম বয়েসী দেহাতি মেয়ে আর তার স্বামী হেলেদুলে চলেছে, হাসিখুশি।

কে বুঝি রসিকতা করে মেয়েটিকে জিগ্যেস করলে, এত ফুর্তি করে কোথায় চলেছ?

মেয়েটি হেসে ফেলে বললে, বেটিয়ার যাবার জায়গা তো একটাই, বাবাকা পাশ।

থাকবার জায়গা একটাই—শ্বশুরাল। মেয়ে তো থাকে শ্বশুরবাড়িতে, যায় বাবার কাছে। টুংরিবাবাও বাবা।

কথা শুনে আমরা হাসলাম।

এখন আর আমার মনে কোন কষ্ট নেই, দুঃখ নেই। ভয় উবে গেছে। যেন টুংরিবাবার কাছে পৌঁছতে পারলেই নিশ্চিন্ত। হেমবাবুর মুখ দেখেও মনে হচ্ছে, ওঁরও আর কোন ভয় নেই।

উনি বিশ্বাস করেছেন টুংরিবাবা একটা মিব্যাক্‌ল।

মাসীমা বলেছিলেন, টিলুর গিয়ে কাজ নেই, ও একেই দুর্বল।

হেমবাবু শোনেননি। বলেছেন, ওর জন্যেই তো যাওয়া। কেবল অসুখ অসুখ, ও একটু হৈহল্লা করতে পারবে, একটা নতুন জায়গা দেখবে।

আমি সামনে ছোটনকে দেখতে পেয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলাম। ছোটন, ছোটনের বাবা-মা, বাণীদি।

—সে কি রে, তুই ? ছোটন অবাক হয়ে গেল।

আমি লজ্জা পেলাম।

বললাম, হ্যাঁ, আমি। অবুদের সঙ্গে চলেছি।

তখনই শুনতে পেলাম ছোটনের মা ছোটনের দিদিকে বলছেন, মনে মনে টুংরিবাবাকে ডাক। উনি সদয় হলে সব হতে পাবে। একবাব শুধু পৌঁছে যাওযার অপেক্ষা।

কি নিশ্চিন্ত বিশ্বাস।

ছোটনের মাব সেই চাপা গলাব কথাগুলো যেন শুনতে পাচ্ছি। —মেয়েটাব কপালে সুখ নেই, কোলে তো ছেলেমেয়ে কিছু এল না

আমি বাণীদির দিকে তাকালাম। সেদিনেব সেই হাসিখুশি উচ্ছল বাণীদি আজ অন্যরকম। শুধু দেখতে পেয়ে চিনতে পেরে একটু স্মিত হাসি হাসলেন।

বেশ বুঝতে পাবলাম এখন ওঁব সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে শুধু টুংবিবাবা।

বাণীদি, ছোটন, ছোটনেব মা, সকলেই সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন। একটা অলৌকিক কিছু ঘটে যাবে টুংবিবাবা পাহাড়টায উঠতে পাবলেই।

ছোটন যখন জোব দিয়ে বলেছিল. টুংবিবাবা একটা মিব্যাকল, আসলে ও বোধহয় তখন সেটাই বিশ্বাস কবতে চাইছিল। বিশ্বাস কবাব চেষ্টা কবছিল।

আমি ছোটনকে বললাম, পবিমলবাও এসেছে।

ছোটন বললে, দেখেছি। ওবা আবও পিছনে। অজযবাও।

আমি ওব সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে ধীবে ধীবে পিছিয়ে পড়তে শুরু কবলাম। টিলুদেব পিছনে ফেলে এসেছি।

দেহাতিদের ভিড় কাটিয়ে আমি আবাব হেমবাবুদেব কাছে ফিবে এলাম।

টিলুব বোধহয় হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। হেমবাবুকে ধবে ধবে হাঁটছে।

আমি বললাম, টিলু, তুমি ডুলিতে উঠে পড়ো।

টিলু ম্লান হাসি হেসে বললে, দাঁড়িপাল্লায ঝুলতে ঝুলতে আমি যেতে পারব না।

অবুও হেসে উঠল। দাঁড়িপাল্লা ! ডুলি কোথায পাবেন এখানে, আসলে ওটা বানানো। কাঠের বড দাঁড়িপাল্লাব একটা পাল্লাব মত। দুজন লোক বাঁশের বাঁকে ঝুলিযে নিয়ে চলেছে।

হেমবাবু বললেন, থাক্। আরেকটু চলুক না। যতক্ষণ পারে।

অনেকক্ষণ ওদের পাশাপাশি হেঁটে একসময অবুকে বললাম, চল একটু পিছিয়ে যাই। পরিমলরা আছে, অজয়রা আছে।

অবু বললে, চল।

পিছিয়ে পড়তে পড়তে পরিমলদের পেয়ে গেলাম।

তারকবাবু দেখতে পেয়েই বললেন, এই যে সুকমার। তুমিও যাচ্ছ ?

আমি ঘাড় নাড়লাম।

পরিমলের দু বোনও চলেছে। ওদের খুব ফুর্তি। ছোটাছুটি করছে, দু পাশের ঝোপের ডাল ভাঙছে।

একটা কি ফুল ছিঁড়ে নিয়ে জিগ্যেস করল, এটা কি ফুল, বাবা।

—বুনো ফুল। তারকবাবু উত্তর দিলেন। নাম জানেন না।

তারকবাবু বললেন, ট্র্যান্সফার রদ হয়ে যেতেও পারে, কি বলো ? টুংবিবাবার তো একটা মাহাত্ম্য আছে, সবাই বলছে। আর মেয়ে দুটোর···।

আমি, অবু, পরিমল—তিনজন গল্প করতে করতে চলেছি।

একটু পরেই বললাম, অবু চল এগিয়ে যাই, টিলুর শরীর খারাপ লাগতে পারে। যদি দরকার হয়, আমাদের···

আসলে টিলুকে ফেলে আমার বেশিক্ষণ কাটাতে ভাল লাগছিল না। ওর পাশে পাশে যেতে পারলে যেন শান্তি।

টিলুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবতেই পারছিলাম না, ওর পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে।

এখন বরং অন্য একটা জোর পাচ্ছি। একটা কিছু মির‍্যাক্‌ল ঘটে যাবে। টুংবিবাবায় পৌঁছতে পারলেই।

ফিরে এসে দেখলাম, টিলু ডুলিতে উঠেছে।

ও খুব হাসছিল। বললে, সুকুমারদা, খুব মজা লাগছে। দোলনায় দুলতে দুলতে স্বর্গে চলেছি।

'স্বর্গে চলেছি' কথাটা শোনা মাত্র বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। হেমবাবুও মুখ ফেরালেন অন্যদিকে।

টিলু তখন হাসতে হাসতে বলছে, একটু শেয়ার করবে নাকি, চলে এসো, জায়গা আছে।

জায়গা আছে। যেন টিলুর বুকের মধ্যে আমার জন্যে জায়গা আছে।

খুব চড়া রোদ্দুর। ঘাম ঝরছে।

সকলেই প্রায় ক্লান্ত।

জঙ্গল পার হয়ে একটা পাথুরে প্রান্তরে এসে পড়তেই দেহাতিরা একসঙ্গে বিকট চিৎকারে টুংরিবাবার জয়ধ্বনি দিল। এর আগে জঙ্গলের ভিতর থেকেই যখন প্রথম দেখা গেছে তখনও দু-একবার শোনা গিয়েছিল।

বনের শেষে ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটা বড় বড় গাছ।

বাজপেয়ীজী গরমে মাথার গেরুয়া পাগড়ি খুলে ফেলেছিলেন। আবার বেঁধে নিলেন।

গেরুয়া পাগড়ি, গেরুয়া আলখাল্লা, গেরুয়া লুঙি। হাতে ছড়ি।

এখন অন্য মানুষ হয়ে গেছেন বাজপেয়ীজী। এখন লোকটাকে বিশ্বাস হচ্ছে।

সাদা কোট আর ঢিলেঢালা ফুলপ্যান্টে সেদিন লোকটাকে মনে হয়েছিল, জোচ্চোর। লোক ঠকিয়ে টাকা কামায়।

বাজপেয়ীজী আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, একটু বিশ্রাম করে নিন সবাই গাছের ছায়ায়। আবার যেতে হবে।

কিন্তু কারও যেন বিশ্রাম করার ইচ্ছেই নেই। সকলেই পৌঁছে যেতে চায়, তাড়াতাড়ি।

সকলেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পাহাড়টার দিকে। আমিও।

দূরে ছোট্ট একটা পাহাড়। টিলার মত। গাছপালা বিশেষ নেই বলেই মনে হল দূর থেকে।

আমরা তাকিয়ে ছিলাম।

হেমবাবু বললেন, চমৎকার দৃশ্য। খুব সুন্দর লাগছে, ফাঁকা মাঠের মধ্যে এই টুংরিবাবা।

পরিমলের বাবা কাছাকাছি এসে পড়েছেন, শুনে বললেন, একেবারে শিবলিঙ্গের মত।

আমারও কথাটা শুনে মনে হল শিবলিঙ্গের মত।

একটা গাছের তলায় অজয়দের দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেলাম। ওর জামাইবাবু এসেছেন।

আমাকে দেখতে পেয়ে জিগ্যেস করলেন, এই তুমি ভাই বলো তো, টুংরিবাবা সত্যি সত্যি মির‍্যাক্‌ল ঘটাতে পারে? সবাই বলছে।

হাসছিলেন।

আমিও তো বিশ্বাস করতেই চাইছিলাম। বললাম, হ্যাঁ পারে।

আমি জানি অজয়ের জামাইবাবু বিশ্বাস করেননি। উনি পিকনিক করতে এসেছেন। ছোট্ট এই পাহাড়টায় দলবল নিয়ে চড়াতেই ওঁর আনন্দ। সকলে আঘাত পাবে বলে, সকলে বিশ্বাস করছে বলে প্রতিবাদ করলেন না।

শুধু বললেন, জীবনে মির‍্যাকল তো ঘটে।

আর সঙ্গে সঙ্গে বাবার কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। বাবা হয়তো কোথাও পড়েছেন, সেটাই বলেছিলেন। হোয়েন ইট হ্যাপেনস ওনলি ওয়ান্স ইট ইজ কল্‌ড মির‍্যাক্‌ল, হোয়েন ইট হ্যাপেনস এগেন অ্যাণ্ড এগেন ইটস কল্‌ড নেচার।

মাঠ পার হয়ে এসে আমরা এবার পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছি। বাজপেয়ীজী রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

কোন সিঁড়ি বা রাস্তা নেই। সারা পাহাড়ের গায়ে বিশাল বিশাল ভাঙা পাথরের চাঙড়। এবড়োখেবড়ো পড়ে আছে।

নীচে থেকে তাকিয়ে দেখে ভেবেছিলাম ওঠাই যাবে না। কিন্তু এঁকেবেঁকে একবার এদিকের পাথর একবার ওদিকের পাথরে পা ফেলে বাজপেয়ীজীকে অনুসরণ করে সবাই ঠিক উঠে যাচ্ছিল। এমন কি টিলুর ডুলিবাহক দুজনও।

মিনুদি, ইনু আর তার জামাইবাবু বেশ জোরে জোরে কথা বলছিল। অনর্গল।

জামাইবাবু ভদ্রলোক রসিকতা করে বললেন, ইনু তো এখানে বর চাইতে এসেছে, ঠিক আমার মত বর চাইবে।

মিনুদি হেসে উঠল।

আর ফ্রকপরা বেণী দোলানো ইনু রেগে গিয়ে বললে, এই জাঁইবাবু, ভাল হচ্ছে না কিন্তু। ছুটে গিয়ে জামাইবাবুর পিঠে দুমদুম করে দুটো কিল মারল।

অজয়ের বাবা অনেক পিছন থেকে চিৎকার করলেন, এই ইনু দাপাদাপি করিস না, পড়ে যাবি।

অনেকখানি উঠে এসে টিলু বললে, এবার আমি পারব, আমি পারব। আমাকে নামিয়ে দাও।

হেমবাবু জিগ্যেস করলেন, পারবি তো ঠিক?

ডুলিওয়ালারা থেমে পড়েছিল। টিলু ধীরে ধীরে নেমে পড়ল।

মাসীমা বললেন, দ্যাখ ভাল করে, উঠতে পারবি?

টিলু হেসে বললে, আর ডুলি নয়। যদি না পারি তোমার ভাল ছেলে তো আছে, কাঁধে

করে নিয়ে যাবে। বলে হেসে উঠল।

মাসীমা একদিন ওদের সামনে বলেছিলেন, সুকুমার খুব ভাল ছেলে।

তারপর থেকে এই ঠাট্টা।

অজয়ের গলা শোনা গেল হঠাৎ। বাণীদি ! বাণীদি ! অত তাড়াতাড়ি উঠবেন না, পা ফসকে পড়ে যাবেন।

পিছনে অজয়, বেশ কিছুটা পিছনে। ওদের কোন তাড়াহুড়ো নেই।

সামনে, অনেকটা আগে বাণীদি তড়বড় করে উঠে যাচ্ছেন। ডাক শুনে ফিরে দাঁড়িয়ে অজয়কে খুঁজলেন, দেখতে পেয়ে হাসলেন। বললেন, গড়িয়ে পড়লে তুমি ধরবে।

তারপর আবার এঁকেবেঁকে এ পাথর থেকে ও পাথরে লাফ দিয়ে দিয়ে উঠতে লাগলেন। দেখে মনে হল তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে চাইছেন।

ঠিক তখনই বাজপেয়ীজী অনেক ওপর থেকে, সকলের আগে বেশ একটা উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে এক হাতে ছড়িটা তুলে চিৎকার করে বললেন, সবলোগ টুংরিবাবাকো দর্শন কিজিয়ে।

সকলে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে পড়ল।

জুতো খুলে রাখতে বললেন বাজপেয়ীজী।

যারা ওপরে উঠে গিয়েছিল তারা দু হাত জোড় করে নমস্কার করল।

আমরা তখনও দেখতে পাচ্ছি না।

যারা পিছনে ছিল তারাও ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে।

আর খানিকটা উঠেই দেখতে পেলাম।

একটা বিশাল পাথর, এবড়োখেবড়ো ভাঙা পাথর, খানিকটা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার নীচের দিকটা সিঁদুরে সিঁদুরে লাল। একটা ত্রিকোণ পতাকা উড়ছে বাঁশের কিংবা শালবল্লির ডগায়। পতাকাটা ছিঁড়ে গেছে।

সামনে একটা ছোট্ট ডোবার মত। জল রয়েছে। বাজপেয়ীজী বলেছিলেন, হ্রদ। হয়তো সত্যিই হ্রদ। পাথর ফুঁড়ে বেরিয়েছে। কিংবা বৃষ্টির জল জমা হয়। এটাই কাপালিকুণ্ড।

একে একে সকলে এগিয়ে গেল।

বাজপেয়ীজীর সঙ্গে জনাকয়েক কুলিকামিন থলে আর ঝুড়ি করে কি-সব জিনিসপত্র আনছিল।

একজন দেহাতি লোককে বাজপেয়ীজী কি বললেন, সে একপাশে দোকান খুলে বসে গেল। গাঁদা ফুল, তুলসীপাতা আর নকুলদানা বাতাসা। আর সিঁদুর।

একে একে সকলেই সেই ডোবার জলে হাত মুখ ধুয়ে ফুল বাতাসা সিঁদুর কিনে যাচ্ছে পাথরটার কাছে। সিঁদুর লেপে পুজো দিচ্ছে।

বাজপেয়ীজী মন্ত্র পড়ছিলেন।

ব্যস্, নিশ্চিন্ত। আমারও মনে হল নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি। আর কোন ভাবনা নেই।

আমরা এগিয়ে গেলাম।

যাদের পুজো হয়ে গেছে তারা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে। বসার উপায় নেই। জুতো খুলে রেখে এটুকু আসতেই কষ্ট। পাথর একেবারে দুপুর রোদে আগুন হয়ে আছে।

সবাই ঘাস বা মাটি খুঁজছিল। সেখানে তবু পা রাখা যায়।

হেমবাবু দেখলাম চাপরাশির ব্যাগ থেকে একটা মগ বের করে কুণ্ডের জল নিয়ে মাথায় ঢাললেন।

—ও কি করছ। ও কি করছ। অরু বলে উঠল, মাসীমাও।

ওরা তো জানে না। হেমবাবুর বুকের ভিতর এখন কি চলছে। কি গোপন করেছেন।

হেমবাবুকে দেখে কোনদিন ভক্তিপ্রাণ মানুষ মনে হয়নি। উনি তো আধা-সাহেব। সবাই দত্তসাহেব বলে।

কিন্তু এখন উনি কোন ত্রুটি রাখতে চান না। কারণ, ওঁর চারশো বিরাশি দিন থেকে অনেকগুলো দিন এর মধ্যেই কেটে গেছে।

প্রণাম করলেন। দেহাতিরা কেউ কেউ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছিল।

হেমবাবুর দেখাদেখি মাসীমাও মাথায় দু মগ জল ঢাললেন। এ জল পবিত্র। গঙ্গোদকের মতই।

টিলুর মাথায় কয়েক ফোঁটা ছিটিয়ে দিলেন।

আমি টিলুকে বললাম, হাত ধরো। এটুকু অন্তত হাত ধরে ওঠো।

টিলু হাত বাড়িয়ে দিল। হাসিহাসি মুখে।

হেমবাবু ফুল বাতাসা কিনলেন, মাসীমা সিঁদুর।

আমিও।

ভিড়ের জন্যে, ভিড়ের চাপে পুজো দিয়েই নেমে আসতে হল।

আমরা যেখানে জুতো খুলেছিলাম সেখানেই নেমে এলাম। একটা কাঁটাগাছের একটুখানি ছায়ায়।

একে একে সকলেই নেমে এল।

কিন্তু এসেও কেউ জুতো পরল না। সেই প্রচণ্ড গরম পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে টুংরিবাবার সিঁদুর-লাল পাথরটার দিকে তাকিয়ে রইল। বিস্ময়াবিষ্টের মত।

হেমবাবু দেখছিলেন, আমি, সকলেই। এক ধাপ নীচে পরিমলরা। বাণীদি। ওদিকে তারকবাবু, ছোটন। আরও অনেকে। দেহাতি লোকগুলোও।

অবাক চোখ মেলে সকলেই তাকিয়ে আছি।

একটা লৌকিক বিস্ময়ের দিকে। অলৌকিকের দিকে। যেন এখনই একটা কিছু মির‍্যাক্‌ল ঘটে যাবে। কিংবা সত্যিই ভিতরে ভিতরে অদৃশ্যভাবে একটা মির‍্যাক্‌ল ঘটে গেছে।

সকলের মুখেই কি তৃপ্তি। সকলেই হাসছে। দুরন্ত একটা খুশির ঝড় সকলের বুকে।

বাণীদিকে খুব উচ্ছল দেখাচ্ছে। এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফাচ্ছেন। বাণীদি ভাবছেন ওঁর জীবনেও মির‍্যাকল ঘটে যাবে।

ছোটনের মার মুখে কি শান্তি। হাসিহাসি মুখে আবার জোড় হাত করে নমস্কার করলেন এত নীচে থেকেও।

আমার মন বলছিল, টিলু ভাল হয়ে যাবে, ভাল হয়ে যাবে।

তারকবাবুকে দেখতে পেলাম, ওঁর দু মেয়ে আর পরিমল পাশেই দাঁড়িয়ে। ওরাও ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখছে।

—এই জাঁইবাবু, টুংরিবাবার কাছে কি চাইলেন, বলুন না?

ইনুর গলা। ফ্রক-পরা বেণীদোলানো মেয়েটা হাসতে হাসতে জিগ্যেস করছে।

মিনুদি ধমক দিল, ইয়ার্কি করিস না, মন্দির না হলেও এটা মন্দির।

হয়তো নিজেও কিছু কামনা জানিয়েছে মিনুদি। কিংবা অন্য সকলের ভক্তি দেখে, সকলের চোখে অবাক বিস্ময়ের দৃষ্টি দেখে ওর মনেও বিশ্বাস এসেছে।

সকলেই তাকিয়ে আছে, তাকিয়ে থাকবে।

অপেক্ষা করবে কখন সেই মির‍্যাক্‌ল ঘটে যায়।

টিলুর মুখের দিকে তাকাতে এখন আর আমার কোন অস্বস্তি নেই। ভয় নেই।

হেমবাবু হাসছেন, হেসে হেসে টিলুর সঙ্গে কথা বলছেন। টিলু বাবার কাঁধে শরীরের

ভার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হেমবাবুর মুখে এই হাসি অনেকদিন দেখিনি।

কি জানি, এখন হয়তো উনি আর দিন গুনবেন না। শুধু অপেক্ষা করবেন। মির‍্যাক্‌ল ঘটে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করবেন।

ঐ দেহাতি লোকগুলোও।

এর আগেও তো শত শত লোক এসেছে, ফিরে গেছে। তাদের মতই আমরাও তাকিয়ে থাকব। অপেক্ষায় থাকব।

হঠাৎ বাজপেয়ীজীর কণ্ঠস্বব ভেসে এল। চিৎকার কবে বলছেন, জলদি চলিযে জলদি। আউর টাইম নাহি হায়, সূরজ্ অস্ত্ হো জায়গা।

তড়বড় করে লাফাতে লাফাতে নামতে শুরু করে দিলেন বাজপেয়ীজী। আর সময় নেই, সময় ফুবিয়ে এসেছে।

এখনও অনেকখানি পথ যেতে হবে। অনির্দিষ্ট বিপদের রাস্তা ধরে বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে। অন্ধকার নেমে আসার আগেই পৌঁছে যেতে হবে।

সূর্য ঢলে পড়ছে পশ্চিমের দিকে। ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। সময় নেই, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।

বাজপেয়ীজীব কথাগুলো যেন অন্য কি বলতে চাইল। —সূরজ অস্ত্ হো জাযগা।

আউব টাইম নেহি হায়।

আব সময় নেই, সময ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

সকলেই সেই পুরনো গৃহবাসে আবার ফিরে যাবে।

মানুষ যতদিন অসহায থাকবে, সে তাকিযে থাকবে, অপেক্ষা কববে। বিশ্বাস কববে মির‍্যাক্‌ল আছে।

আমরা দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে ফিরে চলেছি। পাহাড থেকে নেমে ফাঁকা মাঠ পাব হয়ে বনজঙ্গলের পথ ধবতে হবে।

বাজপেযীজী কেবলই তাড়া দিচ্ছেন। —সূরজ অস্ত্ হো জায়গা। জলদি চলিযে. জলদি।

সন্ধে নামাব আগেই জঙ্গলের এই দীর্ঘ পথ পার হয়ে যেতে হবে।

মাঠ পার হযে এসে সকলে জড়ো হল। এবাব বাজপেযীজী পথ দেখিযে নিযে যাবেন। বাজপেয়ীজী লোক গুনছিলেন, সবাই ফিবেছে কিনা। আপন আপন পরিবাবের সকলে এসেছে কিনা দেখে নিতে বললেন।

অনেকে একটু বসে জিবিযে নিচ্ছে যাত্রা শুরু করার আগে। এই প্রচণ্ড গরমে, আব এতখানি পথ হেঁটে এসে ফিরে যাওয়া! সকলেই ক্লান্ত। কিন্তু উপায় নেই।

বাজপেয়ীজী কাকে যেন বললেন, কষ্ট কি দুসরা নাম হায় পুণ্। কষ্ট পাওয়াব অপব নাম পুণ্য।

আমি পিছনে বসে পড়েছিলাম। উঠে দাঁড়ালাম।

আর তখনই শুনলাম, মাসীমা জিগ্যেস করছেন, সত্যি বলো তো কেন এলে এখানে?

অবু আব টিলু একটু দূরে। সেই সুযোগে জিগ্যেস কবছেন।

হেমবাবু বললেন, কেন আবার, এমনি।

মাসীমা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমাব কাছে লুকিয়ো না, বলো। ডাক্তারবা কি খারাপ কিছু বলেছেন?

অসহ্য, অসহ্য।

আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। সেখান থেকে সবে এলাম।

অবু আর টিলুর কাছে।

টিলু আর হাঁটতে পারবে না। হাঁটতে চায় না।

হাসতে হাসতে বললে, না বাবা, ডুলিতেই যাব। ঐটুকু হেঁটেছি, কি করে যে হাঁটলাম...

একটু থেমে বললে, আর হাঁটতে হলে আমি মরে যাব। হেসে বললে, মরে যাওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই আমার। সঙ্গে সঙ্গে ওর কথাগুলো মনে পড়ে গেল। অনেকদিন বাঁচতে চাই, অনেকদিন, বুড়ি থুত্থুড়ি হয়ে তবেই...

অবু হাসল। কিন্তু ওর কথাগুলো মনে পড়ে গেল বলেই আমি হাসতে পারলাম না।

বাজপেয়ীজী কি যেন বললেন, কানে গেল না। সবাই উঠে দাঁড়াল। এবার বোধহয় যাত্রা শুরু।

উঠে দাঁড়িয়ে সকলেই তাই শেষবারের মত দেখে নিচ্ছে টুংরিবাবাকে। তাকিয়ে আছে।

আমিও সেদিকে তাকালাম। বুকের মধ্যে একটা রুদ্ধশ্বাস কৌতূহল। দুর্বোধ্য একটা ব্যথা।

আমি চোখ বুজে মনে মনে বললাম, টুংরিবাবা, একবার, একবার অন্তত তুমি সত্যি সত্যি মির‍্যাক্‌ল হয়ে ওঠো, মির‍্যাক্‌ল ঘটিয়ে দাও।

আরো একজন

কমলেশের কথা

এমন কিছু অভাবনীয় কথা নয়। এমন একটা খবর যে দু-দশ দিনের মধ্যেই শুনব তা জানতাম। একেবারেই কি এ-কথা ভাবিনি! কল্পনার জাল বুনিনি তাকে ঘিরে!

তবু কেমন যেন অদ্ভুত মনে হল কথাটা। কেমন যেন অচেনা-অচেনা। ভাসা-ভাসা। ঠিক যেন মনের ওপর বসল না। কিংবা মনের মতই, অস্পষ্ট, হাল্কা—মৃদু আলোর মত, ঘন অন্ধকারের মত, দূরাগত সুরের মত। হাত বাড়িয়ে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, অনুভব করা যায় না।

ছোট্ট এক টুকরো কথা, তুচ্ছ একটি ঘটনা এই ঘটনাবহুল বিশ্বের কাছে।

—টুনুমামা!

ছোট্ট মেয়েটা বেণী দোলাতে দোলাতে ছুটে এল। শিউলি ফোটা শাখার মত এক মুখ হাসি নিয়ে। খুশি-মাখানো দুষ্টুমির হাসি হাসল সে, মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল, ঠোঁট টিপে হাসল।

বললে, মেয়ে।

হাসল আবার।

আমি বিস্ময়ের চোখে তাকালাম তার মুখের দিকে, তার টোল-খাওয়া গালের দিকে, তার চোখের ধূর্ত হাসির দিকে।

সে আবার হাসল। বললে, তোমার মেয়ে হয়েছে।

কথাটা শুনলাম। স্পষ্ট সহজ কথা। তবু কেমন যেন আবছা, অস্পষ্ট। যেন মনের ওপর স্থির হয়ে থামল না। কেমন এক ভাসা-ভাসা অনুভব, কিংবা অনুভব নয়। কথাটার কোনই গুরুত্ব নেই যেন। অচেনা, অবোধ্য একটুকরো কথা।

নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য লাগছে নাকি! না, লজ্জা? হ্যাঁ, কেমন একটা লজ্জার মেঘ নেমে আসছে মনের চারপাশে, সারা দেহে। জানতাম, তবু যেন অজানা, অভাবনীয়, নতুন কিছু।

বেণীর ডগায় ফিতের ফুল বানাতে বানাতে মেয়েটা হাসছে। হাসতে হাসতে চোখ পাকাল, তর্জনী তুলল, বললে, টুনুমামা! এবার কেমন জব্দ। মেয়ে হয়েছে দেখবে মজা! মনটা খুশিতে ভরে উঠছে কেন? এতক্ষণে মনের ওপর চেপে বসেছে একটা নতুন খবর, একটা ঘটনা। এই ছোট্ট ঘটনাবিহীন পৃথিবীর সমুদ্রে একটা প্রচণ্ড ঢেউ যেন। এর চেয়ে গভীর কোন কথা নেই, এর চেয়ে উত্তাল কোন তরঙ্গ নেই।

আমি নিজেও কি খুশিতে হাসছি? ঐ ফাজিল মেয়েটার মত? দাদুর মত? দন্তহীন দু-পাটি মাড়ির বিচিত্র আনন্দের মত?

দাদু হাসলেন।—বুঝবে এবার ঠ্যালা, নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে।

দাদু হাসছেন, বাবা হাসছে, মা হাসছে। সকলেই খুশি হয়েছে।

আমি? কি আশ্চর্য, এমন অসীম লজ্জা কোত্থেকে এল, এল কেন! কেন ওদের মত খুশিতে হাসতে পারছি না, কেন এই অফুরন্ত আনন্দকে চেপে রাখতে চাইছি!

আমি কি জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছি? আমি কি অতীতকে গোপন রাখতে চাইছি? কিন্তু সেদিকে কেউ তো তাকিয়ে নেই। সকলেই তাকিয়ে আছে

ভবিষ্যতের দিকে। তবে কেন এই লজ্জা ?

—বাবা, পাঁজিটা দেখুন না একবার। মা বলল দাদুকে উদ্দেশ করে। কিন্তু আমার কানে বোধ হয় সম্পূর্ণ কথাটা গেল না। শুধু একটা কথাই ঠেকে রইল। 'বাবা ?'

আদিম মানুষের আড়ষ্ট একটা অর্থহীন শব্দ হয়তো। অথচ···

'বাবা।' কৌতুকের মত রঙ্গময়।

মা পাঁজিটা এনে দিল দাদুকে। দাদু বোধ হয় ঠিকুজি করতে বসবে। কি গণ, কোন্ লগ্ন।

আমি সরে এলাম ওদের সন্ধানী তীক্ষ্ণ চোখের সামনে থেকে। জামা খুলছি, জুতো খুলছি, মনটা নীরবে কেমন যেন গুনগুন করে উঠছে। আনন্দ, আনন্দ।

কিন্তু, কই, আর তো কেউ কিছু বলছে না। আমার কি আর কিছু জানবার নেই, আমাকে জানাবার নেই কিছু ?

কেউ গিয়েছিল হাসপাতালে ? দেখে এসেছে ? সুনন্দা ভাল আছে তো। সুনন্দা, সুনন্দা। কি বলব তোমাকে, কি বলে ধন্যবাদ দেব।

ভগবান। সুনন্দা যেন ভাল থাকে, সুনন্দা যেন নিরাপদে ফিরে আসে। অমি কি ভগবান মানি ? ভগবানে বিশ্বাস করি ? কবে থেকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি ?

কি আশ্চর্য। এরা সকলে এত নিশ্চিন্তে বসে রয়েছে কি করে ? দুর্ভাবনার কি কিছুই নেই ? সুনন্দা ভাল আছে কিনা, ফুটফুটে ছোট্ট একটুকরো বাচ্চা মেয়েটা কেমন হয়েছে দেখতে ? সুন্দর হয়েছে? নিখুঁত ?

কত বিকলাঙ্গ শিশুই তো জন্মায় প্রতিদিন। মেয়েটার শরীরের কোথাও কোন খুঁত নেই তো। যদি থাকে ?

ছিঃ ছিঃ, এসব কথা কেন ভাবছি আমি। সুনন্দা বুঝি একদিন সিঁড়িতে পড়ে গিয়েছিল। না, ভয়ের কিছু নেই—ডাক্তার সান্ত্বনা দিয়েছিল। অমন তো অনেকেই পড়ে যায়।

ওরা কেউ কি এর মধ্যে গিয়ে দেখে এসেছে ? বলছে না কেন। যেন ওদের জানাটাই সব, আমার কোন আগ্রহ নেই, ঔৎসুক্য নেই।

একটা ঠিকুজি বানাতে কি এতক্ষণ লাগে। দাদু কিছু বলছে না কেন ? কি দেখেছেন আকজোঁক কষে ? কোন আশঙ্কা, কোন···

আমি কবে থেকে ঐ সব বুজরুকিতে বিশ্বাস কবতে শুরু করলাম ? জ্যোতিষও শাস্ত্র ? কে জানে। এই রহস্যময় পৃথিবীর কতটুকুই বা জেনেছি। কিছুই যদি নেই, তবে হাজার হাজার বছর ধরে টিকে রইল কি করে।

ভূত ভগবান—দুই টিকে আছে। রাক্ষস, রাজকন্যে টিকে আছে। ধারণা টিকে থাকলেই কি তা সত্য হতে বাধ্য ? কে জানে। সত্যি মিথ্যে জানি না, তবু জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, কি বলে দাদুর গণনা।

কুৎসিত দেখতে হবে না তো ? হলেই বা। কুৎসিত হলেও সে আমার—হ্যাঁ, আমার মেয়ে।

—টুনুমামা।

ফাজিল মেয়েটা আবার এসে দাঁড়াল।

বললাম, কি ?

—দিদিমা বললে, একবার হাসপাতালে গিয়ে দেখে এস, খবর নিয়ে এস।

আঃ, এই কথাটাই এতক্ষণ শুনতে চাইছিলাম। ওরা কি বোঝে না ? মা বুঝতে পারে না ?

কিন্তু এ কি বললাম ? বলে ফেললাম। বিরক্তির স্বরেই বললাম, হ্যাঁ, এখন আবার যাই

হাসপাতালে, সারাদিন খেটেখুটে এসে…
মা এসে দাঁড়াল।—যা একবার।
বেঁচে গেলাম। কি বোকা আমি, আর কি লাজুক। যদি বলে বসত : তবে থাক্, যেতে হবে না এখন!
সারা রাস্তা মনের মধ্যে কেমন এক রুদ্ধ উল্লাস, অথচ বিচিত্র এক ভয়-ভয় ভাবনা। অস্পষ্ট আতঙ্কের মত।
হাসপাতালের সামনে এসে দাঁড়ালাম।
রিক্সায় উঠে বসেছেন ভদ্রমহিলা। কোলে ছোট্ট একটি শিশু। কি সুন্দর দেখতে হয়েছে, কি সুন্দর চোখ। ভদ্রলোক পাশে বসলেন। স্বামী নিশ্চয়। সুখী, কত সুখী মনে হচ্ছে ওদের। আরও একজনকে নিয়ে ওরা ফিরে চলেছে।
রিক্সা চলে গেল ঠুনঠুন ঠুনঠুন।
ওপরে উঠে যাব? না। এখানেই খবর দিতে হবে।
এত সময় লাগে দোতলার বেডে খবর পাঠাতে?
দোতলার কোণটিতে এসে দাঁড়ালাম। আরও অনেকে এসেছে। আমার মতই। উৎকণ্ঠা কারও মুখেচোখে, কেউ বা খুশি খুশি।
ডাক এল। এগিয়ে গেলাম। সুনন্দা হাসছে। এত রোগা হয়ে গেছে সুনন্দা? রোগপাণ্ডুর মুখ যেন। তবু উজ্জ্বল।
সুনন্দা হাসল।
বললাম, কই?
সুনন্দা আবার হাসল। কপট অভিমানে বলল, ও! মেয়েকে দেখতে এসেছো, আমাকে নয়!
বললাম, তোমাকেও!
ও হাসল।—ঘুমোচ্ছে যে। গাটা একটু গরম।
—দেখব না?
বড়ো দুর্বল দেখাচ্ছে সুনন্দাকে। রক্তহীন।
ওর বেডের পাশে এসে দাঁড়ালাম। আর ওপাশে বেবি-কটের সারি।
—এই যে। সুনন্দা দেখিয়ে দিল।
ওমা, এই নাকি! কি সুন্দর, কি সুন্দর। পিটপিট করে তাকাচ্ছে কেমন। মাথায় হাল্কা চুল। কিন্তু গায়ে এত লোম কেন?
থাকবে না, ঝরে যাবে, উঠে যাবে। এমনিই হয়। সবারই।
উঠে যাবে? সকলেরই কি উঠে যায়?
বাঃ, কি সুন্দর লাগছে। ছোট ছোট চোখ দুটো চেয়ে আছে, তাকাচ্ছে আমার দিকে। কি আশ্চর্য, ঠিক যেন চিনতে পেরেছে আমাকে। চেনা মানুষের দিকে এমনিভাবেই তো তাকাই আমরা।
কি নরম। তুলতুল করছে সারা শরীর। এক ফোঁটা জীবন।
খুব ফর্সা হয়েছে। ফর্সা। দুধের মত সাদা। ননীর মত, ননীর পুতুলের মত। ননীর কি পুতুল হয়?
হাতে কি ওটা? একটা চাকতি। নম্বর। জেলের কয়েদির মত নম্বর মেরে দিয়েছে। আচ্ছা, চাকতিটা কি সব সময়েই হাতে বাঁধা থাকে। খুলে যায় না, খুলে নেয় না?
সুনন্দা হাসল।—স্নান করাতে নিয়ে যায় যখন, খুলে যায় তো।
বললাম, সবগুলোই তো এক রকম, চিনতে পার।

—ওমা একরকম কই ? হাসল সুনন্দা ।—ওটার দেখছ না, টাক মাথা চুল নেই । আর ওপাশেরটা দেখো কেমন লালচে লালচে, ফর্সা হবে না । খুকু কালো হবে ?

কি বলব । কি জানি আমি এ-সবের ।

সুনন্দা আবার হাসল, এবারের হাসিটা একটু ম্লান আতঙ্কের ।

প্রশ্ন করলে, মা খুব রেগে গেছেন, না ?

—রেগে গেছেন ? কেন ? প্রশ্নটা কেমন যেন দুর্বোধ্য ঠেকল ।

সুনন্দা ঠোঁট টিপে উত্তর দিলে, মেয়ে হয়েছে বলে ? রাগেননি ?

সশব্দে হেসে উঠলাম । কি ছেলেমানুষি প্রশ্ন । বললাম, কেন, মা তো এসেছিল দেখতে, দেখে কি মনে হল তোমার ?

—বাইরে থেকে কি বোঝা যায় । দীর্ঘশ্বাস ফেললে সুনন্দা ।

আমি সান্ত্বনা দিলাম । নির্ভয় করলাম ।

সুনন্দা এবার হাসল ।—মেয়েকে দেখতে এসেছ, এনেছ কি ? সোনার কিছু একটা দিয়ে মুখ দেখতে হয় জান না !

—কি দেব ? কিছুই তো আনিনি । এই আংটিটা, দেব ?

সুনন্দা খিলখিল করে হেসে উঠল এবার ।—ওটা তো ওর বালা হবে । থাক, তোলা থাক । পরে দেবে ।

দেবার শেষ নয় এখানে, এখানেই শুরু । যাবার আগে ঝি, জমাদার, দারোয়ান সকলকে দিতে হবে । নার্স । নার্সদেরও কি দিতে হয় ? কি পরিচ্ছন্ন, সুন্দর চেহারা ওদের, কেমন খুটখুট খুটখুট করে হেঁটে বেড়াচ্ছে । হাসপাতালের এই লম্বা হলখানা কত শান্ত, কত সুন্দর । সারি সারি বেড, সারি সারি বেবি কট । ঘরের দেয়ালগুলো সাদা ধবধবে, বিছানার চাদরগুলো সাদা ধবধবে, নার্সদের পোশাক ।

কোণের টেবিলে বসে দাঁতে একটা পেন্সিল কামড়ে নার্সটা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে । তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে ।

চোখোচোখি হল ।

চোখ ফিরিয়ে নিল সে । ধরা পড়ে গেছে যেন ।

এত সুন্দর চেহারা, একটা উষ্ণবক্ষ সারসের মত আঁট-সাঁট ।

ডাকব ওকে ? অকারণ দুটো কথা বলব ? আজেবাজে যে-কোন প্রশ্ন তো করা যায় । সুনন্দা কবে যেতে পারবে, কিংবা ভয়ের কিছু আছে কিনা ।

সে-কথার উত্তর তো সুনন্দাও দিতে পারে । ও যদি কিছু ভাবে, যদি বলে, নার্সকে কেন জিগ্যেস করছ, আমি তো জানি ।

নার্স । নার্স বলে কি ডাকা যায় ? কি বলে ডাকে তাহলে নার্সদের ? সিস্টার ? কেমন অনভ্যস্ত ঠেকছে । এ কেমন নাম, যা কাছে আসতে দেয় না মানুষকে, অন্তরঙ্গ হতে দেয় না । কি দরকার, দিদি বলে ডাকলেও তো হয় । কিন্তু বলতে গিয়ে হেসে ফেলব না তো ।

নার্সটা আবার তাকিয়ে আছে । উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে আসছে ।

—মেয়েকে দেখলেন ? কাছে এসে জিগ্যেস করল । মরাল ঘাড় ঈষৎ উৎফুল্ল হল, বললে, বেশ হেলদি হয়েছে, ন পাউন্ড ।

পাউন্ড ? পাউন্ড কি একটা পরিচয় । চাকতির নম্বরের মত এদের কাছে শিশুর পরিচয় অন্য সূত্রে বাঁধা । হাল্কা চুল নয়, টানাটানা চোখ নয়, মিষ্টি হাসি নয়—আঠারো নম্বর, ন পাউন্ড, পেনিসিলিন কেস ।

সুনন্দার বেডের মাথায় টাঙানো আছে 'পেনিসিলিন কেস', বোধহয় থাকে, বোধহয় থাকে না ।

—কি মিষ্টি হাসছে দেখুন মেয়ে আপনার। বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল নার্স।—কিন্তু ভারী দুষ্টু, সারাদিন মাকে ঘুমোতে দেয়নি—ট্যাঁ ট্যাঁ করেছে।

—কাঁদে ? খুব কাঁদে বুঝি ? প্রশ্ন করলাম।

সুনন্দা সজোরে ঘাড় নাড়ল।—মোটেই না, একটু আধটু সবাই কাঁদে।

—নিন, কোলে নিন মেয়েকে। এক মুখ হাসি নিয়ে আমার নিঃশ্বাসের কাছে এসে দাঁড়াল।

এক তাল নরম ছানার মত, টলটল করছে। ভয় হচ্ছে, যেন গড়িয়ে পড়ে যাবে, একটু অসতর্ক হলেই হয়তো আঘাত পাবে। না কোলে দিল না, শুধু আমার বুকের কাছে তাকে একবার ছুঁইয়ে আবার শুইয়ে রাখল।

ওদিক থেকে কেউ বুঝি ডাকল ওকে। চলে গেল।

বললাম, নার্সটা কি করে চিনল, আমার মেয়ে জানল কি করে !

সুনন্দা হাসল।—পারে, ঐ তো করছে সাবা জীবন। বেশ ভালমানুষ, সারাক্ষণ বসে বসে গল্প করে আমার সঙ্গে।

—কি নাম ওর ?

—ছন্দা।

ছন্দা। সত্যি, শরীরে ছন্দ আছে। চলায় বলায়। ছন্দা। বেশ মিষ্টি নাম। গুনগুন করতে ইচ্ছে করে। হ্যাঁ, ছন্দাই নাম রাখব মেয়ের।

সারাপথ গুনগুন করল মনের মধ্যে। সারাটা দিন বাববার একটা মুখ ভেসে উঠল। চোখের সামনে। ছোট্ট হাসিখুশি মুখ, দুটো পিটপিটে চোখ।

কার মত দেখতে হবে ? সুনন্দার মত ? কে জানে।

তাড়াতাড়ি আপিস থেকে ফিরে এলাম। হাসপাতালে যেতে হবে, মেটার্নিটি ওয়ার্ডে। মেটার্নিটি ওয়ার্ড। কি সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে মেঝে, তকতকে বিছানা। সারি সারি বেড, বেবি কট।

ন পাউন্ড ওজনের বাচ্চাটা কি এখন ঘুমোচ্ছে ? ভাল করে দেখতে হবে আজ, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। গতকাল ভাল করে দেখা হয়নি। কেমন যেন লজ্জা করছিল। সুনন্দাব কাছে লজ্জা, নার্সটার কাছে।

নার্স নয়। ছন্দা। ছন্দা রায়। বেশ মিষ্টি নাম, তাব মিষ্টি ব্যবহারের মতই।

সুনন্দা কি আজকেও ইনজেকশন নিয়েছে, এখনও তার বেডের মাথায় সেই বোর্ড ঝুলছে ? পেনিসিলিন কেস।

কেন, পেনিসিলিন দিচ্ছে কেন এখনও, কে জানে। কোন ভয়ের কিছু আছে কি ?

ডাক্তারকে জিগ্যেস করতে হবে। কোথায় বসে ডাক্তার ? সুনন্দা হয়তো বলতে পারবে। কিংবা ছন্দা। ডাক্তারকে হয়তো জিগ্যেস করার প্রয়োজন হবে না, ছন্দা নিজেই বলতে পারবে।

ঐ তো সে। আমি নীচে, লোহার ফটকের সামনে। ছন্দা ওপরে, বারান্দায়। উদাস চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল ও। হঠাৎ নীচের দিকে তাকাল, চোখোচোখি হল।

হাসল ও। পিছনে তাকাল, হল ঘরটার দিকে। বোধ হয় সুনন্দার দিকে। কি বলল তাকে কে জানে। হয়তো কোন রসিকতা করল।

সুনন্দা কি বুঝতে পারবে, আজ বাড়ি ফিরিনি, সটান এখানেই চলে এসেছি আপিস থেকে ? বুঝতে পেরে খুশি হবে ?—নাকি অভিমান দেখিয়ে বলবে, খুকুর টানেই এত তাড়াতাড়ি এসেছি।

কই, খুকুর জন্যে সত্যিকারের কোন টান তো বুকের মধ্যে টের পাচ্ছি না। শুধু একটু আগ্রহ, একটু ঔৎসুক্য। আর কিছু নয়।

কিন্তু সুনন্দার টানে তো আসিনি এত তাড়াতাড়ি। তবে ? ওই চটপটে নার্সটার টানে ! তাই কি ?

আজেবাজে কি ভাবছি সব। নিরর্থক। ওই তো সুনন্দাকে দেখতে পাচ্ছি, বিছানার ওপরে বসেছে পা গুটিয়ে। তাকিয়েছিল দরজার দিকে, তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল।

হ্যাঁ, ছন্দা নিশ্চয় ওকে জানিয়ে দিয়েছে, আমি আসছি।

কিন্তু ছন্দা কই ?

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম সুনন্দার বেডের কাছে। সুনন্দা টুলটা দেখিয়ে দিল। বসলাম।

সুনন্দাকে আজ বেশ ছিমছাম লাগছে। সেই রক্তহীন অবসন্নতা নেই আর।

ওর বেডের মাথার দিকে তাকালাম। না, সেই বোর্ডটা সরে গেছে।

এপাশ-ওপাশ দেখলাম। ওপাশের বেডের মেয়েটির মুখখানা যেন কচি ডাবের মত। এত অল্প বয়সে মা হয়েছে ? অল্প বয়েস হয়তো নয়, ওর চেহারাটাই বোধ হয় সুন্দর। আঠারো বসন্তের পাপড়ি ওর দেহে, মন যেন পঞ্চদশীর কুঁড়িতে স্থির হয়ে আছে। দেখে তাই মনে হচ্ছে, যেন পনের বছর বয়স। এ বয়সে বিয়েই হয় না আজকাল, ও মা হয়েছে।

—কি যে বলো। হাসল সুনন্দা। বললে, ও মেয়েটা আমাদের সঙ্গে পড়ত। পনের বছর বয়স হয় কখনও। আচ্ছা, ওঁর কত বয়েস বল তো ?

দূরের বেডে এক ভদ্রমহিলাকে দেখাল ও। হেসে বললে, চল্লিশ—এই প্রথম বাচ্চা, আমাদের মতই। ও-ঘরে সবাই প্রথম।

বলে হাসল।

আমি মাথা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সারা হলটা তন্নতন্ন করে দেখলাম, যেন ঘরের দেয়াল দেখছি, কড়ি বরগা দেখছি, বাচ্চাগুলোকে দেখছি। কি আশ্চর্য, এত অভিনয় করার কি দরকার। আমি তো খুঁজছি ছন্দাকে, ছন্দা রায়কে। বারান্দা থেকে এক ফালি মিষ্টি হাসির অভিবাদন জানিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল সে। হয়তো কাছেই কোথাও আছে, পাশের ঘরে। কাজ সেরেই আসবে আবার।

আসছে, হাসছে ছন্দা, দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে। ওর হাসিটা বড়ো সুন্দর। মনের ওপর দাগ কেটে যায়। খুটখুট খুটখুট করে বেশ ছন্দে ছন্দে হাঁটে। কাঁধ দুটো কি সুন্দর নিটোল, হাত দুখানা কি সুডোল আর ফর্সা। আফোটা পদ্মের মত। ফোটা ফুলের শিথিলতা নেই শরীরের ভাঁজে।

কি বলে ডাকব ওকে। কি নামে। নার্স ? সিস্টার বলব ? না, মিস রায় ?

—নমস্কার।

হাসিতে ভাঙা ভঙ্গিতে কাছে এসে দাঁড়াল ছন্দা। দুটি হাত বুকের কাছে জড়ো করে বললে, নমস্কার। তারপর প্রশ্ন করলে, মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল ?

হাসলাম।

ছন্দা বললে, খুব সুন্দর হয়েছে কিন্তু, আমাদের সবারই মায়া পড়ে গেছে ওর ওপর।

সুনন্দার দিকে তাকিয়ে বললে, ওকে আপনারা রেখে যান দিদি।

তিনজনই হেসে উঠলাম। সুনন্দা হাসি থামিয়ে বললে, হবে, হবে, আপনারও হবে। বিয়েও হবে, মাও হবেন।

ছন্দা লজ্জা পেল। পাবে না কেন, বিয়ে যে ওর হয়নি। তাই বোধ হয় লজ্জা পেল।

তাই বোধহয় কথা পাল্টাবার জন্যই ছন্দা বললে, আবার 'আপনি' বলছেন। আমি

আপনার ছোট বোন না ?

ছোট বোন ! সুনন্দা তা হলে এত অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে, এত ঘনিষ্ঠ ! অথচ, আমার কাছে তা প্রকাশ করতে ওর দ্বিধা । তবে যে নার্সদের সম্পর্কে কত লোক কত কি বলে । সত্যি নয় !

কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম রসিকতা করে, মেয়েটা কেঁদে উঠল ।

সুনন্দা তাকে কোলে তুলে নিল । সুনন্দার কোল থেকে ছন্দা ।

তাকিয়ে দেখলাম । অস্পষ্ট নাক মুখ চোখ । সামনে এনে ধরল ছন্দা ।

ছোট্ট একটি শিশুর মধ্যে যে এত বিস্ময় আছে কে জানত ।

পিটপিট করে আগের মতই তাকাল সে । চোখের তারাটা ঘুরিয়ে আড় চোখে তাকিয়ে রইল । তারপর আপনা থেকেই হেসে উঠল । ছোট্ট একটা টোল পড়ল তার গালে ।

কি আশ্চর্য । এইটুকু এক ফোঁটা একটা মেয়ে, তার চোখের দৃষ্টিতে এত সম্মোহনী আসে কোত্থেকে । হাসে কি কারণে । সত্যি, এই দুটো দিন মাত্র বয়েস, সে হাসে কেন ? হাসি কি আনন্দের অভিব্যক্তি নয় ? শরীরের কিংবা শিরা-উপশিরার কোন যান্ত্রিক ফল ? নাকি, আমি বুঝছি না, আমরা বুঝি না এমন কোন সূক্ষ্ম অনুভূতি, কোন আবেগ এই এক ফোঁটা মেয়ের মনের মধ্যেও খেলা করে ! খিদে পেলে কাঁদে, কিন্তু হাসে কেন ?

ন পাউন্ড ওজনের বাচ্চাটাকে আমার কোলে তুলে দিল ছন্দা । বললে, চলে যাবার আগে ঠিকানাটা দিয়ে যাবেন দিদি । গিয়ে খুকুকে দেখে আসব একদিন, বড় হলে ।

সুনন্দা বললে, তুমি যাবে ?

—যাব না ? নিশ্চয় যাব । এই একফোঁটা বাচ্চা ঘেঁটে ঘেঁটে জীবন গেল, আমার কিন্তু একটু বড় হলেই তাদের বেশি ভাল লাগে ।

সুনন্দা হাসল । বললে, বেশ, দেখব কেমন যাও ।

ছন্দা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল । কে বুঝি ডাকছে । মেট্রন খুটখুট করে দ্রুত পায়ে চলে গেল ।

বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম । নির্বাক ! যেন একটা সুরের রেশ রেখে গেছে, একটা স্নিগ্ধ আমেজ ।

সুনন্দা এক সময় বলল, বেশ মেয়েটা, না ? অন্য নার্সদের মতো নয় ।

—তাই নাকি ?

সুনন্দা হেসে বললে, তা ঠিক নয়, ভালও আছে, মন্দও আছে, কিন্তু ওর মতো একজনও নেই ।

আমি তখন বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছি । শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে তার কথাই ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলাম, নিজেও টের পাইনি ।

চমক ভাঙল একটা গুঞ্জন শুনে ।

সময় হয়ে গেছে । দেখা সাক্ষাতের সময় শেষ হয়ে গেছে । এবার যেতে হবে ।

আসবার সময় সুনন্দা বললে, কালই বোধহয় যেতে দেবে, না হলে পরশু ।

সুনন্দা ফিরে এসেছে । তার সঙ্গে এসেছে আরও একজন । সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়িটা যেন রাতারাতি পাল্টে গেছে ।

অভাব অনটন, দুর্দশা আর দুশ্চিন্তায় যে বাড়িটা সদাসর্বদাই থমথম করত—এই নতুন মানুষটা এসে যেন তার সব গ্লানি মুহূর্তে মুছে দিয়ে গেল । সকলের মুখেই খুশি-খুশি ভাব । ছোট্ট ঐ একফোঁটা মেয়েটার কোথায় কখন এতটুকু অসুবিধে হতে পারে তার জন্যে সকলেই যেন তটস্থ ।

ঠাকুমা মেয়ে হয়েছে শুনে প্রথম দিন মুখ বেঁকিয়েছিলেন। তিনিও মালা জপতে জপতে এসে মাঝে মাঝে ছানি পড়া চোখে ঠায় তাকিয়ে থাকেন তার মুখের দিকে। তার হাসি দেখে হাসেন।

আর কান্না শুনে দাদু ছুটে আসেন, বাবা ছুটে আসে, মা ছুটে আসে।

সুনন্দা দেখে আর ফিসফিস করে বলে, আদরে আদরে মেয়েটার পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে, দেখ।

যে গতকাল মাত্র এসেছে তার পরকালের চিন্তা আমার নয়। তাই অভিযোগ করি, মুস্কিল দেখ, মেয়ে তো আমার, অথচ কেমন সারাক্ষণ আগলে আগলে রেখেছে, একবার যে কাছে যাব উপায় নেই।

সত্যিই তাই। কাছে যাবার উপায় নেই এমন নয়। কিন্তু যাকে আর সকলেই আদর যত্ন করছে, কোলে নিচ্ছে, চুমু খাচ্ছে, তার কাছে গিয়ে একবার যদি দাঁড়াই, তাব নরম গাল দুটো যদি একবার চেপে ধরি,অমনি সেই বেণী দোলানো মেয়েটা বলে বসবে, টুনুমামা! মেয়েকে খুব আদর করা হচ্ছে, না? অথচ আমাদের তো কই কোনওদিন একটু হেসে কথা বল না।

শুনে গা জ্বলে যায় এক এক সময়। নীতু যখন ছোট ছিল, আদর করিনি তাকে? ভালবাসিনি? না, এখন সে ভালবাসা কমে গেছে? তবু এরা আমাকে কিনা স্বার্থপর ভাবছে, ভাবছে নিজের মেয়েকেই শুধু আদর করছি।

অবশ্য এক এক সময় বেশ বুঝতে পারি এসব ওদের অভিযোগ নয়। নিছক ঠাট্টাবিদ্রূপ, নির্দোষ ব্যঙ্গ। তাই শুনি আর হাসি।

মা বলে, হ্যাঁ রে, তোর চোখ লাল হয়েছে কেন? শরীর খারাপ?

বলি সারা রাত ঘুমোতে দেয় না মেয়েটা, কেবল ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদে।

মা হাসে।—এমনি করেই তোদের মানুষ করেছি, এবার বুঝতে শেখ।

এমনি করেই বুঝি সকলে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে। এমনি দুঃখকষ্ট, উদ্বেগ চিন্তা নিয়ে। অথচ প্রতিদানে কি পায়? না, সন্তানস্নেহের এক আনাও বোধ হয় পায় না।

স্নেহ নিম্নগামী, শাস্ত্রের বচন। নদীর স্রোতের মত তা শুধু নীচের দিকেই ছুটে চলে। কিন্তু ফিরে তাকায় না কেন মাঝে মাঝে!

ফিরে তাকাবার কি উপায় থাকে তখন আর। সাবাক্ষণ কাঁদছে আর কাঁদছে বাচ্চাটা। গা গরম, জ্বর হয়েছে।

—থার্মোমিটারটা দাও না একবার। বললাম সুনন্দাকে।

সুনন্দা জবাব দিল, আছে নাকি থার্মোমিটার, ভেঙে গিয়েছে না সেবার?

সুতরাং ছোট দোকানে, ছোট ডাক্তারের কাছে, ছোট হাসপাতালে। না, এই নতুন মানুষটা এত ছোট হলে কি হবে, যেমন আকাশ-প্রমাণ আনন্দ এনেছে, তেমনি এনেছে পাহাড়-প্রমাণ দুশ্চিন্তা।

সকলেই আদর করছে, কোলে নিচ্ছে, অথচ এটুকু কেউ লক্ষ করেনি কেন? একটা অস্পষ্ট অভিযোগ যেন মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেল।

কিন্তু থার্মোমিটার কিনে এনে জ্বর দেখতে যেতেই মা হেসে বলল, ও কি হবে?

বললাম, জ্বর হয়েছে ওর।

মা হাসল।—সে দেখেছি। ও আপনি সেরে যাবে। বলে তার ক্ষুদে ক্ষুদে বুকে কপালে হাত দিয়ে দেখল মা।

আর নীতু পাকা মেয়ের মত বললে, বাবা, বাবা, মেয়ে যেন আর হয় না কারও।

হবে না কেন, সকলেরই হয়, আবার সকলেই তার অসুখেবিসুখে যত্ন নেয়, ডাক্তার ডাকে, ওষুধ দেয়।

নাকি সত্যিই আমি একটু বাড়াবাড়ি করছি ? এ-সব করবার কথা নয় ? তা হবে হয়তো। জ্বর হয়, জ্বর সেরে যায় আপনা থেকেই।

আপনা থেকে না সারলে এ-ও-তা মিশিয়ে টোটকা ওষুধের দু-ফোঁটা ঝিনুকে করে মা তার জিভে ঢেলে দেয়। চুক চুক করে সেটুকু শুষে নেয় মেয়েটা।

না, রাত্তিরে কাঁদে না মেয়েটা। বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে তার গায়ে গলায় হাত ছুঁইয়ে জ্বর দেখি। ঘুম আসে না, আসতে চায় না।

দুশ্চিন্তায় ? ভয়ে ? না, কোন দুশ্চিন্তা নয়, ভয় নয়। জানি, এ জ্বর আপনা থেকেই সেরে যাবে। তবু মনে মনে একটু উদ্বেগ পুষে রাখতে যেন ভাল লাগে। না ঘুমিয়ে শুধু ওর জন্যে জেগে থাকাতেও কি আনন্দ, কেন ? অনেক পরিশ্রমের রোজগার থেকে ভিখিরিকে হঠাৎ কিছু দান করে ফেলে মনটা যেমন খুশিতে ভরে ওঠে, ঠিক তেমনি। এই জেগে বসে থাকা—আরেকজনের জন্যে না ঘুমিয়ে বসে থাকাও বুঝি এক ধরনের ত্যাগ। ত্যাগের মধ্যে আনন্দ আছে বৈকি।

দুটো দিন ভুগে মেয়েটা শেষ পর্যন্ত চাঙ্গা হয়ে উঠল। আবার ছটফট করতে শুরু করল, ক্ষুদে ক্ষুদে হাত পা ছুঁড়ে আনন্দ জানাল, হাসল !

আঃ, নিশ্চিন্ত !

এ দু-দিন উদ্বেগ নিয়ে বাড়ি ফিরতাম, এখন আগ্রহ আর আবেগ নিয়ে। আপিসের কাজের মধ্যে হঠাৎ কখনও কখনও হয়তো মনে পড়ে যায়। কিন্তু তখনই কাজের চাপে আবার ভুলে যেতে হয় তার কথা।

শুধু মনটা গুনগুন করে ওঠে ছুটির পর। সাবাটা রাস্তা বারবার তার কথাই মনে পড়ে। সেই সকালে চলে এসেছি, এর মধ্যে কোন বিপদ আপদ হয়নি তো ? কেমন আছে কে জানে। ভালই আছে হয়তো, ভাল থাকবারই কথা।

কোন কোনদিন রাস্তা থেকেই ওর কান্না শুনতে পাই। সেই একটানা কান্না। কান্নাও কি শুনতে ভাল লাগে ? ভালই তো লাগে। যেন কান্না নয়, ঘোষণা। আমি আছি, তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি—একথাটাই যেন বলতে চায়। কিংবা ও হয়তো বলতে চায় না, আমিই ওর অস্তিত্ব টের পাই এ কান্নার মধ্যে।

আছে, একজন আছে, এই বোধটুকুই আনন্দের। কাছে থাকা, কাছে পাওয়ার চেয়েও তা যেন অনেক বেশি তৃপ্তির।

সুনন্দা—সুনন্দার এই অস্তিত্বটুকুই ভাল লাগত। সেই দিনগুলো—যখন মনে হয়েছে সুনন্দা আমার, সুনন্দা চিবকালের। সারাটা দিন ও ঘুরঘুর করত মা-ঠাকুমার পায়ে পায়ে, কখনও কাজে অকাজে। আমি চুপচাপ বসে আছি, কিছু ভাবছি, কিংবা কিছুই ভাবছি না, হয়তো অপেক্ষাও করছি না সুনন্দার জন্যে, সেসব দিনেও সুনন্দা এই বাড়িতেই, একই ছাদের নীচে কোথাও আছে, ডাকলেই আসবে, কথা বলবে, দাঁড়াবে পাশ ঘেঁসে, এই আশ্বাসটুকুই মনে হত অনেকখানি। যখন আপিস থেকে ফিরে এসে দেখতাম সুনন্দা বেরিয়ে গেছে কেনাকাটা করতে, কিংবা যে-কদিন তার মা-বাবার কাছে গিয়ে থাকত সুনন্দা, কি অসীম এক অভাব, এক অসহ্য শূন্যতা। ওর আঁচলের চকিত বিদ্যুৎ, দূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট হাসি, চুড়ির রিমঝিম শুনে যেমন মনে হত সুনন্দা আছে,কাছে, তেমনি তৃপ্তির, মুগ্ধতার আবেশ যেন কান্নার, ছোট্ট এই শিশুর, আরও একজন নতুন মানুষের।

এসে দাঁড়ালাম তার পাশে। কোলে নিলাম। কান্না থেমে গেল। ছোট ছোট চোখের তারা দুটো বড় বড় হয়ে স্থির হয়ে রইল আমার মুখের দিকে, আমার চোখের দিকে।

হাসল সে। গালে ছোট্ট টোল পড়ল।

সুনন্দাও হাসছে, দেখছে। আমাকে ? না, ওর মেয়েকে।

হাসতে হাসতে সুনন্দা আমার সার্টের কলার ধরল, বললে, এই, খুকু আজ কি বলেছে জানো ?

বিস্ময়ে তাকালাম সুনন্দার হেসে-গড়িয়ে-পড়া ভঙ্গির দিকে।

সুনন্দার চোখজোড়া চকচক করে উঠল।

—কি ?

—বা। বা। বা। একটানা বলতে শুরু করল খুকু।

সুনন্দা হাসল।—ঐ দেখো, বাবা বলছে।

দু'জনেই হেসে উঠলাম ওর কৃতিত্বে। পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় বিস্ময় বুঝি নেই, এর চেয়ে বড় রহস্য নেই।

কি আশ্চর্য। কেউ তো শেখায়নি ওকে। একটা কথাও তো জানত না ও। কি করে উচ্চারণ করল, কোত্থেকে এল এই শব্দ।

সুনন্দা বললে, দেখো কাণ্ড। সবাই তো প্রথমে 'মা' বলে, ও কিনা প্রথমেই 'বাবা' বলছে।

বলছে ? সত্যিই কি কিছু বলছে ও ? না অর্থহীন একটা শব্দ শুধু। কে জানে। হয়তো 'মা' ডাকটাও এমনি অর্থহীন একটা শব্দমাত্র।

দু-হাত বাড়িয়ে ওকে কোলে নিতে চাইল সুনন্দা। দিলাম না। ও আমার, শুধু আমার। কি সুন্দর হাসছে, চোখের তারা দুটো কি সুন্দর নীল। গাঢ় নীল। না, নীল নয়, ঘন কৃষ্ণ উজ্জ্বল কোন মণি যেন, কত তীব্র চাউনি।

—বা। বা।

আবার ঐ একটা শব্দ। নতুন কোন খেলা পেয়েছে যেন। পুতুল নিয়ে যেমন নাড়াচাড়া করে বাচ্চারা, এর কাছে তেমনি এই নতুন শব্দটা।

কে জানে, হয়তো 'বাবা'ই বলছে। তা না হলে 'বাবা' 'মা' বলে কেন এই এক ফোঁটা মেয়েরা। আরও তো শব্দ আছে, আরো বর্ণ।

সুনন্দা হাসল আবার।—আজ দুপুরে কে এসেছিল জান ?

—কে ? কোন আগ্রহ নেই জানবার, তবু প্রশ্ন করলাম।

—ছন্দা। উত্তর দিল সুনন্দা।—সেই যে নার্সটা। হাসপাতালে দেখেছিলে মনে নেই ? আমার সঙ্গে বসে বসে গল্প করত...

ছন্দা। কি বোকা সুনন্দা, কত সরল। ও ভেবেছে ছন্দাকে আমি ভুলে গেছি, ছন্দার নাম মনে নেই আমার। 'সেই যে নার্সটা...আমার সঙ্গে বসে বসে গল্প করত !' যেন এত কথা না বললে আমার মনে পড়বে না।

মুহূর্তের মধ্যে মন ছুটে গেল সেই মুখটির দিকে, সেই সাদা ফুটফুটে পোশাক, সেই চঞ্চল হাসি...

জামা-কাপড় বদলাতে বদলাতে বললাম, কোন্ নার্সটা ? নার্স তো অনেক ছিল।

কি সুন্দর অভিনয় করতে পারি আমি। চমৎকার। নিজের অভিনয় দেখে বুঝি নিজেই হাততালি দেওয়া যায় না।

সুনন্দা বিশ্বাস করল, এতটুকু সন্দেহ হল না ওর। বললে, সেই যে তোমাকে জিগ্যেস করল, মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে কিনা ?

—ওঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কখন এসেছিল ?

—দুপুরে। ঘুমোচ্ছি আমরা, খুকুর কাঁথাটা দেখি ভিজে গেছে, ঘুমোতে ঘুমোতেই টের পেলাম, তবু এত ঘুম পেয়েছে, ভাবছি, উঠে কাঁথাটা বদলে দেব কিনা, হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠল।

—তারপর ?

সুনন্দা হাসল।—প্রথমবার বাজল, সাড়া দিলাম না, ভাবলাম ঝি এসেছে···

বিরক্তি চাপা দিলাম। যা জানতে চাই সেইটুকু বলে না কেন। কে শুনতে চায় এত কথা। তবু চুপ করে রইলাম। কিছু বললে হয়তো অভিমান দেখাবে, সরে যাবে। যা শুনতে চাই শোনা হবে না।

সুনন্দা কিন্তু বুঝল না। ও হাসতে হাসতে বললে, দ্বিতীয়বার বেল বাজতেই উঠে গিয়ে দেখি কি ছন্দা এসেছে। রঙিন শাড়ি পরে এসেছে। দেখলে চিনতেই পারতে না তুমি।

চিনতে পারতাম না ? হবে হয়তো। কত মেয়েই তো মনের ওপর ছায়া ফেলে যায়। সব মুখ কি মনে রাখা যায়।

বিস্ময়ের সুরে তবু বলতে হল, রঙিন শাড়ি পরে এসেছিল ?

—হ্যাঁ, পেঁয়াজি রঙের কি সুন্দর একটা শাড়ি পরেছিল ···

—পেঁয়াজি রঙ ? সে আবার কি ? বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করি। নাকি, আরও কিছু শোনার জন্যেই প্রসঙ্গ ছাড়তে চাই না।

সুনন্দা হাসে।—তুমি রঙও চেনো না ? পেঁয়াজের খোসার মত রঙ, বেশ লাগছিল ওকে। খুকুকে কত আদর করল, কত কি উপদেশ দিয়ে গেল আমাকে। কি করে ছেলে মানুষ করতে হয়। কাঁদলে কি করতে হবে, ভোরবেলায় মিছরির জল খাওয়াব কিনা···

বলতে বলতে খিলখিল করে হেসে উঠল, যেন হাসবারই কথা। সত্যিই তো, সুনন্দা মা হয়েছে, আর নার্সটার যে বিয়েই হয়নি। সুতরাং ছেলে মানুষ করার কথা সে বলবে কি করে। বলবে কেন।

কিন্তু এসব কথা শোনবার জন্য তো উদ্‌গ্রীব নই আমি। আমি শুধু মনের চোখে একবার কল্পনা করে নিলাম ছন্দাকে। কত সুন্দর মানিয়েছিল তাকে পেঁয়াজি রঙের শাড়িতে, হাসপাতালের ব্যস্ত-জীবনের বাইরে ছন্দার সুগঠিত যৌবন কতখানি মুগ্ধতা এনেছিল তার দেহে।

একটু অনুশোচনা যেন উঁকি দিয়ে গেল মনের কোণে। একটু লোভ। ছন্দা কি সত্যিই খুকুর টানে এতদূর ছুটে এসেছিল ? শুধু একটি ছোট্ট শিশুকে ভালবেসে ? নাকি সুনন্দার সঙ্গে দুদিনের নিবিড় অন্তরঙ্গতার ফলে।

সত্যি নয়, সত্যি হওয়া সম্ভব নয়, তবু কেমন ভাবতে ভাল লাগল, আমার মনে ছন্দা যে স্নিগ্ধ ছায়াটুকু ফেলে গেছে, তেমনি কোন মোহময় আবেগ হয়তো তার মনেও গুঞ্জন তুলেছে। সেই চোখোচোখি, হাসি, মধুর কথালাপ। সে-সবের মধ্যে কি সত্যিই কিছু লুকিয়ে ছিল ?

না, নিছক কল্পনা। তবু ভাবতে ভাল লাগে, ছন্দা হয়তো আশা করেছিল আমার সঙ্গে দেখা হবে। কিংবা সেই আকর্ষণেই হয়তো এসেছিল।

পরক্ষণেই হেসে উঠলাম। কি বোকা, কি বোকা আমি। তাও কি কখনও সম্ভব। রূপকথার গল্পের মত চারিচক্ষুর মিলন হলেই কি ভালবাসা হয় ?

সুনন্দার চোখ এড়াল না। বললে, হাসছ যে !

আমি ততক্ষণে খাটের পাশে গিয়ে বসেছি, ছোট্ট শিশুটির চঞ্চল শরীরের কৌতুক দেখছি।

বললাম, দ্যাখো, দ্যাখো, কেমন হাসছে।

যেন ওর হাসি দেখেই হেসে ফেলেছি।

সুনন্দাও এগিয়ে এল, কাছে বসল, খুকুর গাল দুটো অকারণে টিপে দিয়ে বললে, কি দুষ্টু যে হয়েছে ?

বললাম, কেন ?

—দুষ্টু নয় ? সারা দুপুর ঘুমোবে না, জ্বালাবে আমাকে, আর তুমি এলেই কত ভালমানুষ, যেন হাসি ছাড়া কিছুটি জানে না।

—সত্যি ? হাসলাম আমি। একরত্তি মেয়েটাকে কোলে তুলে নিলাম। কি নরম, কত অসহায়। তবু হাত দুটো নিশপিশ করে, মনে হয় ওকে বুকে চেপে ধরি, দু-হাতে ওর কোমল শরীরটাকে…

না। শুধু মনে হয়, এমনি ঘন হয়ে বসে সারাটা দিন, সারা রাত কাটিয়ে দিই। কোন কাজ নয়, কোন কথা নয়, কিংবা শুধু অনর্গল অর্থহীন কথা। শিশুর ভাষায় কথা বলি। কথা, কথা, কথা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। তবু ক্লান্ত হই না কেন ? একঘেয়ে লাগে না কেন ?

কি আশ্চর্য ! একদিন সুনন্দার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেও ক্লান্ত হতাম না, তার নিবিড় সান্নিধ্যে একঘেয়েমি ছিল না। তারপর, ক্রমে ক্রমে কেমন করে জানি না, সে যত বেশি আপন হল, ততই দূরে সরে গেলাম।

আর এই ছোট্ট মেয়েটা…

বাচ্চা চাকরটা এসে দাঁড়াল। কে এসেছে, ডাকছে, দেখা করতে চায়।

মুহূর্তে মনটা সেই অচেনা আগন্তুকের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল। বিক্ষুব্ধ।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে আসতে হল।

যখন ফিরে এলাম, তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে, দেখলাম, ন পাউন্ড ওজনের বাচ্চাটা ন স্টোন ওজনের মত ভারি হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুম, ঘুম।

ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে এত ভাল লাগে। ওর ঘুমন্ত হাতখানা আমার হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বসে থাকতে এত আনন্দ ! ওর ঘুমন্ত গালের ওপর গাল ঘসতে…

যেদিনই ফিরতে সন্ধে পার হয়ে যায়, এসে দেখি, ঘুম,ঘুম, অকাতরে ঘুমোচ্ছে ও।

তাড়াতাড়ি ফিরে আসার চেষ্টা করতাম, কোন কোন দিন আসতামও। কিন্তু যেদিনই দেরি হত, এসে দেখতাম, ঘুমিয়ে পড়েছে বুলা।

বুলা ? বেশ তো, বুলাই নাম থাক্ না ওর। ক্ষতি কি। কিন্তু না, সুনন্দার ও নাম পছন্দ নয়। বলত, নাম রাখো মৌ।

মৌ ? মন্দ কি। এ নামটাও বড়ো মিষ্টি, বড়ো সুন্দর। কিন্তু ঠিক যেন স্বাভাবিকভাবে মুখে আসে না। শানানো-বানানো। তার চেয়ে সহজ নাম, সরল নাম বুলা। বুলাই।

সিঁড়ির মাথাতেই সেদিন দেখা হল সুনন্দার সঙ্গে।

বললাম, বুলা ঘুমিয়ে পড়েছে ?

—ঘুমোবে না ? কটা বাজল দেখ তো। অভিযোগের স্বরেই বললে সুনন্দা।

এবারও মনে হল না অভিযোগটা সুনন্দার। ঐ একফোঁটা মেয়েটা যেন সুনন্দাকে আমার মন থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু সেদিকে তাকাবার সময় কোথায় তখন। জামা খুলে ভিজে গামছাটা বুকে পিঠে ঘসে ঘাম মুছতে মুছতে এসে বসলাম বুলার ঘুমন্ত শরীরের পাশে।

হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলাম তাকে। ধীরে ধীরে ডাকলাম, বুলা ! বুলা !

সুনন্দা হাসল, কপট গাম্ভীর্যে ধমক দিলে।—জাগিয়ে দিও না বলছি। মাঝরাত্তিরে এসে আদর হচ্ছে ?

বললাম, মাঝরাত্তির কোথায় ? মোটে তো আটটা বাজল।

—রাত আটটাই ওর মাঝরাত। যাও তো, তুমি উঠে যাও এখান থেকে। বলে ঠেলে

সরিয়ে দিতে চাইল সুনন্দা।

হাসলাম। বললাম, হিংসুটি। বলে, বুলাকে জোরে জোরে নাড়া দিলাম।—বুলা ওঠ, ওঠ বুলা।

সুনন্দা এবার সত্যিই রেগে গেল। বললে, কাঁচাঘুমে উঠিয়ে দিও না বলছি। ভাল হবে না।

কাঁচাঘুমে ঐটুকু একটা বাচ্চা মেয়েকে উঠিয়ে দেওয়া উচিত নয়, সে কি আমি জানি না, বুঝি না ? ওর শরীর খারাপ হতে পারে, হয়তো আর ঘুম পাড়ানো যাবে না, সারা রাত কাঁদবে হয়তো। তবু, সারাদিন কাজের চাকায় কাটিয়ে এসে যদি এইটুকু বিশ্রাম না পাই, এইটুকু আনন্দ।

এইটুকু।

না, বোধহয় এমন পরিপূর্ণ আনন্দ আর কিছুতেই নেই। অফুরন্ত, অক্লান্ত আনন্দ।

সুনন্দাকে যেদিন প্রথম কাছে পেয়েছিলাম, একান্ত আপন করে পেয়েছিলাম উষ্ণ নিবিড় স্পর্শের মধ্যে, সেদিনও এই আনন্দের কণামাত্র পাইনি বোধ হয়।

এ এক অনির্বচনীয় আনন্দ।

ডাকাডাকি আর নাড়াচাড়ায় চোখ মেলে তাকা'ল বুলা, তাকাল আমার মুখের দিকে, তারপর আবার চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ল।

সুনন্দা হাসল। ধীরে ধীরে আমার মুঠোর ভেতর থেকে বুলার ছোট্ট নরম হাতখানা টেনে বললে, জানো, আজ সারা দিন শুধু বাবা, বাবা করেছে।

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম সুনন্দার মুখের দিকে।

ও বললে, যেমন বাপ তেমনি মেয়ে। সবাই প্রথমে 'মা' 'মা' বলে, ও প্রথম থেকেই 'বাবা' 'বাবা' করছে। এদিকে বাপের পাত্তা নেই মাঝরাত্তির অবধি।

সত্যি কি বুলা সারাদিন আমার নাম করেছে ? মনটা হঠাৎ যেন বড়ো বেশি নরম হয়ে গেল। কেমন একটা অনুশোচনা। নিজেকে অপরাধী মনে হল এইটুকু একটা বাচ্চা মেয়ের কাছে। না জানি সারাদিন আমাকে না দেখতে পেয়ে কত কষ্ট পেয়েছে ও। কষ্ট পেয়েছে ? বুলার মত মেয়ের, এই একরত্তি একটা মেয়ে, যার মুখে শুধু হাসি আর কান্না দুটো মাত্র অনুভূতি, যার মুখে শুধু একটাই অস্পষ্ট শব্দ—বাবা, তারও কি আমাদের মতই সূক্ষ্ম অনুভূতি আছে ? মন আছে ? যখন কষ্ট পায়, গুমরে গুমরে কাঁদে ? কারও কথা ভাবে বুলা ? ভাবতে পারে ?

কেমন যেন রহস্য মনে হয়। কোত্থেকে আসে এই অনুভূতি ? বাপ-মা'ক শিশু কি জন্মগত কারণেই ভালবাসে, না সদাসর্বদা কাছে পায় বলে ? কিন্তু কতক্ষণই বা আমাকে কাছে পায় বুলা। পায় না বলেই কি এত টান।

ভাবতে কেমন বিস্ময় লাগে।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতে বুঝি, ঘুম আপনা থেকে ভাঙেনি। কখন যেন উঠে পড়েছে বুলা। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কি যেন খুঁজছিল, তার হাতটা দুবার আমার মুখের ওপর পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল।

কাছে টেনে নিলাম তাকে। আলো জ্বাললাম। তখনও রাত ভোর হয়নি। সুনন্দাকে দুটো ঠেলা দিতেই সেও উঠল ঘুম-চোখে, চোখের পাতা না খুলেই প্রশ্ন করলে, খুকু উঠেছে ?

—হ্যাঁ।

ঘুম-চোখেই হাত বাড়িয়ে টুলের ওপর থেকে বাটি-ঝিনুক নিয়ে মিছরি ভেজানো জলটুকু বুলাকে খাইয়ে দিল, তারপর আবার শুয়ে পড়ল।

বললাম, উঠবে না ?
সুনন্দা চোখ না খুলেই বললে, তোমার যে আগে আটটার আগে ঘুম ভাঙত না ?
কি উত্তর দেব একথার, চুপ করে রইলাম।
সুনন্দা আবার ঘুম-জড়ানো স্বরে বললে, কেউ ডাকলে যে চটে যেতে ?
এ কথারই বা কি উত্তর আছে।
আসল অভিযোগটা এইবার তুলল সুনন্দা। বললে, আর এখন রাত ভোর হতে না হতেই, উঠে ঠায় মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাক।
হেসে ফেললাম। বুলাকে বললাম, তোর মায়ের কি হিংসে দেখেছিস !
বুলা কি বুঝল কে জানে, সুনন্দার চুল ধরে টানতে শুরু করল।
ওর ঘুম যখন ভেঙে গেছে তখন অন্য কেউ পড়ে পড়ে ঘুমোবে—বুলার বোধহয় ইচ্ছে নয়।
চুল ধরে বুলা টানাটানি করছিল বলেই, না অন্যান্য ঘর থেকে দু-একটা কথা ভেসে আসছিল বলে, কে জানে, সুনন্দা হুড়মুড় করে এক সময় উঠে পড়ল।
বললে, উঃ, অনেক বেলা হয়ে গেছে। উঠিয়ে দিলে না কেন, উনুনে আঁচ দিতে হবে না !
বলেই সুনন্দা ছুটতে ছুটতে চলে গেল কপাট খুলে রেখে।
আর কিছুক্ষণ পরেই মা ঢুকল ঘরে।—খুকু উঠেছে রে ! দুধ খেয়েছে ?
বুলা ডাক শুনেই অস্ফুটে বিচিত্র শব্দ করতে শুরু করল। অর্থাৎ সে যে জেগে আছে এবং মার গলার স্বরটা চিনতে পেরেছে, সেটুকুই জানিয়ে দিতে চাইল।
মা এসে তাকে কোলে তুলে নিল, তারপর চলে গেল যেমন এসেছিল তেমনি।
কি আশ্চর্য ! এরা কেউ যেন চায় না, আমি আমার মেয়েকে ভালবাসি, কাছে রাখি। না, তা নয়, আসলে ওরাও বুলাকে ভালবাসতে চায়, কাছে রাখতে চায়।
কিন্তু ওদের ওই স্বার্থপরতায় আমার মনটা বিষিয়ে ওঠে।
মুখে-চোখে জল দিয়ে ও-ঘরে গিয়ে ঢুকতেই দেখি বুলাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। একজনের কোল থেকে আরেকজনের কোলে।
বাবার কোল থেকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দুড়দাড় করে ছুটে পালায় মিনু। আর মা চিৎকার করে ওঠে ; ছুটিস না মিনু। ছুটিস না ওকে নিয়ে, পড়ে যাবি।
বাবা বলে, দিয়ে যা ওকে।
মুহূর্তের মধ্যে বিরক্তি দূর হয়। মনটা খুশিতে নেচে ওঠে।
এমনি খুশিতে নেচে উঠল সেদিন সুনন্দার কথা শুনে। এত বড় আনন্দের খবর যেন কখনও শুনিনি।
আপিস থেকে ফিরতেই সুনন্দা একদিন বললে, আজ একটা কাণ্ড করেছে খুকু।
—কি ব্যাপার ?
সুনন্দা খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল।—সে তুমি বিশ্বাস করবে না, না দেখলে।
বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলাম উৎকণ্ঠার স্বরে।—কি হয়েছে তাই বল না।
—খুকু আজ হামাগুড়ি দিতে শিখেছে।
—সত্যি ?
পৃথিবীতে যেন এর চেয়ে অবিশ্বাস্য কথা নেই, কিংবা বুলার পক্ষে এর চেয়ে বড় কৃতিত্ব থাকতে পারে না যেন।
সুনন্দা ভাবল আমি ওর কথা বিশ্বাস করিনি। তাই বুলাকে মেঝের ওপর উপুড় করে শুইয়ে দিল ও। আর দুহাত বাড়িয়ে কাছে আসতে বলল বুলাকে।

এর আগেও বহুবার এমন করেছে সুনন্দা, আর বুলা একটা সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে তিল তিল করে এগিয়ে গেছে।

কিন্তু আজ আর তেমন কোন চেষ্টাই দেখা গেল না। তার বদলে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠল বুলা। হাত দুটো, ছোট ছোট নরম হাত দু খানা কাঁপছে এবার, কাঁপছে। ধীরে ধীরে হাত দুটোয় ভর দিয়ে বুকটা মাটি ছেড়ে উঠল। তারপর একটা হাঁটু একটু এগিয়ে এল, আরেকটা হাঁটু—

সামান্য একটু এসেই থপ করে তার শরীরটা পড়ে গেল।

সুনন্দা তাড়াতাড়ি ওকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেল। বললে, দেখলে তো। আরও অনেকটা হামাগুড়ি দিতে পারে, সারাদিন ধরে সবাইকে সার্কাস দেখিয়ে দেখিয়ে বেচারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই বেশি পারল না।

সার্কাস! ঠিক বলেছে সুনন্দা, সার্কাসই তো। দড়ির ওপর দিয়ে ছাতা হাতে যে মেয়েটা হেঁটে যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি চমকে দিয়েছে বুলা। হামাগুড়ি দিয়েছে।

বুলার হামাগুড়ি দেয়ার ছবিটা মনের মধ্যে গাঁথা রয়ে গেল। সারাদিন মাথার মধ্যে ঐ একটাই কথা।

আপিসে বড়বাবুর সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প হত, মেয়ে কেমন আছে। হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়াব না অ্যালোপ্যাথি, মধু খাওয়ানো উচিত কিনা।

ভদ্রলোক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতেন, উত্তর দিতেন, উপদেশ দিতেন।

এমন শুভানুধ্যায়ীর কাছে খবরটা না জানিয়ে কি থাকা যায়।তাছাড়া বুলার এই কৃতিত্বের কথাটা অন্য একজনকে না বলে যেন পরিপূর্ণ আনন্দ পাব না। তাই বললাম, জানেন অমিয়বাবু, মেয়ে আমার কাল তাজ্জব করে দিয়েছে সকলকে।

—কি ব্যাপার। হাসলেন বড়বাবু, পানের ছোপ-লাগা কালো দাঁত বের করে।

বললাম, কাল হামাগুড়ি দিয়েছে মেয়ে—সে অনেকখানি, প্রায় দশ হাত।

কেন জানি না, দেড় হাত দূরত্বটাকে দশ হাত বানাতে এতটুকু সঙ্কোচ হল না।

তিলকে তাল করার অভ্যাস সুনন্দাদের, সব কিছুই বাড়িয়ে বলে—এ-কথা বলে কতদিন সুনন্দাকে খোঁটা দিয়েছি, ঠাট্টা করেছি। অথচ আমিই কিনা একটা তুচ্ছ ব্যাপারকে এত বড় করে বাড়িয়ে তুললাম। নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত বোধ করলাম।

কিন্তু অমিয়বাবু কোন কথা বলছেন না কেন ? ধীরে সুস্থে পানের ডিবে থেকে পান বের করে খেলেন, জর্দার কৌটো থেকে দু-আঙুলে খানিকটা জর্দা নিয়ে মুখে ফেললেন। তারপর পান চিবোতে শুরু করলেন।

তবে কি বাড়িয়ে বলার ফলে অমিয়বাবু বিশ্বাস করেননি আমার কথা ? নাকি ভেবেছেন, বুলা হামাগুড়ি দিতে শেখেনি আদপেই!

বললাম, কি হল, কথা বলছেন না যে!

পান চিবোতে চিবোতেই বড়বাবু বললেন, আপনাদের নিয়ে হয়েছে হাঙ্গামা।

—হাঙ্গামা ?

—তা নয় তো কি। ছেলেমেয়ে আমার···এই এক, দুই, তিন···একটার পর একটা আঙুল মটকাতে মটকাতে অন্য হাতের তৃতীয় আঙুলে গিয়ে থামলেন অমিয়বাবু। বললেন, আটটি। বুঝলেন ? আট আটটি ছেলেমেয়ে নিয়ে জীবন অতিষ্ঠ, বৌ তো বলে বাড়ি ছেড়ে পালাব। আপনার মত ঐ মেয়ে হামাগুড়ি দিল কি হেঁটে বেড়াল, তা দেখে আহ্লাদে আটখানা হবার বয়েস নেই।

কথাটা শুনে দমে গেলাম। সত্যিই তো, অমিয়বাবুর কাছে এ-গল্প না করাই উচিত ছিল। কিন্তু লোকটা কি অন্যের আনন্দ দেখে একটু খুশি হওয়ার ভান করতে পারত না!

না, এরপর আর কোনদিন ওঁর কাছে বুলার কথা বলব না। এমনকি যেচে উপদেশ দিতে এলেও শুনব না।

কিন্তু বুলার হামাগুড়ি দেওয়ার ব্যাপারটা অমিয়বাবু যতই তাচ্ছিল্য করুক না কেন, মনের মধ্যে থেকে তা দূর করতে পারলাম না।

ছুটির পর বাড়ি ফিরছি, তখনও মনের মধ্যে গুনগুন করছে ঐ একটা কথা। কোন একজনের কাছে কথাটা বলে, উপভোগ করতে না পেলে যেন শান্তি নেই।—

কি আশ্চর্য। ঠিক এই মুহূর্তেই যে ছন্দাকে দেখতে পাব কে জানত।

বাস থেকে নেমে হন্‌হন্ করে হেঁটে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি ওদিকের বাস স্টপে নার্সের পোশাকে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে।

প্রথমটা চিনতে পারিনি, ছন্দাও বোধহয় চিনতে পারেনি। কিংবা অন্যমনস্ক ছিল।

দ্বিতীয়বার চোখোচোখি হতে ছন্দা একমুখ হেসে হাত নেড়ে ডাক দিল।

রাস্তা পার হয়ে কাছে এগিয়ে গেলাম।

ফুলঝুরির মত হাসি হেসে ছন্দা বললে, খুকু কেমন আছে?

বললাম, চলুন না দেখে যাবেন, হামাগুড়ি দিতে শিখেছে। ছন্দা খুশি হল, হাসল. তারপর মনে মনে কি হিসেব করে বললে, হ্যাঁ, হামাগুড়ি দেবার তো বয়েসও হল।

তারপর মিষ্টি হেসে বললে, যাব একদিন, আজ ডিউটি আছে।

বললাম, কবে যাবেন বলুন, কখন? আমি থাকব।

ছন্দা ওর সুন্দর শরীরটাকে দুলিয়ে হেসে উঠল। বললে, যাব, যাব।

এমন ভাবে বলল, যেন আমার কথাটা ওর কাছে হাস্যকর মনে হয়েছে। হাস্যকরই তো। ছন্দা যাবে বুলাকে দেখতে, হয়তো সুনন্দার সঙ্গে দু-চারটে সুখ দুঃখের কথা বলতে। আমার সঙ্গে তো দেখা করতে যাবে না। তবে আর আমি থাকব কি থাকব না, জেনে তার কি লাভ!

তাই শুধরে নিয়ে বললাম, আপনি গেলে সুনন্দা খুব খুশি হবে।

ছন্দা আবার হাসল, তারপর বললে, খুকুকে রোজ দু-চামচ করে কমলা লেবুর রস খাওয়াতে বলবেন। এ-সময়েই হাড় শক্ত হয়, লেবুর রস না খাওয়ালে—

কথা শেষ হবার আগেই বাস এসে গেল, আর ফিরে তাকিয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে চট্ করে উঠে পড়ল ও।

বুকের মধ্যে একটা কাঁটা খচখচ করল সারাক্ষণ। লেবুর রস, হাড় শক্ত হওয়ার কথা ছাড়া কি আর কোন কথা নেই ছন্দার মনে? নার্স ছন্দা কি শুধুই নার্স? আর কিছু নয়?

হঠাৎ এক সময় আমার নিজের চরিত্রটাই নিজের কাছে দুর্বোধ্য মনে হল। বড়বাবু বুলার কথায় কোন উৎসাহ দেখাননি বলে চটে গিয়েছিলাম আমি। অথচ ছন্দা শুধুই বুলার কথায় উৎসাহ দেখাল বলে নিজেকে বড়ো বেশি তুচ্ছ মনে হচ্ছে কেন? ছন্দার ব্যবহারে খুশি হতে পারছি না কেন?

বাড়িতে যখন ফিরে এলাম তখন বুলার জন্যে কোন উৎকণ্ঠা বা আগ্রহ নেই, সাদা ধপধপে অ্যাপ্রনে বুক ঢাকা স্বচ্ছন্দ একটি শরীর আর রহস্যময় হাসিতে উজ্জ্বল একটি মুখের ছবি ভাসছে শুধু চোখে।

ছন্দা! নার্স ছন্দা রায়।

কেন জানি না, ছন্দার সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাতের কথাটা সুনন্দাকে বলতে বাধল। বলতে পারলাম না।

দিন কয়েক বাদে শুধু প্রশ্ন করলাম, তোমার সে বান্ধবী, কি নাম যেন নার্সটার, সে আর আসেনি?

অভ্যাস কি ভাবে যেন নিঃশব্দে বদলে যায় মানুষের। সত্যি কি আমি তাহলে বদলে গেছি, বদলে চলেছি ? কারও পরিবর্তন কি তার নিজের চোখে পড়ে ! হয়তো কখনও কখনও পড়ে, তা না হলে হঠাৎ সেদিন কেন মনে হল আমি বদলে গেছি।

ব্যাপারটা কিছু নয়। তুচ্ছ। রোজ সকালে উঠেই খবরের কাগজটার জন্য অপেক্ষা করতাম এতদিন। কাগজটা পেতে দেরি হলে মন-মেজাজ বিগড়ে যেত।

সুনন্দা তা নিয়ে ঠাট্টা করত। বলত, ছোট ছেলেপিলেরা সকালে উঠেই খাবার চায়, তোমরা খবর চাও। কি ছাইপাঁশ থাকে ঐ কাগজটায় ?

হাসতাম ওর কথা শুনে, বলতাম, শুধু কাগজটাই নয়, সকালে উঠেই এক কাপ চা না পেলেও একই অবস্থা—নেশা, নেশা, বুঝলে !

চায়ের পেয়ালাটা এনে ঠক্ করে টুলের ওপর রেখে দিয়ে ও কখনও বলত, সূয্যি উঠলেই কাক কা কা করে, তোমরা চা চা করো। এই নাও চা।

সেদিনও যথারীতি চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে গেল সুনন্দা, দুবার এসে মনে পড়িয়ে দিল, চা ঠাণ্ডা হচ্ছে।

হোক ঠাণ্ডা। চায়ের নেশাটা যেন বেমালুম উবে গেছে। ঘুম জড়ানো চোখেই বুলাকে তখন টেনে নিয়েছি বুকের কাছটিতে, দুটো হাত হাল্কা করে ওর শরীরের ওপর নামিয়ে রেখে স্পর্শের মধ্যে অদ্ভুত এক অনুভূতি উপভোগ কবছি।

মাঝে মাঝে চেয়ে চেয়ে আমাব দিকে তাকাচ্ছে বুলা, আবার পবক্ষণেই চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করছে।

সুনন্দাও একসময় উঁকি মেরে দেখে বললে, কি দুষ্টু, কি দুষ্টু। এত বুদ্ধি তোর মাথায় কে ঢোকায় রে বুলা ?

সত্যি তো. কে ঢোকায়। কে শেখায় এত দুষ্টুমি, এত অভিনয় ?

বুলা বোঝে কি বোঝে না, খিলখিল করে হেসে ওঠে এক একবার, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে পড়ে থাকে, ডাকলে সাড়া দেয় না।

ওর সঙ্গে খেলা করতে করতে আমিও যেন ওর মতই ছোট হয়ে গেছি।

সুনন্দা দেখে আর হাসে।

তারপর এক সময় সাইকেলের ঘণ্টি শুনে ছুটে যায়, খবরের কাগজখানা এনে আমার মুখের ওপর ফেলে দিয়ে যায় সুনন্দা।

কাগজটা সরিয়ে রেখে দিই। আমি তখন বুলাকে নিয়ে মেতে আছি। বুলা ! মাস কয়েকের ছোট্ট মেয়েটাই যেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় খবর। অন্য সব খবরই তুচ্ছ। কি হবে কাগজের পাতা উল্টে।

সুনন্দাও বোধহয় সেটুকুও লক্ষ করে। বলে, বেশ বাবা চা ঠাণ্ডা হল, খবরের কাগজ পড়ে রইল। আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটি খাবে, বুঝতে পারছি।

সুতরাং বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়।

ঘরে আলো ঢোকে না, বারান্দায় বাতাস নেই। তবু এই শীর্ণ বারান্দাটুকু থেকে এক চিলতে আকাশ দেখা যায়। তাই প্রতিদিন এই জায়গাটিতে এসে বসি ভোরবেলায়।

সামনে খবরের কাগজটা খোলা পড়ে থাকে। বুলা কোনদিন তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাগজটা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে। কোনদিন বা কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাগজটা সরিয়ে দেয়।

সেদিন তাই একা এসে বসলাম বারান্দায়, কাগজটা হাতে নিয়ে। পড়া হয়ে যাক তবে নামিয়ে আনব বুলাকে।

কিন্তু খবরের কাগজে চোখ রেখে দুটো মিনিটও পার হয়নি, দুম করে একটা শব্দ হল।

সুনন্দা ওদিকে বঁটি পেতে শাকসব্জির ঝুড়ি নিয়ে বসে ছিল।

আওয়াজ শুনে সেও ছুটে এল।

তাড়াতাড়ি মেঝে থেকে তুলে নিলাম বুলাকে। খাটের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেছে। পড়ে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত একেবারে চুপ করে ছিল, তারপরেই চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

কোঁকড়ানো নরম এক মাথা চুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দেখি একটা দিক ফুলে উঠেছে। মনের মধ্যে একটা আতঙ্কের ধাক্কা লাগল, যেন চোটটা আমার মাথাতেই লেগেছে।

কি করব, কি করা উচিত, কোন ওষুধ খাওয়ানো উচিত কিনা—কিছুই যেন ঠিক করতে পারছি না।

সুনন্দা ইতিমধ্যে জল নিয়ে এসে ভিজিয়ে দিল জায়গাটা।

কান্না শুনে মা আর বাবাও ছুটে এল।

সুনন্দার কোল থেকে বুলাকে নিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করল মা।

বললাম, একটা ওষুধ কিছু লাগিয়ে দিলে হত।

মা হাসল।—ও কতবার পড়বে এরপর, হামাগুড়ি দিতে শিখেছে এখন, দিনরাত পড়বে।

বাবা বললে, দুটো আর্নিকার বড়ি খাইয়ে দাও।

ব্যাস! আর কিছুই নয়? সমস্ত মনটা যেন বিদ্রোহ করতে চাইল। এমন একটা দুর্ঘটনাকে এত হাল্কাভাবে উড়িয়ে দেওয়াটা আমার কাছে রহস্য মনে হল। ছোট ছেলেদের পড়ে যাওয়া, মাথায় আঘাত লাগা কি এতই স্বাভাবিক, এতই তাচ্ছিল্যের বিষয়?

হঠাৎ সুনন্দার সেই প্রশ্নটা মনের পটে উঁকি দিয়ে গেল। সুনন্দার সেই ম্লান হাসির মুখখানা।

হাসপাতালে প্রথম যেদিন দেখা করতে গেলাম, সুনন্দা ভীত বিষণ্ণ হাসি হেসে প্রশ্ন করেছিল, মা খুব রেগে গেছে, না? মেয়ে হয়েছে শুনে?

তবে কি সত্যিই বুলাকে স্বীকার করে নিতে পারেনি মা? কুসংস্কারের মনে কোথাও একটা কাঁটা বিঁধে আছে?

এক সময় সুনন্দা ফিসফিস করে বললে, দেখলে তো!

ছোট্ট একটা কথা। কিন্তু সুনন্দার কাছে নিজেকে যেন ছোট মনে হল। মা বুলাকে ভালবাসে না? তাই কখনও হতে পারে? ভুল, মনের ভুল, আমাদের।

কিন্তু ঐ ছোট্ট মেয়েটা যেন শোধ নেবার জন্যে প্রতিজ্ঞা করে বসেছে। অভিমানে মানুষ যেমন আত্মঘাতী হয়ে ওঠে, নিজেকে কষ্ট দিতে চায়, তেমনি ভাবেই যেন বুলাও মেতে উঠেছে।

পরের দিনও আবার এক সময় খাট থেকে পড়ে গেল বুলা। এবার বোধ হয় আরও জোরে লাগল ওর মাথায়। কান্না থামতে চাইল না।

কেন জানি না চটে গেলাম সুনন্দার ওপর। কে তুলেছিল ওকে খাটের ওপর? কেন যাবার সময় নামিয়ে দিয়ে যায়নি?

সুনন্দা অপরাধীর মত বললে, ওর দুধটা গরম করে আনতে গেলাম, এক মিনিটের জন্যে···

ধমক দিয়ে বললাম, এক মিনিটের জন্যেই বা ছেড়ে যাবে কেন? সঙ্গে নিয়ে যেতে পার না?

ধমকের সুরটা বোধহয় রূঢ় শোনাল ওর কানে। এক মুহূর্ত দুটো স্থির চোখ মেলে তাকাল ও আমার মুখের দিকে, তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে সরে গেল।

শুধু বুলার কান্নাটা ভেসে আসছে তখনও দূর থেকে।

একটু পরেই শুনতে পেলাম, মা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জিগ্যেস করছে, কি হল বৌমা, কাঁদছে কেন ?

—খাট থেকে আবার পড়ে গেছে। কান্নার মত শোনাল সুনন্দার গলার স্বর। যেন নিজের ওপর একটা নৃশংস আঘাত হানবার চেষ্টা করেই আবার বললে—মরবে, মেয়েটা মরবে এমনি করে।

মা বোধ হয় বুলাকে কোলে নিল। হ্যাঁ, বুলাকে এ-ও-তা বলে ভোলাবার চেষ্টা করছে মা। লজেন্স কি বিস্কুট কিছু একটা দিচ্ছে বোধ হয়।

বুলা চুপ করেছে। কই, আর তো কান্না শোনা যাচ্ছে না।

মা বুঝি সুনন্দাকে বলল, এ সময় একটু সাবধান থেকো বৌমা, হামা দিতে শিখেছে, খাটের ওপর রেখো না।

রেখো না বলা সহজ। কিন্তু রাত্তিরে তো মেঝের ওপর শোয়ানো যায় না। ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

আর মেয়েটাও এত বোকা। ভোর বেলায় অন্য কারও ঘুম ভাঙার আগেই অন্ধকার থাকতে থাকতে ঘুম থেকে উঠে পড়ে। তারপর মশারির মধ্যে অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে বেড়ায়, এদিক থেকে ওদিকে।

দু একটা অস্ফুট শব্দও কানে আসছিল এক একবাব। কিন্তু ঘুমে তখন চোখ জড়িয়ে আছে! চোখ মেলে তাকাতে পারছি না! এমন কি বলাব ডাকটাও বিরক্তিকর লাগছে। মেয়েটা শান্তিতে ঘুমোতে দেবে না একটা দিন।

ঘুম। বুলাব চেয়েও বোধ হয় ঘুমকে ভালবাসি।

এদিকে বুলা কিভাবে যেন হামাগুড়ি দিয়ে আমার কাছে এসে পড়েছে। বোধ হয় অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছে না বলেই আমাব মুখের ওপর হাত বুলিযে মানুষটাকে চেনবার চেষ্টা করছে।

ওর ঘুম ভেঙে গেছে, অথচ অন্য সকলে ঘুমোবে কেন! তাই চোখের পাতা দুটো টেনে খুলে দিতে চাইছে!

এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে পাশে শুইয়ে দিলাম। বললাম, ঘুমোও।

চুপ করে শুয়ে পড়ল বুলা।

তারপর কখন যেন আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। গাঢ় ঘুম। হঠাৎ চমকে উঠলাম। ভারী কিছু একটা পড়ার শব্দ। সুনন্দাও উঠে পড়েছে।

কি আশ্চর্য, আবার পড়ে গেছে বুলা। কিন্তু কাঁদছে না কেন ? কাঁদছে না। মেঝের ওপর নিঃশব্দে পড়ে আছে।

তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিলাম। একটু পরেই কেঁদে উঠল বুলা।

এবার আর সুনন্দার ওপর রাগ নয়, নিজের ওপর। 'মরবে, মেয়েটা মরবে একদিন এমনি করে'—কানের মধ্যে সুনন্দার কথাটা বাজতে লাগল বার বার।

বললাম, না, এবার থেকে নীচে বিছানা পেতে শোব।

একটু পরেই কান্না থামল বুলার। আর সুনন্দা বলতে শুরু করল, ওর কোন পিসতুতো বোনের মেয়ে টেবিল থেকে পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে, পাশের বাড়ির বৌটির কোন ননদের ছেলে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে চিরজন্মের জন্যে খোঁড়া হয়ে গেছে, খাট থেকে গড়িয়ে পড়ে কার ছেলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

গোপন আতঙ্কটা যেন বাড়িয়ে দেয় ও। সত্যিই তো, এ-সবের একটিও তো অসম্ভব নয়। তুচ্ছ এক দুর্ঘটনা কোথায় গিয়ে পৌঁছয় কেউ কি বলতে পারে।

বললাম, একবার ডাক্তার দেখিয়ে নিলে হত, রোজ রোজ পড়ে যাচ্ছে, শেষে যদি কিছু একটা হয় !

সুনন্দা বললে, কোন ডাক্তারকেই বা দেখাবে ।

একটু চুপ করে থেকে বললে, ছন্দা—সেই নার্সটা যদি একদিন আসত···

নার্স ছন্দা রায় আসবে জানতাম । এত তাড়াতাড়ি আসবে ভাবিনি ।

বুলাকে বুকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম দোতলার বারান্দায় । সুনন্দা কাজের ফাঁকে ফাঁকে একবার করে এসে ঘুরে যাচ্ছিল । দু-একটা কথা, বুলার সঙ্গে । দু-একটা কপট অভিযোগ, আমার বিরুদ্ধে ।

সন্ধে হয়েছে তখন । শীর্ণ গলিটার মোড়ে গ্যাসবাতিটা মুমূর্ষু রোগীর হৃৎপিণ্ডের মত ধুকধুক করছে । সে আলোয় ল্যাম্পপোস্টটা জোনাকির মত নিজেকে আলোকিত করেই সন্তুষ্ট । গলিটা অন্ধকার । যেটুকু আবছা আলো, তাও শুক্লপক্ষের চাঁদের ।

নির্জন গলি । দু-একটা লোক আসছে, যাচ্ছে । জুতোর শব্দ, দু-একটা টুকরো টুকরো কথা ।

এদিকে বুলার মুখে একটানা ডাক ; মা-মা-মা ।

হঠাৎ একটা নতুন নাম শিখেছে, নতুন শব্দ । তাই পুরনোটা ভুলে গেছে ।

সুনন্দা এক ফাঁকে এসে বুলার গাল টিপে তাকে চুমু খেয়ে বললে, ঠিক হয়েছে, শুধু 'মা মা' বলবে এবার থেকে । 'বাবা' বলবে না, কেমন ?

হাসলাম ।—যা হিংসে তোমার, কি করে বলবে । 'মা' বলে না বলেই তো খাট থেকে ফেলে দিচ্ছ বারবার, ও কি বোঝে না কিছু ।

মুখ গম্ভীর করল সুনন্দা । একটা চিমটি কাটল । তারপর কি যেন বলতে যাচ্ছিল । কিন্তু গলিরাস্তার দিকে চোখ যেতেই ঝুঁকে পড়ে দেখল ভাল করে, চিৎকার করে উঠল : ছন্দা, ছন্দা আসছে !

দুড়দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল ।

আবছা অন্ধকারে দেখা গেল খুটখুট খুটখুট করে এগিয়ে আসছে একটা ছায়াশরীর । একটি সুগঠিত নারীদেহ ।

হ্যাঁ, ছন্দাই । নার্স ছন্দা রায় ।

সিঁড়িতে ছন্দার পায়ের শব্দ, ছন্দার কণ্ঠস্বর ।

সিঁড়ির মুখে এগিয়ে গেলাম । পরক্ষণেই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হতে হল ।

ছন্দা রায়কে ঠিক এই পোশাকে দেখিনি কখনও, দেখব ভাবিনি ।

একটি উজ্জ্বল যৌবনের ডালি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে যেন । নার্স নয়, নারী । শরীরের প্রতিটি যৌবনরেখাকে এভাবে ছন্দোময় করে তুলতে দেখিনি কখনও । ছন্দার এ রূপ যেন অচেনা, অজানা, রহস্যময় !

মুহূর্তের জন্যে সিঁড়ির ধাপে থমকে দাঁড়াল ছন্দা, চোখে চোখ রেখে তাকাল, হাসল, যেন তার সমস্ত রূপটুকু হাসির ভঙ্গিতে, চোখের কটাক্ষে, দেহের হিল্লোলে বিকশিত করতে চাইল ।

কিন্তু ওর এই নতুন রূপকে কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হল । হাসপাতালের কাজের মধ্যে, পরের জন্যে ব্যস্ততার মধ্যে যে-রূপ নিয়ে এসেছে ও বারবার, তা মানুষকে মুগ্ধ করে । কিন্তু এই উগ্র সাজপোশাকের মত্ততা শুধুই নেশা ধরায় ।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এল ছন্দা, দুহাত বাড়িয়ে বুলাকে কোলে নিল ।

আমি হয়তো নেশায় পাওয়া চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম । ছন্দার অলক্ষ্যেও চোখোচোখি হল সুনন্দার সঙ্গে ।

সুনন্দা হাসল, ব্যঙ্গের হাসি। কিংবা নিছক কৌতুকের। ওর কাছেও তা হলে ছন্দার পোশাক-প্রসাধন উৎকট মনে হয়েছে। অস্বাভাবিক ঠেকেছে।

তবু সে-ভাবটুকু চাপা দিয়ে তাকে ঘরে এনে একটা চেয়াব টেনে দিল সুনন্দা। ছন্দা বোধ হয় তা লক্ষ করল না, বিছানার এক পাশে বসল সে।

হেসে বললে, বুলা আমাকে ভুলে গেছে।

ভুলে যাবারই কথা। সুনন্দা অভিযোগ করলে, এতদিন বাদে এলে তো ভুলে যাবেই ; কদ্দিন পরে এলে বলো তো।

ছন্দা হাসল। বললে, সময় পাই না, সত্যি বলছি দিদি, বোজ ভাবি আসব আসব, হয়ে ওঠে না।

বললাম, আপনাকে দেখে ভেবেছিলাম...

চোখ কপালে তুলল ছন্দা। কি ? বিগলিত অনুবোধেব কৃত্রিম স্ববে প্রশ্ন করলে, কি ভেবেছিলেন বলুন না ?

—ভেবেছিলাম...

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই সহাস্যে তাকালাম সুনন্দার মুখের দিকে। আব ছন্দা বুঝতে না পেরে একবার আমার মুখেব দিকে, একবাব সুনন্দার মুখেব দিকে তাকাল।

সুনন্দার কথা

বুলাকে আমি কম ভালবাসি না। কম ? ভাবলে হাসি পায়। আমার চেয়ে বুলাকে আর কেউ বেশি ভালবাসতে পারে নাকি ? কক্ষনো না। মায়েব স্নেহ প্রীতি ভালবাসার চেয়ে গভীর আর আন্তরিকতা আর কিছু থাকতে পারে না। আমি কেন, পৃথিবীতে কেউই তা বিশ্বাস করবে না। তবে হ্যাঁ, বুলার বাবাও বুলাকে ভালবাসে বৈকি, একটু বেশি বেশিই যেন। তাতে আমার আপত্তি করবার কি আছে, সেটাও তো স্বাভাবিক।

কিন্তু, হঠাৎ এক একদিন এক এক সময় আমাব কেমন যেন হিংসে হয়। হিংসে ? বুলার বাবা অবশ্য তা বলে, আর তা শুনে আমাব হাসি পায়। হাসি পাবারই তো কথা। বুলাকে আমি হিংসে করি ? কি অদ্ভুত সাব ধারণা ওর—আমাব স্বামীব।

না। হিংসে বলা যায় না। বরং বুলার বাবা যে বুলাকে এত ভালবাসে, তা আমার ভালই লাগে। মনে হয়, ওর এই বুলাকে ভালবাসা যেন এক ধরনেব আমাকেই ভালবাসা। বুলা তো আমারই, আমারই শরীরের রক্ত মাংস দিয়ে গড়া। বিয়ের পর আমি যখন ওর টেবিলের ঢাকা দেবার জন্যে দোসুতি কাপড় কিনে চার কোণে ফুল তুলে দিয়েছিলাম, তখন সেটা দেখে ও যখন খুশি হয়েছিল, বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিযে প্রশংসার চোখে দেখেছিল, তখন যেমন ভাল লেগেছিল আমার, মনে হয়েছিল আমাব হাতের নক্সাটা ভাল লাগা মানে আমাকে ভাল লাগা, এও তেমনি। কিংবা তার চেয়েও বেশি।

কিন্তু, কিন্তু বুলা এত তাড়াতাড়ি না এলেই যেন খুশি হতাম। তাই কি ? না। প্রথম প্রথম অবশ্য তাই মনে হয়েছিল, কিন্তু বুলা যখন সত্যি সত্যি এল...

বিয়ের দিনটা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। কোন মেয়ের না মনে থাকে ! সকলেরই। পুরুষদের কথা জানি না, মেয়েদের মনে ঐ দিনটার ছবি সারা জীবন বেঁচে থাকে। আমার অন্তত তাই মনে হয়।

সত্যি কি ভয় যে হচ্ছিল। আবার কি এক আনন্দ। বেশ মজা লাগছিল। সারা বাড়ি তোলপাড়, আত্মীয়-স্বজনরা আসছে, কৌতুকের চোখে দেখছে আমাকে, কথা বলছে, বাইরে বাবা-দাদাদের চিৎকার-হট্টগোল—সারা পৃথিবীটা যেন আমার জন্যে ব্যস্ত।

আমি তখন অবধি ওকে দেখিনি। একটা ছবিও না। কি করে দেখব! আজকালকার মেয়েদের মত স্বয়ম্বরা তো হইনি, বাবা-মা পাত্র পছন্দ করে বিয়ে দিয়েছিল।

বরপক্ষ থেকে বিয়ের চিঠি এসেছিল একটা, যেমন আমাদের বাড়ি থেকেও পাত্রপক্ষের বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল। দুটো চিঠিতেই নাম ছাপা ছিল শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর সেনের পুত্র শ্রীমান কমলেশের সহিত···

শ্রীমান কমলেশ নামটুকুর মধ্যেই আমি অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম। কোন চেহারার বর্ণনা নেই, কত মাইনে, কি চাকরি স্পষ্ট করে তখনও শুনিনি, বিদ্যে বা বয়স—গোঁফ আছে না নেই, চোখে চশমা—এসব কিছুই জানতাম না। যেটুকু জানতাম সবই ভাসা ভাসা। তবু মনে মনে একটা অস্পষ্ট চেহারা গড়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু কল্পনার সে-মানুষটা আমার মনে তখন এতই অস্পষ্ট যে তার নাকের নীচে পুরু গোঁফ আছে কিনা, কিংবা চোখে পুরু চশমা—ফর্সা না কালো, লম্বা না বেঁটে—এসব কোন কিছুই ভাবিনি! শুধু মনে হয়েছিল, যে আসছে সে একজন রক্তমাংসের পুরুষ মানুষ—যে ভালবাসবে এবং ভালবাসা পেতে চাইবে।

বিয়ের কথা পাকা হওয়ার পর দু-একবার যে অরুণদার কথা মনে পড়েনি এমন নয়। মনে পড়বারই কথা। কারণ, আমার কেমন ধারণা হয়েছিল অরুণদার সঙ্গে আমার বিয়ে না হলেও এমন কারও সঙ্গে বিয়ে হবে যে অনেকটা অরুণদার মত।

কিন্তু শ্রীমান কমলেশ নামটা শুনে (এবং দেখে) অবধি আমার মন বলতে শুরু করলে, এ লোকটা—এ ভদ্রলোক অরুণদার চেয়েও অনেক ভাল।

অরুণদাও ভাল ছিল, তবু এতটা ভালমানুষি আমার পছন্দ হত না। রোজ সকালে অরুণদা যখন সাইকেলে করে কলেজে যেত, আমার সঙ্গে চোখোচোখি হত। তখন একবারও কি তার মনে হত না যে আমি রোজ রোজ অকারণে এসে এ-সময়টায় জানলায় দাঁড়াই কেন? ভেতরে ভেতরে আমি তাই অরুণদার বিরুদ্ধে একটু রাগ পুষে রেখেছিলাম।

কিন্তু, আশ্চর্য, বিয়ের দিনটা যত ঘনিয়ে আসতে শুরু করল, অরুণদাকে আমি ততই ভুলে গেলাম একেবারে। তখন শুধু কমলেশ আর কমলেশ।

বিয়ের রাতটায় আমার বিষম ভয় লাগছিল! বুক দুরদুর করছিল। কি জানি কেমন হবে নতুন মানুষটা, শ্বশুর-শাশুড়ি—অন্য সবাই। শুধু কি তাই? না। অজানা একটা পৃথিবীতে চলেছি, নতুন জীবনে···ভয়-আশঙ্কা থাকবে না? কিন্তু তারই ফাঁকে আবাব আনন্দও ছিল। আমার মাসতুতো বোন শিউলি, দিদির ননদ বেলা, পাড়ার বন্ধু মিতা—ওদের দিকে তাকিয়ে কেমন একটা গর্বও হচ্ছিল। ওরা সবাই আমার চেয়ে দু-এক বছরের বড়, অথচ আমারই কিনা আগে বিয়ে হচ্ছে—গর্ব হবে না কেন।

তারপর সেই বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসলাম। বেলা শিউলিরা কি দেখে কে জানে, খিলখিল করে হেসে উঠল। মিতা ফিস ফিস করে আমার কানে কানে কি যে বলল বুঝতেই পারলাম না।

মন্ত্র শুনছি, মন্ত্র পড়ছি, ঘাড় হেঁট করে সামনের মাটির ঘটটার দিকে চোখ বেঁধে।

শাঁখ বাজল, উলু দিল দু-একজন।

বুঝতে পারলাম শ্রীমান কমলেশ আসছে, এসে বসেছে পিঁড়িতে।

আমি মাথা নিচু করে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে বসেছিলাম। তারই ফাঁকে একবার একটুখানি মাথা তুলে আড়চোখে দেখে নিলাম। বাঃ রে, ভদ্রলোক তো বেশ দেখতে। আমি যেমন যেমন ভেবেছিলাম তেমন নয়। তবু বেশ ভাল লাগল। মনে মনে খুশি হয়ে উঠলাম।

আরও ভাল করে দেখতে পেলাম শুভদৃষ্টির সময়। দিব্যি মুচকি মুচকি হাসছে।

নির্লজ্জ ! ওর ঐ হাসিটা বোধ হয় শিউলি আর মিতা দেখেছিল, তাই বাসরে যাবার সময় কানের কাছে ফিস ফিস করে একজন বললে, তোর বরটা ভাই লাভলি । আর একজন বললে, বেশ জলি রে ।

তখন আশেপাশে গুরুজনরা রয়েছেন, জেঠিমা জলছড়া দিয়ে নিয়ে চলেছেন, তাই কিছু বলতে পারলাম না ।

বাসরে ঢুকেই শিউলিকে জড়িয়ে ধরে ফিস ফিস করে বললাম, তোর লোভ হচ্ছে বুঝি ?

শিউলি হেসে গড়িয়ে পড়ল । আর মিতা কানের কাছে মুখ এনে বললে, লোভ হলেও কি ছেড়ে দিবি আমাদের ।

কমলেশ তখন পাশবালিশে হেলান দিয়ে খাটে গিয়ে বসেছে ।

আমি তার দিকে একচোখ তাকিয়ে নিয়ে মিতাকে বললাম, ছেড়ে তো দিয়েছি, যা-না এতই যদি ইচ্ছে ।

সত্যি সত্যিই ওরা সব গিয়ে কমলেশকে ঘিরে বসল । আর আমি দেখলাম, কমলেশ লাজুক লাজুক চোখ তুলে ওদের কথার জবাব দিচ্ছে, আর ফাঁকে ফাঁকে আমার দিকে তাকাচ্ছে ।

আমার এত হাসি পাচ্ছিল !

কনকাঞ্জলির সময় বাবার হাতে চাল আর টাকা দিয়ে যখন পরের দিন সকালে বলতে হল, বাবা তোমার সব ঋণ শোধ করলাম, তখন কিন্তু আমার সব আনন্দ উবে গেছে । এমন একটা কথা কেন যে বলতে বাধ্য করে । এ-কথা কি বলা যায় ! নাকি সত্যি কেউ মা-বাবার ঋণ শোধ করতে পারে ।

মা-বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কেঁদে উঠলাম । সারা রাস্তা কিভাবে যে এসেছি কিছু মনে নেই ! বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি চলেছি, কোথায় মনটা খুশিতে ভরে উঠবে, তা নয় শুধু কান্না আর কান্না । বুকের ভেতর কি এক অসহ্য কষ্ট !

ছোটবেলা থেকে এই দিনটার কত স্বপ্নই না আমরা দেখি, কত রঙিন কল্পনা ঘিরে থাকে কৈশোর-যৌবনের দিনগুলিকে । কিন্তু দিনটা সত্যিই যেদিন এল আমার জীবনে, তখন আনন্দের চেয়ে ভয় আর দুঃখটাই যেন বেশি করে অনুভব করলাম । বাবা মাকে ছেড়ে চলেছি বলে, ভাই বোনেদের ছেড়ে চলেছি বলে, এমনকি ঐ বাড়িটাব নিষেধের বেড়া-দেয়া অন্ধকার আর অতি পরিচিত পরিবেশ, এমনকি ঐ পুরনো মাদুরটা—যেটা পেড়ে শুতাম কোন কোনদিন দুপুরে, ঐ কাঁসার থালাটা—যেটায় ভাত খেতাম দু-বেলা, ঘাম আর তেলের চেনা গন্ধের আমেজ যে বালিশটায়—সব কিছুকেই ছেড়ে যেতে কষ্ট ; কিংবা ঠিক কষ্ট নয়, শুধু একটা অস্পষ্ট অনুভূতি—যেন এসব ছেড়ে যেতে না হলেই ভাল হত ।

শ্বশুরবাড়ির কাছকাছি যখন গাড়িটা এসে পৌঁছেছে, তখন চোখের জল শুকিয়ে গেছে, কিন্তু বুক দুরদুর করছে ভয়ে । কি হয় কি হয়, একটা আতঙ্ক ।

স্বামী পাশেই বসেছিল, হঠাৎ সে আমার হাতটা চেপে ধরল ! আমি থর থর করে কেঁপে উঠলাম ।

ও বললে, ভয় কিসের, আমি তো আছি ।

কি আশ্চর্য, ও কি করে বুঝল, কি করে বুঝল আমি ভয় পেয়েছি । আমি তো আছি এই ছোট্ট সান্ত্বনাটুকুর মধ্যে আমি এতখানি ভরসা পাব ।

সত্যি, যে-মানুষটাকে গতকাল দুপুর অবধি দেখিনি, যাকে চিনতাম না জানতাম না, এখনও কি ছাই জেনেছি, চিনেছি—তবু তার এই একটা সামান্য কথায় আমার বুকের ভার সরে গেল মুহূর্তের মধ্যে । আমি ধীরে ধীরে মাথা তুললাম, চোখ তুললাম, ওর দিকে একটি মুহূর্তের জন্যে তাকালাম কৃতজ্ঞতার চোখে, তারপর চোখ নামিয়ে নিলাম ।

সারাটা দিন একটা নেশার ঘোরে কেটে গেল।

স্ত্রী-আচার। হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ। নীতু মেয়েটা এক হাত বেণীতে রেখে আরেক হাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে সে কি আনন্দ আহ্লাদ। কেবল 'মামীমা' 'মামীমা'।

একটা নতুন নাম, যে নামে কেউ কোনদিন আমাকে ডাকেনি। বেশ মজা লাগছিল আমার, আবার কেমন লজ্জা আর অস্বস্তিও।

দুপুরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সন্ধের আগে কে যেন উঠিয়ে দিল। সাজগোজের ধুম পড়ে গেল।

দেখলাম, এর মধ্যেই নীতু মেয়েটা গা ধুয়ে নতুন একটা সিল্কের শাড়ি পরে নিয়েছে, মুখে পাউডার দিয়েছে, রুজ লাগিয়েছে গালে, আর চোখে কাজল, নখে নেল-পালিশ।প্রথম যখন ওকে দেখলাম এ-বাড়িতে এসে, ও তখন একটা ফ্রক পরে ছিল, কিন্তু সিল্কের শাড়িতে ওকে এত সুন্দর লাগল।

ও বললে, ওঠো মামীমা, তাড়াতাড়ি গা ধুয়ে আসবে চলো, আর তো দেরি নেই, লোকজন আসতে শুরু করবে!

পাশের ঘর থেকে, ছাদ থেকে নানারকম হট্টগোল চিৎকার ভেসে আসছে তখন। বোধ হয় রসুইকররা গোলমাল করছিল।

আর কমলেশের ঠাকুরদা চিৎকার করে কি যেন বলছিলেন। হঠাৎ তিনি পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, নাতবৌ ঘুম থেকে উঠেছে রে?

নীতু জবাব দিলে চিৎকার করেই।—উঠেছে গো বড়দাদু, উঠেছে।

পরক্ষণেই চটির শব্দ পেলাম, আসছেন বোধ হয় এদিকেই।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। চটি চট চট করে এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। সকালে ওঁকে প্রণাম করেছিলাম বটে, কিন্তু ভাল করে চোখ তুলে দেখতে পারিনি লজ্জায়। এখন দেখলাম। মাথার চুলগুলো সব সাদা, একমুঠো রেশমের সাদা সুতোর মত। গাল দুটো বসে গেছে বয়সের ভারে, হাতের শিরাগুলো নীল আর ফোলা ফোলা, মুখে দাঁত নেই। কিন্তু চোখ দুটো খুব মিষ্টি লাগল, খুব আপন মনে হল।

দাদাশ্বশুর তোমার। নীতু বলে দিল, যেন আমি চিনতে পারতাম না! এত বোকা মেয়েটা।

দাদাশ্বশুর একমুখ ফোকলা হাসি হেসে ঠাট্টা করলেন!—কি এত স্বপ্ন দেখছিলে নাতবৌ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে?

দিদিশাশুড়িও এসে দাঁড়ালেন, হাসলেন, তারপর লজ্জায় মুখ ফেরালেন। ফিসফিস করে বললেন, মরণ! মুখে লাগাম নেই গো!

দাদাশ্বশুর হারবার পাত্র নন। বললেন, ঘোড়া নাকি আমি, যে মুখে লাগাম থাকবে।

কথা শুনে এত লজ্জার মধ্যেও আমি খিলখিল করে হেসে উঠলাম। আর দাদাশ্বশুর বলে উঠলেন, বা! বা! নাতবৌয়ের হাসিটি তো বেশ সুন্দর!

দিদিশাশুড়িও হাসলেন, তারপর বললেন, খুব হয়েছে, এখন যাও তো। নাতবৌয়ের সঙ্গে ভাবসাব করবার এখন সারাজীবন পড়ে রয়েছে, এখন গা ধুয়ে আসুক ও, সাজগোজ করতে হবে না!

নীতু হাত ধরে টানল, চলো, মামীমা চলো। ওর পিছনে পিছনে দু-পা এগোতেই শুনলাম দাদাশ্বশুর বলছেন, সারাজীবন তোমার নাতবৌয়ের পড়ে রয়েছে বটে, কিন্তু আমার যে জীবনই সারা হয়ে গেল, আর কটা দিন?

দিদিশাশুড়ি উত্তর দিলেন, বটে বটে, আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে পালাতে দেব না। সে মনে রেখো!

আমি ততক্ষণে কলঘরের দিকে চলে এসেছি। আমার মনটা তখন খুশিতে ভরে উঠেছে। দুটো বুড়ো-বুড়ির প্রাণখোলা কথা আমাকে যেন মুহূর্তের মধ্যে আপনজন করে নিল। আমি হাসি-হাসি মুখে কলঘরের দরজাটা সবে বন্ধ করতে যাচ্ছি, দেখি কি ছাদের আলসেতে দাঁড়িয়ে কমলেশ আমার দিকে ঠায় তাকিয়ে আছে, আর মুচকি মুচকি হাসছে।

এর আগেও দুপুরের দিকে বারকয়েক দেখেছি কমলেশ কেবলই ঘুর ঘুর করছে। অর্থাৎ ও একটু নির্জনতা খুঁজছে, একটু ফাঁক পেয়ে দু-চারটে কথা, দু-এক টুকরো হাসি।

কিন্তু ও যে কিছুতেই সুযোগ পাচ্ছিল না, ভেতরে ভেতরে চটছিল, তা দেখে আমার খুব মজা লাগছিল।

গা ধুয়ে আসতেই অনেকগুলো মেয়ে একসঙ্গে আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে ঢুকল। যত না কথা বলে মেয়েগুলো, তত হাসি। এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে। ওদের মধ্যে শুধু নীতুকেই চিনি, আর বাকিগুলোর মধ্যে দু-একজনের মুখটা চেনা-চেনা লাগল। সকালের দিকে দেখেছি হয়তো। কিন্তু কার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক কিছুতেই ঠিক করতে পারলাম না। এমনকি তারা আমার নতুন আত্মীয় গোষ্ঠীব কেউ, না পাড়াপড়শিদের মেয়ে, তাও বুঝতে পারছিলাম না। কেউ বৌদি বলে, কেউ মামীমা বলে, কেউ বা কাকীমা। আর সবাই প্রায় আমার সমবয়সী। দু-চার বছর এদিক ওদিক বড়ো জোর।

ওরা সবাই লুটোপুটি করে আমাকে সাজাতে লাগল। বেনাবসী, জড়োয়া গয়না, ফুলের সাজ। চন্দন, কুঙ্কুম, আলতা। আরও কত কি।

আমার কি ভাল যে লাগছিল। যেন আমি ছাড়া পথিবীতে আর কেউ নেই। সব কিছু আজ আমাকে ঘিরেই।

হঠাৎ এক ফাঁকে দরজায় টোকা পড়ল। আমার শাশুড়ির গলা শুনতে পেলাম —খোল রে একটু দরজাটা, কি কবছিস দেখি!

কে একজন আমার গায়ে শাড়িটা আলতো ভাবেজড়িয়ে দিয়ে গিয়ে কপাট খুলে দিল। আর আমি লজ্জা লজ্জা চোখ তুলে শাশুড়ির দিকে তাকালাম।

হাসি-হাসি মুখে তৃপ্তি ফুটে উঠল তাঁব। একদৃষ্টে আমার মুখেব দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোদের মত অত সাজগোজ দবকার হয না বৌমার আমার, এমনিতেই সুন্দরী!

বলেই বেরিয়ে গেলেন তিনি নিজের বসিকতায় নিজেই হেসে উঠে। আর নীতু ছুটে গিয়ে কপাটটা বন্ধ করে দিল।

ওদিকে জানালার পাশে সরে গিযে দাঁড়িয়েছে রমলা। হ্যাঁ, রমলাই তো নাম ওর, কে যেন তখন ওকে ঐ নামে ডাকল।

রমলা খুব সুন্দর নয়, কিন্তু প্রথম থেকেই ওর দিকে আমার চোখ যাচ্ছিল। বেশ লম্বা দোহারা চেহারা, ওর সারা শরীরে কি যেন অদ্ভুত একটা মোহ জড়ানো আছে। ওকেই কি যৌবন বলে? হবে হয়তো।

ওকে লক্ষ করেই কে যেন বলল, সত্যি রমলাদি, বৌদি কিন্তু খুব সুন্দরী, না?

আমি মাথা না তুলে শুধু আড়চোখে তাকালাম রমলার মুখের দিকে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার চোখে পড়ল, প্রশ্নের উত্তরে বমলা নাক সিঁটকে ঠোঁট উল্টে এমন একটা তাচ্ছিল্য দেখাল যার অর্থ ছাই সুন্দর!

আমার বুকের ভেতর অবধি কেঁপে উঠল। আমি হঠাৎ কেন জানি না, ভয় পেলাম। কেমন দুর্বোধ্য লাগল ওর ব্যবহারটা।

না, আমাকে সুন্দরী বলে স্বীকার করল না বলেই যে আমি অপমানিত বোধ করলাম, বা লজ্জিত হলাম, তা নয়। অকারণেই কেমন যেন বুকটা দুলে উঠল আমার।

কিন্তু পরক্ষণেই আমি রমলাকে ভুলে গেলাম। আমাকে ওরা সবাই মিলে টানতে টানতে

পাশের ঘরে নিয়ে গেল।

—মাসীমা মাসীমা। ওরা আমার শাশুড়িকে ডাকতে শুরু করলে।—দেখে যান, আপনার বৌমাকে সাজানো হয়েছে কিনা ঠিকমত।

শাশুড়ি এসে আমার চিবুকে হাত ঠেকিয়ে হাতটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুমু খেলেন। আমার খুব ভাল লাগল। খুব আনন্দ হল। মনে হল, এ বাড়িতে আর কেউ বোধ হয় এত ভালবাসে না আমাকে!

আমি শাশুড়ির পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম।

তিনি আমার পিঠে হাত রাখলেন আদরে, বললেন, তুমি এখন এই পাখার তলায় বসে থাকো বৌমা। ও ঘরে পরে গিয়ে বসবে।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম, আর অস্ফুটে আমার গলা থেকে বের হল—মা!

কি আশ্চর্য, কত অস্বস্তি ছিল মনের মধ্যে, শাশুড়িকে কি করে 'মা' বলব, শ্বশুরকে 'বাবা'। মাসতুতো বোনরা কত হাসি-ঠাট্টা করেছে তা নিয়ে, বিয়ের আগের দিনও। অথচ কত সহজে মুখ থেকে 'মা' ডাকটা বের হল, কত স্বাভাবিক ভাবে। যেন এই প্রথম নয়, বহুকাল থেকেই যেন এ-নামে ডাকতে অভ্যস্ত আমি।

মা সোহাগের স্বরে প্রশ্ন করলেন, কি বৌমা ; কিছু বলবে আমায় ?

বললাম, বিজুকে, আমার ভাইকে তো দেখছি না।

—ও মা, তাই তো! কোথায় সে ? বিকেলে জল খেতে দিয়ে এলাম, বলে এলাম দিদির সঙ্গে দেখা করে এস, আসেনি ?

বলে হাসতে হাসতে নিজেই ছুটলেন।

একটু পরে বিজুকে নিয়ে এসে আমার পাশে বসিয়ে দিলেন, বললেন, বসো এখানে, দিদির সঙ্গে গল্প করো।

কিন্তু গল্প করো বললেই কি গল্প করা যায়। এতগুলো অপরিচিত মেয়ে ঘিরে আছে আমাকে, তা দেখে বিজুর মুখ দিয়ে কথাই বের হল না।

তারপর এক সময় ওরা যখন সরে গেল, বিজু ফিসফিস করে বললে, দিদি।

—কি রে ?

—জামাইবাবুরা খুব বড়লোক, না।

আমি হেসে ফেললাম। এটুকু ছেলে বিজু, ওর দোষ কি। গরিব বাপেব মেয়ে আমি। তিনশো টাকা মাইনেতে এত বড় সংসারটা চালিয়ে এসেছে বাবা, তাই একটু ভাল অবস্থার লোককে বিজু যে বড়লোক ভাববে সে তো জানা কথা।

আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম বিজুকে, ও হঠাৎ বললে, সাদা সিল্কের শাড়ি পরা ঐ মেয়েটা কে রে দিদি ? লম্বা-চওড়া চেহারা ?

বললাম, ওর নাম রমলা, কেন ?

—ও না খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কেবল আমাদের বাড়ির কথা জিগ্যেস করছিল, বাবা কি করে, কত মাইনে পায়, তুই কদ্দূর পড়াশুনো করেছিস, গান জানিস কি না···

আমি শঙ্কিত হয়ে বলে উঠলাম, তুই কি বললি ?

বিজু হেসে ফেলল।—আমি সব গুল মেরে দিয়েছি।

—সে কি রে ? আমি ভয় পেলাম।

বিজু হেসে বললে, বলেছি বাবা এক হাজার টাকা মাইনে পায়, তুই নাচগানে মেডেল পেয়েছিস···

আমি রেগে গেলাম বিজুর ওপর।—কেন তুই ওসব বলতে গেলি ?

বিজুও রেগে গেল। বললে, কেন বলব না! ও মেয়েটা এমন ভাব করল যেন

জামাইবাবুর সঙ্গে তোকে মানায় না।

বুকের মধ্যে এত আঘাত দিল কথাটা। আমি চেষ্টা করেও হেসে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। কারণ আমার নিজের মনেই তেমন একটা সন্দেহ যেন ছিল। কমলেশের চোখের মধ্যে আমি বারবার হাতছানি দেখেছি, তার স্পর্শে অস্পষ্ট একটা অন্তরঙ্গতা, তবু কেমন একটা অবোধ্য ভয় যেন আমাকে পেয়ে বসেছিল।

আমি তাই চেষ্টা করছিলাম, এদের সকলের কাছ থেকে, কমলেশের কাছ থেকে নিজেকে গোপন করে রাখতে। আমাদের বাড়ির অবস্থা, আমার বাবা কি ধাতের মানুষ, মা কেমন, এ-সব আড়াল করে রাখতে চাইছিলাম। কেবলই মনে হচ্ছিল এদের সঙ্গে আমাদের বাড়ির যেন অসংখ্য অমিল। মনে হচ্ছিল, সমস্ত পরিচয়টুকু পেলে হয়তো কমলেশ আমাকেও পছন্দ করবে না।

আমি এত আনন্দের মধ্যেও তাই ভয় পাচ্ছিলাম। মনে মনে চাইছিলাম, শুধু আমাকে নিয়েই ওরা বিচার করুক।

কিন্তু সেখানেও যে খুব ভরসা ছিল তাও নয়। বিশেষ করে ওই রমলা মেয়েটা মাঝ থেকে এসে একটা সন্দেহের কাঁটা বিঁধে দিয়ে গেল।

আমি ওর কথা কিছুতেই ভুলতে পারলাম না।

রাত্তিরে ফাজিল মেয়ে নীতু যখন হাসতে হাসতে আমাকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিল, আর আমি দেখলাম, কমলেশ একমনে কি একটা বই পড়ছে, আমার হাসি পেল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, বইটা ও শুধু খুলে রেখেছে বুকের ওপর, চোখ দুটোও হয়তো বইয়ের পাতায়, কিন্তু কান দুটো নিশ্চয় দরজার দিকে ছিল।

কমলেশ ধীরে ধীরে বললে, পরীক্ষা শেষ হয়েছে ?

পরীক্ষাই তো।

সন্ধের সময় সাজগোজ করিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা গালিচার ওপর যখন বসিয়ে দিল শাশুড়ি, তখন আমার সারা শরীরে ঘাম ঝরছে।

কমলেশ তখন একবার উঁকি মেরে দেখে হেসেছিল। আর পাড়াপড়শি সকলেই বলছিল, কি সুন্দর লাগছে ভাই তোমাকে।

নীতু বললে, দেখবে !

বলে আলমারির আয়নাটার সামনে নিয়ে গেল আমাকে। আর আমি নিজের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এত সুন্দর আমি ? ফুলে ফুলে সারা অঙ্গ এমন ভাবে সাজিয়ে দিয়েছে, যেন আমি নিজেও একটা ফুল। ভীষণ লজ্জা করছিল আমার, আবার ভীষণ ভালও লাগছিল।

মানুষের পৃথিবী থেকে আমি কিছুক্ষণের জন্যে কোন এক রূপকথার জগতে চলে গিয়েছি।

শকুন্তলার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, আশ্রমকন্যা শকুন্তলা।

কিন্তু যেই নিমন্ত্রিতেরা আসতে শুরু করল, অমনি কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল আমার। কেবলই ভয়, কে কি টিপ্পনী দিয়ে বসে, কে কি জিগ্যেস করে বসে।

দু-চারজন দুচারটে কথা প্রশ্ন করল, কি উত্তর দিলাম, আমি নিজেও জানি না। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে কেটে গেল সন্ধেটা। কে কি রসিকতা করল তাও মনে নেই, কিন্তু সে-রসিকতা শুনে আমিও হেসেছিলাম।

তাই কমলেশের প্রশ্নের জবাবে বললাম, পরীক্ষাই তো। বাব্বা, ঘাড় ব্যথা হয়ে গেছে।

—কেন ?

বললাম, তিনটি ঘণ্টা যদি ঘাড় হেঁট করে বসে থাকতে হত, আর মিনিটে মিনিটে

নমস্কার করতে হত তো…

কথাটা শেষ করতে পারলাম না। এর আগেও ঠিক এমন ভাবে এড়িয়ে এড়িয়েই দু-একটা কথা বলেছি। কমলেশও ঠিক তাই করেছে।

সারা সন্ধেটা এক একজন এক একটা উপহার এনে দিয়েছে। আর আমি কাউকে হাত দুটি জোড় করে নমস্কার করেছি, কাউকে প্রণাম করেছি শাশুড়ির নির্দেশ মেনে। দু'বারই ঘাড় হেঁট করতে হয়েছে। সে-কথাটাই জানাতে চাইলাম কমলেশকে। কিন্তু কি বলব ! মিনিটে মিনিটে নমস্কার করতে হত তো 'বুঝতেন'! না 'বুঝতে'।

'আপনি' বলায় দূরত্বটা যেনে টেনে আনতে ইচ্ছে হল না, আবার 'তুমি' বলতেও সঙ্কোচ।

আসবার সময় বৌদি বারবার করে বলে দিয়েছিল, খবদ্দার 'আপনি' বলো না যেন কমলেশকে। তা হলে দেখবে মজা. 'তুমি' বলতে পারবে না। আমি একমাস ধরে তোমার দাদাকে 'আপনি' বলেছি, জানো তো !

বৌদির উপদেশ মেনেই নয়, নিজেরও ইচ্ছে হচ্ছিল না।

কমলেশ আমার কথা শুনে বললে, একটা দিন পরীক্ষা দিয়ে যদি এত সব উপহার পেতাম—

আমার হঠাৎ খুব সাহস হয়ে গেল। বাপের বাড়িতে ফাজিল মেয়ে বলেই আমাব পরিচয়। এই কটা দিন বুঝি বা বদলে গিয়েছিলাম। কিন্তু রসিকতা করার নেশাটা আমাকে পেয়ে বসল।

বললাম, এর আগে একদিন পরীক্ষা দিযে তো এর চেয়ে বড় উপহার পেয়ে গেছি।

সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক মেয়ের খিলখিল হাসি শুনতে পেলাম দরজাব আড়ালে।

কমলেশ চট করে উঠে দরজা খুলল, আর সিঁড়িতে দুড়দাড় শব্দ শুনতে পেলাম। ছুটে পালাল বোধহয় সবাই।

কমলেশ ফিরে এসে সব দরজা জানালাগুলো বন্ধ করে দিল।

আড়ি-পাতার আশঙ্কায় আমরা ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করলাম।

শুধু একসময় জিগ্যেস করলাম. আচ্ছা, রমলা বলে ওই যে মেয়েটা, ও কে !

কমলেশ একবার আমার চোখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকালে। তাবপব বললে, কে রমলা ?

আমি রমলার রূপের বর্ণনা দিলাম. যদিও বেশ বুঝতে পারলাম এত পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই।

কমলেশ শুনে বললে, ওঃ, পাড়ারই একটা মেয়ে।

আমি ইচ্ছে করেই আসল প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলাম। বললাম, আমি নাকি এ-বাড়ির যোগ্য নই, ও বলেছে। তাই জিগ্যেস করছি।

কমলেশ হাসল তা শুনে। তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

এলোমেলো অবান্তর কথার মধ্যে দিয়ে কখন যে রাত কেটে গেছে, ভোর হয়েছে আমরা দুজনেই বুঝতে পারিনি।

ভোরের আলো ঢুকতেই চমকে উঠেছি। কি আশ্চর্য। একটা দিন ঘুমোতে বেশি রাত হলে, কিংবা ঘুম না হলে কত শরীর খারাপ হয়, ঘুমের চেষ্টা করে যখন পড়ে থাকতে হয় তখন প্রতিটি মিনিটকে মনে হয় ঘণ্টা, আর সারাটা রাত কিনা গল্প করে কেটে গেল !

অথচ এতটুকু ক্লান্তি লাগল না সকালে বিছানা ছেড়ে উঠে।

তবু অনুযোগ করে বললাম, ও মা সকাল করে দিলে একেবারে !

কমলেশ হেসে বললে, মনে রাখবার মত একটা রাত তো রইল।

বললাম, তোমার আর কি, চোখ-মুখ দেখে বাড়ির সবাই বুঝতে পারবে, আমাকেই রাগাবে।

বলে কপাট খুলে বেরিয়ে এলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

একটা নির্জন রাতের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দুজনে দুজনের এত কাছে এসে গেছি বুঝতে পারিনি। কথার ফাঁকে ফাঁকে কখন যে দূরত্ব ঘুচে গেছে, পরস্পর পরস্পরকে তুমি বলতে শুরু করেছি।

কিন্তু তার ফলে কি বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছি ! না, মুখের ভাষা মানুষকে কাছে আনে না। মনের ভাষার কথা বলেছি বলেই এত কাছে গেছি।

অথচ সে মনের ভাষা তো একবারও ভালবাসার কথা উচ্চারণ করেনি। তবে কি উপন্যাসের মানুষগুলো মানুষ নয়।

পরস্পরের কাছে আসার জন্যে তাদের এত সময় লাগে কেন, এত পাহাড় পর্বত ডিঙোতে হয় কেন !

বিছানার নক্সাকাটা সুন্দর আর দামী চাদরখানায় কে যেন সেন্টের শিশি উপুড় করে দিয়েছিল। নাকি রজনীগন্ধা আর চাঁপা ফুলেব গন্ধেই ভরে ছিল ঘরখানা। আমার খোঁপায় জড়ানো চাঁপার ছড়া, খাটের বাজুতে রজনীগন্ধা, এখানে ওখানে সুগন্ধি ফুল ছড়ানো। কিন্তু এ-সব কিছু না থাকলেও চলত, কারণ আমাদেব দুজনের চোখেই স্বপ্ন জডানো ছিল। তাই একটা রাতেই মনে হল দুজন দুজনের কত কাছে এসে গেছি। মনে হল, দুজনই দুজনের মনের কপাট খুলে দিয়েছি। একটা নেশাব মধ্যে কেটে গেল কয়েকটা দিন, কিংবা কে জানে কয়েকটা সপ্তাহ হয়তো।

আমার মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। মাকে চিঠি লিখলাম একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে। চিঠি নয়, যেন ডায়েরি লিখছি। আমার দাদাশ্বশুর কত ভাল, আমার শাশুড়ি কত আদর কবে, কোন কাজে হাত দিতে দেয় না। সেদিন জোর কবে কুটনো কুটতে বসেছি, ঠেলে উঠিয়ে দিলে, বললে ওঠো বউমা, ও সব তোমাকে করতে হবে না। আমাকে সকলেই লক্ষ্মী বলছে, ভাগ্যবতী বলছে, তোমার জামাইয়ের চাকরিতে উন্নতি হল কিনা হঠাৎ, তাই। ব্যাস্। আরো কত কথা, নীতুর কথা, পাশের বাড়ির দিদির কথা—সকলের কথাই লিখলাম। কিন্তু মায়ের জামাই ভাল আছে এটুকু খবর ছাড়া আর কিছু লিখতে পারলাম না। অথচ ইচ্ছে হচ্ছিল, মাকে জানাই যে তার জামাই খুব ভাল, আর খুব ভালবাসে আমাকে। মাকে তো আব সে-কথা লেখা যায় না।

চিঠিটা লেখা শেষ করে খামে মুড়ে জিভে ভিজিয়ে সেঁটে দিলাম, তারপর ঠিকানা লিখে সবে কমলেশের পকেটে রেখে দিয়েছি, আপিসে যাওয়ার সময় ডাকবাক্সে ফেলে দেবে বলে, সেই সময়েই রমলা এসে হাজির হল।

সেই বিয়ের দিন দেখেছিলাম ওকে, তারপর একদিন মিনিট পাঁচেকের জন্যে এসেছিল, নীতুর সঙ্গে গল্প করে চলে গিয়েছিল। তারপর আর দেখিনি।

এতদিন পরে হঠাৎ এসে হাসতে হাসতে রমলা বললে, কই বৌদি, কি করছেন ?

আমি শুধু হাসলাম। আমার মন তখন এত খুশিতে ভরে আছে যে ওকেও ভালবাসতে ইচ্ছে হল।

বললাম, এস ভাই, এতদিন যে আসোনি ?

রমলা হাসল।—আমি এলে যদি আপনার কর্তাটি বিরক্ত হয় তাই আসিনি।

—কেন, বিরক্ত হবে কেন ! আমি বিস্মিত হয়ে তাকালাম ওর মুখের দিকে।

—দাম্পত্যপ্রণয়ে বাধা পড়তে পারে তো। রমলা হাসল।

আর আমি বললাম, ফাজিল মেয়ে কোথাকার। বলে কমলেশের দিকে ফিরে তাকিয়ে—হ্যাঁ, ফিরে তাকিয়ে ওর চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন অবোধ্য লাগল। রমলার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল কমলেশ। কিন্তু সেই ক্রোধ যেন রহস্যময়।

তবু হেসে উঠলাম। নিজের মনকে বোঝালাম ও কিছু নয়, নিজের মনের ভুল।

কিন্তু মনের মধ্যে একটা খটকা রয়েই গেল।

তখন কলেজে পড়ত রমলা। রোজ সকালেও যখন কলেজ যেত তার অনেক আগেই আপিসে বেরিয়ে যেত কমলেশ।

তবু কলেজ যাওয়ার পথে ও বাড়ির সামনে দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে জোরে কথা বলতে বলতে যেত, অকারণে চিৎকার করে ডাকত কাউকে, কোনদিন বা আমার সঙ্গে চোখোচোখি হলে কিছু একটা জিগ্যেস করত, তারপর : কমলদা চলে গেছে বুঝি ? তাই একা একা, না ?

প্রশ্নটার মধ্যে একটা রসিকতা লুকিয়ে থাকত, তবু আমার মনে হত ও যে এ-বাড়ির দিকে তাকায়, কমলদা চলে গেছে কিনা প্রশ্ন করে, এ-সব মোটেই অকারণ নয়।

কিন্তু সত্যিই কি রমলার ওই ব্যবহারে আমি সন্দিগ্ধ হতাম ? কাঁটার মত খচখচ করে লাগত বুকে ?

না। সমস্ত সন্দেহ, সমস্ত ভয় আমি হেসে উড়িয়ে দিতাম। কারণ তখন আমার মনের মধ্যে একটা খুশির সুর বেজেছে। স্বামীর ভালবাসা, বিশেষ করে নতুন বউয়ের চোখে—কি যে মোহ ছড়ায়! একটা নেশার মধ্যে যেন দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল।

আর কমলেশ ? হ্যাঁ, ওর মনেও একটা খুশির রেশ ঢেউ তুলত থেকে থেকে। বেশ বুঝতে পারতাম।

শুধু একটা অস্বস্তি। শ্বশুর-শাশুড়ি, নীতু, অন্য সবাই সারাটা দিন আমাকে নিয়ে মেতে থাকত। উঠতে বসতে তাদের এত আদর, যত্ন,—ভালবাসা—তবু আমি ভেতরে ভেতরে বিরক্ত বোধ করতাম। মনে হত কমলেশের সঙ্গে একান্তে বসে যে দু-দণ্ড গল্প করব তার সুযোগ দেয় না কেন!

এই নিয়ে ওর সঙ্গে রীতিমত খিটিমিটি লেগে থাকত।

ও চাইত, আপিস থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর কাছে ছুটে যাব। ইচ্ছে কি আমারই হত না ?

কিন্তু চক্ষুলজ্জা বলে তো একটা কথা আছে। অন্য সকলে কি ভাববে তা হলে ? আর ওই ডেঁপো মেয়েটা, নীতু—ও তো সকলের সামনেই ঠাট্টা করে বসত।—বাবা বাবা, টুনুমামা এলেই মামীমার আর টিকি দেখা যায় না।

হেসে বলতাম, আমি কি টোলের বামুন নাকি ? টিকি থাকবে কেন আমার ?

কিন্তু নীতুকে যত সহজে জবাব দিতে পারতাম, অন্যদের বেলায় অত সহজ ছিল না।

এমনিতেই তো সুযোগ থাকলেও লজ্জায় আমি বড়োএকটা কমলেশের কাছে যেতে চাইতাম না। তার ওপর আবার পাঁচজনের টিটকারি।

কমলেশ কিন্তু অতশত বুঝত না। ও রেগে যেত আমার ওপর। বলত, এতক্ষণে সময় হল ? আর আমি সেই আপিস থেকে এসে চুপচাপ বসে আছি।

বলতাম, কি করব বলো, ওরা যে ছাড়তে চায় না, এলেই যা তা বলে।

—বলুকগে। ওদের কথায় এত কান দেওয়ার দরকার কি তোমার ?

বাঃ রে, ওদের কথায় কান দেব না তো কি, দিন রাত কমলেশের কাছে এসে বসে থাকব। আসতে কি আমারই ইচ্ছে হত না ? কিন্তু উপায় কি। পাঁচজনের সংসারে থাকতে হলে পাঁচজনের সঙ্গে মিলে-মিশেই তো থাকতে হবে।

কমলেশ কিন্তু রেগে গিয়ে কটা দিন অনেক রাত করে ফিরতে শুরু করলে।

অনুযোগ করলাম একদিন ।—তুমি কি বলো তো, সারাটা দিন একা একা থাকা যায় ! কি করো এতক্ষণ পর্যন্ত ?

—কি আর করব, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিই । কমলেশ উত্তর দিল ।

—তোমার তো বন্ধু-বান্ধব আছে, আমার ?

—সংসার আছে তোমার । এত লোকজন, আমার কাছেই তো আসার সময় পাও না ।

বুঝলাম ও রাগ করেই এত দেরিতে ফেরে । কি করে বোঝাব ওকে যে, কাছে যেতে পাই বা না পাই, ও বাড়িতে থাকলেই মনে হয় কাছে আছে, একই ছাদের নীচে, ও আমার কথা শুনতে পায়, আমি ওর । মাঝখানে যতগুলো দেয়ালই থাক, এই উপস্থিতিটুকুই কি কম আনন্দের নাকি !

কোন-কোনদিন কমলেশ হঠাৎ বলে বসত, চলো আজ একটা সিনেমা দেখে আসি ।

—মাকে বলো তুমি । আমি বলতাম ওকে । কিংবা পরামর্শ দিতাম, নীতুর জন্যও একটা টিকিট কেটো ।

নিজে মাকে বলতে লজ্জা পেত ও, আর তাই সব দায়দায়িত্ব চাপাতে চাইত আমার ওপর ।

মা, অর্থাৎ আমার শাশুড়ি অবশ্য মাঝে মাঝে নিজেই বলতেন ওকে, যা বৌমাকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আয় না, বেচারা হাঁপিয়ে উঠছে এই ঘরের মধ্যে ।

কোনদিন বা বলতেন, হ্যাঁ রে তোদের কি সিনেমা-টিনেমাও দেখতে ইচ্ছে করে না ।

আশ্চর্য, কমলেশ নিজে যে এত সাধাসাধি করে । এদিকে মা নিজে থেকে বললেই দেখতাম ও কেমন তাচ্ছিল্য দেখিয়ে জবাব দিত, যেন বাইরে বেড়াতে বা সিনেমা দেখতে ওর একটুও ইচ্ছে হয় না । এমনি করেই দিনগুলো কেটে চলেছিল ।

হঠাৎ একদিন শুনলাম, ওরা সবাই নাকি এখান থেকে চলে যাবে । আমি জানতাম না, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদাশ্বশুর, নীতু এরা কেউই এখানে এ-বাড়িতে থাকে না । আমার ধারণাই ছিল না, কমলেশ আর আমি—এ-বাড়িতে আমরা শুধু দুজনই থাকব ।

শাশুড়িই একদিন বললেন, এবার ঘর সংসার চাবিকাটি তোমার হাতে নিয়ে নাও বৌমা, আমার আর কদিন ?

—কেন ? কোথায় যাবেন আপনারা ?

—চাকরি নেই নাকি তোমার শ্বশুরের ? যেতে হবে না ?

—কোথায় ? আপনারা থাকবেন না এখানে ? আমি সত্যি খুব বিস্মিত হয়েছিলাম ।

মা বললেন, আসব বই কি, মাঝে মাঝে আসি বলেই তো খোকা বাসা রেখেছে । কিন্তু থাকা তো চলবে না মা ।

কি আশ্চর্য, এতদিন অমার মনের মধ্যেও একটা অভিযোগ ছিল ওঁদের বিরুদ্ধে । মনে হত, ওঁরা যদি এখানে না থাকতেন, আমি আর কমলেশ কত ফুর্তিতেই না দিনগুলো কাটাতে পারতাম । কিন্তু কথাটা শুনে অবধি আমার মন খারাপ হয়ে গেল । কেমন ভয় ভয় করতে লাগল ।

একা থাকতে হবে । একা থাকা যে কি তা তো জানতাম না, কখনওই তো একা থাকিনি । তা ছাড়া শ্বশুর শাশুড়ি ছিলেন বলেই অনেক কিছু ভাবতে হয়নি ।

সত্যি সত্যি ওঁরা যেদিন চলে গেলেন আমার এত মন খারাপ হয়ে গেল, ভাল করে কথাও বলতে পারলাম না কারও সঙ্গে । আমি কেঁদে ফেললাম ।

মা আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, ছিঃ, কাঁদে না, আমরা তো আবার আসব ।

নীতুও কাঁদল আমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে ।

দেখো মজা, দুদিন আগেও যাদের চিনতাম না, কোন সম্পর্কই ছিল না, তারাও কত

আপন হয়ে উঠেছে। নিজের মাকে ছেড়ে আসতে যেমন কষ্ট হয়েছিল তেমন কষ্ট অবশ্য আর কারও জন্যে হয় না। কিন্তু কমলেশের মার মুখের দিকে তাকিয়েও মনে হল যেন আমার নিজের মা।

ওরা আমাকে কাঁদিয়ে চলে গেল।

তারপর, তার পর মনে হল সমস্ত বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করছে।

একা, একা, একা।

ঝি-টার সঙ্গে গল্প করে করে কি ভাবে যে সারাটা দিন কাটত। আর কমলেশ না ফিরে আসা পর্যন্ত কিছুতেই শান্তি পেতাম না। সব সময়েই কেমন একটা আতঙ্ক।

কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলাম। এত দিন মনে হয়েছে আমার আর কমলেশের মাঝখানে কোন পাঁচিল না থাকলেই বুঝি অনেক সুখ। অথচ, সকলে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুজনেও যেন পরস্পর থেকে সরে এলাম। এত কাছে থেকেও এত দূর মনে হল।

ভাল লাগত মাঝে মাঝে যখন রমলা আসত।

হেসে, হুটোপুটি করে, হাসিয়ে ও আমাদের পরস্পরকে যেন কাছে এনে দিত। কমলেশের চেয়ে আমার সঙ্গেই বেশি গল্প করত।

—বৌদি, একটা সিনেমা দেখান আজ। হঠাৎ কোনদিন এসে বলত।

রাজি হতাম, চলো না।

—বলুন ওঁকে। বলে চাপা হাসিতে ইশারায় কমলেশকে দেখিয়ে দিত।

—বেশ তো. চলো না।সিনেমা দেখবে সে আর বেশি কথা কি! বলে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যেত কমলেশ।

আর আমি মনে মনে হাসতাম। বেশ মানুষ! আমি যখনই বলি, তখন ওঁর কত কাজ, সময় নেই, কিংবা ভাল লাগে না সিনেমা দেখতে। অথচ রমলার মুখ থেকে কথাটা খসতে না খসতেই রাজি।

সন্দেহ যে একটু না ছিল তা নয়, তবু ওটাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে ইচ্ছে হত না। ভাবতাম, আমার মনের ভুল।

কোন কোনদিন ওরা অত্যন্ত সাধারণ কথাও এমনভাবে বলাবলি করত আমার মনে হত কিছু একটা নিগূঢ় অর্থ আছে তার। আবার রমলার হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে ওর কপালে যখন সিঁদুরের টিপ এঁকে দিত আমার সামনেই, কিংবা তার খোঁপার কাঁটা খুলে নিত রমলাকে জানতে না দিয়ে, তখন আমি ব্যাপারটাকে ছেলেমানুষি মনে করতাম।

কিন্তু হঠাৎ এমন একটা ব্যাপার যে আমার চোখে পড়বে ভাবতে পারিনি।

সন্ধে হয়ে গেছে তখন, রাস্তার আলো জ্বলছে। দু-চারবার বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে দেখলাম গলিটা। না, কমলেশ তখনও ফেরেনি।

নিজের মনেই কি করছিলাম। হঠাৎ মনে হল কার জুতোর শব্দ শুনলাম।

নীচে গেলাম তাড়াতাড়ি, কপাট খোলা আছে, কেউ ঢুকে পড়েনি তো?

আবছা অন্ধকার বারান্দা। আমি ছুটে যেতেই মনে হল দুটো ছায়াশরীর পরস্পর থেকে দূরে সরে গেল। চিনতে পারলাম।

কমলেশ আর রমলা।

রমলা হেসে উঠে কমলেশকে বললে, রাতকানা নাকি? দেখতে পান না। উঃ মাথায় যা লেগেছে…

কমলেশ হাসল, তুমিই বা এত ছুটতে ছুটতে আসছিলে কেন? একে অন্ধকার…

আমি একটাও কথা বললাম না। যেমন দ্রুত পায়ে নীচে নেমে গিয়েছিলাম, তেমনি দ্রুত

পায়ে ওপরে উঠে গেলাম। তারপর দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইলাম বিছানার ওপর।

তখন আমার বুকের মধ্যে যেনএকটা ঝড় বইছে। রাগে সর্ব শরীর জ্বলে যাচ্ছে। কচি খুকি ভেবেছে নাকি এরা আমাকে?

কিছুক্ষণ পরেই কমলেশ এসে আমার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল।

প্রথমটা সাড়া দিলাম না। তারপর বললাম, বিরক্ত কোর না।

কমলেশ বললে, আরে, কাপড়টা দাও। কাপড় ছাড়তে হবে তো।

আমি দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে চলে গেলাম। আর একটু পরেই রমলাও গিয়ে জুটল ছাদে।

আজেবাজে অনেক কথা বলল ও, আমি উত্তর দিলাম না। এক সময় রমলা চলে গেল।

আমার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কি কষ্ট যে হল। মনের ভুল বলে বার বার উড়িয়ে দিতে চেয়েছি, অথচ···

আমি একটা কথা তখনও মুখ ফুটে বলতে পারিনি কমলেশকে। কদিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম বলতে। লজ্জায় বলতে পারিনি। বলব বলব করেও কটা মাস পার হয়ে গেছে।

আমি বুঝতে পারছিলাম, এ-সময় আমার পক্ষে কোন চিৎকার হট্টগোল করা উচিত নয়। কোন আঘাত···

হ্যাঁ, আমি তখন মা হতে চলেছি।

মুহূর্তের জন্য মনে হল, আমার সন্তান যেন ভূমিষ্ঠ না হয়। আমি একাই যেন প্রবঞ্চিত হই, আর কেউ নয়।

এমনি ভাবেই দিনের পর দিন কেটে চলল। একটু একটু করে আমরা আবার পরস্পরের কাছে সহজ হয়ে উঠলাম। কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনার জন্যে আমি কোন অভিযোগ করলাম না।

লক্ষ করলাম রমলাও আর আসে না। মাসের পর মাস।

ভাবলাম, বাঁচা গেছে, ও না এলেই ভাল।

এমন সময় আমার খবর পেয়ে শ্বশুর-শাশুড়ি, নীতু সবাই মাস খানেকের ছুটিতে ফিরে এল।

আমি হাসপাতালে গেলাম।

আর যেদিন হাসপাতালে গেলাম, তার আগের দিন সন্ধ্যায় রমলার ভাই এসে জিগ্যেস করলে, দিদি এসেছে বৌদি?

—দিদি! কই না তো। আমি উত্তর দিলাম।

রমলার ভাই হতাশার চোখে তাকাল, বললে, দিদিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—পাওয়া যাচ্ছে না! আমিও বিস্মিত হলাম।

কমলেশকে বললাম। ও কথাটা যেন বিশ্বাস করতেই চাইল না।

পরের দিন শুনলাম খবরটা। পাড়ারই একটি ছেলের সঙ্গে রমলা নাকি পালিয়েছে।

অনেক দিন ধরেই ব্যাপারটা অনেকের চোখে পড়েছিল। বাপ-মা সাবধানও করেছিল তাকে। কিন্তু এ-ভাবে যে সত্যিই সে পরিবারের নাম কলঙ্কিত করে পালিয়ে যাবে কেউ ভাবতেই পারেনি।

খবরটা শুনে আমার সমস্ত গর্ব যেন মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কমলেশকে মনে হল কত তুচ্ছ, কত সামান্য। সেই প্রথম বুঝতে পারলাম, মনে মনে তার ওপর যত ক্রুদ্ধই হয়ে থাকি না কেন, রমলার মত মেয়ে তাকে পাবার জন্যে পাগল এ-কথাটা ভেবে আমি নিজেই যেন গর্ব বোধ করতাম! কমলেশের মূল্য যেন আমার কাছে অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

মুহূর্তের একটা খবরে মনে হল কমলেশ কত তুচ্ছ! কত তুচ্ছ!

সুনন্দাই প্রশ্ন করলে, কি ভেবেছিলে, বলো না ?

বললাম, ভেবেছিলাম, বিয়ের চিঠি নিয়ে এসেছেন উনি।

—বিয়ে ! বিস্ময়ের চোখ মেলে তাকাল ছন্দা।—কার বিয়ে ?

আর আমি সুনন্দার মুখের দিকে তাকাতেই ওরা দুজনেই বুঝতে পারল, দুজনেই সশব্দে অট্টহাসে হেসে উঠল।

সুনন্দা বললে, সত্যি ভাই, বিয়ের কনেটি সেজে আসবে ভাবিনি। কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে তোমাকে !

কথাটা মিথ্যে নয়। নার্সের বেশে দেখেছি ছন্দাকে, আর এ যেন অন্য রূপ।

ছন্দা বোধ হয় লজ্জা পেল। বুলাকে ডেকে বুকে জড়িয়ে ধরল ও, বুলাব গালে গাল চেপে বললে, তোমার মা এখন সবকিছুই সুন্দব দেখছে বুলা।

সুনন্দা হাসল।—বুঝবে বুঝবে, সময়ে সব বুঝবে।

ছন্দা তখন বুলাকে নিয়ে মেতে উঠেছে।

এক সময় হঠাৎ আমার দিকে তাকিযে বললে, আসতে আসতে ভাবছিলাম আপনাব সঙ্গে দেখা হবে না···

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, সুনন্দাকে বললাম, যাও চায়ের ব্যবস্থা করে এস।

সুনন্দা বেরিযে গেল, আর আমি হঠাৎ ভয় পেলাম। ভয় ? হ্যাঁ, একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম হয়তো। কিন্তু ছন্দার কথায় হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করলাম।

কি বোকা, কি বোকা আমি। তুচ্ছ একটা কথা, তুচ্ছতম ঘটনা। তবু কথাটা সুনন্দার কাছে চেপে রাখতে গেলাম কেন। হাসতে হাসতে সেদিন কি বলতে পারতাম না ? ছন্দাব সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে গেল ! রাস্তাতেই তো দেখা হয়েছিল। আকস্মিকভাবেই। ছন্দার বাসার ঠিকানা খুঁজে খুঁজে তো দেখা কবতে যাইনি, ঘড়ি ধরে সময মিলিয়ে বাস-স্টপে অপেক্ষা করিনি।

অথচ এই সামান্য খববটুকু সুনন্দাকে জানালে কিছুই তো মনে করত না সে। কিছুই তো মনে করবার মত নয়।

তবু কেন যে প্রকাশ করে বলতে পারিনি, তা আমার কাছেই কি অজ্ঞাত ? রমলার কথা মনে পড়ল। একটা ব্যথার মোচড় অনুভব করলাম বুকে। রমলাকে একদিন বুকের কাছে পেয়েছিলাম, মনের কাছেও। তবু কেন যে আমরা দুজনে মিলে সংসার পাততে চাইনি, তা যেন আমাদের কাছেও রহস্য ছিল।

না বিয়ের কথা রমলা কোনদিন বলেনি। তাই সুনন্দাকে নিযে আমার ওপব প্রথম প্রথম একটা অভিমান ওর ঠোঁটের ডগায় ফুলে উঠত। তারপর একদিন ও আবার কাছে এল।

আর—

হ্যাঁ ! তারপর থেকেই আমার ওপর তার আস্থা হারিযে ফেলল সুনন্দা। আমি বেশ বুঝতে পারতাম ওর চোখ দুটো যেন অণুবীক্ষণ দৃষ্টিতে আমার বুকের ভেতর পর্যন্ত দেখতে চায়।

তাই ছন্দার কথা বলতে পারিনি সুনন্দাকে।

একটু পরেই সুনন্দা ফিরে এল। বললে, চায়ের জল চাপিয়ে এলাম। মা জিগ্যেস করছে—খুব সুন্দর দেখতে একটি মেয়ে এল তোমার কাছে। কে বউমা ?

বলে খিলখিল করে হেসে উঠল সুনন্দা।

কিন্তু ওর হাসিতে যোগ দিতে পারলাম না। আমার মনে তখন একটাই অস্বস্তি। কথায়

কথায় ছন্দা হয়তো এখনই বলে বসবে সেদিন রাস্তার মোড়ে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। হয়তো বলে বসবে, আমি ওকে আসতে বলেছিলাম।

থাকব আমি। ছেলেমানুষের মত কি হাস্যকর একটা কথাই না বলে ফেলেছিলাম। যেন আমার থাকা না থাকার ওপর নির্ভর করে ছন্দার আসা-যাওয়া। যেন আমার সঙ্গে দেখা করার লোভেই আসবে সে, বুলার জন্যে নয়।

মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক উঁকি দেয় বার বার।

কিন্তু সুনন্দা তা জানবে কি করে, ও তখন নিজের রসিকতায় নিজেই হাসছে।

বললে, খুব বেঁচে গেছ ভাই, মা তোমাকে আমার আগে দেখলে তোমাকেই বউমা বানিয়ে দিতেন।

ছন্দা লাজুক হাসি হাসল। মুখ নিচু করল। আর সুনন্দার ওপর বিরক্ত হলাম আমি। আড় নেই মুখে ওর, রসিকতার মাত্রা নেই। ছি ছি!

সুনন্দা কিন্তু থামবার পাত্র নয়। বললে, টের পেতে তাহলে, হাড় ভাজা ভাজা করে ছাড়তেন ইনি, দেখে মনে হয় ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। কি জ্বালান যে জ্বালায় ভাই।

আরও হয়তো কিছু বলত সুনন্দা, তার আগেই মা এসে দাঁড়াল কপাটের পাশে।

সুনন্দা বললে, মা।

ছন্দা উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল, তারপর মার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

ছন্দার চিবুকে হাত ঠেকিয়ে চুমো খেলেন মা। কি যেন আশীর্বাদ করলেন অস্ফুটে।

তারপর দু-একটা কথা বলে মা চলে গেলেন।

চা এনে দিল সুনন্দা। বসল গিয়ে ছন্দার পাশে। ওর শাড়িতে হাত বোলাল, ওর চুড়ির ডিজাইনে।

ফিসফিস করে কি যেন জিগ্যেস করল। ফিসফিস করে উত্তর দিল ছন্দা, আর মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাল আমার দিকে, কিংবা তাকিয়ে দেখল আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি কিনা।

এক সময় উঠে দাঁড়াল ছন্দা।—আজ যাই দিদি।

—যাবে! অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন সায় দিল সুনন্দা।

বুলাকে কোলে নিয়েই নেমে এল ছন্দা। পিছনে আমরা।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আবার গল্প শুরু কবল ওরা। আবার কবে আসবে বলো। আপনারা চলুন না একদিন।

আরো কিছুক্ষণ।

ছন্দা হেসে বললে, এবাব যাই।

সুনন্দা ঘাড় নাড়ল। তাকাল অন্ধকার রাস্তাটার দিকে।

বললে, যাও না, পৌঁছে দিয়ে এস ট্রাম লাইন অবধি।

হঠাৎ খুশি হয়ে উঠলাম সুনন্দার ওপর। হঠাৎ যেন নতুন করে ভাল লাগল ওকে। মনে হল, সুনন্দার বুক থেকে অবিশ্বাসের কাঁটাটা সরে গেছে। নাকি শুধু রমলাকে কেন্দ্র করেই ওর অবিশ্বাস!

ছন্দা বাধা দিল, না, না, এই তো এইটুকু।

তবু বেরিয়ে পড়লাম। বললাম, এইটুকু যখন, পৌঁছে দিলে দোষ কি!

শেষবারের মত বুলাকে আদর করে বিদায় নিল ছন্দা। আমি পাশে পাশে।

বুলা কেঁদে উঠল। ছন্দার কোল থেকে আসবে না ও। যাবে তার সঙ্গে।

—এস আবার।

ছন্দা দাঁড়াল এক মুহূর্ত। হাসল। বললে, আবার আসব। হাঁটতে শুরু করল আবার।

নির্জন রাস্তা। আবছা অন্ধকার। পাশাপাশি চলেছি দুজন। অদ্ভুত একটা অনুভূতির সুর বাজছে মনের মধ্যে। বিচিত্র এক আনন্দ। ভাল লাগছে এমনি ক্লান্তভাবে পাশাপাশি হাঁটতে। হ্যাঁ, বড়ো ক্লান্ত লাগছে নিজেকে।

ছন্দা কোন কথা বলছে না।

আমি কোন কথা বলছি না।

একবার শুধু আমার হাতখানা ঝট করে তুলে ধরল ছন্দা, গ্যাসবাতিটার কাছে এসে। হাতটা চোখের কাছে তুলে এনে ঘড়িটা দেখল। কটা বাজে।

নিজের মনেই বললে, সাড়ে নটা? এত রাত হয়ে গেছে?

হাত ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালাল। এসে দাঁড়াল বাস-স্টপে।

পাশাপাশি।

বললে, একটু করে মধু খাওয়াচ্ছেন তো বুলাকে? আর ফলের রস?

সমস্ত মন যেন মুহূর্তের মধ্যে বিষিয়ে উঠল। নার্স, নার্স। ছন্দা রায়ের এই সাজ-পোশাক, হাসি-আনন্দ, সব কিছুর আড়াল থেকে একটা কর্তব্যের মুখ উঁকি দেয়; একটি নার্সের মুখ।

বাস এল, এসে দাঁড়াল। উঠে পড়ল ও।

বাস চলে গেল। যাবার সময় একবার বুঝি জানালার দিয়ে ফিরে তাকাল ছন্দা। হাসল।

ফিরে এলাম। ফিরে আসতে আসতে একবার থমকে দাঁড়ালাম গ্যাসবাতিটার নীচে। ঘড়ি দেখলাম।

হাতের ওপর একটা কোমল হাতের স্পর্শ যেন লেগে রয়েছে।

একটা শিহরন। ঘড়ি দেখার জন্যেই কি হাতটা ছুঁয়ে গেল ও, না অন্য কোন উদ্দেশ্যে!

ওর হাসি, ওর চোখের কটাক্ষে কি কোন অর্থ ছিল না! এত সাজপোশাকই বা কেন? শুধুই খেয়াল?

ফিরে আসতেই সুনন্দা হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বললে, ছি ছি ছি, কি বেহায়ার মত কাপড় পরেছে বলো তো? পেটকাটা ব্লাউজ, আর···

বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়ল সুনন্দা।

বললাম, আর কি?

সুনন্দা কপট গাম্ভীর্যে বললে, আহা কিছু জানে না যেন, সারাক্ষণ তো ওর দিকেই তাকিয়েছিলে!

শুধু সুনন্দা নয়, ফিরে আসার পর সারা বাড়িটাই যেন নৃশংস হয়ে উঠল ছন্দার ওপর।

নীতু ছুটে এল বেণী দোলাতে দোলাতে, হতাশার সুরে বললে, চলে গেছে?

পাশের বাড়ির মেয়েটার সঙ্গে লাইব্রেরিতে বই বদলাতে গিয়েছিল নীতু, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল তার সঙ্গে। তাই ছন্দাকে দেখতে পায়নি।

ছন্দার সাজপোশাকের আলোচনা শুনেই হয়তো নীতুর অনুশোচনা হল। এমন একটা মজার ব্যাপার থেকে বেচারী বঞ্চিত হল, অনুশোচনা হবে না।

এর আগে একদিন এসেছিল ছন্দা, মা বলেছিল, বেশ মেয়েটি, খুব নরম স্বভাব, নার্সদের মত নয়।

আশ্চর্য, সুনন্দাও তাই বলে। বলে নার্সদের মত নয় ছন্দা।

অথচ আজ যেন মুহূর্তের মধ্যে মত বদলে গেল সকলের। বদলে গেল, আজ ওকে নার্সদের মত মনে হয়নি বলেই হয়তো। নার্সের পোশাক থাকবে তার শরীরে, শ্বেতশুভ্র

নির্মলিন শান্ত পোশাক—উচ্ছল উচ্চকিত হাসি হাসবে না, প্রগলভ হবে না। তবেই খুশি এরা। পুরোপুরি একটি নার্সের ভূমিকা নিয়ে এলেই বলবে, ছন্দা নার্সের মত নয়।

হাসি পায় ওদের কথা শুনে। কি চায় ওরা, সে এক রহস্য যেন।

মা প্রশ্ন করেছিল, খুব সুন্দর দেখতে একটি মেয়ে এল তোমাব কাছে, কে বউমা?

নার্স। হাসপাতালে ছিলাম যখন, ওর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল। কিংবা এই ধরনের কিছু বলেছিল হয়তো। কিন্তু একটি পরিচয়েই কি তার সম্পর্কে মত বদলে গেল মার।

নার্সকে শুধু নার্সের চেহারাতেই দেখতে চায কেন ওরা?

জানি না, সকলেই হয়তো তাই চায়। আমিও তো সুনন্দাকে সুনন্দার মত দেখতে চাই, বুলাকে বুলার মতই।

তাই কি? না বোধ হয়। বুলাকে সাজাতে ভালবাসে কেন। বিভিন্ন পোশাকে। ছেলেদের শার্ট কিনে আনিয়ে বুলাকে পরিয়েছিল একদিন।

দেখে মা হেসেছিল।—শার্ট পরালেই তো ছেলে হয়ে যাবে না বউমা, দেখবে বিয়েব সময়, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা লাগবে।

সুনন্দার মুখের হাসিটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। তবু অপ্রতিভ না হয়ে বলেছিল, ওদের সময় আর টাকা লাগবে না মা। পডাশুনা করে চাকরি করবে।

—চাকরি? মুখ বিকৃত করেছিল মা—ঐ নার্সদের মত?

—তা কেন, কত বড় চাকরি করবে।

বুলাকে নিয়ে সত্যিই বুঝি স্বপ্নের শেষ নেই। মানুষেব যা কিছু আকাঙ্ক্ষা, কিংবা সুনন্দার নিজের, সবই যেন সে দেখতে চায় বুলার মধ্যে।

একদিন বললে, বুলা কি হবে জানো?

কি?

সুনন্দা হেসে বললে, ও নিজে বলেছে ম্যাডাম কেবীর মত হবে।

—নিজে বলেছে? ঠাট্টা স্বরে প্রশ্ন করলাম।

সুনন্দা হাসল।—তা নয়তো কি। দেখবে? বলেই সুনন্দা দুটো আঙুল এগিয়ে দিল বুলার সামনে। বললে, একটা আঙুল ধরো তো বুলা।

বুলা কি বুঝল কে জানে, ছোট ছোট দুটো হাত বাডিযে দুটো আঙুলই চেপেধরেখিলখিল করে হেসে উঠল।

আমরাও হেসে উঠলাম।

আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা চমকে উঠলাম। বিস্ময়ে, আনন্দে।

—দাঁত। চিৎকার করে উঠল সুনন্দা। খুশি-খুশি চোখে আমাব দিকে তাকাল। তারপর বুলার মখের মধ্যে একটা আঙুল দিয়ে দেখল।—হ্যাঁ, উঠছে। একটাই।

খবরটা রটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। দাঁত উঠেছে বুলার। দাঁত। ঠিক একটা সাদা ধবধবে মুক্তোর মত।

আবার হাসল বুলা। চিকচিক করে উঠল দাঁতটা।

মা ছুটে এল। নীতু ছুটে এল।—টুনুমামা, বুলার নাকি দাঁত উঠেছে?

—হ্যাঁ।

নীতু এসেই টুপ করে কোলে তুলে নিল বুলাকে।—দেখি দেখি দেখি বুলা, হাসো তো একবার।

নীতুর হাসি দেখেই বোধ হয় খিলখিল করে আবার হেসে উঠল বুলা। আধফোটা দাঁতটা ঝিকমিক করে উঠল।

—ওমা, কি সুন্দর! চিৎকার করে উঠল নীতু। তারপর বুলাকে নিয়ে ছুটে পালাল

হাসতে হাসতে।

মা ডাকল, বাবা ডাকল।—দেখি দেখি, এই নীতু শোন।

খবর শুনে দাদুও নেমে এল খড়ম ফটফটিয়ে।—কই আমার দিদা কই? নেমকহারামটা কই রে। বেশ ছিলাম দুজনেই,ফোকলা বেটি—দাঁত গজিয়ে নিল? কই সে?

নীতু তখন সকলের নাগালের বাইরে। রাস্তা থেকেই পাশের বাড়ির মেয়েটাকে ডাকছে।—শিগগির আয় কুমি, দেখে যা, বুলার ভাই কি সুন্দর একটা দাঁত উঠেছে।

শুধু কুমি নয়। সারা পাড়া ঘুরে এল নীতু। যেন এত বড় খবর ঘটে না, ঘটে না।

ছোট্ট একটা দাঁত, ভাল করে ওঠেওনি, অথচ তার ফলেই সারা বাড়ি তোলপাড়।

সত্যি, বুলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, ওর হাসিটা যেন রাতারাতি বদলে গেছে। সেই অর্থহীন হাসিটা যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। আরও সুন্দর, আরও মিষ্টি।

যে আসত সে-ই বলত, কি সুন্দর কোঁকড়া কোঁকড়া চুল হয়েছে একমাথা। এখন যে আসে সেই বলে, কি সুন্দর হাসছে দেখ, দাঁতটা কি সুন্দর লাগছে!

আর বুলাও যেন বুঝতে পারে, তাই কারণে অকারণে হেসে ওঠে নিঃসঙ্গ একটি দাঁতের ঝিলিক দিয়ে।

কিন্তু সেদিন একটা কাণ্ড করে বসল সে।

দাদু বললেন, কই নাতনীকে একবার নিয়ে এস তো বউমা, বড়ো দাঁত দেখাতে শিখেছে।

সুনন্দা হেসে বুলাকে নিয়ে গেল দাদুর কাছে। কিন্তু এত সাধাসাধি করলেন দাদু, বুলা সেই যে মুখ ঘুরিয়ে রইল, কিছুতে গেল না দাদুর কোলে।

ঠাকুমা ঠাট্টা করে বললেন, তোমার দাঁত নেই একটাও, যাবে কেন তোমার কাছে।

—তাই নাকি? দাঁত চাই? বলেই দাদু তাঁর বাঁধানো দু-পাটি দাঁত এনে মুখে পুরলেন। বুলাকে বললেন, এই দেখ দাঁত।

আর আশ্চর্য, বড় চোখ করে সেদিকে তাকিয়ে রইল বুলা, তারপর দুহাত বাড়িয়ে দাদুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সবাই তার কাণ্ড দেখে হেসে উঠল।

নীতু চুলে রিবন বাঁধতে বাঁধতে বললে, কি মেয়ে বাবা, সত্যি যাচ্ছিল না দাঁত নেই বলে!

ব্যাপারটা যে আসলে তা নয়, বাঁধানো দাঁত দু-পাটির লোভেই বুলা দাদুর কোলে লাফিয়ে পড়ল তা কেউই যেন বুঝেও বুঝতে চায় না।

কিন্তু তার চেয়েও মজার ব্যাপার করল বুলা।

যার কোলেই যায় ক্ষুদে ক্ষুদে হাত বাড়িয়ে তারই দাঁত ধরে টানে। ওর ধারণা, দাদুর দাঁত যখন খোলা যায়, পরা যায়, তখন সকলের দাঁতই খোলা যায়।

ওর কীর্তি দেখে হেসে লুটোপুটি খায় সুনন্দা। আর সুনন্দার হাসি দেখে বুলা খিলখিল করে হেসে ওঠে, যেন সবই বুঝতে পেরেছে ও।

কিন্তু, কে জানত, হাসিটা দিনে দিনে মিলিয়ে যাবে। শুধু বুলার মুখ থেকেই নয়, সকলের মুখ থেকে।

দুটো দিন যেতে না যেতেই কেমন যেন মুষড়ে পড়ল বুলা, শরীরটা নেতিয়ে পড়ল নির্জীব হয়ে।

মা বলল, দাঁত উঠছে কিনা, অমন হয় এ-সময়। একটু সাবধানে থাকলেই সেরে যাবে।

বাবা হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশিটার মুখে ছিপিটা আড় করে ধরে ফোঁটা ফেলতে

ফেলতে বলল, এইটে তিন ভাগ করে দু-ঘণ্টা অন্তর খাইয়ে দে, সেরে যাবে।

ঠাকুমা বললেন, একটু তেল আর জল নিয়ে পেটে মালিশ করে দাও নাতবউ, দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়বে মেয়ে তোমার।

দাদু বললেন, মিছরির জল খাওয়াও, দুধ দিও না, সেরে যাবে।

সেরে যাবে, সেরে যাবে, সেরে যাবে।

শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। দুশ্চিন্তা দূর করার জন্যই বলে সকলে, অথচ আতঙ্ক বেড়ে যায়। বিরক্ত হয়ে উঠি ওদের কথা শুনে। এমন নাদুসনুদুস চেহারাটা যে দুদিনে শুকিয়ে ঝরে পড়েছে, ঝিম মেরে গেছে এমন হাসিখুশি মুখটা, এ-সব নাকি কিছুই নয়। সাধারণ, স্বাভাবিক। সকলেরই হয়, সকলেরই সেরে যায়।

সেরেই যদি যায়, সেরেই যদি যাবে, তা হলে এত ওষুধপথ্য কেন, এত ডাক্তার কবরেজ আছে কেন?

সুনন্দাও চিন্তিত হয়ে ওঠে। রাত্তিরে ঘুমোতে পারে না। ঠায় বসে থাকে বুলার পাশে, হাতখানা নাড়ে আর বলে, কি করি বলো তো, দিনে দিনে কত রোগা হয়ে যাচ্ছে দেখেছ।

সারাদিনের খাটাখুটির পর রাত্রির ঘুমটুকুই একমাত্র বিশ্রাম। ক্লান্তিতে চোখ জুড়ে আসে, উঠতে ইচ্ছে হয় না। চোখ বুজে বুজেই বলি, কাল ডাক্তার দেখিয়ে আনব।

—রোজই তো বলছ! অনুযোগ করে সুনন্দা।

সান্ত্বনা দিই, কাল নিশ্চয়ই যাব।

আরও ছোট ছোট, কাটা কাটা, দু-চারটে ঘুম-জড়ানো কথা। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ি।

সকালে ঘুম থেকে উঠতেই সুনন্দা মনে পড়িয়ে দেয়।—চা-টা খেয়েই বেরিয়ে পড়ো। কাল রাতে খুকু আরও দুবার—

—যাচ্ছি, যাচ্ছি। থামিয়ে দিই সুনন্দাকে।

তবু ভিতর থেকে যেন তাগাদা পাই না। কেমন এড়িয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। কিংবা কাজটা অন্য কারও ঘাড়ে চাপাতে পারলে বুঝি বা খুশি হই।

হঠাৎ নিজেকে বড়ো অপরাধী মনে হয় বুলা আর একবার বমি করার চেষ্টা করতেই। কি আশ্চর্য! সেই প্রথমবার যখন সামান্য জ্বর হল বুলার, সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি, উৎকণ্ঠায় পাহারা দিয়েছি তাকে। তবু কত ভাল লেগেছে। অথচ কাল রাত্তিরে একবার চোখ চেয়েও দেখলাম না কেন? আজ ডাক্তারের কাছে যেতে আলস্য লাগছে কেন?

হঠাৎ বললাম, ছন্দাকে সেদিন জিগ্যেস করলে হত!

—কি জিগ্যেস করবে? সুনন্দা বিস্মিত হয়ে তাকাল আমার দিকে।

বললাম, ডাক্তারের খবর। কোন্ ডাক্তারকে দেখানো উচিত।

সুনন্দা একটু ভাবল, যাও না এখনই, হাসপাতালেই থাকবে হয়তো।

—তাই ভাল।

আলনা থেকে পাঞ্জাবিটা নিয়ে মাথায় গলাতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ থেমে পড়লাম। হ্যাঁ, পাঞ্জাবিটা একটু ময়লা লাগছে, ইস্ত্রির ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেছে। ধুতিটাও কি বদলানো দরকার?

বললাম, ধুতি-পাঞ্জাবি বের করে দাও।

সুনন্দা রুপোর বাটিটায় ঝিনুক নেড়ে নেড়ে মিছরি গুলছিল জলে। ফিরে তাকিয়ে বললে, সে কি কালই তো ভেঙেছ, এখনও দুদিন আপিসে যাওয়া চলবে।

কথাটা কাঁটার মত একটা খোঁচা দিল। হয়তো হঠাৎ চটে উঠতাম, কিছু একটা রূঢ় কথা বলে বসতাম। তবু সামলে নিলাম নিজেকে। বললাম, গরমেন্ট আপিসের চাকরি, বাড়িটাও

যেমন পুরনো, ফাইলগুলোও তেমনি ধুলো-বোঝাই। সে আপিসে আধময়লা ধুতি-পাঞ্জাবিতেই চলে।

সুনন্দা হেসে বললে, এখানেই বা কোন তোমার ফিলিমস্টার বসে আছে।

ফিরে তাকালাম সুনন্দার দিকে। ও কি কিছু একটা সন্দেহ করছে? কোন অভিসন্ধি খুঁজে পেয়েছে?

বললাম, তোমার পাতানো বোনটার কাছে এর চেয়ে ময়লা জামা পরে যেতে আপত্তি নেই। ভাবছি, যদি কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়...

সুনন্দা আর কোন কথা বলল না। আঁচলের চাবির থোকাটা ঝনাত করে পিঠ থেকে তার হাতে এসে পড়ল হেঁচকা টানে, আলমারি খুলল, ধোপদুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি বের করে দিল, শব্দ করে বন্ধ করে দিল আলমারির পাল্লাটা। চাবি লাগাল, তারপর চাবির থোকাটা পিঠে ফেলে বুলার কাছে গিয়ে বসল।

বুলা বড়ো অসহায়ের মত তাকিয়ে আছে আমার দিকে। নির্জীব দুর্বল একটা শরীর। দুটো ব্যথাকাতর অসহায় চোখ।

পোশাক বদলে পাঞ্জাবির বোতাম লাগাচ্ছি, সুনন্দা বললে, সোনার বোতামগুলো বের করে দেব?

ফিরে তাকালাম। হ্যাঁ, মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকের হাসিটা লুকিয়ে ফেলল সুনন্দা। কৌতুকে, কিংবা উপহাসে হাসছিল ও।

জবাব দিলাম না। জবাব দেবার মত কথা নয়।

যাবার আগে গিয়ে বসলাম বুলার পাশে। সত্যি, অসহ্য একটা যন্ত্রণা যেন চেপে রেখেছে বুলা। চোখ দুটো ভাসা ভাসা। শুধু তাকিয়ে আছে। কিছু লক্ষ করছে না যেন।

ডাকলাম বুলা।

বুলা তাকাল। বিছানার ওপর নির্জীব পড়ে থাকা ছোট হাতখানা গড়িয়ে গড়িয়ে কি যেন খুঁজল। ধীরে ধীরে সেটা এসে ঠেকল আমার হাতে।

আমার হাতের ওপর ছোট্ট খুদে হাতখানা রেখে ম্লান একফালি মেঘ-ঢাকা জ্যোৎস্নার মত হাসল বুলা। হাসবার চেষ্টা করল।

আমার হাতের ওপর হাত রেখে ও যেন পরম নিশ্চিন্ত।

বিশ্বাস। সরল বিশ্বাসে ও যেন আমার কাছে আশ্রয় চাইছে। সুনন্দা যেমনভাবে একদিন আশ্রয় চেয়েছিল। ভয়ে ভয়ে উৎকণ্ঠায় আগ্রহে। কিন্তু এতখানি আস্থা, এতটা বিশ্বাস কি ছিল সুনন্দার? এমন অকুণ্ঠিতভাবে হাতে হাত রাখতে পেরেছিল সে? না। এমন সরল বিশ্বাস ছিল না সুনন্দার।

বুলার জন্যে অদ্ভুত একটা বেদনাবোধ যেন সারা বুক নিঙড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে হল, অপরাধী মনে হল ঐ ছোট্ট মেয়েটার কাছে।

তাড়াতাড়ি পথে বেরিয়ে পড়লাম। হাসপাতালের উদ্দেশে।

মেটার্নিটি ওয়ার্ড। এইখানেই আছে ছন্দা, থাকবার কথা।

বারান্দায় দুটি নার্স রেলিঙে ভর দিয়ে গল্প করছে, হাসছে। কোন গোপন রসালাপ হয়তো।

নার্সদের পোশাকটা কি সুন্দর, কত শান্ত। ছন্দাকে কত সুন্দর লাগে এ পোশাকে।

ফটকের কাছে এসে একটা রিক্শা থামল। একজন বয়স্কা মহিলা আরেকজন তরুণী। হয়তো পেন উঠেছে, তরুণীটিকে ধরে ধরে হাসপাতালের দিকে নিয়ে চলেছেন মহিলাটি।

তরুণীর মুখে-চোখে গভীর বেদনার চিহ্ন, যন্ত্রণায় কুঞ্চিত কপালের রেখা।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল তারা।

হাসপাতালের সামনে অধৈর্য হয়ে পায়চারি করছেন এক বৃদ্ধ। এক একবার ভিতরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসছেন।

এনকোয়ারির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, মিস রায়, মিস ছন্দা রায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

একজন ছোকরা কেরানী-গোছের লোক আপন মনে কাজ করতে করতে তাকাল, গম্ভীর গলায় বললে, এখানে সব মিসেস, মিস নেই।

কে যেন হেসে উঠল।

হাসিটা গায়ে মাখলাম না। বললাম, নার্স। এখানকার নার্স মিস রায়, মিস ছন্দা রায়।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন এবার। যেন বিস্মিত হলেন। হয়তো নার্সদের খোঁজ নিতে কেউ আসে না এখানে, হয়তো ছন্দার খোঁজ করে ভুল করেছি।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক কি ভাবলেন কে জানে। বললেন, দোতালায় গিয়ে জিগ্যেস করুন, নার্সদের খবর নার্সরাই বলতে পারবে।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেলাম।

সেই ঘর। কয়েকটা বেঞ্চ, কিছু লোকজন। সকলেই অপেক্ষা কবছে। কেউ হয়তো খবর নিতে এসেছে আত্মীয়জনের, কেউ দেখা-সাক্ষাৎ করতে। উৎকণ্ঠা সকলের মুখে-চোখেই।

খুটখুট খুটখুট শব্দ করে হাল্কা পায়ে এগিয়ে আসছে একটি নার্স। সদাই ব্যস্ত। কোন জরুরী কাজে চলেছে হয়তো।

তবু সামনে গিয়ে বললাম, মিস ছন্দ রায়, নার্স··

—আসেনি এখনও। বসুনএখানে। চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল সে।

বসে রইলাম। আরও অনেকেব মত।

বসে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে উঠলাম। কখন আসবে ছন্দা, আসবে কি ? হয়তো নার্সটা ভুল খবর দিয়েছে। ছন্দার ডিউটি হয়তো এখন নয়। কিংবা ছুটি নিয়েছে সে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম, নেমে এলাম সিঁড়ি ভেঙে। এর চেয়ে খোলা বাতাসে, হাসপাতালের বাইরে পায়চারি করা অনেক ভাল।

ফটকের সামনে এসে অপেক্ষা করলাম। ওপরের বারান্দাব দিকে তাকালাম। না, রসালাপে মত্ত নার্স দুটি নেই।

চমকে উঠলাম পরমুহূর্তেই, হর্নের শব্দে।

গাড়িটা ফটকের ভেতর ঢুকল, থামল হাসপাতালের সামনে।

কোন ডাক্তারের গাড়ি। হ্যাঁ, ডাক্তারই। ঘাড়ে স্টেথসকোপ ঝুলছে। হাতে কি ওটা ?

কিন্তু তার আগেই চোখ গেছে পার্শ্ববর্তিনীর দিকে। ডাক্তারের পাশে বসেছিল ছন্দা, নামল।

কি অপূর্ব মোহময় শরীর ছন্দার। ছন্দোময় দেহের ভাঁজে ভাঁজে যৌবনের হিল্লোল।

ছোকরা ডাক্তারটি কি যেন বললে ছন্দাকে, কৌতুকে হাসল সে, কিছু একটা জবাব দিল। গাড়ির দরজা বন্ধ করে দ্রুত পায়ে দুজনেই হাসপাতালের অন্দরমহলে চলে গেল।

আর মুহূর্তের মধ্যে মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। ছন্দাকে ঠিক যেন এভাবে দেখতে চাইনি, এই রূপে। ডাক্তারটির সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসবে কেন, হাসবে কেন এত অন্তরঙ্গ আনন্দে।

কেন হাসবে না ? অন্তরঙ্গ হবে না কেন ? আমি কে। আমার চাওয়া না-চাওয়া, আমার পছন্দ-অপছন্দ, ভাল লাগা মন্দ লাগার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক ছন্দার।

আরও পাঁচজনের মতই সেও একজন নার্স। শুধুই নার্স।

আমি কি ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করছি ? না, অভিমান ?

যাব না, দেখা করব না ছন্দার সঙ্গে। কি প্রয়োজন ওর পরামর্শ নিয়ে। কত শত ডাক্তার আছে, চেনা অচেনা। যে-কোন একজনের কাছে গেলেই তো হয়। টাকা। কয়েকটা টাকার বিনিময়ে সকলেই কিছু একটা প্রেসক্রিপশান লিখে দেবে। মা, বাবা, দাদু, ঠাকুমার মত বলবে, সেরে যাবে।

হয়তো সারবে, হয়তো সারবে না। সারবে না ? বুলার ছোট্ট মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ম্লান ব্যথাক্লান্ত দুটি চোখ। অসহ্য যন্ত্রণা লুকনো ক্ষীণ এক বিন্দু হাসি। শক্তিহীন দুর্বল একখানা হাত, ছোট্ট নরম হাতখানা যেন ধীরে ধীরে এসে আশ্রয় খুঁজছে আমার হাতের মধ্যে।

বেচারী। না, বুলাকে সারিয়ে তুলতে হবে। যন্ত্রণা লাঘব করতে হবে। যে কোন ডাক্তার নয়, ভাল বিশ্বাসী ডাক্তার, যার ওপর আস্থা আছে সকলের, ছন্দার। ঠিক আমার ওপর বুলার হাতখানি যেমন আস্থা খুঁজেছে তেমনি···

যাব। দেখা করব ছন্দার সঙ্গে।

আবার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেলাম। সেই ঘরখানার সামনে পাপোশের ওপর দাঁড়িয়ে জুতোর ধুলা মুছলাম। তাকালাম এদিক-ওদিক। না, ছন্দা নেই কাছেপিঠে, না অন্য কোন নার্স।

যারা বসেছিল ঘরের মধ্যে ছড়ানো চেয়ার-টুল জুড়ে, তারা অনেকেই চলে গেছে, এসেছে নতুন মুখ। দু-একজন বুঝি এখনও বসে আছে।

পায়চারি করতে শুরু করলাম লম্বা করিডরে। হয়তো ছন্দা এখনই এসে পড়বে, কিংবা অন্য কোন নার্স।

হ্যাঁ, আসছে, সেই নার্সটি ; তেমনি খুটখুট খুটখুট জুতোর শব্দ করে। নিঃশব্দ শান্ত এই পরিবেশের মধ্যে এই জুতোর শব্দেরও যেন অপরূপ একটা ছন্দ বাজে। জুতোর শব্দ নয়, হাসপাতালটার হৃৎপিণ্ড যেন, টিকটিক টিকটিক করছে ঘড়ির কাঁটার মত অবিরাম ছন্দে।

এগিয়ে গেলাম। সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকাল নার্সটি, এক মুহূর্ত থামল। বেশ বুঝতে পারলাম, ভুলে গেছে সে, ভুলে গেছে যে, একটু আগেই তাকে ছন্দা রায়ের কথা জিগ্যেস করেছিলাম। অনেক নতুন মুখের ভিড়ে আমার প্রশ্নটা হারিয়ে গেছে তার মন থেকে।

বললাম, মিস রায়, নার্স ছন্দা রায়ের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

পিছন ফিরে তাকাল নার্সটি, দুপা ফিরে গিয়ে ঘরটার মধ্যে উঁকি দিল, সেখান থেকেই ডাকলে, ছন্দা ! এক ভদ্রলোক তোর জন্যে···

ইশারায় বাকিটা বোঝাল নার্সটি, তারপর আমাকে বসবার ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল নিজের কাজে।

চেয়ার খালি ছিল, তবু দাঁড়িয়ে রইলাম। মিনিট দুই পরেই দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ছন্দা। সপ্রশ্ন দৃষ্টির চোখ দুটো পরক্ষণেই হাসিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল ছন্দা সহাস্য মুখে।—আপনি ? কতক্ষণ এসেছেন ?

বললাম, এই মাত্র। সত্যি কথাটা কেন জানি না বলতে বাধল।

—আসুন, আসুন। পাশের ছোট্ট ঘরে নিয়ে গেল ছন্দা। আমাকে চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে নিজে টেবিলটার ওপর বসল।

ছন্দার কথা

কমলেশকে আমি কি করে ভাল বেসে ফেললাম, কেন ভালবাসলাম, আমি আজও বুঝতে পারি না।

প্রেম, ভালবাসা শুধু কবিদের কল্পনা, জীবনের ক্ষেত্রে তা যদি বা কখনও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,মন রাঙিয়ে দিয়ে যায় তো তাও ক্ষণিকের জন্যে, এই বিশ্বাসই এতকাল মনের মধ্যে লালন করে চলেছিলাম।

পুরুষের প্রেমকে আমি কোনদিনই বিশ্বাস করব না আর, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। ভেবেছিলাম, পুরুষের প্রেম প্রতারণারই নামান্তর। ভাল তারা বাসতে জানে না, বাসে না। আর মেয়েরা যাকে জীবনে একবার ভালবাসে তাকে কোনদিনই ভুলতে পারে না। প্রবঞ্চিত, ব্যর্থ হয়েও তাকেই সারা জীবন মনে রাখে। নতুন করে আরেক জনকে হৃদয়ের আসন পেতে দিয়ে বসতে বলে না।

আমার যখন আঠারো বছর বয়েস, তখন আমি যে কলেজে ভর্তি হলাম সে কলেজে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ত। আর তখন ছেলেমেয়েরা এত সহজে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেত না বলেই ওই কলেজটায় পড়বার আগ্রহ ছিল অনেকের। কিন্তু আমার তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। ছিল না, তার কারণ আমি ছিলাম ভীষণ লাজুক।

বাবা-মা আমার এই লাজুক স্বভাবটা একেবারেই পছন্দ করত না। বিশেষ করে মা চেয়েছিল আমি খুব আধুনিকা হয়ে উঠি। তাই এ কলেজটায় আমাকে ভর্তি করা হল।

প্রথমটা আমাব খুব ভয় ছিল। কিন্তু ভর্তি হওয়ার পর সব আশঙ্কা উবে গেল। দেখলাম, কো-এডুকেশান নামটা নামে মাত্র। অর্থাৎ একই রেজিস্টারে নাম লেখা আছে। একই সঙ্গে প্রফেসররা নাম ডাকেন—এই যা। বসার বেঞ্চিগুলোও ছিল পৃথক। আমরা মেয়েরা বসতাম প্রফেসরের টেবিলের দুপাশে। ছেলেদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে। ছোঁয়া বাঁচাতাম, কিন্তু দৃষ্টি নয়। কারণ তারা সামনের বেঞ্চিগুলোয় বসত, ফলে তাদের চোখ প্রতিনিয়তই এসে পড়ত আমাদের ওপর। কারও কারও চোখ যেন আমাদের সর্বশরীব লেহন করত, কারও কারও দৃষ্টি ছিল নম্র-করুণ।

প্রথম দলের মধ্যে পড়ে সুবিনয় রায়। নামে সুবিনয় হলেও বিনয়ের এক তিলও ছিল না তার চরিত্রে। প্রফেসরদের সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া করত সে, হেনস্থা করবার চেষ্টা করত, আর মেয়েদের উদ্দেশে এক এক সময় অশিষ্ট মন্তব্য করত।

আমার ওপরই তার যেন বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু আমার উদ্দেশে কখনো কোন অভব্য উক্তি সে করেনি। বরং করিডরে সুবিনয় যখন সিগারেট টানতে টানতে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করত তখন হঠাৎ আমাকে দ্রুত পায়ে হেঁটে যেতে দেখলেই ওর মুখের ভাব বদলে যেত। যেন কত ভাল ছেলে, নিরীহ গোবেচারি।

ওর এই ব্যবহারটা যে আসলে আমার সম্পর্কে ওর মনের দুর্বলতার ফল, তা প্রথম প্রথম বুঝতে পারিনি। আমি ভাবতাম, অমন যে দুঃসাহসী ছেলে সুবিনয়, সেও আমাকে ভয় পায়। আমার ব্যক্তিত্বের কাছে সে শ্রদ্ধানত, কিংবা ভীত—এই ধারণাই আমার ছিল।

তাই আমি ওকে আরও বেশি করে উপেক্ষা করতে শুরু করলাম। এবং আমি ওকে যত উপেক্ষা করতে লাগলাম সুবিনয় দিনে দিনে ততই নৃশংস হয়ে উঠতে চাইল।

এতদিন ও পিছনের বেঞ্চিতে বসত। ক্রমশ ও সামনের বেঞ্চিতে এগিয়ে এল। আমার সম্পর্কেও আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বন্ধুদের দু-একটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শোনাতে শুরু করল। প্রথম প্রথম আমি এমন ভান করতাম, যেন ওর কোন টীকাটিপ্পনীই আমি শুনতে পাইনি।

আমার রোল নম্বর ছিল টোয়েন্টি-নাইন। একদিন রোল কল করতে করতে প্রফেসর বোস যেই আঠাশের পর উনত্রিশ নম্বর ডেকেছেন, আমি সাড়া দেবার আগেই দেখি কি, সুবিনয় সাড়া দিয়ে বসল।

প্রফেসর বোস একটু ভাবে-ভোলা ধরনের অধ্যাপক ছিলেন, তাই তিনি কিছু ধরতে পারলেন না। আমার নামের পাশে 'পি' লিখে তিরিশ নম্বরে চলে গেলেন। কিন্তু ক্লাশসুদ্ধ

সকলেই লক্ষ করল, আর মেয়েরা সশব্দে হেসে উঠল। প্রফেসর বোস বুঝতে না পেরে এদিক-ওদিক তাকালেন, তারপর ডাকলেন—থার্টিওয়ান।

সুবিনয় পরিত্রাণ পেয়ে গেল।

কিন্তু লজ্জায়-অপমানে আমি মাটিতে মিশে গেলাম।

আমাদের বেঞ্চিগুলো ছেলেদের বেঞ্চির সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে বসানো থাকত। অর্থাৎ আমাদের বেঞ্চির একেবারে বাঁদিক ঘেঁসে বসলে সামনের বেঞ্চির ছেলেদের ডেস্কের সঙ্গে কোন দূরত্বই আর থাকত না।

একদিন একটু দেরিতে এসেছি, জায়গা না পেয়ে বাঁদিক ঘেঁসে বসতে বাধ্য হলাম। প্রফেসর এসে গেছেন তখন।

হঠাৎ দেখি কি, ঠিক আমার কাছেই যে ছেলেটি বসেছিল, সুবিনয় ওধার থেকে উঠে এসে তাকে বললে, উঠুন তো স্যার, এখানে আমি বসব।

আমি আড় চোখে তাকিয়ে দেখলাম, ছেলেটি সেখান থেকে উঠে গেল। আর সুবিনয় এসে বসল সেখানে। অনেকের চোখেই সেদিন কৌতুকের হাসি দেখতে পেলাম।

আরেকদিন। এসে দেখি ব্ল্যাকবোর্ডে একটা ছড়া লেখা রয়েছে।

মেয়েটির নাম ছন্দা,
বাজার পড়েছে মন্দা।

রাগে জ্বলে উঠলাম আমি। মনে হল কষে একটা চড় বসিয়ে দিই সুবিনয়ের গালে।

কিন্তু অপমানের বুঝি আরও কিছু বাকি ছিল।

ক্লাস হয়ে যাবার পর বইখাতা নিয়ে ওঠবার সময় চুল ঠিক করতে গিয়ে হাতে চটচটে কি লাগল। জট ছাড়াতে গিয়ে দেখি কি, চিউইংগাম খেয়ে আমার চুলে সেগুলো কে লাগিয়ে দিয়েছে।

কে আর লাগাবে। বেশ বুঝতে পারলাম, সুবিনয়ের দিকে মাথা হেলিয়ে যখন নোট নিচ্ছিলাম তখন আমার চুলগুলো হয়তো ওব ডেস্কের সামনে পড়েছিল, আর ও-ই এ কীর্তি করেছে।

আমার চোখ দিয়ে সেদিন জল পড়তে বাকি রইল। আমি ঠিক করলাম, প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে নালিশ করব।

কিন্তু প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে এ-কথা বলতেও আমার কেমন লজ্জা হল। তাই শেষ পর্যন্ত আর বলা হল না।

তারপর একদিন ক্লাসে যাইনি। লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ছি একটা, ঘণ্টা পড়তেই নিভা, আমার বন্ধু, ছুটে এল।

—এই ছন্দা, ক্লাসে যাসনি, একটা কাণ্ড হয়ে গেছে।

—কি হয়েছে!

নিভা হেসে বললে, সুবিনয় তোর প্রক্সি দিতে গিয়ে সে এক কাণ্ড।

শুনে সর্বাঙ্গ রাগে জ্বলে গেল আমার। প্রফেসর সেন প্রত্যেককে চেনেন, তাই রোল নম্বর টোয়েন্টি-নাইন ডাকতেই সুবিনয় যেই ইয়েস্ স্যার বলে উঠেছে অমনি তাকে ধরেছেন তিনি। প্রশ্ন করেছেন, তুমি মিস্ ছন্দা রায়? সঙ্গে সঙ্গে সারা ক্লাশ হো হো করে হেসে উঠেছে। নিভা বললে।

—তারপর?

—তারপর প্রফেসর সেন জিগ্যেস করলেন। প্রক্সি দিলে কেন তুমি?

—সুবিনয় কি বললে?

—বললে, তুই নাকি তাকে প্রক্সি দিতে অনুরোধ করেছিলি।

আমি আর কোন কথা বললাম না, তরতর করে দোতলায় নেমে এসে কমন রুমের দিকে এগিয়ে এলাম। আর ঠিক সেই সময় দেখলাম, সুবিনয় আসছে তার বন্ধুদের সঙ্গে হাসাহাসি করতে করতে।

কি হল জানি না। আমি দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে বললাম, শুনুন!

সুবিনয় বিব্রত বোধ করলে, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এল।

আর আমি মুহূর্তের জন্য সব ভুলে গেলাম। পায়ের স্লিপারটা খুলে পাগলের মত সুবিনয়ের দু-গালে বসিয়ে দিলাম। তারপর সেটা নীচে ফেলে পায়ে গলিয়ে কমনরুমের দিকে চলে গেলাম, একটা কথাও বললাম না।

কমনরুমে গিয়ে কিন্তু আমি এক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে বসতে পারলাম না। ক্লাসে যেতে পারলাম না। কারও সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারলাম না। সারা শরীর তখনও থরথর করে কাঁপছে।

কিছুক্ষণ পরেই আমি বাড়ি ফিরে এলাম। সে-রাত্রে আমি এক মুহূর্তের জন্যও চোখ বুজতে পারলাম না। ঘুম এল না একবারও। আর মনে হল আমার যেন জ্বর এসেছে। সারা শরীরে কেমন জ্বর জ্বর ভাব। চোখ জ্বালা করছে। মাথা ঘুরছে। অনুশোচনায় জ্বলতে লাগলাম আমি। মনে হল, ছি ছি এ কি করলাম!

পুরো একটা সপ্তাহ আমি কলেজে যেতে পাবলাম না। ভীষণ লজ্জা করতে লাগল। মনে মনে ভাবলাম, যদি আমার হয়ে প্রক্সি দিয়েই থাকে সুবিনয় কি এমন অন্যায় করেছে। হয়তো আমার উপকার করার জন্যেই প্রক্সি দিতে গিয়েছিল, ধরা পড়ার পর নিজেকে বাঁচাবার জন্য মিছে কথাটা অনায়াসে বলে ফেলেছে।

একবার ইচ্ছে হল সুবিনয়ের সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চেয়ে নেব। আবার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। কি জানি এব পর কি সাংঘাতিক প্রতিশোধ নিয়ে বসে সে! ভয় আর অনুশোচনাব মধ্যে দ্বিতীয়টাই শেষ পর্যন্ত জয় হল।

ধীরে ধীরে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে উঠল। কিন্তু করিডরে, ক্লাসে বা লাইব্রেরিতে সুবিনয়ের সঙ্গে চোখোচোখি হলেই দেখি ও লজ্জায় মাথা নিচু করে চট করে সেখান থেকে সরে যায়। পিছনের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে। আগের মত টীকাটিপ্পনী কাটে না। আর হঠাৎ একদিন দেখলাম ব্ল্যাকবোর্ডে আরেকটা ছড়া উঠেছে :

সুবিনয় রায়,
পাদুকাপ্রহার পেল, হায় হায় হায়!

বেচারা এমনিতেই কারও সঙ্গে চোখ তুলে কথা বলতে পারছে না, চোখোচোখি হতেও ভয়, তার ওপর এমন অপমান! ও ভাববে না তো যে আগের সেই ছড়াটার প্রতিশোধ নেবার জন্যে এটা আমিই লিখিয়েছি!

আমি ঠিক করলাম, একদিন ওকে ডেকে কথা বলব, ক্ষমা চাইব। এতখানি নৃশংস হতে তো আমি চাইনি।

একটা বিশ্রী মানসিক অশান্তির মধ্যে দিনের পর দিন কাটতে লাগল।

তারপর একদিন ভাবলাম ক্ষমা চাইব সুবিনয়ের কাছে, মনের ভার হালকা করব। তাই ছুটির পর অপেক্ষা করলাম কলেজ গেটের বাইরে। সুবিনয় বেরিয়ে আসতেই চোখোচোখি হল, ও লজ্জায় চোখ নামিয়ে অন্য পথে সরে পড়বার চেষ্টা কবল। আমি দ্রুত পায়ে গিয়ে বললাম, শুনুন।

সুবিনয় থেমে দাঁড়াল। বিস্মিত হল।

বললাম, আপনার সঙ্গে দুটো কথা আছে।

একটু থেমে বললাম, চলুন না, ওই চায়ের দোকানটায় গিয়ে বসি।

যেতে যেতে বললাম, আপনি আমাকে মাফ করবেন। রাগের মাথায় যা করে বসেছি···

হয়তো সব কথা স্পষ্ট করে বলতেও পারিনি। কারণ তখন আমি থরথর করে কাঁপছিলাম। আবেগে, আশঙ্কায়, কেমন এক বিচিত্র অস্বস্তিতে।

সেদিন চা খেয়ে একটা পার্কের বেঞ্চে এসে আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে কাটিয়েছিলাম। কেউ কোন কথা বলতে পারিনি। শুধু মনের ভার গিয়েছিল হালকা হয়ে।

তারপর ধীরে ধীরে কি-ভাবে কখন থেকে যে আমরা দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম, ভালবাসলাম পরস্পরকে, আমি নিজেও বুঝতে পারি না।

একদিন শুধু আবিষ্কার করলাম, সুবিনয়কে বাদ দিয়ে আমার জীবন নিরর্থক, মিথ্যা।

সুবিনয়ের কাছে তখন আর আমার কিছুই অদেয় নেই। নিজেকে নিঃশেষে তার কাছে বিলিয়ে দিতে পেরেছিলাম, তার কারণ সুবিনয়ের ওপর আমার আস্থা ছিল কল্পনাতীত।

কিন্তু একদিন আমার সব স্বপ্ন ভেঙে গেল।

একটা ফাঁকা ক্লাসরুমে আমরা দুটি মেয়ে বসে বসে নোট লিখে নিচ্ছিলাম আরেকজনের খাতা থেকে। হঠাৎ হাসি চিৎকার হট্টগোল কানে এল। পাশের ক্লাস-রুমটাও ফাঁকা ছিল। কখন এক দল ছেলে এসে বসেছে।

হঠাৎ সুবিনয়ের গলা শুনলাম।

কান পেতে শুনতেই কান লাল হয়ে গেল।

ওর কোন একজন বন্ধু ওকে বললে,পাদুকা ও প্রেম বলে একটা গল্প লিখছি সুবিনয়।

সুবিনয় যা জবাব দিলে কোনদিন ভাবিনি আমাকে তা কখনও শুনতে হবে।

সুবিনয় হেসে উঠে বললে, প্রেম ? প্রেম নয়, প্রতিশোধ। ছন্দাকে আমি ভালবাসি তোর ধারণা ? আমি শুধু অপমানের প্রতিশোধ নিলাম,আর কিছু নয়।

আমার পাশে যে মেয়েটি বসেছিল, আমার বন্ধু, সেও আমার মুখের দিকে তাকাল, আমি তার।

এর পব আমি আর সুবিনয়ের সঙ্গে একটা দিনের জন্যও দেখা করতে চাইনি, কথা বলিনি। কলেজ ছেড়ে দিলাম সেদিন থেকেই।

মামার কাছে মানুষ হয়েছিলাম। তাঁকে বললাম, আমি পড়ব না আর।

কয়েকটা বছর নষ্ট হল। জীবনের যেন উদ্দেশ্য নেই কোন, কোন অর্থ নেই।

শেষে নার্সিং পড়তে শুরু করলাম এক সময। নিজের পায়ে তো দাঁড়াতে হবে।

শিখলাম, পাশ করলাম, চাকরি নিলাম। পুরুষমানুষকে আমি সহ্য করতে পারতাম না। মনে হত তারা সকলেই এক জাতের মানুষ। তাই এমন একটা হাসপাতালে চাকরি নিলাম, যেখানে মেয়েদের সেবা করতে পারব। তাদের কষ্টের সময় একটু সান্ত্বনা, একটু শান্তি দিতে পারব।

দিনের পর দিন এমনি ভাবেই কেটে চলেছিল।

এ হাসপাতালে মেয়েরা আসত শুধু কটি দিনের জন্যে। থাকত, চলে যেত এক মুঠো আনন্দ আর হাসিকে দুহাতে বুকে চেপে।

সুনন্দাকে কেন যে এত ভাল লাগল জানি না। কেন ভাল লাগল তার এক ফোঁটা ছোট্ট মেয়েকে।

আর কমলেশকে—

ওই এক ফোঁটা মেয়েটাকেই—বুলাকেই আমার ভাল লেগেছিল। কিন্তু বুলাকে উপলক্ষ করে কখন থেকে কমলেশ যে আমার মন জুড়ে বসেছে আমি টেরও পাইনি।

প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জীবনে আর কোন দিন কোন পুরুষের আকর্ষণে নিজেকে বাঁধব

না।

কিন্তু পারলাম না। কেন কে জানে। বুলাই আমাদের দুজনের মধ্যে একটা গোপন সেতু বেঁধে দিলে।

কমলেশের কথা

মাঝে মাঝে সেই ছোকরা ডাক্তারটির কথা মনে পড়েছে, আর অসহ্য ঈর্ষায় জ্বলেছি।

'হাসপাতালের ফটকের সামনে এসে গাড়ি থামল, ডাক্তারটির পাশের আসন থেকে নামল ছন্দা, হাসল, কথা বলল পরস্পরে অন্তরঙ্গ কৌতুকে।' এই ছোট্ট দৃশ্যটুকু বারবার মনের পটে ভেসে উঠেছে।

ঐ ডাক্তারটির সঙ্গে কি প্রেমপ্রীতির সম্পর্ক ছন্দার ? হয়তো তাই। নার্সদের নামে কত কি তো শোনা যায়। সুশ্রী বা সুন্দরী কোন নার্স ইচ্ছে থাকলেও কি নিজেকে বাঁচাতে পারে আর পাঁচজন ডাক্তারের কামলুব্ধ হাত থেকে ? হয়তো পারে না। হয়তো ছন্দা আর পাঁচজন নার্সের মতই।

আর পাঁচজন মেয়ের মতো নিশ্চয়ই। তা না হলে বুলাকে সে এত ভালবাসে কেন ? কি পায় সে বুলার কাছে ! গোপন মনে কি সেও মা হতে চায় ? সংসার আর সুখ চায় ?

কে জানে, ঐ ডাক্তারটিকে হয়তো বিয়ে করবে ছন্দা। কত নার্সই তো করে। কিন্তু, ডাক্তারটি কি ওকে বিয়ে করবে ? বিচিত্র মন ডাক্তারদের। ওরা কি জানে না, নার্সদের কারো কারো স্বভাবচরিত্র ভাল হয় না, ভাল থাকতে দেয় না কেউ। তবু একজন নার্সকে বিয়ে করতে চায় কি করে ওরা ?

কিংবা, কে জানে, এ-সবই হয়তো মিথ্যা রটনা। নার্সদের অকাবণ দুর্নাম রটায় বাইরের লোক। ডাক্তাররা তাদের ঘনিষ্ঠভাবে দেখে, জানে, তাই সত্যিকারের মূল্য তারা দিতে পারে।

কিন্তু ছন্দাকে ঐ ছোকরা ডাক্তারটি যদি বিয়ে করে আমি কি খুশি হব ? না। বিয়ে আমি হতে দেব না।

ছি ছি, একি ভাবছি আমি ? অধঃপতনের পথে নেমে চলেছি কি আমি ? না, এখনও কোন অন্যায় আমি করিনি। আমি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। আমার স্ত্রী আছে, কন্যা আছে, আত্মীয়-স্বজন আছে। আমাব স্ত্রী নাকি খুব সুন্দরী। হ্যাঁ, সুন্দরী সত্যিই। ইদানীং হয়তো একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। প্রসবের পর কোন্ মা না হয়।

তবু সুনন্দাকে কেন আর আগের মত সুন্দর মনে হয় না ? আমি কি ওকে ভালবাসি না ?

ভালবাসি, আমি ওকে আমার ঘুমের মত নিবিড় করে ভালবাসি।

আর বুলা ? আমার হৃৎপিণ্ডের মত একান্ত আপন।

ওকে যখন বুকের ওপর চেপে ধরি, দুটি হৃৎপিণ্ড যেন একই লয়ে ওঠানামা করে। বুকের মাঝখানকার সবটুকু শূন্যতা যেন ভরে যায় বুলাকে যখন বুকেব ওপর চেপে ধরি।

সুনন্দা দিনে দিনে পুরনো হয়ে চলেছে, আর বুলা যেন দিনে দিনে নতুন হয়। নতুনতর আবিষ্কার যেন।

আবিষ্কারই তো! দুটো একটা করে কথা ফুটতে শুরু করেছে ওর মুখে।

যা শোনে তাই বলবার চেষ্টা করে। যা দেখে তাই অনুকরণ করে! ছোট ছেলেদের ঐ এক স্বভাব। সকলে বোধ হয় একই ভাবে নকল করে না।

ভোরবেলায় বাসন মাজার ঠিকে ঝি আসে, কলিং বেল টেপে। ঘণ্টি বাজে আর কোনদিন সুনন্দা, কোনদিন বাচ্চা চাকরটা সাড়া দেয়।—কে ? যাচ্ছি।

সকালে বিকেলে গয়লা আসে। ঘণ্টি বাজায়। তারপর একই প্রশ্ন।—কে ?

সন্ধের সময় আপিস থেকে ফিরে কোন কোনদিন দেখি কপাট বন্ধ। ঘণ্টি বাজাই। আর সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাই বুলার কচি-কণ্ঠের প্রশ্ন।—তে ?

কয়েকদিন থেকেই এই একটা নতুন খেলা পেয়েছে বুলা। ঘণ্টি বাজলেই চিৎকার করে প্রশ্ন করে, তে ?

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। হাতের পুতুল ছেড়ে উঁকি দিয়েও দেখে না কে এল কে গেল। সাড়া পেলেও উত্তর দেয় না।

শুধু আমি যখন আপিস যাই বাইরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আসে বুলা, কোনদিন সুনন্দার কোলে, কোনদিন নীতুর কোলে, আর মৃদু হেসে বলে, বাবা এতো।

কথাটা সুনন্দাই শিখিয়ে দেয়, বলে, বল, বাবা তাড়াতাড়ি এস।

এত কথা ওর ছোট্ট মুখে ধরে না, ছোট করে বলে, বাবা এতো।

ছোট্ট ভাঙা ভাঙা কথা, তবু বড়ো মিষ্টি লাগে শুনতে। মিষ্টিই তো, তা না হলে একে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করবে কেন।

হেসে বলি, আসব, তাড়াতাড়ি আসব। ওর মতোই ছেলেমানুষি ঢঙে অস্পষ্ট উচ্চারণে বলি।

আর সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওর কথাটা মনে পড়ে যায়, ওর মুখ। তাড়াতাড়ি ফেরার অনুরোধটুকু যেন বুলারই। একবারও মনে হয় না, ওর পিছনে সুনন্দার ইচ্ছাটুকু লুকিয়ে আছে।

সুনন্দা কি ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে ? না, আমিই হয়তো ওর কাছ থেকে সরে এসেছি। এত হাসি, কথা, ঘরোয়া পরামর্শ, এত অন্তরঙ্গ হয়েও কোথায় যেন একটা দূরত্ব বেড়ে চলেছে।

এক এক সময় এই অপরাধবোধ জেগে ওঠে মনের মধ্যে। আর তখন নিজেকে বড়ো ক্ষুদ্র মনে হয়, অকৃতজ্ঞ মনে হয়। আদরে আদরে, অকৃত্রিম ভালবাসার প্লাবনে ডুবিয়ে দিতে চাই তখন সুনন্দাকে।

এক একদিন আপনা থেকেই বড়ো আপন মনে হয় সুনন্দাকে, ভাল লাগে। তেমনি মুগ্ধতা নিয়েই বুঝি বসেছিলাম সেদিন শীর্ণ এক ফালি বারান্দার পাশে।

হয়তো ছুটির দিন সেটা। সামনে বঁটি পেতে আনাজের ঝুড়ি নিয়ে বসেছিল সুনন্দা। কুটনো কুটছিল।

বুলা বসেছিল আমার কোলের কাছে, খবরের কাগজটা পরম আনন্দে ছিঁড়ছিল।

সুনন্দা হেসে বললে, কাগজটা সরিয়ে নাও।

হাসলাম, কিন্তু সরিয়ে নিলাম না কাগজখানা।

কপট ক্রোধে ফেটে পড়ল সুনন্দা।—মাসের শেষে চিৎকার কোর না, এক সেরের বেশি কাগজ হল না কেন বলে।

বললাম, বারো আনা সেরে কতই বা পাওয়া যায়।

কই, এ-কথা এতদিন তো বলোনি, এখন নিজের মেয়ে ছিঁড়ছে কিনা। রাগ দেখিয়ে, কিংবা অন্য কাজে দপদপ করে চলে গেল সুনন্দা।

আর সেই মুহূর্তে গয়লা এসে দাঁড়াতেই বুলা বলে উঠল, বাবা তাতা দাও।

—তাতা ? সে আবার কি ?

সুনন্দা ততক্ষণে ফিরে এসে বুলার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

বুলা আবার বলে, তাতা দাও।

সুনন্দা হেসে গড়িয়ে পড়ল। এসে বুলার হাতে একটা চিমটি দিয়ে বললে, পাকা মেয়ে।

গয়লা কাল এসে বলেছে, টাকা দাও, ও তাই গয়লাকে দেখলেই বলে, টাকা দাও।
শুনে হেসে উঠল নীতু আর মা।
কিন্তু বুলা যে এমন একটা কাণ্ড করে বসবে তা কে জানত!
পাকা মেয়ে সত্যিই।
সেদিন সন্ধের পর আপিস থেকে ফিরেছি, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছি, দেখি বুলাকে কোলে নিয়ে সুনন্দা দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মাথায়।
আমাকে দেখেই সুনন্দা বললে, ছন্দা এসেছে।
—ছন্দা! কোথায়? হয়তো অজান্তেই আমার গলার স্বরে আগ্রহ ফুটে উঠেছিল।
তাই কৌতুকে হাসল সুনন্দা, বললে, ঘরে।
একরকম ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকলাম। কিন্তু কই, কেউ তো নেই ঘরে।
বললাম, কোথায়?
সুনন্দা ততক্ষণে বিছানার ওপর বুলাকে ফেলে দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে।
হাসতে হাসতেই বললে, কেমন ঠকিয়েছি!
ঠকিয়েছি! একটা সন্দেহের কাঁটা এসে লাগল বুকে। তবু ভেতরে ভেতরে লজ্জিত হলাম। সত্যি সুনন্দার সামনে এতখানি আগ্রহ না দেখালেই কি হত না?
কিন্তু সুনন্দাই বা হঠাৎ এভাবে বলল কেন। ও কি দেখতে চেয়েছে ছন্দার নাম শুনে আমি খুশি হয়ে উঠি কিনা? কিংবা ছুটে যাই কিনা ঘরের মধ্যে?
মানুষ কারও কাছে ঠকে গেলে তাকে সহ্য করতে পারে না, তার ওপর চটে যায়। সেই জন্যেই হয়তো সুনন্দার ওপর চটে গেলাম আমি। গম্ভীর হয়ে রইলাম, ওর রসিকতায় যোগ দিতে পারলাম না।
একবার শুধু মনে হল, সুনন্দা হয়তো সন্দেহ করেছে এত দেরি করে যখন ফিরেছি তখন নিশ্চয়ই ছন্দার কাছে গিয়েছিলাম।
হয়তো আশা করেছিল, নাকি আশঙ্কা, যে 'ছন্দা এসেছে' শুনেই আমি বলে বসব, এই তো ছন্দার কাছ থেকেই আসছি।
কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য রাগ নিবে গেল। বুঝলাম, সুনন্দা শুধুই একটু রসিকতা করতে চেয়েছিল। সন্দেহ নয়। কেন হবে সন্দেহ। ছন্দা কে, কি এমন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে? আমার মনে ছন্দার সম্পর্কে একটা দুর্বলতা আছে বলেই কি ছন্দাও সে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবে!
তবু, ছন্দার কাছে একদিন যাওয়া উচিত। অনেক করেছে সে বুলার জন্যে। সেটুকুর জন্যে অন্তত ধন্যবাদ জানিয়ে আসা উচিত।
পরের দিন আপিস থেকে ফেরার পথে ভাবলাম, সুনন্দাকে সঙ্গে নিয়ে যাব আজ ছন্দার ফ্ল্যাটে। সুনন্দা কি যেতে রাজি হবে না? না যায়, বুলাকে সঙ্গে নিয়েই যাব।
না, একা একা যেতে কেমন একটা অস্বস্তি। সেই জন্যেই বোধ হয় যেতে পারিনি একদিনও।
কিন্তু বাড়ি ফিরে জামা খুলতে খুলতে দেখলাম খাটের ওপর বসে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছে বুলা। আর সুনন্দা পাশে বসে হিসেবের খাতায় গরমিলের অঙ্ক বসাচ্ছে।
আমাকে দেখেই বুলা মুখ তুলে তাকাল, বললে, বাবা।
—কি বলো? বুলার পাশে গিয়ে বসলাম।
বুলা বললে, তন্না এছে।
—কি? বুঝতে না পেরে আবার প্রশ্ন করলাম।
বুলা এবার একটু সজোরেই বললে, তন্না এছে, তন্না। বলেই হেসে উঠল খিলখিল

করে।

সুনন্দার হিসেব মিলছিল না হয়তো, তাই প্রথমটা কানে যায়নি ওর। এবার কথাটা শুনেই ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বললে, ডেঁপো মেয়ে!

মার খেয়ে কেঁদে উঠল বুলা, দুহাত বাড়িয়ে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বললাম, কাঁদালে কেন?

সুনন্দা হেসে উঠল এবার। বললে, কি বলছে জানো।

—কি?

—বলছে, ছন্দা এসেছে। বাপের সঙ্গে ইয়ার্কি মেয়ের। বলেই হেসে গড়িয়ে পড়ল।

আর আমি জামাটা আবার আলনা থেকে টেনে নিয়ে বললাম, চলো বুলা, ছন্দার কাছে যাই চলো।

সুনন্দা কৌতুকের চোখে তাকাল। বললে, বেশ তো যাও না ওকে নিয়ে।

বুলাকে নতুন-কেনা রঙ ঝলমল একটা ফ্রক পরিয়ে দিল সুনন্দা।

বললে, যাও বেড়িয়ে নিয়ে এস ওকে ছন্দাদের ওখান থেকে। ওর অসুখের সময় বেচারী অনেক করেছে, অথচ যেতে বলেছিল, একদিনও যেতে পারলাম না।

বেশ সহজ সুরেই বললে সুনন্দা, কোথাও 'কিন্তু' নেই, না কোন অসন্তুষ্ট ভাব। যেন সত্যিই খুশি হয় ও, ছন্দার সঙ্গে দেখা করতে গেলে।

রাস্তায় বেরিয়ে সুনন্দার ওপর মনটা খুশি হয়ে উঠল। নতুন করে যেন ভাল লাগল সুনন্দাকে। ভাল লাগল? ওর সরল বিশ্বাসের পাশে অবিশ্বাসী নিজের মনটাকে দাঁড় করিয়ে নিজের কাছেই যেন লজ্জিত হলাম। ভাবলাম, না সুনন্দার এই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখব। ভালবাসব, শুধুই তাকে। আর কেউ নয়। ছন্দার প্রতি যদি কোন আকর্ষণ থেকে থাকে মনের গোপনে মুছে ফেলব।

নিজেই নিজেকে যেন প্রবোধ দিলাম : শুধুই সৌজন্য দেখাতে যাচ্ছি ছন্দাকে, আর কিছু নয়। সত্যি অনেক করেছে ছন্দা। হাসপাতালে নিত্য নতুন মানুষের আনাগোনা, প্রতিদিনই কত ছেলেমেয়ে আসছে এ পৃথিবীতে, দু-দিনের মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে তাদের বিদায় দিচ্ছে ছন্দার মত আরও কত নার্স। কই তারপর আর তো তারা কোন খবরই রাখে না তাদের।

মনে হল, ছন্দা সত্যিই বুঝি অন্য নার্সদের মত নয়।

নয়ই তো। ছন্দার ছোট্ট ফ্ল্যাটের দুখানা ঘরের ছিমছাম রূপটা দেখেও মনে হয়, কোথায় যেন একটা পার্থক্য আছে।

এর আগে একটা দিনই এসেছিলাম। সেদিন কিন্তু এত ভাল কবে দেখিনি, দেখতে পাইনি। সুনন্দাকে সঙ্গে আনতে বলেছিল ও, কিন্তু ইচ্ছে করেই বোধ হয় এড়িয়ে গিয়েছিলাম।

সুনন্দা একবার শুধু বলেছিল, আমি যাব কি করে? গেলেই তো সাত-সতেরো শুনতে হবে সকলের কাছে, বলবে দাঁত ওঠার সময় অমন সকলেরই হয়। তার আবার ডাক্তারবদ্যি কেন?

সুনন্দার কথাটা যেন কতই যুক্তিপূর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলাম, তা বটে।

বলে একা একাই বুলাকে নিয়ে এসেছিলাম। ছন্দা বোধ হয় তৈরি হয়েই ছিল, আমাকে দেখতে পেয়েই তরতর করে নেমে এসে বলেছিল, চলুন ডক্টর সেনকে ফোন করে রেখেছি।

ফ্ল্যাটটা সেদিনও তাই ভাল করে দেখা হয়নি।

চৌমাথার মোড়ের বিরাট ম্যানসনটার অগুন্তি ফ্ল্যাট। কাঠের সিঁড়ি পাক খেয়ে খেয়ে

চারতলা অবধি উঠে গেছে। কিন্তু ছন্দার ঘরখানা রাস্তার দিকেই দোতলায়। আজ আবার তার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

কড়া নাড়তেই ভিতর থেকে ছন্দা সাড়া দিল।—এক মিনিট।

একটু পরেই এসে কপাট খুলল ও, আর সঙ্গে সঙ্গে একমুখ খুশির হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।—আরে, বুলা। কী আশ্চর্য, আপনারা আসবেন, বুলা আসবে আমি ভাবতেই পারিনি।

প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বুলাকে কোলে তুলে নিল ছন্দা, বুকে চেপে ধরল তাকে, মুখটা গালের ওপর, বুলার গালে গাল ঘসল, ঘূর্ণির মত দুটো পাক দিয়ে বুলাকে কাঁধে তুলে বাইরের বারান্দায় আরাম কেদারাটায় বসে পড়ল।

তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে বললে, ও মা আপনাকে বসতেই বলিনি! বসুন এখানে।

বলে খিলখিল করে হেসে উঠল ছন্দা। আর তা দেখে বুলাও হেসে উঠল।

আর আমি তাকিয়ে রইলাম ওদের দুজনের দিকে।

এক সময় উঠে গেল ছন্দা, কাকে যেন ডাকল, ফিসফিস করে কি যেন বলল তাকে। ফিরে এসে বসল আবার।

বললে, দিদিকে আনলেন না?

বললাম, আসবে আরেক দিন, আজ আসতে পারল না।

চুপ করে রইল ছন্দা। কথাটা যেন ওর কানে পৌঁছল না। বুলাকে কোলে বসিয়ে ও তখন উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর এক ফালি বারান্দার ছোট্ট আকাশের দিকে। যেন হঠাৎ কোন সুদূর অতীতে, কিংবা কোন অজানা ভবিষ্যতে চলে গেছে ও।

একটু পরেই হিন্দুস্থানী একটা ঝি এসে সামনের টুলে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রাখল। তারপর ছন্দার কোল থেকে বুলাকে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে বললে, আও বেটি, আও।

বুলা একবার আমার মুখের দিকে তাকাল, একবার ছন্দার মুখের দিকে, তারপর হাত বাড়িয়ে ঝি-টার কাছে গেল। বোধ হয় কিছু একটা পাবার লোভে।

বললাম, আপনি একা থাকেন? সাহস আছে আপনার।

ছন্দা হাসল—একা কোথায়, রামপিয়ারীও থাকে এখানেই।

রামপিয়ারী তা শুনে হাসল, তারপর ছন্দাকে প্রশ্ন করলে, বাচ্চাকে মিঠাই দেবো মাজী?

ছন্দা মাথা নাড়ল—না! বরং বিস্কুট দাও ওকে দুটো।

রামপিয়ারী বুলাকে নিয়ে চলে গেল। বোধহয় নীচের তলায় দোকান থেকে বিস্কুট কিনে দিতে।

আর আমরা দুজনেই চুপচাপ বসে রইলাম নির্জন নিঃশব্দ বারান্দাটায়।

কলকাতার আকাশে তখন সন্ধ্যা নামছে একটু একটু করে। রাস্তার মোড়ে আলো জ্বলে উঠেছে, কাছের আর দূরের বাড়িগুলোর জানালায় জানালায়ও। একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার দমক আসছে মাঝে মাঝে, একটা চাপা কোলাহলের গুঞ্জন। বোধ হয় ভিড় বাড়ছে রাস্তায়। চঞ্চল হয়ে উঠেছে নীচের দোকানগুলো।

চুপচাপ বসে আছি দুজনেই। যেন কথা নেই কোনও, কথা হারিয়ে গেছে। শুধু কাছাকাছি, পাশাপাশি বসে থাকার সান্নিধ্যটুকুই ভাল লাগছে।

এক সময় উঠে দাঁড়ালাম, ছোট্ট বারান্দাটার রেলিংয়ের পাশে এসে তাকিয়ে রইলাম রাস্তার দিকে।

চৌমাথার মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যাল জ্বলছে, নিবছে। ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলাচ্ছে আলোর সারি। দপ করে সবুজ আলোটা জ্বলে উঠল, বন্যার স্রোতের মত গড়িয়ে চলল গাড়িগুলো। ঝড়ের বেগে ছুটছে মানুষ বোঝাই স্টেট বাস। ঠুং ঠুং ঠং ঠং ঘণ্টি বাজিয়ে চলে গেল

ট্রামটা।

ছন্দাও উঠে দাঁড়িয়েছে, অনুভবে বুঝতে পারছি, আসছে, হ্যাঁ, পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল ও। আমার মতই। কেমন যেন উদাস বিষণ্ণ।

হঠাৎ একটা চাপা সুরের গলায় বললে, এমনি তাকিয়ে থাকতে বেশ লাগে, না?

হাসলাম। উত্তর দিলাম না। চুপ করে থাকতেই যেন ভাল লাগছে।

পরমুহূর্তেই একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে ফিরে তাকালাম। আবছা অন্ধকার, অন্ধকার। স্পষ্ট দেখা গেল না ছন্দার মুখখানা। ও কি কিছু ভাবছে, কিছু বলতে চায়?

ধীরে ধীরে শান্ত গলায়, একটা হতাশার সুরে ছন্দা বললে, আপনারা কত সুখী।

সুখী? কি বলছে ছন্দা? মানুষের বাইরেটা দেখেই কি অন্তরের কথা জানা যায়। নাকি ছন্দা বলতে চাইছে ও নিজে কত দুঃখী, কত নিঃস্ব।

তাকালাম ছন্দার মুখের দিকে, বললাম, ভুল।

শুধু একটি কথা, হয়তো সত্যিকারের মনের কথা। সত্যিকারের মনের কথা বলেই হয়তো অবিশ্বাস করল না ছন্দা, শান্ত গলায় বললে, তা হলে কেউই হয়তো সুখী হয় না।

দীর্ঘশ্বাস ফেললে ছন্দা।

বললাম, আপনি?

বিষণ্ণ হাসি হাসলে ও, অন্ধকারে সে হাসির পিছনে কোন অশ্রু আছে কিনা বুঝতে পারলাম না।

কি বলব এই ম্লান হাসির জবাবে, কি বলে সান্ত্বনা দেব।

ছন্দার হাতখানা তেমনি পড়ে আছে রেলিংয়ের ওপর, সাদা সুডোল হাতখানা আবছা অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছি। পাশেই আরেকখানা হাত। রুক্ষ, সবল। আবেগে কিংবা উদভ্রান্তিতে কাঁপছে হাতটা। এই মুহূর্তে কি ছন্দার হাতখানার ওপর হাত রাখব, সান্ত্বনা দেব। সেদিন যেভাবে ছন্দা হাতটা টেনে নিয়ে ঘড়ি দেখেছিল, তেমনি সরল অভিনয়ে!

রাখলাম। ছন্দার হাতের ওপর হাত রাখলাম।

না, হাত সরিয়ে নিল না ছন্দা। যেন অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে ছন্দা। না, ওর হাতের শিরার স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। স্পর্শের অনুভূতিতে বুঝতে পারছি, ছন্দা কাঁপছে, আবেগে, বিষণ্ণ ব্যথায়, আত্মহারা কোন মাদকতায়! নরম সুন্দর হাতখানা ওর কাঁপছে থরথর করে।

সান্ত্বনার ছলে বললাম, দুঃখ সকলের জীবনেই থাকে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল ছন্দা মুখোমুখি। মুখ তুলে তাকাল আমার মুখের দিকে।

চমকে উঠলাম। আবছা অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তার দু-চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু চকচক করছে। কাঁদছে, ছন্দা কাঁদছে।

কিসের এত ব্যথা, কি এমন গভীর দুঃখ! আমি বিভ্রান্ত বোধ করলাম। ছন্দা রায় নার্স। কর্তব্য থেকে এতটুকু বিচ্যুত হয় না যে মানুষটা, কাজ, কাজ আর কাজের ছদ্মবেশে যে নিজেকে ঢেকে রাখে, তার অন্তরেও বুঝি ব্যথা আছে।

হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ল ছন্দা, কান্নার গলায় বললে, সব, সব ছিল আমার···

কি আশ্চর্য, সেই মুহূর্তটির জন্যে আজ আমি নিজেকে ঘৃণা করি। আমার ক্লেদাক্ত মনটাকে সেদিন বুঝি নিজেই চিনতে পারিনি।

সেই মুহূর্তে আমি দুহাত বাড়িয়ে ছন্দাকে জড়িয়ে ধরলাম। সত্যিই কি সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলাম একটি ব্যথিত হৃদয়কে, না সবই অভিনয়? কে জানে। আমি নিজেই নিজের কাছে সবচেয়ে বড় রহস্য। কি করে জানাব সেই এক পলকের মনের খবর।

আমি দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলাম ছন্দাকে। ছন্দার কোমল শরীরটা যেন ভেঙে পড়তে চাইল। ওর মসৃণ পিঠের ওপর আমার হাত দুখানা হয়তো স্পর্শের মধ্য দিয়ে কিছু

একটা সান্ত্বনা দিতে চাইল, হয়তো অন্য কিছু।

চকিতে সচেতন হয়ে উঠল, আঁচলে চোখ মুছল, হাসল সপ্রতিভ হবার জন্যে, আর সেই মুহূর্তে রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, যৌবনের উন্মাদনা আমাকে সব কিছু ভুলিয়ে দিল।

আরও দৃঢ় আকর্ষণে কাছে টানলাম ছন্দাকে, তার মুখের ওপর মুখ নেমে এল···

সঙ্গে সঙ্গে ছটফট করে উঠল ছন্দা, ছাড়া পাবার চেষ্টা করলে।

ছাড়া পেয়েই দূরে সরে গেল ছন্দা, বারান্দায় আলো জ্বালল। আর সেই উজ্জ্বল আলোটা যেন সুতীব্র ধিক্কারের মত এসে লাগল আমার বুকে।

আলোটা জ্বেলে দিয়েই ভিতরে চলে গেল ছন্দা। আর অসীম লজ্জা, কল্পনাতীত একটা অন্যায়বোধ আমাকে গ্রাস করল।

আমি মাথা তুলে তাকাতে পারলাম না। ছন্দার দিকে তাকাতে ভয় পেলাম, তার সঙ্গে চোখোচোখি হবার ভয়।

হয়তো ছন্দারও সেই লজ্জা। তাই আলো জ্বেলে দিয়েই ভিতরে চলে গেল সে। ফিরল না; অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফিরে এল না সে।

আমি মাথা নিচু করে বসে রইলাম। মনে হল, ছন্দা আর ফিরবে না, কোনদিনই ফিরবে না।

ভাবলাম, রামপিয়ারীর নাম ধরে ডাকি।

ভাবলাম, বুলাকে নিয়ে নিঃশব্দে পালিয়ে যাই এখান থেকে, আমার বিকৃত আত্মার কাছ থেকে।

সেই মুহূর্তে একবার বুঝি মনে হয়েছিল, ছন্দার ঐ দোতলার বারান্দা থেকে চলন্ত ট্রাম-বাসের ভিড়ের মধ্যে লাফিয়ে পড়ি। নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলি।

কিংবা কে জানে, সত্যিই হয়তো তেমন কোন বাসনা উঁকি দেয়নি মনে। ঐ কল্পনাটুকু শুধুই একটা বিলাসের মত আত্মধিক্কারের গায়ে সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়েছিল।

পরক্ষণেই রামপিয়ারী এসে দাঁড়িয়েছিল বুলাকে কোলে নিয়ে।

রামপিয়ারীর দিকেও মুখ তুলে তাকাতে পারিনি।

বুলাকে তার কাছ থেকে নিয়ে বললাম, চলি।

দরজার চৌকাট পার হয়েছি, ছন্দা এসে দাঁড়াল। তেমনি মুখ নিচু করে। কোন কথা বলল না। না, বুলার সঙ্গেও নয়।

সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসতে আসতে হঠাৎ কি মনে হল, ফিরে তাকালাম। চোখোচোখি হল ছন্দার সঙ্গে। পরক্ষণে দুজনেই চোখ সরিয়ে নিলাম।

সারাটা রাস্তা আজেবাজে অনর্গল কথা বলতে বলতে এল বুলা। এক হাতে আমার মাথাটা জড়িয়ে ধরে আরেক হাতে ফুটপাতের ধারের দোকানগুলোর দিকে দেখাতে দেখাতে ও কি বলে গেল কিছুই কানে গেল না আমার।

ফিরে আসতেই সুনন্দা ছুটে এল।—তন্নার বাড়ি গিয়েছিলি বুলা?

বুলা বঝল না, তবু মাথা নেড়ে সায় জানাল।

আর সুনন্দা বুলাকে কেড়ে নিয়ে তার ফ্রকটা খুলে নিতে নিতে প্রশ্ন করলে, কি বলল ছন্দা? আসতে বলে এলে একদিন?

—হ্যাঁ। শুধু ঐ ছোট্ট উত্তরটুকু দিয়েই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু সুনন্দা নাছোড়বান্দা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যেকটি কথা ও জানতে চায়। ছন্দার ঘরখানা কেমন, আর কে কে আছে, কি বলল সে সুনন্দা যায়নি দেখে।

সুনন্দা যতবার প্রশ্ন করে ততবারই সেই অসীম লজ্জার দৃশ্যটা মনে পড়ে, বিষাক্ত কাঁটার মত খচখচ করে বুকের মধ্যে। শুধু লজ্জা? না। একটা অজানা আতঙ্কের মত ছন্দা যেন

আমার সমস্ত শরীর-মন গ্রাস করে আছে। বাবা মা ভাই বোন, দাদু ঠাকুমা সকলের মনে আমার সম্পর্কে যে ধারণাটা গড়ে উঠেছে তিল তিল করে, একটি ফুঁ দিয়ে আলো নিবিয়ে দেয়ার মত ছন্দা যেন আজ এক মুহূর্তে তা মুছে দিতে পারে। একটি ছোট্ট অপরাধ অথচ তার কথা যদি সুনন্দা জানতে পারে, যদি শোনে সে-কথা, তার এতদিনের গভীর ভালবাসা আর এই বিশ্বাস মুছে যাবে মুহূর্তের মধ্যে। আপিসের অমিয়বাবু হয়তো হাসবেন, আড়ালে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবেন।

সুনন্দা আবার বললে, একা থাকে ছন্দা, ভয় করে না ওর ?

উত্তর দিলাম না এ-কথার। তাড়াতাড়ি বুলাকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলাম।

বাবার ঘর।

নীতু বসে বোধ হয় স্কুলের পড়া করছিল। বুলাকে দেখতে পেয়েই সে ছুটে এল। টুনুমামা, দাও না একটু।

বাবা বকুনি দিল—পড়াশুনো নেই তোর ?

—বুলা পড়ছে না কেন ? নীতু অভিযোগ করলে, ও দিব্যি আদর খেয়ে খেয়ে বেড়াবে, আর আমি বসে বসে পড়ব। বয়ে গেছে।

নীতুর কথা শুনে বাবাও হেসে ফেলল, আর সে হাসি দেখে বুলা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল।

নীতু ওকে কেড়ে নিয়ে বললে, দেখবে টুনুমামা, দেখবে।

—কি ? বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলাম।

—দেখ না! বলে আসল রহস্যটা প্রকাশ না করে বুলাকে মেঝের ওপর বসিয়ে দিল।

তারপর হাততালি দিতে দিতে বলল, দেখি বুলা, দেখি।

বারকয়েক হাততালি দিতেই দেখা গেল, লাফ দিয়ে দিয়ে উঠছে বুলা, দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

বেশ কয়েকবার চেষ্টা করল বুলা, কিন্তু পারল না।

নীতু বললে, কাল একবার নিজে দাঁড়িয়েছিল। আজ ভুলে গেছে।

বাবা এসে বুলাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। বললে, নিজে উঠতে পারবে কেন, দাঁড় করিয়ে দে, তা হলেই···

নীতু প্রতিবাদ করল, কাল তো দাঁড়িয়েছিল। দুপরে ইস্কুল থেকে এসে দেখি মামীমা ঘুমুচ্ছে নাক ডাকিয়ে, আর বুলুরানী ঘুম থেকে উঠে নিজে নিজেই দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

বুলাকে এবার দাঁড় করিয়ে বার কয়েক ধরে ধরে হাঁটাল নীতু। তারপর হঠাৎ একবার ছেড়ে দিল।

কি আশ্চর্য! বুলা দাঁড়িয়ে আছে। কাঁপছে থরথর করে, হাসছে। ও যেন নিজে নিজেই হাঁটতে চাইছে, বড় হতে চাইছে।

বুলার সামনে থেকে দুহাত বাড়িয়ে নীতু ডাক দিল।—এসো বুলা, এসো এসো। পা-পা···

হাসল বুলা, নীতুর মুখের দিকে তাকাল, একবার, তারপর ধীরে ধীরে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে একটা পা তুলল—পড়ে যাবে বুঝি, টলে পড়বে—না, একটা পা সামনে ফেলল বুলা—নড়ছে, কাঁপছে এইবার বুঝি পড়ে যাবে—না, বাঁ পাটাও এগিয়েছে এবার—আবার ডান পা···না, হঠাৎ ধুপ করে পড়ে গেল বুলা। আর পড়ে গিয়েই খিলখিল করে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে বুলাকে কোলে তুলে নিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে এলাম সুনন্দার কাছে। এসে বললাম, এই, বুলা হাঁটতে শিখেছে, দেখবে ?

বলেই ওকে মেঝেতে নামিয়ে দিলাম। তারপর দুহাত ধরে দাঁড় করিয়ে বললাম, দেখি বুলা…পা…পা…

কিন্তু না, যতই হাততালি দিই, আর যতই তাকে হাত ছেড়ে দাঁড়াতে বলি, বুলা ধপ করে বসে পড়ে।

সুনন্দা হেসে বললে, এমন একগুঁয়ে হয়েছে, কারও কথা শুনবে না, নিজের ইচ্ছে হলে তবে…

সত্যি তাই। কিন্তু এও এক রহস্য, এর চেয়ে বড় রহস্য বোধ হয় আর নেই। সেই ছোট্ট থলথলে মাংসপিণ্ডটা একদিন শুধু পিটপিট করে তাকাত, অকারণে হাসত, ঘুমের ঘোরেও হাসত কখনও কখনও, আর মুখে হাত পুরে হাতটা চুষত সদাসর্বদা।

ঘুমের ঘোরে হাসতে দেখলে ঠাকুমা বলত, মা ষষ্ঠির সঙ্গে কথা বলছে।

আমরা বিস্ময়ে কৌতুকে তাকিয়ে দেখতাম।

সেই মেয়েটা ধীরে ধীরে একটা দুটো কথা বলতে শিখছে, হামাগুড়ি দিচ্ছে, হাঁটতেও শিখছে। এর চেয়ে বড় রহস্য সত্যিই বুঝি আব নেই।

আপিসে গিয়ে বড়বাবুকে বললাম, মেয়ে আমার হাঁটতে শিখছে অমিয়বাবু!

—তাই নাকি? একটা কপট আগ্রহ দেখালেন অমিয়বাবু। বোধহয় আগে যেদিন হামাগুড়ি দেয়ার খবর শুনে বিরক্ত হয়েছিলেন সেদিনের অনুশোচনাতেই।

হ্যাঁ, বিরক্ত হয়েছিলেন বলেই সংসারের আর কোন কথাই তাঁকে বলিনি। বলতাম না। মনে হয়েছিল, অমিয়বাবু তাঁর নিজের পরিবারের দুঃখকষ্টে নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে থাকেন, অপরের সুখ আনন্দ তাঁকে স্পর্শ করে না।

বোধ হয় তাই। বুলা হাঁটতে শিখছে শুনে খুব খুশি হলেন না তিনি।

শুধু বললেন, এ-সময়টায় খুব সাবধান থাকবেন, অসুখ-বিসুখ হলে ডাক্তার দেখাবেন…

সায় দিয়ে বললাম, তা তো বটেই।

অমিয়বাবু পানের ডিবে খুললেন, দুটো পান বের করে একসঙ্গে মুখে পুরলেন, কৌটো থেকে এক টিপ জর্দা। তারপব বললেন, আগে থেকে সাবধান হবেন, বুঝলেন? তা না হলে এই আমার মত ভুগতে হবে—সুখের সংসার হাসপাতাল হয়ে যাবে। এটার পেটের অসুখ, ওটার সর্দিকাশি, ছোটটার টাইফয়েড—লেগেই আছে। কোন্ সুখে যে লোকে ছেলেমেয়ে চায় জানি না।

অমিয়বাবু একদিন বুলার কথা শুনে বিরক্ত হয়েছিলেন, তার জন্য একটু অভিমান যে না হয়েছিল তা নয়! মনে হয়েছিল তিনি নিজের ছেলেমেয়েদেরও ভালবাসেন না, স্নেহ করেন না।

আজ অমিয়বাবুর প্রতি সহানুভূতিতে মনটা ভিজে গেল। সত্যি, রোগ বুঝি মানুষের মন থেকে সব স্নেহ-মমতা কেড়ে নেয়। হয়তো তাই।

কথাটা মনে পড়ল দিন কয়েক পরেই, বুলা আবার অসুখে পড়তে।

পর পর কয়েকদিন অঝোরে বৃষ্টি হয়ে গেল, রাস্তায় জল থইথই। এদিকে ঘরের ভেতর গুমোট গরম। পাখা না খুলে ঘুমোনো যায় না।

এরই মধ্যে কেমন করে যেন ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসল বুলা।

প্রথমটা গা ছ্যাঁকছ্যাঁক করছিল, তারপর সর্দি, শেষে কাশি।

মা ঠাকুমা নানারকম টোটকার ব্যবস্থা করলেন। তেজপাতা গোলমরিচ আরও কত কি এসে জড়ো হল কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

সারারাত ঘুমোতে পারে না মেয়েটা। ঘুমোতে দেয় না।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একদিন, কাশির শব্দে। চাদরটা সরিয়ে দিয়ে উঠে

বসতেই দেখি টুলের ওপর একটা ভাঙা কড়াইয়ে কাঠ কয়লার আগুন করে বুলার বুকে পিঠে তেল মালিশ করছে সুনন্দা। আর তার গরম হাতের ছোঁয়া পেয়ে পরম আরামের নিঃশ্বাস ফেলছে বুলা।

বললাম, কখন উঠেছ ?

সুনন্দা হেসে বলল, শুলাম কখন ? যা কষ্ট হচ্ছে বেচারীর···

একটা মুহূর্তের জন্যে আমি যেন ছোট হয়ে গেলাম সুনন্দার কাছে। সত্যি, বুলাকে আমার চেয়েও কেউ বেশি ভালবাসতে পারে, ভালবাসে, জানতাম না। ঘুমের ব্যাঘাত হলে আমি বরং মনে মনে একটু বিরক্তই হয়েছি।

কিন্তু···

টং টং করে দুটো ঘণ্টা পড়ল। রাত দুটো। এত রাত অবধি বসে বসে বুলার বুকে পিঠে তেল মালিশ করছে সুনন্দা।

অমিয়বাবুর কথাটা মনে পড়ল। রোগভোগ অভাব অনটন কোন কিছুই তা হলে স্নেহমমতা ধুয়ে মুছে দিতে পারে না। আসলে আমার—আমাদের ভালবাসাটা হয়তো সুনন্দাদের মত গভীর নয়।

আমি, আমি কি তা হলে বুলার হাসিটাই দেখতে ভালবাসি ? তার কান্না নয়, কষ্ট নয় ?

সুনন্দা বললে, তুমি শুয়ে পড়ো, রাত জাগলে কাল আবার আপিস যেতে পারবে না।

আর সুনন্দা ? রাত জাগার পরেও কি তাকে ভোরবেলায় ছুটতে হবে না উনোনে আঁচ দিতে, সারাদিন খাটতে হবে না ? ভালবাসা, সন্তানপ্রীতি হয়তো ওদের কোন অদৃশ্য শক্তি জোগায়।

শুয়ে পড়তেই সুনন্দা বললে, কাল সকালে একবার যা'ও না ডাক্তারের কাছে, সেই যার কাছে নিয়ে গিয়েছিল ছন্দা।

বললাম, যাব।

সকালে উঠে দেখলাম জ্বরের ঘোরে পড়ে রয়েছে বুলা। থার্মোমিটার দিলাম—জ্বর ১০৩-এর কাছাকাছি। বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।

সুনন্দা বললে, ওকে নিয়ে যেতে হবে না এই অবস্থায়, তুমি গিয়ে বরং নিয়ে এসো ডাক্তারকে।

বললাম, তাই ভাল।

সরাসরি ডাক্তার সেনের চেম্বারে চলেগেলাম। তাঁর বাড়ির নীচের তলাতেই চেম্বার। সকাল নটা বাজতে না বাজতে রোগীর দল জড়ো হয়েছে, অপেক্ষা করছে। সামনের টুলে কয়েকখানা মান্ধাতা আমলেব ছেঁড়া-খোঁড়া ছবির পত্রিকা।তারই একখানা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করলাম।

একটু পরেই একটা বাচ্চা এল।—শ্লিপ দিন।

নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে দিলাম।

একটার পর একটা পত্রিকা দেখা শেষ হচ্ছে, একজন করে রোগীর ডাক পড়ছে।

তারপর একসময় আমার শ্লিপটা নিয়ে এল বাচ্চাটা।—চলুন।

ধীরে ধীরে সুইংডোর ঠেলে এগিয়ে গেলাম।

প্রথমটা লক্ষ্যই করিনি ডাক্তার সেনের ওপাশে কে বসে আছে। চোখ পড়তেই ছন্দা হেসে উঠল।—আপনি ? কি খবর, আবার কি হল বুলার ?

ডাক্তার সেন বললেন, দুপুরে ছাড়া তাঁর যাবার সময় হবে না, আর নয়তো রাত্তিরে। কিন্তু বাসা তো চেনেন না তিনি, কে আসবে দুপরে তাঁকে নিয়ে যেতে।

বললাম, আমার আপিস, বরং রাত্তিরেই···

ছন্দা বাধা দিল ।—কি দরকার, আমি যাব ওঁর সঙ্গে, আজ আমার ছুটি ।

ডাক্তার সেনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দাও উঠল । বাইরে বেরিয়ে এল চুপচাপ । তারপর রাস্তায় নেমে বললে, আর তো গেলেন না একদিনও !

কি বলব এ-কথার জবাবে । মাথা নিচু করে বললাম, সময় পাই না ।

হঠাৎ এক দমকা হেসে উঠল ছন্দা, তারপরই গম্ভীর হয়ে গেল ।

ছন্দা কি তা হলে উপহাস করছে আমাকে ? নাকি হাসবার মতই কোন কথা বলেছি । তবু ঔৎসুক্য চাপা দিতে পারলাম না । বললাম, হাসছেন যে ।

—না, এমনি । কেমন একটা ম্লান বিষণ্ণ মুখ করল ছন্দা । ধীরে ধীরে বললে, আপনি সময় পান না, আর আমি সময় কাটাতে পারি না ।

বললাম, কেন ? কাজ তো আপনার অফুরন্ত । সারাটা দিনই তো কাজের চাকায় বাঁধা থাকেন··

হাসল ছন্দা ।—জীবনে বিশ্রামও তো মানুষ চায় । একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল যেন ।

আর আমি হঠাৎ কখন আবিষ্কার করলাম, মনের মধ্যে যে অপরাধের কাঁটাটা, লজ্জার কাঁটাটা সর্বক্ষণ বিঁধছিল সেটা কখন যেন সরে গেছে ।

আমরা দুজনেই কখন সহজ হয়ে গেছি, অন্তরঙ্গ হয়ে গেছি ।

ছন্দার চলার মধ্যেও যেন কোন ব্যস্ততা নেই । ঢলে ঢলে এঁকে বেঁকে পায়চারি করার মত হাল্কা ভাবে হাঁটছিল, হাসছিল, ক্ষণে ক্ষণে তাকাচ্ছিল আমার মুখের দিকে, কখনও বা ফুটপাতের ধারে ছড়িয়ে বসা দু-একটা দোকানির সঙ্গে ছুটকো কোন জিনিসের দর করছিল, কখনও থেমে পড়ে দেখছিল দোকানের শো-কেশ ।

এমনি ভাবেই অনেক নির্বাক ইঙ্গিত আর সশব্দ আলাপের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন চৌমাথার মোড়ে ছন্দার ফ্ল্যাটের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি খেয়াল করিনি, খেয়াল করিনি ঘড়ির কাঁটার ঊর্ধ্বগতি ।

ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে ছন্দা বললে, আসুন না, এক কাপ চা শুধু, আপিসের দেরি হয়ে যাবে ?

বললাম, হলেই বা । চলুন···

হাসল ছন্দা, নিয়ে এল ওর সেই ছোট্ট ঘরখানায় । সাজানো গোছানো সুন্দর একখানা ঘর । এর আগেও দেখেছি, কিন্তু এত স্পষ্ট করে চোখে পড়েনি ।

দেয়ালের একখানা বড় ছবির দিকে চোখ পড়ল । বললাম, কার ছবি ?

—আমার মা । আমি যখন পনেরো বছরের তখন—

একে একে সব খবর বলে গেল ছন্দা, নিজের কথা বলতে বলতে এক সময় চোখ ছলছল করে উঠল ওর ।

চোখের জল লুকোবার জন্যেই হয়তো পিছন ফিরে চায়ের পেয়ালায় লিকার ঢালতে লাগল ।

—যখন রাত্তিরে ডিউটি দিই, লম্বা হলটার এপাশ থেকে ওপাশ অবধি হেঁটে যাই, রোগীদের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকাই, তখন এক এক সময় মনে হয় কে যেন আমার পাশে পাশে চলেছে ।

মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম ছন্দার কথা । ঘড়ির দিকে চোখ ছিল না । হঠাৎ উঠে পড়লাম । ছন্দাও উঠে দাঁড়াল ।

বললে, কত সুখী আপনারা । আর আমি ?

বললাম, বাইরের চেহারাটা দেখেই কি সুখ-দুঃখ বোঝা যায় ?

আরও কি কি যেন বললে ছন্দা, সব কথা হয়তো কানে গেল না আমার । আমি তখন

তার উজ্জ্বল যৌবনের দিকে তাকিয়ে আছি মোহমুগ্ধের মত।

আর ছন্দা ? হ্যাঁ সেও যেন মন্ত্রমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যেন কি বোবা বাসনায় তার চোখের গভীর কালো তারা দুটো উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম। পাক দিয়ে দিয়ে সিঁড়িটা নেমে গেছে নীচে। সিঁড়ির বাঁকে বাঁকে দিনের বেলাতেও আবছা অন্ধকার।

ছন্দা এগিয়ে এল। কয়েক ধাপ নামল। সিঁড়ির বাঁক অবধি।

আমি বাঁক নিয়ে দুটো ধাপ নেমে ফিরে তাকালাম।

সিঁড়ির রেলিংয়ের ওপর ছন্দার ফর্সা সুডোল হাতখানা লেপটে আছে, তার ওপর থুতনি রেখে অদ্ভুত এক রহস্যময় চোখে তাকিয়ে আছে ছন্দা।

ফিরে দাঁড়ালাম। থেমে পড়লাম।

ফিসফিস করে আজেবাজে দু-একটা কথা বলল ছন্দা। আবার কবে আসবেন, আসবেন কিনা।

জবাব দিলাম। মনে পড়িয়ে দিলাম. দুপুবে ডাক্তার সেনকে নিয়ে যাবার কথা।

হাসল ছন্দা।—আপনি ভারী স্বার্থপর।

আমরা দুজন দুজনের কাছে ধবা পড়ে গেলাম। সব অভিনয়ের মুখোস খসে পড়ল।

সিঁড়িতে কাব পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ছন্দা বললে, আবার কবে আসবেন ?

ফিরে তাকালাম। হাসলাম, তারপব জবাব না দিয়ে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে গেলাম।

বুলা ভাল হয়ে উঠেছে। তাব চেয়ে বড কথা বুলা হাঁটতে শিখেছে।

প্রথম প্রথম খাটের ধাবে হাত রেখে হাঁটত। চেয়াব টেবিল ধরে ধবে।

একদিন বিস্মিত কৌতুকে দেখি কি, দিব্যি টলতে টলতে হাঁটছে বুলা !

দুটো বেণী নীতুর পিঠেব ওপব সপাং সপাং করে পড়ছিল। তাই বেণী দুটো নিয়ে পিছনে একটা গিঁট বেঁধে দিয়ে হাসতে হাসতে নীতু আবার বলল, দেখবে টুনুমামা, দেখবে ?

দুটো হাত সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে নীতু ডাকলে, বুলা বু—লা। পা—পা, পা—পা···

আর কি আশ্চর্য বুলাও হাসতে হাসতে টলতে টলতে এক একবার থমকে দাঁড়াতে দাঁড়াতে এগিয়ে এল। বুলা যত এগিয়ে আসে নীতু তত পিছিয়ে যায়।

এমনিভাবে সারা ঘরখানা পাক দেয় বুলা। আর তা দেখে মা বলে, অত হাঁটাস না, পায়ে ব্যথা হবে।

নীতু হাসে, আবার ডাকে।—বু—লা। পা—পা

এক ফাঁকে তাকিয়ে দেখি সুনন্দাও ঈষৎ ঘোমটার আড়ালে কৌতুকে আর আনন্দে হাসছে।

আর আশ্চর্য, দেখতে দেখতে সত্যিই ভাল করে হাঁটতে শিখে ফেলল বুলা। আর হাঁটতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনও হয়তো বাড়ির বাইরে পালাবার জন্যে ছটফট করল। দিনরাত সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপর আর নীচ, নীচে আর ওপরে।

বাবা বলে, পায়ে ব্যথাও হয় না ওর !

মা বলে, সাবধানে থেকো বৌমা, কখন দরজা খোলা পেলেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে, যা গাড়ি ঘোড়া রাস্তায়···

—ঘোড়া ? নীতু হেসে ওঠে। বলে, দিদা কি যে বলে, ঘোড়া আবার কোথায়, সে তো টুনুমামা সেবার গড়ের মাঠে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে এনেছিল।

সুনন্দা ঘোমটার আড়াল থেকে টিপ্পনী কাটে, এমন ফাজিল মেয়ে !

ফাজিল মেয়ে শুধু কি নীতু । বুলা নয় ? ঐটুকু একটা বাচ্চা মেয়ে, অথচ এক এক সময় এমন একটা কথা বলে বসে, সকলে হেসে গড়াগড়ি যায় ।

কিন্তু সবাই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে বুলার আরেক দৌরাত্ম্যে । একটু অন্যমনস্ক হলেই কোথায় গিয়ে কি যে করে বসবে ঠিক নেই । একটা না একটা খুটখাট লেগেই আছে । কখনও বাসনকোসন নিয়ে রান্না করতে বসবে, পেয়ালা ভাঙবে, আর নয়তো মিট সেফ খুলে দেখবে খাবার কিছু আছে কিনা ।

আর মিট সেফ খুলে যদি বা কিছু খায়, লুকিয়ে, জিগোস করলে বলবে না ।

সুনন্দা বলে, ও আমাকে কাজ করতে দেবে না, কি বিরক্ত যে করে। জানো, ময়দার টিন বের করে সব মেঝেতে ঢেলে দিয়েছে ।

বললাম, বুলা ময়দা ফেলেছ ?

সরল উত্তর, নান্না করব না ? লুটি খাব না ?

একদিন বললাম, তুমি কাপ ভেঙেছ ?

—না !

—কে ভেঙেছে ?

—মা ।

প্রথম প্রথম ভাবতাম, এটুকু মেয়ে কি আব মিথ্যে কথা বলে । সুনন্দা হেসে বললে, ওকে চেনো না ! আমার সামনে ভেঙেছে, ভীষণ মিছে কথা বলে ।

কিন্তু সবচেয়ে বিপদ হল বুলার বাইরে বেরিয়ে যাওয়া নিয়ে । দরজা খোলা পেলেই রাস্তায় বেরিয়ে যায় । ধমক দিলে বলে, বেলাতে যাব না ? অর্থাৎ বেড়াতে ।

সুনন্দা বললে, সত্যি ওকেও দোষ দেওয়া যায় না । এই গুমোটে ঘরের মধ্যে, না আলো না বাতাস, একটু বেড়িয়ে আনলে তো পার !

বললাম, কখন যাব ?

—কেন ভোরবেলায় কিংবা সন্ধেবেলায । সব বাড়ির ছেলেমেয়েরাই তো বেড়াতে যায়, বারান্দা থেকে তো দেখি ঝি-চাকরেব সঙ্গে যায় সব দলে দলে···

বললাম, বেশ তো, আমিই ওকে নিয়ে যাব কাল থেকে । আমারও একটু মর্নিং ওয়াক হয়ে যাবে ।

পরের দিন বুলাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পার্কের উদ্দেশে । গিয়ে পৌঁছলাম যখন, দেখি ভিড় জমে গেছে অত সকালেই । বৃদ্ধের দল, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল, তরুণীদের দল ।

বুলাকে নিয়ে পায়চারি করছি, কেউ এসে ওর সঙ্গে দুটো কথা বলছে, কেউ নাম জিজ্ঞেস করছে, কেউ বা কোলে নিয়ে আদর করছে ।

একটা তরুণীর দল রীতিমত কাড়াকাড়ি শুরু করল ওকে নিয়ে, কেউ বা গাল টিপে দিল । আর বুলা বিরক্ত হয় মুখ ঘুরিয়ে নিল ।

দেখতে বেশ ভাল লাগে । কোথায় যেন একটা আত্মপ্রশংসার স্পর্শ পাই । যেন বুলাকে ভালবাসার মধ্যে নিজের অহঙ্কারকেই আবিষ্কার করি ।

আর তার ফলে ভোরবেলায় পার্কে বেড়াতে যাওয়ার একটা নেশা ধরে যায় । একটা দিন না বের হতে পেলে যেন তৃপ্তি পাই না ।

সেদিনও পার্কে পায়চারি করছিলাম বুলাকে নিয়ে, বোধহয় একটু তাড়াতাড়ি এসেছিলাম ।

আধখানা পাক দিতেই মাঝ পথে দেখা হয়ে গেল ছন্দার সঙ্গে ।

ভোরবেলাকার রুপোলি আলোয় ছন্দাকে সুন্দর লাগছে। আকাশের গায়ে একটা উড়ন্ত পায়রার মত সুন্দর।

বললাম, তুমি ?

হাসল ছন্দা—বাঃ রে আমি তো রোজই ভোরবেলায় আসি এখানে।

বললাম, আমিও তো আসি।

—কি আশ্চর্য ! একদিনও দেখা হয়নি ! ওর মুক্তোর মত সুন্দর দাঁতের সারি ঝকঝক করে উঠল।

বললাম, চলো, বেঞ্চিটায় গিয়ে বসি।

—চলুন।

দুজনে পাশাপাশি এসে বসলাম বেঞ্চিটায়। চুপচাপ। কেউ বুঝি সন্দেহের চোখে দেখল একবার, কেউ বা বুলার দিকে তাকিয়ে সন্দেহের কিছু পেল না।

শুধু দুটো চ্যাংড়া ছেলে দূর থেকে একবার শিস দিয়ে হেসে উঠল।

ওরা হয়তো ছন্দাকে চেনে, কিংবা আমাকে।

বসে থাকতে থাকতে এক সময় আমার হাতখানা গিয়ে পড়ল ছন্দার কাঁধে।

বুলা সামনের ঘাসে বসে বসে ঘাস ছিঁড়ছিল, ফ্রকের আঁচলে জমা করছিল সেগুলো।

হঠাৎ আমাদের দিকে তাকাল একবার। কেমন যেন দুর্বোধ্য বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে আমাদের পিছনে এসে ছন্দার ঘাড় থেকে আমার হাতখানা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

ছন্দা হাসল।

কিন্তু বুলা ছন্দার পিঠ থেকে আমার হাতখানা সরিয়ে দিতেই আমি চমকে উঠলাম। লজ্জিত হলাম। একটা অদ্ভুত অপরাধ বোধ যেন আমাকে গ্রাস করল।

উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, চলি ছন্দা !

ছন্দা বুলাকে আদর করতে চাইল, কিন্তু বুলা বিরক্তি প্রকাশ করে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে তার ফাঁকে মুখ লুকোল। ছন্দা হেসে উঠল।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ছন্দা চলে গেল। আর আমি বুলাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম।

এত অন্যমনস্ক আমি বোধহয় আর কখনও হইনি। এত বিচলিত। বুলা কি কিছু বুঝতে পারে ? বুলা কি কিছু ভাবে ? এইটুকু একফোঁটা একটা মেয়ে—সেও কি ছন্দার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাকে সমাজের তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে দেখে !

বাড়ি ফিরে সুনন্দাকে বললাম, ছন্দার সঙ্গে দেখা হল।

—কোথায় ? সুনন্দা বিস্মিত হল।

বললাম, পার্কে। ছন্দাও ভোরবেলায় নাকি বেড়াতে যায়।

সুনন্দা কেমন যেন সন্দেহের চোখে তাকাল। আমার গলার স্বরের মধ্যে কি কোন সূক্ষ্ম একটা কাঁপন লক্ষ করল ও ! কে জানে।

সুনন্দার কথা

কমলেশকে, আমার স্বামীকে, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। কিংবা নিজেকেই হয়তো বুঝতে পারি না।

রমলাকে আমি সন্দেহের চোখে দেখতাম, রমলাকে আমি ভয় পেতাম। পাশের বাড়ির সেই রমলাকে—একদিন তাকে আর কমলেশকে অন্ধকার বারান্দায় এমনভাবে দেখতে

পেলাম যা দেখে যে-কোন স্ত্রী স্বামীকে সন্দেহ করতে বাধ্য, ভিতরে ভিতরে একটা অসহ্য জ্বালায় দগ্ধ হতে। তবু স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারিনি সেদিন। সমস্ত সন্দেহ মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলম। মনে মনে চেয়েছিলাম, রমলা আমাদেব পথ থেকে সরে যাক।

একদিন সত্যিই সরে গেল রমলা। পাড়ারই আরেকটি ছেলের সঙ্গে। আর সেদিন কি আশ্চর্য, কমলেশের ওপর আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম। তার মূল্য যেন মুহূর্তে মাটিতে মিশে গেল আমার চোখে! ছি ছি, রমলা আর কমলেশের এত ঘনিষ্ঠতা, গোপন প্রেম সব তুচ্ছ হয়ে গেল, কমলেশকে তুচ্ছ করে কিনা আরেকজনের আকর্ষণে সব ছেড়ে গেল সে।

এইটুকু আকর্ষণও কি নেই কমলেশের?

সত্যি কথা বলতে কি, প্রথম প্রথম ছন্দা সম্পর্কে আমি কিছুই ভাবিনি। কোন ভয় ছিল না মনের মধ্যে। কোন আশঙ্কা নয়।

তখন আমি বুলাকে নিয়েই মেতে উঠেছি। ভয তখন বুলাকে নিয়েই। শুনে এসেছি, সন্তান নাকি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একটা বাধার পাঁচিল তুলে দেয়। পরস্পরের প্রেমের বেশির ভাগটাই কেড়ে নেয়। তাই আশঙ্কা ছিল, আমাব ওপর থেকে সরে গিয়ে বুলার ওপরই কমলেশের সব টান চলে যাবে। ভয়? না। ঠিক ভয নয়। বিশ্বাস কবতে ইচ্ছে হত না তা সম্ভব। তবু কমলেশকে সে-কথা বলে আনন্দ পেতাম। ওকে যত বলতাম, ও ততই চটে যেত। হাসত।

আর এবই ফাঁকে কখন যে ছন্দা এসে উপস্থিত হযেছে আমাদেব জীবনের মাঝখানে, আমি বুঝতে পারিনি। বুঝতে চাইনি।

এক একদিন কমলেশের কথাবার্তায, ছন্দার সামনে ওর বিচিত্র অস্বস্তি দেখে কেমন একটা ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি দিয়েছে। মনকে বুঝিযেছি, ও কিছু নয়। একটি সুশ্রী মেয়েকে দেখে যে-কোন পুরুষেব মনে যেটুকু মুগ্ধতা উঁকি দেয় কমলেশের মনে তাব চেয়ে বেশি কিছু নেই।

কিন্তু তাবপর দিনে দিনে সন্দেহ গাঢ় হযেছে।

প্রতিদিন ভোরবেলাতে কাছের পার্কটায বেড়াতে যাওয়ার আগ্রহ যেন বেড়ে গেল কমলেশের। যেন বুলাকে বেডাতে নিয়ে যাওযাব জন্যেই এত! আটটার আগে যে বিছানা ছেড়ে উঠত না, ছটাব আগেই সে ছুটতে চায কিসেব নেশায়!

বিরক্ত হযে তাই বলেছি, নিজে যেতে চাও যাও, ও মেযেটাকে এত ভোবে ওঠানোর কি দবকার!

কমলেশ একটু অস্বস্তি বোধ করেছে। তাবপব বলেছে, তুমিই চলো তা হলে, একা একা কি বেড়ানো যায়!

আমাব তখন হাজারো কাজ। ভোববলায বেডাতে যাব আমি! আর বুলাকে বিছানায ফেলে রেখে? হেসে ফেলেছি ওর কথা শুনে। রাগ চলে গেছে মুহূর্তে।

এমনি করেই চলছিল।

একদিন হল কি, বেশ একটু রাত করে আপিস থেকে ফিবল কমলেশ।

বললাম, এত দেরি যে!

—কাজ ছিল আপিসে। আর কোন কথা বললে না কমলেশ।

আমিও বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম। কাজ তো থাকতেই পারে। কিন্তু পরের দিনে ওর সার্টটা ধোপাকে দেবাব সময় পকেটে কিছু আছে কিনা দেখতে গিয়েই দুটো রঙিন কাগজে হাত ঠেকল। গত সন্ধ্যার সিনেমার টিকিট দুখানা।

রাগে জ্বলে গেল সর্ব শরীর। মুঠোর মধ্যে কাগজ দুটো দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দিলাম সবার অলক্ষ্যে।

তারপর একসময় ধোপদুরস্ত জামা কাপড় বের করে দিতে গিয়ে বললাম, আজকেও আপিসে কাজ থাকবে না তো ?

গলার স্বরে কি কোন জ্বালা ছিল ? কে জানে।

কমলেশ কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।—বলব ?

—কি বলবে ? আমি বিস্মিত হলাম।

কমলেশ হেসে উঠে বললে, আপিসে কাজ ছিল না ছাই।

—তার মানে ! আমি যেন কিছুই জানি না এমন ভান কবলাম।

কমলেশ বললে, কাল সিনেমা গিয়েছিলাম। তুমি চটে যাবে, নিয়ে যাইনি বলে, তাই।

আমি তখনও বিস্মিত স্বরে বললাম, কার সঙ্গে ?

—আপিসেরই এক বন্ধুর সঙ্গে।

সন্দেহের পারা তরতর করে নেমে গেল আমার সারা শবীর থেকে।

কি শান্তি যে পেলাম, কি আনন্দ !

আর আশ্চর্য, মাঝে মাঝে এমনি ভুল বুঝতাম বলেই, ওকে আর সন্দেহ কবতাম না। সন্দেহ করতে চাইতাম না।

কেনই বা সন্দেহ করব। বাড়িতে যতক্ষণ থাকত কমলেশ, সারাক্ষণ ও বুলাকে নিয়ে এমনভাবে মেতে থাকত—বুলা আর বুলা।

মনে হত ছন্দা তো দূর, আমাকেই ও ভুলে গেছে—বুলাকে যাব কাছ থেকে পেয়েছে সেই আমাকে।

ছন্দা মাঝে মাঝে আসত। কমলেশ তখন আব ভোববেলায় বেড়াতে যেত না, রাত করে ফিরত কদাচিৎ। তাই ছন্দা এলে আমি ভয় পেতাম না, বিরক্ত হতাম না।

কিন্তু একদিন নীতু দোকানে কটা জিনিস কিনতে গিয়ে ফিবে এসে বললে, টুনুমামা ট্যাক্সি করে কোথায় যাচ্ছে মনে হল ?

আমি হেসে উঠলাম।—যাঃ, সে তো আপিসে গেছে কোন সকালে।

নীতু কি যেন ভাবল। বললে, কি জানি, দূর দিয়ে গেল। চিনতে পারলাম না ভাল করে।

তারপব বললে, ভুলই হবে হযতো। সঙ্গে কে একটা মেয়ে ঠিক, টুনুমামা হতেই পাবে না…

ব্যস। ওইটুকুতেই আমার মনের ভেতর একটা সন্দেহেব কাঁটা গেঁথে বইল।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, সত্যি তো, কই আগের মত ও তো আমাকে কাছে টানে না, আদর করে না ! আমার ওপর ওর কোন আকর্ষণ আছে বলে তো মনেই হয় না।

বুলাকে ও ভালবাসে দেখে সব ভুলে ছিলাম, কিংবা কিছুই চোখে পড়েনি ! নীতুর কথায় সন্দেহের কাঁটাটা মনের ভেতর গেঁথে রইল।

এমনি করেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। ভেবেছিলাম, একদিন মুখ ফুটে বলব, শোনাব সব অভিযোগ।

কিন্তু পারতাম না।

সেদিন আপিস থেকে ও ফিরল অনেক বাত করে। ওর চেহারা দেখে আমি আঁতকে উঠলাম। যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে ওর শরীরের ওপর দিয়ে।

আমি কাছে এগিয়ে গেলাম।—শরীর খারাপ নাকি তোমার ? উৎকণ্ঠা বোধ করলাম।

ও হাসল। বলল, না।

বলেই আমাকে কাছে টানল। মোহগ্রস্তের মত মুগ্ধ চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল, কাছে টানল, জড়িয়ে ধরল, তার পর—তারপর বললে আজ তোমাকে এত ভাল লাগছে…

আমি লজ্জায় অস্বস্তিতে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গেলাম। পারলাম না। কমলেশের মুখ তখন নেমে এসেছে আমার মুখের ওপর, তার শরীর ভেঙে পড়েছে আমার শরীরের ওপর...

বললাম, এই সরো বুলা দেখবে...

সশব্দে হেসে উঠেই বুলাকে আসতে দেখে আমাকে ছেড়ে দিল কমলেশ। তারপর বুলাকে কোলে তুলে নিল। বুলার মুখে মুখ ঘসতে ঘসতে বললে, একটা খবর আছে।

—কি খবর ? আমার সারা শরীবে তখন আনন্দ আর আনন্দ।

কমলেশ হেসে বললে, ছন্দাব বিয়ে।

—বিয়ে ?

—হ্যাঁ এক ডাক্তারের সঙ্গে। আসবে বলেছে একদিন।

আমি প্রশ্ন করতে ভুলে গেলাম, কোথায দেখা হল তার সঙ্গে, কিভাবে দেখা হল।

কমলেশের কথা

ছন্দা, ছন্দা ! কি মিষ্টি নাম। উষ্ণ পাবাবতের মত একটি সুন্দর সুশুভ্র শরীর। শুধু কি তাই ? না, আরও কিছু, আরও গভীর মন। ভোরেব কল-কাকলির মত স্নিগ্ধ, সন্ধ্যার রক্তমেঘের মত উজ্জ্বল।

ছন্দাও কি ন্যায়-অন্যায় ভুলে গিয়েছিল ? কিভাবে জানি না, ক্রমে ক্রমে দুজনে দুজনের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম।

হয়তো সেও ভবিষ্যতেব দিকে তাকাযনি, বর্তমানকে নিযেই ছিল তৃপ্ত।

কোন কোনদিন দুজনেই কাজে ফাঁকি দিযে কিংবা মিথ্যা অজুহাতে ছুটি নিয়ে চলে যেতাম কোন এক নির্জন প্রান্তে। ভিক্টোবিযা মেমোবিযালের সিঁড়িতে গিয়ে বসতাম পাশাপাশি ঘন হয়ে, তারপর কথা আর কথা। স্পর্শ, আবও নিবিড় স্পর্শ।

পৃথিবী ভুলে যেতাম।

দু-একজন ফিরিওয়ালা কখনও বা দূরে দূরে হেঁকে যেত, ফিরে তাকাত আমাদেব দিকে। কাছে ডাকতাম। অলস মধ্যাহ্নের অকাবণ গুঞ্জনের মধ্যে আমবা হারিয়ে যেতাম।

কোনদিন বা বোটানিক্স, চিড়িয়াখানা, ক্যানিং লাইনের নির্জন কামরা।

সেদিনও এসে বসেছিলাম পরেশনাথেব মন্দিবেব ছায়ায়, ঘাসেব ওপর পা ছড়িয়ে।

ছন্দা বোধহয় একটা ঘাসের শিস ছিড়ে নিয়ে দাঁতে কাটছিল। আর আমি একটা বড় দেখে নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে জুতোর যে পেরেকটা মুখ উঁচিয়ে বাবংবাব পায়ের বুড়ো আঙুলটাকে বিরক্ত কবছিল, সেই পেবেকটার ওপর ঠুকছিলাম।

চুপচাপ বসেছিলাম দুজনেই। সব দেয়া-নেয়ার শেষে শুধুমাত্র সন্নিধ্যটুকুই বুঝি ভাল লাগে। কাছে থাকা, পাশে থাকা।

ছন্দা ধীরে ধীরে বললে, পারছিনে আর এভাবে থাকতে।

বুঝতে না পেরে সপ্রশ্ন চোখ তুললাম তাব দিকে।

ছন্দা আবার বললে, আব যে পারিনে। চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই। অন্য কোথাও অন্য কোনখানে, নতুন করে সংসার বাঁধি আমরা।

আমিও কি তা চাই না, আমার গোপন মনের বাসনাও কি তাই নয়। তবু, ঠিক এই কথাটার জন্যে যেন আমি প্রস্তুত ছিলাম না। যেন ইচ্ছে করেই এই প্রলয়ঙ্কর মুহূর্তটাকে আমি বারবার দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি।

সুনন্দাকে ত্যাগ করতে হবে বলে ? সুনন্দাকে হারাতে হবে বলে ?

না। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে সুনন্দার মনের সঙ্গে আমার মন যেন সূক্ষ্মতম বাঁধনেও বাঁধা নেই। সুনন্দার প্রতি এতটুকু আকর্ষণ নেই আর, নেই সেই পুরনো দিনের কর্তব্যবোধ। তবু অস্বস্তি বোধ করছি কেন ছন্দার প্রশ্নে। তবু আতঙ্কিত হয়ে উঠছি কেন ?

আমি কি সাহস হারিয়েছি ? সমাজকে ভয় পাচ্ছি ? দাদু, ঠাকুমা, বাবা, মা, বোন—এই বিরাট পরিবার থেকে বিচ্যুত হতে ভয় পাচ্ছি ?

সমস্ত মায়া মমতা স্নেহ প্রীতির চেয়ে আমার এই তেইশটি বসন্তের উদ্দাম উষ্ণ রক্তের প্রবাহে যে কথা বার বার বেজে উঠছে তা আরও সত্য, আরও স্পষ্ট।

সেই মুহূর্তে হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল তেইশ বছর বয়সটা যেন নেহাত একটা কিশোরের বয়স, যেন একটা ভীরু কিশোর স্বপ্ন বুনছে, চোখের সামনে মাটি খুঁজে পাচ্ছে না।

ছন্দা আমার একখানা হাত টেনে নিল, চেপে ধরল তার মুঠোর মধ্যে। থরথর করে কাঁপছে ছন্দা, এখনি যেন কান্নায় ভেঙে পড়বে।

ব্যথিত ম্লান দুটি চোখ তুলে আমার চোখের দিকে তাকাল সে। বললে, না, না। এখনই, আজ এই মুহূর্তে উত্তর দাও তুমি। চলো যেখানে খুশি, যে-দেশে কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না, তেমন কোথাও আমরা চলে যাই।

ধীরে ধীরে বললাম, অস্থির হয়ো না ছন্দা। অপেক্ষা করো. অন্য কোথাও একটা চাকবিব চেষ্টা দেখি আগে···

বিস্মিত স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকাল ছন্দা। বললে, পা যখন আছে দাঁড়াতে আমরা পারবই। কেন ভয় পাচ্ছ তুমি ?

—ভয় ? হাসলাম। নিজের মনের কাছে ধরা পড়ে গেলাম হয়তো। মনে হল, সত্যিই বুঝি ভয় পাচ্ছি আমি, এই নিশ্চিন্ত স্থিতিকে ভেঙে দিয়ে একটা চঞ্চল জনস্রোতের মধ্যে হারিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছি।

সান্ত্বনার ভঙ্গিতে একটা হাত রাখলাম ছন্দার পিঠের ওপর, আর দুটি হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে গুমরে গুমরে কেঁদে উঠল ও।

আমি ভয় পেলাম, চকিতে চারপাশে চেয়ে দেখলাম, কেউ আমাদের লক্ষ করছে কিনা।

আমি শুধু আশ্চর্য হলাম। এই ছন্দাকেই প্রথম যেদিন কাছে টেনেছিলাম, সেদিন ছন্দাই সুনন্দার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল, তাব সুখের সংসার ভাঙতে পারব না।

আজ !

আপিসের সময় পার করে বাড়ি ফিরলাম। আর বাড়ি ফেরার পথে মনে হল যেন রাজ্যের দুশ্চিন্তা একটা ভারী পাথরের মত আমার বুকের ওপর চেপে বসেছে। একবার মনে হল, আমি যেন মানুষ হিসেবে ছোট হয়ে গেছি। মিথ্যে হয়ে গেছি। এ কি কপটতাব খেলা দিনের পব দিন আমি সুনন্দার সঙ্গে খেলছি। এ কোন হীনতা আমাকে জয় করে বসেছে ?

না, কোন অন্যায় আমি করিনি—নিজের মনকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। যা সহজ আর স্বাভাবিক—তাই ঘটেছে, ঘটছে। সুনন্দার অপরাধ নেই, কিন্তু আমারই বা কি অপরাধ। শরীর আর মন কি কারও হাতের মুঠোয় থাকে যে, ইচ্ছে কবলেই তাকে যে-পথে খুশি চালনা কবা যাবে। মিথ্যা মিথ্যা।

ছন্দা আর আমি, আমরা পরস্পরকে ভালবেসেছি। এর কাছে সব সামাজিক অনুষ্ঠান, সব কর্তব্যবোধ মিথ্যা হয়ে গেছে।

একটি মুহূর্তের জন্যে মনে হল, সুনন্দাই অপরাধী, সুনন্দা কেন আমার মনকে জয় করতে পারেনি, আমার সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে নেবার জন্যে কেন সে এগিয়ে আসেনি।

পরক্ষণে নিজের মনেই হেসে ফেললাম। আমি কি সত্যিই অধঃপাতের শেষ সীমায় গিয়ে

পৌঁছেছি ? তা না হলে নিজেব অন্যায়কে কেন আমি সুনন্দার ঘাড়ে চাপাতে চাইছি। কেন আমি আমার অপরাধকে ভালবাসাব, সত্যের চাদরে ঢেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছি।

কিন্তু, কি আশ্চর্য, বাড়ি ফিরতেই সমস্ত শবীব যেন হাল্কা হয়ে গেল। যে পাথবটা বুকের ওপর চেপে বসেছিল মুহূর্তে সরে গেল।

দরজার কড়া নাড়লাম, আর সঙ্গে সঙ্গে ওপব থেকে ধুলা টানা টানা ভাঙা উচ্চাবণে সাড়া দিল—তাই ! বাবা তাই

কপাটের ধাবে একটা কলিং বেল ছিল, নষ্ট হযে গেছে। কিন্তু তখনও যেমন ক্র্যা—র‍্যা—র‍্যা শুনে বুলা চিনতে পাবত, কড়া নাড়াব শব্দ শুনেও তেমনি।

একটু পরেই খিল খোলার শব্দ হল। কপাট খুলে দিল সুনন্দা।

আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রতিদিনের মতই কি যেন তন্ন তন্ন করে খুঁজল। প্রশ্ন করলে, কোথায় গিয়েছিলে ?

বিস্মিত হবার ভান করে প্রতিপ্রশ্ন করলাম, কেন ?

সুনন্দা সিঁড়ির অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে যেতে বললে, আপিস থেকে কে একজন খোঁজ করতে এসেছিল।

আমি হেসে উঠলাম। বললাম, সে এক কাণ্ড, এক স্কুলেব বন্ধুব সঙ্গে দেখা হযে গেল···

সবটুকু শেষ করতে হল না, কারণ তখন তরতব করে দোতলায উঠে গেছে ও।

বুকটা কেমন একটা আতঙ্কে দুলে উঠল। তবে কি যে সন্দেহটা ঈষৎ উঁকি দিয়েছিল সেটাই স্পষ্ট হয়ে গেছে সুনন্দার কাছে ? সুনন্দা কি জেনেছে ছন্দার কথা ?

দোতলায় উঠে আসতেই বুলা ছুটে এল দুহাত বাড়িযে, যেমন প্রতিদিন আসে। আমিও এগিযে গেলাম, কিন্তু সেই মুহূর্তে সুনন্দা ছুটে এসে ছিনিযে নিযে গেল বুলাকে, বললে, থাক, আদব দেখাতে হবে না।

যে দুশ্চিন্তাব পাথরটা সবে গিয়েছিল, সেটা যেন আবার নতুন কবে এসে বুকেব ওপব চেপে বসল।

জোর কবেই বুলাকে কেড়ে নিলাম সুনন্দাব কাছ থেকে। এসে বসলাম সেই ছোট্ট আকাশ-দেখা বাবান্দায়।

বুলা অনর্গল কথা বলে গেল। ভাঙা ভাঙা কথা।

তারপব একসময় বললে, দালাও। বলেই ছুটে গিয়ে লুঙিটা নিযে এসে বললে,নুমি পলো।

হাসলাম। লুঙিটা নিলাম তার হাত থেকে, আব বুলা পাকা মেয়েব মত শাসন কবলে, কাপল মলা হবে না ? অর্থাৎ আপিসের কাপড় মযলা হবে মেঝেব ওপর বসলে।

জামাকাপড় বদলে মুখ হাত ধুয়ে আবাব এসে বসলাম বুলাকে নিয়ে।

বুলা বললে, অল্প বলো।

—গল্প ? আমি গল্প জানি না, তোমার মা জানে। বলে হেসে তাকালাম সুনন্দার দিকে। চোখোচোখি হল, একটা কটাক্ষ হানল সুনন্দা, তাবপর মুখ ফিরিযে নিল।

বুলা বললে, আমি বলব অল্প ?

—বলো।

—বলো অল্প ? অর্থাৎ বড় গল্প ?

বললাম, হ্যাঁ।

বুলা আমার কোলের ওপর গুটি পাকিযে বসে বললে, এক্‌তা লাজা ছিল···

—তারপর ?

—আলেকতা লাজা ছিল।

—তারপব ?

—আলেকতা লাক্কস্ ছিল।

`—তাবপর ?

—আলেকতা লাক্কস্ ছিল।

আমি হেসে উঠলাম, আর সুনন্দাও। দুজনে চোখোচোখি হল আবার। সুনন্দার হাসিটা দপ কবে নিভে গেল।

কিন্তু আমাদেব হাসি দেখে হয়তো লজ্জা পেল বুলা। উঠে দাঁড়াল, রেগে গিয়ে বললে, যাও বলব না অল্প। তুমি দুত্তু।

বললাম, আমি না, তোমার মা।

বুলা গম্ভীব হযে বললে, তুমি দুত্তু, মা দুত্তু, সব দুত্তু।

বলে আমার পিছনে গিযে দাঁডিযে বইল।

আব তখনই সুনন্দা জলখাবারেব প্লেটটা এনে ঠক করে নামিযে দিয়ে গেল সামনে।

বুলা ধমক দিলে, বেঙে যাবে। অর্থাৎ ভেঙে যাবে।

—তুই চুপ কবে বোস তো। তোকে পাকামি কবতে হবে না। বলে চোখ পাকাল সুনন্দা, কিন্তু পরমুহূর্তেই হেসে ফেলল। হয়তো আমাব হাসি দেখেই।

মুহূর্তেব মধ্যে সহজ হযে গেল সুনন্দা। ছুটকো দু-একটা কাজ সেবে এসে বসল উলেব গোলা আব কাঁটা নিযে। বললে, কোথায় গিযেছিলে ? আপিস যাওনি কেন ?

বুলাও এসে পিঠে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। বললে, দেলি কলো কেন ? আমাব কট্ট হয় না ?

দেবি কবো কেন আপিস থেকে ফিরতে, আমাব কষ্ট হয না ?

বুঝলাম কথাগুলো সুনন্দাব শেখানো।

বুলাকে বুকে জডিযে ধবলাম। বললাম, আব দেবি কবব না।

সুনন্দা হাসল, খুশি হল। সন্দেহেব কাঁটাটা হয়তো মুছে গেল তাব মন থেকে।

আর আমি ভাবলাম, বুলাকে ছেডে আমি কোথাও গিযে শান্তি পাব না। ছন্দাব কাছে গিয়েও নয।

আবাব একদিন এল ছন্দা। সেই ভিক্টোবিয়া মেমোবিযালেব ছাযা-ভেজা সিঁডিতে বসে গল্প করতে করতে ছন্দা আনমনা হল।

তাবপব বললে, উত্তর দাও।

কি উত্তর দেব তাকে ? ভিতরে ভিতবে কঠিন হয়ে উঠলাম।

অনেক ভেবেছি। সারা বাত।

কি আশ্চর্য, এতদিন দ্বন্দ্ব ছিল ছন্দা আব সুনন্দাব। এক দিকে ছন্দা, অন্য দিকে সুনন্দা। সুনন্দা—মানে বুলাব মা, আমাব বাবা, মা, ঘব-সংসাব। আত্মীয় পরিজন। একদিকে তীব্র সুখ, অন্যদিকে শান্ত স্বস্তি। তাই বাববাব ছন্দাব আকর্ষণকেই বড় মনে হয়েছে।

আজ হঠাৎ যেন নতুন দ্বন্দ্বেব মধ্যে পডেছি। একদিকে ছন্দা, অন্যদিকে বুলা। একদিকে তীব্র সুখ, অন্যদিকে জীবনেব তৃপ্তি।

ছন্দা আবাব বলল, উত্তব দাও। আমি তো আব অপেক্ষা করতে পারছি না।

কি আশ্চর্য, সুনন্দাব জীবনে সামান্য দুঃখের আঘাত লাগতে পাবে এই ভেবে যে একদিন বারবাব পিছিযে গিয়েছে, আজ সেই সুনন্দার কথা বুঝি একেবারেই ভাবতে চায় না ছন্দা!

কিন্তু সুনন্দা নয়। আমাব মনে তখন বুলার কথা।

আমি অনেকক্ষণ ভাবলাম। কিন্তু নতুন কিছুই নয়। যে-কথা এতদিন ভেবেছি।

তারপর এক সময় বললাম, না ছন্দা। পারব না। সব ছেড়ে, বুলাকে ছেড়ে…

হঠাৎ অট্টহাসে হেসে উঠল ছন্দা। বললে, জানতাম।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, তা হলে মুক্তি দাও আমাকে।

বিস্ময়ের চোখে তার দিকে তাকালাম আমি।

ছন্দা হাসল। বললে, আমিও যে আরও একজনকে চাই, আরও একজন—বুলার মতই।

ধীরে ধীরে তার বিয়ের খবরটা শোনাল ছন্দা।

আর আমি মুক্তির নিশ্বাস নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। কি আনন্দ, কি আনন্দ—বুলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার মত আর কোন আনন্দ আছে নাকি?

সেই প্রথম স্পষ্ট হয়ে উঠল একটা সত্য। আমরা কেউই একজনকে ভালবেসে তৃপ্ত নই। সে প্রেম যতই শান্ত আর গভীর হোক, সে প্রেম যতই উষ্ণ আর উন্মত্ত হোক, আমাদের মনের কোণে সব সময়েই আরেকটা ভালবাসা লুকিয়ে থাকে—আরও একজনের ভালবাসা। সব ব্যর্থতা, অতৃপ্তি, বাসনাকে ভুলিয়ে দেয় একটি ছোট্ট শিশুর প্রতি স্নেহ-মমতা। সব ভাঙনের মধ্যে একটি মাত্র স্নিগ্ধ সন্ধি।

এখনই

রচনাকাল জুন-জুলাই ১৯৬৮। প্রথম প্রকাশ দেশ পত্রিকা [illegible] ডিসেম্বর ১৯৬৮ থেকে ২২ মার্চ ১৯৬৯। গ্রন্থাকারে প্রথম সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৩৭৬। প্রকাশক গোপালদাস মজুমদার। ডি এম লাইব্রেরি। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন সুধীর মৈত্র। উৎসর্গ যুবকদিনের স্বপ্ন আশা আদর্শকে।

১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হয়েছে, আর 'এখনই' উপন্যাস লিখেছিলাম ১৯৬৮ তে। ঠিক একুশ বছর বয়েস তখন স্বাধীনতার, এবং স্বাধীনতার মুহূর্তে যাদের জন্ম তাদের বয়েসও তখন একুশ। এই একুশ-বাইশের তরুণ-তরুণীরা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের অবশ্যই -তারাই তো তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে দেখা দিয়েছে। তাদের মধ্যে [illegible] একজন টিকলুও। এখন মনে হয় এই একুশ বাইশের নতুন প্রজন্মের সঙ্গে কি 'এখনই' উপন্যাস লেখার কোন সম্পর্ক ছিল? এরা কি সত্যি কোন নতুন চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছিল? তা না হলে লিখলাম কেন?

কো-এডুকেশন তো আগেও ছিল। যদি কলকাতা শহরের নয়, মফস্বলের ছেলেদের কলেজগুলিতেও কখনও-সখনও ব্যতিক্রম হিসেবে দু চারজন ছাত্রীও। কিন্তু তখন তেমন কোন চাঞ্চল্য দেখা দেয়নি। গল্পে উপন্যাসেও নয়। হয়তো এই প্রজন্ম সতেরো আঠারো থেকেই নিজেদের জানান দিতে শুরু করেছিল, একুশে পৌঁছে [illegible] আলোড়ন জাগাল। রাজনীতির ক্ষেত্রেও একটা বিস্ফোরণ যে ঘটতে চলেছে তা এই সময়েই অস্পষ্ট ভাবে চিহ্ন রাখতে শুরু করেছে। কিন্তু বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী তখনও এ সবের বাইরে, নিজেদের স্বপ্ন আর হতাশা নিয়েই আত্মমগ্ন। আমি এদেরই বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম। কারণ এরাই সমাজে একটা অন্য ধরনের বিস্ফোরণ এনেছিল। বিচারটা ভালোমন্দের নয়, বিচার যা ঘটছিল তার।

রাজনীতির ক্ষেত্রে যে অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল এবং কয়েক বছর পরে তা একসময় থিতিয়েও গেল, তার প্রকৃত প্রভাব কতখানি তা দেখার জন্যে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু আমার চোখে অনেক বেশি তাৎপর্যময় মনে হয়েছিল যুবক সমাজে খোলা হাওয়ার স্বাভাবিকতা, যা সকলকে নাড়া দিয়ে গেল, আমূল বদলে দিয়ে গেল সমাজের চেহারাটাই। বিশেষ কোন উচ্চাশা নিয়ে তো লিখিনি, তরুণ তরুণীদের [illegible] জড়তা থেকে উচ্ছল স্বাভাবিকতায় পৌঁছে যাওয়ার দিনগুলির একটা রেকর্ড রাখতে চেয়েছিলাম হয়তো। এরও প্রায় সিকি শতাব্দী আগে আমিও তো বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলাম, ছাত্রীরা সংখ্যায় কম ছিল না তবু আড়ষ্টতা ছিল উভয়পক্ষেই, আলাপ মানেই প্রেমালাপ কিনা সন্দেহ, অধ্যাপকদের পিছনে পিছনে ঘাড় হেঁট করে ঢুকত মেয়েরা, অধ্যাপকদের পিছনে পিছনে দ্রুত নিজেদের কমনরুমে পৌঁছে গিয়ে যেন নিশ্চিন্ত---ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়, কিন্তু এটাই সে যুগের প্রকৃত ছবি অথচ [illegible] এই ছেলেরা আর এই মেয়েরা মনে হল একেবারেই অচেনা। বাঙালীর গৃহশাসিত সঙ্কোচভীরু জীবনে এরা যেন একটা নতুন হাওয়া নিয়ে এল, যার প্রভাব মনে হল সমাজের সর্বস্তরেই থেকে যাবে। এও এক ধরনের বিপ্লব, রাজনীতির চশমা চোখে দিয়ে যাকে তুচ্ছ করা যায়, কিন্তু উপেক্ষা করার উপায় নেই। আমারই একটি গল্প 'একুশ' আমারই আরেকটি গল্প 'দিনকাল' কত তফাত। রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছু কিছু তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণ ঘটে, কিন্তু পরবর্তীকালে তার কোন প্রভাবই থাকে না, অথচ জীবনের ক্ষেত্রে কোন কোন সামান্য আলোড়নও হয়তো সমাজস্রোতের মোড় ফিরিয়ে দেয়।

এই সময়েই এক পাঠিকার চিঠি 'এখনই পড়ে আমরাও কলেজের ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে 'তুই' বলতে শুরু করেছি।'

এ উপন্যাসের কিছু বক্তব্যও ছিল। তা যে সব পাঠকদের কাছে হারিয়ে যায়নি তার প্রমাণ এক বিদগ্ধ সমালোচক আশা প্রকাশ করেছিলেন এ উপন্যাস বাংলাভাষায় বক্তব্যপ্রধান উপন্যাস রচনার সূচনা করবে। একজনেরই মন্তব্য তবু লেখককে তা

পাঠক সম্পর্কে আশান্বিত করেছিল।

উপন্যাসটি লিখেছিলাম ১৯৬৮-র জুন-জুলাই মাসে, হয়তো বা একটু দ্রুত, কারণ সে-বছর শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি উপন্যাস লেখার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম। কিন্তু প্রতিষ্ঠানে হঠাৎ ধর্মঘট হওয়ার ফলে পুজো সংখ্যাই বের হল না। যেদিন জানা গেল ধর্মঘট যদি বা মিটে যায়, পুজো-সংখ্যা প্রকাশের আর সময় নেই, সেদিনই মধ্যাহ্ন নিদ্রা ভাঙিয়ে 'দেশ' সম্পাদক সাগরময় ঘোষের টেলিফোন 'বাড়ি থেকে বলছি। উপন্যাসটা কোথাও যেন দিয়ে দেবেন না, দেশ-এ ধারাবাহিক ছাপবো।' এর সাত বছর আগে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে লিখেছিলাম 'বনপলাশির পদাবলী', হপ্তায় হপ্তায় এক কিস্তি লিখে দিতাম। এবার কিন্তু পরমানন্দে উপভোগ করা। কোন দায় নেই, উদ্বেগ নেই অথচ ছাপা হয়ে চলেছে। দুঃখ হয়, একালের লেখকরা এই স্বর্গীয় আনন্দ থেকে বঞ্চিত।

কিছু আশা করিনি, কোন দুরাশাও ছিল না। কিন্তু ধারাবাহিক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অকল্পনীয় এক চাঞ্চল্য দেখা দিল। একুশ-বাইশদের জগতে। এবং সেটা তো স্বাভাবিক, কারণ তাদের নিয়েই তো লেখা। কিন্তু বিস্মিত হলাম যখন প্রবীণ প্রখ্যাতরাও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে শুরু করলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র তো আকাশবাণীর এক বিতর্কসভাতেই দারুণ প্রশংসা করে বসলেন দীর্ঘকান্তি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সটান আমাদের অমৃত ব্যানার্জি রোডের বাড়িতে চলে এসে ঈষৎ নুয়ে 'হ্যান্ড শেক' করলেন লোকপরম্পরায় শুনলাম, তারাশঙ্কর দারুণ প্রশংসা করেছেন। পরে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কাছে শুনেছিলাম। সিরাজের ভাষায়- "১৯৭০-এর শেষাশেষি একদিন আর এক সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে তারাশঙ্করের বাড়িতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, প্রয়াত বিনয় ঘোষও বসে আছেন। কথাটা শুরু হয়েছিল হাল আমলের লেখা নিয়ে। একসময় তারাশঙ্কর হঠাৎ বিনয় ঘোষের কথার প্রতিবাদে বলে উঠলেন, 'এখন কিছু লেখা হচ্ছে না, এটা ঠিক নয়। ওই তো আমার নাতনী রমাপদ চৌধুরীর এখনই উপন্যাসটি পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিল। তখন আমি ওর কাছ থেকে উপন্যাসটি নিয়ে প্রায় একটানেই পড়ে ফেললাম। আমার তো মনে হল এইরকম লেখাই এখনকার লেখা। উপন্যাসটি আমার খুব ভালো লেগেছে।' তৎকালে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে মনোজ বসুর সম্পাদনায় একটি মাসিক পত্রিকা বেরোত। মনোজ বসুর ওই পত্রিকার 'তারাশঙ্কর সংখ্যায়' আমাকে তারাশঙ্কর সম্পর্কে লিখতে বলা হয়। আমার সেই লেখায় এই ঘটনাটি আরও বিস্তৃতভাবে লিখেছিলাম। এর পরই রমাপদ চৌধুরীর 'এখনই' রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হওয়ায় আঁচ করেছিলাম, এর পিছনে তারাশঙ্করেরই প্রয়াস আছে। আমার অবাক লেগেছিল, তৎকালে তারাশঙ্করের সঙ্গে কিন্তু আনন্দবাজারের প্রায় দশ বছর ধরে কোন সম্পর্ক ছিল না।" অথচ আমি তো ভেবেছিলাম এদের কাছেই তিরস্কৃত হবো। তবে নিষ্কণ্টক প্রশংসাই যে জুটেছিল তাও না, একটি পত্রিকায় তো একজন পাঠক জানালেন এ উপন্যাসে কতবার 'শালা' শব্দটি আছে। তাঁকে আর জানাইনি অন্যান্য শব্দগুলি, যা কানে এসেছে, মুদ্রণ-অযোগ্য বলেই সবচেয়ে নির্দোষ শব্দটি বারংবার ব্যবহার করতে হয়েছে।

কিন্তু আরও বিস্ময় বাকি ছিল।

১৯৭১-এর রবীন্দ্র পুরস্কার জুটল এই উপন্যাসটির কপালে। আমার ৪৬ বছর বয়সে লেখা উপন্যাস 'মাত্র' উনপঞ্চাশ বছর বয়সে পুরস্কৃত হল সে-যুগে যা ছিল অভাবনীয়। বিশেষ করে, তখনও কয়েকজন প্রবীণ প্রখ্যাত লেখকও যে-পুরস্কার পাননি। নিশ্চয়ই খুশি হয়েছিলাম, কিন্তু অখুশিও এ কারণেই। সে-যুগে রবীন্দ্র পুরস্কারের মর্যাদাও ছিল অনেক বেশি।

পুরস্কারের অভ্যন্তরীণ বৃত্তান্ত পরে জেনেছিলাম। পুরস্কারের জন্যে আরও অনেক বইয়ের মধ্যে আমার নাকি দু-দুখানি বই ছিল--- 'এখনই' উপন্যাস এবং 'ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য গল্প'। বিচারকরা ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিলেন দুটি দলে। এক দল পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলেন 'এখনই' উপন্যাসকে, অন্য দল গল্পের বইটিকে। প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, বিশ্বস্তসূত্রের খবর, তারাশঙ্কর। বিচারকবৃন্দ তারাশঙ্কর, সুভাষ মুখোপাধ্যায়,

কবি অজিত দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, মনোজ বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র। শেষ অবধি নাকি সকলে একমত হয়ে 'এখনই' বইকেই পুরস্কৃত করেন।

পুরস্কৃত হওয়ার বহু আগেই অবশ্য তপন সিংহ 'এখনই' চিত্রায়িত করা শুরু করেন। মুক্তি পায় পুরস্কার ঘোষণার সপ্তাহ কয়েক বাদেই। উর্মির চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন অপর্ণা সেন।

এ উপন্যাসের হিন্দি অনুবাদ করেছিলেন শ্রীমতী সুশীল গুপ্তা, 'আভিহি' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন নয়া দিল্লির ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস।

কিছুকাল আগে এক অধ্যাপক বললেন, উর্মি এবং টিকলু এ দুটি চরিত্র নাকি বাংলা সাহিত্যে আগেও ছিল না, এখনও নেই। সত্যতা যাচাই করে দেখিনি, কিন্তু শুনতে ভাল লেগেছিল। এর পরের বছরই লেখা 'পিকনিক' উপন্যাসটির সঙ্গে 'এখনই' উপন্যাসের কিছু আত্মীয়তা আছে। হয়তো দু' উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যেও। উর্মি আর ইভুর মধ্যে তো নিশ্চয়ই।

এ উপন্যাসের বহিরঙ্গ এবং চরিত্র নির্ভর করেছে অনেকখানি অভিজ্ঞতার ওপর। কিন্তু বক্তব্যও তো কিছু ছিল। অতএব সে ইতিহাসটুকুও জানিয়ে রাখি। লেখা হয়েছে দু' তিন মাসে, কিন্তু চিন্তাভাবনা বেশ কিছুকালের। ঘটনা হ'ল রোটারিতে একটা বিতর্ক অনুষ্ঠান ছিল বুদ্ধদেব বসু, বিনয় ঘোষ এবং এই লেখক। তর্ক করতে গিয়ে বলে বসলাম মানুষ একক ব্যক্তি এবং একা, কেউ কারও কথা বোঝে না, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারে না , গাছের মতই। অনেক গাছ এক সঙ্গে পাশাপাশি থাকে বলেই বন মনে হয়, মানুষ এক সঙ্গে পাশাপাশি থাকে বলেই সমাজ। একটা গাছের শাখা অন্যের গাছে এসে পড়ে, ঝড় উঠলে সব গাছের শাখায় শাখায় আলোড়ন, কিন্তু সেটা একাত্মতা নয়। আরও কি সব যেন বলে ফেলেছিলাম, সচেতন ভাবে কোন পর্যালোচনা না করেই। কিন্তু কথাগুলো মনের মধ্যে রয়েই গেল, ভাবিয়ে তুলল, নিজের সঙ্গে নিজেই তর্ক জুড়ে দিলাম। বহু পরে উপন্যাস লিখতে গিয়ে চেনা-জানা চরিত্রগুলিই দেখি সেই ভাবনার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। যেতে দিলাম।

মতি নন্দী দেশ পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় এই লেখক সম্পর্কে একসময় একটি সুদীর্ঘ নিবন্ধ লিখেছিলেন, লক্ষ করলাম 'এখনই' উপন্যাস থেকেই একটি লাইন তুলে নিয়ে রচনার শিরোনাম দিয়েছেন 'আমরা গাছের মত'। একজন প্রতিভাধর অনুজ লেখককেও যে নাড়া দিয়েছে কথাটা, জেনে আত্মতুষ্টি বোধ করেছিলাম। ঐ প্রবন্ধে মতি নন্দী লিখেছিলেন, "এক পথে দু'বার যেতে রমাপদ অনিচ্ছুক। লাল বনপলাশির পদাবলী বোধহয় বাংলা ভাষায় বাংলার গ্রাম নিয়ে লেখা শেষ উপন্যাস, গোটা উপন্যাস হয়েছে। তারপর আকাঙ্ক্ষিতের দু'একটা বই লিখে একালের কলেজ ছাত্রছাত্রীদের ছটফটানির মধ্যে এ যুগের দুঃখ সুখ আনন্দ বিষাদ বোঝার চেষ্টা করতে করতে লিখে ফেললেন 'এখনই'। আর সেই 'এখনই' পড়ে মতি নন্দীর মনে হ'ল এর লেখক নিশ্চয়ই কোন প্রেমিক যার সঙ্গে দশ বছর ধরে দেখা রমাপদ চৌধুরী নামক ব্যক্তির কোন মিলই নেই। ভাল করে তাকিয়ে দেখল, মাথায় ঘন কালো চুলের বিন্যাসে রুপোলি ছটা। গভীর প্রেমের গল্প বলার বয়সে পৌঁছেছেন রমাপদ। এখন যেন বলতে পারেন, আমরা গাছ। কথা বলতে পারি না, যা বলতে চাই বলতে পারি না। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি। বনের মত ঝোপের মত। এক হতে পারি না। আমরা কাছাকাছি থেকেও পরস্পরের অচেনা। কেউ কাউকে বুঝি না। লোকে বলে সমাজ সংসার প্রেম বিবাহ। সব মিথ্যে। আমরা সব সময়েই একা। প্রতিটি মুহূর্তে। এখন যেন মনে হচ্ছে রমাপদ নিঃসঙ্গ। গভীরে যাওয়ার নির্জনতা ওঁর চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। অমোঘভাবেই যেন গাছ হতে চলেছেন। শিকড় নামছে, ঊর্ধ্বে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করছেন, তবু ঘোচাতে পারছেন না একাকিত্ব।"

এখন আর এ-উপন্যাসকে তেমন কোন গুরুত্ব দিই না। তখনও কি দিয়েছিলাম? কোন কিছুই দাবি করিনি। গুরুত্ব পেয়ে গিয়েছিল দেখে নিজেই অবাক হয়েছিলাম। আমার কাছে এটি শুধুই এক প্রেম-অপ্রেমের গল্প। একটা কালচিহ্ন শুধু। না, কালোচিহ্ন নয়।

অভিমন্যু প্রথম প্রকাশ শারদীয় আনন্দবাজাব পত্রিকা ১৩৮৮ (১৯৮১)। গ্রন্থাকাবে প্রথম সংস্কবণ মার্চ ১৯৮২। প্রচ্ছদ . অমিয় ভট্টাচার্য। অলঙ্করণ . সুধীব মৈত্র। প্রকাশক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড। উৎসর্গ পৃষ্ঠায় ছিল · গত যুগের, বর্তমানেব, আগামী দিনেব দীপঙ্কবদের।

২০শে জুন ১৯৮১ তাবিখে বিভিন্ন সংবাদপত্রেব প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি খবব বাঙালী বিবেককে শোকস্তব্ধ কবে দিয়েছিল। কারণ যাঁব সম্পর্কে এই খবব, তিনি বাঙালী ছিলেন। কিন্তু খবব হিসেবে এটি কোন ব্যতিক্রম নয়। সাবা ভাবতবর্ষেই প্রতিনিয়ত এ ধবনেব কিছু না কিছু ঘটনা ঘটে চলেছে দীর্ঘ দিন ধবে। গুণী মানুষ প্রতিহত হচ্ছেন, অপমানিত হচ্ছেন, নিরুপায় হযে দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন ' বিজ্ঞানীবা আবও বেশি। স্বীকৃতি পাচ্ছেন বাইবে গিযে।

আমবা অভ্যস্ত হযে গেছি, তবু এই একটি ক্ষেত্রে বোধহয নৃশংসতা চবমে উঠেছিল। এমন কি প্রশাসনও তাঁকে স্তব্ধ কবাব জন্যে হাত মিলিয়েছিল, সেই সপ্তবথীদেব ব্যূহ বচনাব অংশীদাব হয়েছিল।

২০শে জুন তাবিখেব স্টেটসম্যান পত্রিকা থেকেই উদ্ধৃতি দেওযা যাক্

Dr Subhas Mukherjee who hit the headlines two years ago with the claim of the first 'Test tube baby' in India, committed suicide by hanging from the ceiling at his southern Avenue residence in Calcutta on Friday He was 49 and is survived by his wife His body was first discovered by his wife around 5 p m Police said Dr Mukherjee was alone at home when the incident occurred His wife, a school teacher, was away at work In a suicide note, the doctor said that he had been unable to bear his heart-trouble "Therefore I put an end to my life"

Dr Mukherjee had survived a heart attack about six months ago, according to one of his relatives The relative said that apart from this, he had been suffering from severe mental depression

Dr Mukherjee, along with two others, claimed two years ago to have kept a fertilized ovum frozen for 53 days before implanting it in the womb The result of his experiment, he claimed, was Durga, a girl born to Mrs Bela Agarwal of Calcutta in September 1978 As the news spread, Dr Mukherjee became the centre of a bitter controversy, which left him a discredited and bitterly disappointed man

PTI adds, Dr Mukherjee, a Hemangini scholar, attained his M.B B S from Calcutta University He later obtained Ph D on gonadotrophin from Edinburg He was professor of Physiology at the R G Kar Medical College

ডাঃ সুভাষ মুখার্জিকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম না, কখনও তাঁকে স্বচক্ষে দেখিনি, কিন্তু টি ভি-তে তাঁব সাফল্যেব খবব প্রকাশেব প্রথম দিন থেকে প্রতিটি সংবাদ, অভ্যন্তরীণ তথ্য, প্রাসঙ্গিক খববাখববের খুঁটিনাটি যথাসম্ভব জানাব চেষ্টা কবেছিলাম। কিন্তু সে-সবই নিছক কৌতূহলবশে, জানাব আগ্রহে। উপন্যাস লেখাব বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। আমাব নিজেবই অজান্তে বিন্দু বিন্দু কবে বেদনামথিত, ক্ষোভসঞ্চিত একটি আবেগেব তাড়নায় 'অভিমন্যু' লিখে ফেলেছিলাম। তাঁকে গবেষণা থেকে বঞ্চিত কবাব জন্যে বাঁকুড়ায় বদলি কবাব খবব জেনেই।

ডাঃ সুভাষ মুখার্জির জীবন ও মৃত্যু এ উপন্যাসেব প্রেবণা, কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র কবে এ উপন্যাস লেখা হয়নি। এ উপন্যাসেব দীপঙ্কব একটি প্রতীক। কুষ্ঠ ব্যাধিটিও। এমন কি কুষ্ঠব্যাধিব প্রচলিত 'সিংহমুখ' শব্দটিও দ্ব্যর্থবোধক। একদিক থেকে 'অভিমন্যু' একটি

শ্লেষাত্মক রচনা। একদিক থেকে আমাদের বর্তমান সমাজের মানুষগুলিব প্রতিচ্ছবি। কিন্তু আমি মনে করি এ উপন্যাস আসলে নির্বাক অসহায় বাঙালী বিবেকের সামান্য এক প্রায়শ্চিত্ত।

স্টেটসম্যান পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত খবরের আরও কয়েকটি লাইন · . Dr Mukherjee became the centre of a bitter controversy, which left him a discredited and bitterly disappointed man. His experiment was challenged by a team of doctors, formed by the Indian Medical Association The controversy deepened as Dr. Mukherjee refused to volunteer data on his experiment. His refusal sparked off doubts about the varacity of his claims and his experiment was dubbed unauthentic.

এই তথাকথিত বিচারকমণ্ডলীব মধ্যে কারা ছিলেন এবং চিকিৎসকদের একটি সভায় কি ধরনের উদ্ভট প্রশ্ন কবা হয়েছিল তা সংবাদপত্রেব পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। তার কিছু কিছু আভাস শ্লেষাত্মক ভাবে এ উপন্যাসে দেওয়া হয়েছে। ভ্রূণ হিমায়িত কবা যে তাঁব পদ্ধতিতে সম্ভব তার সফল বার্তা ডাঃ সুভাষ মুখার্জির মৃত্যুর কিছু পরেই অস্ট্রেলিয়া থেকে এসে পৌঁছয়।

ডাঃ মুখার্জির সাফল্যের সাত-আট বছব পবে, বোম্বাইকে প্রথম সাফল্যেব কৃতিত্ব দেয়াব পর বিভিন্ন সংবাদপত্রে আবাব একটি চাঞ্চল্যকব খবব বের হয়

আনন্দবাজার পত্রিকার ২০ নভেম্বর ১৯৮৬ তারিখের খবর!

বুধবার সকালে কলকাতার একটি নার্সিং হোমে ভারতেব প্রথম টেস্ট টিউব 'ছেলে'র জন্ম হয়েছে।...এদিন সকাল সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তিন কেজি ওজনেব এই সুস্থ শিশুটির জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই খবর ছড়িয়ে যায় সর্বত্র।... ৭৮ সালে হিমায়িত ভ্রূণ থেকে ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সার্থক টেস্ট টিউব বেবি (মেয়ে) 'দুর্গা'ব জন্মকে ঘিরে সংশয়ের বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল। তাঁরই বন্ধুপ্রতিম একদা সহকর্মী ডাঃ বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী এবং তরুণ অনুগামী ডাঃ সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার বছর তিনেকের নিরলস সাধনায় এবার সরকারি স্বীকৃতিতেই নিরঙ্কুশ সাফল্যের মুখ দেখলেন।"

'দুর্গাব জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে যতই বিতর্ক থাক ডাঃ মুখার্জির হিমায়িত ভ্রূণের পদ্ধতি ও তত্ত্বই বিদেশেব আই ভি এফ গবেষণায় স্বীকৃত।'

ডাঃ সুভাষ মুখার্জির সহযোগী ছিলেন ডাঃ সরোজকান্তি ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক সুনীত মুখোপাধ্যায়। ডাঃ সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার ছিলেন সুভাষ মুখার্জির অনুগত ছাত্র। তাঁর ভাষায়: 'আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় হাতে-কলমে ল্যাবরেটারির কাজ শেখার সুযোগ হয়নি। তবে তাঁর সঙ্গে দিনের পর দিন আলোচনায় যে ভাবনা তিনি গেঁথে দিয়েছিলেন কাজ শুরু তারই ভিত্তিতে।'

বাঙালীর বিস্মৃতি প্রবণতা প্রবাদতুল্য বলেই উদ্ধৃতি ও তথ্যগুলি দেওয়া হল।

কিন্তু প্রথমেই জানিয়েছি, 'অভিমন্যু' ডাঃ সুভাষ মুখার্জিকে কেন্দ্র করে লেখা নয়, যদিও এ উপন্যাস পড়ে তাঁব কথা যে-কোন পাঠক-পাঠিকারই স্মবণে এসেছে। স্যাটাযারের প্রয়োজনে আমি সেজন্যই দীপঙ্কর চরিত্রের গবেষণাকে নিয়ে গেছি কুষ্ঠরোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারেব দিকে। তাব জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পঠনপাঠনও ছিল, কিন্তু শেষ অবধি কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলাম। একদিক থেকে সেই অংশকে সায়েন্স ফিকশানও বলা যায়। কিছু আত্মতুষ্টির কাবণ ঘটেছিল উপন্যাসটি প্রকাশেব কিছুকালের মধ্যেই। আনন্দবাজাব পত্রিকার 'কলকাতাব কড়চা' (১৭ নভেম্বর '৮১) পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল: কল্পনা বাস্তবে · পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে গাড়ি দাঁড়ালেই একজন আপাদমস্তক কালো লোক ভাঙা ভাঙা আঙুলের হাত বাড়িয়ে দিত। কিছুদিন যাবৎ লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে কলকাতায় এখন আর কোনও কুষ্ঠবোগী ভিক্ষুক নেই, এমন মনে করাব কারণ নেই। যদিও এই শহব বাঁকুড়া পুরুলিয়া নয়, তবু এখানেও বিশেষ করে ভিখিরিদের একটা বিশেষ অংশ কুষ্ঠরোগী। অপ্রতিরোধ্য এই রোগটি নিয়ে মানুষের ভয় যতটা ঘৃণা তাব চেয়ে বেশি। তবু এবার পুজোয় অন্তত

দু'জন লেখক হ্যানসেনের এই অসুখকে তাঁদের উপন্যাসের বিষয় করেছেন। তার মধ্যে একটি ব্যাপারে ভাবী আশ্চর্যের ঘটনা ঘটেছে। এই রোগের ভ্যাকসিন আবিষ্কার দূরে থাক, এর ব্যাসিলির বংশবৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব ছিল না এবং এর কোনও হোস্ট এতাবৎকাল পাওয়া যায়নি। উপন্যাসের নায়ক দীপঙ্কর একটি মাধ্যম ব্যবহার করে (লেখক যার নাম দিয়েছেন একসন) জীবাণুর বংশবৃদ্ধি করালেন এবং একটি প্রাণীর শরীরে (বিসাস বানর) রোগসৃষ্টি করলেন, অর্থাৎ রোগের হোস্ট পাওয়া গেল। লেখক যা ঘটিয়েছিলেন কল্পনায়, বাস্তবে তা অসম্ভব ছিল। কিন্তু এ সপ্তাহের খবর জার্মানির বর্সটেল গবেষণা কেন্দ্রের প্রফেসর ফ্রীয়ার্কসেন এক বিশেষ ধরনের 'এনজাইম'কে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন এবং ব্রিটিশ বিজ্ঞানী প্রফেসর সীডেল 'আর্মেডিলো'কে কুষ্ঠরোগের হোস্ট করতে সমর্থ হয়েছেন ওই এনজাইমের দৌলতে। ভ্যাকসিন আবিষ্কারের সম্ভাবনা এবার সত্যিসত্যিই দেখা দিল।

হ্যাঁ, উপন্যাসটি রমাপদ চৌধুরীর 'অভিমন্যু'। সত্যি, সাহিত্যের কল্পনা আর বিজ্ঞানের বাস্তব কেমন মিলে যায়!'

তবে, স্যাটায়ার, সায়েন্স ফিকশান, সমাজদর্পণ কিংবা একজন গবেষকের জীবনদলিল—এর কোনটিই উপন্যাস লেখকের দাবি নয়। এমন কি সাহিত্যের দিক থেকেও তাঁর কোন দাবি নেই। তাঁর মতে এ উপন্যাস আসলে বাঙালীর বিবেকের প্রায়শ্চিত্ত।

'অভিমন্যু' উপন্যাস অগণিত পাঠকপাঠিকাকে আলোড়িত করেছিল। এমন কি পরিচালক তপন সিংহকেও। তিনি এটি বাংলায় চলচ্চিত্রায়িত করতে শুরু করেন। দীপঙ্করের ভূমিকায় ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু মাঝপথে এটির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে তিনি আবার এই উপন্যাসকে হিন্দিতে চিত্রায়িত করেন। পঙ্কজ কাপুর অভিনয় করেন দীপঙ্করের ভূমিকায়, শাবানা আজমি তাঁর স্ত্রীর (সীমা) ভূমিকায় এবং অবিজিতের ভূমিকায় বিজয়েন্দ্র ঘাডকে, তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায় দীপা শাহী।

রূপ প্রথম প্রকাশ শারদীয় দেশ ১৩৮৫। গ্রন্থাকারে প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮০। প্রকাশক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড। প্রচ্ছদ অমিয় ভট্টাচার্য। উৎসর্গ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রিয়বরেষু।

একসময় ধারণা হয়েছিল ছদ্মনামের কিছু বিড়ম্বনা আছে, কারণ যে-কোন লোক যে-কোন সময়ে ছদ্মনামের ওই পোশাকটির মধ্যে নিজের শরীরটাকে গলিয়ে দিতে পারে এবং এমন কিছু আপত্তিকর ক্রিয়াকর্ম করে বসতে পারে যার ফলে মূল লেখকটির খ্যাতিতে কিঞ্চিৎ চিড় ধরা সম্ভব। এরকমই একটি ঘটনা ঘটেছিল বহুকাল আগে। সরস প্রাবন্ধিক হিসেবে তখন 'শ্রীপান্থ' ওরফে নিখিল সরকার খুবই বিখ্যাত ব্যক্তি। সুতরাং কেউ যদি নিজেকে 'শ্রীপান্থ' বলে জাহির করে কোন তরুণী পাঠিকার কাছে সম্ভ্রম আদায় ক'রে তারই গৃহে বসে রসগোল্লা এবং সিঙাড়া সহযোগে চা পান করে বসে, তা হ'লে সন্দেহবাদীদের কাছে ধরা পড়ার সম্ভাবনাটুকুও নিশ্চয় থেকে যায়। মনে পড়ে, কয়েকজন তরুণ এ-হেন এক অপরাধীকে একসময় আমাদের সামনে এনে উপস্থিত করেছিল। কিন্তু আমাদের কাছে সে-সময় সমস্ত ঘটনাটিই শুধু হাসির উদ্রেক করে। তবে এ ধরনের ঘটনাকে যে নিছক হাস্যকর ভেবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না তা বোধগম্য হয়েছিল যখন হঠাৎ কোন রেলের কর্তৃপক্ষ ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আমার কাছে চিঠি পাঠান কোন ব্যক্তিগত অভিযোগের জন্য, কোন তরুণী আসানসোল থেকে এসে উপস্থিত হয় দিল্লিতে দেখা হওয়ার পর তাকে যে চাকরিটি পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার ফলাফল জানতে, জিওলোজিকাল সার্ভের কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোক যখন কানপুরে আমাকে ধার দেওয়া টাকা ফেরত নিতে এসে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন মুখের দিকে, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নামক বিখ্যাত লেখককে নিয়েও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল একবার।

এই সব নানাবিধ ঘটনা থেকেই 'রূপ'। ঘটনা এখানে তুচ্ছ, এমন তো হামেশাই হয়। কেউ জাল পুলিশ সাজে, কেউ জাল ডাক্তার, কেউ মন্ত্রীর পি এ। আর সব জায়গাতেই দেখা যায় জাল মানুষটি নিজেকে এমন ভাবে উপস্থিত করতে পারে যে তাকে আসল মানুষটির চেয়েও খাঁটি ভেবে বসে সকলে। কেন এমন হয়? প্রশ্নটা মাথার মধ্যে ছিল। তা থেকে একটা সত্যে পৌঁছনোর চেষ্টা। মানুষের দুটো রূপ। বিশেষ করে বিখ্যাত বা বিশিষ্ট, এমন কি ক্ষমতাবান লোকদেরও। একটা রূপ নিছকই সাদামাটা—একজন মানুষ, হতেও পারে তিনি গুণী মানুষ। আরেকটা রূপ তাঁর 'ইমেজ'। যা কিনা তৈরি হয় তাঁর গুণগ্রাহীদের কল্পনায়, গুণগ্রাহীরা তাঁকে যে-ভাবে দেখতে পেলে খুশি হন। অথচ প্রায় ক্ষেত্রেই এই দুটি রূপের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে আমরা কি কখনও কোনও মানুষের প্রকৃত রূপ দেখতে পাই, জানতে পারি? নাকি নিজেরাই প্রতিটি মানুষের এক একটা ইমেজ গড়ে নিই, এবং ভুল করি। যেমন ধূর্জটিপ্রসাদকে ভেবেছিলেন বিজয় লাহিড়ি কিংবা তাঁর অফিসের সহকর্মীরা, এমন কি লাহিড়ির স্ত্রীও। আর যারা জাল কল্যাণসুন্দরের ভূমিকায় অভিনয় করে, কোন তরুণীর ভালবাসা আদায় করে বসে, তারা কি শুধুই একজন আসামি, ইমপস্টার? তা হলে আসল কল্যাণসুন্দরকে দেখতে যাওয়ার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে ব্যথাক্লিষ্ট দুটি চোখ মেলে তনুশ্রী কেন বলে ওঠে, কি হবে! অর্থাৎ তার কাছে রক্তমাংসের মানুষটাই, জাল হলেও, আসল মানুষ। সে তো ইমেজটাকেই ভালবেসেছে। সকলে, সব জেনেশুনেও সেই ইমেজটাকেই ভালবাসে।

এ উপন্যাসে আঙ্গিকের দিক থেকে কিছু নতুনত্ব দেখানোর প্রয়াস ছিল। অর্থাৎ একটি পরিচ্ছেদ লেখা হয়েছে প্রথম পুরুষে, পরের পরিচ্ছেদ উত্তম পুরুষে। এখন মনে হয় এই অভিনবত্বের কোন প্রয়োজন ছিল না, অথবা এটিই উপন্যাসের দুর্বল অংশ। তবু, উপন্যাসটি পাঠকমহলে তেমন কোন গুরুত্ব পায়নি বলে মনে একটু ক্ষোভ ছিল। 'রূপ' প্রকাশিত হওয়ার পরও জাল 'লেখক'রা অন্তর্হিত হয়নি, এবং বিস্ময়ের বিষয় এই যে পাঠকরাও তেমন সচেতন হননি। ফলে শেষ অবধি পুলিশের দ্বারস্থ হতে হয়। এবং পাঠকদের সচেতন করার জন্যে আনন্দবাজার পত্রিকায় 'অলীকবাবু' শিরোনামে একটি 'কলকাতার কড়চা' প্রকাশিত হয় ২৪ জুলাই ১৯৭৯ তারিখে।

"লেখকরা সাধারণত একটু লাজুক প্রকৃতির হন, কোন অচেনা পরিবেশে গেলে চট করে তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিতে চান না। কোন ঘটনার কেন্দ্রস্থলে না দাঁড়িয়ে তাঁরা পাশ থেকে সবকিছু দেখতে চান। কিন্তু সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, দিল্লির এক হোটেলে প্রখ্যাত লেখক রমাপদ চৌধুরী সাড়ম্বরে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন এবং সেই সুবাদে কিছু সুযোগ-সুবিধেও চাইছেন। পুরীতে বাঙালী ভ্রমণার্থী নারী-পুরুষের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সালঙ্কারে শোনাচ্ছেন তাঁর ভবিষ্যৎ উপন্যাসের পরিকল্পনা। রমাপদ চৌধুরী খড়্গপুরের রেল স্টেশনের হোটেলে খাবার খারাপ বলে বেয়ারাদের ওপর তর্জন করছেন, জানো আমি কে? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অচেনা লোকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে, কারুকে সিনেমায় নামাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারপর এই যাঃ মনিব্যাগটা বাড়িতে ফেলে এসেছি বলে সাতশো টাকা ধার নিয়ে চলে যাচ্ছেন। অনেক দূর থেকে ট্রেন ভাড়া করে কলকাতায় রমাপদ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন এক মহিলা কারণ লেখক তাঁকে চাকরি দেবার আশ্বাস দিয়ে নিজের হাতে ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন। (লেখকদের চাকরি দেবার ক্ষমতা থাকে, এ রকম আগে শোনা যায়নি)। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে কোন মেয়ে ফোন করে বলছে, আপনি মন্দিরের দেয়াল ছুঁয়ে বলেছিলেন, আমাকে বিয়ে করবেন। (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একাধিক বিয়ে করার বাতিক আছে বলে শোনা যায় না।) সব ক্ষেত্রেই বাইরে থেকে এসে এই সব নারী-পুরুষেরা রমাপদ চৌধুরী কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখে সবিস্ময়ে বলেছেন, এ কী! কেননা, তাঁরা যাকে দেখেছেন, যার কাছ থেকে নানান প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস পেয়েছেন সে ছ' ফুটের মত লম্বা, সুগঠিত স্বাস্থ্য, মাথার চুল সামনের দিকে পাতলা হয়ে গেছে এবং কথাবার্তায় তুখোড়। উক্ত

লেখক দু'জনেব কাকুরই চেহাবা কিংবা স্বভাব ওরকম নয়। হয একই ব্যক্তি অথবা ঐ রকম রূপেব একাধিক ব্যক্তি বিভিন্ন লেখকদেব পবিচয় নিয়ে মজার কাববার করছেন। তবে ব্যাপারটা আর শুধু মজাব নেই, রীতিমতন ক্ষতিকব পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। দুটি মেয়েব কাঁধে হাত বাখা ঐ বকম এক নকল লেখকেব একটি ছবি এখন জোগাড কবে লালবাজারে গোয়েন্দা দফতবে জমা দেওযা হয়েছে। পুলিশ সমেত আবও অনেকে এখন এই নকল লেখককে স্বচক্ষে দেখবাব জন্যে উন্মুখ।"

অশোক বিশ্বনাথন এই উপন্যাসটি তিন পর্বে টি ভি সিবিয়াল কবেছিলেন।

চড়াই

শারদীয়া আনন্দবাজাব ১৩৮৬। গ্রন্থাকাবে প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮০। প্রকাশক সুধাংশুশেখব দে, দেজ পাবলিশিং। প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী। উৎসর্গপত্র তাবাশঙ্কব স্মরণে/ আপনাব একটি উপন্যাস আমাকে উৎসর্গ কবেছিলেন/ আপনাকে দেবাব মত কিছু লিখতে পাবিনি/ সময়ও দিলেন না, তাই।

'চড়াই' মূলত বিদ্রূপাত্মক বচনা। কিন্তু আসলে তো মানুষেবই গল্প। একটা সময় এসেছিল, যখন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি কর্মীদেব মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কবাব জন্যে, ক্রমাগত সেই বিভেদ-রেখাব চিহ্নগুলিকে আবও স্পষ্ট কবে তোলাব জন্যে, তাদেব নানা স্তবে চিহ্নিত কবতে শুরু কবেছিল. বিদ্রূপেব ছলে এ উপন্যাসে যেটিকে দেখানো হয়েছে কমোডেব বঙেব বিন্যাসে। সবাব উপবে দেখানো হয়েছে সাদা বঙ, যা কিনা সর্বত্র অতি সাধাবণ বঙ। অথচ এই সাধাবণ বঙটিব জন্যেই ক্রমাগত ওপবে ওঠাব সাধনা। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হয়তো এভাবে যোগ্য ব্যক্তিকেই পুবস্কৃত কবে, যোগ্যেব কাছ থেকেই হয়তো একনিষ্ঠ কাজ আদায় কবতে সক্ষম হয। কিন্তু পবিবর্তে সেই যোগ্য মানুষটি ওপবে ওঠাব নেশায় কি পায় আর কি হাবায়? এই ঘোড়দৌড়েব মাঠে যাবা নামে আব যাবা নামে না, এমন কয়েকটি পবিবাবকে এ উপন্যাসে পাশাপাশি এনে উপস্থিত কবা হয়েছে। একদিকে হামটি ডামটি দুই যমজ মজাদাব ভাইয়েব মা ও বাবা, যাদেব হাবভাব ব্যবহাবকে আমবা গ্রাম্য পিছিয়ে পড়া মানুষ ভাবতে অভ্যস্ত, আবেকদিকে ওপবে উঠে যাওয়া অভি এবং তাব সঙ্গে বাবা আনন্দমোহনেব দূবত্ব. কিংবা চাকচিকাময় রুচিসম্পন্ন ওপবেব তলায় অভি ও চন্দনাব ক্ষিপ্ত কলহ (যা কিনা সত্যি সত্যি আবও ইতব ভাষায় উচ্চাবিত এবং এই লেখকেব স্বকর্ণে শ্রুত) অথবা একটি বৃদ্ধেব শবদেহকে হাঁটু ভাঙা অবস্থায় বিবাহমণ্ডপেব মধ্যে দিয়ে বেব কবে আনা---এসবেব অনেককিছুই লেখকেব অভিজ্ঞতালব্ধ। এ জীবনও আমাদেব চোখেব আড়ালে আছে, চলছে এবং ছুটছে ছুটছে, অবিবাম ছুটছে। প্রথমেই বলেছি এ উপন্যাস বিদ্রূপাত্মক বচনা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? জীবনেব প্রতিচ্ছবিও নয় কেন? তবে সব শেষে 'চড়াই' আসলে মানুষেব গল্প। মানুষেব মনেব।

শেষের সীমানা

প্রথম প্রকাশ শাবদীয় দেশ ১৩৯১। প্রথম সংস্কবণ জুলাই ১৯৮৬। প্রকাশক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড। উৎসর্গ তুলসী সেনগুপ্ত প্রিয়ববেষু। প্রচ্ছদ অমিয় ভট্টাচার্য।

এ উপন্যাসে টুংবিবাবা নামে এক তথাকথিত 'দেবতা'ব উল্লেখ আছে, যাকে কেন্দ্র কবে নানা অলৌকিক উপাখ্যান গড়ে উঠেছে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ যাব কাছে ছুটে যায়। দেবতাব নামকবণেব মধ্যে কিঞ্চিৎ কৌতুক সঞ্চাবের ইচ্ছে নিশ্চযই ছিল, কিন্তু নামকবণটি নিতান্তই লেখকেব কল্পনাপ্রসূত নয়। রাঁচি যাওযাব পথে রেলেব একটি স্টেশন পড়ে---মুরি। জাযগাটির নাম ছোটামুবি। আর এই মুবি স্টেশন থেকে মিনিট পনেরোব হাঁটাপথেব দূবত্বে একটি নাতি-উচ্চ টিলাব ওপব একটি দেবস্থানও আছে। তাব নামও টুংবিবাবা। তা থেকে পাহাড়টিব নামই হয়ে গেছে টুংরিবাবা। কিন্তু

উপন্যাসের পরিবেশ ভিন্ন, আসলে আমার শৈশব কেটেছে যে অঞ্চলে, সেই অঞ্চলের পটভূমিতেই টুংরিবাবাকে এনে এই ছোট্ট কাহিনীটি লেখা। কাহিনী না বলে স্মৃতিকথাও বলা চলত। একটি কিশোরী মেয়েকে দুর্বোধ্য বা অজ্ঞাত কোন অসুখে চোখের সামনে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে দেখেছিলাম সেই শৈশবেই। গভীর কোন দাগ রেখে গিয়েছিল মনে। পরে, বহু বছর পরে, এক বন্ধুর পুত্রের ঐ একই রোগে মৃত্যু হতে দেখেছি। তখন রোগটির নাম জানা, কিন্তু তখনও দুরারোগ্য। হয়তো এখনও। কিন্তু এ-সব নিয়ে তো কাহিনী নয়। গল্প আসলে সেই যুক্তিবাদী মানুষদের ঘিরে, যাঁরা অসহায় হয়ে পড়লে শেষ অবধি অলৌকিকের মধ্যেও আশা খুঁজে পেতে চান। নিজেকেই তাই সেই আসনে বসিয়েছি। এ উপন্যাস কুসংস্কারে বা অলৌকিকে বিশ্বাসের গল্প নয়। যুক্তিবাদীও কেন অলৌকিকের কামনা করে তারই গল্প।

একজন বিজ্ঞ সমালোচক এটিকে ভেবেছিলেন অলৌকিকে বিশ্বাসের গল্প। সেজন্যেই এত কথা বলা। 'শেষের সীমানা' নামকরণেও তা বোঝা উচিত ছিল। উপন্যাসের দুটি উক্তি তিনি হয়তো লক্ষ করেননি, অথবা তার অর্থ বোঝেননি।

প্রথম উক্তি হোয়েন ইট হ্যাপেন্স ওনলি ওয়ান্স ইট ইজ কলড মিরাক্‌ল, ইফ ইট হ্যাপেনস এগেন অ্যান্ড এগেন ইটস কলড নেচার।'

দ্বিতীয় উক্তি উপন্যাসের শেষ লাইন 'আমি চোখ বুজে মনে মনে বললাম, টুংরিবাবা, একবার, একবার অন্তত তুমি সত্যি সত্যি মিরাকল হয়ে ওঠো, মিরাকল্ ঘটিয়ে দাও।'

সমালোচকটির দোষ নেই, অতিকথনে আবিষ্ট বা অভ্যস্ত সমালোচকদের পক্ষে 'একবার অন্তত' শব্দ দুটির প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব নাও হতে পারে।

আরো একজন

প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৬৯। প্রকাশক গোপালদাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরি
প্রচ্ছদ সুবোধ দাশগুপ্ত।

খুবই কম বয়েসের লেখা, তাও অর্ধসমাপ্ত হয়ে পড়েছিল বহু বছর। যতদূর মনে পড়ে, শেষ দুটি পরিচ্ছেদ লিখে প্রকাশ করতে দিয়েছিলাম ডি এম লাইব্রেরিকে। কেন দিয়েছিলাম তার একটা ইতিহাস আছে। আজকাল বেশির ভাগ উপন্যাসই কোন না কোন পত্রিকায় আগে ছাপা হয়, তারপর প্রকাশকরা বই আকারে বের করেন। তখনকার দিনে লেখক ছিলেন অনেক, বিখ্যাত লেখকও, কিন্তু পত্রপত্রিকা ছিল কম। তাই অনেক প্রকাশকই সরাসরি বই বের করতেন। নতুন লেখকদেরও। আমি তখন একেবারেই নতুন লেখক, গল্প লেখক হিসেবেই যৎকিঞ্চিৎ নাম হয়েছে কিন্তু উপন্যাস প্রকাশ করতে কোন পত্রিকা-সম্পাদক আগ্রহী হতে পারেন এমন দুরাশা ছিল না। সেই সময়ে প্রকাশক গোপালদাস মজুমদার কি ভাবে পাঁচশো টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে প্রথম উপন্যাসটি চেয়েছিলেন, সে-কাহিনী 'প্রথম প্রহর' গ্রন্থ প্রসঙ্গে আগেই জানিয়েছি। পাঁচশো টাকা তৎকালে তিন ভরি সোনার দাম। আমার কাছে তখন টাকার প্রয়োজনও ছিল অনেক বেশি। তার চেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল এই উৎসাহ, এই সুযোগের। এই সম্মানের। ডি এম লাইব্রেরির গোপালবাবু, নজরুলবন্ধু হিসেবে যাঁর প্রভূত খ্যাতি ছিল, নজরুল-প্রকাশক হিসেবে পরবর্তীকালে যাঁর খ্যাতি অখ্যাতি প্রায় সমান সমান, তিনি প্রকাশক হিসেবে কি দিয়েছেন না দিয়েছেন তা নিয়ে প্রবীণ লেখকদের মধ্যেও নানা গুজব ছিল, কিন্তু এই তরুণ লেখকের সেই বৃদ্ধ বন্ধু একটি জিনিস আমাকে দিয়েছিলেন যা কোন প্রকাশক বা সম্পাদক দিতে পারেননি। তিনি আমাকে আত্মসম্মান রক্ষার সুযোগ দিয়েছিলেন, উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে কোন প্রকাশক বা সম্পাদকের দ্বারস্থ হতে হয়নি, কোন অনুরোধ উপরোধ করতে হয়নি, যা আমার পক্ষে কোন কালেই সম্ভব ছিল না। হয়তো উপন্যাস লেখক হওয়া সম্ভবই হত না সেই প্রবীণ ও বিখ্যাতদের ভিড়ে। তিনি আমাকে আত্মমর্যাদা দিয়েছিলেন। বইয়ের প্রচ্ছদপট থেকে কাগজ কিংবা

প্রেস নির্বাচনেও আমার মতই ছিল শেষ কথা। অথচ এত সব করেছেন এমন একজনের জন্যে যার লেখা আদৌ বিক্রি হবে কিনা তিনি জানতেন না। 'প্রথম প্রহর' তো তেমন জনপ্রিয়ও হয়নি। কিন্তু এই টাকা আগাম নেয়ার ব্যাপারটা, টাকার প্রয়োজন ছিল তৎসত্ত্বেও, ভাল লাগেনি। এর মধ্যে কেমন এক ধরনের বন্ধনদশা বোধ করতাম। ঋণমুক্ত হলেই যেন বাঁচি, যে-কোন উপায়ে। পরের বই 'লালবাঈ' লেখার সময় সেজন্যেই কোন আগাম টাকা নিতে অস্বীকার করেছিলাম, যদিও প্রকাশের দিনেই হিসেব করে পুরো টাকার চেক তিনি হাতে তুলে দিয়েছিলেন। হিসেব করে দেখেছি তৎকালে সে টাকাও প্রায় দশ ভরি সোনার দাম। 'লালবাঈ' অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা পেল, আর সেজন্যেই হয়তো, অথবা তাঁর স্বভাববশত, পীড়াপীড়ি শুরু হল পরের বইয়ের জন্যে টাকা অ্যাডভান্স নেবার। বাধ্য হয়েই নিতে হয়েছিল। অথচ তখন আমার লেখার একটুও ইচ্ছে নেই। লেখালিখি থেকে কিছুদিনের জন্যে মুক্তি চাইছিলাম। এরকম আমার প্রায়ই হত। আজও হয়। কিন্তু সেই যে টাকা নিলাম, শুরু হল বন্ধন দশা, যেন কোনক্রমে ঋণশোধ করতে পারলে তবেই মুক্তি। অথচ লেখার জন্যে ভিতর থেকে কোন তাগিদ নেই। এই তাগিদ না থাকলে আজও লিখতে পারি না, কিংবা বাধ্য হলে বেশ বাজে লেখা লিখে ফেলি।

কিন্তু টাকা নিয়েছি যখন লিখতে তো হবেই। সুতরাং দেরাজ থেকে বের হল অর্ধসমাপ্ত এই উপন্যাস, কোনক্রমে শেষ করে দিলাম। এর পর আর কখনও সে ভাবে তাঁর কাছ থেকে অগ্রিম কোন টাকা নিইনি। তবে বই প্রকাশ হওয়ার প্রথম দিনেই তিনি রয়ালটির পুরো টাকা মিটিয়ে দিতেন। কিন্তু দেখেছি বই বিক্রি না হলে তিনি যতটা অখুশি হতেন, বইটা ভাল না হলে তার চেয়ে বেশি অখুশি হতেন। সেকালে লেখকরা প্রকাশকদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হতেন বলে শুনেছি, কিন্তু প্রকাশকদেরও কি আমরা প্রবঞ্চিত করিনি। শুধু টাকা শোধ করার দায়ে যা-খুশি লিখেও তো দিয়েছি। তাঁরা হয়তো অনুযোগ করেননি, কিন্তু আমরা নিজেদেরও যে এভাবে প্রবঞ্চিত করেছি সে-কথাই বা অস্বীকার করি কি করে।

'আরো একজন' উপন্যাসে কি আছে না আছে পাঠকরা বিচার করবেন, এর পক্ষ নিয়ে ওকালতি করার মতন মনের জোরও আমার নেই। সেজন্যে শুধু ইতিহাসটুকুই জানিয়ে দিলাম।